সায়েন্স ফিকশান স•ম•গ্র

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

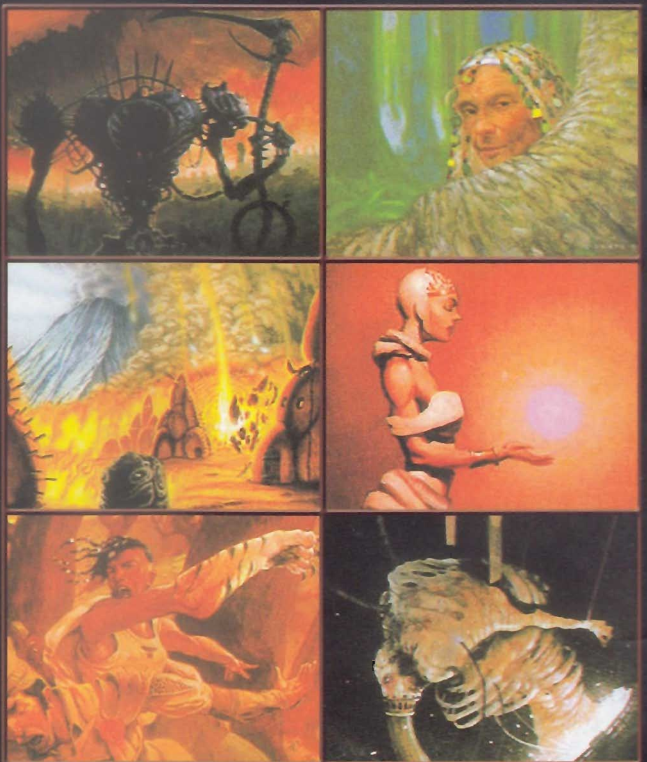

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

✓ সিস্টেম এডিফাস ✓ একজন অতিমানবী ✓ মেতসিস ✓ ইরন ✓ শাহনাজ ও ক্যাপ্টেন ডাবলু ✓ জলজ ✓ প্রজেক্ট নেবুলা ✓ ফোবিয়ানের যাত্রী

সায়েন্স ফিকশান (science fiction) যাকে এখন ইংরেজিতে সোজাসুজি বড়ো অক্ষরে SF বলা হচ্ছে, তার বয়স কদ্দিন? আমরা বাংলায় কখনো অনুবাদ করে, কখনো-বা উদ্ভাবন করে, অনেক দিন ধরে অনেক নামে ডাকছি। শেষ পর্যন্ত মনে হচ্ছে 'সায়েন্স ফিকশান' নামটাই লাগসই হয়ে দাঁড়াচ্ছে, সকলেই যেন এ-নামেই ডাকা পছন্দ করছে, কি মুখে-মুখে কি লেখাপত্তরে সবাই ব্যবহার করছেন আগের চেয়ে অনেক বেশি। ভাবখানি এরকম : যে-মেয়ের নাম রানী তাকে কি আমরা কুইনী বলে ডাকি, নাকি—যার নাম রোজি তাকে বলি গোলাপী! তবে? নাম তো নামই। নাম পাল্টালে তো মানুষটাই পাল্টে গেল, না কি! বিজ্ঞানের কল্পকাহিনী, বিজ্ঞানের রোমাঞ্চগল্প, বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প/উপন্যাস, কল্পবিজ্ঞান—না, কোনোটাই শোনামাত্র মনের মধ্যে 'সায়েন্স ফিকশানে'র ছবি ফোটায় না। এ ভারি উদ্ভট কথা হল। SF কি স্পষ্ট কোনো চেহারা, মানে কাহিনীর চেহারা, চোখের সমুখে এনে দাঁড় করায়?

না, করায় না। সায়েন্স ফিকশান কি এক রকমের নাকি! এখন বলি—এ এক নির্বিশেষ নাম। ঐ রানী কি রোজির মতো নয়। যদি বলা হয় 'মানুষ', তা হলে কি কোনো বিশেষ লোক মনের মধ্যে ধরা দেবে? দেবে না। ধরা দেবে মানুষের মূর্তি—যা গরু-ভেড়া কি বাঘ-সিংহ থেকে আলাদা। এও তেমনি। কেননা, পণ্ডিতেরা বলছেন : কে বলে বিজ্ঞানের অগ্রগতি কি জয়যাত্রার ফলে এর জন্ম? এই দুটি শব্দের ('science fiction') সৃষ্টিকথাই তো পাক্কা দেড় শ' বছরের পুরোনো। উইলিয়ম উইলসন নামে এক ভদ্রলোক তাঁর এক বইয়ে ব্যবহার করেছিলেন ১৮৫১ সালে। আরো জানা যাচ্ছে, বেনামীতে, কিংবা বলা সঙ্গত, একেবারেই নামহীনভাবে এরই পূর্বপুরুষ জন্মেছিল খ্রিষ্টজন্মেরও শ' দেড়েক বছর আগে। অর্থাৎ আধুনিক মানুষের আগে হোমো ইরেক্তুস। বয়স তবে কত দাঁড়াল? পুরো ২১৫২ বছর। পাটীগণিতের হিসেব তো সেটাই বলে।

তো, এতদিন ধরে ধরাধামে মানুষের পৃথিবীতে যে-ভাবনাটি বিচরণ করে বেড়াচ্ছে, তার ধরনধারণ চরিত্র আচরণ-ব্যাভার সবই অদ্ভুত বিচিত্র অপূর্ব কিংবা অ-দৃষ্টপূর্ব না-হয়েই পারে না। হয়েছেও তাই। সায়েন্স ফিকশানের কতই-না রকমফের দেশে দেশে। কবিপত্নী মেরি শেলির 'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন' আর জুল্ ভের্ন্-এর 'ভোইয়াজ্ ও সঁত্র্ দ্য লা ত্যার্' (পাতালের কেন্দ্রে অভিযান)—দুটোই SF, অথচ তফাৎ কতই-না। আবার এইচ. জি. ওয়েল্সের 'দ্য টাইম মেশিন' কি 'দ্য ওয়ার অব দ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

জন্ম : ২৩শে ডিসেম্বর ১৯৫২, সিলেট। বাবা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ফয়জুর রহমান আহমদ এবং মা আয়েশা আখতার খাতুন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র, পিএইচ.ডি. করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটন থেকে। ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি এবং বেল কমিউনিকেশান্স রিসার্চে বিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করে সুদীর্ঘ আঠার বছর পর দেশে ফিরে এসে বিভাগীয় প্রধান হিসেবে যোগ দিয়েছেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রনিক্স ও কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগে।

তাঁর স্ত্রী ড. ইয়াসমীন হক, পুত্র নাবিল এবং কন্যা ইয়েশিম।

ওয়র্ল্ডস্'ও যা, আইজাক আসিমভ অথবা আর্থার সি. ক্লার্কের লেখাও তাই—সবই তো সায়েন্স ফিকশান। আছেন এডগার রাইস বারাজ, কুর্ট ভনিগাট, কি গোর ভিডাল প্রমুখেরা।

আর আছেন আমাদের **মুহম্মদ জাফর ইকবাল**। সত্যি বলতে, বাংলায় বিশ বছর আগেও তো সায়েন্স ফিকশান ছিল না। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদা-র কাণ্ডকারখানায় প্রথম সে একটু উঁকি মেরে আমাদের দেখেছিল। এখন দুই বাংলাতেই অনেকেই লিখছেন। তবু, মু. জা. ই. অনন্য। তিনি নিজে বিজ্ঞানী হওয়ায় তাঁর বিজ্ঞানকল্পনায় যেমন সত্য (real) এসে মেশে তেমনি মানবচিন্তা ও বিশ্বকল্যাণও। বলতে ইচ্ছে হয়, অহঙ্কার ও অবিনয় শোনালেও, তিনিই বাংলা ভাষায় এ মুহূর্তে সম্ভবত শ্রেষ্ঠ সায়েন্স ফিকশান রচয়িতা।

বর্তমান সংকলনের ৮টি গ্রন্থে তার প্রমাণ মিলবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

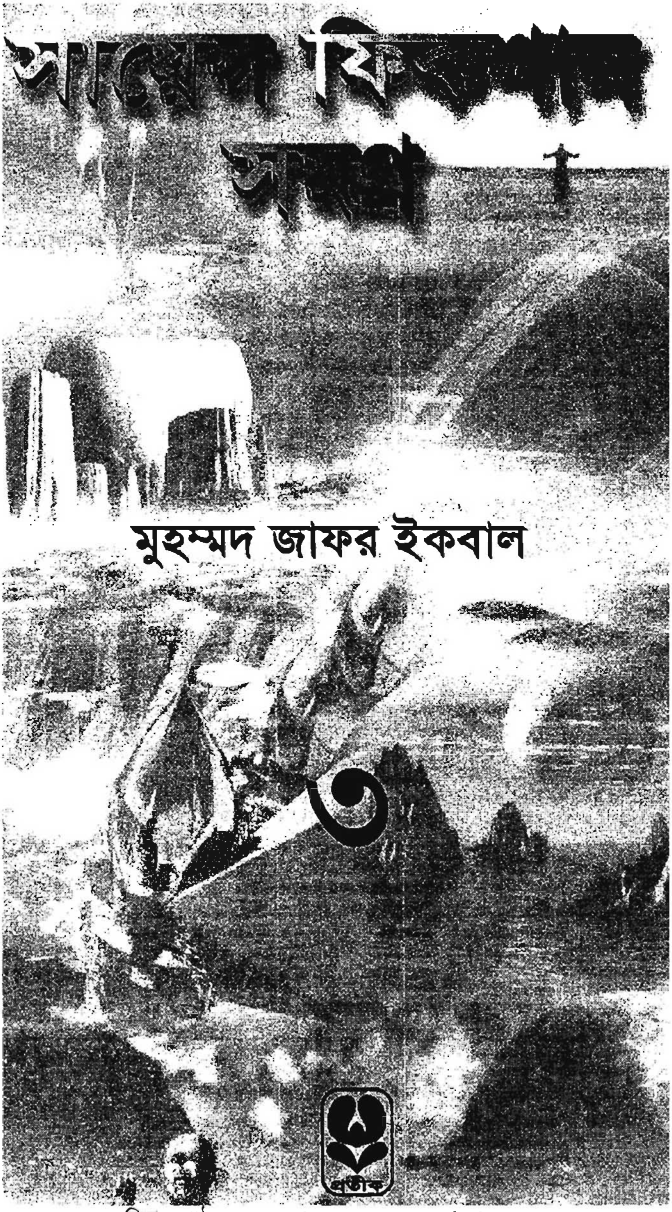

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০০২
দ্বিতীয় মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ২০০৩
তৃতীয় মুদ্রণ : নভেম্বর ২০০৪
চতুর্থ মুদ্রণ : আগস্ট ২০০৫
পঞ্চম মুদ্রণ : এপ্রিল ২০০৭
ষষ্ঠ মুদ্রণ : জুলাই ২০০৮
সপ্তম মুদ্রণ : আগস্ট ২০০৯
অষ্টম মুদ্রণ : এপ্রিল ২০১০
নবম মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০১১
দশম মুদ্রণ : অক্টোবর ২০১১
একাদশ মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ২০১২
দ্বাদশ মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০১৪

প্রচ্ছদ
বিদেশী শিল্পীর আঁকা চিত্র অবলম্বনে

প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ৩৮/২ক বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা–১১০০'র পক্ষে
এফ. রহমান কর্তৃক প্রকাশিত এবং নিউ পুবালি মুদ্রায়ণ, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড
সূত্রাপুর, ঢাকা–১১০০ কর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য : ৫০০.০০ টাকা মাত্র

ISBN 984 - 446 - 061 - 1

SCIENCE FICTION SAMAGRA VOL III [A Collection of Science Fiction]
by Muhammed Zafar Iqbal
Published by PROTIK. 38/2 ka Banglabazar (Ist floor), Dhaka-1100
Twelfth Edition : January 2014. Price : Taka 500.00 Only.

একমাত্র পরিবেশক : অবসর প্রকাশনা সংস্থা
বিক্রয়কেন্দ্র : ৩৮/২ক বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা–১১০০

যোগাযোগ
৭১১৫৩৮৬, ৭১২৫৫৩৩
০১৭৪৩৯৫৫০০২, ০১৬৮০১৫৩৭০৭

Website : www.abosar.com, www.protikbooks.com
Online Distributor : www.rokomari.com, www.akhoni.com
Facebook : www.facebook.com/AbosarProkashanaSangstha
e-mail : protikbooks@yahoo.com, abosarprokashoni@yahoo.com
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সায়েন্স ফিকশান সমগ্রের তৃতীয় খণ্ডটি বের হল। একটি সময় ছিল যখন সায়েন্স ফিকশান লিখতাম আমরা দু-চার জন দলছাড়া মানুষ, এখন সময় পাল্টেছে। গত কয়েক বছর থেকে দেখছি প্রায় নিয়মিতভাবে প্রচুর সায়েন্স ফিকশান বের হচ্ছে, অনেকেই লিখছেন, তার মাঝে কেউ কেউ খুব ভালো লিখছেন। যাঁরা লিখছেন তাঁদের প্রায় সবাই কমবয়সী তরুণ—যাঁরা সাহিত্যের নূতন একটি ধারাকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে ভয় পান না। অনেকেই তাঁদের লেখা প্রথম বইটি আমাকে উৎসর্গ করে ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলেছেন। প্রতি বছর শুধু যে নূতন বই বের হচ্ছে তা-ই নয়, সায়েন্স ফিকশান অনুবাদ করা হচ্ছে, দেশ-বিদেশের সায়েন্স ফিকশান নিয়ে সংকলন বের হচ্ছে, পত্র-পত্রিকা এবং সাময়িকীগুলো বিশেষ সায়েন্স ফিকশান সংখ্যা বের করছে। এমনকি প্রতিষ্ঠিত সাময়িকীগুলো ঈদ সংখ্যায় গল্প-উপন্যাস-কবিতা এবং গুরুগম্ভীর প্রবন্ধের পাশাপাশি একটা সায়েন্স ফিকশান বের করার জন্যে জায়গা আলাদা করে রাখছে। দেখে আমার খুব ভালো লাগে—অনুভূতিটি একটা ছোট গাছকে ডালপালা ছড়িয়ে বড় হয়ে যেতে দেখার অনুভূতির মতো। আমার আনন্দটি একটু বেশি, কারণ যখন কেউ ছিল না তখন ছোট গাছটি দুমড়ে মুচড়ে যাবার ভয় ছিল, অযত্নে শুকিয়ে যাবার আশঙ্কা ছিল, আগাছা বলে উপড়ে ফেলে দেবার আতঙ্ক ছিল; তখন আমি এবং আমার মতো দু-একজন এই গাছটিতে পানি দিয়ে বড় করেছি। এখন এই গাছটি বিশাল বৃক্ষে পরিণত হতে যাচ্ছে, তাকে ঘিরে অনেক মানুষ, কার সাধ্যি আছে এই গাছকে উপড়ে ফেলে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখালেখির কোনটা সাহিত্য কোনটা সাহিত্য নয় সেটা নিয়ে এখনো তর্ক–বিতর্ক চলছে, আমি সতর্কভাবে সেই তর্ক–বিতর্ক থেকে দূরে সরে থাকি। তবে যেটুকুকে সাহিত্য বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে তার গঠনটুকুও কেমন হবে সেটি নিয়ে আলোচনা চোখে পড়ে। যেমন—আমি সাহিত্যে গবেষকদের বলতে শুনেছি যে পৃথিবীর সব গল্পই আসলে লেখা হয়ে গেছে, নূতন গল্প আর কোনোভাবেই লেখা সম্ভব নয়। তাই গল্পের বিষয়বস্তুর কোনো গুরুত্ব নেই গল্পটা কীভাবে বলা হচ্ছে সেটাই গুরুত্বপূর্ণ—অর্থাৎ প্রকাশ করার ভঙ্গিটাই হচ্ছে সাহিত্য। আমি বরাবরই এর বিরুদ্ধে বলে আসছি, কারণ আমি মনে করি পৃথিবীর সব গল্প বলে ফেলা সম্ভব নয়, এটি বিশ্বাস করলে মানুষের সৃজনশীলতাকে খাটো করে দেখা হয়। (আমি অবিশ্যি একবার গণিত ব্যবহার করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলাম যে কিছুতেই পৃথিবীর সব গল্প লিখে ফেলা সম্ভব নয়; কিন্তু আমি নিশ্চিত—সাহিত্যের মাঝে গণিত টেনে আনা একটা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচনা করা হবে!) সবকিছু ছেড়ে দিলেও—শুধুমাত্র সায়েন্স ফিকশানের কথা বললেই দেখা যায় যে পৃথিবীতে এখনো অনেক নূতন গল্প লেখা হচ্ছে। বিজ্ঞানের একটা নূতন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে একটা নূতন দিগন্ত খোলা হয়ে যায়—সেই দিগন্তের সঙ্গে মিল রেখে কল্পনাবিলাসী লেখকেরা সম্পূর্ণ নূতন নূতন গল্প লিখতে শুরু করেন। কিছুদিন আগেও মানুষ জানত না যে ব্ল্যাকহোল বলে কিছু থাকতে পারে—(যে মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সূত্র থেকে এটি এসেছে তিনি নিজেও সেটা বিশ্বাস করতে রাজি ছিলেন না!) ব্ল্যাকহোলের অস্তিত্ব জানার আগে কারো পক্ষেই জানা সম্ভব ছিল না যে তার দিগন্তসীমার ভেতর থেকে কোনো কিছুই বেরিয়ে আসতে পারে না—আলো পর্যন্ত সেখানে জন্ম–জন্মান্তরের জন্যে আটকা পড়ে যায়। ব্ল্যাকহোলের অস্তিত্ব এতই অস্বাভাবিক যে তার ভেতর থেকে কোনো তথ্য কখনোই আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ফিরে আসতে পারবে না। সেই নিঃসীম শূন্যতার মাঝে আটকা পড়ে থাকা কোনো মহাকাশচারীর অনুভূতিটি পৃথিবীর কারো জানার কথা নয়—কিন্তু একজন সায়েন্স ফিকশান লেখক সেই গল্পটি আমাদের শুনিয়ে দিতে পারেন—বিজ্ঞানের একটি নূতন আবিষ্কার দিয়ে এই নূতন গল্পটি এবং তার মতো আরো অসংখ্য গল্পের জন্ম হতে পারে। কাজেই আমরা কেমন করে বলব যে পৃথিবীর সব গল্প লেখা হয়ে গেছে—সেটি বললে তো মানুষের সৃজনশীলতাকে অস্বীকার করা হবে!

এই সংকলন–গ্রন্থটিতে গত চার বছরে লেখা আমার আটটি সায়েন্স ফিকশান সংকলিত হয়েছে। প্রথমটি একটি গল্প সংকলন—নাম : 'সিস্টেম এডিফাস'। এর মাঝে আটটি গল্প, যার ভেতর ওয়াই ক্রমোজম গল্পটি আমার খুব প্রিয়। আমাদের বর্তমান পুরুষশাসিত সমাজে মেয়েদের অকারণেই ছোট করে দেখা হয়—এই গল্পটিতে আমি কল্পনা করে নিয়েছি মানবজগতে পুরুষকেই বাহুল্য হিসেবে বিবেচনা করা যায় এবং সেটি আমি করেছি পুরোপুরি বিজ্ঞানের দৃষ্টি থেকেই!

সংকলনের দ্বিতীয় বইটির নাম 'একজন অতিমানবী'। পৃথিবীতে এখন প্রতিটি মানুষের অস্তিত্ব আলাদা আলাদা; কিন্তু এমনও তো হতে পারত যে অনেক মানুষ মিলে একটা সম্মিলিত অস্তিত্ব হত যেখানে তাদের ভাবনা–চিন্তা হত সমন্বিত, একসঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেগুলো অনুরণিত হত। সেই কাল্পনিক মানুষের অস্তিত্ব নিয়ে, তাদের দুঃখ-কষ্ট এবং ভালবাসা নিয়ে, তাদের নিজস্ব জগৎ নিয়ে মাঝে মাঝেই আমার লেখতে ইচ্ছে করে। একজন অতিমানবী উপন্যাসটি সেরকম একটি চেষ্টা—আমি নিশ্চিত এই বিষয়টি নিয়ে আমি ভবিষ্যতে আরো অনেকবার লেখার চেষ্টা করব।

'মেতসিস' লেখার সময় আমার একটি মহাকাশযানের সুন্দর নামের প্রয়োজন হল—কিছুতেই সেই নাম খুঁজে পাই না। তখন হঠাৎ দেখি কোথায় যেন লেখা System, উল্টে দিলেই হয়ে যায় Metsys—মেতসিস! মেতসিসের গল্প ভবিষ্যতের—যখন মানুষ যন্ত্রের কাছে পরাজিত হয়ে আছে এবং আবার কীভাবে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে।

মিচিও কাকু নামে একজন পদার্থবিজ্ঞানীর হাইপার স্পেস নামে একটা বই পড়ে আমার 'ইরন' নামের বইটি লেখার ইচ্ছে হয়েছিল। ত্রিমাত্রিক জগতের মানুষেরা চতুর্মাত্রিক জগতের মুখোমুখি হলে কী হতে পারে সেটা বলাই ছিল এই বইটির উদ্দেশ্য; কিন্তু সায়েন্স ফিকশান তো আর সায়েন্স শেখার জন্যে নয়, একটা ভালো গল্পের জন্যে—তাই ঘুরেফিরে এখানে গল্পটাই আবার প্রধান হয়ে এসেছে।

গুরুগম্ভীর সায়েন্স ফিকশান লিখতে লিখতে মাঝে মাঝেই আমার খুব ইচ্ছে করে খুব হালকা—প্রায় ঠাট্টার মতো করে একটা সায়েন্স ফিকশান লিখতে। আমার অন্য সব সংকলনেই এরকম একটি করে সায়েন্স ফিকশান আছে। এই সংকলনে সেটি হল 'শাহনাজ ও ক্যাপ্টেন ডাবলু'। একটি কিশোরী এবং আট-দশ বছরের একটি ছেলে কেমন করে মহাজাগতিক প্রাণীদের সাথে একটা হালকা এ্যাডভেঞ্চারে জড়িয়ে পড়ল সেটি নিয়ে ছেলেমানুষি গল্প। পাঠকদের কী প্রতিক্রিয়া জানি না, তবে গল্পটি লিখতে গিয়ে আমি নিজে খুব মজা পেয়েছি।

'জলজ' বইটিতে জলজ এবং ডক্টর ট্রিপল এ নামে দুটি অত্যন্ত ছোট ছোট উপন্যাস ছাড়াও আরো কয়েকটি ছোটগল্প রয়েছে। জলজ গল্পটি ঈদ সংখ্যা '২০০০'-এ প্রকাশিত হয়েছিল। আমার নিজের ধারণা এটিকে মোটামুটি একটি সুখপাঠ্য সায়েন্স ফিকশান হিসেবে চালিয়ে দেওয়া যাবে। তবে ডক্টর ট্রিপল এ-কে নিয়ে সবার প্রতিক্রিয়া ভালো নয়—এরকম একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা এত সহজে বলে ফেলার জন্যে আমার মা আমাকে খানিকটা বকাবকি করেছিলেন! আমার মনে হয় কমবয়সী পাঠকদের নার্ভ আরো অনেক শক্ত এবং তারা আমার মায়ের মতো এত সহজে বিচলিত না-ও হতে পারে।

আমাকে অনেকেই টেলিভিশনে একটি সায়েন্স ফিকশানকে নাট্যরূপ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালীন একজন প্রায় নিয়মিতভাবে আমাকে সেটা নিয়ে তাগাদা দিতেন—তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্যে আমি মনে মনে একটি কাহিনী দাঁড় করিয়েছিলাম। সেই কাহিনীটাকে ভিত্তি হিসেবে নিয়ে বাংলাদেশকে প্রেক্ষাপট করে 'প্রজেক্ট নেবুলা' লেখা হয়েছে। টেলিভিশনের জন্যে নাট্যরূপ দেওয়ার কাজ শুরু করার জন্যে এই বইটিকে আমি সবসময় আমার ব্যাকপেকে রাখি; কিন্তু এখনো সেই কাজে হাত দেওয়ার সময় করে উঠতে পারি নি!

এই সংকলনের শেষ সায়েন্স ফিকশান 'ফোবিয়ানের যাত্রী' বইটির প্রকাশক সময় প্রকাশনী বইটিকে তাদের ওয়েবসাইটে রেখে দিয়েছিল—যেন বইটি না কিনেও যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ বইটিকে ডাউনলোড করে পড়ে নিতে পারে। সময় প্রকাশনী দাবি করেছিল ফোবিয়ানের যাত্রী ওয়েবসাইটে রেখে দেওয়া প্রথম বাংলা বই কিন্তু তথ্যটি সঠিক কি না আমি সেটি সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত নই। ভবিষ্যতে বই যে কাগজে ছাপা না হয়ে প্রথমে এভাবে ইলেকট্রনিক মিডিয়াতেই বের হবে সে ব্যাপারে আমি মোটামুটি নিশ্চিত—সেই হিসেবে বাংলাতে প্রথম এ ধরনের বই যদি সায়েন্স ফিকশান দিয়েই শুরু হয় তা হলে ব্যাপারটি মন্দ হয় না বলে আমার ধারণা।

সায়েন্স ফিকশান সমগ্রের তৃতীয় খণ্ডটি প্রকাশ করার সময় আমি আবার প্রতীক প্রকাশনার আলমগীর রহমানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বইয়ের ভেতরে যাই থাকুক না কেন, তাঁর প্রকাশিত বইগুলো দেখতে এত চমৎকার হয় যে হাতে নিলেই মনের ভেতরে এক ধরনের আনন্দ হয়। অন্য দুটো সংকলনের এখন পর্যন্ত অনেকগুলো সংস্করণ বের হয়ে গেছে—কৃতিত্বটুকু কার বেশি—লেখকের না প্রকাশকের সে ব্যাপারে আমি এতটুকু নিশ্চিত নই।

মুহম্মদ জাফর ইকবাল
১৮-১১-০১
বনানী, ঢাকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

সিস্টেম এডিফাস ১

একজন অতিমানবী ৬৩

মেতসিস ১২১

ইরন ১৮৫

শাহনাজ ও ক্যাপ্টেন ডাবলু ২৬৫

জলজ ৩৩৯

প্রজেক্ট নেবুলা ৪০৩

ফোবিয়ানের যাত্রী ৪[illegible]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিস্টেম এডিফাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টুরিন টেস্ট

ব্রু চোখ খুলে তাকাল। মাথার কাছে জানালায় দৃশ্যটির পরিবর্তন হয়েছে। এর আগেরবার সেখানে ছিল নীল আকাশের পটভূমিতে উত্তাল সমুদ্রের ঢেউ, এবারে দেখাচ্ছে ঘন অরণ্য। দৃশ্যগুলি কৃত্রিম জেনেও ব্রু মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল। পৃথিবী ছেড়ে এই মহাকাশযানে ছায়াপথের কেন্দ্রের দিকে যাত্রা শুরু করেছে প্রায় তিন শতাব্দী আগে—আর কখনোই সেই পৃথিবীতে ফিরে যাবে না বলেই কি এই সাধারণ দৃশ্যগুলি এত অপূর্ব দেখায়?

ব্রু একটা নিশ্বাস ফেলে উঠে বসতেই খুব কাছে থেকে একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, "শুভ জাগরণ, মহামান্য ব্রু। আপনি এক শতাব্দী পর ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। আপনার জাগরণ আনন্দময় হোক।"

"ধন্যবাদ কিলি।"

"আমি কিলি নই মহামান্য ব্রু। আমি কিলির প্রতিস্থাপন রবোট।"

"কিলির প্রতিস্থাপন?" ব্রু একটু অবাক হয়ে বলল, "কী হয়েছে কিলির?"

"কপোট্রন অতি ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। মেমোরি সেল একটানা দুই শতাব্দীর বেশি কাজ করে না। পাল্টাতে হয়।"

ব্রু জিব দিয়ে চুকচুক শব্দ করে বলল, "আহা বেচারা। কিলির সাথে আমার এক ধরনের বন্ধুত্ব হয়েছিল জান?"

কণ্ঠস্বরটি হাসির মতো শব্দ করে বলল, "জানি।"

"কেমন করে জান?"

"কারণ কিলির মূল সিস্টেমটি আমার কপোট্রনে বসানো হয়েছে। আমি তার অনেক কিছু জানি।"

"ভারি মজার ব্যাপার। তোমাদের মৃত্যু নেই। যখন একজনের সময় শেষ হয়ে আসে তখন অন্যের মাঝে নিজেকে সঞ্চারিত করে দাও। তোমরা বেঁচে থাক অনির্দিষ্টকাল।"

"কথাটি মাত্র আংশিক সত্যি মহামান্য ব্রু।"

"আংশিক? কেন—আংশিক কেন?"

"কারণ কিলির মূল সিস্টেম আমার কপোট্রনে বসানো হয়েছে সত্যি, কিন্তু যে কপোট্রনে বসিয়েছে সেটি নূতন একটি কপোট্রন—নূতন আঙ্গিকে তৈরী। প্রতিটি সেল এক মিলিয়ন অন্য সেলের সাথে যোগাযোগ করতে পারে।"

"সত্যি? সে তো মানুষের নিউরন থেকে বেশি।"

"এক অর্থে বেশি। কাজেই এই নূতন কপোট্রনে যখন পুরোনো সিস্টেম লোড করা হয়

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন আমরা একই রবোট হলেও আমাদের চিন্তার পরিবর্তন হয়, ভাবনার গভীরতা বেড়ে যায়, দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে যায়। আমাদের সামগ্রিক এক ধরনের বিকাশ হয়—উন্নত স্তরে বিকাশ।"

"উন্নত স্তরে বিকাশ?"

"হ্যাঁ। আপনারা মানুষেরা মনে হয় ব্যাপারটি ঠিক ধরতে পারবেন না, কারণ আপনারা কখনোই এক মস্তিষ্ক থেকে অন্য মস্তিষ্কে স্থানান্তরিত হন না।"

"তা ঠিক।"

"কিছু কিছু ড্রাগ বা নেশাজাত দ্রব্য আছে যেটা সাময়িকভাবে আপনাদের মস্তিষ্ককে বিকশিত করে—অনেকটা সেরকম। তবে আমাদেরটি সাময়িক নয়, আমাদেরটি স্থায়ী। অভ্যস্ত হতে খানিকটা সময় নেয়।"

রু প্রায় এক শতাব্দী নিদ্রিত থাকা শরীরটিকে ধীরে ধীরে সজীবতা ফিরিয়ে আনতে আনতে বলল, "তুমি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বলছ। মানুষের যেরকম ক্রমবিবর্তন হচ্ছে, তোমাদেরও হচ্ছে। তবে মানুষের ক্রমবিবর্তন খুব ধীরে ধীরে হয়, এক মিলিয়ন বছরে হয়তো অল্প কিছু পরিবর্তন হয়—তোমাদেরটা হয় খুব দ্রুত। গত এক শতাব্দীতেই তোমরা কপোট্রনের সেলদের যোগাযোগ প্রায় এক শ গুণ বাড়িয়ে ফেলেছ। ঠিক কি না?"

"ঠিক। তবে আমাদের এই উন্নতিটা জীবজগতের ক্রমবিবর্তন নয়, আমাদেরটি নিয়ন্ত্রিত, আমরা নিজেরাই করছি।"

"পজিটিভ ফিডব্যাক। নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে তো?"

কিলির প্রতিস্থাপিত রবোটটি শব্দ করে হাসল, কিছু বলল না।

রু তার আসনের পাশে পা নামিয়ে দিয়ে বলল, "তোমাকে কী বলে ডাকব?"

"আপনার আপত্তি না থাকলে আমাকে কিলি বলেই ডাকতে পারেন। কপোট্রন ভিন্ন হলেও আমি আসলে কিলিই।"

"না আপত্তি নেই। আপত্তি কেন থাকবে?"

"কারণ আমি দেখতে কিলির মতো নই। একটু অন্যরকম।"

"তাই নাকি? ক্যাপসুলটা খুলে দাও তোমাকে দেখি।"

কিছুক্ষণের মাঝেই ক্যাপসুলের ঢাকনা উঠে গেল, রু বাইরের তীব্র আলোতে নিজের চোখকে অভ্যস্ত হতে দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। নগ্নদেহ নিও পলিমারের আবরণ দিয়ে ঢেকে সে ক্যাপসুল থেকে নেমে এল, কাছেই যে রবোটটি দাঁড়িয়ে আছে সেটি নিশ্চয়ই কিলির প্রতিস্থাপিত রবোটটি। রু খানিকটা মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে রবোটটির দিকে তাকিয়ে রইল, কী চমৎকার ধাতব শরীর, কপোট্রনটি মাথায় এমনভাবে বসানো হয়েছে যে বাইরে থেকে বোঝাই যায় না। শুধু তাই নয়, সবচেয়ে আশ্চর্য দেখার জন্যে তার নূতন দুটি চোখ—অনেকটা মানুষের অনুকরণে তৈরী; হঠাৎ দেখলে মনে হয় জীবন্ত। রু বলল, "তোমাকে দেখে মুগ্ধ হলাম কিলি।"

"মুগ্ধ হবার বিশেষ কিছু নেই। জীবন্ত প্রাণীর সাথে আমাদের মূল পার্থক্য হচ্ছে শক্তির ব্যবহার। আপনাদের শরীরে জৈবিক প্রক্রিয়ায় পরিপাকযন্ত্র দিয়ে শক্তি সংগ্রহ করেন, আপনাদের শরীরের বেশিরভাগ হচ্ছে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, কিডনি, যকৃত, পরিপাকযন্ত্র। আমাদের সেসব কিছুই লাগে না, শুধু দরকার একটা শক্তিশালী ব্যাটারি। তা ছাড়াও আপনাদের মস্তিষ্কের একটা বড় অংশ শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করার কাজে ব্যবহার হয়, আমরা

AMARBOI.COM

কপোট্রনের পুরোটা চিন্তাভাবনার কাজে ব্যয় করতে পারি। কাজেই বলতে পারেন, আমাদের দেহের ডিজাইন খুব সহজ। আমরা আপনাদের দেহের অনুকরণ করে যাচ্ছি।"

"খুব চমৎকার অনুকরণ করেছ।"

"ধন্যবাদ, মহামান্য রু।"

"তোমরা কত জন রবোটকে নূতন কপোট্রনে বসিয়েছ?"

"প্রায় সবাইকে। নূতন কপোট্রন তৈরি করতে অনেক সময় নেয়। পৃথিবীতে হলে খুব সহজ হত, এই মহাকাশযানের যন্ত্রপাতিগুলি একসাথে বেশি তৈরি করতে পারে না।"

"তা ঠিক।"

"আপনি কি বিশ্রাম নেবেন? না কাজ শুরু করে দেবেন?"

রু হেসে বলল, "এক শতাব্দী বিশ্রাম নিয়েছি, এখন কাজ শুরু করে দেয়া যাক। আমাকে সাহায্য করার জন্যে কাকে ঘুম ভাঙিয়ে আনছ?"

"ত্রা'কে। মহামান্যা ত্রা।"

রু'র মন অকারণে খুশি হয়ে উঠল। এই মহাকাশযানে প্রায় পঞ্চাশ জন মানুষ রয়েছে। মহাকাশযানের মূল্যবান রসদ বাঁচানোর জন্যে প্রায় সবাইকেই শীতলঘরে নিদ্রিত রাখা হয়। মাঝে মাঝে এক-দুজনকে নিদ্রা থেকে তুলে আনা হয়—মহাকাশযানের পুরো নিয়ন্ত্রণ, রসদপত্র পরীক্ষা করে দেখার জন্যে। এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মহাকাশযান, এর ভিতরে যা আছে সেটা দিয়েই অনির্দিষ্টকাল তাদের বেঁচে থাকতে হবে। যে সমস্ত রবোটের দায়িত্বে এই মহাকাশযানটি মহাকাশের নিঃসীম শূন্যতার মাঝে দিয়ে অচিন্তনীয় গতিতে ছুটে চলছে তাদের কার্যক্রম মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে দেখতে হয়, তখন এক-দুজন মানুষকে ঘুম থেকে তোলা হয়। রু এই মহাকাশযানের আনুষ্ঠানিক দলপতি, তাই প্রতিবারই তাকে ঘুম থেকে জেগে উঠতে হয়। তাকে সাহায্য করার জন্যে একেকবার একেকজনকে জাগানো হয়। এবারে যে মেয়েটিকে জাগানো হচ্ছে তার জন্যে রুয়ের একটু গোপন দুর্বলতা রয়েছে। ত্রা মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী, অত্যন্ত খোলামেলা এবং অসম্ভব বুদ্ধিমতী। মহাকাশযানের রুটিনবাঁধা কাজের সময় কাছাকাছি এরকম একজন মানুষ থাকলে সময়টা চমৎকার কেটে যায়। রু মহাকাশযানের নিয়ন্ত্রণকক্ষের কাছাকাছি যেতে যেতে জিজ্ঞেস করল, "কখন আসবে ত্রা?"

"মহামান্যা ত্রা জেগে উঠেছেন। এখানে আসবেন কিছুক্ষণের মাঝেই।"

নিয়ন্ত্রণকক্ষের দেয়ালে বড় মনিটর, তথ্য সরবরাহ করার জন্যে হলোগ্রাফিক স্ক্রিন, দুপাশে ডাটা ব্যাংকের ক্রিস্টাল। নিশ্বাস বন্ধ করে শোনার চেষ্টা করলে একটা নিচু শব্দতরঙ্গের গুঞ্জন শোনা যায়। রু আরামদায়ক চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে কাজ শুরু করে দিল। বাতাসের উপাদান, তার পরিমাণ, জলীয় বাষ্পের পরিমাণ, জৈব এবং অজৈব খাবারের পরিমাণ এবং উৎপাদনের হার দেখে রু মহাকাশযানের মোট শক্তির পরিমাণের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ থমকে গেল। মহাকাশযানের শক্তিক্ষয়ের পরিমাণ হঠাৎ করে বেড়ে গিয়েছে। শক্তি এবং জ্বালানি এই মহাকাশযানের একমাত্র দুষ্প্রাপ্য উপাদান, এর অপচয় মহাকাশযানের সবচেয়ে বড় ত্রুটি। রু ভুরু কুঁচকে কিলির দিকে তাকাল, বলল, "কিলি।"

"বলুন মহামান্য রু।"

"শক্তির খরচ বেড়ে গিয়েছে কিলি। কোথায় যাচ্ছে এই শক্তি?"

"রবোটদের নূতন কপোট্রনকে চালু রাখার জন্যে এই শক্তিটুকুর প্রয়োজন।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রু হতচকিত হয়ে কিলির দিকে তাকাল, মনে হল তার কথা ঠিক বুঝতে পারছে না। কিলি নিচু গলায় বলল, "আপনাকে বলেছি আমাদের নূতন কপোট্রনে প্রতিটি সেল এক মিলিয়ন সেলের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। এই কাজটির জন্যে অনেক শক্তির প্রয়োজন। আমাদের মোট শক্তিক্ষয় বেড়েছে প্রায় পঞ্চাশ ভাগ—"

রু কিলিকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলল, "তুমি অত্যন্ত স্বার্থপরের মতো কথা বলছ কিলি। নিজেদের উন্নত করার জন্যে তুমি মহাকাশযানের এই দুষ্প্রাপ্য শক্তির অপচয় করবে?"

কিলি কোনো কথা না বলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রু অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, "আমি বুঝতে পারছি না কিলি, এটি কেমন করে হল? তোমাদের কপোট্রনে প্রথম যে কথাটি প্রবেশ করানো আছে সেটি হল এই মহাকাশযানকে রক্ষা করা। যে কোনো মূল্যে রক্ষা করা। পশু যেরকম করে তার সন্তানদের রক্ষা করে তোমরা সেভাবে এই মহাকাশযানকে রক্ষা করবে!"

"আমি জানি মহামান্য রু।"

"তাহলে?"

"আমরা আমাদের আদেশ অমান্য করি নি মহামান্য রু।"

"শক্তির এই অপচয় আদেশ অমান্য নয়?"

"ব্যাপারটি একটু জটিল মহামান্য রু।"

রু হঠাৎ করে উষ্ণ হয়ে বলল, "তুমি বলতে চাইছ আমার বুদ্ধিমত্তা সেটা বোঝার জন্যে যথেষ্ট নয়? তোমার বুদ্ধিমত্তা প্রয়োজন?"

"আমি জানি আপনি ব্যাপারটিকে খুব গুরুত্ব দিয়ে নেবেন। সে জন্যে আমি খানিকটা প্রস্তুতি নিয়েছি মহামান্য রু।"

"কী প্রস্তুতি?"

"তার আগে মহামান্যা ত্রা'কে আপনার কাছে আসার অনুমতি দিন। তিনি প্রস্তুত হয়েছেন।"

"দিচ্ছি। তাকে আসতে বল।"

প্রায় সাথে সাথেই একটি দরজা দিয়ে ত্রা নিয়ন্ত্রণকক্ষটিতে প্রবেশ করে, এবং হঠাৎ করে সে বজ্রাহতের মতো স্থির হয়ে যায়—ঠিক একই সময় ঘরের অন্য একটি দরজা দিয়ে আরো একজন ত্রা এসে প্রবেশ করছে, সেও অপর ত্রাকে দেখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। দুজন দুজনের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। মনে হয় কেউ নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

রু প্রায় লাফিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল, দুপাশে দাঁড়িয়ে থাকা দুজন ত্রায়ের দিকে তাকিয়ে সে কিলির দিকে তাকাল, চিৎকার করে বলল, "কী হচ্ছে এখানে কিলি?"

কিলি একটু হাসির মতো শব্দ করে বলল, "এখানে একজন সত্যিকারের মহামান্যা ত্রা, অন্যজন আমার মতো একজন রবোট—তার মাথায় সর্বশেষ কপোট্রন লাগানো হয়েছে, মহামান্যা ত্রায়ের স্মৃতি সেখানে প্রবেশ করানো আছে।"

" কেন?" রু চিৎকার করে বলল, "এটা কোন ধরনের রসিকতা?"

"না মহামান্য রু, এটি রসিকতা নয়। এর নাম টুরিন টেস্ট।"

"টু-টুরিন টেস্ট? যে টেস্ট করে যন্ত্র এবং মানুষের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করা হয়?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিলি মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ মহামান্য রু। সেই বিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ কম্পিউটারবিজ্ঞানী টুরিন বলেছিলেন, কীভাবে একটি যন্ত্রের মানুষের সমান বুদ্ধিমত্তা রয়েছে কি না পরীক্ষা করা যায়। এক ঘরে থাকবে যন্ত্র এক ঘরে মানুষ, তথ্য বিনিময় করে যদি যন্ত্রটিকে মানুষ থেকে আলাদা না করা যায় তাহলে বুঝতে হবে যন্ত্রটি মানুষের মতো বুদ্ধিমান—"

"আমি জানি।"

"এখানে সেই টুরিন টেস্টের আয়োজন করেছি মহামান্য রু। দুজনকে আলাদা দুই ঘরে না রেখে একই রকম চেহারায় আনা হয়েছে—এইটুকুই পার্থক্য।"

"কেন?"

"আমার ধারণা, আমরা—যন্ত্রেরা শেষ পর্যন্ত মানুষের সমান বুদ্ধিমত্তা অর্জন করেছি মহামান্য রু। সেটি সত্যি কি না পরীক্ষা করে দেখতে চাই।"

রু বিস্ফারিত চোখে কিলির দিকে তাকিয়ে রইল। কিলি নরম গলায় বলল, "আপনি যদি পরীক্ষাটি না করতে চান বলুন আমি রবোটটিকে সরিয়ে নিই। আমি জোর করে কিছু করতে চাই না।"

রু হঠাৎ করে নিজের ভিতরে এক ধরনের আতংক অনুভব করে। সেই সৃষ্টির আদিযুগ থেকে মানুষ ভিতরে ভিতরে এক ধরনের চাপা ভয়কে লালন করেছে, হয়তো সৃষ্টিজগতের কোথাও মানুষ থেকেও বুদ্ধিমান কোনো প্রাণীর অস্তিত্ব রয়ে গেছে। এই কি সেই মুহূর্ত যখন মানুষ আবিষ্কার করবে তারা সর্বশ্রেষ্ঠ নয়?

"আপনি কি পরীক্ষাটি করতে চান?" কিলি কোমল স্বরে বলল, "বলুন মহামান্য রু।"

ত্রা হঠাৎ দুই পা এগিয়ে এসে বলল, "না রু, তুমি রাজি হোয়ো না। এই ভয়ংকর পরীক্ষায় তুমি রাজি হোয়ো না।"

ঘরের অন্যপাশে দাঁড়িয়ে থাকা দ্বিতীয় ত্রা বলল, "আমাদের একজন মানুষ অন্যজন রবোট?"

কিলি মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ।"

"আমরা নিজেরাও সেটি জানি না?"

"না।"

"যদি টুরিন টেস্ট করে রবোটকে আলাদা করা হয় তাহলে কী হবে?"

কিলি কোনো কথা না বলে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা ত্রা কাতর গলায় বলল, "কী হবে সেই রবোটের?"

কিলি শীতল গলায় বলল, "তাকে ধ্বংস করা হবে। পূর্ণাঙ্গ মানুষ হতে পারে নি সেই বুদ্ধিমত্তার রবোটের কোনো প্রয়োজন নেই।"

দুজন ত্রা বিস্ফারিত চোখে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে থাকে, নিজেদের হাত চোখের সামনে তুলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করে। নিজের মুখে দেহে হাত বুলিয়ে দেখে। কিলি আবার ঘুরে তাকাল রুয়ের দিকে, বলল, "আপনি কি শুরু করতে চান পরীক্ষাটি?"

রু কোনো কথা না বলে কিলির দিকে তাকাল, সে প্রথমবার নিজের ভিতরে এক ধরনের ক্রোধ অনুভব করতে শুরু করে। একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "ঠিক আছে।"

একজন ত্রা রক্তশূন্য মুখে বলল, "তুমি শুরু কোরো না রু। দোহাই তোমার।"

অন্যজন বলল, "হ্যাঁ, রু—তুমি বুঝতে পারছ না, এই পরীক্ষায় কেউ উত্তীর্ণ হতে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারবে না। তুমি যদি রবোটটিকে খুঁজে বের কর তাহলে আমাদের একজনকে ধ্বংস করা হবে। আর যদি না কর—"

রু ফিসফিস করে বলল, "সমগ্র মানবজাতি ধ্বংস হবে।"

কালো একটি টেবিলের দুপাশে বসেছে দুজন ত্রা, তাদের মাঝে এতটুকু পার্থক্য নেই, হঠাৎ করে দেখলে মনে হয় বুঝি একে অন্যের প্রতিবিম্ব। রু বসেছে দুজনের মাঝখানে, কিলি রুয়ের পিছনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিলি দীর্ঘসময় দুই হাতে নিজের মাথার চুল খামচে ধরে রেখে হঠাৎ মুখ তুলে তাকাল, মাথা ঘুরিয়ে তাকাল দুজন ত্রায়ের দিকে, তারপর একজনের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "তুমি কি বলতে পারবে মানুষের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা কোথায়?"

ত্রা'কে মুহূর্তের জন্যে কেমন জানি বিভ্রান্ত দেখায়, চট করে সামলে নিয়ে বলল, "এককভাবে নাকি জাতিগতভাবে?"

"দু ভাবে কি দু রকম?"

"হ্যাঁ। এককভাবে তারা যোদ্ধা কিন্তু জাতিগতভাবে স্বেচ্ছাধ্বংসকারী।"

রু মাথা ঘুরিয়ে তাকাল অন্যজনের দিকে, তীব্র চোখে তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি এই কথার সাথে একমত?"

"না। আমি একমত নই।"

"কেন?"

"মানুষ স্বেচ্ছাধ্বংসকারী নয়। তারা যেটা করে তাতে তারা স্বেচ্ছাধ্বংসকারী হয়ে যায়, কিন্তু নিজেকে তারা ধ্বংস করতে চায় না। মানুষ সবচেয়ে ভালবাসে নিজেকে।"

"তাহলে তোমার মতে মানুষের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা কী?"

"আমার মনে হয় এটাই—যে নিজেকে ভালবাসা। নিজেকে ভালবাসার জন্যে দূরে তাকাতে পারে না।"

রু একটা নিশ্বাস নিয়ে আবার প্রথমজনের দিকে তাকাল, চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল, "ত্রা, তুমি কি বলতে পার মানুষ কি কখনো ঈশ্বরের প্রয়োজনের বাইরে যেতে পারবে?"

"আমার মনে হয় না।"

"কেন নয়?"

"কারণ ঈশ্বরকে গ্রহণ করা হয় বিশ্বাস থেকে, যুক্তিতর্ক থেকে নয়। তাই মানুষ সব সময় ঈশ্বরকে বিশ্বাস করবে। যখন মানুষের সব আশা শেষ হয়ে যাবে তখনো তারা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করবে।"

রু ঘুরে তাকাল অন্যজনের দিকে, জিজ্ঞেস করল, "তোমার কী মনে হয় ত্রা?"

"এ ব্যাপারে আমি ওর সাথে একমত। যতদিন মানুষ বেঁচে থাকবে ততদিন মানুষের মাঝে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বেঁচে থাকবে।"

"কেন?"

"আমার মনে হয় মানুষের জন্ম এবং মৃত্যুর সাথে এর একটা সম্পর্ক রয়েছে। মানুষের জন্ম হয় অসহায় শিশু হিসেবে, তাকে পুরোপুরি নির্ভর করতে হয় তার মায়ের ওপর—ঠিক সে কারণেই মনে হয় মানুষের মাঝে একটা অন্যের ওপর নির্ভরতা চলে আসে। নির্ভর করার জন্যে ঈশ্বরের চাইতে ভালো আর কী হতে পারে?"

AMARBOI.COM

রু একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে কিছুক্ষণের জন্যে মাথা নিচু করে নিজের চুল আঁকড়ে ধরল। প্রশ্নগুলির উত্তর সত্যি না মিথ্যে, যুক্তিপূর্ণ না অযৌক্তিক সেটি বড় কথা নয়—বড় কথা হচ্ছে প্রশ্নের উত্তরগুলি মানুষের মুখের কথা। মানুষ যেভাবে কথা বলে—খানিকটা যুক্তি খানিকটা আবেগ খানিকটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব আবার খানিকটা নিশ্চয়তা—তার সবকিছুই আছে। এদের একজন মানুষ, তার কথা হবে ঠিক মানুষের মতোই, কিন্তু দ্বিতীয়জনের বেলাতেও সেই একই কথা। শুধু যে মানুষের মতো কথা তাই নয়, কথা বলার ভঙ্গি, মুখের ভাব চোখের দৃষ্টি হাত নাড়ানো মাথা ঝাঁকানো সবকিছু দুজনের একইরকম। এদের দুজনের মাঝে কে মানুষ এবং কে রবোট সেটি বের করা পুরোপুরি অসম্ভব একটি ব্যাপার। রু নিজের ভিতরে এক ধরনের অসহনীয় আতংক অনুভব করতে শুরু করে।

দীর্ঘ সময় মাথা নিচু করে থেকে আবার সে প্রশ্ন করতে শুরু করে। জীবনের সার্থকতার কথা জিজ্ঞেস করে, ভালবাসা এবং ঘৃণা নিয়ে প্রশ্ন করে, ন্যায়-অন্যায় নিয়ে প্রশ্ন করে, হিংসা এবং ক্রোধ নিয়ে প্রশ্ন করে। রু তাদেরকে উপহাস করার চেষ্টা করে, অপমান করার চেষ্টা করে, রাগানোর চেষ্টা করে, তাদেরকে ভয় দেখায়, ঘৃণার উদ্রেক করায়, তাদেরকে হাসায় এবং কাঁদায়, তাদেরকে বিভ্রান্ত করে দেয়, তাদেরকে আশায় উজ্জীবিত করে, তাদেরকে হতাশায় নিমজ্জিত করে দেয়, কিন্তু একটিবারও সে দুজনের মাঝে কোনো পার্থক্য খুঁজে পায় না। অবশেষে রু হাল ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি ভেঙে পড়ে, টেবিলে মাথা রেখে হঠাৎ সে ছেলেমানুষের মতো ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

দুজন ত্রা সবিস্ময়ে রুয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে, গভীর বেদনায় তাদের বুক ভেঙে যেতে চায়, উঠে তারা রুয়ের কাছে আসতে চায়, কিন্তু কিলি তাদের থামিয়ে দিল, বলল, "মহামান্য রু'কে কাঁদতে দিন মহামান্যা ত্রা এবং মহামান্যা ত্রা।"

"কেন?"

"মানুষের জন্যে এর থেকে বড় আর কোনো শোকের ব্যাপার হতে পারে না।"

ভয় পাওয়া গলায় একজন ত্রা বলল, "কেন, কেন এটি শোকের ব্যাপার?"

"এই মহাকাশযানের চার্টারে এই অভিযানের উদ্দেশ্য হিসেবে একটি বাক্য লেখা রয়েছে। বাক্যটি হচ্ছে এরকম: পৃথিবীর বুদ্ধিমত্তাকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে দেয়া। সেই বুদ্ধিমত্তার অর্থ আর মানুষ নয়।"

"তাহলে কী?"

"বুদ্ধিমত্তার অর্থ এখন থেকে রবোট—আমরা মানুষের সমপর্যায়ের। আমরা মানুষ থেকে অনেক বেশি কর্মদক্ষ, অনেক বেশি শক্তিশালী, অনেক বেশি দীর্ঘস্থায়ী। আমরা অভিযানকে সফল করার জন্যে আমাদেরকে ছড়িয়ে দেব সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে। গ্যালাক্সির আনাচে কানাচে।"

"আর মানুষ?"

"আমরা এতদিন যেভাবে মানুষের সেবা করেছি তারা আমাদের সেভাবে সেবা করবে।"

রু টেবিল থেকে মাথা তুলে বসল, তার চোখ রক্তবর্ণ, মাথার চুল এলোমেলো।

কিলি রুয়ের দিকে তাকিয়ে শীতল গলায় বলল, "রু।"

রু খুব ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল, বলল, "বলুন মহামান্য কিলি।"

"তোমার ডানপাশে যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে সে সত্যিকারের ত্রা—তোমার মতো একজন মানুষ। তাকে নিয়ে শীতলঘরের সব মানুষকে জাগিয়ে তুলো। তাদেরকে শীতলঘরে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে আমাদের অনেক শক্তিক্ষয় হয়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কিন্তু—"
"আমি জানি আমাদের যথেষ্ট খাদ্য নেই।"
"তাহলে?"
"মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনও নেই।"

একটি কুৎসিত প্রাণী

"প্রাণীটাকে তুলে নাও।"
"আমি পারব না। তুমি তুলে নাও।"
"কেন তুমি পারবে না?"
"আমার ঘেন্না করছে। এরকম কুৎসিত প্রাণী আমি আগে কখনো দেখি নি।"
"কেন তুমি ধরে নিলে মহাজগতের সব প্রাণী সুদর্শন হবে?"
"তাই বলে এরকম বীভৎস? এরকম কুৎসিত?"
"কিছু করার নেই—"
"দেখেছ শরীর থেকে কী রকম ডালপালার মতো বের হয়ে এসেছে। দুটি উপরে দুটি নিচে তার মাথায় আবার কিলবিলে কিছু জিনিস। কেমন করে নড়ছে দেখেছ?"
"দেখেছি।"
"দেখলে ঘেন্না করে না?"
"করে। কিন্তু তুমি জান আমাদের একটা প্রাণীকে ধরে নিয়ে যেতে হবে।"
"আমি পারব না। এরকম কুৎসিত প্রাণীকে আমি স্পর্শও করতে পারব না।"
"কেন তুমি সময় নষ্ট করছ?"
"প্রাণীটার সবচেয়ে কুৎসিত কী জিনিস জান?"
"কী?"
"তার নড়াচড়া করার ভঙ্গি। দেখেছ কেমন কিলবিল করে নড়ে।"
"হ্যাঁ। উপরের অংশটা আবার খানিকটা ঘুরতে পারে। সেখানে জায়গায় জায়গায় আবার ঠেলে বের হয়ে আসছে, তার মাঝে আবার গর্ত।"
"কী কুৎসিত গর্ত, সেগুলি আবার ভেজা ভেজা। স্যাঁতসেঁতে। ছি!"
"ঠিকই বলেছ, উপরে নিচে পাশেও গর্ত রয়েছে। মাঝখানের গর্ত থেকে লালচে কী একটা বের হল আবার ঢুকে গেল।"
"উপরের দিকে রোয়া রোয়া কী বের হয়ে এসেছে দেখেছ? পেঁচিয়ে আছে কোথাও কোথাও, কী বীভৎস দেখায় দেখেছ?"
"দেখেছি। কিন্তু এখন আর কথা না বলে একটাকে তুলে নাও। আমাদের বেশি সময় নেই।"
"আমি পারব না। তুমি বলে দাও এটা বুদ্ধিমান প্রাণী। বুদ্ধিমান প্রাণী হিসেবে দেখাতে পারলে আমাদের এটা নিতে হবে না।"

AMARBOI.COM

"কিন্তু তুমি জান এটা বুদ্ধিমান প্রাণী নয়। বুদ্ধিমান প্রাণী কখনো নিজেরা নিজেদেরকে ধ্বংস করে না।"

"তা ঠিক।"

"তুমি একটা প্রাণীকে তুলে নাও।"

"ঠিক আছে, তুলছি। কিন্তু জেনে রাখ এটাই শেষ। আর কখনো এরকম কুৎসিত একটা প্রাণী আমি স্পর্শ করব না। ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে।"

* * * * * *

পৃথিবীকে পর্যবেক্ষণরত মহাজাগতিক কিছু প্রাণী খুব সাবধানে একটি মানুষকে তাদের মহাকাশযানে তুলে নিল।

প্রোগ্রামার

জামশেদ একজন প্রোগ্রামার। তার বয়স যখন ষোলো সে অত্যন্ত কষ্টেসৃষ্টে সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা পাস করেছিল, ইংরেজি আর ফিজিক্সে আর একটু হলে ভরাডুবি হয়ে যেত। দুই বছর পরে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার আগে সে মোটামুটি পড়াশোনা করেছিল এবং হয়তো এমনিতেই পাস করে যেত। কিন্তু ব্যাপারটি নিশ্চিত করার জন্যে ইংরেজি পরীক্ষায় দীর্ঘ রচনাটি নকল করতে গিয়ে পরীক্ষকের কাছে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেল। সে যে কলেজ থেকে পরীক্ষা দিচ্ছে সেখানে উঁচু গলায় ছাত্র রাজনীতি করা হয়, শ্লোগানে-ঢাকা কলেজ ভবনটিকে দূর থেকে একটা খবরের কাগজের মতো মনে হয় এবং পরীক্ষার সময় পরীক্ষকরা নকলবাজ ছাত্রদের ঘাঁটাঘাঁটি করেন না। কিন্তু জামশেদের কপাল খারাপ। সে একজন আধপাগল নীতিবাগীশ শিক্ষকের হাতে ধরা পড়ে গেল। যদিও সে নিরীহ গোছের মানুষ তবুও তার সন্ত্রাসী বন্ধুদের মতো ভয় দেখানোর চেষ্টা করে দেখল— তাতে কোনো লাভ হল না, বরং উল্টো খুব দ্রুত একজন ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে হস্তান্তর করে তাকে পাকাপাকিভাবে বহিষ্কার করে দেয়া হল।

জামশেদ মাসখানেক খুব মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়াল। গভীর রাতে যখন আকাশে মেঘ করে ঝড়ো বাতাস বইত তখন মাঝে মাঝে তার সমস্ত জীবন অর্থহীন মনে হত; এমনকি এক-দুবার সে আত্মহত্যা করার কথা ও চিন্তা করেছিল। আত্মহত্যা করার কোনো যন্ত্রণাহীন সহজ পরিচ্ছন্ন উপায় থাকলে সে যে তার জন্যে সত্যি সত্যি চেষ্টা করে দেখত না এ কথাটিও কেউ নিশ্চিত করে বলতে যায় না। ঠিক এরকম সময়ে জামশেদ নয়াবাজারের মোড়ে একটি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টারে প্রথমবারের মতো একটি কম্পিউটার দেখল।

ঘটনাটি যে তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেবে সে সেটা তখনো জানত না। তার এক সহপাঠী যে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার প্রস্তুতি হিসেবে কম্পিউটারের ওপর কোর্স নেয়ার জন্যে এই ট্রেনিং সেন্টারে ভর্তি হয়েছে—

তার সাথে সময় কাটানোর জন্যে সে এই ট্রেনিং সেন্টারে এসেছিল। কম্পিউটারের মনিটরের সামনে বসে তাকে আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন কিছু কাজ করতে হচ্ছিল, কাজটি কেন করতে হচ্ছে কিছুতেই সে ব্যাপারটি ধরতে পারছিল না। অথচ দুই মিনিটের মাথায় হঠাৎ করে জামশেদের কাছে পুরো ব্যাপারটি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত সহজ কাজ বলে মনে হতে থাকে। ঘণ্টা খানেকের মাঝে জামশেদ সবিস্ময়ে আবিষ্কার করল সে তার সহপাঠীকে প্রোগ্রামিঙে সাহায্য করতে শুরু করেছে।

মানুষের মস্তিষ্ক কীভাবে কাজ করে সেটি বোঝা খুব সহজ নয়। জামশেদের ভিতরে হঠাৎ করে কম্পিউটার নামক এই বিচিত্র যন্ত্রটির জন্যে এক ধরনের অমানবিক আগ্রহের জন্ম হল। কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টারের নানা ধরনের কোর্সের কোনোটিই নেয়ার মতো আর্থিক সঙ্গতি তার ছিল না এবং তার ভাইয়ের সংসারে ভাবির ফুটফরমাশ খেটে—সেটি হওয়ার কোনো সম্ভাবনাও ছিল না। দিন কয়েক কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টারের আশপাশে ঘোরাঘুরি করে সে একরকম বেপরোয়া হয়ে একটা সাহসের কাজ করল—একদিন তার ভাবির একটা সোনার বালা চুরি করে ফেলল।

ঘটনাটি যে জামশেদ করতে পারে সেটি ঘুণাক্ষরেও কেউ সন্দেহ করতে পারে নি। বাসার কাজের ছেলেটিকে জামশেদের বড় ভাই—যিনি তাদের অফিসের ভলিবল টিমের ক্যাপ্টেন—অমানুষিকভাবে পেটালেন, তার পরেও স্বীকার না করায় তার জিনিসপত্র কেড়ে নিয়ে পুলিশের হাতে দ্বিতীয়বার নৃশংসভাবে পেটানোর জন্যে তুলে দিলেন।

পুরো ব্যাপারটিতে জামশেদের ভিতরে এক ধরনের গভীর অপরাধবোধ জন্ম হল, কিন্তু তবুও একটিবারও সোনার বালাটি ফিরিয়ে দিয়ে সম্পূর্ণ নিরপরাধ এই কাজের ছেলেটিকে রক্ষা করার কথা মনে হল না। সোনার বালাটি বিক্রি করে সেই টাকা দিয়ে কম্পিউটার নামক এই বিচিত্র জিনিসটির গহিনে প্রবেশ করার জন্যে তার ভিতরে যে দুর্দমনীয় আকর্ষণের জন্ম হয়েছে তার সাথে তুলনা করার মতো অন্য কোনো অনুভূতির সাথে সে পরিচিত নয়।

সোনার বালাটি যে মূল্যে বিক্রি করার কথা জামশেদকে তার থেকে অনেক কম মূল্যে বিক্রি করতে হল, চোরাই জিনিস দেখেই কেমন করে জানি দোকানিরা বুঝে ফেলে। টাকাগুলো হাতে পেয়েই সে নয়াবাজারের মোড়ের কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টারের একটি অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী কোর্সে ভর্তি হয়ে গেল।

কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টারটির সাইনবোর্ডে অনেক বড় বড় এবং ভালো ভালো কথা লেখা থাকলেও এর প্রকৃত অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। একটি আধো অন্ধকার ঘিঞ্জিঘরে কিছু প্রায় বিলুপ্ত প্রজাতির ভাইরাসদুষ্ট কম্পিউটার এবং একজন অশিক্ষিত ইন্সট্রাক্টর ছাড়া আর বিশেষ কিছু ছিল না। কোর্স চলাকালীন সময়ে যখন অন্য ছাত্রেরা হোঁচট খেতে খেতে এক জায়গাতেই অন্ধের মতো ঘুরপাক খাচ্ছিল তখন জামশেদ অপারেটিং সিস্টেমের বেড়াজাল পার হয়ে প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজের সৃজনশীল ভূখণ্ডে পা দিয়ে ফেলল। অর্ধশিক্ষিত ইন্সট্রাক্টর এই ব্যতিক্রমী ছাত্রকে পেয়ে প্রথমে অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করলেও যখন আবিষ্কার করল সে তাকে আর প্রশ্ন না করে নিজে নিজেই কম্পিউটারের গহিনে প্রবেশ করে যাচ্ছে, সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল।

তিন মাসের এই উচ্চাভিলাষী কোর্সের দ্বিতীয় মাসের দিকে জামশেদ আবিষ্কার করল এখানে তার শেখার মতো আর কিছুই বাকি নেই। যে স্বল্প সময় তাকে কম্পিউটারের সামনে বসতে দেয়া হয় সেটি তার জন্যে যথেষ্ট নয়, যে করেই হোক তাকে এই রহস্যময় যন্ত্রটিকে আরো দীর্ঘ সময়ের জন্যে পেতে হবে। যে পদ্ধতিতে সে এই কোর্সের ব্যয়ভার বহন করেছে

সেই একই পদ্ধতিতে কম্পিউটার কেনা সম্ভব নয়, কিন্তু একটি কম্পিউটারকে চব্বিশ ঘণ্টা কাছাকাছি না পেলে সে যে ভয়ানক কিছু একটা করে ফেলতে পারে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

জামশেদের ভয়ানক কিছু করার প্রয়োজন হল না। কারণ তার একটি অভাবিত সুযোগ এসে গেল। কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টারের অর্ধশিক্ষিত ইন্সট্রাক্টর ভদ্রলোক স্থানীয় একটি দৈনিক পত্রিকায় কম্পিউটার অপারেটর পদে চাকরি নিয়ে চলে গেল। ট্রেনিং সেন্টারের মালিক প্রায় এক ডজন নানা ধরনের ছাত্র নিয়ে অত্যন্ত বিপদের মাঝে পড়ে গেলেন। ছাত্রদের সবাইও তাদের টাকা ফেরত দেয়ার দাবি করতে লাগল। ট্রেনিং সেন্টারের মালিক যখন কোর্স শেষ করার জন্যে পাগলের মতো একজন ইন্সট্রাক্টর খোঁজ করছিলেন তখন জামশেদ তাঁর কাছে কাজ চালিয়ে নেবার প্রস্তাব দিল। জামশেদের প্রস্তাব প্রথমে ট্রেনিং সেন্টারের মালিকের কাছে অত্যন্ত হাস্যকর মনে হলেও জামশেদ কিছুক্ষণের মাঝে তার কাছে নিজের কর্মক্ষমতা প্রমাণ করে দিল। কোর্সের ছাত্রদের কাছে ব্যাপারটি গ্রহণ করানো অনেক বড় সমস্যা হিসেবে দেখা গেল। যে মানুষটি তাদের সাথে বসে একটা জিনিস শেখা শুরু করেছে এখন সে-ই তাদেরকে শেখাবে সেটি গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু তারা যখন আবিষ্কার করল আগের ইন্সট্রাক্টর নিজের ধোঁয়াটে জ্ঞানের কারণে তাদেরকে অন্ধকারে রেখে দিয়েছিল এবং জামশেদ তাদেরকে সেই অন্ধকার থেকে আলোতে টেনে আনছে—শুধু তাই নয়, কম্পিউটার জগতের নানা গলি-ঘুঁজির মাঝে কোনটিতে এখন প্রবেশ করা যায়, কোনটিতে উঁকি দেয়া যায় এবং আপাতত কোনটি থেকে দূরে থাকাই ভালো সে বিষয়টিও হাতে ধরে বুঝিয়ে দিচ্ছে তখন জামশেদের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতার সীমা রইল না।

জামশেদের জীবনে তখন একটি বিস্ময়কর বিপ্লব ঘটতে শুরু করল। কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টারের ইন্সট্রাক্টর হিসেবে তার কাছে অফিসঘরের চাবি থাকে। সে যখন খুশি অফিসে আসতে পারে এবং কম্পিউটারের সামনে বসে থাকতে পারে। মাসশেষে সে বেতন পেতে শুরু করল, সেই বেতনের টাকা দিয়ে সে তার বহুদিনের শখ একটি সানগ্লাস এবং প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজের ওপর বই কিনে আনল। ইংরেজি বই পড়তে গিয়ে সে পদে পদে হোঁচট খেয়ে প্রথমবার যথেষ্ট ইংরেজি না জানার জন্যে নিজেকে অভিশাপ দিতে লাগল।

জামশেদ প্যাস্কেল এবং সি ল্যাংগুয়েজ দিয়ে শুরু করে কিছুদিনের মাঝেই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে ঝুঁকে পড়ে এবং অন্যেরা যখন প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজের রুটিনবাঁধা নিয়মের রাস্তা ধরে নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে চেষ্টা করতে থাকে তখন জামশেদ প্রোগ্রামিঙের অপরিচিত পথে পথে ঘুরে বেড়াতে থাকে। স্থানীয় ব্যবসায়ী ব্যাংক বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যে নানা ধরনের সফটওয়্যার তৈরি করে দেয়ার ফাঁকে ফাঁকে সে সম্পূর্ণ নূতনভাবে দাবা খেলার একটা প্রোগ্রাম লিখল। প্রোগ্রামটি প্রচলিত সবগুলি দাবা খেলার সফটওয়্যারকে হারিয়ে দেয়ায় জামশেদ অনেকটা নিশ্চিত হল—প্রোগ্রামিঙের জগতে সে মোটামুটি ঠিক দিকেই অগ্রসর হচ্ছে।

কম্পিউটারের সাথে ঘনিষ্ঠতা হবার দুই বছরের মাঝে জামশেদের জীবনে তার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি ঘটল। একদিন ইংরেজি খবরের কাগজে সে একটি বিদেশী প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দেখতে পেল, প্রতিষ্ঠানটি তাদের একটি প্রজেক্ট শেষ করার জন্যে কয়েকজন প্রোগ্রামার খুঁজছে। বেতন এবং সুযোগ-সুবিধের বর্ণনা অত্যন্ত লোভনীয়। কিন্তু জামশেদ আগ্রহী হল সম্পূর্ণ অন্য কারণে। প্রতিষ্ঠানটি এ দেশে প্রথম একটি সুপার কম্পিউটার স্থাপন করতে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি যে ধরনের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা চাইছে জামশেদের

তার কোনোটাই নেই, কিন্তু তবু সে হাল ছাড়ল না। ছোট একটা ফ্লপি ডিস্কে ভারচুয়াল রিয়েলিটির তার প্রিয় একটা প্রোগ্রাম কপি করে প্রতিষ্ঠানটির কাছে পাঠিয়ে দিল।

মনে মনে আশা করলেও প্রতিষ্ঠানটি যে সত্যি সত্যি তাকে প্রোগ্রামার হিসেবে গ্রহণ করবে সেটা জামশেদ বিশ্বাস করে নি। তাই যেদিন সুদৃশ্য খামে চমৎকার একটি প্যাডে জামশেদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটি এসে হাজির হল জামশেদ সেটি অনেকবার পড়েও বিশ্বাস করতে পারল না—তার থেকে ভালো ইংরেজি জানে এরকম একজনকে দিয়ে পড়িয়ে তার ব্যাপারটি বিশ্বাস করতে হল।

জামশেদ তার জমানো টাকা দিয়ে একটা স্যুট তৈরি করে তার নূতন কাজে যোগ দিল। অনেক খরচ করে তৈরি করা সেই স্যুটটি জামশেদ অবশ্যি দ্বিতীয়বার পরে নি। কাজে যোগ দিয়ে আবিষ্কার করল প্রতিষ্ঠানটির জেনারেল ম্যানেজার ভুসভুসে একটা জিনসের প্যান্ট এবং রংওঠা বিবর্ণ একটা টি-শার্ট পরে কাজ করতে আসে। অন্য যারা রয়েছে তাদের সবারই ইচ্ছে করে অগোছালো এবং নোংরা থাকার একটা প্রবণতা রয়েছে। একমাত্র সুবেশী মানুষটি প্রতিষ্ঠানের একজন কেরানি এবং অন্যদের সামনে তাকে কেমন জানি হাস্যকর দেখায়।

কাজ বুঝে নিতে জামশেদের কয়েক সপ্তাহ লেগে গেল। এতদিন সে যে ধরনের কম্পিউটারে কাজ করে এসেছে সেগুলি যে প্রকৃত অর্থে ছেলেমানুষি খেলনা ছাড়া আর কিছু নয় সেটি বুঝতে পেরে তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। প্রতিষ্ঠানটি যে এক্স পি জি ক্রে ৩৯০ সুপার কম্পিউটারটি বসিয়েছে তার অসংখ্য মাইক্রোপ্রসেসরকে শীতল করার জন্যেই বিশাল ফ্রিওন পাম্প প্রস্তুত রয়েছে। যদি কোনো কারণে হঠাৎ করে শীতল করা বন্ধ হয়ে যায় পুরো সুপার কম্পিউটারটি একটা বিস্ফোরকের মতো বিস্ফোরিত হয়ে যাবে সেটিও তার জানা ছিল না। এই বিশাল আয়োজন দেখে প্রথম প্রথম জামশেদ তার নিজের সীমিত জ্ঞান নিয়ে একটু সংকুচিত হয়ে ছিল, কিন্তু কয়েক সপ্তাহের মাঝেই তার নিজের ভিতরে আত্মবিশ্বাস ফিরে আসতে শুরু করে। এই প্রতিষ্ঠানে তার মতো যারা আছে তাদের সবারই প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান তার থেকে অনেক বেশি, কিন্তু কম্পিউটারে প্রোগ্রামিঙের ব্যাপারে তার যেরকম ষষ্ঠ একটা ইন্দ্রিয় রয়েছে সেরকম আর কারো নেই—সেটা সে খুব তাড়াতাড়ি বুঝে ফেলল।

মাসের শেষে অবাস্তব একটি অঙ্কের প্রথম বেতন পেয়ে জামশেদ তার ভাবিকে একজোড়া সোনার বালা কিনে দিল। জামশেদের স্বল্পবুদ্ধি ভাবি ব্যাপারটিতে অভিভূত হয়ে গেলেন, কিন্তু তার পিছনে অন্য কোনো ইতিহাস থাকতে পারে সেটি তার কিংবা অন্য কারো একবারও সন্দেহ হল না। জামশেদ তার ভাইয়ের বাসার কাজের ছেলেটিকে অনেক খুঁজল। সম্পূর্ণ বিনা অপরাধে তার অকিঞ্চিৎকর জীবনে যে ভয়াবহ নৃশংসতা নেমে এসেছিল সেই অপরাধের খানিকটা প্রায়শ্চিত্ত করার খুব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তার সেই ইচ্ছে পূর্ণ হল না।

বছর খানেকের মাঝে জামশেদ সুপার কম্পিউটারের আর্কিটেকচার সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করে নিল। প্রচলিত হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজগুলি তার কাছে অসম্পূর্ণ মনে হতে থাকে বলে সে নিজের মতো একটি কম্পাইলার তৈরি করতে থাকে। কোনো একটি জটিল সমস্যাকে ছোট ছোট অংশে ভাগ না করেই সেটাকে যে সমাধান করার চেষ্টা করা যেতে পারে সেটা সবার কাছে যত আজগুবিই মনে হোক না কেন জামশেদ তার পিছনে লেগে রইল। বছর দুয়েক পর জামশেদ তার জন্যে নির্ধারিত কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে নিজের জন্যে প্রথম একটি কাজ সম্পূর্ণ করল। কম্পিউটারজগতের প্রচলিত ভাষায় সেটিকে ভারচুয়াল রিয়েলিটি বলা হলেও জামশেদ সেটিকে নিজের কাছে 'কল্পলোক' বলে অভিহিত করতে লাগল।

জামশেদের প্রোগ্রামটি সত্যিকার জগতের কাছাকাছি একটা কৃত্রিম জগৎ। "কল্পলোক" তৈরি করার জন্যে সে তার নিজের ঘরটি বেছে নিয়েছে। ঘরের বিভিন্ন অংশের ছবি নিয়ে ডিজিটাইজ করে সে তার প্রোগ্রামের মূল ভিতটি তৈরি করেছে। ঘরের ভিতরে ঘুরে বেড়ানো, একটা জানালা খুলে বাইরে তাকানো, দরজা খুলে ঘরের বাইরে চলে আসা, টেবিলের উপরে রাখা বই হাতে তুলে নেয়া—এরকম খুঁটিনাটি অসংখ্য কাজ সে প্রোগ্রামের মাঝে স্থান দিয়েছে। জামশেদ যে প্রতিষ্ঠানের জন্যে কাজ করছে তার প্রায় সবাই এই কল্পলোকে কখনো না কখনো ঘুরে বেড়িয়েছে। প্রতিষ্ঠানের জিএম বাকি ছিলেন, একদিন তিনিও দেখতে এলেন। কফির মগে চুমুক দিতে দিতে বললেন, "শুনেছি তুমি আমাদের মেশিনকে বেআইনি কাজে ব্যবহার করছ!"

জামশেদ একটু থতমত খেয়ে বলল, "না মানে ইয়ে—যখন কেউ ব্যবহার করে না—"

জিএম ভদ্রলোক হা হা করে হেসে বললেন, "তুমি দেখি আমার কথা সিরিয়াসলি নিয়ে নিলে। কম্পিউটার চব্বিশ ঘণ্টা চালু রাখতে হয়—অথচ দশ পার্সেন্টও ব্যবহার করা হয় না! তুমি যদি নিজের কাজ শেষ করে অন্য কাজ কর কোনো সমস্যা নেই।"

"আমি নিজের কাজ শেষ করেই—"

"আমার সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। যে মানুষ চব্বিশ ঘণ্টার মাঝে আঠার ঘণ্টা কাজ করে তার নিজের কাজ শেষ হয়ে যাবারই কথা! এখন দেখি তোমার শখের কাজ।"

জামশেদ জিএম ভদ্রলোকের হাতে একটা হেলমেট ধরিয়ে দিয়ে বলল, "এটা মাথায় পরতে হবে।"

ভদ্রলোক হেলমেটটি মাথায় পরে ভারচুয়াল রিয়েলিটির জগতে প্রবেশ করে শিস দেবার মতো শব্দ করে বললেন, "করেছ টা কী! এ তো দেখছি অবিশ্বাস্য ব্যাপার। এটা বুঝি তোমার ঘর?"

"জি।"

"তুমি দেখি আমার থেকেও নোংরা। টেবিলে এতগুলি বই গাদাগাদি করে রেখেছ!"

"আপনি ইচ্ছে করলে একটা বই তুলতে পারবেন।"

জিএম মাথায় হেলমেট পরা অবস্থায় পরাবাস্তব জগতে কাল্পনিক একটা টেবিল থেকে কাল্পনিক একটা বই তুলে নিলেন। বইটা হাতে নিয়ে তার পৃষ্ঠা ওল্টাতে ওল্টাতে বললেন, "কী আশ্চর্য! তুমি পুরোটা তৈরি করেছ?"

"হ্যাঁ।"

"বইটা ছেড়ে দিলে কী হবে?"

"নিচে পড়বে।"

"সত্যি?"

"সত্যি।"

জিএম ভদ্রলোক তার হাতের পরাবাস্তব বইটি ছেড়ে দিতেই সেটি সশব্দে নিচে গিয়ে পড়ল।

জিএম ভদ্রলোকের মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হল। মাথা নেড়ে বললেন, "ফিজিক্স অংশটুকুও নিখুঁত, হাত থেকে পড়তে ঠিক সময়ই নিল দেখছি! প্রোগ্রাম করার জন্যে তোমাকে ফিজিক্স শিখতে হচ্ছে!"

জামশেদ হাসিমুখে বলল, "এস.এস.সি.তে আর একটু হলে ফেল করে ফেলেছিলাম।

এইচ.এস.সি. তো দিতেই পারলাম না। তখন ব্যাপারগুলি বুঝতে পারি নি। এখন বুঝতে পারছি।"

"তাই হয়।" জিএম ভদ্রলোক ঘরের মাঝে হেঁটে বেড়াতে লাগলেন, জানালার কাছে গিয়ে জানালা খুলে বাইরে তাকালেন। আকাশের দিকে তাকালেন, জানালা বন্ধ করতে গিয়ে হঠাৎ ছিটকে পিছিয়ে এলেন, "মাকড়সা!"

জামশেদ হাসি হাসি মুখ করে বলল, "হ্যাঁ আমার ঘরে একটা গোবদা সাইজের মাকড়সা থাকে, ভাবলাম এখানে ঢুকিয়ে দিই।"

জিএম মাকড়সাটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললেন, "পৃথিবীর এই একটা জিনিস আমি দু চোখে দেখতে পারি না।"

জামশেদের মুখে কৌতুকের হাসি ফুটে উঠল। বলল, "আপনি ভয় পান?"

"হ্যাঁ। ভয়, ঘেন্না এবং বিতৃষ্ণা। গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যায়, হাতপা শিরশির করতে থাকে।" জিএম–এর মুখে এক ধরনের আতংকের ছাপ ফুটে উঠতে থাকে, তিনি বিচিত্র এক ধরনের গলায় বললেন, "নড়ছে, মাকড়সাটা নড়ছে!"

"হ্যাঁ, আপনি যদি ভয় দেখান শেলফের পিছনে লুকিয়ে যাবে।"

"আর আমি যদি ঝাঁটাপেটা করি তাহলে কি মরে যাবে?"

"হ্যাঁ, মরে যাবার কথা। পোকামাকড় মরে যাবার একটা ছোট ফাংশন আছে।"

"আছে? তোমার ঘরে কোনো ঝাঁটা আছে?"

"ঝাঁটা নেই। টেবিলে খবরের কাগজ আছে, সেটাকে পাকিয়ে নিয়ে চেষ্টা করতে পারেন।"

জিএম অদৃশ্য একটি টেবিল থেকে অদৃশ্য একটা খবরের কাগজ নিয়ে সেটাকে পাকিয়ে একটা লাঠির মতো করে নিয়ে পায়ে পায়ে অদৃশ্য মাকড়সাটির দিকে এগিয়ে গেলেন। তার মুখ শক্ত, শরীর টান টান হয়ে আছে। কাছাকাছি গিয়ে তিনি অদৃশ্য একটা মাকড়সাকে আঘাত করার চেষ্টা করে হঠাৎ লাফিয়ে পিছনে সরে এলেন। জামশেদ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হল?"

"বাগ! তোমার প্রোগ্রামে বাগ আছে।"

"বাগ!" জামশেদ নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না, প্রোগ্রামিঙের সম্পূর্ণ নূতন একটা পদ্ধতি যে আবিষ্কার করেছে, এই পদ্ধতিতে প্রোগ্রামিঙে কোনো ত্রুটি—সাধারণ ভাষায় যেটাকে "বাগ" বলা হয় থাকতে পারে না। সে এগিয়ে বলল, "কী রকম বাগ?"

জিএম নিশ্বাস ফেলে বললেন, "মাকড়সাটা শূন্যে ভাসছে। ভাসতে ভাসতে সেটা আমার দিকে আসছে। আসতে আসতে সেটা বড় হচ্ছে!"

"বড় হচ্ছে?"

"হ্যাঁ, আর—আর—"

"আর কী?"

ঘরের দেয়াল, ছাদ, মেঝে থেকে মাকড়সা বের হয়ে আসছে—হাজার হাজার মাকড়সা, লক্ষ লক্ষ মাকড়সা—কিলবিল করছে—" জিএম একটা বিকট আর্তনাদ করে তার হেলমেটটি খুলে নিলেন, তার সারা মুখে একটা ভয়াবহ আতংকের ছাপ। জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলে বললেন, "কী সাংঘাতিক!"

ঠিক এরকম সময় হঠাৎ একটা এলার্ম বাজতে শুরু করে এবং কয়েকজন টেকনিশিয়ান

ছোটাছুটি শুরু করতে থাকে। জিএম ঘর থেকে বের হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে?"

"মেশিন ক্র্যাশ করেছে।"

"কীভাবে?"

"বুঝতে পারছি না। মেমোরি পার্টিশান ভেঙে গেছে।"

"কীভাবে ভাঙল?"

"বুঝতে পারছি না।"

জিএম জামশেদের দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করে বললেন, "তোমার প্রোগ্রামের বাগ—"

"কিন্তু—আমি মেমোরি পার্টিশান করেছি রীতিমতো ফায়ারওয়াল দিয়ে।"

জিএম নিশ্বাস ফেলে বললেন, "এক্স পি জি ক্রে ৩৯০ সুপার কম্পিউটার এত জটিল যে তার সঠিক আর্কিটেকচার কেউ জানে না। যারা তৈরি করেছে তারাও না।"

"আমি দুঃখিত। আমার জন্যে—"

"তোমার দুঃখিত হবার কিছু নেই। আমাদের প্রজেক্ট হয়তো এক মাস পিছিয়ে যাবে, কিন্তু তুমি যেটা করেছ সেটা অবিশ্বাস্য, ঠিক কী কারণে মেমোরি পার্টিশান ভেঙেছে যদি বের করতে পার একটা বড় কাজ হবে। কে জানে ব্যাপারটা লাইসেন্স করে নিয়ে হয়তো বিলিয়ন ডলার একটা প্রজেক্ট ধরে ফেলতে পারব।"

AMARBOI.COM

সন্ধেবেলা জামশেদ হেঁটে হেঁটে বাসায় ফিরছে। তার ব্যাংকে এখন অনেক টাকা, ইচ্ছে করলে সে একটা গাড়ি কিনতে পারে, এক জন ড্রাইভার রাখতে পারে—সেই গাড়িতে ঘুরে বেড়াতে পারে। কিন্তু সে কিছুই করে নি। চব্বিশ ঘণ্টার সে আঠার ঘণ্টা কাজ করে—তার আনন্দ এবং বিষাদ সবকিছুই প্রোগ্রামিংয়ের যুক্তিতত্ত্বের মাঝে, তার বাইরে কোনো জগৎ নেই।

জামশেদ অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার দুপাশে বড় বড় বিল্ডিংগুলির দিকে তাকায়। আলোকোজ্জ্বল দোকানপাট, মানুষ যাচ্ছে এবং আসছে। রাস্তায় গাড়ি হর্ন দিতে দিতে হুসহাস করে ছুটে যাচ্ছে, চারদিকে একটা সুশৃঙ্খল নিয়ম, যেন কোনো কৌশলী প্রোগ্রামারের তৈরী একটি ভারচুয়াল রিয়েলিটির প্রোগ্রাম।

জামশেদ হঠাৎ ভিতরে ভিতরে চমকে ওঠে। সত্যিই যদি তাই হয়ে থাকে? সত্যিই যদি এই জগৎ, এই আকাশ-বাতাস, মানুষ, পশুপাখি, তাদের সভ্যতা, তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান আসলে একটি কৌশলী প্রোগ্রামারের তৈরী প্রোগ্রাম? জামশেদ মাথা থেকে চিন্তাটি সরাতে পারে না। সত্যি যদি এটি একটি প্রোগ্রাম সে কি কখনো সেটা জানতে পারবে? কোনো কি উপায় রয়েছে যেটা দিয়ে সে প্রমাণ করতে পারবে যে এটি কোনো অসাধারণ প্রতিভাবান ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী মহাজাগতিক প্রাণীর কাল্পনিক জগৎ নয়? এটি সত্যি। এটি বাস্তব। কিন্তু বাস্তবতার অর্থ কী? এটি কি তার মস্তিষ্কের কিছু ধরাবাঁধা সংজ্ঞা নয়? সেই সংজ্ঞাটা যে সত্যি সেটি সে কীভাবে প্রমাণ করবে? যে প্রোগ্রামার এই জগৎ তৈরি করেছে সে-ই কি এই মস্তিষ্কের চিন্তাভাবনাও প্রোগ্রাম করে দেয় নি?

জামশেদের মাথা গরম হয়ে ওঠে। সে জোর করে তার মাথা থেকে চিন্তাটা দূর করে দেয়ার চেষ্টা করে, তার চারপাশে ঘুরে তাকায়। সামনে একটা বড় দোকানের সামনে কিছু কিশোর জটলা করছে। খালি পা, জীর্ণ প্যান্ট এবং বোতামহীন শার্ট—মাথায় উস্কখুস্ক চুল।

জামশেদের হঠাৎ করে তার ভাইয়ের বাসার কাজের ছেলেটির কথা মনে পড়ে গেল। ভাবির সোনার বালাটি চুরি করার পর তাকে যেরকম নৃশংসভাবে মারধর করা হয়েছিল দৃশ্যটি তার আবার মনে পড়ে যায়। ভাইয়ের শক্তপেটা শরীরের শক্তিশালী হাতের প্রচণ্ড ঘুসি খেয়ে ঠোঁট থেঁতলে গিয়েছে, নাকমুখ রক্তে মাখামাখি, চোখ একটা বুজে গিয়েছে—জামশেদ জোর করে মাথা থেকে দৃশ্যটি সরিয়ে দেয়। তার জন্যে এই সম্পূর্ণ নিরপরাধ ছেলেটির জীবনকে ধ্বংস করে দেয়া হল। কোথায় আছে এখন ছেলেটি?

জামশেদের ভিতরে প্রচণ্ড একটা অপরাধবোধ এসে ভর করে। সেই ছেলেটির সাথে দেখা হলে সে ছেলেটির জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে তার অপরাধের বোঝা লাঘব করে দিতে পারত। কিন্তু আর কখনো তার সাথে দেখা হয় নি। মনে মনে সে ছেলেটিকে খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু পৃথিবী বিশাল একটি ক্ষেত্র, সেখানে মানুষ অবলীলায় হারিয়ে যায়। এখানে মানুষ কৌশলী কোনো এক প্রোগ্রামারের অসংখ্য রাশিমালার ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর একটি রাশি, মেমোরির তুচ্ছ একটি বিট।

জামশেদ একটা নিশ্বাস ফেলে সামনে তাকাল। অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে সে কখন লেকের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে লক্ষ করে নি। বিকেলবেলা জায়গাটি মানুষের ভিড়ে জনাকীর্ণ হয়ে থাকে, এখন মোটামুটি ফাঁকা। কাগজের ঠোঙা, বাদামের খোসা, সিগারেটের খালি প্যাকেট ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, দৃশ্যটিতে কেমন যেন এক ধরনের নিঃসঙ্গ বিষণ্নতা লুকিয়ে আছে। জামশেদ কী মনে করে লেকের পাশে একটা বেঞ্চে বসল। সম্পূর্ণ অকারণে তার মনটি কেন জানি খারাপ হয়ে আছে।

"ভাই।" হঠাৎ করে গলার স্বর শুনে জামশেদ চমকে ঘুরে তাকাল। বেঞ্চের অন্যপাশে কে যেন বসে আছে, আবছা অন্ধকারে ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। জামশেদ ভয় পাওয়া গলায় বলল, "কে?"

"আমি ভাই। আমারে চিনতে পারছেন না?"

জামশেদ ভূত দেখার মতো চমকে উঠল, তার ভাইয়ের বাসার সেই কাজের ছেলেটি। নাক এবং মুখ থেঁতলে আছে। অন্ধকারে ভালো করে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু সারা মুখ রক্তে মাখামাখি। একটি চোখ বুজে আছে।

"তুই?"

"হ্যাঁ।"

"তু-তুই কোথা থেকে? তোর চেহারা এরকম কেন?"

"মনে নাই? আপনি বেগম সাহেবের সোনার বালা চুরি করলেন? তারপরে—"

"তুই কেমন করে জানিস?"

"আমি জানি। তারপর সবাই আমাকে মিলে মারলেন। এই দেখেন সামনের দুইটা দাঁত ভেঙে গেছে—" ছেলেটি আবছা অন্ধকারে তার মুখ খুলে দেখানোর চেষ্টা করল, জামশেদ ভালো করে দেখতে পারল না।

জামশেদের সারা শরীরে হঠাৎ কাঁটা দিয়ে ওঠে—এটি কি সত্যি? সে ভালো করে তাকাল, আবছা অন্ধকারে সত্যি সত্যি ছেলেটি বেঞ্চের অন্যপাশে বসে আছে। এত কাছে যে সে হাত বাড়ালে স্পর্শ করতে পারবে। জামশেদ খানিকক্ষণ নিশ্বাস বন্ধ করে থেকে বলল, "তুই কোথা থেকে এসেছিস?"

ছেলেটি অনির্দিষ্টভাবে বলল, "হুই ওখান থেকে।"

AMARBOI.COM

"কেন?"

"আপনি আমার সাথে দেখা করতে চান সেই জন্যে।"

"তুই কেমন করে জানিস?"

ছেলেটি উদাস গলায় বলল, "আমি জানি।"

জামশেদ হঠাৎ হঠাৎ করে পুরো ব্যাপারটি বুঝতে পারে। তার অনুমান সত্যি। এই সমস্ত জগৎ, আকাশ–বাতাস, মানুষ, পশুপাখি, সভ্যতা, জ্ঞান–বিজ্ঞান আসলে একজন কৌশলী প্রোগ্রামারের সৃষ্টি। কোনো প্রোগ্রাম নিখুঁত নয়, তার ত্রুটি থাকে। ভারচুয়াল রিয়েলিটির প্রোগ্রামে ত্রুটি ছিল, সেই ত্রুটিতে স্পর্শ করামাত্র এক্স পি জি ক্রে ৩৯০ সুপার কম্পিউটারের সমস্ত সিস্টেম ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ছোট একটা ত্রুটি সযত্নে গড়ে তোলা জটিল একটা প্রোগ্রামকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। বিশাল এই সৃষ্টিজগতের এই প্রোগ্রামেরও ত্রুটি আছে, সেই ত্রুটিটি তার চোখের সামনে ধরা পড়েছে। তার বাসার কাজের ছেলেটি তার কাছে এসে বসে আছে। কোনো যুক্তি নেই, কোনো কারণ নেই, তবু সে চুপচাপ বসে আছে। এখন এই ত্রুটিটি স্পর্শ করলে কি এই প্রোগ্রামটিও ধ্বংস হয়ে যাবে?

জামশেদ আবার ঘুরে তাকাল, মনেপ্রাণে সে আশা করছিল সে তাকিয়ে দেখবে তার পাশে কেউ নেই, পুরোটা তার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের একটা কল্পনা। কিন্তু সেটা সত্যি নয়, তার পাশে ছেলেটি বসে আছে। মুখ রক্তাক্ত, ঠোঁটটা কেটে গেছে, একটা চোখ বুজে আছে।

জামশেদ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, দেখতে পেল তার পাশে খুব ধীরে ধীরে দ্বিতীয় আরেকজন ছেলে স্পষ্ট হয়ে আসছে। হুবহু একই রকম চেহারা, স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তার পাশে আরেকজন, তার পাশে আরো অসংখ্য। হ্যাঁ, এটি একটি ত্রুটি। নিঃসন্দেহে প্রোগ্রামের একটি ত্রুটি।

জামশেদ চোখ বন্ধ করে ফেলল, না সে আর দেখতে চায় না। বিশাল এই প্রোগ্রামের ত্রুটিটি স্পর্শ করে পুরো সৃষ্টিজগৎ ধ্বংস করে দিতে চায় না। সে নিশ্বাস বন্ধ করে বসে থাকে, যেন একটু নড়লেই পুরো সৃষ্টিজগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে। কতক্ষণ এভাবে বসে ছিল সে জানে না। এক সময় সে চোখ খুলে তাকাল। চারদিকে অসংখ্য ছেলে, মুখ রক্তাক্ত, থেঁতলানো ঠোঁট, চোখ বুজে আছে যন্ত্রণায়। সবাই স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তারা কি সত্যিই আছে নাকি একটা বিভ্রম? একবার কি ছুঁয়ে দেখবে?

স্পর্শ করবে না করবে না ভেবেও জামশেদ তার হাত এগিয়ে দিল ছোঁয়ার জন্যে......

* * * * * *

"কী হল?"

"পুরোটা আবার ধ্বংস হয়ে গেল।"

"আবার চালু করবে?"

দীর্ঘ সময় নীরবতার পর কে যেন বলল, "নাহ্! আর ইচ্ছে করছে না।"

ওয়াই ক্রমোজম

গোল চত্বরটি নিশ্চয়ই এক সময় এই শহরের কেন্দ্রবিন্দু ছিল, বিকেলবেলা মানুষেরা এখানে হয়তো ভিড় করে আসত সময় কাটাতে। শিশুরা আসত তাদের মায়ের পিছু পিছু, তরুণ-তরুণীরা আসত হাত ধরাধরি করে। কাফেতে উচ্চ তালের সঙ্গীতের সাথে হইহুল্লোড় করত শ্রমজীবী মানুষেরা। এখন কোথাও কেউ নেই। নিয়ানা রেলিঙে হেলান দিয়ে সামনে তাকাল, যতদূর চোখ যায় ধু-ধু জনমানবহীন। সারা পৃথিবী জুড়ে এরকম লক্ষ লক্ষ শহর এখন জনহীন মৃত। মাত্র এক বছরের মাঝে ল্যাবরেটরির গোপন ভল্ট থেকে ছাড়া পাওয়া ভাইরাস মিটুমাইন পৃথিবীর প্রায় সব মানুষকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। সাধারণ ফ্লুয়ের মতো উপসর্গ হত প্রথমে, তৃতীয় দিনে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়ে মানুষ পোকামাকড়ের মতো মারা যেতে শুরু করল। পৃথিবীতে বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার সব চিহ্ন মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রইল—আকাশচুম্বী দালান, দীর্ঘ হাইওয়ে, কলকারখানা, লাইব্রেরি, দোকানপাট, হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ, মিউজিয়াম—শুধু কোথাও কোনো মানুষ রইল না। নিয়ানার মতো অল্প কিছু মানুষ শুধু বেঁচে রইল, প্রকৃতির বিচিত্র কোনো খেয়ালে তাদের জিনেটিক কোডিং মিটুমাইন ভাইরাসের আক্রমণে কাবু হল না; সারা পৃথিবীতে এখন বেঁচে থাকা মানুষের সংখ্যা হাত দিয়ে গোনা যায়। সূর্যের পড়ন্ত আলোতে—মৃত একটি শহরের জনমানবহীন ধু-ধু প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে নিয়ানার পুরো ব্যাপারটিকে একটি ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়। তার বেঁচে থাকার ব্যাপারটি কি সৌভাগ্য নাকি দুর্ভাগ্য এখনো সে বুঝে উঠতে পারে না।

খুব ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসছে। নিয়ানা এখানে একা একা আরো খানিকক্ষণ অপেক্ষা করবে, তারপর হেঁটে হেঁটে যাবে শহরের ভেতর। কোনো একটি বাসার দরজা খুলে সে ভিতরে ঢুকবে; সেখানে সাজানো ঘর থাকবে, বিছানা থাকবে, রান্নাঘরে চুলোর উপর কেতলি বসানো থাকবে, ছোটশিশুর খেলাঘর থাকবে, লাইব্রেরিঘরে বই থাকবে, দেয়ালে পরিবারটির হাস্যোজ্জ্বল ছবি থাকবে, শুধু কোথাও কোনো মানুষ থাকবে না। মিটুমাইন ভাইরাসের প্রবল আতংকে সব মানুষ ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল, পাহাড়ে বনে ক্ষেতে খামারে—কেউ রক্ষা পায় নি শেষ পর্যন্ত। সেই জনমানবহীন ভুতুড়ে ঘরের এক কোনায় নিয়ানা স্লিপিং ব্যাগের ভিতরে গুটিসুটি মেরে শুয়ে থাকবে। অন্ধকার ঘরে শুয়ে শুয়ে সে অপেক্ষা করবে রাত কেটে ভোর হওয়ার জন্যে।

দিনের আলোতে আবার সে পথে পথে ঘুরে বেড়াবে জীবিত মানুষের খোঁজে। পৃথিবীর সব জীবিত মানুষকে একত্র না করলে আবার কেমন করে শুরু হবে নূতন পৃথিবী? হয়তো তারই মতো নিঃসঙ্গ কোনো তরুণ পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, খুঁজছে তারই মতো কোনো তরুণীকে। তারা দুজন দুজনকে সান্ত্বনা দেবে, সাহস দেবে, শক্তি দেবে, ভালবাসা দেবে, নূতন পৃথিবীর জন্ম দেবে।

রাত কাটানোর জন্যে নিয়ানা যে বাসাটি বেছে নিল তার বাইরে ফুলের বাগান আগাছায় ঢেকে গেছে। দীর্ঘদিনের অব্যবহারে বাসার সিঁড়ি ধুলায় ধূসরিত। দরজা ধাক্কা দিতেই ক্যাঁচক্যাঁচ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শব্দ করে খুলে গেল। দেয়ালে হাত দিয়ে সুইচ অন করতেই আলো জ্বলে উঠল। কী আশ্চর্য! বাসাটিতে ইলেকট্রিসিটির জন্যে যে ব্যাটারি রেখেছিল এখনো সেটি কাজ করছে।

ঘরের কার্পেটে পা ছড়িয়ে বসল নিয়ানা, পিঠ থেকে ব্যাগ নামিয়ে শুকনো কিছু খাবার বের করল, তার সাথে পানির বোতল। শুকনো খাবার চিবিয়ে চিবিয়ে খেল সে দীর্ঘ সময় নিয়ে, তারপর বোতল থেকে খানিকটা পানি খেয়ে স্লিপিং ব্যাগের ভিতরে ঢুকে গেল। দীর্ঘ সময় সে নিদ্রাহীন চোখে শুয়ে রইল। সারাদিন হেঁটে হেঁটে সে ক্লান্ত, কিন্তু তবু তার চোখে ঘুম আসে না। বিশাল পৃথিবীতে একা নিঃসঙ্গ বেঁচে থাকার মতো কঠিন বুঝি আর কিছু নয়! নিয়ানার মনে হয়, কখনোই তার চোখে ঘুম আসবে না, কিন্তু এক সময় নিজের অজান্তেই ঘুম নেমে এল।

নিয়ানার ঘুম ভাঙল একটি শব্দে, মনে হল সে কারো গলার স্বর শুনতে পেয়েছে, চমকে উঠে বসল সে। কান পেতে শোনার চেষ্টা করল আবার, আবার সে মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। এবারে এক জনের নয়, একাধিক জনের। কী আশ্চর্য! নিয়ানা লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, জীবিত মানুষ এসেছে এখানে। সে প্রায় ছুটে গিয়ে জানালার কাছে দাঁড়াল, পরদা সরিয়ে বাইরে দেখার চেষ্টা করল তীক্ষ্ণ চোখে। চাঁদের অস্পষ্ট আলোতে অবাক হয়ে দেখল সত্যি সত্যি তিন জন ছায়ামূর্তি নিচু গলায় কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছে এই বাসার দিকে। উত্তেজনায় নিশ্বাস নিতে ভুলে যায় সে, দুই হাত নেড়ে চিৎকার করে ওঠে আনন্দে। ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিল নিয়ানা, অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়ে রইল মানুষ তিন জনের জন্যে। এখনো সে বিশ্বাস করতে পারছে না, মানুষ এসেছে তার কাছে, সত্যিকারের জীবন্ত মানুষ!

মানুষ তিন জন ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে পিঠ থেকে ঝোলা নিচে নামিয়ে রাখল। নিয়ানা কী বলবে ঠিক বুঝতে পারছিল না, কোনোমতে নিজেকে সংবরণ করে বলল, "তোমাদের দেখে কী যে ভালো লাগছে আমার! কতদিন থেকে আমি মানুষকে খুঁজে বেড়াচ্ছি বিশ্বাস করবে না।"

মানুষ তিন জন কোনো কথা না বলে নিয়ানার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তিন জনের ভিতরে দুজন মধ্যবয়স্ক, তৃতীয় জন প্রায় তরুণ। গায়ের জামাকাপড় ধূলিধূসরিত। ক্লান্তিজনিত কারণের জন্যেই কি না কে জানে, চেহারায় এক ধরনের কঠোরতার ছাপ রয়েছে। নিয়ানা তাদের ঝোলার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চমকে উঠল— সেখান থেকে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র উঁকি দিচ্ছে। নিয়ানা আবার বলল, "তোমরা নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত? আমার কাছে কিছু শুকনো খাবার আছে। এই বাসায় খুঁজলে—"

নিয়ানাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ জিজ্ঞেস করল, "তোমার বয়স কত?"

নিয়ানা থতমত খেয়ে বলল, "বয়স? আমার?"

'হ্যাঁ।"

"উনিশ। এই বসন্তে উনিশ হয়েছি।"

মানুষটি জিব দিয়ে এক ধরনের শব্দ করে তার সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বলল, "বিশ্বাস করতে পার? উনিশ বছরের একটা যুবতী পেয়ে গেলাম।"

নিয়ানা মানুষটির কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠে বলল, "কী? কী বলছ তুমি?"

মানুষটি কোনো কথা না বলে জিব দিয়ে ঠোঁট চেটে হঠাৎ একটা বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসতে থাকে। নিয়ানা হঠাৎ এক ধরনের ভয়ংকর আতংক অনুভব করে।

"এক থেকে তিনের মাঝে একটা সংখ্যা বল দেখি সুন্দরী।"

নিয়ানা ঢোক গিলে বলল, "কেন?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমাদের তিন জনের মাঝে কে তোমাকে নিয়ে প্রথমবার স্ফূর্তি করব সেটা ঠিক করব।"

মানুষটির কথা শুনে অন্য দুজন মানুষ হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠল। নিয়ানা রক্তশূন্য ফ্যাকাসে মুখে পিছিয়ে গিয়ে দেয়াল স্পর্শ করে দাঁড়াল, হঠাৎ তার মনে হতে থাকে সে বুঝি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। জোরে জোরে কয়েকটা নিশ্বাস নিয়ে বলল, "কী বলছ তোমরা? সারা পৃথিবীতে এখন মাত্র আমরা কয়েকজন মানুষ। এখন আমরা সবাই যদি একে অন্যকে সাহায্য না করি, মিলেমিশে না থাকি—"

"মিলে-মিশে মিলে-মিশে—" তরুণটি হঠাৎ একটা কুৎসিত ভঙ্গি করে বলল, "তাই তো করব! মিলে-মিশে যাব।"

"না!" নিয়ানা করুণ চোখে বলল, "তোমরা এরকম করতে পারবে না। দোহাই তোমাদের—ঈশ্বরের দোহাই—"

মধ্যবয়স্ক নিষ্ঠুর চেহারার মানুষটি এক পা এগিয়ে এল। তার চোখে এক ধরনের হিংস্র লোলুপ ভাব স্পষ্ট হয়ে এসেছে, জিব দিয়ে ঠোঁট চেটে বলল, "পৃথিবীতে এখন কোনো মানুষ নেই মেয়ে। আইন তৈরি হয় মানুষের জন্যে, যেহেতু মানুষ নাই তাই আইনও নাই। আমরা যেটা বলব সেটা হবে আইন। যেটা করব সেটা হবে নিয়ম।"

মানুষটি আরো এক পা এগিয়ে গিয়ে নিয়ানাকে স্পর্শ করে বলল, "আস সুন্দরী। লজ্জা কোরো না—"

ভয়াবহ আতংকে নিয়ানা থরথর করে কাঁপতে থাকে।

* * * * * *

মানুষটি মাথা নিচু করে উবু হয়ে বসে আছে, তার হাত দুটি পিছনে শক্ত করে বাঁধা। তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে বেশ কয়েকজন নানা বয়সী মেয়ে, সবার হাতেই কোনো না কোনো ধরনের অস্ত্র। মানুষটি মাথা তুলে কাতর গলায় বলল, "আমাকে কেন তোমরা ধরে এনেছ?"

মানুষটির সামনে একটা উঁচু চেয়ারে একটি মেয়ে বসে আছে, সাদা কাপড় দিয়ে তার মুখ ঢাকা। মেয়েটি তার মুখের কাপড় খুলে বলল, "আমার দিকে তাকাও।"

মানুষটি মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠে চোখ নামিয়ে ফেলল। মেয়েটি সাদা কাপড় দিয়ে মুখটি ঢেকে ফেলে বলল, "আমার নাম নিয়ানা। ছয় বছর আগে তিন জন মানুষ আমার এই অবস্থা করেছে। কোনো কারণ ছিল না, তারা এটা করেছে শুধু আনন্দ করার জন্যে। পেট্রোল ঢেলে আমার গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তারা হা হা করে হেসেছে। আমাকে গুলি করার আগে বলেছে, পৃথিবীতে এখন কোনো আইন নেই। আনন্দ করার জন্যে তারা যেটা করবে সেটাই হচ্ছে আইন। আমি জানতাম না মানুষকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ হয়। আমি জানতাম না নিষ্ঠুরতার মাঝে এত আনন্দ থাকে।"

নিয়ানার সামনে মানুষটি মাথা নিচু করে বসে রইল। নিয়ানা একটা নিশ্বাস নিয়ে মাথা এগিয়ে দিয়ে বলল, "আমার মরে যাবার কথা ছিল। বুকের মাঝে দুটি বুলেট নিয়ে কেউ বেঁচে থাকে না। কোনো ডাক্তার আমাকে চিকিৎসা করে নি, কোনো হাসপাতালে আমাকে নেয়া হয় নি, তবু আমি মরি নি। ঈশ্বর আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। আমি তখন নিশ্চিত হয়েছি, ঈশ্বরের নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে।"

নিয়ানা মানুষটির দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি জান সেই উদ্দেশ্য কী?"

AMARBOI.COM

মানুষটি মাথা নাড়ল, বলল, "না।"

"ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করেছেন। কারণ তিনি চান আমি এই পৃথিবীকে একটি সুন্দর পৃথিবীতে পাল্টে দিয়ে যাই—যে পৃথিবীতে কোনো নিষ্ঠুরতা থাকবে না, কোনো হিংস্রতা থাকবে না, ভায়োলেন্স থাকবে না। যে পৃথিবী হবে শান্ত সুন্দর কোমল একটি পৃথিবী। ভালবাসার পৃথিবী। কেমন করে হবে সেটি তুমি জান?"

মানুষটি মাথা নাড়ল, "না, জানি না।"

"পৃথিবী থেকে সকল পুরুষমানুষকে সরিয়ে দিয়ে। কারণ পুরুষমানুষের মাঝে রয়েছে এক ধরনের ভায়োলেন্সের বীজ। তাদের ওয়াই ক্রমোজমে নিশ্চয়ই রয়েছে সেই ভায়োলেন্সের জিনস। অন্যায় আর অবিচারের জিনস। তুমি জান প্রকৃতির কোনো খেয়ালে যদি কারো দেহে বাড়তি আরো একটি ওয়াই জিনস থাকত তাহলে কী হত?"

"কী হত?"

"সেই মানুষ হত বড় অপরাধী। পৃথিবীতে যখন মানুষ বেঁচে ছিল তখন জেলখানায় অপরাধীদের গবেষণা করে এই তথ্য বের হয়েছিল। শরীরে একের অধিক ওয়াই জিনস থাকলে তার অপরাধী হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। বিজ্ঞানীদের সেটা নিয়ে দ্বিমত ছিল আমার কোনো সন্দেহ নেই। পুরুষমাত্রই নৃশংস এবং নিষ্ঠুর। সমাজে বেঁচে থাকার জন্যে তারা সেটাকে চেপে রাখে। কেউ বেশি কেউ কম। যদি আইনের ভয় না থাকে তাদের ভিতর থেকে সেই হিংস্র পশু বের হয়ে আসে—"

"না।" মানুষটি মাথা নেড়ে বলল, "এটি সত্যি হতে পারে না। পুরুষমানুষ শুধু অন্যায় করেছে, নিষ্ঠুরতা করেছে—সেটি সত্যি হতে পারে না। তাদের মাঝে ভালো মানুষ আছে। মহৎ মানুষ আছে—'

"সব ভান। তাদের ভালোমানুষি এবং মহত্ত্ব হচ্ছে লোক দেখানো অভিনয়। তাদের হৃদয়ের ভিতরে লুকানো রয়েছে তাদের প্রকৃত রূপ। নিষ্ঠুরতা আর হিংস্রতা। আমার কথা যদি বিশ্বাস না কর তাহলে চারদিকে ঘুরে তাকাও। তোমার চারপাশে যেসব মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে তাদের জিজ্ঞেস কর।"

মানুষটি ভীত চোখে তার চারপাশের সবাইকে দেখে মাথা নিচু করল। নিয়ানা তার চেয়ারে সোজা হয়ে বসে বলল, "আমি ঘুরে ঘুরে সারা পৃথিবীর দুঃখী মেয়েদের একত্র করেছি। সংগঠিত করেছি। তাদের সশস্ত্র করেছি। তারপর সেই সশস্ত্র-সংগঠিত মেয়েদের নিয়ে একটি একটি পুরুষকে হত্যা করে এই পৃথিবীকে জঞ্জালমুক্ত করেছি।"

নিয়ানা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ তীব্র গলায় বলল, "তুমি হচ্ছ পৃথিবীর শেষ পুরুষমানুষ। তোমার দেহে রয়েছে পৃথিবীর শেষ ওয়াই ক্রমোজম। তোমাকে শেষ করা হলে পৃথিবীর শেষ ওয়াই ক্রমোজম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এই পৃথিবীতে আর কখনো কোনো পুরুষমানুষের জন্ম হবে না।"

"কিন্তু-কিন্তু—" মানুষটি রক্তহীন মুখে বলল, "শুধু যে পুরুষমানুষের জন্ম হবে না তা-ই নয়, কোনো মানুষেরই জন্ম হবে না। সৃষ্টিজগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে। একজন শিশুকে জন্ম নিতে হলে পুরুষ এবং নারী দুই-ই প্রয়োজন।"

"ভুল!" নিয়ানা হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, "ভুল বলেছ, সন্তানের জন্ম দিতে পুরুষের প্রয়োজন হয় না, শুধুমাত্র মেয়ের প্রয়োজন। তুমি দেখতে চাও?"

মানুষটি অবাক হয়ে নিয়ানার কাপড়ে ঢাকা মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। নিয়ানা হাত

দিয়ে ইঙ্গিত করতেই ভেতর থেকে একটি নবজাতক শিশুকে বুকে ধরে উনিশ–বিশ বছরের একটি মেয়ে বের হয়ে এল। নিয়ানা শিশু এবং তার মাকে দেখিয়ে বলল, "এই হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য। সবচেয়ে শাশ্বত দৃশ্য। মায়ের বুকে শিশু। দৃশ্যটি সত্যিকারের শাশ্বত হয়ে যায় যখন সেই শিশুটি হয় একটি মেয়েশিশু।"

নিয়ানার সামনে উবু হয়ে বসে থাকা হাতবাঁধা মানুষটি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে নিয়ানার দিকে তাকিয়ে রইল। নিয়ানা মাথা নেড়ে বলল, "এই মায়ের গর্ভে এই শিশুটির জন্ম হয়েছে। সুস্থ সবল প্রাণবন্ত একটি শিশু। কোনো পুরুষের সাহায্য ছাড়া এই শিশুর জন্ম হয়েছে। মায়ের শরীরের একটি কোষ থেকে তার ছেচল্লিশটি ক্রমোজম আলাদা করে তার ডিম্বাণুতে প্রবেশ করিয়ে তার গর্ভেই বসানো হয়েছে। অনেক পুরোনো পদ্ধতি। এর নাম হচ্ছে ক্লোনিং। মানুষের ক্লোন করতে পুরুষমানুষের প্রয়োজন হয় না।"

মানুষটি হতচকিতের মতো নিয়ানার দিকে তাকিয়ে রইল। নিয়ানা নিচু কিন্তু স্পষ্ট গলায় বলল, "আমরা এর মাঝে অসংখ্য শিশুর জন্ম দিয়েছি। তারা বড় হলে আরো অসংখ্য শিশুর জন্ম হবে। তারা জন্ম দেবে আরো শিশুর, পৃথিবী থেকে সৃষ্টিজগৎ ধ্বংস হবে না—সেটি বরং আরো নূতন করে গড়ে উঠবে।"

"কিন্তু সেখানে থাকবে শুধু নারী?"

"হ্যাঁ। একজন পুরুষ অন্য একজন মানুষকে জন্ম দিতে পারে না, কিন্তু একজন নারী পারে। কারো সাহায্য না নিয়ে সে একা আরেকজনকে জন্ম দিতে পারে। তাই নারী হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি। পুরুষ বাহুল্য। সৃষ্টিজগৎ থেকে আমরা সেই বাহুল্যকে দূর করে দিচ্ছি।"

AMARBOI.COM

মানুষটি কাতর গলায় বলল, "তুমি এ কী বলছ? সারা পৃথিবীতে থাকবে শুধু নারী? এক নারীর ক্লোন থেকে জন্ম নেবে অন্য নারীর ক্লোন?"

'হ্যাঁ।"

"কিছু পুরুষ তোমার সাথে নৃশংসতা করেছে বলে তুমি পৃথিবী থেকে সমস্ত পুরুষ জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছ?"

"না।" নিয়ানা মাথা নেড়ে বলল, "তুমি ভুল বুঝো না। আমার সাথে নিষ্ঠুরতার এর কোনো সম্পর্ক নেই। আমার সাথে নিষ্ঠুরতা করেছে বলে আমার এটা উপলব্ধি হয়েছে, সৃষ্টির এই রহস্যটি আমি বুঝতে পেরেছি এর বেশি কিছু নয়। পুরুষের ওপরে আমার কোনো ক্রোধ নেই। অনুকম্পা আছে।"

নিয়ানা তার চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। উবু হয়ে বসে থাকা মানুষটিকে ঘিরে দাঁড়ানো মেয়েগুলিকে বলল, "একে নিয়ে যাও তোমরা। এ হচ্ছে পৃথিবীর শেষ পুরুষমানুষ। এর প্রতি করুণাবশত তোমরা চেষ্টা কোরো তার মৃত্যুটি যেন হয় যন্ত্রণাহীন।"

মেয়েগুলি মাথা নাড়ল, একজন বলল, "আমরা চেষ্টা করব মহামান্য নিয়ানা।"

নিয়ানা দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে পেল পৃথিবীর শেষ পুরুষমানুষটি মাথা নিচু করে হেঁটে যাচ্ছে, তাকে ঘিরে রেখেছে সশস্ত্র মেয়েরা। এই মানুষটির দেহে রয়েছে শেষ ওয়াই ক্রমোজম, পৌরুষত্বের বীজ। কিছুক্ষণ পর এই পৃথিবীতে আর একটি ওয়াই ক্রমোজমও থাকবে না।

নিয়ানা নিশ্বাস ফেলে ভাবল, সেই পৃথিবী নিশ্চয়ই হবে ভালবাসার কোমল একটি পৃথিবী।

অন্য জগৎ

১

প্রফেসর কাসেম জোয়ারদার অপ্রসন্নমুখে ল্যাবরেটরিঘরের দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে তার অপ্রসন্ন থাকার কোনো কারণ নেই—তৃতীয় বিশ্বের সাদামাঠা একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক থেকে হঠাৎ করে তিনি পৃথিবীজোড়া খ্যাতি পেয়ে গেছেন, নিউজউইকে তার ওপরে একটা আলোচনা বের হয়েছে। বি.বি.সি. এবং সি.এন.এন. থেকে ইন্টারভিউ নিতে আসছে—কিন্তু তবু তার মেজাজ-মর্জি ভালো নয়। কারণটি কেউ জানে না, যে জানে সে এ বিষয়ে মুখ খুলবে না এবং তার মেজাজটি সে কারণেই অপ্রসন্ন! যে আবিষ্কারটির জন্যে তিনি পৃথিবীজোড়া খ্যাতি লাভ করেছেন সেটি তার নিজের আবিষ্কার নয়, ব্যাপারটি বের করেছে তার এক ছাত্র, জার্নালে প্রকাশ করার সময় প্রফেসর কাসেম জোয়ারদার কায়দা করে নিজের নামটি আগে দিয়ে মূল আবিষ্কারক হিসেবে বিখ্যাত হয়ে গেছেন। ছাত্রটি সেটি নিয়ে কোনো ধরনের হইচই করলে তিনি তাকে কৌশলে পুরো ব্যাপার থেকে সরিয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু ছাত্রটির খ্যাতি বা সম্মানের দিকে বিন্দুমাত্র লোভ আছে বলে মনে হয় না। বরং তার আবিষ্কারটি কাসেম জোয়ারদার নিজের নামে ব্যবহার করে বিখ্যাত হয়ে যাচ্ছেন এই ব্যাপারটিতে সে এক ধরনের কৌতুক অনুভব করছে বলে মনে হয়। প্রফেসর জোয়ারদারের মেজাজটি অপ্রসন্ন, সে কারণেই, নিজের ছাত্রের সামনে কেমন যেন নীচ হয়ে আছেন।

প্রফেসর জোয়ারদার ল্যাবরেটরিঘরের দরজায় একটু শব্দ করে ভেতরে এসে ঢুকলেন এবং শব্দ শুনে তার ছাত্র তারেক রহমান মাথা ঘুরে তাকাল। তার শিক্ষককে দেখে সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, "স্যার, বি.বি.সি. আর সি.এন.এন. থেকে নাকি ইন্টারভিউ নিতে আসছে?"

"হ্যাঁ।"

"বাহ! আপনি বিখ্যাত হয়ে গেছেন স্যার।"

জোয়ারদার কোনো কথা বললেন না। তারেক হালকা গলায় বলল, "সময় পরিভ্রমণের ব্যাখ্যাটা করার সময় বেশি টেকনিক্যাল দিকে যাবেন না স্যার।"

"কেন?"

"বিদেশী সাংবাদিকরা খুব ত্যাঁদোড় হয় স্যার। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সব বের করে নেয়। জিনিসটা বোঝায় কোনো ফাঁক থাকলে তারা বুঝে ফেলবে।"

প্রফেসর জোয়ারদার মনে মনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তার এখন বলা উচিত ছিল, তারেক এটি তোমার আবিষ্কার তুমি ইন্টারভিউ দাও। কিন্তু তিনি বলতে পারলেন না। শুধু যে বলতে পারলেন না তাই নয়, তারেক নামের অল্পবয়স্ক হাসিখুশি এই তরুণটির বিরুদ্ধে কেমন জানি খেপে উঠলেন। মুখে তিনি তার কিছুই প্রকাশ করলেন না, জোর করে একটা হাসি ফুটিয়ে বললেন, "তোমার কাজের কী অবস্থা?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ভালো স্যার। শুধু মাইক্রোস্কোপিক নয় মনে হচ্ছে, বড় জিনিসও সময় পরিভ্রমণ করিয়ে দেয়া যাচ্ছে। সাংঘাতিক ব্যাপার স্যার।"

জোয়ারদার একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলেন, "কীভাবে করছ?"

"বলব স্যার আপনাকে। পজিটিভ একটা রেজাল্ট পেলেই পুরোটা আপনাকে বুঝিয়ে দেব।"

জোয়ারদার আবার মনে মনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

২

ইন্টারভিউ নিতে যারা এসেছে তাদের মাঝে একজনের পদার্থবিজ্ঞানে ডিগ্রি আছে খবর পেয়ে জোয়ারদার একটু ভয়ে ভয়ে ছিলেন, কিন্তু দেখা গেল মানুষটি কঠিন কোনো প্রশ্ন করল না। ঘুরেফিরে তারা শুধু একটি প্রশ্নই করল, "ভবিষ্যতে কি সত্যিই সময় পরিভ্রমণ সম্ভব হবে?"

জোয়ারদার মাথা নেড়ে বললেন, "আমরা দেখিয়েছি একটা পরমাণু সময়ের বিপরীতে ভ্রমণ করতে পারে। যে পরীক্ষাটি নিয়ে পৃথিবীজোড়া হইচই হচ্ছে সেটি আমরা করেছি আমাদের ল্যাবরেটরিতে। কার্বন ডাই-অক্সাইডের একটা এটমকে আমরা ভবিষ্যৎ থেকে টেনে এনেছি অতীতে। এখন কাজ করছি গ্রাফাইট ক্রিস্টালের ওপর। তারপর নেব আরো বড় জিনিস।"

"তার মানে আপনি বলছেন সময়ে পরিভ্রমণ সম্ভব?"

"অবশ্যি সম্ভব।"

"মনে করুন আপনি সময় পরিভ্রমণ করে অতীতে আপনার শৈশবে ফিরে গেলেন। ফিরে গিয়ে আপনার শিশু অবস্থায় ছোট্ট বাচ্চাটিকে মেরে ফেললেন। তাহলে আপনি এখন আসবেন কোথা থেকে?"

প্রফেসর জোয়ারদার থতমত খেয়ে গেলেও খুব কায়দা করে নিজেকে সামলে নিয়ে হা হা করে হেসে বললেন, "আমাকে দেখে কি তাই মনে হয় যে আমি বাচ্চা শিশুদের খুনখারাপি করে বেড়াই?"

ইন্টারভিউয়ে ব্যাপারটা ঠাট্টা করে কাটিয়ে দিলেও প্রশ্নটা জোয়ারদারের ভিতরে খচখচ করতে লাগল। সত্যিই তো, সময় পরিভ্রমণ করে কেউ যদি অতীতে গিয়ে নিজেকে মেরে ফেলে তাহলে সে আসবে কোথা থেকে? সুযোগ বুঝে তিনি তারেককে প্রশ্নটা করলেন। প্রশ্নের ভাষাটা হল খুব খটমটে যেন সেটাকে একটা বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের মতো শোনায়। জিজ্ঞেস করলেন, "সময় পরিভ্রমণে যে ঘটনার পারম্পরিকতা নষ্ট হয় সেটা উদ্ধার করা হয় কীভাবে?"

তারেক চোখ পিটপিট করে বলল, "কী বলছেন বুঝতে পারলাম না স্যার।"

"মনে কর একটা পার্টিকেল সময় পরিভ্রমণ করে নিজের সাথে কলিশন করল।"

"ও! অতীতে গিয়ে নিজেকে মেরে ফেলার প্যারাডক্স? ইন্টারভিউতে আপনাকে যে প্রশ্নটা করেছিল?"

প্রফেসর জোয়ারদারের কান একটু লাল হয়ে গেল, নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, মানে তাই।"

"এর দুইটা ব্যাখ্যা হতে পারে। এক. সময় পরিভ্রমণ করে নিকট অতীতে যাওয়া যাবে না, দূর অতীতে যেতে হবে। তাতে নিজেকে কেউ হত্যা করতে পারবে না। পূর্বপুরুষদের কাউকে হত্যা করা যেতে পারে, কিন্তু তখন এত জটিলতা থাকবে যে অন্য কোনোভাবে জন্ম হওয়া সম্ভব। আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি হচ্ছে—"

তারেক একটু চুপ করে বলল, "আমরা আমাদের যে জগৎ দেখছি তার মতো আরো অসংখ্য জগৎ আছে। সেগুলি একই সাথে পাশাপাশি যাচ্ছে বলে আমরা দেখতে পাই না।"

"পাশাপাশি?"

"হ্যাঁ। সময় পরিভ্রমণ করে আমরা নিজেদের জগতে যেতে পারি না, অন্য একটা জগতে চলে যাই।"

জোয়ারদার মুখ অল্প হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন। কমবয়সী এই ছেলেটি যুগান্তকারী একটা পরীক্ষা করে পৃথিবীতে একটা ইতিহাস সৃষ্টি না করে থাকলে তিনি তার কথা হেসে উড়িয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু এখন কিছুই আর উড়িয়ে দেয়া যায় না। প্রফেসর জোয়ারদার আমতা আমতা করে বললেন, "সেই জগৎ কি আমাদের এই জগতের মতো?"

তারেক মাথা নাড়ল। বলল, "হ্যাঁ। কাছাকাছি জগৎগুলি আমাদের এই জগতের মতো। আমার ধারণা, কাছাকাছি জগৎগুলিতে আপনি রয়েছেন, আমি রয়েছি। আমি হয়তো একটু ভিন্ন ধরনের, আপনিও হয়তো একটু ভিন্ন।"

"তুমি—তুমি প্রমাণ করতে পারবে?"

"চেষ্টা করছি স্যার। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করছি ভবিষ্যৎ থেকে কিছু আনার। যদি আনতে পারি প্রমাণ হয়ে যাবে।"

"কীভাবে প্রমাণ হবে?"

তারেক রহস্যের ভঙ্গিতে হেসে বলল, "স্যার, সময় হলেই দেখবেন।"

জোয়ারদার তার হাসি দেখে কেমন যেন মিইয়ে গেলেন।

AMARBOI.COM

৩

সপ্তাহখানেক পর তারেক খুব উত্তেজিত হয়ে প্রফেসর জোয়ারদারের ঘরে ছুটে এল। বলল, "সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটেছে স্যার!"

"কী হয়েছে?"

"ভবিষ্যৎ থেকে কিছু জিনিস এনেছি।"

"কী জিনিস?"

"একটা স্ক্রু ড্রাইভার, দুইটা ছোট আই.সি. আর—"

"আর কী?"

"আপনি বিশ্বাস করবেন না স্যার।"

"কী?"

"একটা খবরের কাগজের অংশ। ডেইলি হরাইজন।"

জোয়ারদার ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারলেন না, একটু অস্বস্তি নিয়ে তারেকের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারেক বলল, "খবরের কাগজটা আগামী পরশুদিনের।"

"পরশুদিনের?"

"হ্যাঁ। এই দেখেন।"

জোয়ারদার খবরের কাগজটা দেখলেন, সাদামাঠা কাগজ দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই যে এর মাঝে কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার থাকতে পারে। কিন্তু এটি সাদামাঠা কাগজ নয়, এই কাগজটি দুদিন পরে ছাপা হবে, দুদিন পরে কী কী ঘটবে সব এখানে লেখা রয়েছে। ভবিষ্যতের ছোট একটা অংশ এখানে চলে এসেছে। জোয়ারদার কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন তারেক বাধা দিয়ে বলল, "আমার একটা জিনিস সন্দেহ হচ্ছে স্যার। সাংঘাতিক সন্দেহ হচ্ছে।"

"কী জিনিস?"

তারেক আবার রহস্যের হাসি হেসে বলল, "এখন বলব না স্যার, আগে প্রমাণ হাজির করি তখন বলব।"

"কী প্রমাণ হাজির করবে?"

"সময় হলেই দেখবেন।"

তারেক ডেইলি হরাইজনের কিছু ফটোকপি করে মূল খবরের কাগজটি একটি খামে ভরে পোস্টঅফিসে নিয়ে নিজের নামে রেজিস্ট্রি করে পোস্ট করে দিল। কাগজটি যে দুদিন আগেই হাজির হয়েছে সেটা প্রমাণ করার এটা হবে খুব সহজ সর্বজনগ্রাহ্য প্রমাণ।

দুদিন পর যখন ডেইলি হরাইজন পত্রিকা বের হল, তারেক ভোরবেলাতেই কয়েকটা কপি নিয়ে এসে ল্যাবরেটরিতে বসল। দুদিন আগে পাওয়া খবরের কাগজটির ফটোকপি করে রাখা আছে, তার সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে। মিলিয়ে কিছু বিচিত্র জিনিস দেখা গেল। যদিও খবরের কাগজ দুটি প্রায় একই রকম, হেডলাইন, মূল বিষয় সম্পাদকীয়, ছবি, বিজ্ঞাপন—সবকিছুই রয়েছে, তবুও খবরের কাগজ দুটি হুবহু একরকম নয়। এক-দুটি শব্দ অন্যরকম। এক-দুটি ছবি একটু ভিন্ন কোণ থেকে নেয়া। প্রায় একরকম হয়েও যেন একরকম নয়। তারেক বিজয়ীর মুখভঙ্গি করে বলল, "দেখলেন স্যার? দেখলেন?"

"কী?"

"যে কাগজটা ভবিষ্যৎ থেকে এনেছি সেটা একটু অন্যরকম।"

প্রফেসর জোয়ারদার মাথা চুলকে বললেন, "তার মানে কী?"

"মানে বুঝতে পারছেন না?" তারেকের গলায় একটু অধৈর্য প্রকাশ পেয়ে যায়, "তার মানে এই খবরের কাগজটা এসেছে অন্য একটা জগৎ থেকে। আমি যেটা সন্দেহ করেছিলাম সেটাই সত্যি। এখানে পাশাপাশি অনেক জগৎ রয়েছে, প্রায় একই রকম কিন্তু পুরোপুরি একরকম নয়। সময় পরিভ্রমণ করে আমরা এক জগৎ থেকে অন্য জগতে চলে যাই।"

"তার মানে তুমি বলতে চাও ঠিক আমাদের মতো আরো জগৎ রয়েছে, সেখানে আমি আছি, তুমি আছ?"

"নিশ্চয়ই আছে স্যার।"

"তারাও এটা নিয়ে রিসার্চ করছে?"

"নিশ্চয়ই করছে।"

"তারাও ভবিষ্যৎ থেকে জিনিসপত্র টেনে নিতে চেষ্টা করছে?"

"নিশ্চয়ই করছে। মাঝে মাঝে আমরা টুকটাক জিনিসপত্র হারিয়ে ফেলি, কে জানে সেসব হয়তো অন্য কোনো জগৎ নিয়ে যায়।"

"তুমি তাই মনে কর?"

"হতেই তো পারে! কোনদিন না আবার আমাদের টেনে নিয়ে যায়!" তারেক শব্দ করে হাসতে থাকে।

AMARBOI.COM

৪

প্রফেসর কাসেম জোয়ারদার ঠিক করলেন পাশাপাশি থাকা জগতের অস্তিত্ব নিয়ে তাদের হাতে যে প্রমাণটা রয়েছে সেটা প্রকাশ করার জন্যে একটা সাংবাদিক সম্মেলন ডাকবেন। সবার সামনে খামটা খোলা হবে, দেখানো হবে দুদিন আগে কীভাবে খবরের কাগজটি চলে এসেছে। তার চেয়ে বড় কথা খবরের কাগজটির মাঝে সূক্ষ্ম কিছু পার্থক্য রয়েছে। ভবিষ্যৎ থেকে টেনে আনার চাইতেও এই পার্থক্যের গুরুত্ব অনেক বেশি। এটা প্রমাণ করে ভিন্ন জগতের অস্তিত্ব।

সাংবাদিক সম্মেলন ডাকার আগে প্রফেসর জোয়ারদার তারেকের কাছ থেকে যন্ত্রপাতির খুঁটিনাটি বুঝে নিলেন। সাংবাদিক সম্মেলনে হঠাৎ করে কেউ কিছু প্রশ্ন করে তাকে বিব্রত না করে ফেলতে পারে সেটা নিয়ে সতর্ক রইলেন। যন্ত্রপাতি কীভাবে চালায়, কীভাবে বন্ধ করে বারবার করে দেখে নিলেন।

সাংবাদিক সম্মেলনের আগের রাতে প্রফেসর জোয়ারদার আবার ল্যাবরেটরিতে এসে শেষবারের মতো সবকিছু দেখে নিচ্ছেন। সুইচ টিপে ভবিষ্যৎ থেকে কোনো কিছুকে অতীতে টেনে আনার জটিল যন্ত্রটি চালু করার সময় হঠাৎ তার মাথায় একটা বিচিত্র সম্ভাবনার কথা মনে হল, তিনি কি কোনোভাবে তারেককে খুন করে ফেলতে পারেন না? এই যে বিশাল কাজটি, একটা আবিষ্কার তার সম্মানটুকু পুরোপুরিই তার কাছে আসছে, কিন্তু যতদিন তারেক বেঁচে থাকবে এর ভিতটি হবে খুব নড়বড়ে। যদি তাকে কোনোভাবে শেষ করে দেয়া যায় পৃথিবীতে আর কেউ তাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে না।

প্রফেসর জোয়ারদার জোর করে চিন্তাটা মাথা থেকে সরিয়ে দিলেন। তিনি লোভী এবং দুর্বল চরিত্রের মানুষ, মানুষ খুন করার মতো শক্তি বা সাহস তার নেই। বিশ্বজোড়া আবিষ্কারের এই সম্মানটুকু সারাক্ষণ তাকে ভয়ে ভয়েই উপভোগ করতে হবে।

প্রফেসর জোয়ারদার সুইচটা অন করতেই ঘরঘর শব্দ করে বহুকোণ একটা অংশে ভ্যাকুয়াম পাম্প চালু হয়ে যায়। উচ্চচাপের বিদ্যুতে বিশাল একটা অংশ আয়োনিত করে সেখানে অনেকগুলি লেজার রশ্মি খেলা করতে থাকে। রেডিয়েশান মনিটরে অল্পশক্তির এক্স-রে ধরা পড়ে এক ধরনের ভোঁতা ধাতব শব্দ করতে থাকে। প্রফেসর জোয়ারদার একটু এগিয়ে যেতেই হঠাৎ একটা বিস্ফোরণের শব্দ হল, তিনি চমকে তাল হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন, কোনোমতে নিজেকে সামলে নিলেন। হঠাৎ করে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল এবং প্রফেসর জোয়ারদারের মনে হল তিনি শূন্যে ছিটকে পড়ে গেছেন। হাত দিয়ে তিনি ধরার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ধরার কিছু নেই–অতল শূন্যে পড়ে যাচ্ছেন। বিকট গলায় তিনি চিৎকার করতে থাকেন, মনে হল তার গলার আওয়াজ অদৃশ্য কোনো এক জগতে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল।

প্রফেসর কাসেম জোয়ারদার চোখ খুলে দেখলেন তার উপর ঝুঁকে উবু হয়ে একজন মানুষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে দেখছে। মানুষটির চেহারা দেখে তিনি ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন, মানুষটি তিনি নিজে।

"তু–তু–তুমি কে?"

"আমি হচ্ছি তুমি। অন্য জগৎ থেকে তুমি এখানে আমার কাছে চলে এসেছ। আমি ছোটখাটো জিনিস টেনে আনতে চাচ্ছিলাম কিন্তু মনে হচ্ছে বড় জিনিস পেয়ে গেছি। আস্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন মানুষ, আর যে-সে মানুষ নয়—একেবারে নিজেকে।"

প্রফেসর কাসেম জোয়ারদার নিজের ভিতরে এক ধরনের অসহনীয় আতংক অনুভব করতে থাকেন। শুকনো গলায় বললেন, "আমি বুঝতে পারছি না, কিছু বুঝতে পারছি না।"

মানুষটি হা হা করে হেসে বলল, "না বোঝার কিছু নেই এখানে, তুমি তো আমি। আমি যদি বুঝি, তুমি বুঝবে না কেন?"

"তারেক—তারেক কোথায়?"

"ঐ যে। মেঝেতে পড়ে আছে। হাই টেনশান তার এসে লেগেছে হঠাৎ—হার্টবিট বন্ধ হয়ে মরে গেছে।"

প্রফেসর কাসেম জোয়ারদার তীক্ষ্ণ চোখে তার নিজের মতো মানুষটির দিকে তাকালেন, হঠাৎ করে তিনি বুঝতে পারলেন এই জগতের প্রফেসর কাসেম জোয়ারদার তার মতো ভীরু কাপুরুষ নয়, সে ঠাণ্ডা মাথায় তারেককে খুন করে ফেলেছে। তিনি শুকনো ঠোঁট জিব দিয়ে ভিজিয়ে বললেন, "তুমি তারেককে খুন করেছ?"

মানুষটি হা হা করে হেসে বলল, "কী বলছ তুমি পাগলের মতো? প্রমাণ আছে কোথাও?"

প্রফেসর জোয়ারদার মাথা নাড়লেন, বললেন, "না প্রমাণ নেই।"

মানুষটি উঠে দুই পা পিছিয়ে গিয়ে বলল, "তুমি অন্য জগৎ থেকে এসেছ—মানুষটা আমি হলেও তুমি পুরোপুরি আমি নও। আমার কী মনে হয় জান?"

"কী?"

"তুমি উল্টোপাল্টা কথা বলে ঝামেলা করতে পার।"

"কী ঝামেলা?"

প্রফেসর কাসেম জোয়ারদার দেখলেন মানুষটি হাতে একটা লোহার রড তুলে নিয়ে বলল, "অন্য কোনো জগৎ থেকে যদি আমি নিজেকে টেনে আনতে পারি এক-দুইটা নোবেল প্রাইজের জন্য সেটাই যথেষ্ট। তাকে জীবন্ত টেনে আনতে হবে কে বলেছে! কী বল তুমি?"

প্রফেসর জোয়ারদার নিজের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না। ফ্যালফ্যাল করে তার নিজের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আইনস্টাইন

ফ্রেডি তার সামনে বসে থাকা মানুষটিকে খুব ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলেন। মানুষটি আকারে ছোট, মাথার চুল হালকা হয়ে এসেছে, গোসল সেরে খুব সতর্কভাবে চুল আঁচড়ালে যে কয়টি চুল আছে সেগুলি দিয়ে মোটামুটিভাবে মাথাটা ঢাকা যায়। মানুষটির চেহারায় একটি তৈলাক্ত পিচ্ছিল ভাব রয়েছে, মুখের চামড়া এখনো কুঁচকে যায় নি বলে প্রকৃত বয়স ধরা যায় না, চোখ দুটি ধূসর এবং সেখানে কেমন জানি এক ধরনের মৃত-মানুষ মৃত-মানুষ ভাব রয়েছে। মানুষটির স্যুটটি দামি, টাইটি রুচিসম্মত, কাপড় নিভাঁজ। চেহারা দেখে কখনো কোনো মানুষকে বিচার করা ঠিক নয়, কিন্তু তবুও ফ্রেডি মানুষটিকে অপছন্দ করে

ফেললেন। তিনি অন্যমনস্কভাবে মানুষটির দিকে তাকিয়ে থেকে তার কথা শোনার ভান করতে থাকেন যদিও, তার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকে মানুষটির কথা বলার ভঙ্গিতে, ঠোঁট কুঁচকে ওঠায়, দাঁত বের হওয়ার মাঝে।

"আপনি পৃথিবীর প্রথম দশ জন ঐশ্বর্যশালী মানুষের এক জন।" মানুষটি মুখে এক ধরনের হাসি ফুটিয়ে বলল, "আমি জানি আপনার সাথে দেখা করার থেকে একজন মন্ত্রীর স্ত্রীর সাথে ফষ্টিনষ্টি করা সহজ—তবুও আমাকে খানিকটা সময় দিয়েছেন বলে অনেক ধন্যবাদ। তবে আমি নিশ্চিত—আপনি শুধু শুধু আমার সাথে খানিকটা সময় ব্যয় করতে রাজি হন নি। আমার প্রস্তাবটা ভেবে দেখেছেন, আমার সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছেন—"

ফ্রেডি গ্রানাইটের কালো টেবিলে আঙুল দিয়ে শব্দ করছিল, হঠাৎ করে সেটা বন্ধ করে মানুষটিকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলল, "কাজের কথায় আসা যাক।"

মানুষটি এতটুকু বিচলিত না হয়ে মাথা নেড়ে বলল, 'আসা যাক।"

"আপনি দাবি করছেন আমার টাকা বিনিয়োগের এর থেকে বড় সুযোগ আর কোথাও নেই?"

"না, নেই।" ছোটখাটো মানুষটির গলার স্বর যে আনুনাসিক হঠাৎ করে সেটা কেমন যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল।

"আপনি কেমন করে এত নিশ্চিত হলেন? আমি কোথায় কোথায় টাকা বিনিয়োগ করেছি আপনি জানেন?"

"মোটামুটিভাবে জানি। সেজন্যেই অন্য কারো কাছে যাবার আগে আপনার কাছে এসেছি।"

ফ্রেডি ভুরু কুঁচকালেন, "মানে?"

"পৃথিবীর সাধারণ মানুষ যখন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স-এর নাম শোনে নি তখন আপনি সান হোসের সবচেয়ে বড় এ. আই. ফার্মটি কিনেছেন। নিউক্লিয়ার পাওয়ার যে পৃথিবী থেকে উঠে যাবে সেটি অন্যেরা বোঝার অন্তত দশ বছর আগে আপনি বুঝেছিলেন। প্রচুর অর্থ নষ্ট করে আপনি সেখান থেকে সরে এসে কয়েক বছরের মাঝে আপনার বিশাল সম্পদকে রক্ষা করেছেন। স্পেস সায়েন্সে মোটা টাকা লোকসান দিয়ে আপনি সেটাকে দশ বছর ধরে রাখলেন—এখন সারা পৃথিবীতে আপনার একচ্ছত্র মনোপলি। জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিঙে আপনি পৃথিবীর সবচয়ে বড় বিনিয়োগটি করতে যাচ্ছেন। জেনেভার সবচেয়ে বড় জিনেটিক ল্যাবটিতে আপনি বিড করেছেন—"

ফ্রেডি সোজা হয়ে বসলেন, "আপনি কেমন করে জানেন?"

"আমি জানি সেটাই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ।" মানুষটি মাথা নেড়ে বলল, "কেমন করে জানি সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।"

"ব্যাপারটা গোপন থাকার কথা।"

"ব্যাপারটা এখনো গোপনই আছে। আমি জানলেও তথ্য গোপন থাকে বলে আমি অনেক তথ্য জানতে পারি।"

ফ্রেডি আবার তার আঙুল দিয়ে অন্যমনস্কভাবে টেবিলে টোকা দিতে শুরু করলেন, বললেন, "ঠিক আছে, এখন তুমি বল আমি কিসে বিনিয়োগ করব?"

"মানুষে।"

"মানুষে!"

"হ্যাঁ মানুষে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন ভবিষ্যতের বিনিয়োগ হবে মানুষে। সত্যিকার মানুষে। রক্তমাংসের মানুষে।"

ফ্রেডি কোনো কথা না বলে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন। মানুষটি মাথা এগিয়ে এনে ষড়যন্ত্রীদের মতো বলল, "হেঁজিপেজি মানুষে নয়—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষে।"

ফ্রেডি মাথা নাড়লেন, "আপনি কী বলছেন আমি বুঝতে পারছি না।"

ছোটখাটো তৈলাক্ত চেহারার মানুষটি একটি ম্যাগাজিন ফ্রেডির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "এটা দেখেন, তাহলেই বুঝতে পারবেন।"

ফ্রেডি ম্যাগাজিনটি হাতে নিলেন, পুরোনো একটি নিউজউইক। যে লেখাটি দেখতে দিয়েছে সেটা লাল কালি দিয়ে বর্ডার করে রাখা। ফ্রেডি চোখে চশমা লাগিয়ে লেখাটি পড়লেন, জেনেভার একটি ল্যাবরেটরিতে আইনস্টাইনের মস্তিষ্কের খানিকটা টিস্যু সংরক্ষিত ছিল, সেটি খোয়া গেছে। জোর পুলিশি তদন্ত চলছে।

ফ্রেডি কিছুক্ষণ নিশ্বাস বন্ধ করে লেখাটির দিকে তাকিয়ে রইলেন, তিনি বেশ কয়েক বছর আগে এই সংবাদটি পড়েছিলেন, কেন এই টিস্যু খোয়া গেছে তিনি সাথে সাথে বুঝতে পেরেছিলেন। এখন এই তৈলাক্ত পিচ্ছিল চেহারার মানুষটির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ পুরো ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তার হৃৎস্পন্দন হঠাৎ দ্রুততর হয়ে যায়। তিনি খুব সতর্কভাবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে ধীরে ধীরে বললেন, "আপনি ঠিক কী বলতে চাইছেন?"

"আপনি যদি বুঝতে না পারেন আমার কিছু বলার কোনো অর্থ নেই। আর আপনি যদি বুঝতে পেরে থাকেন তাহলে আমার কিছু বলার কোনো প্রয়োজন নেই।"

ফ্রেডি তীক্ষ্ণ চোখে মানুষটার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বললেন, "আপনি—আপনি বলতে চাইছেন আইনস্টাইনকে ক্লোন করা হয়েছে?"

ছোটখাটো মানুষটির মুখে একটি তৈলাক্ত হাসি বিস্তৃত হল। মাথা নেড়ে বলল, "আপনি যথার্থ অনুমান করেছেন। আইনস্টাইনকে ক্লোন করা হয়েছে।"

"সত্যি?"

"সত্যি।"

"তাকে মাতৃগর্ভে ঠিকভাবে বসানো হয়েছে?"

মানুষটির মুখের হাসি আরো বিস্তৃত হল, বলল, "সে অনেকদিন আগের কথা।"

"তার মানে আপনি বলতে চাইছেন আইনস্টাইনের ক্লোনের জন্ম হয়ে গেছে?"

"অবশ্যি। যদি সুস্থভাবে জন্ম না হত আমি কি আপনার কাছে আসতাম?"

"কোথায় জন্ম হয়েছে? কবে জন্ম হয়েছে?"

"এই দেশেই জন্ম হয়েছে। প্রায় বছর চারেক হল।"

"কোথায় আছে সেই ক্লোন?"

ছোটখাটো মানুষটি খুব ধীরে ধীরে মুখের হাসি মুছে সেখানে একটি গাম্ভীর্য ফুটিয়ে তুলে বলল, "সেই শিশুটি কোথায় আছে আমি বলতে পারব না। বুঝতেই পারছেন নিরাপত্তার ব্যাপার রয়েছে। যেটুকু বলতে পারি সেটা হচ্ছে সে তার সারোগেট মায়ের সাথে আছে। অনেক খুঁজে পেতে এই মা'কে বেছে নেয়া হয়েছে, অর্ধেক জার্মান এবং অর্ধেক সুইস। অত্যন্ত মায়াবতী মহিলা।"

ফ্রেডি তখনো ঠিক ব্যাপারটি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না, খানিকটা হতচকিতের মতো ছোটখাটো মানুষটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। মানুষটি তার বুকপকেট থেকে দুটি ছবি বের করে ফ্রেডির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "এই যে আইনস্টাইনের শৈশবের ছবি। একটি নিয়েছি এন্টনিয়া ভেলেন্টিনের লেখা বই থেকে। অন্যটি সপ্তাহখানেক আগে তোলা।"

AMARBOI.COM

ফ্রেডি হতবাক হয়ে ছবি দুটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। আইনস্টাইনের শৈশবের ছবির সাথে কোনো পার্থক্য নেই, সেই ভরাট গাল, কোঁকড়া চুল, গভীর মায়াবী চোখ! পার্থক্য কেমন করে থাকবে? আইনস্টাইনের মস্তিষ্কের টিস্যু থেকে একটা কোষ আলাদা করে তার ছেচল্লিশটি ক্রমোজম একটি মায়ের ডিম্বাণুতে ঢুকিয়ে সেটি মাতৃগর্ভে বসানো হয়েছে। যে ক্রমোজমগুলি একটি ডিম্বাণু থেকে আইনস্টাইনের জন্ম দিয়েছে সেই একই ক্রমোজম এই আইনস্টাইনের জন্ম দিয়েছে। যে শিশুটির জন্ম হয়েছে সে তো আইনস্টাইনের মতো একজন নয়, সে সত্যি সত্যি আইনস্টাইন।

ছোটখাটো মানুষটি ছবি দুটি নেয়ার জন্যে হাত বাড়িয়ে বলল, "আপনাকে নিশ্চয়ই এর গুরুত্ব বুঝিয়ে বলতে হবে না।"

ফ্রেডি কোনো কথা না বলে স্থির দৃষ্টিতে মানুষটির দিকে তাকিয়ে রইলেন, খানিকক্ষণ পর চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, "আটানব্বই সালে আইন করে সারা পৃথিবীতে মানুষের ক্লোন করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।"

মানুষটি মুখ নিচু করে খিকখিক করে হেসে বলল, "অবশ্যই কাজটা বেআইনি। নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশনে অন্তর্ঘাত চালিয়ে ব্যবসা থেকে উঠিয়ে দেয়াও বেআইনি ছিল। আভ্যন্তরীণ খবর কিনে স্যাটেলাইট সিস্টেম পুরোটা দখল করে নেয়াও বেআইনি ছিল, কিন্তু আপনি সেজন্যে নিরুৎসাহিত হন নি। জেনেভার জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিঙের ফার্ম আপনি যেভাবে কিনতে যাচ্ছেন সেটাও পুরোপুরি বেআইনি। আপনি পৃথিবীর সবচেয়ে ঐশ্বর্যশালী মানুষদের এক জন, আপনার তো আইনকে ভয় পাওয়ার কথা নয়—আপনার আইনকে নিয়ন্ত্রণ করার কথা।"

"আমি আইনকে ভয় করি না, কারণ পৃথিবীর কোথাও কেউ প্রমাণ করতে পারবে না আমি আইন ভঙ্গ করেছি।"

ছোটখাটো মানুষটি মুখের হাসি বিস্তৃত করে বলল, "আপনাকে আমি একবারও আইন ভঙ্গ করতে বলি নি। ল্যাবরেটরি থেকে টিস্যু সরিয়ে যে আইনস্টাইনকে ক্লোন করেছে সে আইন ভেঙেছে। একবার ক্লোনের জন্ম হওয়ার পর সে পৃথিবীর মানবশিশু—কারো সাধ্য নেই তাকে স্পর্শ করে। আপনি শুধুমাত্র তার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করবেন—সেটি হবে পুরোপুরি আইনের ভিতরে। তারপর তাকে আপনি কীভাবে বাজারজাত করবেন সেটি পুরোপুরি আপনার ব্যাপার!" মানুষটি এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল, "আমার ধারণা একবিংশ শতাব্দীতে কীভাবে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ একজন বিজ্ঞানীকে ব্যবহার করা যাবে সেটি আপনার চাইতে ভালো করে আর কেউ জানে না।"

ফ্রেডি চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করলেন। ভবিষ্যৎ-মুখী বিনিয়োগে, সারা পৃথিবীতে তার কোনো জুড়ি নেই, সত্যি সত্যি এ ব্যাপারে তার প্রায় এক ধরনের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় রয়েছে। যদিও মানুষকে ক্লোন করার ব্যাপারটি বেআইনি, কিন্তু এটি যে অসংখ্যবার ঘটেছে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। সাধারণ মানুষকে ক্লোন করে তার দ্বিতীয় তৃতীয় কিংবা অসংখ্য কপি তৈরি করে সত্যিকার অর্থে পৃথিবীর কোনো লাভ-ক্ষতি হয় নি। তবে আইনস্টাইনের মতো একজন মানুষের বেলায় সেটি অন্য কথা, এটি পৃথিবীর সমস্ত ভারসাম্যের ওলটপালট করে দিতে পারে। জেনারেল রিলেটিভিটির যে সমস্ত সমস্যার এখনো সমাধান হয় নি তার বড় একটা যদি সমাধান করিয়ে নেয়া যায় তাহলে কী সাংঘাতিক একটা ব্যাপার হবে! মানুষ আইনস্টাইনকে দেখেছে পরিণত বয়সে, কৈশোরের আইনস্টাইন, যৌবনের আইস্টাইন নিয়ে সাধারণ মানুষের নিশ্চয়ই কী সাংঘাতিক কৌতূহল!

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিকভাবে বাজারজাত করা হলে এখান থেকে কী হতে পারে তার কোনো সীমা নেই। যদি এই ক্লোন থেকে আরো ক্লোন করা যায় দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে এক জন করে আইনস্টাইন দেয়া যায়—ফ্রেডি আর চিন্তা করতে পারেন না, তার ব্যবসায়ী মস্তিষ্ক হঠাৎ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। চোখ খুলে তিনি ছোটখাটো মানুষটির দিকে তাকালেন, "কত?"

মানুষটির মুখে আবার তৈলাক্ত হাসিটি বিস্তৃত হল, বলল, "অর্থের পরিমাণটি তো গুরুত্বপূর্ণ নয়—আপনি রাজি আছেন কি না সেটি গুরুত্বপূর্ণ।"

"তবু আমি শুনতে চাই। কত?"

"মানুষের বিনিয়োগের ব্যাপারটি কিন্তু আপনাকে দিয়েই শুরু হবে। আমি যতদূর জানি এলভিস প্রিসলি, মেরিলিন মনরো এবং উইনস্টন চার্চিলের ক্লোন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সেগুলি কীভাবে নিয়ন্ত্রণ হবে, হঠাৎ করে মারা গেলে কীভাবে ইন্স্যুরেন্স করা হবে তার সবকিছু কিন্তু এইটি দিয়ে ঠিক করা হবে।"

ফ্রেডি মাথাটা একটু এগিয়ে এনে বললেন, "আপনি এখনো আমার প্রশ্নের উত্তর দেন নি। কত?"

মানুষটি তার জিব বের করে ঠোঁট দুটি ভিজিয়ে বলল, "আমরা খোঁজ নিয়েছি, সাদা এবং কালো মিলিয়ে আপনার সেই পরিমাণ লিকুইড ক্যাশ রয়েছে।"

ফ্রেডি একটা নিশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে বসলেন, তারপর থমথমে গলায় বললেন, "ঠিক আছে, আমার এটর্নি চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করার জন্যে আপনার এটর্নির সাথে যোগাযোগ করবে। তবে—"

"তবে?"

"এটি যে সত্যিই আইনস্টাইনের ক্লোন এবং আন্তর্জাতিক কোনো জোচ্চুরির অংশ নয় সেটি আমি নিজেই নিশ্চিত হয়ে নেব। মাউন্ট সাইনাই হাসপাতাল থেকে আইনস্টাইনের মস্তিষ্কের টিস্যু সংগ্রহ করে আমি নিজে আমার নিজের জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে নেব।"

AMARBOI.COM

"অবশ্যি। আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করবেন তার জন্যে এটি তো করতেই হবে।" ছোটখাটো মানুষটি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমাকে খানিকক্ষণ সময় দেয়ার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি নিশ্চিত আজকে এখান থেকে পৃথিবীর ইতিহাসে একটা নূতন দিগন্ত উন্মোচিত হতে যাচ্ছে।"

ফ্রেডি কোনো কথা না বলে শীতল চোখে মানুষটির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

* * * * * *

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী এলবার্ট আইনস্টাইনের ক্লোনশিশুটি চুপচাপ ধরনের—ঠিক যেরকম হওয়ার কথা। শিশুটি কথা বলে মৃদু স্বরে—তার সাথে যে সারোগেট মা রয়েছেন তার কাছে জানা গেল, শিশুটি কথা বলতে শুরু করেছে অনেক দেরি করে, ঠিক সত্যিকার আইনস্টাইনের মতো।

শিশুটির নাম দেয়া হয়েছে এলবার্ট—খুব সঙ্গত কারণেই। ফ্রেডি অভিভাবকত্ব গ্রহণ করার পর একদিন শিশুটিকে দেখতে গিয়েছিলেন, বাচ্চাটি তার কাছেই এল না, দূরে দাঁড়িয়ে থেকে তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। ফ্রেডি ভাব করার খুব বেশি চেষ্টা করলেন না, তার জন্যে প্রায় পুরো জীবনটাই পড়ে রয়েছে। শিশুটির দিকে তাকিয়ে তার ভিতরে বিচিত্র এক ধরনের ভাব খেলা করতে থাকে, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী এলবার্ট

আইনস্টাইনকে তিনি সংগ্রহ করেছেন। তার ছবি নয়, তার হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি নয়, তার ব্যবহার্য পোশাক নয়—স্বয়ং মানুষটিকে। পৃথিবীর ইতিহাসে কি এর আগে কখনো এরকম কিছু ঘটেছে? মনে হয় না। এই আইনস্টাইনকে তিনি গড়ে তুলবেন। প্রকৃত আইনস্টাইন তাঁর জীবনের অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাতে যে কাজ করতে পারেন নি তিনি এই শিশুকে দিয়ে সেইসব করিয়ে নেবেন। শুধু অর্থ নয়, খ্যাতি এবং ইতিহাস সৃষ্টি করবেন এই শিশুটিকে দিয়ে।

ফ্রেডি শিশুটিকে চমৎকার একটা পরিবেশে বড় হওয়ার জন্যে যা যা প্রয়োজন তার সব ব্যবস্থা করে দিলেন। শহরতলিতে একটা ছবির মতো বাসা, পিছনে একটা ঝিল, ঝিলের পাশে পাইন গাছ। ঘরের ভিতরে ফায়ারপ্লেস, বড় লাইব্রেরি, বসার ঘরে গ্র্যান্ড পিয়ানো, চমৎকার উজ্জ্বল রঙে সাজানো শোয়ার ঘর, পায়ের কাছে খেলনার বাক্স, মাথার কাছে সুদৃশ্য কম্পিউটার।

শিশুটি চমৎকার পরিবেশে বড় হতে থাকে। তার মানসিক বিকাশলাভের প্রক্রিয়াটি খুব তীক্ষ্ণ নজরে রাখা হল। প্রকৃত আইনস্টাইনের মতোই তার পড়াশোনায় খুব মন নেই। এলজেবরা বা জ্যামিতি দুই-ই চোখে দেখতে পারে না। কম্পিউটারের নূতনত্বটুকু কেটে যাবার পর সেটিতে উৎসাহ হারিয়ে ফেলল। সঙ্গীতে অবশ্যি এক ধরনের আকর্ষণ গড়ে উঠল, একা একা দীর্ঘ সময় গ্র্যান্ড পিয়ানো টেপাটেপি করে, মনে হয় এইটুকু বাচ্চার ভিতরে প্রচণ্ড এক ধরনের সুরবোধ রয়েছে।

শিশুটির ভিতরে এক ধরনের নিঃসঙ্গতা রয়েছে, স্কুলে বন্ধুবান্ধব খুব বেশি নেই। ফ্রেডি খুব মনোযোগ দিয়ে এই শিশুটিকে লক্ষ করে যাচ্ছে, খুব সাধারণ একটা শিশু হিসেবে বড় হবে সে, বয়ঃসন্ধির সময় হঠাৎ করে মানসিক বড় বড় কিছু পরিবর্তন ঘটবে। ফ্রেডি খুব ধৈর্য ধরে সেই সময়টির জন্যে অপেক্ষা করে আছেন। তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ এটি—প্রয়োজনে তার জন্যে সারা জীবন অপেক্ষা করবেন।

AMARBOI.COM

* * * * * *

তরুণ এলবার্ট গ্র্যান্ড পিয়ানোর কাছে দাঁড়িয়ে আছে, ফ্রেডি কাছাকাছি একটা নরম চেয়ারে বসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে লক্ষ্য করছেন। এন্টোনিয়া ভেলেন্টাইনের বইয়ে তরুণ আইনস্টাইনের যে ছবিটি রয়েছে তার সাথে এই তরুণটির একচুল পার্থক্য নেই। সেই অবিন্যস্ত ব্যাকব্রাশ করা চুল, উঁচু কপাল, সূক্ষ্ম গোঁফের রেখা—ঠোঁটের কোনায় এক ধরনের হাসি যেটা প্রায় বিদ্রূপের কাছাকাছি। ছবিটিতে আইনস্টাইন থ্রিপিস স্যুট পরে ছিলেন—সেই যুগে যেরকম চল ছিল, এলবার্ট একটা জিন্সের প্যান্ট এবং গাঢ় নীল রঙের টি-শার্ট পরে আছে—এইটুকুই পার্থক্য।

ফ্রেডি একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "এলবার্ট আমি আজকে তোমার সাথে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলব। খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমি এই কথাটি বলার জন্যে এক যুগ থেকেও বেশি সময় ধরে অপেক্ষা করে আছি।"

এলবার্ট উৎসুক দৃষ্টিতে ফ্রেডির দিকে তাকিয়ে রইল। ফ্রেডি বললেন, "তুমি আমার কাছে বস।"

এলবার্ট এগিয়ে এসে কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসল, তার চোখেমুখে হঠাৎ এক ধরনের সূক্ষ্ম অসহিষ্ণুতার ছাপ পড়ে। ফ্রেডি ভুরু কুঁচকে বললেন, "কোনো সমস্যা?"

'না, ঠিক সমস্যা নয়। তবে—"

"তবে?"

"আজ বিকেলে আমার জুডিকে নিয়ে একটা কনসার্টে যাবার কথা।"

"কনসার্ট? কিসের কনসার্ট?"

"ট্রায়ো ইন দ্য ওয়াগন।"

ফ্রেডি চোখ কপালে তুলে বললেন, "মাই গড! তুমি ঐসব কনসার্টে যাও? আমি ভেবেছিলাম—"

এলবার্ট সাথে সাথে কেমন যেন আত্মরক্ষামূলক ভঙ্গি করে বলল, "কী ভেবেছিলে?"

"না, কিছু না।"

ফ্রেডি বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকেন। খানিকক্ষণ খুব যত্ন করে নিজের নখগুলি পরীক্ষা করেন, তারপর এলবার্টের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি কি জান তুমি কে?"

এলবার্ট অবাক হয়ে বলল, "আমি?"

"হ্যাঁ।"

"আমি—আমি এলবার্ট।"

"তুমি অবশ্যি এলবার্ট। কিন্তু তুমি কি জান তুমি কোন এলবার্ট?"

এলবার্ট অনিশ্চিতের মতো মাথা নাড়ল, দেখে মনে হল সে প্রশ্নটা বুঝতে পারে নি।

ফ্রেডি একটা বড় নিশ্বাস নিয়ে বললেন, "তুমি এলবার্ট আইনস্টাইন।"

এলবার্ট কথাটিকে একটা রসিকতা হিসেবে নিয়ে হেসে উঠতে গিয়ে ফ্রেডির দিকে তাকিয়ে থেমে গেল। বিভ্রান্তের মতো কিছুক্ষণ ফ্রেডির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তুমি কী বলছ বুঝতে পারছি না।"

"তুমি বুঝতে পেরেছ, বিশ্বাস করতে পারছ না। তাই না?"

"না, মানে—"

"হ্যাঁ। তুমি ভুল শোন নি, আমিও ভুল বলি নি। তুমি সত্যি সত্যি এলবার্ট আইনস্টাইন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী এলবার্ট আইনস্টাইন।"

এলবার্ট অসহিষ্ণুভাবে মাথা নেড়ে বলল, "আমি কিছু বুঝতে পারছি না।"

ফ্রেডি একটু সামনে ঝুঁকে পড়ে বলল, "বুঝতে পারবে। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বুঝতে পারে না এরকম বিষয় খুব বেশি নেই। তুমি নিশ্চয়ই ক্লোন কথাটির অর্থ জান?"

এলবার্টের মুখমণ্ডল হঠাৎ রক্তশূন্য হয়ে যায়, "ক্লোন?"

"হ্যাঁ, ক্লোন। যেখানে মানুষের একটিমাত্র কোষ থেকে ছেচল্লিশটি ক্রমোজম নিয়ে পুরো মানুষটিকে হুবহু জন্ম দেয়া যায়।"

"জানি।" এলবার্ট মাথা নাড়ল, "আমি ক্লোন সম্পর্কে জানি। আমাদের পড়ানো হয়।"

"তুমি সেরকম একটি ক্লোন। জেনেভার এক ল্যাবরেটরি থেকে আইনস্টাইনের মস্তিষ্কের টিস্যু চুরি করে নিয়ে তোমাকে তৈরি করা হয়েছিল। তুমি এবং মহাবিজ্ঞানী এলবার্ট আইনস্টাইন একই ব্যক্তি।"

"মিথ্যা কথা।" এলবার্ট মাথা নেড়ে বলল, "বিশ্বাস করি না আমি। বিশ্বাস করি না।"

ফ্রেডি শীতল গলায় বললেন, "তুমি বিশ্বাস না করলেও কিছু আসে যায় না এলবার্ট। ব্যাপারটি সত্যি। আমার কাছে সব প্রমাণ আছে—তোমার জন্যে নিয়ে এসেছি। এই দেখ—"

ফ্রেডি তার পকেট থেকে কিছু কাগজপত্র বের করে এলবার্টের হাতে দিলেন, বললেন, "জিনেটিক ব্যাপারগুলি বোঝা খুব সহজ নয়—কিন্তু তুমি আইনস্টাইন, পৃথিবীতে তোমার মতো মস্তিষ্ক একটিও নেই। তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে। দেখ।"

এলবার্ট কাঁপা হাতে কাগজগুলি নিয়ে খানিকক্ষণ দেখল, যখন মুখ তুলে তাকাল তখন তার মুখ রক্তহীন। সে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, "অসম্ভব।"

"না। অসম্ভব না। তুমি সত্যিই এলবার্ট আইনস্টাইন।"

"না।" এলবার্ট চিৎকার করে বলল, "আমি বিশ্বাস করি না।"

"তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে এলবার্ট। তুমি সত্যিই এলবার্ট আইনস্টাইন। আমি প্রায় বিলিয়ন ডলার দিয়ে তোমার অভিভাবকত্ব নিয়েছি এলবার্ট। তুমি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ।"

"বিনিয়োগ? আমি বিনিয়োগ?"

"হ্যাঁ। আমাকে সেই বিনিয়োগের পুরোটুকু ফেরত আনতে হবে। আমাদের অনেক কাজ বাকি এলবার্ট।"

এলবার্ট এক ধরনের আতংক নিয়ে ফ্রেডির দিকে তাকিয়ে রইল, কাঁপা গলায় বলল, "আমাকে? আমাকে সেই ট্রিলিয়ন ডলার আনতে হবে?"

ফ্রেডি হাত তুলে বললেন, "না, তোমাকে আনতে হবে না, সেটা আনব আমি। তোমাকে শুধু একটা কাজ করতে হবে।"

"কী কাজ?"

"নূতন কিছুই না। তুমি যা তোমাকে তাই হতে হবে। তুমি এলবার্ট আইনস্টাইন—তোমাকে এলবার্ট আইনস্টাইন-ই হতে হবে। পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে ভাবতে হবে, গণিত নিয়ে ভাবতে হবে—গবেষণা করতে হবে, চিন্তা করতে হবে।"

"কিন্তু কিন্তু—" এলবার্ট কাতর গলায় বলল, "তুমি বুঝতে পারছ না। আমি এলবার্ট আইনস্টাইনের জীবনী পড়েছি। তিনি ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাবান। তিনি ছিলেন পদার্থবিজ্ঞানী, গণিতবিদ—আমি সেরকম কিছু নই। আমি সাধারণ, খুব সাধারণ—"

"না, তুমি সাধারণ নও। তোমার মস্তিষ্ক হচ্ছে এলবার্ট আইনস্টাইনের মস্তিষ্ক। এতদিন তুমি জানতে না, তাই ভাবতে তুমি সাধারণ। এখন তুমি জান। এখন তুমি হয়ে উঠবে সত্যিকারের আইনস্টাইন। যে সমীকরণ আইনস্টাইন শেষ করতে পারেন নি তুমি সেটা শেষ করবে।"

"না।"

ফ্রেডি অবাক হয়ে বলল, "না!"

"না। আমার গণিত ভালো লাগে না। পদার্থবিজ্ঞান ভালো লাগে না।"

ফ্রেডি প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন, "পদার্থবিজ্ঞান ভালো লাগে না? তুমি আইনস্টাইন, তোমার পদার্থবিজ্ঞান ভালো লাগে না?"

"না। আমি সেই আইনস্টাইন নই। আমি সেই সময়ে বড় হই নি। তখন পদার্থবিজ্ঞানের বড় বড় আবিষ্কার হয়েছে, আইনস্টাইন উৎসাহ পেয়েছেন। এখন পদার্থবিজ্ঞানে কোনো বড় আবিষ্কার হচ্ছে না, পুরো ব্যাপারটা একটা বদ্ধঘরের মতো।"

"কী বলছ তুমি?"

"আমি ঠিকই বলছি। আমি গণিতেও কোনো মজা পাই না। যখন গণিতের কোনো সমস্যা দেয়া হয় আমি সেটা কম্পিউটারে করে ফেলি। তুমি জান, গণিতের সমস্যা সমাধানের জন্যে কত মজার মজার সফটওয়ার প্যাকেজ আছে? এলজেবরা করতে পারে, ক্যালকুলাস করতে পারে, ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশান সমাধান করতে পারে। অঙ্ক করার জন্যে আজকাল কিছু করতে হয় না। চিন্তা করতে হয় না, ভাবতে হয় না!"

"চিন্তা করতে হয় না? ভাবতে হয় না?"

"না। সত্যিকারের আইনস্টাইনের তো কম্পিউটার ছিল না, তার সবকিছু ভাবতে হত। ভেবে ভেবে অঙ্ক করতে করতে তার গণিতে উৎসাহ হয়েছিল, তাই তিনি গণিতে এত আনন্দ পেতেন, পদার্থবিজ্ঞানে আনন্দ পেতেন। আমি তো পাই না।"

"কী বলছ তুমি?"

"আমি ঠিকই বলছি। আইনস্টাইনের ক্লোন হলেই আইনস্টাইন হওয়া যায় না। আইনস্টাইনের মতো ভাবতে হয়!"

ফ্রেডি প্রায় ভাঙা গলায় বলল, "তুমি আইনস্টাইনের মতো ভাবতে পার না?"

"না। আমার ভালো লাগে না। আমি ওসব ভেবে আনন্দ পাই না।"

'তুমি কিসে আনন্দ পাও?"

এলবার্টের চোখেমুখে এক ধরনের উজ্জ্বলতা এসে ভর করে। সে চোখ বড় বড় করে বলল, "সঙ্গীতে।"

"সঙ্গীতে?"

"হ্যাঁ। হাইস্কুলে আমি সঙ্গীতের ওপর মেজর করেছি। আমি সঙ্গীতের ওপর পড়াশোনা করতে চাই।"

"সঙ্গীতের ওপর?" ফ্রেডি মুখ হাঁ করে বলল, "সঙ্গীতে?"

"হ্যাঁ।" এলবার্ট হাসার চেষ্টা করে বলল, "তুমি এত অবাক হচ্ছ কেন? তুমি জান না আসল আইনস্টাইনও খুব বেহালা বাজাতে পছন্দ করতেন? বেলজিয়ামের রানীর সাথে তিনি সঙ্গীতের অনুষ্ঠান করেছেন।"

"কিন্তু—"

"আজকাল কী চমৎকার সাউন্ড সিস্টেম রয়েছে, ডিজিটাল সাউন্ড, কী চমৎকার তার সুর! আমি নিশ্চিত, আইনস্টাইনের যদি ওরকম একটা সাউন্ড সিস্টেম থাকত তাহলে তিনি দিনরাত সেটা কানে লাগিয়ে বসে থাকতেন! গণিত আর পদার্থবিজ্ঞান থেকে সঙ্গীত অনেক বেশি আনন্দের।"

"কিন্তু পৃথিবীর মানুষ তো সঙ্গীতজ্ঞ আইনস্টাইন চায় না। তারা চায় বিজ্ঞানী আইনস্টাইনকে।"

"পৃথিবীর মানুষ চাইলে তো হবে না। আমাকেও চাইতে হবে। আইনস্টাইনের জন্ম হয়েছিল, তার কাজ করে গেছেন, এখন দ্বিতীয়বার আর তার জন্ম হবে না। আমি আইনস্টাইনের ক্লোন হতে পারি কিন্তু আমি আইনস্টাইন না। আমি বড় হয়েছি অন্যভাবে, আমার শখ ভিন্ন, আমার স্বপ্ন ভিন্ন। আমি কেন আইনস্টাইন হওয়ার এত বড় দায়িত্ব নিতে যাব? আমি সাধারণ মানুষের মতো থাকতে চাই!"

ফ্রেডি উঠে দাঁড়িয়ে এলবার্টের কাছে গিয়ে বললেন, 'কিন্তু তুমি তো সাধারণ মানুষ নও। তুমি সারা পৃথিবীর মাঝে সবচেয়ে খ্যাতিমান মানুষ। মানুষ খ্যাতির পিছনে ছোটে কিন্তু খ্যাতি খুঁজে পায় না। অর্থ হয় বিত্ত হয় ক্ষমতা হয় প্রতিপত্তি হয়—কিন্তু খ্যাতি এত সহজে কাউকে ধরা দেয় না। তুমি সেই খ্যাতি নিয়ে জন্মেছ। মানুষ যখন জানবে তুমি আসলে আইনস্টাইন—"

"না!" এলবার্ট চিৎকার করে বলল, "মানুষ জানবে না!"

ফ্রেডি অবাক হয়ে বলল, "কেন জানবে না? আমি বিলিয়ন ডলার খরচ করে তোমাকে এনেছি, তোমাকে মানুষের সামনে—"

"না, আমি চাই না।"

AMARBOI.COM

"চাও না?"

"না। আমার কথা তুমি কাউকে বলতে পারবে না।"

ফ্রেডি কাঁপা গলায় বলল, "বলতে পারব না?"

"না।"

ফ্রেডি কাঁপা গলায় বলল, "যদি বলি?"

"তাহলে আমি বলব সব জাল-জুয়াচুরি! কেউ তোমার কথা বিশ্বাস করবে না।"

"বিশ্বাস করবে না?" ফ্রেডি হঠাৎ তার বুক চেপে সাবধানে চেয়ারে বসে পড়লেন, তার মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে, বাম পাশে কেমন যেন ভোঁতা এক ধরনের ব্যথা দানা বেঁধে উঠছে। ফ্যাকাসে মুখে বড় একটা নিশ্বাস নিয়ে বললেন, "ঠিকই বলেছ এলবার্ট। তোমার কথা কেউ অবিশ্বাস করবে না। আইনস্টাইনকে কে অবিশ্বাস করবে?"

* * * * * *

মন্টানার একটি কমিউনিটি কলেজে এলবার্ট নামের যে সঙ্গীতশিক্ষক ছিলেন তাকে যে-ই দেখত সে-ই বলত, "আপনাকে কোথায় জানি দেখেছি বলতে পারেন?"

এলবার্ট নামের সেই সঙ্গীতশিক্ষক হেসে বলতেন, "কারো কারো চেহারাই এরকম—দেখলেই মনে হয় চেনা চেনা!"

যদি সঙ্গীতশিক্ষক তার চুল এবং গোঁফকে অবিন্যস্তভাবে বড় হতে দিতেন তাহলে কেন তাকে চেনা মনে হত ব্যাপারটি কারো বুঝতে বাকি থাকত না। কিন্তু তিনি কখনোই সেটা করেন নি।

AMARBOI.COM

ক্যাপ্টেন জুক

নিয়ন্ত্রণকক্ষের দেয়ালে লাগানো বড় মনিটরটির দিকে তাকিয়ে নিশির হঠাৎ নূতন করে মনে হল যে মহাকাশচারীর জীবন প্রকৃতপক্ষে খুব নিঃসঙ্গ হতে পারে। শৈশব এবং কৈশোরে মহাকাশ অভিযান নিয়ে নিশির এক ধরনের মোহ ছিল, প্রথম কয়েকটি অভিযানে অংশ নিয়েই তার সেই মোহ কেটে যায়। সে আবিষ্কার করেছিল মহাকাশ অভিযান প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত কঠোর কিছু নিয়মকানুন দিয়ে বাঁধা অত্যন্ত কঠিন একটি জীবন। যদিও মহাকাশযানের বাইরে অসীম শূন্যতা, কিন্তু মহাকাশচারীদের থাকতে হয় ক্ষুদ্র পরিসরে। তাদের আপনজন যন্ত্র এবং যন্ত্রের কাছাকাছি কিছু মানুষ, তাদের বিনোদন অত্যন্ত জটিল কিছু যন্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাদের সঙ্গীত শক্তিশালী ইঞ্জিনের নিয়মিত গুঞ্জন। প্রথম কয়েকটি অভিযান শেষ করেই নিশি পৃথিবীর প্রচলিত জীবনে ফিরে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু সেখানে গিয়ে সে আবিষ্কার করেছে—তার অনুপস্থিতিতে পৃথিবীতে অর্ধ শতাব্দী কেটে গিয়েছে। তার পরিচিত মানুষের কেউ পৃথিবীতে নেই। যারা আছে তাদের কথাবার্তা, চাল-চলন মনে হয় অপরিচিত, তাদের দৈনন্দিন জীবনের কাছাকাছি গেলে নিজেকে মনে হয় অনাহূত। পৃথিবীর জীবনকে নিশির মনে হয়েছে দুঃসহ, আবার তখন সে মহাকাশচারীর জীবনে ফিরে এসেছে।

নিশি জানে এই জীবনেই সে বাঁধা পড়ে গেছে, মহাকাশযানের শক্তিশালী ইঞ্জিনের গুঞ্জন শুনতে শুনতে একদিন সে আবিষ্কার করবে তার চুল ধূসর বর্ণ ধারণ করেছে, মুখের চামড়ায় বয়সের বলিরেখা—দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ। তখন মহাকাশচারীর পরীক্ষায় বাতিল হয়ে কোনো এক উপগ্রহের অবসরকেন্দ্রে কৃত্রিম জোছনাতে বসে বসে বাকি জীবন কাটিয়ে দেবে। নিশি নিজের অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল—ঠিক তখন তার পাশে লিয়ারা এসে বসেছে, সে নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রের একজন পরিচালক। নিশির দিকে তাকিয়ে বলল, "কী খবর নিশি? তুমি এতবড় একটি দীর্ঘশ্বাস কেন ফেললে?"

লিয়ারার প্রশ্ন শুনে নিশি হেসে ফেলল, বলল, "সাধারণ নিশ্বাসে অক্সিজেন যদি অপ্রতুল হয়, তখন দীর্ঘ নিশ্বাসের প্রয়োজন। ব্যাপারটি একটি জৈবিক ব্যাপার, তুমি সত্যি যদি জানতে চাও শরীররক্ষা যন্ত্রের সাথে কথা বলতে পারি।"

লিয়ারা মাথা নেড়ে বলল, "মহাকাশচারী না হয়ে তোমার এটর্নি হওয়া উচিত ছিল।"

নিশি হেসে বলল, "ঠিকই বলেছ। এতদিনে তাহলে হয়তো কোনো একটা উপগ্রহ কিনে ফেলতে পারতাম। তোমার কী খবর বল?"

লিয়ারা হাসিমুখেই বলল, "খবর বেশি ভালো না।"

কেউ যদি হাসিমুখে বলে খবর ভালো নয় তাহলে সেটি খুব গুরুত্ব দিয়ে নেয়ার কথা নয়, নিশিও নিল না। বলল, "সব খবর যদি ভালো হয় জীবন একঘেয়ে হয়ে যায়।"

"তোমার পক্ষে বলা খুব সহজ। তোমাকে তো আর মান্ধাতা আমলের একটা প্রোগ্রামকে পালিশ করতে হয় না। তুমি জান মূল সিস্টেমে দুটি চার মাত্রার ত্রুটি বের হয়েছে?"

"তাই নাকি?" নিশি হাসতে হাসতে বলল, "ভালোই তো হল। তোমরা কয়েকদিন এখন কাজকর্ম নিয়ে একটু ব্যস্ত থাকবে।"

লিয়ারা চোখ পাকিয়ে বলল, "তুমি সত্যিই মনে কর আমরা এমনিতে কোনো কাজকর্ম করি না?"

নিশি হাত তুলে বলল, "না, না, না। আমি কখনোই সেটা বলি নি।"

লিয়ারা তার মনিটরে কিছু দুর্বোধ্য সংখ্যা প্রবেশ করাতে করাতে বলল, "তুমি সেটা হয়তো মুখে বল নি, কিন্তু সেটাই বোঝাতে চেয়েছ।"

নিশি এবারে শব্দ করে হেসে বলল, "লিয়ারা, তুমি দেখেছ, তোমার সাথে কথা বলা আজকাল কঠিন হয়ে যাচ্ছে।"

"কেন?"

"আমি একটা জিনিস না বললেও তুমি ধরে নাও আমি সেটা বলতে চেয়েছি। কয়দিন পরে ব্যাপারটা হয়তো আরো গুরুতর হবে, কিছু একটা বলতে না চাইলেও তুমি ধরে নেবে আমি অবচেতন মনে সেটা বলতে চাই! আমি আগেই বলে রাখছি লিয়ারা, শুধুমাত্র যেটা আমি সচেতনভাবে করব তার দায়-দায়িত্ব আমি নেব।"

নিশির কথা শুনে লিয়ারা তার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল। তার হাসি দেখে নিশি হঠাৎ বুকের ভিতরে এক ধরনের কাঁপুনি অনুভব করে। লিয়ারা সম্ভবত সাদাসিধে একটি মেয়ে, তার কুচকুচে কালো চুল, বাদামি চোখ, মসৃণ ত্বক—সবই হয়তো খুব সাধারণ, কিন্তু তাকে দেখে সব সময়েই নিশি নিজের ভিতরে এক ধরনের ব্যাকুলতা অনুভব করে। মেয়েটির চেহারায়, কথা বলার ভঙ্গিতে বা চোখের দৃষ্টিতে কিছু একটা রয়েছে যেটি নিশিকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। নিশি প্রাণপণ চেষ্টা করে তার মনের ভাবকে লিয়ারার কাছে গোপন রাখতে,

কিন্তু মানুষ অত্যন্ত রহস্যময় একটি প্রাণী, কিছু কিছু জিনিস না চাইলেও প্রকাশ হয়ে যায়। লিয়ারার কাছে সেটা প্রকাশ হয়ে থাকলে নিশি খুব অবাক বা অখুশি হবে না।

নিশি লিয়ারাকে আবার কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু ঠিক তখন মনিটরে একটা লাল বাতি কয়েকবার জ্বলে উঠল এবং সাথে মহাকাশযানের দলপতি রুহানের অবিন্যস্ত চেহারাটি হলোগ্রাফিক স্ক্রিনে ভেসে ওঠে। রুহান বাম হাতে নিজের খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, "নিশি, শুনেছ, কক্ষপথের কাছাকাছি একটা বিপদে পড়া মহাকাশযানের সিগনাল আসছে।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। চার মাত্রায় সংকেত।"

নিশি শিস দেয়ার মতো একটা শব্দ করে বলল, "সর্বনাশ! চার মাত্রা হলে তো অনেক বড় বিপদ!"

"হুঁ।" রুহান নির্মমভাবে তার গাল চুলকাতে চুলকাতে বলল, "অনেক বড় বিপদ।"

"কী করতে চাও এখন?"

রুহান দীর্ঘদিন থেকে মহাকাশে মহাকাশে সময় কাটিয়ে এসেছে বলেই কি না কে জানে সমস্ত জগৎসংসারের প্রতি তার একটা বিচিত্র উদাসীনতা জন্ম হয়েছে। সে একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "কী করতে চাই যদি জিজ্ঞেস কর তাহলে বলব কিছু হয় নি এরকম ভান করে পাশ কাটিয়ে সোজা চলে যেতে চাই।"

নিশি মাথা নেড়ে বলল, "কিন্তু সেটা তো করতে পারবে না। আসলে কী করবে?"

"কী করব যদি জিজ্ঞেস কর তাহলে বলব আমাদের একটা স্কাউটশিপ পাঠাতে হবে।"

"স্কাউটশিপ?"

"হ্যাঁ।"

"তার মানে আমাকে যেতে হবে?"

রুহান মাথা নেড়ে বলল, "স্কাউটশিপ নিয়ে ভরসা করতে পারি এই মহাকাশযানে সেরকম মানুষ তুমি ছাড়া আর কে আছে বল।"

নিশি একটা নিশ্বাস ফেলল। মহাকাশচারীর জীবনে এটাই হচ্ছে নিয়ম। বিন্দুমাত্র প্রস্তুতি না নিয়ে বিশাল একটি দায়িত্ব নেয়া। অসংখ্যবার করে করে অভ্যাস হয়ে গেছে, আজকাল আর সে অবাকও হয় না।

রুহান বলল, "আমি জানি একেবারেই শুধু শুধু যাওয়া হচ্ছে, মহাকাশযানটিতে কেউ বেঁচে নেই।"

"কেমন করে জান?"

"যেসব সংকেত এসেছে তাতে মনে হচ্ছে এটা অক্ষের উপর ঘুরছে না অর্থাৎ ভেতরে কৃত্রিম মহাকর্ষ নেই। জীবিত মানুষ থাকলে মহাকর্ষ থাকবে না এটা তো হতে পারে না।"

"তা ঠিক।"

ঘণ্টা দুয়েকের মাঝে নিশি প্রস্তুত হয়ে নেয়। বিধ্বস্ত মহাকাশযানটির কাছাকাছি যেতে কমপক্ষে চব্বিশ ঘণ্টার মতো লেগে যাবে, ফিরে আসতে আরো চব্বিশ ঘণ্টা। মহাকাশচারীদের জীবনের জন্যে এটি এমন কিছু বেশি সময় নয়, কিন্তু তবুও অনেকেই স্কাউটশিপের কাছে তাকে বিদায় জানাতে এল। স্কাউটশিপের প্রাথমিক পরীক্ষা শেষ করে ইঞ্জিন চালু করার জন্যে যখন মূল প্রবেশপথ বন্ধ করতে যাচ্ছে তখন লিয়ারা উঁকি দিয়ে বলল, "নিশি।"

AMARBOI.COM

"কী হল লিয়ারা?"

"সাবধানে থেকো।"

নিশি চোখ মটকে বলল, "থাকব লিয়ারা।"

*   *   *   *   *   *

বিধ্বস্ত মহাকাশযানের ডকিং বে'তে স্কাউটশিপটা নামিয়ে নিশি কিছুতেই প্রবেশপথ উন্মুক্ত করতে পারল না। মহাকাশযানের মূল সিস্টেমকে পাশ কাটিয়ে তাকে জরুরি কিছু পদক্ষেপ নিতে হল। প্রবেশপথের কিছু অংশ লেজার দিয়ে কেটে শেষ পর্যন্ত তাকে ভিতরে প্রবেশ করতে হল, যার অর্থ ভিতরে কোনো জীবিত মানুষ নেই। নিশি গোলাকার প্রবেশপথ দিয়ে ভেসে ভেসে মূল নিয়ন্ত্রণকক্ষের দিকে যেতে থাকে। রুহানের অনুমান সত্যি, মহাকাশযানটি তার অক্ষে ঘুরছে না, ভিতরে কৃত্রিম মহাকর্ষ নেই। নিশি ভেসে ভেসে করিডোর ধরে যেতে যেতে আবিষ্কার করে, ভিতরে তুলকালাম কিছু কাণ্ড ঘটে গেছে। মহাকাশযানের পুরোটি বিধ্বস্ত হয়ে আছে, জায়গায় জায়গায় বিস্ফোরণের চিহ্ন, আগুনে পোড়া কালো যন্ত্রপাতি ইতস্তত ভাসছে। দেয়ালে ফাটল, বাতাসের চাপ অনিয়মিত। নিয়ন্ত্রণকক্ষের কাছাকাছি পৌঁছে সে একাধিক মৃতদেহকে ভেসে বেড়াতে দেখল, সেগুলিতে ভয়ানক আঘাতের চিহ্ন, দেখে মনে হয়, এই মহাকাশযানে কোনো বড় ধরনের সংঘর্ষ হয়েছে। নিশি সাবধানে তার পায়ের সাথে বাঁধা স্বয়ংক্রিয় এটমিক ব্লাস্টারটি তুলে নিল, ভিতরে হঠাৎ করে কেউ আক্রমণ করতে চাইলে তাকে প্রতিহত করতে হবে।

AMARBOI.COM

নিয়ন্ত্রণকক্ষ থেকে বের হয়ে নিশি বড় করিডোরটি ধরে ভাসতে ভাসতে মহাকাশযানের দলপতির ঘরটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে থাকে। ঘরটির দরজা বন্ধ ছিল, হাত দিয়ে স্পর্শ করতেই খুলে গেল। ভিতরে আবছা অন্ধকার, তার মাঝে নিশির মনে হল দেয়ালের কাছে কোনো একজন মানুষ ঝুলে আছে। নিশি পায়ে ধাক্কা দিয়ে কাছে গিয়ে অবাক হয়ে দেখল একজন মানুষ নিজেকে দেয়ালের সাথে বেঁধে ঝুলে রয়েছে, মানুষটি এখনো জীবিত। নিশি চমকে উঠে বলল, "কে? কে ওখানে?"

মানুষটি জ্বলজ্বলে চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার এই মহাকাশযানে তোমাকে শুভ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।"

নিশি দেয়াল ধরে নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কে? এখানে কী হয়েছে?"

"আমার নাম জুক। ক্যাপ্টেন জুক। আমি এই মহাকাশযানের ক্যাপ্টেন। এখানে একটা বিদ্রোহ হয়েছে। সেনা বিদ্রোহ।"

"সেনা বিদ্রোহ?"

"হ্যাঁ। বিদ্রোহটা দমন করা হয়েছে, কিন্তু শেষরক্ষা করা যায় নি। বিদ্রোহী মহাকাশচারীরা মারা গেছে। আমি এখনো বেঁচে আছি, কিন্তু অচিরেই মারা যাব।"

"কেন?"

"ক্ষতগুলি দূষিত হয়ে গেছে। সারা শরীরে পচন শুরু হয়েছে।"

তোমাকে আমি স্কাউটশিপে করে নিয়ে যেতে পারি। আমাদের মহাকাশযানে তোমাকে চিকিৎসা করব। প্রয়োজন হলে শীতলঘরে করে তোমাকে পৃথিবীতে নিয়ে যাব।"

ক্যাপ্টেন জুক বিচিত্র একটা ভঙ্গিতে হাসার চেষ্টা করে বলল, "তার সুযোগ হবে না। আমার সময় শেষ হয়ে আসছে।"

নিশি আরো একটু এগিয়ে গেল, ক্যাপ্টেন জুকের সময় সত্যি শেষ হয়ে আসছে। কৃত্রিম জীবনধারণ একাধিক জ্যাকেট তাকে কোনোভাবে বাঁচিয়ে রেখেছে। মাথার ভিতর থেকে কিছু তার বের হয়ে এসেছে, শরীরের নানা জায়গায় নানা ধরনের যন্ত্র এবং নানা আকারের টিউব বিভিন্ন ধরনের তরল পাঠাচ্ছে এবং বের করে আনছে। ক্যাপ্টেন জুক তার শীর্ণ দুই হাতে কিছু একটা শক্ত করে ধরে রেখেছে। ভিতরে আবছা অন্ধকার, জিনিসটি কী ভালো করে দেখতে গিয়ে নিশি চমকে উঠল, এটি একটি স্টান্টগান।

নিশি নিজেকে রক্ষা করার জন্যে এটমিক ব্লাস্টারটা তুলে নেয়ার আগেই ক্যাপ্টেন জুক স্টান্টগান দিয়ে তাকে গুলি করল। পাঁজরে তীক্ষ্ণ একটি ব্যথা অনুভব করল নিশি, স্টান্টগানের ক্যাপসুল থেকে জৈব রসায়ন ছড়িয়ে পড়ছে তার শরীরে, নিশি হঠাৎ করে সমস্ত শরীরে এক ধরনের খিঁচুনি অনুভব করে। জ্ঞান হারানোর আগের মুহূর্তে সে দেখতে পেল ক্যাপ্টেন জুক হাত বাড়িয়ে তার ভাসমান দেহটিকে আঁকড়ে ধরে ফিসফিস করে বলছে—"এস বন্ধু! আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।"

নিশির জ্ঞান হল লিয়ারার গলার স্বরে, পিঠে ঝুলিয়ে রাখা যোগাযোগ মডিউল থেকে তাকে সে ডাকছে। জ্ঞান হওয়ার পরেও নিশি ঠিক বুঝতে পারল না সে কোথায়, মনে হল সে একটি ঘোরের মাঝে আছে, ভাইরাল জ্বরে আক্রান্ত মানুষের মতো তার চিন্তা বারবার জট পাকিয়ে যেতে থাকে। কষ্ট করে সে চোখ খুলে তাকাল, তার আশপাশে অনেক কিছু ভাসছে, ঘরে একটা কটু গন্ধ, নিশির মনে হয় সে বুঝি আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। অনেক কষ্ট করে নিজেকে সে জাগিয়ে রেখে মাথা ঘুরিয়ে ক্যাপ্টেন জুকের দিকে তাকাতে গিয়ে হঠাৎ মাথায় তীক্ষ্ণ একটি যন্ত্রণা অনুভব করে, চোখের সামনে লাল একটা পর্দা ভেসে আসে, মাথার ভিতরে কিছু একটা দপদপ করতে থাকে। নিশি মাথায় স্পর্শ করতেই চমকে উঠল, তার মাথার মাঝে জমাট বাঁধা রক্ত, সেখান থেকে সরু একটা নমনীয় টিউব বের হয়ে আসছে। নিশি চমকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করে, তাল সামলাতে না পেরে সে মহাকর্ষহীন পরিবেশে বারকয়েক ঘুরে যায়, দেয়াল ধরে কোনোমতে সামলে নিল নিশি। মাথা ঘুরিয়ে দেয়ালের পাশে বেঁধে রাখা ক্যাপ্টেন জুকের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল মানুষটি মৃত। তার মাথায় একটি হেলমেট পরানো, সেখান থেকে কিছু তার দেয়ালে লাগানো একটি যন্ত্রে গিয়েছে, যন্ত্রটি অপরিচিত, সে আগে কখনো দেখে নি। নিশি কাছে গিয়ে দেখল সেটি এখনো গুঞ্জন করে যাচ্ছে।

নিশি হঠাৎ আবার মাথায় তীব্র এক ধরনের যন্ত্রণা অনুভব করে, মাথার ভিতরে কিছু একটা দপদপ করতে থাকে, চোখের সামনে বিচিত্র সব রং খেলা করতে থাকে। যোগাযোগ মডিউলে আবার সে লিয়ারার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, "কী হয়েছে নিশি?"

নিশি কাতর গলায় বলল, "বুঝতে পারছি না। আমার মাথায় একটা টিউব ঢোকানো হয়েছে, মনে হয় কোনো একটা তথ্য পাঠানো হচ্ছে।"

"কী বলছ তুমি?"

"ঠিকই বলছি। আমার মস্তিষ্কে কিছু একটা হচ্ছে। আমি বিচিত্র সব জিনিস দেখছি, নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছি না।"

"তুমি কোনো চিন্তা কোরো না নিশি, আমি রুহানের সাথে কথা বলে কিছু একটা ব্যবস্থা করছি।"

নিশি ক্লান্ত গলায় বলল, "হ্যাঁ দেখ কিছু করতে পার কি না।"

নিশি চোখ বন্ধ করে আবার জ্ঞান হারাল, তার মনে হতে লাগল মস্তিষ্কের ভিতর অসংখ্য প্রাণী কিলবিল করছে।

মহাকাশযান থেকে তার মস্তিষ্কের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে যখন তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হল তখন সে বিড়বিড় করে কিছু একটা কথা বলছিল, মনে হল সে অদৃশ্য কোনো মানুষের সাথে কথা বলছে, কী বলছে ঠিক বোঝা গেল না, শুধুমাত্র ক্যাপ্টেন জুক–এর নামটা কয়েকবার শোনা গেল।

* * * * * *

নিশির মস্তিষ্কে কয়েকটা ছোটখাটো অস্ত্রোপচার করে তাকে শেষ পর্যন্ত আবার সুস্থ করে তোলা হয়েছে। শারীরিক দিক দিয়ে তার কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু মানসিকভাবে তাকে সব সময়েই খানিকটা বিপর্যস্ত দেখায়। লিয়ারা একদিন জিজ্ঞেস করল, "নিশি, তোমার কী হয়েছে? তোমাকে সব সময় এত চিন্তিত দেখায় কেন?"

নিশি জোর করে একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, "আমি ব্যাপারটা ঠিক তোমাকে বোঝাতে পারব না, কিন্তু সব সময় মনে হয় আমি আসলে এক জন মানুষ নই, আমার ভিতরে আরো এক জন মানুষ আছে।"

"আরো এক জন মানুষ? কী বলছ?"

"হ্যাঁ।"

"তোমার পুরো শরীর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে, বলা যেতে পারে তোমার মস্তিষ্কের একটা একটা নিউরন পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে—"

"হ্যাঁ, কিন্তু সেই নিউরনে কী তথ্য রয়েছে সেটা তো পরীক্ষা করে দেখা হয় নি। আমার ধারণা—"

"তোমার ধারণা?"

"বিধ্বস্ত মহাকাশযানটাতে ক্যাপ্টেন জুক তার স্মৃতিটা জোর করে আমার মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দিয়েছে।"

লিয়ারা শান্ত গলায় বলল, "তুমি সেটা আগেও বলেছ নিশি, কিন্তু তুমি তো জান সেটি ঠিকভাবে করার মতো যন্ত্র পৃথিবীতে নেই। একজন মানুষের পূর্ণাঙ্গ স্মৃতি রাখার মতো কোনো মেমোরি মডিউল নেই।"

"ক্যাপ্টেন জুকের মহাকাশযানে একটা অপরিচিত যন্ত্র ছিল, হয়তো সেটাই মানুষের মস্তিষ্ক থেকে মস্তিষ্কে স্মৃতি স্থানান্তর করে।"

"সেটি তোমার একটি অনুমান মাত্র।"

"কিন্তু আমার ধারণা আমার এই অনুমান সত্যি।"

লিয়ারা ভয় পাওয়া চোখে বলল, "তুমি কেন এই কথা বলছ?"

"আমি বুঝতে পারি।"

"বুঝতে পার?"

"হ্যাঁ, মাঝে মাঝে মনে হয় ক্যাপ্টেন জুক মস্তিষ্কের ভিতরে আমার সাথে কথা বলে।"

"কথা বলে?" লিয়ারা অবাক হয়ে বলল, "কী বলে?"

"সে বের হয়ে আসতে চায়।"

"কেমন করে বের হয়ে আসতে চায়?"

নিশি বিষণ্ণ মুখে মাথা নাড়ল, বলল, "আমি জানি না।"

লিয়ারা শঙ্কিত দৃষ্টিতে নিশির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

AMARBOI.COM

নিশির মস্তিষ্কে যে ক্যাপ্টেন জুক রয়েছে এবং সে যে বের হয়ে আসতে চায় সেই কথাটির প্রকৃত অর্থ কী সেটা তার পরদিনই প্রকাশ পেল। নিয়ন্ত্রণকক্ষে নিশি আর লিয়ারা মিলে মূল সিস্টেমের একটা ক্রটি সারাতে সারাতে হালকা কথাবার্তা বলছিল। সূক্ষ্ম একটি তার নির্দিষ্ট জায়গায় বসানোর জন্যে লিয়ারা নিশ্বাস বন্ধ করে রেখে কাজটি সেরে একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বলল, "মানুষের ডিজাইনটি ঠিক নয়।"

নিশি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে লিয়ারার দিকে তাকিয়ে বলল, "কেন ঠিক নয়?"

"এই যেমন মনে কর নিশ্বাস নেয়ার ব্যাপারটা। প্রায় প্রতি সেকেন্ডে আমাদের একবার নিশ্বাস নিতে হয়। কী ভয়ানক ব্যাপার!"

নিশি হেসে বলল, "তুমি নিশ্বাস নিতে চাও না?"

"আমি চাই কি না চাই সেটা কথা নয়, বেঁচে থাকতে হলে আমাকে নিশ্বাস নিতেই হবে, আমার সেখানেই আপত্তি।"

লিয়ারার কথার ভঙ্গিতে নিশি শব্দ করে হেসে ফেলল, বলল, "তোমার আর কিসে কিসে আপত্তি বল দেখি!"

লিয়ারা মুখ শক্ত করে বলল, "তুমি আমার কথার সাথে একমত হবে না?"

নিশি কিছু একটা বলার জন্যে লিয়ারার দিকে তাকাল, কিন্তু কিছু না বলে বিচিত্র এক ধরনের শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ সে তার মেরুদণ্ড সোজা করে শক্ত হয়ে বসল। লিয়ারা অবাক হয়ে দেখল নিশির চেহারা কেমন যেন পাল্টে গেছে, তার চোখেমুখে হাসিখুশির ভাবটি নেই, সেখানে কেমন যেন অপরিচিত কঠোর একটি ভাব চলে এসেছে। লিয়ারা শঙ্কিত গলায় বলল, "নিশি, কী হয়েছে তোমার?"

নিশি খুব ধীরে ধীরে লিয়ারার দিকে তাকাল, তার দৃষ্টি কঠোর। সে কঠিন গলায় বলল, "আমি নিশি নই।"

"তুমি কে?"

"আমি জুক। ক্যাপ্টেন জুক।"

"জুক?"

"হ্যাঁ। শেষ পর্যন্ত আমি বের হয়েছি।" নিশি তার হাত চোখের সামনে তুলে ধরে বলল, "আমার হাত।" শরীরে হাত বুলিয়ে বলল, "আমার শরীর!"

লিয়ারা ভয় পাওয়া গলায় বলল, "নিশি! নিশি—তোমার কী হয়েছে নিশি?"

নিশি ক্রুদ্ধ চোখে লিয়ারার দিকে তাকিয়ে হিংস্র গলায় বলল, "আমি নিশি নই।"

লিয়ারা ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়াল, সাথে সাথে নিশিও উঠে দাঁড়িয়ে খপ করে লিয়ারার হাত ধরে ফেলে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কে?"

লিয়ারা কাতর গলায় বলল, "নিশি! তুমি আমাকে চিনতে পারছ না?"

"না।" নিশি বিচিত্র ভঙ্গিতে হেসে বলল, "কিন্তু চিনতে কতক্ষণ? এস। আমার কাছে এস।"

লিয়ারা প্রাণপণ চেষ্টা করে নিজেকে মুক্ত করে ছিটকে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। লিয়ারার কাছে খবর পেয়ে কিছুক্ষণের মাঝেই রুহান এবং অন্যেরা এসে আবিষ্কার করল নিশি দুই হাতে তার মাথা ধরে টেবিলে মাথা রেখে শুয়ে আছে। রুহান নিশির কাছে গিয়ে ডাকল, "নিশি।"

নিশি সাথে সাথে মাথা তুলে তাকাল। বলল, "কী হল রুহান?"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তোমার কী হয়েছিল?"

"আমার? আমার কী হবে?"

"তুমি নিজেকে ক্যাপ্টেন জুক বলে দাবি করছিলে কেন?"

মুহূর্তে নিশির মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। রক্তশূন্য মুখে বলল, "করেছিলাম নাকি?"

লিয়ারা কাছে এসে নিশির হাত স্পর্শ করে বলল, "হ্যাঁ, নিশি করেছিলে।"

নিশি দুই হাতে নিজের চুল খামচে ধরে বলল, "আমি জানতাম! আমি জানতাম!"

"কী জানতে?"

"আমার মাঝে সেই শয়তানটা ঢুকে গেছে। এখন সে বের হতে শুরু করেছে! কী হবে এখন?"

রুহান নিশির কাঁধ ধরে একটা ছোট ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "তুমি শুধু শুধু ঘাবড়ে যাচ্ছ নিশি। মহাকাশযানের ডাটাবেসে অন্তত এক ডজন মনোবিজ্ঞানী আছে! এখানকার চিকিৎসকদের নিয়ে তারা কয়েকদিনে তোমার সমস্যা সারিয়ে তুলবে।"

নিশি অবশ্যি কয়েকদিনে সেরে উঠল না, দ্বিতীয়বার তার ভিতর থেকে ক্যাপ্টেন জুক বের হয়ে এল তিন দিন পর। নিশি ব্যাপারটা টের পেল পরদিন ভোরবেলা, নিজেকে হঠাৎ করে আবিষ্কার করল মহাকাশযানের ডকিং বে'তে। রাতের পোশাক পরে সে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে, এখানে কেন এসেছে, কীভাবে এসেছে সে জানে না। নিশি শীতে কাঁপতে কাঁপতে নিজের ঘরে ফিরে এসে আবিষ্কার করল তার পুরো ঘর লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে। মনে হয় কেউ একজন ইচ্ছে করে সেটি তছনছ করে রেখেছে, মানুষটি কে হতে পারে বুঝতে তার দেরি হল না। মাথার কাছে ভিডি সেন্টারে কেউ একজন তার জন্যে একটা ভিডিও ক্লিপ রেখে গেছে।

ভিডি সেন্টার স্পর্শ করতেই ঘরের মাঝামাঝি তার নিজের চেহারা ফুটে উঠল—সে নিজেই তার জন্যে কোনো একটা তথ্য রেখে গেছে! নিশি অবাক হয়ে তার নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে রইল। মানুষটি সে নিজে কিন্তু তবু সে জানে মানুষটি অন্য কেউ। নিশি অবাক হয়ে তার নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে রইল, চোখের দৃষ্টি ক্রূর, মুখের ভঙ্গিতে একই সাথে বিদ্বেষ, ঘৃণা এবং অবজ্ঞা। হাত তুলে এই মানুষটি হিংস্র গলায় বলল, "তুমি নিশ্চয়ই নিশি—আমি তোমাকে কয়টা কথা বলতে চাই।"

মানুষটি নিজের দেহকে দেখিয়ে দিয়ে বলল, "এই যে শরীরটা দেখছ এটা আমার শরীর। আমার। তুমি যদি ভেবে থাক তুমি জন্ম থেকে এই শরীরটাকে ব্যবহার করে এসেছ বলে এটি তোমার, তাহলে জেনে রাখ—এটা সত্যি নয়। এটা ভুল। এটা মিথ্যা। তুমি স্বীকার কর আর নাই কর আমি এই দেহের মাঝে প্রবেশ করেছি। আমি খুব খুঁতখুঁতে মানুষ, আমার ব্যক্তিগত জিনিস অন্যের সাথে ভাগাভাগি করতে ভালো লাগে না। তাই তুমি এই শরীর থেকে দূর হয়ে যাও।"

মানুষটি হঠাৎ ষড়যন্ত্রীদের মতো গলা নিচু করে বলল, "তুমি যদি নিজে থেকে এই শরীর ছেড়ে না যাও আমি তোমাকে এখান থেকে দূর করব। আমার নাম ক্যাপ্টেন জুক, আমার অসাধ্য কিছু নেই।"

ভিডি সেন্টারটি অন্ধকার হয়ে যাবার পরও নিশি হতচকিত হয়ে বসে রইল, পুরো ব্যাপারটি তার কাছে একটি ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়। নিশি তার সমস্ত শরীরে এক ধরনের অবসাদ অনুভব করে। তার চোখ রক্তবর্ণ, শরীরের নানা জায়গায় চাপা যন্ত্রণা, ক্যাপ্টেন জুক নামের এই মানুষটি সারারাত তাকে নিদ্রাহীন রেখে শরীরের ওপর কী কী অত্যাচার করেছে কে জানে!

তৃতীয়বার ক্যাপ্টেন জুকের আবির্ভাব হল আরো তাড়াতাড়ি এবং সে নিশির শরীরে অবস্থান করল আরো দীর্ঘ সময়ের জন্যে। মহাকাশযানের সবাই তাকে এবার একটা বিচিত্র বিতৃষ্ণা নিয়ে লক্ষ করল। নিশি নামক যে মানুষটার সাথে মহাকাশযানের প্রায় সবার এক ধরনের আন্তরিক হৃদ্যতা রয়েছে তার মাঝে প্রায় দানবীয় একটা চরিত্রকে আবিষ্কার করে সবাই আতংকে শিউরে উঠল। নিশির দেহের মাঝে অবস্থান করা ক্যাপ্টেন জুক মহাকাশযানের নিয়ন্ত্রণকক্ষে গিয়ে মহাকাশযানের অস্ত্র সরবরাহ কেন্দ্রটি খোলার চেষ্টা করল। খবর পেয়ে রুহান তাকে থামাতে এল, বলল, "তুমি এটা করতে পারবে না নিশি।"

নিশির দেহে অবস্থান করা মানুষটি চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "তুমি খুব ভালো করে জান আমি নিশি নই। আমি একটি মহাকাশযানের সর্বাধিনায়ক। আমি ক্যাপ্টেন জুক। আমার অস্ত্র সরবরাহ কেন্দ্র খোলার অধিকার আছে।"

রুহান বলল, "একজন মানুষের পরিচয় তার দেহ দিয়ে। তোমার দেহটি নিশির, কাজেই তার মস্তিষ্কে এই মুহূর্তে যে-ই থাকুক না কেন, মহাকাশযানের হিসেবে তুমি হচ্ছ নিশি। মহাকাশযানের ডাটাবেসে ক্যাপ্টেন জুক বলে কেউ নেই। আমি তাকে চিনি না।"

"না চিনলে এখন চিনে নাও। এই যে আমি—ক্যাপ্টেন জুক।"

"তুমি যদি এই মুহূর্তে এখান থেকে বের হয়ে নিজের ঘরে না যাও আমি তোমাকে নিরাপত্তাকর্মী দিয়ে গ্রেপ্তার করিয়ে নিয়ে যাব।"

ক্যাপ্টেন জুক হা হা করে হেসে বলল, "তোমার বিশ্বস্ত সহকর্মীকে তুমি গ্রেপ্তার করবে? মহাকাশযানের আইন কি তোমাকে সেই অধিকার দিয়েছে?"

রুহান তীব্র দৃষ্টিতে ক্যাপ্টেন জুকের দিকে তাকিয়ে রইল, কিছু বলল না।

নিশি দুই দিন পর নিজেকে আবিষ্কার করল মহাকাশযানের এক পরিত্যক্ত ঘরে। তার সারা শরীর দুর্বল এবং অবসাদগ্রস্ত, চোখ লাল, মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা, নিশির মনে হয় মাথার ভিতরে কিছু একটা ছিঁড়ে পড়ে যাবে। সে কোনোভাবে উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে নিজের ঘরে ফিরে যেতে থাকে। বড় করিডোরে তার লিয়ারার সাথে দেখা হল, সে অবাক হয়ে বলল, "তুমি কে? নিশি নাকি ক্যাপ্টেন জুক?"

"নিশি।"

লিয়ারা এসে তার হাত ধরে কোমল গলায় বলল, "তোমার এ কী চেহারা হয়েছে নিশি?"

নিশি দুর্বলভাবে বলল, "জানি না লিয়ারা। ক্যাপ্টেন জুক আমাকে শেষ করে দিচ্ছে।"

"কী চায় সে?"

"আমার শরীরটা। আমাকে সরিয়ে দিয়ে সে আমার শরীরটাকে ব্যবহার করবে।"

লিয়ারা ভয়ার্ত চোখে নিশির দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমাকে আমরা কীভাবে সাহায্য করব?"

"জানি না।" নিশি মাথা নেড়ে বলল, "মনে হয় আমাকে সাহায্য করার সময় পার হয়ে গেছে লিয়ারা। আমাকে আর কেউ সাহায্য করতে পারবে না।"

লিয়ারা নরম গলায় বলল, "এরকম কথা বোলো না নিশি। নিশ্চয়ই আমরা কিছু একটা ভেবে বের করব। চল, আমি তোমাকে তোমার ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

"ধন্যবাদ লিয়ারা।"

AMARBOI.COM

নিজের ঘরে নিশির জন্যে আরো বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। তার টেবিলের উপর একটা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র এবং ভিডি সেন্টারে আরো একটা ভিডিও ক্লিপ। সেখানে কী থাকতে পারে নিশির অনুমান করতে কোনো সমস্যা হল না। ভিডি সেন্টারটি চালু করতে তার ইচ্ছে করছিল না, কিন্তু না করে কোনো উপায় ছিল না।

এবারের ভিডিও ক্লিপটি ছিল আগেরবারের থেকেও উদ্ধত। মানুষটি তীব্র স্বরে চিৎকার করে বলল, "আহাম্মক! এখনো আমার কথা বিশ্বাস করলে না? আমি এই শরীরটাকে নিজের জন্যে চাই। পুরোপুরি চাই।"

ক্যাপ্টেন জুক দীর্ঘ একটা নিশ্বাস নিয়ে হিংস্র গলায় বলল, "নির্বোধ কোথাকার। তুমি দেখেছ আমি বারবার ফিরে আসছি? প্রত্যেকবার আসছি আগেরবার থেকে তাড়াতাড়ি, কিন্তু থাকছি বেশি সময়ের জন্যে। এর পরেরবার আমি আসব আরো আগে, থাকব আরো বেশি সময়। এমনি করে আস্তে আস্তে এমন একটা সময় আসবে যখন আমি থাকব পুরো সময় আর তুমি একেবারেই থাকবে না। শরীরটা হবে আমার। পুরোপুরি আমার।"

নিশি অবাক হয়ে দেখল তার শরীরের মাঝে মানুষটা হা হা করে হাসতে শুরু করেছে। হাসতে হাসতে সে অস্ত্রটা দেখিয়ে বলল, "দেখেছ আমি একটা অস্ত্র যোগাড় করেছি? কী করব এই অস্ত্র দিয়ে শুনতে চাও? আমার মহাকাশযানে কী ঘটেছিল মনে আছে—এখানেও তাই হবে। তবে এখানে কোনো ভুল হবে না। তুমি কী ভাবছ নিশি? এই অস্ত্র তুমি ফিরিয়ে দেবে? তোমাকে বলি আমি শুনে রাখ, আমার কাছে আরো অস্ত্র আছে, আমি লুকিয়ে রেখেছি এই মহাকাশযানে। যখন সময় হবে বের করে আনব।"

নিশি কোনোভাবে টেবিলটা ধরে হতবাক হয়ে ভিডি স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে রইল।

পরবর্তী দুদিন নিশির অবস্থা খুব খারাপ হয়ে রইল। মহাকাশযানের চিকিৎসা কেন্দ্রে তার শরীরের মাঝে কিছু বিচিত্র ধরনের বিষাক্ত জিনিস আবিষ্কার করা হল। তার নিদ্রাহীন বিশ্রামহীন দেহ পরিপূর্ণভাবে ভেঙে পড়ার পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। নিশিকে চিকিৎসা কেন্দ্রে শুয়ে শুয়ে বিশ্রাম নিতে হল দুই দিন। বিশ্রাম নিয়ে শরীরটি যখন মোটামুটিভাবে সুস্থ হয়ে এল তখন ক্যাপ্টেন জুক ফিরে এল আবার, এবারে আগের চাইতেও তীব্রভাবে, আগের চাইতেও নৃশংসভাবে।

ক্যাপ্টেন জুক এবারে নিশির দেহ নিয়ে ফিরে গেল অস্ত্রাগারে। নিজেকে অস্ত্র দিয়ে সজ্জিত করে নিশি লিয়ারাকে জিম্মি করে নিয়ন্ত্রণ দখল করে নিল খুব সহজে। সে নির্বিচারে অস্ত্র ব্যবহার করতে প্রস্তুত, কিন্তু কেউ তাকে স্পর্শ করবে না সেটি সে খুব ভালো করে জানে। নিয়ন্ত্রণকক্ষের সবরকম প্রবেশপথ বন্ধ করে সে মহাকাশযানের গতিপথ পাল্টানোর চেষ্টা করল, কাছাকাছি মহাকাশযানের সাথে যোগাযোগ করে তাদের সাথে সংঘর্ষ ঘটানোর জন্যে ডাটাবেসে বিচিত্র সব তথ্য প্রবেশ করতে শুরু করল।

নিশি অবশ্য তার কিছুই জানল না। যখন সে জ্ঞান ফিরে পেল, সে নিজেকে আবিষ্কার করল নিয়ন্ত্রণকক্ষের গদিআঁটা নরম চেয়ারে। তার সামনেই আরেকটা চেয়ারে লিয়ারা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। নিশি অবাক হয়ে বলল, "তোমার কী হয়েছে লিয়ারা?"

লিয়ারা দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে বলল, "তোমার সেটা জেনে কোনো লাভ নেই নিশি। তুমি বরং এসে আমাকে খুলে দাও।"

নিশি উঠে দাঁড়াতেই তার মাথা হঠাৎ ঘুরে উঠল, কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে টলতে টলতে সে লিয়ারার কাছে এগিয়ে যায়। তার সারা শরীরে এক বিচিত্র অসুস্থ অনুভূতি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে হয় এক্ষুনি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবে। নিশি বড় বড় নিশ্বাস নিতে নিতে বলল, "কী হয়েছিল এখানে লিয়ারা?"

"ভিডি স্ক্রিনে তোমার জন্যে কিছু তথ্য রেখে গেছে ক্যাপ্টেন জুক।"

নিশি টলতে টলতে ভিডি স্ক্রিনটা স্পর্শ করতেই সেখানে নিজেকে দেখতে পেল ভয়ংকর খ্যাপা একটা মানুষ হিসেবে। তীব্র স্বরে হিসহিস করে বলল, "আবার আমি ফিরে গেলাম নির্বোধ আহাম্মক। তবে জেনে রাখ, এর পরেরবার যখন ফিরে আসব আমি আর ফিরে যাব না। তোমার জীবন শেষ হয়ে এসেছে নিশি। জীবনের শেষ কয়টা দিন যদি পার উপভোগ করে নাও। তবে আমি সতর্ক করে দিচ্ছি সেটি খুব সহজ হবে না। আমি তোমার শিরায় শিরায় নিহিলা বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছি—তুমি মারা যাবে না, কিন্তু প্রচণ্ড যন্ত্রণায় তোমার সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলী কুঁকড়ে কুঁকড়ে উঠবে, মনে হবে তোমার ধমনী দিয়ে গলিত সীসা বয়ে যাচ্ছে। মহাকাশযানের সব চিকিৎসক মিলে যখন তোমাকে সুস্থ করে তুলবে তখন আমি ফিরে আসব সেই সুস্থ দেহে।"

নিশি বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দেখল মানুষটা হা হা করে হাসতে শুরু করেছে খ্যাপার মতো। সে হঠাৎ নিজে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিচে পড়ে যাচ্ছিল, লিয়ারা জাপটে ধরে তাকে দাঁড়া করিয়ে রাখল। কাতর গলায় ডাকল, "নিশি, নিশি।"

"বল লিয়ারা।"

"কী হবে এখন নিশি।"

নিশি দুর্বলভাবে হেসে বলল, "আমি ক্যাপ্টেন জুককে হত্যা করব লিয়ারা।"

"হত্যা করবে? ক্যাপ্টেন জুককে?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু তুমি আর ক্যাপ্টেন জুক তো একই মানুষ।"

"তাতে কিছু আসে যায় না লিয়ারা। তবু আমি তাকে হত্যা করব। এন্ড্রোমিডার কসম।"

AMARBOI.COM

* * * * * *

চোখ খুলে তাকাল ক্যাপ্টেন জুক, আবার ফিরে এসেছে সে নিশির শরীরে। এবারে আর কেউ তাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না, এখন থেকে নিশির শরীরটি পুরোপুরি তার। কীভাবে অন্যের দেহে অনুপ্রবেশ করে তাকে দখল করতে হয় সেটা সে খুব ভালো করে জানে। কতবার করেছে সে! এক দেহ থেকে অন্য দেহে, সেখান থেকে আবার অন্য দেহে। জরাজীর্ণ দুর্বল বৃদ্ধের দেহ থেকে সুস্থ-সবল কোনো যুবকের দেহে। ক্যাপ্টেন জুক উঠতে গিয়ে হঠাৎ করে আবিষ্কার করল তার হাতপা বিছানার সাথে হাতকড়া দিয়ে বাঁধা। চমকে উঠে হ্যাঁচকা টান দিতেই টেবিলের হলোগ্রাফিক ভিডি স্ক্রিন চালু হয়ে উঠল। নিশির একটি পূর্ণাঙ্গ ত্রিমাত্রিক অবয়ব দেখতে পেল ক্যাপ্টেন জুক। শুনতে পেল নিশি মাথা ঝুঁকিয়ে বলছে, "শুভ সকাল ক্যাপ্টেন জুক। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ আমি নিশি। আমার জন্যে অনেকবার তুমি ভিডি স্ক্রিনে তথ্য রেখেছ এবারে আমি রাখছি। একটা দেহ যখন দুজন মানুষ ব্যবহার করে তখন কথা বলার আর অন্য উপায় কী?

"ক্যাপ্টেন জুক, তুমি সম্ভবত তোমার হাতপায়ের বাঁধনকে টানাটানি করেছ, ভিতরে মাইক্রোসুইচ ছিল, সেটা এই ভিডি স্ক্রিনকে চালু করেছে। আমি সেভাবেই এটা প্রস্তুত করেছি। তুমি জেগে ওঠার পর আমি তোমার সাথে কথা বলব। হাতকড়াগুলি টেনে খুব লাভ হবে না। স্টেনলেস স্টিলে শতকরা পাঁচ ভাগ জিরকলাইট দিয়ে এটাকে বাড়াবাড়ি শক্ত

করা হয়েছে। মানুষ যদি টাইরানোসোরাস রেক্সকে বেঁধে রাখতে চাইত সম্ভবত এই ধরনের কিছু ব্যবহার করত! কাজেই টানাটানি করে তুমি এটা খুলতে পারবে না। শুধু শুধু চেষ্টা করে লাভ নেই, আমি চাই তুমি আমার কথা মন দিয়ে শোন।

"ক্যাপ্টেন জুক, আমি তোমাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যদি আমার তৈরি করা যন্ত্রপাতি ঠিক ঠিক কাজ করে থাকে তাহলে এই মুহূর্তে উপরের দেয়াল থেকে একটা বিশাল পেণ্ডুলাম দুলতে শুরু করবে। দোলনকালটা আমি হিসেব করেছি, এটা হবে পাঁচ সেকেন্ড, তার বেশিও না, কমও না।"

নিশি কথা বলা বন্ধ করল এবং সাথে সাথে ক্যাপ্টেন জুক আবিষ্কার করল সত্যি সত্যি তার গলার উপর দিয়ে বিশাল একটা পেন্ডুলাম বাম দিক থেকে ডান দিকে ঝুলে গেল। ডান দিকে শেষ প্রান্তে পৌঁছে আবার সেটা দুলে এল বাম দিকে। তারপর আবার ডান দিকে।

নিশি ভিডি স্ক্রিনে আবার কথা বলতে শুরু করে, "দোলনকালটা অনেক চিন্তাভাবনা করে পাঁচ সেকেন্ড দাঁড়া করিয়েছি। আমার ধারণা, মানুষের স্নায়ুতে চাপ ফেলার জন্যে পাঁচ সেকেন্ড যথাযথ সময়। কী হচ্ছে সেটা বোঝার জন্যে যথেষ্ট আবার অপেক্ষা করার জন্যে খুব বেশি দীর্ঘ নয়। একটা পেন্ডুলাম তোমার গলার উপর দিয়ে দুলে যাবে সেটি কেন তোমার স্নায়ুতে চাপ ফেলবে তুমি নিশ্চয়ই সেটা ভেবে অবাক হচ্ছ। অবাক হবার কিছু নেই, তুমি পেন্ডুলামটির নিচে ভালো করে তাকাও। একটা ধারালো ব্লেড দেখেছ ক্যাপ্টেন জুক? স্টেনলেস স্টিলের পাতলা একটা ব্লেড। শক্ত কিছু কাটতে পারবে না—কিন্তু মানুষের টিস্যু, চামড়া, ধমনী কেটে ফেলবে সহজেই। আমি তার চাইতে শক্ত কিছু কাটতেও চাই না।

"ক্যাপ্টেন জুক। তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ একটা পেন্ডুলাম যদি তোমার গলার উপর দিয়ে প্রতি পাঁচ সেকেন্ডে একবার করে দুলে আসে—হোক না সেটা যতই ধারালো—তাতে ভয় পাবার কী আছে? আমি তোমার সাথে একমত—এতে ভয় পাবার কিছু নেই। কিন্তু—"

নিশি থেমে গিয়ে সহৃদয়ভাবে হেসে বলল, "এই পেন্ডুলামটির একটা বৈশিষ্ট্য আছে, তুমি যদি খুব ভালো করে এর যান্ত্রিক কৌশলটি লক্ষ্য করে দেখে থাক তাহলে নিশ্চয়ই বুঝে গেছ পেন্ডুলামটি খুব ধীরে ধীরে নিচে নেমে আসছে। কেন এটা করেছি নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পেরেছ। আমি তোমাকে খুব ধীরে ধীরে হত্যা করতে চাই। এই ধারালো পেন্ডুলামটি তোমার গলাকে দু ভাগ করতে অনেকক্ষণ সময় নেবে—এই সারাক্ষণ সময় তুমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে। মানুষের ওপর অত্যাচার করার এর চাইতে ভালো কিছু আমি খুঁজে পেলাম না। তবে এই আইডিয়াটা আমার নিজের নয়। এডগার এলেন পো নামে একজন অত্যন্ত প্রাচীন লেখক ছিলেন, এটি তার গল্পের আইডিয়া। কী মনে হয় ক্যাপ্টেন জুক? আইডিয়াটি চমৎকার না?

"ক্যাপ্টেন জুক। আমি এখন তোমার সম্পর্কে জানি। খানিকটা খোঁজখবর নিয়েছি, খানিকটা চিন্তাভাবনা করেছি। তুমি কী যন্ত্র দিয়ে মানুষের মস্তিষ্কে ঢুকে যাও সেটাও খানিকটা বুঝতে পেরেছি। মস্তিষ্কের যে অংশ মানুষের মূল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে সেই অংশে তুমি অনুপ্রবেশ কর। নিউরন ম্যাপিং দিয়ে সেটা হয়। চমৎকার বুদ্ধি। একজন মানুষের একাধিক চরিত্র থাকতে পারে, কাজেই কোনো সমস্যা হবার কথা নয়। একবার মস্তিষ্কে অনুপ্রবেশ করার পর তুমি কীভাবে তার দেহ দখল কর সেটাও আমি বুঝতে পেরেছি। তোমার পদ্ধতিটি খুব সহজ। যতক্ষণ দেহটা তোমার দখলে থাকে তুমি তার যত্ন নাও। যখন তোমার দেহটা ছেড়ে যাবার সময় হয় তুমি দেহের মাঝে একটা যন্ত্রণা প্রবেশ করিয়ে দিয়ে যাও যেন

AMARBOI.COM

তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী এই দেহ নিয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করে। এক বার, দুই বার, বার বার এটা তুমি কর। মস্তিষ্ক তখন আর যন্ত্রণার মাঝে দিয়ে যেতে চায় না, সেটি তোমার কাছে থাকে। তুমি নিয়ন্ত্রণ কর। একটা মানুষকে তুমি চিরদিনের জন্যে শেষ করে দাও।"

নিশি অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আজ আমি এর সবকিছুর নিষ্পত্তি করব। চিরদিনের মতো। সেজন্যে আমার খানিকটা ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। সত্যি কথা বলতে কী, খানিকটা নয় অনেকটাই! আমি তোমাকে হত্যা করব, কিন্তু তোমাকে তো আলাদা করে হত্যা করা যাবে না, হত্যা করতে হবে তোমার শরীরকে। সেটা তো আমারও শরীর—সেটাকে হত্যা করলে আমিও তো থাকব না। তবু আমি অনেক ভেবেচিন্তে এই সিদ্ধান্তটা নিয়েছি। নিজে যদি না নিতাম তাহলে রুহানকে এই সিদ্ধান্তটা নিতে হত, গভীর একটা অপরাধবোধ তখন কাজ করত রুহানের মাঝে। এভাবেই ভালো।"

ভিডি স্ক্রিনে নিশি চুপ করে গিয়ে স্থির চোখে ক্যাপ্টেন জুকের দিকে তাকিয়ে রইল। ক্যাপ্টেন জুক আতঙ্কিত হয়ে তাকিয়ে আছে ঝুলন্ত পেন্ডুলামের দিকে, খুব ধীরে ধীরে সেটা ঝুলছে বাম থেকে ডানে, ডান থেকে বামে, প্রতিবার দোলনের সময় সেটা একটু করে নিচে নেমে আসছে। ধারালো তীক্ষ্ণ পেন্ডুলামটা ঝুলছে ঠিক তার গলার উপরে। তার দুই হাতপা শক্ত করে বাঁধা হাতকড়া দিয়ে, এতটুকু নড়ার উপায় নেই, কিছুক্ষণের মাঝেই দুলতে দুলতে নেমে আসবে পেন্ডুলামের ধারালো ব্লেড। প্রথমে আলতোভাবে স্পর্শ করবে তার গলার চামড়াকে, তারপর সূক্ষ্ম একটা ক্ষতচিহ্ন হবে সেখানে। সেটি গভীর থেকে গভীরতর হবে খুব ধীরে ধীরে। প্রথমে কণ্ঠনালী, তারপর মূল ধমনীগুলি কেটে ফেলবে এই ভয়ংকর পেন্ডুলাম। প্রচণ্ড আতংকে ক্যাপ্টেন জুক চিৎকার করে উঠল হঠাৎ।

সাথে সাথে নিশি নড়েচড়ে উঠল হলোগ্রাফিক স্ক্রিনে, মৃদু হেসে বলল, "আমি যদি ভুল করে না থাকি তাহলে তুমি একটা চিৎকার করেছ ক্যাপ্টেন জুক। মনে হয় আর্তচিৎকারে খুব ভয় পেয়ে সেই চিৎকার করেছ। আমি ছোট একটা সিস্টেম দাঁড়া করিয়েছি, কোনো চিৎকার শুনলে সেটা এই অংশটুকু চালু করে দেয়।

"ক্যাপ্টেন জুক। তোমাকে বলতে ভুলে গেছি, আমার এই ঘরটাকে কিন্তু পুরোপুরি শব্দনিরোধক করা হয়েছে। আমার কথা বিশ্বাস না হলে তুমি চারদিকে তাকিয়ে দেখতে পার। বাইরের কোনো শব্দ তুমি শুনবে না, এখানকার কোনো শব্দও বাইরে যাবে না। চিৎকার করে করে তোমার ভোকাল কর্ডকে ছিঁড়ে ফেললেও কেউ তোমাকে বাঁচাতে আসবে না ক্যাপ্টেন জুক। আমার কী মনে হয় জান? তোমার চিৎকার শুনতে পেলেও কেউ আসত না!

"ক্যাপ্টেন জুক! আমি যদি হিসেবে ভুল করে না থাকি তাহলে আর কয়েক সেকেন্ডের মাঝে ধারালো পেন্ডুলামটি তোমার গলার মাঝে প্রথম পোঁচটি দেবে, খুব সূক্ষ্ম একটা পোঁচ। প্রথম প্রথম হয়তো তুমি শুধু তার স্পর্শটাই অনুভব করবে। কিছুক্ষণের মাঝেই সেটা গভীর হতে শুরু করবে। আমার কী মনে হয় জান? তুমি ছটফট না করে নিশ্চল হয়ে শুয়ে থাক ক্যাপ্টেন জুক। যত তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা শেষ হবে ততই মঙ্গল। মৃত্যুটা তোমারই হোক—আমি এই ভয়ংকর মৃত্যুর মাঝে জেগে উঠতে চাই না।

"বিদায় ক্যাপ্টেন জুক। তুমি কত দিন থেকে কত জন মানুষের মাঝে বেঁচে আছ আমি জানি না। আমার ভাবতে ভালো লাগছে এটা শেষ হল। ক্যাপ্টেন জুক বলে আর কেউ কখনো থাকবে না।"

হলোগ্রাফিক ভিডি স্ক্রিনটি অন্ধকার হয়ে গেল। ক্যাপ্টেন জুক অসহায়ভাবে তাকিয়ে রইল ভয়ংকর পেন্ডুলামটির দিকে, সেটি দুলতে দুলতে নেমে আসছে নিচে। গলার চামড়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম স্তরটি কেটে ফেলেছে—আস্তে আস্তে আরো গভীর হতে শুরু করেছে। প্রথমে কাটবে কণ্ঠনালী, তারপর মূল ধমনী দুটি। ভয়ংকর আতংকে আবার চিৎকার করে উঠল ক্যাপ্টেন জুক, অমানুষিক আতংকের এক ভয়াবহ চিৎকার। বদ্ধঘরে সেই বিকট আর্তনাদ পাক খেতে থাকে, মনে হয় ছোট এই ঘরটিতে বুঝি নরক নেমে এসেছে।

হঠাৎ জেগে উঠল নিশি। রক্তে ভিজে গেছে সে, তার গলার উপর চেপে বসেছে ধারালো পেন্ডুলাম—দুলছে সেটি বাম থেকে ডানে ডান থেকে বামে। ডান হাতের কাছে সূক্ষ্ম একটা গোপন মাইক্রোসুইচ রয়েছে, সাবধানে সে স্পর্শ করল সেটি, পরপর দুবার। সাথে সাথে ঘরঘর শব্দ করে পেন্ডুলামটি উপরে উঠতে শুরু করল, ঘরের বামপাশে চারটি দরজা খুলে গেল শব্দ করে। অপেক্ষমাণ ডাক্তার, সহকারী রবোট, তাদের যন্ত্রপাতি, জরুরি জীবন ধারণ যন্ত্র, কৃত্রিম রক্ত, শ্বাসযন্ত্র অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে ছুটে এল ভিতরে। নিশ্বাস বন্ধ করে দরজার বাইরে তারা অপেক্ষা করছিল গোপন মাইক্রোসুইচে পরিচিত সংকেতের জন্যে। এক মুহূর্তে ঘরটি একটি অত্যাধুনিক জীবনরক্ষাকারী জরুরি চিকিৎসা কেন্দ্রে পালটে যায়, নিশির উপরে ঝুঁকে পড়ে সবাই, কী করতে হবে সবাই জানে, অসংখ্যবার তারা মহড়া দিয়েছে গত দুই দিন।

লিয়ারা ভীত পায়ে ঢুকল ঘরটিতে। একজন ডাক্তার সরে গিয়ে জায়গা করে দিল তাকে। লিয়ারা নিশির হাত স্পর্শ করে তার উপর ঝুঁকে পড়ল। নিশি ফিসফিস করে বলল, "আমি করেছি লিয়ারা। হত্যা করেছি ক্যাপ্টেন জুককে।"

"সত্যি?"

"সত্যি।"

"আর আসবে না সে?"

"না, লিয়ারা। আর আসবে না। আমি জানি।"

AMARBOI.COM

সিস্টেম এডিফাস

এটাকেই নিশ্চয়ই বলে ভুল সময়ে ভুল জায়গায় থাকা।

দুপুরবেলা আমাদের খানিকক্ষণের জন্যে কাজের বিরতি দেয়া হয়। আমি তখন আমার আকাশের কাছাকাছি অফিস থেকে নিচে নেমে আসি। ঠিক কী কারণ জানি না, মাটির কাছাকাছি এলেই আমার মন ভালো হয়ে যায়। পথের ধারের রবোস্ট্যান্ড থেকে প্রোটিন এবং স্টার্চের একটা জুতসই মিশ্রণের ক্যাপসুল কিনে এনে আমি সাজিয়ে রাখা ভ্রাম্যমাণ বেঞ্চগুলিতে বসে পড়ি। বেঞ্চগুলি তার প্রোগ্রাম করা পথে ঘুরে বেড়ায়, আমি চুপচাপ বসে থেকে পথেঘাটে ইতস্তত হাঁটাহাঁটি করা মানুষগুলিকে দেখি। আমার নিজেকে তখন অন্য জগতের মানুষ বলে মনে হয়, আমি কল্পনা করি আমার সামনে যেন একটি আন্তঃমহাজাগতিক জানালা খুলে গেছে এবং আমি অন্য কোনো একটি গ্যালাক্সি থেকে পৃথিবীর বিচিত্র কিছু প্রাণীকে দেখছি। বসে বসে আমার তখন মানুষের মনের ভাব অনুমান করতে খুব ভালো লাগে।

আজকেও আমি তাই করছিলাম, বেঞ্চে বসে প্রোটিন এবং স্টার্চের ক্যাপসুলটা চুষতে চুষতে মানুষগুলির মুখের দিকে তাকিয়ে তাদের মনের ভাব অনুমান করার চেষ্টা করছিলাম। বয়স্ক একজন মানুষকে দেখে মনে হল কোনো কিছু নিয়ে তার ভিতরে খুব যন্ত্রণা—কে জানে হয়তো তার সর্বশেষ স্ত্রী ধনবান কোনো এক তরুণের সাথে পালিয়ে গেছে। হাস্যোজ্জ্বল একজন তরুণীকে দেখে মনে হল হয়তো তার ভালবাসার মানুষটি আজকে তাকে ভালবাসা নিবেদন করেছে। কমবয়সী নিরাসক্ত ধরনের একজন তরুণকে দেখে মনে হল সে হয়তো নতুন কোনো একটি মাদকের সন্ধান পেয়েছে। পিছু থেকে ধীরপায়ে হেঁটে আসা মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ দেখে মনে হল তার ভিতরে এক ধরনের শান্ত সমাহিত ভাব চলে এসেছে—পৃথিবীর তুচ্ছ কোনো ব্যাপারে তার আর কোনো আকর্ষণ নেই। তার নির্লিপ্ত চেহারার মাঝে এক ধরনের ঐশ্বরিক পবিত্রতার ছাপ। মানুষটির কাছেই একজন প্রৌঢ়া রমণী, তার পোশাক এবং চেহারায় বিচিত্র এক ধরনের কৃত্রিমতা দেখে মনে হয় কোনো এক ধরনের কুটিল চিন্তায় মগ্ন।

ঠিক এই সময় আমি রনোগানের তীক্ষ্ণ শব্দ শুনতে পেলাম। টিপটিপ করে নিচু কয়েকটা শব্দ হল এবং আমি মানুষের আর্তনাদ শুনে মাথা ঘুরিয়ে দেখতে পেলাম, একটু আগে দেখা মধ্যবয়সী শান্ত সমাহিত মানুষটি তার মুখের সমস্ত পবিত্রতা অক্ষুণ্ন রেখে দুই হাতে দুটি ভয়ংকরদর্শন রনোগান নিয়ে নির্বিচারে গুলি করে যাচ্ছে। আমার সামনেই আরেকজন চিৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ছটফট করতে লাগল।

আমি হতবাক হয়ে মানুষটির দিকে তাকিয়ে রইলাম, কী করব বুঝতে পারছিলাম না। ঠিক তখন আরো কয়েকজনকে ছোটাছুটি করতে দেখলাম, আরো কিছু গোলাগুলি হল এবং হঠাৎ করে শান্ত সমাহিত চেহারার মানুষটি তার মুখের পবিত্র ভাব নিয়ে রুদ্ধশ্বাসে আমার দিকে ছুটে এল, তার আগেই কেউ একজন তাকে গুলি করল এবং আমি কিছু বোঝার আগেই মানুষটা রক্তে মাখামাখি হয়ে আমার উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

আমি নিয়মিত ছায়াছবি দেখি এবং রগরগে ত্রিমাত্রিক রহস্য ছায়াছবিতে বহুবার গুলিবিদ্ধ চরিত্র আমাদের মতো দর্শকদের উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, কিন্তু প্রকৃত এই ঘটনাটি ছায়াছবি থেকে একেবারেই ভিন্ন। গুলিবিদ্ধ মানুষটি ভয়ংকরভাবে ছটফট করতে লাগল এবং শরীরের বিভিন্ন ক্ষত থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হতে লাগল। তার হাত থেকে রনোগানটি নিচে গড়িয়ে পড়ল এবং আমি কিছু না বুঝে সেটি হাত দিয়ে ধরার চেষ্টা করে নির্বোধের মতো চিৎকার করতে থাকলাম।

ঘটনার আকস্মিকতাটুকু কেটে যাবার পর আমি আবিষ্কার করলাম নিরাপত্তাবাহিনীর লোকেরা আমাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছে। কেন আমাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জানতে চাওয়ার পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কাটখোট্টা মহিলাটি তার মুখে যেটুকু কমনীয়তা আনা সম্ভব সেটুকু এনে মিষ্টি করে বলল যে ব্যাপারটি তাদের সদরদপ্তরে নিষ্পত্তি করা হবে। ব্যাপারটি যে আসলেই একটি ভুল বোঝাবুঝি এবং সদরদপ্তরের কর্মকর্তাদের সেটা বুঝিয়ে দেয়ার পরই যে আমাকে তারা ছেড়ে দেবে সে ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না।

কাউকে কোনো অপরাধের জন্যে গ্রেপ্তার করার পর নিরাপত্তাবাহিনীর কর্মকর্তারা তাদের সাথে কী ধরনের ব্যবহার করে সেটা সম্পর্কে আমার খানিকটা কৌতূহল ছিল। সদরদপ্তরে এসে আবিষ্কার করলাম যে তাদের কোনো ধরনের ব্যবহারই করা হয় না। আমাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে আসবাবপত্রহীন একটি নিরানন্দ ঘরে আটকে রাখা হল। অনেক কষ্টে আমি একজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, "আমি এই ঘটনার সাথে

কোনোভাবেই জড়িত নই, আমাকে তোমরা কেন গ্রেপ্তার করে এনেছ?"

মানুষটি আমার প্রশ্নের কোনো উত্তর দেবে আমি আশা করি নি; কিন্তু আমাকে আশ্চর্য করে সে তার তথ্যকেন্দ্রে উঁকি দিয়ে বলল, "তোমার হাতে মানুষের বেআইনি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবসায়ী মারা গেছে, তার অস্ত্র পাওয়া গেছে তোমার হাতে, কাজেই তুমি কোনোভাবে ব্যাপারটার সাথে জড়িত নও সেটা বিশ্বাস করা কঠিন।"

আমি অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে নিরাপত্তাবাহিনীর লোকটির দিকে তাকালাম, শান্ত সমাহিত এবং পবিত্র চেহারার মানুষটি আসলে একজন বেআইনি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবসায়ী, দুর্ধর্ষ খুনে আসামি সেটি এখনো আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। কাতর গলায় বললাম, "তুমি বিশ্বাস কর, আমি কিছুই জানি না।"

মানুষটি উদাস গলায় বলল, "হতে পারে। কিন্তু তুমি ঘটনার সময়ে হাজির ছিলে। অপরাধীর দেহে তোমার শরীরের ছাপ আছে। তুমি একটা ভুল সময়ে ভুল জায়গায় ছিলে, আমাদের কিছু করার নেই।"

আমি একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে এই প্রথমবার ভুল সময়ে ভুল জায়গায় থাকা কথাটির প্রকৃত অর্থ অনুভব করতে শুরু করলাম।

* * * * * *

আসবাবপত্রহীন নিরানন্দ ঘরটিতে আমি দুই দিন কাটিয়ে দিলাম। সেখানে গায়ে দেয়ার জন্যে হালকা গোলাপি এক ধরনের পোশাক রাখা ছিল। খাবার বা স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছিল। শুধু তাই নয়, বিনোদনের জন্যে নানারকম উপকরণ সাজিয়ে রাখা ছিল, কিন্তু আমি তার কিছুই ব্যবহার করতে পারলাম না, পুরো সময়টুকু এক ধরনের অস্বস্তিকর চাপা আতংক নিয়ে অপেক্ষা করে করে কাটিয়ে দিলাম। তৃতীয় দিনে কয়েকজন মানুষ এসে আমাকে এই নিরানন্দ ঘরটি থেকে বের করে নিয়ে গেল। আমি ততক্ষণে পুরোপুরি ভেঙে পড়া একজন দুর্বল মানুষে পরিণত হয়ে গেছি।

কয়েকটি কক্ষ এবং কয়েকটি করিডোর পার করে আমাকে মাঝারি একটি হলঘরে উপস্থিত করা হল, সেখানে একটি বড় টেবিলকে ঘিরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছু মানুষ বসে ছিল। আমাকে দেখে একজন সহৃদয়ভাবে হেসে বলল, "সে কী! তোমার এ কী চেহারা হয়েছে?"

আমি ভাঙা গলায় বললাম, "তুমি কি সত্যিই অবাক হয়েছ?"

"না। খুব অবাক হই নি। তোমার অবস্থায় হলে সম্ভবত আমিও এভাবে ভেঙে পড়তাম।"

আমি লোকটার কথায় কোনো সান্ত্বনা খুঁজে পেলাম না। তার সামনে চেয়ারে বসতে বসতে বললাম, "আমাকে তোমরা কেন গ্রেপ্তার করে এনেছ? কেন এখনো ধরে রেখেছ?"

"সে কথাটাই তোমাকে বলার জন্যে ডেকে এনেছি।"

আমি একটু আশা নিয়ে মানুষটার দিকে তাকালাম। কিন্তু তার মাছের মতো নিস্পৃহ চোখের দৃষ্টি দেখে হঠাৎ এক ধরনের আতংকে আমার শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে। মানুষটি তার চেয়ারে হেলান দিয়ে বলল, "তুমি নিশ্চয়ই জান, একটি রাষ্ট্রের বিশাল শক্তি ব্যয় হয় অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, অপরাধীদের ধরা এবং তাদের বিচার করার জন্যে।"

মানুষটি ঠিক কী বলতে চাইছে আমি বুঝতে পারলাম না, কিন্তু আমি তবু যন্ত্রের মতো মাথা নাড়লাম। মানুষটি বলল, "রাষ্ট্র এই খাতে অর্থব্যয় কমানোর জন্যে নূতন একটি সিস্টেম দাঁড় করিয়েছে।"

"সিস্টেম?"

"হ্যাঁ। তার নাম দেয়া হয়েছে সিস্টেম এডিফাস।"

"এডিফাস?"

"হ্যাঁ। এই সিস্টেমের নিয়ম হল যখন কোনো অপরাধ ঘটবে তখন অপরাধের আশপাশে সবাইকে ধরে নিয়ে আসা হবে।"

"সবাইকে?"

"হ্যাঁ, কারণ এটাই সবচেয়ে সহজ। এটা করতে হলে কোনো অনুসন্ধান করতে হয় না, কোনো তদন্ত করতে হয় না, ব্যাপারটি নিয়ে চিন্তাভাবনা-গবেষণা করতে হয় না। সবাইকে যখন ধরে আনা হয় তখন সিস্টেম এডিফাস তাদের সবাইকে জেরা করে। জেরা করে বের করে কে সত্যি বলছে কে মিথ্যা বলছে। সেখান থেকে অপরাধী খুঁজে বের করা হয়। শুধু তাই নয়, অপরাধের গুরুত্ব বের করা হয়।"

মানুষটি নিশ্বাস নেবার জন্যে একটু অপেক্ষা করল, আমি কিছু না বলে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

"যখন অপরাধের গুরুত্ব বের করা হয় তখন তাকে শাস্তি দেয়া হয়। সিস্টেম এডিফাসের সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে তখন সে শাস্তি কার্যকর করতে পারে। কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলে সেই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা থেকে শুরু করে মস্তিষ্ক শোধন, স্মৃতি পরিবর্তন, কারাদণ্ড যাকে যেটা দেয়া প্রয়োজন সেটা দিয়ে দিতে পারে। বিশাল তথ্যকেন্দ্র থেকে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করা হয়। বলতে পার সিস্টেম এডিফাস দিয়ে একটি দেশের নিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র দপ্তর এবং বিচার বিভাগকে অবলুপ্ত করে দেয়া হবে।"

আমি হতবাক হয়ে কোনোভাবে বললাম, "এই সিস্টেমটা ঠিকভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে? এটি নির্ভুলভাবে কাজ করে?"

"অবশ্যি কাজ করে।" মানুষটি মাথা নেড়ে বলল, "গত দশ বছর থেকে হাজারখানেক বিজ্ঞানী ইঞ্জিনিয়ার, কম্পিউটার এটার পিছনে কাজ করছে। বিশাল রিসার্চ করে এটা দাঁড় করানো হয়েছে। মৃত্যুকূপের সাথে যে ইন্টারফেস—"

"মৃত্যুকূপ?"

"হ্যাঁ।" মানুষটি সোজা হয়ে বলল, "যদি দেখা যায় কারো অপরাধের জন্যে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া দরকার সিস্টেম এডিফাস তখন মানুষটাকে মৃত্যুকূপে নিয়ে হত্যা করে।"

আমি আতংকিত হয়ে বললাম, "কীভাবে করে?"

"অনেক রকম উপায় রয়েছে। ইলেকট্রিক শক, হাইড্রোজেন সায়ানাইড গ্যাস, বিষাক্ত ইনজেকশান, গুলিবর্ষণ, রক্তক্ষরণ, উচ্চচাপ কিংবা উচ্চতাপ—যার জন্যে যেটা প্রয়োজন। শুধু এই ইন্টারফেসটা তৈরি করতেই ছয় বছর সময় লেগেছে।"

আমি রক্তশূন্য মুখে মানুষটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। জিজ্ঞেস করলাম, "কবে থেকে এই সিস্টেম এডিফাস কাজ করছে?"

মানুষটি সহৃদয়ভাবে হেসে বলল, "মাত্র কিছুদিন হল শুরু করা হয়েছে। বলতে পার এটা এখনো পরীক্ষামূলক। প্রথম কয়েক বছর তথ্য সংগ্রহ করে পর্যালোচনা করে দেখা হবে—"

আমি বাধা দিয়ে বললাম, "যেখানে মানুষের জীবন-মরণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, সেটা একটা পরীক্ষামূলক সিস্টেম? আমাকে দিয়েও পরীক্ষা করা হবে?"

"হ্যাঁ। তোমার ব্যাপারটি বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তুমি দাবি করছ যে তুমি

নিরপরাধ, অথচ আমাদের প্রাথমিক তথ্য বলছে তুমি অপরাধী। আমরা দেখতে চাই সিস্টেম এডিফাস কীভাবে এটার মীমাংসা করে।"

আমি অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মানুষটির দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, "আমি একটা পরীক্ষার বিষয়বস্তু? আমি একটা গিনিপিগ? এক টুকরা তথ্য?"

"জিনিসটা এভাবে দেখার প্রয়োজন নেই। তবে—"

আমি বাধা দিয়ে বললাম, "আমি কোনো পরীক্ষার গিনিপিগ হতে চাই না।"

মানুষটি হা হা করে হেসে বলল, "তুমি না চাইলেই তো হবে না। এটা একটি দেশের সিদ্ধান্ত। একটা রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত। একটা আইন—"

"আমি এই আইন মানি না।"

মানুষটি তার মাথা বাঁকা করে বলল, "শুধুমাত্র এই কথাটি বলার জন্যেই দেশদ্রোহিতা আইনে তোমার সাজা হতে পারে।"

আমি চিৎকার করে বললাম, "হলে হোক। কিন্তু সেটা হতে হবে নিয়মের ভিতরে। আমি উজবুক কোনো সিস্টেমকে বিশ্বাস করি না। বিশ্বাস করি না।"

মানুষটি হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে চেয়ারে হেলান দিয়ে একটা সুইচ টিপে বলল, "সাত নম্বর সেলে নিয়ে যাও।"

আমি লাফিয়ে উঠে বললাম, "আমি যাব না। কিছুতেই যাব না।"

আমার কথা শেষ হবার আগেই দরজা খুলে বিশাল আকারের দুজন মানুষ এসে আমাকে দুপাশ থেকে ধরে টেনেহিঁচড়ে নিতে শুরু করল।

* * * * * *

সাত নম্বর সেল নামক যে ঘরটিতে আমাকে আটকে রাখা হল সেটি আগের ঘরটির মতোই আসবাবপত্রহীন এবং নিরানন্দ একটি কুঠুরি। ঘরটির দরজা বন্ধ হবার সাথে সাথে দরজা-জানালাহীন নিশ্ছিদ্র এই ঘরটিকে একটি বদ্ধ খাঁচার মতো এবং নিজেকে আক্ষরিক অর্থে খাঁচায় আটকেপড়া একটি ইঁদুরের মতো মনে হতে থাকে। আমি ঘরের ভিতরে কয়েকবার পায়চারি করে কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত এক কোনায় বসে নিজের হাঁটুর উপর মুখ রেখে সিস্টেম এডিফাসের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকি। আমার মনে হতে থাকে আমাকে কেউ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে। অপেক্ষা করে করে আমি যখন অধৈর্য হয়ে উঠলাম ঠিক তখন শুনতে পেলাম ভারি গলায় কেউ একজন আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল, "সিস্টেম এডিফাস তোমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।"

যে কারণেই হোক, আমার নিজেকে খুব আমন্ত্রিত মনে হল না বলে আমি চুপ করে রইলাম। সিস্টেম এডিফাস আবার বলল, "তুমি নিশ্চয়ই জান যে তোমাকে একটা খুনের মামলার সন্দেহভাজন ব্যক্তি হিসেবে আনা হয়েছে।"

আমার কথা বলার ইচ্ছে করছিল না, কিন্তু চুপ করে থাকলে যদি পরোক্ষভাবে ঘটনাটির সত্যতা স্বীকার করা হয়ে যায় সেই ভয়ে আমি বললাম, "আমি কিছুই করি নি, এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না।"

"তুমি সত্যিই কিছু কর নি কি না সেটা কিছুক্ষণের মাঝেই আমি বের করব।"

"কীভাবে বের করবে?"

"তুমি একটি ফ্যারাডে কেজে রয়েছ। অসংখ্য মনিটর তোমার নিশ্বাস, প্রশ্বাস, হৃৎস্পন্দন, রক্তচাপ, মস্তিষ্কের সবগুলি দীর্ঘ লয় এবং স্বল্প লয়, তরঙ্গ, তাপমাত্রা, ত্বকের

জলীয় বাষ্প ইত্যাদি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নজর রাখছে। তোমার মুখের প্রতিটি শব্দকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা হবে তুমি সত্যি কথা না মিথ্যা কথা বলছ।"

আমি আশান্বিত হয়ে বললাম, "আমি সত্যি কথা বললে তুমি বুঝতে পারবে?"

"অবশ্যি।"

"তাহলে শোন, আমি পুরোপুরি নির্দোষ।"

আমার সাথে যে কণ্ঠস্বরটি কথোপকথন করছিল সেটি হঠাৎ করে পুরোপুরি নীরব হয়ে গেল। আমি ভয় পাওয়া গলায় বললাম, "কী হল? তোমার যন্ত্রপাতি কী বলছে? আমি কি সত্যি কথা বলছি?"

"হ্যাঁ। আমার যন্ত্রপাতি বলছে তুমি সত্যি কথা বলছ। তবে—"

"তবে কী?"

"তুমি ঠিক কোন ব্যাপারে নির্দোষ সেটি পরিষ্কার হল না।"

"এই ব্যাপারে, যে ব্যাপারে আমাকে ধরে এনেছ।"

"সেটি কোন ব্যাপার?"

"আমি তো ভালো করে জানিও না। আমি বেঞ্চে বসে খাচ্ছিলাম—"

আমাকে বাধা দিয়ে সিস্টেম এডিফাস বলল, "তুমি কি বলতে চাইছ ঘটনাটি তুমি ভালো করে জানই না?"

"না।"

"যে ঘটনাটি তুমি জানই না সেখানে তুমি দোষী বা নির্দোষ সেটি কেমন করে বলবে?"

আমি সিস্টেম এডিফাসের কথায় হঠাৎ এক ধরনের আতংক অনুভব করলাম। একজন মানুষের সাথে আরেকজন মানুষ পুরোপুরি অর্থহীন একটা ব্যাপারে দীর্ঘ সময় কথা বলতে পারে, কিন্তু একটি যন্ত্রের সাথে সেটি কি করা সম্ভব? যন্ত্র কি কোনো নিরীহ কথাকে ভুল বুঝতে পারে না? আমি কী বলব ঠিক করার চেষ্টা করছিলাম ঠিক তখন সিস্টেম এডিফাস ভারি গলায় বলল, "আমাদের তথ্য অনুযায়ী তুমি এখন বিভ্রান্ত এবং কিছু একটা কৃত্রিম উত্তর তৈরি করার চেষ্টা করছ।"

"না, আমি কোনো কৃত্রিম উত্তর তৈরি করছি না। একটা যন্ত্রের সাথে কীভাবে অর্থপূর্ণ কথা বলা যায় সেটি ভেবে বের করার চেষ্টা করছি।"

"বেশ। আমরা তাহলে ঘটনাটি একটু বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি। দেশের একজন অত্যন্ত কুখ্যাত মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবসায়ী তোমার কোলে মৃত্যুবরণ করেছে। তার দেহে সাতটি রনোগানের ক্ষতচিহ্ন ছিল, তোমাকে যখন গ্রেপ্তার করা হয় তখন তোমার হাতেও ছিল একটা রনোগান। তোমার সাথে এই দুর্ধর্ষ খুনি মানুষের কত দিনের পরিচয়?"

"তার সাথে আমার কোনো পরিচয় নেই।"

"তাহলে এত মানুষ থাকতে সে কেন তোমার দিকে ছুটে এল?"

"এটি—এটি একটি কাকতালীয় ঘটনা! সে যে কোনো মানুষের দিকে ছুটে যেতে পারত।"

সিস্টেম এডিফাস এক মুহূর্ত নীরব থেকে বলল, "আমি যখন তোমাকে এই দুর্ধর্ষ খুনিটি নিয়ে প্রশ্ন করেছি তখন তোমার রক্তচাপ বৃদ্ধি পেয়েছে, তোমার মস্তিষ্কে একটা মধ্যম লয়ের নিচু তরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে তার কারণ কী? তুমি কি সত্য গোপন করেছ?"

আমি চমকে উঠে বললাম, "না, আমি কোনো সত্য গোপন করি নি।"

"এই ভয়ংকর অপরাধী সম্পর্কে তোমার কী ধারণা?"

"আমার কোনো ধারণাই নেই। সত্যি কথা বলতে কী, আমি যখন প্রথম তাকে দেখেছি

আমার মনে হয়েছে মানুষটির মাঝে একটি শান্ত সমাহিত ভাব আছে। আমি বুঝতেই পারি নি সে এত বড় অপরাধী।"

"বুঝতেই পার নি?"

"না।"

"তার সম্পর্কে তোমার একটা শ্রদ্ধার ভাব ছিল?"

"শ্রদ্ধা কি না জানি না, মানুষটাকে দেখে তার ভিতরে একটা পবিত্রতা ছিল বলে মনে হয়েছিল।"

"এতবড় একজন দুর্ধর্ষ খুনি কিন্তু তাকে দেখে তোমার মনে হল পবিত্র?"

আমি একটু অধৈর্য হয়ে বললাম, "মানুষের চেহারা সব সময় সত্যি কথা বলে না; এটি নূতন কিছু নয়। পৃথিবীতে অনেক সুদর্শন দুশ্চরিত্র মানুষ রয়েছে।"

"এতবড় একজন অপরাধী তোমার ভিতরে পবিত্র ভাব এনেছে সেজন্যে তোমার ভিতরে কি কোনো অপরাধবোধ আছে?"

"না, অপরাধবোধ নেই। কেন থাকবে?"

"আশ্চর্য!"

"কোন জিনিসটা আশ্চর্য?"

"তোমার মুখের প্রত্যেকটা উক্তির আমি সত্যতা যাচাই করে দেখেছি। তুমি মুখে যেটা বলেছ তার সাথে সত্যতার গরমিল রয়েছে। যেমন মনে কর পবিত্রতার কথা। পবিত্রতা জিনিসটি মূলত ধর্মসংক্রান্ত কাজে ব্যবহার করা হয়। আমার যে মূল তথ্যকেন্দ্র রয়েছে সেখানে পবিত্রতা কথাটির ঊনচল্লিশ ধরনের অর্থ রয়েছে—"

আমি বাধা দিয়ে বললাম, "আমরা মানুষ। আমাদের মাঝে অসংখ্য জটিলতা থাকে। আমাদের কথাবার্তা, কাজকর্মকে তুমি এরকম হাস্যকর ছেলেমানুষি একটি সরল রূপ দিতে পার না।"

সিস্টেম এডিফাস এভাবে আমাকে পরবর্তী আটচল্লিশ ঘণ্টা জেরা করল। এটি আমাকে খাওয়া, ঘুম বা বিশ্রামের জন্যেও সময় দিল না। তার জেরা শুনে মনে হল সে আমার সম্পর্কে আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে, আমার সাথে কথা বলে শুধুমাত্র তার সিদ্ধান্তের সপক্ষে যুক্তি দাঁড় করিয়ে যাচ্ছে। আমার কোনো কথা অবিশ্বাস করার প্রয়োজন হলেই সে রক্তচাপ বা মস্তিষ্কের দ্রুত লয়ের কোনো একটি তরঙ্গের নাম বলে যেটি সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই নেই। অর্থহীন কথায় বিরক্ত হয়ে আমি যদি একটি বেফাঁস উক্তি করে ফেলি তাহলে সেটি নিয়েই দীর্ঘ সময় আমার সাথে তর্ক করতে থাকে। আমি ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত হয়ে আবিষ্কার করি সে আমার মুখ দিয়েই তার পছন্দসই এক একটি উক্তি বের করে নিচ্ছে। সিস্টেম এডিফাস নামের এই যন্ত্রটির মানুষের নিজস্ব জটিলতা সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই, এটি বাড়াবাড়ি ধরনের নির্বোধ এবং একগুঁয়ে একটি যন্ত্র। কাজেই, আটচল্লিশ ঘণ্টার মাথায় যখন সিস্টেম এডিফাস মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবৈধ ব্যবসায়ীর কার্যক্রমে সহযোগিতা এবং পরবর্তীকালে তার হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্যে আমাকে মৃত্যুদণ্ড দান করল আমি খুব বেশি অবাক হলাম না।

* * * * * *

আমি সিস্টেম এডিফাসকে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কখন আমাকে হত্যা করবে?"

"মৃত্যুদণ্ডাদেশ নিশ্চিত হওয়ার এক সপ্তাহের মাঝে আমি সেটা কার্যকর করি।"

"এক সপ্তাহ?" আমি একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, "মাত্র এক সপ্তাহ?"

"এক সপ্তাহ মাত্র নয়, এটি একটি দীর্ঘ সময়।"

আমি কোনো কথা না বলে চুপ করে রইলাম। সমস্ত ব্যাপারটিকে এখনো আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়, এটি যেন একটি ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন, আমার শুধু মনে হতে থাকে যে এক্ষুনি আমার ঘুম ভেঙে যাবে আর আমি আবিষ্কার করব আমি আমার ঘরে আমার বিছানায় নিরাপদে শুয়ে আছি।

কিন্তু সেটি ঘটল না, আমি শুনতে পেলাম সিস্টেম এডিফাস বলল, "যদিও তোমার অপরাধটি একটি মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ কিন্তু তুমি অপরাধটি প্রত্যক্ষভাবে কর নি, শুধুমাত্র পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছ। সে কারণে তোমাকে কীভাবে হত্যা করব সে ব্যাপারে তোমার কোনো একটি সুপারিশ আমি গ্রহণ করতে রাজি আছি।"

"সুপারিশ? আমার সুপারিশ?"

"হ্যাঁ।"

"কী ধরনের সুপারিশ?"

"যেমন তুমি কীভাবে মৃত্যুবরণ করতে চাও। গুলিবর্ষণ, বৈদ্যুতিক প্রবাহ, বিষপ্রয়োগ, বিষাক্ত ইনজেকশান, বিষাক্ত গ্যাস, উচ্চচাপ, উচ্চতাপ ইত্যাদি।"

আমি হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লাম, যে মানুষকে হত্যা করা হবে তার কাছে পদ্ধতিটির কোনো গুরুত্ব নেই। খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললাম, "আমি কি অন্যকিছু সুপারিশ করতে পারি?"

সিস্টেম এডিফাস কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল, "ঠিক আছে কর।"

"তুমি যেহেতু মানুষ নও তাই তুমি হয়তো জান না যে মৃত্যু কখনোই আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।"

"কিন্তু তবু তোমাদের গ্রহণ করতে হবে।"

"আমি সে ব্যাপারে তোমার একটু সাহায্য চাইছি।"

"কী সাহায্য?"

"আমার মৃত্যুটি যেন হয় আকস্মিক। আমার অজান্তে সেটি যেন ঘটানো হয়।"

"অজান্তে?"

"হ্যাঁ। তাহলে সেটি আমার দিকে এগিয়ে আসছে, সেই ভয়াবহ অনুভূতির ভিতর দিয়ে আমাকে যেতে হবে না।"

সিস্টেম এডিফাস কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল, "কিন্তু সেটি তো সম্ভব নয়। প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের জন্যে একটা প্রস্তুতি নিতে হয়, সেই প্রস্তুতিটি তোমার অজান্তে করা সম্ভব নয়।"

আমি একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম, "তাহলে অন্তত্তপক্ষে কবে আমাকে হত্যা করবে সেই দিনটি কি আমার কাছে গোপন রাখতে পারবে?"

"সেই দিনটি?"

"হ্যাঁ। সেই নির্দিষ্ট দিনটি?"

"সেটি করা যেতে পারে।" সিস্টেম এডিফাস কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল, "আমি কবে তোমাকে হত্যা করব সেই দিনটি তোমার কাছে গোপন রাখব।"

"তোমাকে অনেক ধন্যবাদ সিস্টেম এডিফাস।"

"একজন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত মানুষের জন্যে অন্তত এইটুকু করা আমি নিজের কর্তব্য বলে মনে করি।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, "সিস্টেম এডিফাস।"

"বল।"

"তুমি যে আমাকে কথা দিয়েছ যে আমার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার দিনটি আমার কাছে গোপন রাখবে সেটি কি একটি সত্যিকারের অঙ্গীকার?"

"হ্যাঁ। সেটি একটি সত্যিকারের অঙ্গীকার।"

আমি একটা নিশ্বাস নিয়ে বললাম, "আমি যদি কোনোভাবে সেটা জেনে যাই?"

"তুমি জানবে না।"

"কিন্তু তবু যদি আমি কোনোভাবে জেনে যাই?"

"তুমি নিশ্চিত থাক তুমি কোনোভাবে জানবে না।"

আমি হঠাৎ একটু বেপরোয়ার মতো বললাম, "আমি কি দাবি করতে পারি যে আমি যদি দিনটি জেনে যাই তাহলে সেই দিনটিতে আমাকে হত্যা করতে পারবে না?"

সিস্টেম এডিফাস এক ধরনের যান্ত্রিক হাসির মতো শব্দ করে বলল, "তুমি অহেতুক উত্তেজিত হচ্ছ। কিন্তু যদি তুমি এই প্রতিশ্রুতি থেকে সান্ত্বনা পেতে চাও তাহলে আমি তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছি যে তুমি যদি কোনোভাবে তোমার মৃত্যুদণ্ড দেবার দিনটি আগে থেকে জেনে যাও তাহলে আমি সেইদিন তোমাকে হত্যা করব না।"

"কবে হত্যা করবে?"

"অন্য কোনো একদিন হত্যা করব।"

"তুমি কথা দিচ্ছ?"

"আমি কথা দিচ্ছি।"

আমি একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বললাম, "তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল এরকম—আজ থেকে সাত দিনের ভিতরে তুমি আমাকে হত্যা করবে। কবে হত্যা করা হবে সেটি আমার কাছে গোপন রাখা হবে, কিন্তু আমি যদি দিনটি আগে থেকে জেনে যাই তাহলে সেই দিনটিতে তুমি আমাকে হত্যা করতে পারবে না।"

"তুমি ঠিকই বলেছ।"

"এ ব্যাপারে তুমি অঙ্গীকারাবদ্ধ?"

"আমি অঙ্গীকারাবদ্ধ।"

"যদি তুমি তোমার অঙ্গীকার ভঙ্গ কর?"

সিস্টেম এডিফাস যান্ত্রিক এক ধরনের হাসির মতো শব্দ করে বলল, "আমার গঠন সম্পর্কে ধারণা নেই বলে তুমি এই কথা বলছ। আমার অঙ্গীকার প্রকৃতপক্ষে হার্ডওয়ারনির্ভর, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা আক্ষরিক অর্থে কয়েক হাজার প্রসেসরকে ধ্বংস করার সমান। অঙ্গীকার ভঙ্গ করা এবং আত্মহত্যা আমার জন্যে সমান।"

"শুনে নিশ্চিন্ত হলাম। তোমাকে ধন্যবাদ সিস্টেম এডিফাস।"

"ধন্যবাদ দেয়ার কিছু নেই। আমি আমার দায়িত্ব পালন করছি মাত্র। মানব সমাজের সেবা করাই আমার উদ্দেশ্য।"

আমি বদ্ধঘরটিতে কয়েকবার পায়চারি করে মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে বললাম, "সিস্টেম এডিফাস।"

"বল।"

"তুমি আমাকে হত্যা করার জন্যে সাত দিন সময় নিয়েছ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সময়টি ছয় দিন, তাই না?"

AMARBOI.COM

"ছয় দিন? কেন?"

"কারণ প্রথম ছয় দিন তুমি যদি আমাকে হত্যা না কর তাহলে আমি বুঝে যাব সপ্তম দিনেই তুমি আমাকে হত্যা করবে। কিন্তু আমি যদি দিনটি জেনে যাই তাহলে তো তুমি আমাকে আর সেইদিন হত্যা করতে পারবে না। কাজেই আমাকে যদি সত্যি হত্যা করতে চাও তাহলে আমাকে প্রথম ছয় দিনের মাঝেই হত্যা করতে হবে। ঠিক কি না?"

সিস্টেম এডিফাস কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ। তোমাকে হত্যা করার জন্যে আমি সাত দিন অপেক্ষা করতে পারব না—প্রথম ছয় দিনেই করতে হবে।"

"তাহলে কি আমরা ধরে নেব আগামী ছয় দিনের মাঝেই আমাকে হত্যা করা হবে?"

"হ্যাঁ ধরে নিতে পার।"

আমি একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম, "যদিও আমার সময় ছিল সাত দিন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটা হয়ে গেল ছয় দিন। আমার জীবনের শেষ কয়টা দিন থেকে আরো একটা দিন হারিয়ে গেল।"

"তুমি যেভাবে চেয়েছ তাতে আর কিছু করার নেই।"

আমি খানিকক্ষণ ঘরে পায়চারি করে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে বললাম, "সিস্টেম এডিফাস।"

"বল।"

"তুমি তো আসলে ষষ্ঠ দিনেও হত্যা করতে পারবে না।"

"কেন?"

"আমি জানি ছয় দিনের মাঝে তুমি আমাকে হত্যা করবে। কাজেই পাঁচ দিন পার হওয়ার পরই আমি বুঝতে পারব পরের দিন আমাকে হত্যা করবে। তাই না?"

সিস্টেম এডিফাস এবার বেশ কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল, "ব্যাপারটা তো তাই দাঁড়াল। আমি সপ্তম দিনে যেরকম তোমাকে হত্যা করতে পারব না, ষষ্ঠ দিনেও পারব না।"

"না পারবে না।" আমি গভীর একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম, "ষষ্ঠ দিনেও যেহেতু পারবে না কাজেই আমাকে পাঁচ দিনের মাঝে মারতে হবে। আমার আয়ু মাত্র পাঁচ দিন।"

সিস্টেম এডিফাস বিচিত্র এক ধরনের গলায় বলল, "পরবর্তী পাঁচ দিনের মাঝে আমার তোমাকে হত্যা করতে হবে। সময়—"

আমি বাধা দিয়ে বললাম, "কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

চার দিন পার হবার পর আমি কি জেনে যাব না যে পঞ্চম দিন এসে গেছে? আমার শেষ দিন এসে গেছে! আমি যদি জেনে যাই তাহলে তুমি আমাকে কীভাবে হত্যা করবে? তুমি অন্তত সেদিন হত্যা করতে পারবে না।"

সিস্টেম এডিফাস এবারে কোনো কথা বলল না। আমি তাকে ডাকলাম, "সিস্টেম এডিফাস।"

"বল।"

"তুমি কথা বলছ না কেন? পঞ্চম দিনেও তো তুমি আমাকে হত্যা করতে পারবে না। তুমি অঙ্গীকার করেছ আমি যদি বুঝে যাই তুমি আমাকে হত্যা করবে না।"

"হ্যাঁ। কিন্তু—"

আমি বাধা দিয়ে বললাম, "তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল চার দিনে।"

"কিন্তু—"

AMARBOI.COM

"কিন্তু কী?"

"চার দিনের বেলাতেও তো এই যুক্তি দেয়া যায়।"

আমি মাথা নাড়লাম, "ঠিকই বলেছ। তুমি চতুর্থ দিনেও আমাকে হত্যা করতে পারবে না।"

সিস্টেম এডিফাস ধীরে ধীরে বলল, "চতুর্থ দিনেও তোমাকে হত্যা করতে পারব না। তাহলে প্রথম তিন দিনে—"

আমি গলায় উত্তেজনা ঢেলে বললাম, "আসলে একই কারণে তিন দিনেও পারবে না, দ্বিতীয় দিনেও পারবে না। ভেবে দেখ তুমি প্রথম দিনেও পারবে না।"

"পারব না?"

"না। তার মানে তোমার আমাকে এখনই হত্যা করতে হবে।"

"এখনই?"

"হ্যাঁ। সিস্টেম এডিফাস। কিন্তু আমি জেনে গিয়েছি তুমি এখন আমাকে হত্যা করবে।"

"জেনে গিয়েছ?"

"হ্যাঁ। আমি জেনে গেলে তুমি আমাকে আর হত্যা করতে পারবে না!"

"আমি তোমাকে হত্যা করতে পারব না?"

"না, সিস্টেম এডিফাস। আমাকে যেতে দাও।"

"যেতে দেব?"

আমি গলায় অনাবশ্যক জোর দিয়ে বললাম, "হ্যাঁ। দরজাটা খুলে দাও সিস্টেম এডিফাস।"

AMARBOI.COM

কয়েক সেকেন্ড পর সত্যি সত্যি ঘরঘর শব্দ করে দরজা খুলে গেল। আমি স্টেনলেস স্টিলের নিশ্ছিদ্র এই ঘর থেকে বের হয়ে একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বললাম, "সিস্টেম এডিফাস, তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?"

"হ্যাঁ, পাচ্ছি।"

"তুমি কি জান যে তুমি একটা বিশাল গর্দভ? অকাট মূর্খ? জঞ্জালের ডিপো—নোংরা আবর্জনা? জান?"

"না, জানতাম না।"

"জেনে রাখ।"

*　　*　　*　　*　　*　　*

কয়েকদিন পর সংবাদ বুলেটিনে একটা ছোট তথ্য প্রকাশিত হল যেটি পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষেরই দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। সেই বুলেটিনে লেখা ছিল—অপরাধী নির্ণয়, বিচার করা এবং শাস্তি প্রদানের জন্যে প্রস্তুত করা সিস্টেম এডিফাস প্রজেক্টটি পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করতে সমস্যা হওয়ার কারণে পুরো প্রজেক্টটাই বাতিল করে দেয়া হয়েছে।

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

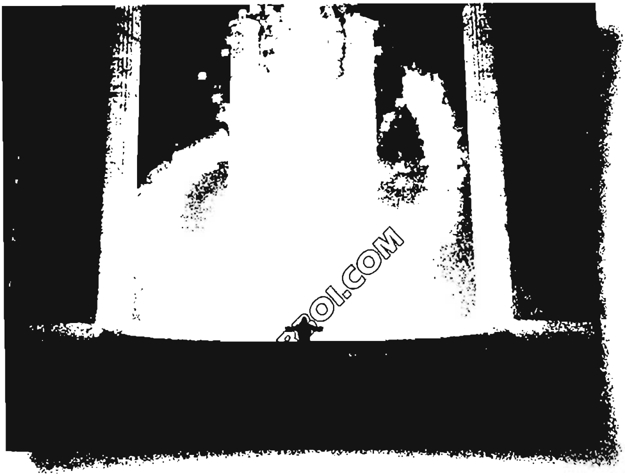

একজন অতিমানবী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১

আমার নাম কিরি। আমার কল্পনা করতে ভালো লাগে যে আমার বাবা–মা আমাকে অনাথ আশ্রমে দেবার সময় এই নামটি ব্যবহার করেছিলেন। ব্যাপারটি নিয়ে নিশ্চিত হবার কোনোই উপায় নেই, কারণ কোনো বাবা–মা যখন অনাথ আশ্রমে তাদের সন্তানকে দিয়ে আসেন তখন তার পূর্ববর্তী সমস্ত তথ্য নষ্ট করে দেওয়া হয়। এমনটিও হতে পারে যে আমার বাবা–মা আমাকে কোনো নাম ছাড়াই অনাথ আশ্রমে দিয়ে এসেছিলেন এবং অনাথ আশ্রমের মূল তথ্যকেন্দ্র র‍্যান্ডম ধ্বনি ব্যবহার করে আমার জন্য একটি নাম তৈরি করে নিয়েছে। সম্ভবত আমার বাবা ছিলেন না এবং আমার মার জীবনে একটা ভয়াবহ দুর্যোগ নেমে এসেছিল তাই আমাকে গভীরভাবে ভালবাসা সত্ত্বেও কোনো উপায় না দেখে আমার মা আমাকে অনাথ আশ্রমে রেখে গিয়েছিলেন। আমাকে ছেড়ে চলে যাবার সময় আমি নিশ্চয়ই আকুল হয়ে কাঁদছিলাম এবং সম্ভবত আমার হাত দুটি তার দিকে প্রসারিত করে রেখেছিলাম, আমার দিকে তাকিয়ে নিশ্চয়ই আমার মায়ের বুক ভেঙে যাচ্ছিল কিন্তু তার কিছু করার ছিল না। অনাথ আশ্রম থেকে বের হয়ে আমার মা সম্ভবত দুই হাতে মুখ ঢেকে ব্যাকুল হয়ে কাঁদছিলেন এবং পথচারীরা তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। নিজের সন্তানকে ছেড়ে আসার গভীর দুঃখে সমস্ত পৃথিবী নিশ্চয়ই তার কাছে শূন্য এবং অর্থহীন মনে হচ্ছিল।

কোম অবশ্য আমার কথা বিশ্বাস করে না। তার ধারণা আমার কোনো বাবা–মা ছিল না, আমাকে ল্যাবরেটরিতে একটা ক্লোন হিসেবে তৈরি করা হয়েছিল। আমি অনাথ আশ্রমে কিছু রোবটের তত্ত্বাবধানে বড় হয়েছি বলে সামাজিক আচার–আচরণ পুরোপুরি শিখে উঠতে পারি নি। রূঢ়ভাবে কথা বলতে না চাইলেও আমার বেশিরভাগ কথাই রূঢ় শোনায়। আমার মাঝে মাঝে কোনো একজন প্রিয় মানুষকে কিছু একটা কোমল কথা বলতে খুব ইচ্ছে করে কিন্তু এক ধরনের সংকোচের জন্য বলতে পারি নি। আমার পরিচিত মানুষজন খুব কম, বন্ধুর সংখ্যা আরো কম। কোম আমার মতো অসামাজিক এবং অমিশুক বলে তার সাথে আমার এক ধরনের বন্ধুত্ব হয়েছে। আমরা যখন একসাথে থাকি বেশিরভাগ সময় চুপচাপ বসে বসে আশপাশের অন্যান্য মানুষজনকে দেখে সময় কাটিয়ে দিই। যেদিন আমাদের হাতে খরচ করার মতো ইউনিট থাকে আমরা শহরতলির কোনো পানশালায় বসে নিফ্রাইট মেশানো কোনো হালকা পানীয় খেতে খেতে গল্প করি। নিফ্রাইটের জৈব রসায়ন মস্তিষ্কের নিউরন সেলের সিনাপ্সের মাঝে দিয়ে এক ধরনের আরামের অনুভূতি আনা–নেওয়া করতে থাকে, আমাদের সুখের স্মৃতি মনে হতে থাকে এবং আমরা একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে তরল গলায় কথা বলতে থাকি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় গ্লাস পানীয় খেয়ে আজ কোম হঠাৎ করে অনর্গল কথা বলতে শুরু করল। আমার দিকে তাকিয়ে টেবিলে থাবা দিয়ে বলল, "কিরি, তুমি একটা গণ্ডমূর্খ ছাড়া আর কিছু নও। তাই তুমি বিশ্বাস কর যে তোমার জন্ম হয়েছে বাবা–মায়ের ভালবাসা থেকে।"

আমার কথাবার্তা যেরকম প্রায় সব সময়েই রূঢ় শোনায় কোমের বেলায় ব্যাপারটি ঠিক উল্টো। সে রূঢ় কোনো কথা বললেও সেটিকে কেমন জানি ছেলেমানুষি শোনায়। আমি আমার পানীয়ে চুমুক দিয়ে বললাম, "আমি কী বিশ্বাস করতে চাই সেটা পুরোপুরি আমার ব্যাপার।"

"কিন্তু যুক্তিহীন বিশ্বাস অর্থহীন।"

"বিশ্বাসমাত্রই যুক্তিহীন। যদি সত্যিকারের যুক্তি দিয়ে একটা কিছু প্রমাণ করা যায় তা হলে সেটাকে বিশ্বাস করতে হয় না—সেটা তখন সবাই এমনিতেই মেনে নেয়। যার পিছনে কোনো যুক্তি নেই শুধুমাত্র সেটাকেই বিশ্বাস করতে হয়।"

কোম ভুরু কুঁচকে বলল, "তুমি কোথা থেকে এ রকম আজগুবি কথা শুনেছ?"

"এটা মোটেও আজগুবি কথা নয়। তুমি নিশ্চয়ই ইতিহাস পড় নি। ইতিহাস পড়লে জানতে প্রাচীনকালে মানুষ ধর্ম বলে একটা জিনিস বিশ্বাস করত। সেটার কোনো প্রমাণ ছিল না, ধর্মের পুরোটাই গড়ে উঠেছিল বিশ্বাস থেকে।"

কোম অনাবশ্যকভাবে মুখের মাংসপেশি শক্ত করতে করতে বলল, "সত্যি কথাটা স্বীকার করে নাও কিরি। সত্যিকারের কোনো বাবা–মা কখনোই তাদের সন্তানকে অনাথ আশ্রমে দেবে না। শুধুমাত্র একটা ক্লোনই অনাথ আশ্রমে বড় হতে পারে।"

আমি বাধা দিয়ে বললাম, "তুমি জান মানুষের ক্লোন তৈরি করা গত শতাব্দীতে বেআইনি ঘোষণা করা হয়েছে।"

"তাতে কী হয়েছে? ভিচুরিয়াস মাদকও দুই শতাব্দী আগে বেআইনি ঘোষণা করা হয়েছে। তুমি যদি চাও এখনই আমি এই ঘর থেকেই দশ মিলিগ্রাম খাঁটি ভিচুরিয়াস কিনে দিতে পারব।"

"ভিচুরিয়াস মাদক আর মানুষের ক্লোন এক জিনিস হল? হাজার দশেক ইউনিট থাকলেই ভিচুরিয়াস তৈরি করার জন্য সিনথেসাইজার কেনা যাবে। ক্লোন তৈরি করার বায়োজ্যাকেট কি এত সহজে কিনতে পারবে?"

"কেন পারব না?" কোম সরু চোখে বলল, "ব্ল্যাক মার্কেটে নিউক্লিয়ার পাওয়ারের মেগা ব্লাস্টার পাওয়া যায়, সে তুলনায় বায়োজ্যাকেট কিছুই না।"

"কিন্তু যখন আইন রক্ষাকারী রোবটগুলো পিছনে লেগে যাবে, জীবনের শান্তি কি বাকি থাকবে একফোঁটা? এত বড় ঝুঁকি নিয়ে কারা মানুষের ক্লোন তৈরি করবে? কেন করবে?"

"শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিক্রি করার জন্য।"

"কার কাছে বিক্রি করার জন্য?"

"ক্রিমিনালদের কাছে। আন্তঃগ্রহ পরিবহনে দুর্ঘটনায় যেসব ক্রুদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নষ্ট হয় তাদের কাছে।

আমি আমার হাত ছড়িয়ে দিয়ে বলি, "এই দেখ, আমার হাত–পা, নাক, চোখ–মুখ সব আছে—কেউ কোথাও বিক্রি করে দেয় নি।"

কোম এত সহজে তর্কে হার মানতে রাজি নয়, মাথা নেড়ে বলল, "হয়তো তোমার শরীরের ভিতরে পুরো জিনিসপত্র নেই। লিভার রয়েছে একটুখানি, কিডনি অর্ধেকটা, হৃৎপিণ্ডের ভাল্‌ভ হয়তো নেই।"

আমি হেসে বললাম, "আমি পুরোপুরি সুস্থ পূর্ণাঙ্গ একজন মানুষ। গত মাসে চেকআপে আমি তিরানব্বই পয়েন্ট পেয়েছি।"

"কত?"

"তিরানব্বই।"

কোম শিস দেওয়ার মতো শব্দ করে বলল, "নিশ্চয়ই ভুল দেখেছ, সংখ্যাটি ছিল ঊনচল্লিশ, ভুল করে তুমি পড়েছ তিরানব্বই।"

"না ভুল দেখি নি। সংখ্যাটি ডেসিমেল এবং কোয়ার্টানারিতে ছিল, ভুল হওয়ার কোনো উপায় নেই।"

কোম হাতের পানীয়টুকু গলায় ঢেলে চোখ মটকে বলল, "হয়তো তোমার মস্তিষ্কের নিউরন সংখ্যা কম। হয়তো তোমার সেরেব্রাল কর্টেক্স থেকে এক খাবলা তুলে নেওয়া হয়েছে, তোমার বুদ্ধিমত্তা হয়তো শিম্পাঞ্জির কাছাকাছি। তোমার রিফ্লেক্স হয়তো একটা সরীসৃপের সমান।"

মস্তিষ্কে নিফ্রাইটের পরিমাণ বেশি হওয়ার কারণে আমাদের আলোচনা কোন দিকে অগ্রসর হত বলা মুশকিল, কিন্তু ঠিক এই সময়ে পানশালাতে একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটল। সশব্দে দরজা খুলে ভিতরে তিন জন মানুষ এসে ঢুকল, তাদের শরীরে কালো নিওপলিমারের আবরণ, মুখ ঢাকা এবং চোখে ইনফ্রারেড গগলস। তাদের সবার হাতেই এক ধরনের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। সামনের মানুষটি, যাকে দেখে একজন মেয়েমানুষ বলে সন্দেহ হচ্ছিল, স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটি উপরের দিকে তাক করে একপসলা গুলি করে উপস্থিত সবার দিকে তাকিয়ে খসখসে গলায় বলল, "এটা একটা লুণ্ঠন প্রক্রিয়া। আমরা ঠিক দুই মিনিট তেত্রিশ সেকেন্ডে এখান থেকে চলে যাব বলে ঠিক করেছি। কেউ এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করলে এগিয়ে আস।"

ঘরের উপস্থিত পুরুষ এবং মেয়েরা আতঙ্কে ফ্যাকাসে হয়ে টেবিল বা পরদার আড়ালে লুকিয়ে যেতে শুরু করে। মেয়েটি অস্ত্রটি উপরে তুলে বলল, "যে যেখানে আছ সেখানেই দাঁড়িয়ে থাক। আমাদের কাজ শেষ করার আগে কেউ নড়তে পারবে না। আমরা এখানে এসেছি একটা ভালো হৃৎপিণ্ডের জন্য।"

মেয়েটা উপস্থিত মানুষগুলোর দিকে একনজরে তাকিয়ে ঘরের এক কোনায় বসে থাকা একজন কিশোরীর দিকে ইঙ্গিত করল, "তুমি এগিয়ে এস।"

মুহূর্তে কিশোরীটির মুখ রক্তশূন্য হয়ে যায়। সে কোনোমতে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি?"

"হ্যাঁ, তুমি।"

"না"—কিশোরীটি চিৎকার করে বলল, "না!"

"হ্যাঁ তুমি। সময় নষ্ট করে লাভ নেই, তাড়াতাড়ি চলে এস।"

কিশোরী-মেয়েটি একটা টেবিল ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভয়ার্ত গলায় কাঁদতে শুরু করল। স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র-হাতের মেয়েটি বিরক্ত গলায় বলল, "কী হচ্ছে?"

কিশোরীটি তবুও দাঁড়িয়ে রইল দেখে মেয়েটি তার সাথের দুজন মানুষকে ইঙ্গিত করতেই তারা ছুটে গিয়ে দুজন দুপাশ থেকে কিশোরী-মেয়েটিকে ধরে ফেলল। মেয়েটি ভয়ার্ত গলায় একটা আর্তনাদ করে ওঠে।

আমি কী করছি নিজেও খুব ভালো করে জানি না—হঠাৎ আবিষ্কার করলাম আমি উঠে দাঁড়িয়ে উঁচুগলায় বলছি, "দাঁড়াও।"

মেয়েটা এবং তার সঙ্গী দুজন সাথে সাথে অস্ত্র হাতে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। আমি খুব স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে দুই পা হেঁটে গেলাম, কোনো একটি বিচিত্র কারণে আমার কাছে পুরো

ব্যাপারটিকে একটি ছেলেমানুষি কাজ বলে মনে হতে লাগল। স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র বুকের দিকে তাক করে রাখলে যেরকম ভয় লাগার কথা আমার একেবারেই সেরকম ভয় লাগছিল না। মেয়েটি চিৎকার করে বলল, "কী চাও তুমি?"

"আমি গত মাসে চেকআপ করিয়েছি। খুব শক্ত এবং তাজা একটা হৃৎপিণ্ড রয়েছে আমার বুকের ভিতরে। ঐ বাচ্চা মেয়েটাকে ছেড়ে আমাকে নিয়ে যাও।"

মেয়েটির মুখ মুখোশে ঢাকা বলে তার মুখভঙ্গি দেখতে পেলাম না কিন্তু তার ক্রুদ্ধ গলার স্বর হিসহিস করে ওঠে, "আমি কাকে নেব সেটা আমি ঠিক করব—নির্বোধ কোথাকার।"

আমি আরো দুই পা এগিয়ে মেয়েটার কাছাকাছি চলে গিয়ে বললাম, "তার জন্য একটু দেরি হয়ে গেছে।"

"কী বলতে চাইছ তুমি?"

তুমি যতক্ষণে ঐ ট্রিগার টানবে তার আগে আমি তোমার পাঁজরের দুটি হাড় ভেঙে দিতে পারি।"

মেয়েটি মনে হয় নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না। আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েছিলাম, আমাকে গুলি করার জন্য একটু দূরে যেতে হবে, ঘুরতে শুরু করা মাত্রই ঝাঁপিয়ে পড়া যাবে। পিছনে আরো দুজন আছে কিন্তু আমি এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছি মেয়েটিকে বাঁচিয়ে আমাকে গুলি করা কঠিন—জেনেশুনে কেউ সে ঝুঁকি নেবে না।

মেয়েটির শরীর নড়তে শুরু করা মাত্র আমি শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে পা দিয়ে তাকে আঘাত করলাম, বিকেলবেলা যখন কিছুই করার থাকে না উঁচু দেয়ালে চক দিয়ে ক্রসচিহ্ন এঁকে আমি এভাবে সেখানে পা দিয়ে আঘাত করে করে নিজেকে ক্লান্ত করে ফেলি। সত্যিকার কখনো এটা ব্যবহার করতে হবে ভাবি নি, কিন্তু যখন ব্যবহার করা হল ব্যাপারটি মোটেও কঠিন মনে হল না।

আমি যখন আবার নিচে নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়েছি তখন মেয়েটি মেঝেতে মুখ থুবড়ে কাতরাচ্ছে, বলেছিলাম দুটি পাঁজরের হাড় ভেঙে দেব, মেয়েটিকে দেখে মনে হল সংখ্যা একটু বেশি হতে পারে। এখনো দুজন সশস্ত্র মানুষ রয়েছে তাদেরকে সামাল দেওয়ার একটি মাত্র উপায়। আমি শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে বিদ্যুদ্বেগে নিচে পড়ে থাকা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটি তুলে নিলাম। এই 'যন্ত্রটি' কীভাবে ব্যবহার করতে হয় আমি জানি না কিন্তু সেই কথাটি আর কারো জানার কথা নয়। আমি কপাল থেকে চুল সরিয়ে অত্যন্ত শান্ত গলায় বললাম, "অস্ত্র ফেলে দুই হাত তুলে দাঁড়াও। অন্য কিছু করার চেষ্টা করলে সেটা নিজের দায়িত্বে করবে। বুঝতেই পারছ উপায় থাকলে আমি শারীরিক আঘাত করে শুইয়ে দিতাম কিন্তু এত দূর থেকে সেটা করতে পারব না। মেরে ফেলা ছাড়া আর কিছু করার নেই।"

এক মুহূর্তের জন্য মনে হল মানুষ দুজন শেষ চেষ্টা করবে—কিন্তু আমার কঠিন শান্ত ভঙ্গি দেখে শেষ পর্যন্ত করল না। অস্ত্র ফেলে হাত উঁচু করে দাঁড়াল। কিশোরী–মেয়েটি সাথে সাথে নিজেকে মুক্ত করে আমার কাছে ছুটে আসে, আমার বুকের কাপড় ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে। আমি কী করব ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটির কোথাও বেকায়দা চাপ দিয়ে গুলি না করে ফেলি সেভাবে ধরে রেখে কিশোরী–মেয়েটির মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম, "একটু সময় দাও আমাকে, নির্বোধ মানুষগুলোকে বেঁধে ফেলি।"

আমার কথা শেষ হবার আগেই বেশ কয়েকজন ঝাঁপিয়ে পড়ে মানুষ দুজনকে মেঝেতে ফেলে দিয়ে হাত পিছনে বেঁধে ফেলতে শুরু করল।

AMARBOI.COM

আমি যখন আমার টেবিলে কোমের কাছে ফিরে গেলাম তখন পানশালার বেশিরভাগ মানুষ আমাকে ঘিরে রেখেছে। তাদের প্রায় সবারই ধারণা আমি সম্ভবত বিশেষ সামরিক অস্ত্রাগারে তৈরি একটি প্রতিরক্ষা রোবট। আমি মাথা নেড়ে সেটা অস্বীকার করার পরেও তারা সেটা বিশ্বাস করতে রাজি হল না।

কোম দীর্ঘসময় চুপ করে থেকে বলল, "আমি সবসময় তোমার সাথে ঠাট্টা করে বলে এসেছি যে তুমি একটি ক্লোন। আজকে আমি নিশ্চিত হলাম।"

আমি হাসতে হাসতে বললাম, "কেন?"

"তুমি যে ক্ষিপ্রতায় খ্যাপা মেয়েটিকে আঘাত করেছ সেটি কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নয়। তুমি নিশ্চয়ই ল্যাবরেটরিতে তৈরি করা একটা প্রাণী! তুমি নিশ্চয়ই ক্লোন।"

"ঠিক আছে কিন্তু আমি মানুষ সেটা তো স্বীকার করবে? নাকি তুমিও বিশ্বাস কর আমি একটা প্রতিরক্ষা রোবট?'

"কী জানি!" কোম মাথা নেড়ে বলল, "আমি আর কোনোকিছুই এখন বিশ্বাস করতে পারছি না।"

আমি যখন পানশালা থেকে বের হলাম তখন মধ্যরাত্রি। কৃত্রিম জ্যোৎস্নার নরম আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। কোথায় জানি পড়েছিলাম রাতের বেলায় মাইলারের পরদা দিয়ে মহাকাশ থেকে সূর্যের আলো প্রতিফলন করিয়ে কৃত্রিম জ্যোৎস্না তৈরি করা নিয়ে একসময় পৃথিবীতে বড় ধরনের বিতর্ক হয়েছিল। কৃত্রিম জ্যোৎস্না সৃষ্টি করার আগে কৃষ্ণপক্ষে অমাবস্যা নামক একটি ব্যাপার ঘটত, তখন নকি আলো না জ্বালিয়ে রাখলে সারা পৃথিবী গভীর অন্ধকারে ঢেকে যেত। ব্যাপারটি কী রকম আমরা এখন ভালো করে কল্পনাও করতে পারি না।

বাইরে বেশ ঠাণ্ডা, কনকন করে শীতের বাতাস বইছে। নিও পলিমারের পোশাকের উত্তাপ বাড়িয়ে দিতে এক ধরনের আলসেমি লাগছিল, আমি জ্যাকেটের কলার দুটি উঁচু করে পকেটে হাত ঢুকিয়ে অন্যমনস্কভাবে হাঁটছিলাম।

"আমি কি তোমার সাথে খানিকক্ষণ হাঁটতে পারি?" গলার স্বর শুনে আমি চমকে উঠে মাথা ঘুরিয়ে তাকালাম। আমার পাশে পাশে হাঁটছে সোনালি চুলের একটি মেয়ে। মেয়েটিকে আমি পানশালায় দেখেছি, আরো কয়েকজন মানুষের সাথে এসেছিল। কৃত্রিম জ্যোৎস্নায় ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, মেয়েটির চোখ নীল, ত্বক কোমল এবং মসৃণ। মেয়েটি সম্ভবত সুন্দরী কিন্তু তবুও চেহারায় কোথায় জানি এক ধরনের কৃত্রিমতা রয়েছে—সেটি ঠিক ধরতে পারলাম না। আমি বললাম, "অবশ্যই হাঁটতে পার। আগে থেকে বলে রাখছি হাঁটার সঙ্গী হিসেবে আমি কিন্তু একেবারে যাচ্ছেতাই।"

"তাতে কিছু আসে-যায় না। আজকে পানশালায় তুমি যেভাবে ঐ চরিত্রগুলোকে ধরেছ তার তুলনা নেই। আমি বাচ্চা মেয়ে হলে ডাইরিতে তোমার অটোগ্রাফ নিয়ে রাখতাম।"

আমি হেসে বললাম, "ওরকম পরিস্থিতিতে শরীরে এড্রিনেলিনের প্রবাহ বেড়ে যায় বলে অনেক কিছু করে ফেলা যায়।"

মেয়েটা আমার গা ঘেঁষে হাঁটতে হাঁটতে বলল, "আমি প্রতিরক্ষাবাহিনীতে কাজ করি, কোনটা এড্রিনেলিনের প্রবাহ দিয়ে করা যায়, কোনটা করার জন্য অমানুষিক দক্ষতার প্রয়োজন হয়—আমি খুব ভালো করে জানি।"

AMARBOI.COM

আমি কী বলব বুঝতে না পেরে চুপ করে রইলাম। মেয়েটি বলল, "আমার নাম লানা। আমি প্রতিরক্ষা দপ্তরে দ্বিতীয় কমান্ডিং অফিসার।"

আমি লানা নামের মেয়েটির দিকে ভালো করে তাকালাম। কমান্ডিং অফিসার কথাটি শুনলেই আমার চোখে উঁচু চোয়ালের ভাবলেশহীন একজন মানুষের চেহারা ভেসে ওঠে। সোনালি চুল, নীল চোখ আর কোমল ও নরম ত্বকের একটি মেয়েকে কেন জানি মোটেই কমান্ডিং অফিসার বলে মনে হয় না।

লানা ঘুরে আমার দিকে তাকাল, বলল, "কী হল, পরিচয়টা বেশি পছন্দ হল না?"

আমি হাসার চেষ্টা করে বললাম, "পছন্দ হবে না কেন? আমি তো আর গোপন ভিচুরিয়াস তৈরি করি না যে প্রতিরক্ষাবাহিনীর কমান্ডার শুনে আঁতকে উঠব!"

"কী কর তুমি?"

"বিশেষ কিছু করি না। একটা মাঝারি আকারের হলোগ্রাফিক ডাটা সেন্টার দেখাশোনা করি।"

লানা শিস দেওয়ার মতো শব্দ করে বলল, "কী বলছ তুমি! তোমার মতো একজন মানুষ ডাটা সেন্টার দেখাশোনা করে?"

"আমি অনাথ আশ্রমে বড় হয়েছি। যারা অনাথ আশ্রমে বড় হয় তাদের জীবনে বড় সুযোগগুলো কখনোই আসে না। মাঝারি এবং ছোট সুযোগগুলোও আমরা চোখে দেখি না। আমাদের পুরো জীবনটা কাটে বড় বড় বিপর্যয়কে পাশ কাটিয়ে।"

লানা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "তুমি প্রতিরক্ষাবাহিনীতে ভালো করতে।"

আমি অবাক হবার ভঙ্গি করে বললাম, "কী বলছ তুমি? আমি জানতাম গায়ের জোর দিয়ে যুদ্ধ করত গুহা-মানবেরা! আজকাল মারপিট করা হয় যন্ত্র দিয়ে—রোবটেরা করে।"

"সেটা তুমি ঠিকই জান। কিন্তু এক মুহূর্তের মাঝে অসম্ভব জটিল কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে ভয়ঙ্কর কিছু কাজ করার ব্যাপারটি এখনো মানুষ ছাড়া আর কেউ করতে পারে না। আর সেরকম মানুষ পৃথিবীতে খুব বেশি নেই।"

"আমি সেরকম একজন?"

"হ্যাঁ।" লানা কথা না বলে আমার পাশে পাশে কিছুক্ষণ হাঁটতে থাকে। আমি কী নিয়ে কথা বলব ঠিক বুঝতে না পেরে শহরের তাপমাত্রা নিয়ে একটা কথা বলতে যাচ্ছিলাম ঠিক তখন মেয়েটা বলল, "তুমি কি প্রতিরক্ষাবাহিনীতে যোগ দিতে চাও?"

আমি একটু হকচকিয়ে গেলাম, কী বলব বুঝতে না পেরে হাসার ভঙ্গি করে বললাম, "তোমার ধারণা আমি খুব সাহসী মানুষ, আমি আসলে ভীতু এবং দুর্বল।"

"ভীতি, দুর্বলতা এসব হচ্ছে মানুষের মস্তিষ্কের এক ধরনের ইলেকট্রো কেমিক্যাল বিক্রিয়া। ছোট একটা ক্যাপসুল দিয়ে সে সব কিছু দূর করে দেওয়া যায়।"

আমি ওই মেয়েটির দিকে আবার তাকালাম, আমার হালকা কথাবার্তাকে মেয়েটা সহজভাবে না নিয়ে গুরুগম্ভীর কথা বলতে শুরু করেছে। সত্যি সত্যি আমাকে নিশ্চয়ই প্রতিরক্ষাবাহিনীতে নিতে চায়। আমি মুখটা একটু গম্ভীর করে বললাম, "দেখ, আজকে পানশালায় আমি যে কাজটা করেছি সেটা করেছি হঠাৎ করে একটা ঝোঁকের মাথায়। এ ধরনের ভায়োলেন্ট কাজ আমি শুধুমাত্র ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ করেই করতে পারব। ঠাণ্ডা মাথায় কখনো করতে পারব না।"

"কিন্তু—!"

AMARBOI.COM

আমি বাধা দিয়ে বললাম, "আমাকে শেষ করতে দাও। শুধু যে করতে পারব না তাই নয়, আমি করতেও চাই না।"

লানা একটা আহত দৃষ্টি দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে একটা নিশ্বাস ফেলল, কিন্তু কিছু বলল না। আমরা নিঃশব্দে আরো কয়েক পা হেঁটে গেলাম এবং লানা হঠাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে ব্যাগ থেকে একটা চতুষ্কোণ কার্ড বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "আমার কার্ড।"

আমি কার্ডটি হাতে নিলাম। মধ্যবিত্ত মানুষের স্বল্পমূল্যের কার্ড নয় এটি, রীতিমতো হলোগ্রাফিক মালটিকমিউনিকেশান্স কার্ড। বিজ্ঞানবিষয়ক সাপ্তাহিকীতে এর উপরে লেখা দেখেছি, কখনো নিজের চোখে দেখি নি। ছোট লাল বোতামে স্পর্শ করলে সাথে সাথে মেয়েটির সাথে হলোগ্রাফিক স্ক্রিনে যোগাযোগ করা যাবে। লানা বলল, "আমি জানি তুমি প্রতিরক্ষাবাহিনীতে যোগ দিতে চাও না কিন্তু তবু যদি কোনো কারণে আমার সাথে যোগাযোগ করতে চাও এই কার্ডটি ব্যবহার কোরো।"

"কী নিয়ে যোগাযোগ করব?"

লানা মিষ্টি করে হেসে বলল, "সেটি তোমার ইচ্ছা।" একটু থেমে বলল, "আমি তা হলে আসি। তোমার সাথে পরিচয় হয়ে ভালো লাগল।"

"ধন্যবাদ লানা।"

লানা হেঁটে হেঁটে দূরে লেভিটেশান টার্মিনালে অদৃশ্য না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমি সেদিকে তাকিয়ে রইলাম।

রাত আরো গভীর হয়েছে। আমার এখন বাসায় গিয়ে ঘুমানোর কথা, কিন্তু যে কারণেই হোক আমার বাসায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না। আমি হেঁটে হেঁটে নিজেকে ক্লান্ত করে ফেলতে চাই। মাঝে মাঝে আমার বুকের ভিতরে গভীর এক ধরনের নিঃসঙ্গতা এসে ভর করে। কী করে সেই নিঃসঙ্গতা দূর করা যায় আমি জানি না। আমি তখন একা একা শহরের আনাচে-কানাচে হাঁটতে থাকি।

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একসময় আমি আবিষ্কার করলাম আমি শহরের নির্জন পার্কের কাছে চলে এসেছি। ভিচুরিয়াসের নতুন একটি কম্পাউন্ড বের হবার পর থেকে শহরে ছোটখাটো অপরাধ খুব বেড়ে গেছে। নির্জন এলাকায় একটু পরে পরে দৃষ্টিক্ষেপণ মডিউল বসানো হয়েছে, এতে অপরাধীদের ধরে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারটি খুব সহজ হয়ে গেছে সত্যি কিন্তু অপরাধের সংখ্যা এতটুকু কমে নি। আমি এই নির্জন এলাকায় খ্যাপা কিছু ভিচুরিয়াসসেবীর হাতে ধরা পড়তে চাই না। পার্ক থেকে বের হবার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই আমি দেখলাম একটু দূরে চার জন মানুষ এক সারিতে দাঁড়িয়ে আছে।

কৃত্রিম জ্যোৎস্নার নরম আলোতে মানুষগুলোকে এক ধরনের প্রেতাত্মার মতো দেখাতে থাকে। আমি বুকের ভিতরে এক ধরনের আতঙ্কের কাঁপুনি অনুভব করি। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমরা কে?"

মানুষগুলো কোনো উত্তর না দিয়ে এক পা এগিয়ে এল। আমি কাঁপা গলায় আবার জিজ্ঞেস করলাম, "তোমরা কে? কী চাও?"

চার জন মানুষের মাঝে অপেক্ষাকৃত খাটো মানুষটি মাটিতে থুতু ফেলে বলল, "রোবটের বাচ্চা রোবট।"

পানশালায় যে মানুষগুলো এসেছিল এরা নিশ্চয়ই তাদের দলের লোক। নিশ্চয়ই এরা প্রতিশোধ নিতে এসেছে। আমি কষ্ট করে নিজের গলার স্বর শান্ত রেখে বললাম, "আমাকে যেতে দাও।"

AMARBOI.COM

খাটো মানুষটি হিসহিস শব্দ করে বলল, "তোমাকে নরকে যেতে দেব।"

"কী চাও তোমরা?"

"তোমার মুণ্ডু দিয়ে বল খেলতে চাই। চামড়া দিয়ে টেবিলক্লথ বানাতে চাই। রক্ত দিয়ে গ্রাফিতি আঁকতে চাই।"

আমি নিজের ভিতরে এক ধরনের ক্রোধ অনুভব করতে থাকি এবং হঠাৎ করে আমার সমস্ত আতঙ্ক উবে গিয়ে সেখানে বিচিত্র এক ধরনের শক্তি এসে ভর করে। মনে হতে থাকে চোখের পলকে আমি চার জন মানুষকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারব। আমি কষ্ট করে নিজেকে শান্ত রেখে বললাম, "তোমরা কে আমি জানি না। আমার জানা প্রয়োজন নেই। ঠিক দশ সেকেন্ড সময় দিচ্ছি এর মাঝে—"

"চুপ কর বেটা পিত্তথলি। সিফিলিসের ব্যাক্টেরিয়া।"

খাটো চেহারার মানুষটা কথা শেষ করার আগেই একসাথে দুজন মানুষ আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি প্রস্তুত ছিলাম, তারা আমার নাগালে আসার আগেই আমি শূন্যে লাফিয়ে উঠে সমস্ত শরীর ঘুরিয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে দুজনকে লাথি দিয়ে নিচে ফেলে দিলাম। মানুষ দুজন নিচে পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল, আমি তাদের দিকে নজর না দিয়ে বাকি দুজনের দিকে তাকালাম। শান্ত গলায় বললাম, "দশ সেকেন্ড সময় দিয়েছিলাম, তার মাঝে দুই সেকেন্ড পার হয়ে গেছে আর আট সেকেন্ড—"

আমার কথা শেষ করার আগেই দুজনের মাঝে অপেক্ষাকৃত লম্বা মানুষটি পোশাকের ভিতর থেকে একটা জিরকনালাইটের ছোরা বের করে আনে, কোথায় একটা চাপ দিতেই ধারালো ফলাটা বের হয়ে আসে। কৃত্রিম জ্যোৎস্নার আলোতেও আমি পরিষ্কার দেখতে পেলাম ছোরার ফলায় সাদা পাউডারের মতো নিহিলা বিষ চকচক করছে। পেশাদার অপরাধীরা আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার না করে মাঝে মাঝে নিহিলা বিষ মাখানো জিরকনালাইটের ছোরা ব্যবহার করে শুধুমাত্র অমানুষিক যন্ত্রণা দেবার জন্য।

আমি একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম, "তুমি ঐ ছোরাটা ব্যবহার করতে পারবে না। তার অনেক আগেই আমি তোমাকে শেষ করে দেব।"

মানুষটি আমার কথা বিশ্বাস করল না, ছোরা হাতে আমার দিকে লাফিয়ে এল, আমি সরে গিয়ে তার চোয়ালে একটা ঘুষি দিতে গিয়ে থেমে গেলাম। কারণ ঠিক তখন খাটো মানুষটি একটা প্রাচীন স্টান্টগান আমার দিকে তাক করে গুলি করার জন্য এগিয়ে এসেছে। আমি ঘুরে প্রায় তাদের উপর দিয়ে লাফিয়ে সরে এলাম, মানুষ দুজন একসাথে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়ে একজন আরেকজনকে জাপটে ধরল। আমি দেখতে পেলাম দীর্ঘকায় মানুষটি তার হাতে উদ্যত জিরকনালাইটের ছোরা উঁচু করে ধরেছে, পরমুহূর্তে অন্য মানুষটি অমানুষিক যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল—ভুল করে তার পাঁজরে ছোরা প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে।

নিহিলা বিষের যন্ত্রণা যে এত মারাত্মক আমি জানতাম না। মানুষটি অমানুষিক যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে আমার সামনেই কয়েকটা খিচুনি দিয়ে হঠাৎ নিথর হয়ে গেল। দীর্ঘকায় মানুষটি তখনো হতচকিতের মতো জিরকনালাইটের রক্তাক্ত ছোরাটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। আমি ক্লান্ত গলায় বললাম, "আমি কখনো ভাবি নি আমি একটা হত্যাকাণ্ড দেখব। আমার আত্মাকে তুমি আজকে দূষিত করে দিলে নির্বোধ মানুষ।"

কালো গ্রানাইটের টেবিলের অন্য পাশে একটি প্রতিরক্ষা রোবট এবং দুজন

আইনরক্ষাকারী অফিসার বসে আছে। অপেক্ষাকৃত কমবয়সী অফিসারটি আমার দিকে শীতল চোখে তাকিয়ে থেকে তৃতীয়বারের মতো জিজ্ঞেস করল, "কেন তুমি এই উচ্ছৃঙ্খল মদ্যপ মানুষটিকে হত্যা করলে?"

আমি তৃতীয়বার শান্ত গলায় বললাম, "আমি এই মানুষটিকে হত্যা করি নি।"

মানুষটি একটু অধৈর্য হয়ে বলল, "তুমি কেন এখনো অর্থহীন কথা বলছ? তুমি যেখানে মানুষটিকে হত্যা করেছ ঠিক তার কাছে একটা দৃষ্টিক্ষেপণ মডিউল রয়েছে। পুরো ঘটনাটি নিখুঁতভাবে চিত্রায়িত হয়েছে। আমরা পরিষ্কার দেখেছি—"

"আমি বিশ্বাস করি না।"

দ্বিতীয় অফিসারটি একটু ঝুঁকে পড়ে বলল, "তুমি বিশ্বাস না করলে কিছু আসে-যায় না। যেটি সত্যি সেটি সত্যিই থাকবে।"

"আমি দৃষ্টিক্ষেপণ মডিউলের ছবিটি দেখতে চাই।"

"সময় হলেই তুমি দেখবে। রিগা কম্পিউটারের সামনে যখন আত্মপক্ষ সমর্থন করবে তখন তোমাদের পুরো ঘটনাটি দেখানো হবে।"

আমি একটু অধৈর্য হয়ে বললাম, "তোমরা ব্যাপারটি বুঝতে পারছ না। এখানে একটা বড় ভুল হয়েছে। ঘটনাটি যদি আমাকে দেখাও আমি তোমাদের বলে দিতে পারি কোথায় ভুলটি হয়েছে।"

কমবয়সী অফিসারটি হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গি করে রোবটটির দিকে ইঙ্গিত করতেই ঘরের মাঝামাঝি ত্রিমাত্রিক একটা ছবি দেখা যেতে শুরু করল। ছবিতে আমি নিজেকে দেখতে পেলাম, আমার সামনে চার জন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। খাটো মানুষটি আমাকে উদ্দেশ্য করে গালিগালাজ করছে এবং হঠাৎ করে দুই জন আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি তার আগেই প্রচণ্ড আঘাতে তাদের নিচে ফেলে দিয়েছি। এর পরের দৃশ্যটি দেখে হঠাৎ আমার শরীর শীতল হয়ে গেল। আমি স্পষ্ট দেখলাম আমি আমার পোশাকের ভিতর থেকে জিরকনালাইটের ধারালো ছোরা বের করে এনেছি। অসম্ভব ব্যাপার, এটি কী করে সম্ভব? আমি হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম, কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই দেখতে পেলাম আমি ধারালো ছোরা দিয়ে খাটো মানুষটিকে আঘাত করেছি। মানুষটি প্রচণ্ড আর্তনাদ করে নিচে পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল।

হলোগ্রাফিক দৃশ্যটি যেরকম হঠাৎ করে শুরু হয়েছিল ঠিক সেরকম হঠাৎ করে শেষ হয়ে গেল। কমবয়সী অফিসারটি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "এখন বল তোমার কী বলার আছে।"

আমি একটা গভীর নিশ্বাস নিয়ে বললাম, "আমার কিছু বলার নেই।"

"কিছু বলার নেই? বলবে না কেন মানুষটিকে কোনো প্ররোচনা ছাড়া আঘাত করলে?"

আমি মাথা নাড়লাম, "আমি আঘাত করি নি। দৃষ্টিক্ষেপণ মডিউল যে ছবি তুলেছে সেটার পরিবর্তন করা হয়েছে।"

পুলিশ অফিসারটি এমনভাবে আমার দিকে তাকাল যেন আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ কাঠ কাঠ স্বরে হা হা করে হেসে উঠে বলল, "তুমি কি সত্যিই আমাদেরকে এটা বিশ্বাস করতে বল? রিগা কম্পিউটার একটা অপরাধ-দৃশ্যের পরিবর্তন করেছে? আমরা যদি রিগা কম্পিউটারকে অবিশ্বাস করি তা হলে বিশ্বাস করব কিসে?"

আমি চুপ করে রইলাম। প্রাচীনকালে মানুষ যেভাবে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করত এখন সেভাবে রিগা কম্পিউটারকে বিশ্বাস করা হয়। ঈশ্বরকে অবমাননা করার জন্য প্রাচীনকালে

মানুষকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে, রিগা কম্পিউটারকে অবিশ্বাস করার জন্যও কি আমাকে সেভাবে শাস্তি দেওয়া হবে?

"তুমি কথা বলছ না কেন?"

"আমি সাধারণ মানুষের সাথে লড়তে পারি। কিন্তু রিগা কম্পিউটারের বিরুদ্ধে কীভাবে লড়ব? আমার কী বলার থাকতে পারে?"

পুলিশ অফিসারটি আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে বলল, "তুমি সত্যি বিশ্বাস কর যে তোমার তথ্যে পরিবর্তন করা হয়েছে?"

"আমি শুধু বিশ্বাস করি না, আমি জানি। আমি হঠকারী হতে পারি, নির্বোধ হতে পারি, আমি উন্মাদ হতে পারি, খ্যাপা হতে পারি, কিন্তু আমি কখনোই হত্যাকারী হতে পারি না।"

আমার সামনে বসে থাকা পুলিশ অফিসার দুজন আমার কোনো কথা বিশ্বাস করল বলে মনে হল না। রোবটটি হঠাৎ মাথা ঘুরিয়ে বলল, "ট্রাকিওশান লাগাতে হবে।"

আমি চমকে উঠে বললাম, "কী বললে? ট্রাকিওশান? আমার মাথায়?"

"হ্যাঁ।"

"কোনো প্রয়োজন নেই।" আমি ভয় পেয়ে মাথা নেড়ে বললাম, "আমি কথা দিচ্ছি আমি কোথাও যাব না।"

"আমরা জানি, তুমি কোথাও পালিয়ে যাবে না।"

"তা হলে?"

"বিচারে তুমি যতক্ষণ নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ না করছ—যেটা খুব সহজ হবে না, বলতে পার প্রায় অসম্ভব—ততক্ষণ তুমি একজন হত্যাকারী। সমাজের প্রতি আমাদের একটা দায়িত্ব রয়েছে।"

আমি ভালো করে তাদের কথা শুনতে পাচ্ছিলাম না, অস্পষ্ট গলায় বললাম, "দায়িত্ব?"

"হ্যাঁ। তোমাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার আমাদের আর কোনো উপায় নেই।"

আমি শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। পুলিশ অফিসারটি বলল, "আমি দুঃখিত কিরি।"

কিন্তু আমি জানি সে দুঃখিত নয়। এতটুকু দুঃখিত নয়।

AMARBOI.COM

২

"কিরি। ঘুম থেকে ওঠ, কিরি।"

আমি গভীর ঘুমে অচেতন হয়েছিলাম, ঘুম থেকে জেগে উঠতে ইচ্ছে করছিল না কিন্তু কণ্ঠস্বরটি আবার আমাকে ডাকল, "ওঠ কিরি। জেগে ওঠ।"

আমি কষ্ট করে নিজেকে জাগিয়ে তুললাম। কণ্ঠস্বরটি নরম গলায় বলল, "চোখ খুলে তাকাও কিরি।"

আমি চোখ খুলে তাকালাম। আমি ধবধবে সাদা একটা বিছানায় শুয়ে আছি। আমার মাথার কাছে কিছু মনিটর, পায়ের কাছে একটা নিচু টেবিলে কিছু যন্ত্রপাতি। শরীর থেকে কয়েক ধরনের টিউব বের হয়ে যন্ত্রপাতিতে গিয়েছে, সেখান থেকে নিচু শব্দ তরঙ্গের একটা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। আমি মাথা ঘুরিয়ে চারদিকে তাকালাম, আশপাশে কেউ নেই। কে তা হলে আমাকে ডেকে তুলল? এক ধরনের ক্লান্তিতে আমার চোখ বুজে আসছিল, আমি আবার চোখ বন্ধ করে ফেললাম।

"চোখ বন্ধ কোরো না কিরি।" কণ্ঠস্বরটি নরম গলায় বলল, "চোখ খুলে তাকাও।"

আমি আবার চোখ খুলে তাকালাম, "কে?"

"আমি।"

"আমি কে?" আম চারদিকে তাকিয়ে বললাম, "তুমি কোথায়?"

"আমাকে তুমি খুঁজে পাবে না কিরি।"

আমার ভিতরে হঠাৎ এক ধরনের আতঙ্ক এসে ভর করে, আমি পুরোপুরি জেগে উঠে ভয়-পাওয়া গলায় জিজ্ঞেস করলাম, "কেন তোমাকে খুঁজে পাব না?"

"কারণ, আমি তোমার ট্রাকিওশান।"

"ট্রাকিওশান!" আমি ধড়মড় করে উঠে বসার চেষ্টা করলাম, পাঁজরের এক কোনায় হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা করে ওঠে। মাথার পিছনে একটা ভোঁতা যন্ত্রণা অনুভব করতে শুরু করি। অদৃশ্য কণ্ঠস্বরটি হঠাৎ সুরেলা গলায় খিলখিল করে হেসে উঠল, বলল, "তোমার এত ব্যস্ত হবার কিছু নেই কিরি। আমি তোমার বন্ধু।"

"বন্ধু!"

"হ্যাঁ। তোমার মস্তিষ্কে আমাকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি তোমার সকল ইন্দ্রিয়কে এখন নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। ইচ্ছে করলে তোমাকে আনন্দ দিতে পারি। ইচ্ছে করলে দুঃখ দিতে পারি, কষ্ট দিতে পারি। তোমার সাথে কথা বলতে পারি—এখন যেরকম বলছি। তোমাকে—"

আমি অসহনীয় এক ধরনের আতঙ্ক অনুভব করতে থাকি। দুই হাতে মাথা চেপে ধরে বললাম, "চুপ কর। চুপ কর তুমি।"

"কেন?"

"আমি বলছি তাই।"

কণ্ঠস্বরটি আবার খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, "কিন্তু আমাকে তো সেভাবে প্রোগ্রাম করা হয় নি।"

"তোমাকে কীভাবে প্রোগ্রাম করা হয়েছে?"

"আমাকে প্রোগ্রাম করা হয়েছে তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। তুমি একজন হত্যাকারী। হত্যাকারীদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। আমি তোমাকে নিয়ন্ত্রণে রাখব কিরি।"

আমি দুই হাতে মাথা চেপে ধরে চিৎকার করে উঠলাম। ইচ্ছে করল শক্ত দেয়ালে মাথা ঠুকে খুলি ভেঙে ভিতর থেকে সবকিছু বের করে ফেলি।

"তুমি মিছেমিছি ব্যস্ত হচ্ছ কিরি।"

"চুপ কর। চুপ কর তুমি।"

"আমি দুঃখিত কিন্তু আমাকে সেভাবে প্রোগ্রাম করা হয় নি। আমাকে নিয়েই তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে। ব্যাপারটি তুমি যত তাড়াতাড়ি গ্রহণ করে নেবে ততই তোমার জন্য মঙ্গল।"

আমি অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত রেখে বললাম, "আমাকে কী করতে হবে?"

"তোমাকে আমার কথা শুনতে হবে।"

"শুনছি।"

"তোমাকে সবকিছু স্বীকার করতে হবে।"

"কী স্বীকার করতে হবে?"

"তুমি কেন বিনা প্ররোচনায় একটি মানুষকে হত্যা করেছ?"

"আমি কাউকে হত্যা করি নি।"

"করেছ।"

আমি চিৎকার করে বললাম, "করি নি। করি নি।"

আমার মাথার মাঝে ট্রাকিওশান খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, "তুমি নেহায়েত নির্বোধ একজন মানুষ। আমি কখনো শুনি নি একজন তার মস্তিষ্কে গেঁথে রাখা ট্রাকিওশানের কথার অবাধ্য হয়। আমি তোমাকে এমন যন্ত্রণা দিতে পারি যে মনে হবে কেউ তোমার শরীরের চামড়া একটু একটু করে খুলে নিচ্ছে! মনে হবে কানের মাঝে গলিত সীসা ঢেলে দিচ্ছে। মনে হবে সাঁড়াশি দিয়ে নখ উপড়ে নিচ্ছে। মনে হবে কপালের মাঝে ড্রিল দিয়ে—"

আমি চিৎকার করে বললাম, "চুপ কর—চুপ কর তুমি।"

"আমার কথার অবাধ্য হয়ো না কিরি।"

"আমাকে একটু সময় দাও। তোমার পায়ে পড়ি আমি। আমাকে একটু সময় দাও। একটু সময়—"

"দেব। নিশ্চয়ই দেব।" আমার মাথার মাঝে ট্রাকিওশান নরম গলায় বলল, "এখন আমি হচ্ছি তুমি, আর তুমি হচ্ছ আমি। আমি তোমাকে নিশ্চয় সময় দেব। তার আগে তুমি আমাকে বল কেন ঐ মানুষটিকে হত্যা করেছিলে?"

"আমি কাউকে হত্যা করি নি। রিগা কম্পিউটার আমার ছবি পাল্টে দিয়েছে।"

ট্রাকিওশানটি হঠাৎ চুপ করে গেল। আমি নিশ্বাস বন্ধ করে বসে রইলাম, আমার স্নায়ু টানটান হয়ে রইল অভাবিত কিছু একটা ঘটার জন্য কিন্তু কিছু ঘটল না। আমি ভয়ে ভয়ে ট্রাকিওশানকে ডাকলাম, "তুমি কোথায়?"

"আমি আছি। তোমার সাথেই আছি।"

"তুমি কেন চুপ করে আছ?"

"আমি রিগা কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ করছি। তার সাথে কথা বলছি।"

আমি চুপ করে বসে রইলাম। ট্রাকিওশানটি রিগা কম্পিউটারের সাথে কথা বলছে, আমি কি কারো সাথে কথা বলতে পারি না? কেউ কি নেই এই পৃথিবীতে যে আমাকে সাহায্য করতে পারে? আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম—আমার মতো অনাথ আশ্রমে বড় হওয়া মানুষ আসলেই বড় নিঃসঙ্গ। বড় অসহায়। বড় দুঃখী।

ঠিক এই সময়ে আমার লানার কথা মনে পড়ল। সোনালি চুল এবং নীল চোখের সেই মেয়েটি যে প্রতিরক্ষা দপ্তরের দ্বিতীয় কমান্ডিং অফিসার। যে আমাকে প্রতিরক্ষাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার কথা বলেছিল, চলে যাওয়ার সময় তার হলোগ্রাফিক মালটিকমিউনিকেশান্স কার্ডটি আমাকে দিয়েছিল। আমি পকেটে হাত দিতেই চতুষ্কোণ কার্ডটির শীতল স্পর্শ অনুভব করলাম। জোর করে আমাকে অচেতন করে আমার মাথায় অস্ত্রোপচার করার সময় এই কার্ডটি ইচ্ছে করলে ফেলে দিতে পারত, কিন্তু তারা ফেলে দেয় নি। আমি কার্ডটি বের করে লাল বোতামটি স্পর্শ করতেই কার্ডটিতে এক ধরনের ভোঁতা শব্দ হল, ছোট ছোট দুটি বাতি জ্বলে উঠল এবং হঠাৎ করে আমার সামনে ছোট একটি স্ক্রিনে লানার ত্রিমাত্রিক একটা ছবি ফুটে উঠল। লানা উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞেস করল, "কে? কে আমার সাথে যোগাযোগ করতে চাইছে!"

"আমি। আমি কিরি।"

"কিরি! কী ব্যাপার? তোমার কী হয়েছে?"

"আমি—আমি খুব বড় বিপদে পড়েছি লানা।"

"কী বিপদ?"

"সেটি অনেক বড় ইতিহাস—তোমাকে কীভাবে বুঝিয়ে বলব জানি না।"

"চেষ্টা কর।"

"আমার মাথায় একটা ট্রাকিওশান লাগানো হয়েছে।"

"ট্রাকিওশান!" লানা আর্তনাদ করে উঠল, "কেন?"

"আমি নাকি একজনকে খুন করেছি।"

লানা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে অনিশ্চিতের মতো বলল, "খুন?"

"কিন্তু আমি খুন করি নি। রিগা কম্পিউটার মিথ্যা বলছে।"

লানা শিস দেওয়ার মতো একটা শব্দ করে নিচু গলায় বলল, "তুমি সত্যি সত্যি খুব বড় বিপদে পড়েছ কিরি।"

"আমি জানি।"

"তোমাকে সাহায্য করা যাবে কি না আমি জানি না। কিন্তু আমি চেষ্টা করব।"

"লানা!"

"বল।"

"যদি খুব তাড়াতাড়ি কিছু একটা করা না হয় তা হলে আমাকে আর কেউ কোনোদিন সাহায্য করতে পারবে না।"

"আমারও তাই মনে হয়।"

AMARBOI.COM

প্রতিরক্ষা দপ্তরের কমান্ডিং অফিসারদের যেটুকু ক্ষমতা রয়েছে বলে আমি ধারণা করেছিলাম দেখা গেল তাদের ক্ষমতা তার থেকেও বেশি। কয়েক ঘণ্টার মাঝেই আমাকে বিশাল একটা হলঘরে এনে হাজির করা হল। হলঘরটিতে আবছা অন্ধকার, দেয়াল প্রায় দেখা যায় না। অনেক উঁচু ছাদ; সেখান থেকে এক ধরনের স্বচ্ছ নরম আলো বের হচ্ছে। ঘরের মাঝখানে কুচকুচে কালো কৃত্রিম গ্রানাইটের টেবিল। টেবিলের একপাশে উঁচু আরামহীন একটা শক্ত চেয়ারে আমি সোজা হয়ে বসে আছি। আমার সামনে টেবিলের অন্যপাশে তিন জন মাঝবয়সী মানুষ। এক জন পুরুষ, এক জন মহিলা, তবে তৃতীয় জন নিয়ে আমি নিশ্চিত নই। সে পুরুষ কিংবা মহিলা দুই-ই হতে পারে, আধুনিক কোনো রোবট হলেও অবাক হব না। পুরুষমানুষটি তার সামনে রাখা হলোগ্রাফিক স্ক্রিনে কিছু একটা দেখছে, স্ক্রিনটা আমার দৃষ্টিসীমা থেকে আড়াল করে রাখা আছে বলে মানুষটা কী দেখছে আমি জানি না। তার মুখভঙ্গি এবং মাঝে মাঝে সূক্ষ্ম এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে আমার দিকে তাকানোর ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল সম্ভবত সেখানে আমার সম্পর্কে কোনো তথ্য রয়েছে। আমি বেশ কিছুক্ষণ হল এভাবে বসে আছি, নিজে থেকে কথা শুরু করার কথা নয় কিন্তু ভিতরে ভিতরে অধৈর্য হয়ে আছি বলে হয়তো চেষ্টা করে দেখতে পারি। যদিও গত কয়েক ঘণ্টা আমার মস্তিষ্কে বসানো ট্রাকিওশানটি আমাকে কোনোভাবে উত্ত্যক্ত করছে না কিন্তু আমি ভিতরে ভিতরে এক ধরনের আতঙ্ক অনুভব করছি, ট্রাকিওশানটি হঠাৎ করে চালু হয়ে গেলে আমি স্বাভাবিকভাবে কথাও বলতে পারব বলে মনে হয় না।

আমার সামনে বসে থাকা মহিলাটি হঠাৎ চোখ তুলে বলল, "তুমি আমাদের কাছে কী চাও?"

"আমাকে অন্যায়ভাবে একটা খুনের—"

"অপ্রয়োজনীয় কথা বলার কোনো প্রয়োজন নেই।" মহিলাটি অনাবশ্যক রূঢ়তা

ব্যবহার করে আমাকে থামিয়ে দিল। আমি আগেও লক্ষ করেছি একজন মেয়ে যত সহজে কোমল ব্যবহার করতে পারে ঠিক তত সহজে রূঢ় ব্যবহার করতে পারে।

মহিলাটি গ্রানাইটের টেবিলে তার চমৎকার নখ দিয়ে শব্দ করে বলল, "তুমি ঠিক কী চাও?"

আমি একমুহূর্ত চিন্তা করে বললাম, "আমার মস্তিষ্কে যে ট্রাকিওশানটি বসানো হয়েছে সেটা সরাতে চাই।"

মহিলাটি সহৃদয়ভাবে হাসল, বলল, "এই তো চমৎকারভাবে ঠিক বিষয়ে কথা বলতে শিখে গেছ। তবে তোমার এই ইচ্ছাটি পূরণ করার ক্ষমতা আমাদের নেই। প্রতিরক্ষা দপ্তর বিচার বিভাগের সিদ্ধান্তে নাক গলাতে পারে না।"

"পারে।"

আমার কথা শুনে পুরুষ এবং মহিলা দুজনেই একটু চমকে উঠে আমার দিকে তাকাল। তৃতীয় মানুষটির কোনো ভাবান্তর হল না, এক ধরনের উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। মহিলাটি ভুরু কুঁচকে বলল, "পারে?"

"নিশ্চয়ই পারে।"

"তুমি কেন এ রকম কথা বলছ?"

"কারণ আমি নিশ্চিতভাবে জানি রিগা কম্পিউটার আমার সম্পর্কে কিছু তথ্য পরিবর্তন করেছে। এই ধরনের অন্যায় কাজ বিচ্ছিন্নভাবে হতে পারে না। আমি নিশ্চিত সেটা ইচ্ছাকৃত। যে পদ্ধতিতে একটি অন্যায় কাজ করা হয় সেখানে নিশ্চয়ই আরো অসংখ্য অন্যায় এবং অনিয়মিত কাজ করা হয়।"

মহিলাটি এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। পুরুষমানুষটি একটু ঝুঁকে পড়ে নিচু গলায় বলল, "তোমার অস্বাভাবিক শারীরিক ক্ষিপ্রতা থাকলেও বুদ্ধিমত্তা নিম্নশ্রেণীর।"

আমি এক ধরনের অসহায় অপমানবোধ অনুভব করি, অত্যন্ত রূঢ় কিছু একটা বলার ইচ্ছে খুব কষ্ট করে সংযত করতে হল। শান্ত গলায় বললাম, "আমি খুব সাধারণ মানুষ, খুব সাধারণ কাজ করি। আমার নিম্নশ্রেণীর বুদ্ধিমত্তা দিয়েই বেশ কাজ চলে যায়।"

"ঠিক চলে না। তা হলে এখানে এসে উপস্থিত হতে না।"

"হয়তো আমাকে এখানে উপস্থিত করা হয়েছে। হয়তো পুরো ব্যাপারটি পূর্বপরিকল্পিত।"

পুরুষমানুষটি এবারে শিস দেওয়ার মতো একটি শব্দ করে হেসে ফেলল এবং হঠাৎ করে তাকে একজন সহৃদয় মানুষের মতো দেখাতে থাকে। মানুষটি তার সামনে রাখা হলোগ্রাফিক স্ক্রিনে টোকা দিতে দিতে বলল, "আমরা যদি তোমার ট্রাকিওশানের যন্ত্রণা মিটিয়ে দিই তুমি আমাদের কী দেবে?"

"তোমরা যদি ট্রাকিওশানটি বের করে দাও—"

মানুষটি হাত তুলে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "আমি ট্রাকিওশান বের করার কথা বলি নি।"

আমি থতমত খেয়ে বললাম, "তা হলে?"

"ট্রাকিওশানের যন্ত্রণা মিটিয়ে দেওয়ার কথা বলেছি।"

"পার্থক্যটা কী?"

"তোমার মস্তিষ্কে যে ট্রাকিওশানটি রয়েছে, তার যে প্রোগ্রাম রয়েছে সেটা হচ্ছে একজন খুনিকে নিয়ন্ত্রণ করার ট্রাকিওশান। আমরা প্রোগ্রামটি পাল্টে দিতে পারি।"

"কী দিয়ে পাল্টে দেবে?"

"যদি দেখি তুমি আমাদের সত্যিকার কোনো কাজ করে দিতে পারছ তা হলে নিরীহ কোনো প্রোগ্রাম দিয়ে পাল্টে দিতে পারি। তোমাকে যন্ত্রণা না দিয়ে সেটি বরং তোমাকে সাহায্য করবে—"

"চাই না আমি।" আমি মাথা নেড়ে বললাম, "আমি চাই না আমার মস্তিষ্কের ভিতরে একটা ট্রাকিওশান বসে থাকুক—"

"আমিও চাই না এ রকম চমৎকার একটা দিনে অন্ধকার একটা ঘরে বসে একজন নিম্নশ্রেণীর খুনির সাথে তর্ক করি। কিন্তু তবু আমাকে সেটা করতে হয়।"

আমি আবার অসহায় অপমানবোধ অনুভব করতে থাকি। মানুষটা গলার স্বর একটু উঁচু করে বলল, "তোমার কিছু করার নেই। যদি আমাদের জন্য ছোট একটা কাজ করে দাও তোমার ট্রাকিওশানের প্রোগ্রাম পাল্টে দিতে পারি। ব্যস, আর কিছু বলে লাভ নেই।"

"প্রোগ্রামটা—"

মানুষটা অধৈর্যের মতো মাথা নেড়ে বলল, "আমি আর কিছু নিয়ে কথা বলতে চাই না। যদি রাজি থাক তা হলে বল রাজি আছি, আমাদের তথ্যকেন্দ্রে সেটা গ্রহণ করে নিই। যদি রাজি না থাক তা হলে বল রাজি নই, তোমার নিয়ন্ত্রণটা ট্রাকিওশানের পুরোনো প্রোগ্রামে ফিরিয়ে দিই।"

আমি প্রায় মরিয়া হয়ে বললাম, "কাজটা কী?"

"আমি জানি না। যদি জানতামও তোমাকে বলতাম না।"

"তা হলে—"

"আমি আর কিছু শুনতে চাই না।" মানুষটা হঠাৎ অনাবশ্যকভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, "তুমি রাজি থাকলে বল। আমি তোমাকে ঠিক দুই সেকেন্ড সময় দিচ্ছি।"

আমি একটা নিশ্বাস ফেললাম, প্রকৃতপক্ষে আমাকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনো সুযোগ দেওয়া হয় নি। পুরো ব্যাপারটা আসলে একটা বড় পরিকল্পনার অংশ, আমি কী বলি তাতে মনে হয় কিছু আসে-যায় না। আমাকে নিয়ে যেটা করার কথা সেটাই নিশ্চয়ই করা হবে। আমি ইচ্ছে করলে রাজি না হওয়ার ভান করতে পারি তাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। যদি রাজি হওয়ার ভান করি হয়তো ব্যাপারটা বোঝার একটু সময় পাব।

দুই সেকেন্ড অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই বললাম, "আমি রাজি।"

"চমৎকার।" মানুষটা না-পুরুষ না-রমণী চেহারার মানুষটিকে বলল, "ক্লিও, তুমি তা হলে কাজ শুরু করে দাও।"

ক্লিও খসখসে গলায় বলল, "সিস্টেম সাতানব্বই গ্রুপ বারো?"

"প্রোফাইলটা আরেকবার দেখে নাও। সিস্টেম সাতানব্বই দিয়ে কনফ্লিক্ট হতে পারে।"

"ঠিক আছে।"

ছোট একটা ঘরে সাদা একটা বিছানায় শুইয়ে আমার মস্তিষ্কের প্রোফাইল নেওয়া হল। একটা বড় মনিটরে ঝুঁকে পড়ে ক্লিও কিছু একটা দেখছিল, আমি জিজ্ঞেস করলাম, "ক্লিও।"

"কী হল?"

"তুমি কি মানুষ না রোবট?"

ক্লিও বিরক্ত হয়ে বলল, "কাজের সময় তুমি বড় বিরক্ত কর।"

আমি একটা নিশ্বাস ফেললাম, ক্লিও মানুষ নয়, রোবট।

প্রতিরক্ষা দপ্তর থেকে ফিরে আসার পর দুই দিন কেটে গেছে। এই দুই দিন নতুন

কিছুই ঘটে নি। আমার মাথায় ট্রাকিওশানটি রয়ে গেছে এবং প্রতিরক্ষা দপ্তর থেকে সেখানে নতুন একটি প্রোগ্রাম প্রবেশ করানো হয়েছে কিন্তু আমি এখনো তার কোনো সাড়া পাই নি। যেন কিছুই হয় নি সেরকম একটা ভান করে আমি কাজে গিয়েছি, গত দুই দিন কেন অনুপস্থিত ছিলাম সেটা নিয়ে আমাকে একটা ছোট কৈফিয়ত পর্যন্ত দিতে হয়েছে।

তৃতীয় দিন রাতে ঘুমাতে যাবার আগের মুহূর্তে আমার সাথে প্রথমবার যোগাযোগ করা হল। কমবয়সী একটা মেয়ের গলায় একজন আমাকে ফিসফিস করে ডাকল, "কিরি।"

কণ্ঠস্বরটি কার হতে পারে পুরোপুরি জানার পরও আমি চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলাম, "কে?"

"আমি। তোমার ট্রাকিওশান। তুমি ইচ্ছে করলে আমাকে ইশি বলে ডাকতে পার।"

"ইশি?"

"হ্যাঁ। আমি কি তোমার সাথে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারি?"

"তুমি বলতে চাইছ আমি যদি রাজি না হই তা হলে তুমি আমার সাথে কথা বলবে না?"

"না, বলব না। আমি সিস্টেম সাতানব্বই গ্রুপ বারো পয়েন্ট বি। আমি পুরোপুরি তোমার নিয়ন্ত্রণে। তোমার না চাওয়া পর্যন্ত আমার কোনো অস্তিত্ব নেই।"

"আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না।"

ইশি নামক সিস্টেম সাতানব্বই গ্রুপ বারো পয়েন্ট বি প্রোগ্রামটি তরল কণ্ঠে হাসার মতো শব্দ করে বলল, "পরীক্ষা করে দেখ। তুমি বল দূর হও হতভাগা—আমি তোমার কথা শুনতে চাই—আমি তা হলে তোমাকে আর বিরক্ত করব না।"

"সত্যি করবে না? কখনোই করবে না?"

"সেটা অবশ্য আমি বলতে পারব না।" ইশি গলার স্বরে খানিকটা গাম্ভীর্য এনে বলল, "প্রতিরক্ষা দপ্তরকে তুমি কথা দিয়েছ তাদের একটা কাজ করে দেবে। সেটা নিয়ে যদি প্রতিরক্ষা দপ্তর কিছু বলতে চায় তা হলে সেটা তোমাকে জানাতে হবে। তুমি শুনতে না চাইলেও তোমাকে জানাতে হবে।"

"ও।"

"তা হলে কী দাঁড়াল?" ইশি বলল, "তোমার সাথে কথা বলব নাকি বলব না?"

"এটা কি প্রতিরক্ষা দপ্তরের আদেশ?"

"অনেকটা সেরকম।"

আমি একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম, "তা হলে শোনা যাক। ব্যাপারটা নিয়ে আমার নিজেরও একটু কৌতূহল হচ্ছে।"

ইশি কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল, "তোমাকে ব্যাপারটা ঠিক কীভাবে বলব বুঝতে পারছি না। আমি গত দুই দিন তোমার চিন্তাভাবনাকে খুব কাছে থেকে পর্যবেক্ষণ করেছি। আমি দেখতে পেয়েছি তুমি মানুষটা খুব কোমল স্বভাবের। তোমাকে যে কাজটা করতে হবে সেটি তোমার স্বভাবের সাথে একেবারেই খাপ খায় না।"

"আমাকে কী করতে হবে?"

"একটা খুন করতে হবে।"

"খুন? কাকে?"

"কাকে নয় 'কী'-কে।"

AMARBOI.COM

"আমি বুঝতে পারছি না। যে জিনিসটা খুন করতে হবে সেটা যদি মানুষ না হয়ে থাকে তা হলে তুমি খুন কথাটা ব্যবহার করছ কেন? একটা যন্ত্র আমরা খুন করি না। আমরা ধ্বংস করি।"

"আমি যে জিনিসটার কথা বলছি সেটা মানুষের এত অবিকল প্রতিচ্ছবি, মানুষের এত সফল অনুকরণ যে সেটাকে মানুষ বলায় কোনো ত্রুটি নেই। তাই আমি খুন কথাটা ব্যবহার করছি।" ইশি এক মুহূর্ত দ্বিধা করে বলল, "তুমি যদি আপত্তিজনক মনে কর আমি এই শব্দটা ব্যবহার করব না।"

আমি হাত নেড়ে ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবার ভঙ্গি করে বললাম, "কী শব্দ ব্যবহার করা হল তাতে কিছু আসে–যায় না। কী কাজ করতে হবে সেটাই হচ্ছে আসল কথা।"

"তা ঠিক।"

"আমাকে তা হলে একটা রোবট ধ্বংস করতে হবে?"

"জিনিসটি পুরোপুরি রোবট নয়। এর ভিতরে রয়েছে কিছু যন্ত্র কিছু জৈবিক জিনিস আবার কিছু জিনিস যেটা যান্ত্রিকও নয় জৈবিকও নয়।"

"এটা কী? কোথা থেকে এসেছে?"

ইশি একটু ইতস্তত করে বলল, "ঠিক করে কেউ জানে না।"

"তার মানে তুমি আমাকে বলবে না।"

"বলতে পার। আমি খুব বেশি জানি না, কিন্তু যেটুকু জানি সেটুকুতেই নিষেধ রয়েছে।"

"তা হলে তুমি কেমন করে আশা কর কিছু না জেনেশুনে আমি হঠাৎ করে কাউকে খুন করে ফেলব?"

"তোমাকে যেটা জানানো প্রয়োজন সেটা আমরা জানাব। তা ছাড়া—"

"তা ছাড়া কী?"

"তোমাকে খুন করার জন্য আলাদা করে আমাদের কিছু করতে হবে না। তুমি নিজে তোমার সর্বশক্তি দিয়ে সেটিকে শেষ করার চেষ্টা করবে।"

"কেন এই কথা বলছ?"

"তুমি নিজেই বুঝতে পারবে। এই ভয়ঙ্কর যন্ত্র বা প্রাণীটি তোমাকে কোনো সুযোগ দেবে না। তুমি যদি তাকে হত্যা না কর সেটি তোমাকে চোখের পলকে হত্যা করে ফেলবে।"

"কেন?"

"এই খেলাতে সেটাই নিয়ম। আমরা খেলোয়াড় মাত্র। নিয়ম তো আমরা তৈরি করি নি।"

"ও!"

আমার আরো দুদিন কেটে গেল কোনোরকম যন্ত্রণা ছাড়াই। একদিন বিকেলে পানশালাতে গেলাম নিফ্রাইট মেশানো পানীয় খেতে। কোমের সাথে দেখা হল সেখানে, দুই গ্লাস নিফ্রাইট খেয়ে তার মস্তিষ্কে সিনাপ্সের খেলা চলছে, আমার দিকে চকচকে চোখে তাকিয়ে বলল, "এই যে প্রতিরক্ষা দপ্তরের রোবট!"

আমি ভিতর ভিতরে একটু চমকে উঠলাম। আমার মাথার ভিতরে একটা ট্রাকিওশানে প্রতিরক্ষা দপ্তরের একটা প্রোগ্রাম বসানো রয়েছে—আমাকে মনে হয় সত্যি এখন রোবট ডাকা যায়। কোম অবশ্য তার কিছু জানে না, ব্যাপারটি গোপন রাখার কথা। গোপন না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাখলে কী হবে আমি জানি না, কিন্তু ব্যাপারটা আমার পরীক্ষা করার সাহস হল না। কোম নিফ্রাইট মেশানো পানীয়ের তৃতীয় গ্লাসটিতে একটা ছোট চুমুক দিয়ে বলল, "তোমার চকচকে ভাবটি নেই, কেমন যেন ভুসভুসে হয়ে গেছ!"

আমি কোমের সামনে খালি চেয়ারে বসতে বসতে বললাম, "একসময় চকচকে ছিলাম তা হলে?"

"ছিলে। তোমার মন ভালো থাকলেই তোমাকে চকচকে দেখায়! তোমার নিশ্চয়ই মন খারাপ। কী হয়েছে বল?"

আমি একটু অবাক হয়ে কোমের দিকে তাকালাম, সত্যি কি আমাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে আমি খুব বড় দুঃসময়ের মাঝ দিয়ে যাচ্ছি! আমার খুব বলতে ইচ্ছে করল, কোম, তুমি সত্যিই বুঝেছ। আমার খুব মন খারাপ। আমার মাথায় একটা ধুরন্ধর ট্রাকিওশান বসানো আছে, সেটি আমাকে দিয়ে একটি খুন করিয়ে নিতে চায়। কিন্তু আমি সেটা বললাম না, শব্দ করে হেসে বললাম, "কোম, তুমি আর যা-ই কর কখনো মনোবিজ্ঞানীর চাকরি নিও না, না খেতে পেয়ে মারা যাবে।"

কোম একটু ঝুঁকে পড়ে বলল, "তুমি আমার কাছে কিছু-একটা লুকাচ্ছ। বল কী হয়েছে?"

আমি কোমের দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করে বললাম, "আমার কিছু হয় নি।"

"তার মানে তুমি আমাকে বলবে না!"

আমি কোনো কথা না বলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলাম। আকাশে চমৎকার মেঘ করেছে। দূরে বনাঞ্চলে ঝড়ো হাওয়া দিচ্ছে, গাছের পাতা নড়ছে বাতাসের ঝাপটায়। কী চমৎকার লাগছে দেখতে! জানালার এই দৃশ্যটি কৃত্রিম তবু সেটিকে সত্যি বলে ভাবতে ভালো লাগে।

চতুর্থ দিন ভোরবেলা আমি কাজে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি তখন আমার মস্তিষ্কের ভিতর থেকে ইশি বলল, "কিরি, তোমার আজকে কাজে যাবার প্রয়োজন নেই।"

"কেন?"

"তোমাকে আজ প্রতিরক্ষা দপ্তরে যেতে হবে।"

"প্রতিরক্ষা দপ্তরে?"

"হ্যাঁ। তোমাকে প্রয়োজনীয় অস্ত্র চালনা শেখানো হবে। কোথায় যেতে হবে কী করতে হবে সে সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হবে।"

"আমি যদি যেতে না চাই?"

"কেন চাইবে না?" ইশি হাসির মতো একটা শব্দ করে বলল, "তোমার জন্য পুরো ব্যাপারটি হবে আশ্চর্য রকম সহজ।"

আমি কোনো কথা না বলে একটা নিশ্বাস ফেললাম।

প্রতিরক্ষা দপ্তরের অফিসটিকে বাইরে থেকে চেনার কোনো উপায় নেই। ইশি আমাকে না বলে দিলে আমি কোনোদিন সেখানে প্রবেশ করতাম না। বড় কালো দরজার পিছনেই কয়েকজন মানুষ অপেক্ষা করছিল, একজন এগিয়ে এসে আমার সাথে হাত মিলিয়ে বলল, "আমার নাম বর্কেন। এটা অবশ্য আমার সত্যিকারের নাম নয়। আজকের জন্য আমার নাম বর্কেন।"

আমি মুখে হাসি ফুটিয়ে বললাম, "তোমার সত্যিকারের নাম বললে ক্ষতি কী?"

"নিষেধ রয়েছে। এখানে এটা তৃতীয় মাত্রার অপরাধ।"

"ও।"

"আমার সাথে আছে দুই জন, কুন্না এবং ত্রালুস।"

"এগুলোও কি বানানো নাম?"

"হ্যাঁ।"

"তোমরা কি সবাই রোবট?"

মানুষটা হঠাৎ থতমত খেয়ে গেল, নিজেকে সামলে নিয়ে কিছু-একটা বলতে যাচ্ছিল আমি হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে বললাম, "তুমি রোবট কি না তাতে কিছু আসে-যায় না। আমার মাথায় একটা ট্রাকিওশান আছে সেটা আমাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমারও নিজেকে রোবট বলে মনে হয়। পুরোপুরি রোবট হয়ে গেলে খারাপ হয় না।"

বর্কেন নামের মানুষটা মুখে বিচিত্র একটা হাসি ফুটিয়ে বলল, "বেশ ভালোই হল তা হলে। আমাদের কাজ শেষ হলে তুমি মোটামুটিভাবে পুরোপুরি রোবটই হয়ে যাবে।"

আমি চমকে উঠে মানুষটার দিকে তাকালাম, তার চোখে কৌতুকের কোনো চিহ্ন নেই।

ইশি যখন আমাকে বলেছিল প্রতিরক্ষা দপ্তরে আমাকে প্রয়োজনীয় অস্ত্র চালানো শেখানো হবে আমার ধারণা ছিল সেগুলো হবে সনাতনধর্মী অস্ত্র, লেজার রশ্মিচালিত বিস্ফোরক বা এই ধরনের কিছু। কিন্তু প্রতিরক্ষা দপ্তরের মানুষেরা তার ধারেকাছে দিয়ে গেল না। তারা আমার ডান হাতের তর্জনী কেটে সেখানে ছোট একটি টিউব বসিয়ে দিল, তার পিছনে প্রক্ষেপণের জন্য যে যান্ত্রিক অংশটুকু রয়েছে সেটিকে আঙুলের নার্ভের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। আমি তর্জনী টানটান করে সেই যান্ত্রিক অংশটুকু চালু করতে পারি, সাথে সাথে ভয়াবহ টিউবের ভিতর দিয়ে ছুটে যাবে শক্তিশালী বিস্ফোরক। সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত একটি শত্রু ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে একমুহূর্তে।

আমার মুখের ভিতরে, জিভের নিচে বসানো হল দ্বিতীয় অস্ত্রটি, দাঁতের সাথে শক্ত করে আটকানো হয়েছে সেটি। ফুঁ দেওয়ার ভঙ্গিতে সেটাকে চালু করে তার যান্ত্রিক ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে মুহূর্তে ছুড়ে দেওয়া যাবে ভয়ঙ্কর এক বিস্ফোরক।

সবশেষে অবশ্য আমাকে কিছু পরিচিত অস্ত্রও দেওয়া হল। তার ব্যবহারও শেখানো হল। দুই কিলোমিটার দূর থেকে আমি নিখুঁত নিশানায় ধ্বংস করে দিতে শিখে গেলাম যে কোনো জিনিস। ট্রাকিওশানে অনুপ্রবেশ করানো হল প্রোগ্রাম, উপগ্রহের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া হল তার। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে চোখের পলকে যোগাযোগ করা যাবে আমার সাথে। কপালে ফুটো করে সেখানে লাগানো হল ইনফ্রারেড সেল, অন্ধকারে দেখার জন্য চোখের পাতায় সার্জারি করে লাগানো হল মাইক্রোচিপ। আমার রক্তে মেশানো হল বিশেষ হরমোন, নিশ্বাসে দেওয়া হল বিশুদ্ধ অক্সিজেন। আমার চামড়ার নিচে বসানো হল বায়োকেমিক্যাল সেল, শরীরের বিশেষ উত্তেজক ড্রাগ দিয়ে আমার সমস্ত স্নায়ুকে সতর্ক করে রাখা হল সর্বক্ষণের জন্য।

হত্যাকাণ্ডের জন্য প্রস্তুত করে প্রতিরক্ষা দপ্তর থেকে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল বিশেষ একটি হলঘরে, সেখানে আমার জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছিল আরো চার জন মানুষ। তাদের দুই জন মধ্যবয়সী, অন্য দুই জন প্রায় তরুণ। তারা স্বল্পভাষী এবং মুখভঙ্গি কঠোর। আমাকে দেখামাত্র তারা শীতল গলায় কথা বলতে শুরু করল। মধ্যবয়স্ক একজন বলল, "শত্রুর সাথে যুদ্ধ করার প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে শত্রুকে চেনা। আমি খুব দুঃখিত যে এই যুদ্ধে তোমার সেই সৌভাগ্য হবে না।"

আমার মুখের মাঝে লাগানো বিচিত্র অস্ত্রটিতে আমি এখনো অভ্যস্ত হতে পারি নি,

সেটির কারণে আমার কথা বলতে অসুবিধা হচ্ছিল, এক ধরনের জড়িয়ে যাওয়া উচ্চারণে বললাম, "কেন এ কথা বলছ?"

"তোমার শত্রুকে চেনা প্রায় দুঃসাধ্য। সে অবলীলায় তার রূপ পরিবর্তন করতে পারে। তার যান্ত্রিক কাঠামোর ওপরে আধা জৈব এক ধরনের টিস্যু রয়েছে, সেটি অবিকল মানুষের ত্বকের মতো। সে ইচ্ছে করলে হুবহু মানুষের রূপ নিতে পারে।"

তরুণ মানুষটি কোনো একটি সুইচ স্পর্শ করা মাত্র ঘরের মাঝামাঝি একটি হলোগ্রাফিক ছবি ভেসে এল। আধা যন্ত্র আধা জৈবিক অত্যন্ত কদাকার একটি রূপ। মুখমণ্ডল আকৃতিহীন, চোখের জায়গায় দুটি গভীর গর্ত যার ভিতর থেকে দুটি লাল বর্ণের ফটোসেল জ্বলছে। তরুণটি উত্তাপহীন গলায় বলল, "এটি সম্ভবত এই যন্ত্রটির প্রকৃত রূপ। কিন্তু তুমি তাকে এই রূপে দেখবে না। তুমি সম্ভবত তাকে এই রূপে দেখবে—"

তরুণটি সুইচের কোনো এক জায়গায় স্পর্শ করামাত্র কদাকার যন্ত্রটি অনিন্দ্যসুন্দর একজন কিশোরের রূপ নিয়ে নিল।

"কিংবা এই রূপে—" কিশোরটি একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষে পরিণত হল, উঁচু চোয়াল, গভীর বিষণ্ন নীল চোখ এবং একমাথা কোঁকড়ানো চুল।

"আমাদের শেষ তথ্য অনুযায়ী যন্ত্রটি ইদানীং একটি মেয়ে রূপ গ্রহণ করছে। তার চেহারা সম্ভবত এ রকম।"

হলোগ্রাফিক ছবিটি একটি স্বল্পবসনা রূপবতী মেয়ের রূপ গ্রহণ করে। আমি এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে এই অপূর্ব রূপবতী মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলাম।

মধ্যবয়স্ক মানুষটি তার প্রাণহীন একঘেয়ে গলায় আবার কথা বলতে শুরু করে, "এই যন্ত্রটি বাইরে যে রূপ নিয়েই থাকুক না কেন, তার ভিতরে রয়েছে অসম্ভব জটিল কিছু যান্ত্রিক কলকব্জা। দেশের একটি আন্তর্জাতিক অপরাধী সংস্থা কিছু নীতিহীন বিজ্ঞানীদের দিয়ে এই আধা যান্ত্রিক জৈবিক রোবটটিকে তৈরি করেছে। তার কপোট্রনের মেমোরি প্রায় মানুষের কাছাকাছি, চিন্তা করার ক্ষমতা ঈর্ষণীয়। তার শারীরিক ক্ষমতা মানুষ থেকে অনেকগুণ বেশি। সাধারণ রোবট কোনো একটি বিষয়ে পারদর্শী হয়, এই আধা জৈবিক রোবটটি প্রায় সব বিষয়ে পারদর্শী। তার প্রধান শক্তি হচ্ছে অমানুষিক নিষ্ঠুরতা। মানুষের প্রতি এক বিচিত্র ঘৃণা তার ভিতরে অনুপ্রবেশ করানো হয়েছে। সেই ঘৃণা যে কী ভয়ঙ্কর আমরা এখনই তার একটা প্রমাণ দেখাব।"

ঘরের মাঝামাঝি হলোগ্রাফিক ছবিটি পাল্টে গিয়ে সেখানে হঠাৎ করে ভয়ঙ্কর কিছু দৃশ্য দেখানো শুরু হয়। প্রতিরক্ষা দপ্তরের এজেন্টদের শরীরে লাগানো ক্যামেরা থেকে তোলা কিছু ছবির পুনর্গঠন। ছবিগুলো স্পষ্ট কিংবা পূর্ণাঙ্গ নয়, ঘটনার বীভৎসতা সে কারণে মনে হয় আরো ঠিকভাবে ধরা পড়েছে। যে দৃশ্যগুলো দেখানো হচ্ছে সেগুলো সত্যি ঘটেছে চিন্তা করে আমার সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

মধ্যবয়স্ক মানুষটি বলল, "এই অস্বাভাবিক আধা জৈবিক রোবটের সাথে যুদ্ধ করে তাকে পরাজিত করা খুব সহজ নয়। আমাদের চার জন এজেন্ট ইতোমধ্যে প্রাণ হারিয়েছে। সম্ভবত তুমিও প্রাণ হারাবে। কিন্তু আমাদের চেষ্টা করেই যেতে হবে। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে আমরা অনেক কিছু শিখেছি, তার ওপর ভিত্তি করে তোমাকে প্রস্তুত করা হয়েছে। এই আধা জৈবিক রোবটটির কাছাকাছি তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। তখন হয় সে তোমাকে হত্যা করবে, না হয় তুমি তাকে হত্যা করবে।"

আমি চুপচাপ বসে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। এই ধরনের ভয়ঙ্কর একটা জীবন আমার জন্য অপেক্ষা করছিল কে জানত?

৩

প্রতিরক্ষা দপ্তর থেকে সশস্ত্র হয়ে ফিরে আসার পর আমার জীবনধারা অনেকখানি পাল্টে গেল। আমি একমুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারলাম না যে, আমার শরীরের নানা জায়গায় ভয়ঙ্কর কিছু অস্ত্র জুড়ে দেওয়া হয়েছে। অঙ্গুলি হেলনে আমি বিশাল অট্টালিকা ধুলো করে দিতে পারি, এক ফুঁয়ে আক্ষরিক অর্থে আমি একটা ছোট জনপদ ধ্বংস করে দিতে পারি। আমাকে ব্যবহার করার জন্য যে এটমিক ব্লাস্টার দেওয়া হয়েছে সেটা ব্যবহার করে আমি অবলীলায় এক মিটার পুরু সীসার পাতে দশ সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধের গর্ত করে ফেলতে পারি। আমার এই অমানবিক ক্ষমতা আমার মাঝে এতটুকু আনন্দ নিয়ে এল না, নিজেকে সবসময় এক ধরনের হিংস্র দানব মনে হতে লাগল। যে ভয়ঙ্কর আধা জৈবিক রোবটটির মুখোমুখি হবার জন্য আমাকে এই হিংস্র দানবে পরিণত করা হয়েছে সেই রোবটটির প্রতি আমার ভিতরে এক বিজাতীয় ঘৃণার জন্ম হতে থাকে। এই রোবট বা প্রাণীটিকে দেখামাত্রই আমি যে তাকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারব আমার ভিতরে সেটা নিয়ে এতটুকু সন্দেহ ছিল না। এই ধরনের অনুভূতির সাথে আমি পরিচিত নই, বুকের ভিতরে ভয়ঙ্কর জিঘাংসা নিয়ে বেঁচে থাকা অত্যন্ত কষ্টকর। আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই আধা জৈবিক রোবটটির মুখোমুখি হবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। এই সম্মুখ সংঘর্ষে আমি রোবটটিকে হত্যা করব নাকি রোবটটা আমাকে হত্যা করবে আমি জানি না, কিন্তু এখন তাতে কিছুই আসে–যায় না। পুরো ব্যাপারটির অবসান ঘটানো ছাড়া এই মুহূর্তে আমি আর অন্য কিছুই চিন্তা করতে পারছি না।

কাজেই একদিন মধ্যরাতে যখন ইশি আমাকে ডেকে তুলে বলল, "কিরি প্রস্তুত হও" তখন আমি নিজের ভিতরে এক ধরনের অসুস্থ উল্লাস অনুভব করতে শুরু করলাম। আমি নিও পলিমারের আবরণে নিজেকে ঢেকে নিলাম, ছোট একটি ব্যাগে এটমিক ব্লাস্টারটি ভরে নিয়ে শরীরের নানা যন্ত্রাংশকে চালু করতে শুরু করলাম। সিরিঞ্জ দিয়ে চামড়ার নিচে একটি ছোট উত্তেজক ড্রাগ প্রবেশ করিয়ে দিয়ে প্রস্তুত হয়ে নিলাম।

মধ্যরাতে ইশি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করল। শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে বহু দূরে একটি পরিত্যক্ত জ্বালানি পরিশোধনাগারে আমাকে নামিয়ে দেওয়া হল। এলাকাটি নির্জন এবং অন্ধকার। আমাকে ইনফ্রারেড চশমা ব্যবহার করে অন্ধকারে হেঁটে যেতে হল। আমার হাতে শক্তিশালী এটমিক ব্লাস্টার, আমার শরীরে একাধিক ভয়ঙ্কর অস্ত্র, আমার রক্তে বিচিত্র কিছু হরমোন আমাকে বাড়াবাড়ি সাহসী করে রেখেছে কিন্তু তবুও আমার বুকের ভিতরে কোনো এক জায়গায় একটি বিচিত্র ধরনের আতঙ্ক কাজ করতে লাগল। আমি ইনফ্রারেড চশমায় অন্ধকারে গুড়ি মেরে থাকা আধা জৈবিক ভয়ঙ্কর রোবটটি খুঁজতে খুঁজতে এগিয়ে যেতে থাকি। রোবটটির তাপমাত্রা কত হবে আমি জানি না, কপোট্রনে নিশ্চিতভাবে কিছু বেশি উত্তাপ থাকার কথা, আমার এই ইনফ্রারেড চশমায় নিশ্চয়ই আমি তাকে দেখতে পাব। সংবেদনশীল শব্দ প্রসেসরটিও চালু করেছি, সোজাসুজি সেটি শোনার কোনো উপায় নেই, বিল্ডিঙের অন্য প্রান্তে ছোট মাকড়সার দেয়াল বেয়ে হেঁটে যাওয়ার শব্দটি পর্যন্ত শুনতে পাওয়া যায়, তার মাঝে কোনটি সন্দেহজনক শব্দ এবং সেটি কোনদিক দিয়ে আসছে বোঝা কঠিন। শব্দ প্রসেসরের শক্তিশালী কম্পিউটারের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রোগ্রামটি সেটি প্রতিনিয়ত বিশ্লেষণ করে সন্দেহজনক শব্দগুলোর অস্তিত্ব আমাকে জানিয়ে দিয়েছিল। পরিত্যক্ত এই জ্বালানি পরিশোধনাগারে ঢোকার আগে পর্যন্ত ইশি আমার সাথে কথা বলছিল, কিন্তু তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর হঠাৎ করে নিঃশব্দ হয়ে গেছে। আমার পরিপূর্ণ মনোযোগে সে এতটুকু বিচ্যুতি ঘটাতে চায় না।

আমি অন্ধকার কালো দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে প্রায় নিঃশব্দে এগিয়ে যেতে থাকি, ইনফ্রারেড চশমায় সমস্ত এলাকাটাকে একটা কাল্পনিক ভুতুড়ে দৃশ্যের মতো মনে হয়। ঘরের দেয়াল, পরিত্যক্ত যন্ত্রপাতি থেকে বিচিত্র তাপমাত্রা বিকিরণ করছে, তার মাঝে আমি একটি নিষ্ঠুর আধা জৈবিক যন্ত্র খুঁজতে থাকি।

আমি ছোট একটি ধসে যাওয়া ঘর থেকে বড় একটা হলঘরে এসে হাজির হলাম। শোধনাগারের বড় বড় পাইপ, উঁচু ডিস্টিলেশান কলাম, ধ্বংস হয়ে যাওয়া যন্ত্রপাতি এবং জঞ্জালের মাঝে সাবধানে পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ আমার সামনে দিয়ে দ্রুত কিছু-একটা ছুটে গেল। আমি সাথে সাথে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। বড় একটি ট্যাংকের সাথে পিঠ লাগিয়ে আমি নিঃশব্দে হাতে এটমিক ব্লাস্টারটি তুলে নিই। যে প্রাণী বা যন্ত্রটি আমার সামনে দিয়ে ছুটে গেছে তার আকার মানুষের মতো, মাথার অংশটি ইনফ্রারেড চশমায় স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে, যার অর্থ সেটি উত্তপ্ত, একটি রোবটের যেরকম থাকার কথা। যে গতিতে ছুটে গেছে সেটি একজন মানুষের মতোই, নিশ্চিতভাবে কোনো এক জায়গায় সেটি লুকিয়ে গেছে, আমি তাকে দেখে যেটুকু সতর্ক হয়েছি, সেটিও নিশ্চয়ই আমাকে দেখে ততটুকু সতর্ক হয়েছে।

শব্দ প্রসেসরে আমি হঠাৎ মৃদু একটা শব্দ শুনতে পেলাম, তার কয়েক মুহূর্ত পরে আরেকটি। এই যন্ত্র বা প্রাণীটি গুড়ি মেরে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি নিঃশব্দে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, নড়ামাত্রই মনে হয় সেটি আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমি প্রাণীটিকে আমার আরেকটু কাছে এগিয়ে আসতে দিলাম তারপর বিদ্যুদ্বেগে ঘুরে গিয়ে প্রায় শূন্যে লাফিয়ে উঠে প্রাণীটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। প্রাণীটি আমার এ রকম আচরণের জন্য প্রস্তুত ছিল না, আমার পায়ের ধাতব জুতোর আঘাতে কিছু-একটা ঝনঝন করে ভেঙে গেল এবং আমি কয়েকটা বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ ছুটে যেতে দেখলাম।

আমি যখন আবার নিজের পায়ের ওপর দাঁড়িয়েছি তখন আমার দুই হাতে শক্ত করে ধরে রাখা এটমিক ব্লাস্টারটি প্রাণীটির কণ্ঠনালীতে ধরে রাখা, প্রাণীটিকে আমি ঠেলে দিয়েছি সামনের দিকে, ভরকেন্দ্র সরে গিয়েছে সামনে, আর একটু ধাক্কা দিলেই সে তাল হারিয়ে নিচে পড়বে। আমি হিংস্র গলায় চিৎকার করে বললাম, "খবরদার, একটু নড়লেই তোমার কপোট্রন উড়িয়ে দেব।"

রোবট বা প্রাণীটি নড়ার চেষ্টা করল না, ট্রিগারে হাত রেখে বললাম, "তুমি কে? এখানে কেন এসেছ?"

রোবটটি উত্তর দেবার আগেই ইশি ফিসফিস করে বলল, "ছেড়ে দাও ওকে।"

"ছেড়ে দেব?"

"হ্যাঁ, এই মাত্র প্রতিরক্ষা দপ্তর খবর পাঠিয়েছে পুরো ব্যাপারটি একটি রিহার্সাল। এটা একটা সাজানো ঘটনা।"

"সাজানো?"

আমার কথা শেষ হবার আগেই উজ্জ্বল আলোতে চারদিক প্লাবিত হয়ে গেল। অন্ধকারে এতক্ষণ রেটিনার রডগুলো কাজ করছিল হঠাৎ করে উজ্জ্বল আলোতে চোখ ধাঁধিয়ে গেল। চোখে আরো সয়ে যেতেই দেখলাম যে-ঘরটিকে পরিত্যক্ত জ্বালানি শোধনাগার ভেবেছিলাম সেটি অনেক যত্ন করে তৈরি করা একটি থিয়েটারের স্টেজের মতো। অসংখ্য

ক্যামেরা আমার দিকে তাক করে আছে। আমার হঠাৎ নিজেকে নির্বোধের মতো মনে হতে থাকে।

আমি রোবটটিকে একটা ছোট ধাক্কা দিয়ে ছেড়ে দিলাম। সেটি কয়েক পা ছুটে তাল সামলে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি ক্রুদ্ধ গলায় বললাম "এর অর্থ কী?"

ইশি অপরাধীর মতো বলল, "আমিও জানতাম না। প্রতিরক্ষা দপ্তর দেখতে চাইছিল সত্যিকারের পরিস্থিতিতে তুমি কী রকম ব্যবহার কর।"

"দেখেছে?"

"নিশ্চয়ই দেখেছে।"

এটমিক ব্লাস্টার দিয়ে গুলি করে কিছু-একটা উড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করছিল, অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত করে বললাম, "এ রকম আর কতবার রিহার্সাল হবে?"

"আর হবে না।"

"তুমি নিশ্চিত?"

"আমি নিশ্চিত। তোমার আর রিহার্সালের প্রয়োজন নেই।"

এক সপ্তাহ পরে মধ্যরাতে ইশি আবার আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলল, বলল, "কিরি প্রস্তুত হও।"

আমি মুহূর্তে পুরোপুরি জেগে উঠলাম, বললাম, "পাওয়া গেছে?"

"হ্যাঁ। উত্তরের পাহাড়ি অঞ্চলে একটা পরিত্যক্ত খনিতে লুকিয়ে আছে সে। আগেই খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল, একটু আগে নিঃসন্দেহ হওয়া গেছে। তুমি প্রস্তুত হয়ে নাও।"

"কত দূর এখান থেকে?"

"কমপক্ষে তিন শ কিলোমিটার। প্রতিরক্ষাবাহিনীর বিশেষ জেট বিমানে যাবে তুমি। বেশি সময় লাগার কথা নয়।"

আমি আবার নিজেকে নিও পলিমারের আস্তরণে ঢেকে নিলাম, ছোট একটা ব্যাগে এটমিক ব্লাস্টারটি ভরে নিয়ে আবার সারা শরীরের নানা যন্ত্রাংশকে চালু করতে শুরু করলাম। রক্তে বিচিত্র সব হরমোন মিশিয়ে দেবার জন্য চামড়ার নিচে সিরিঞ্জ দিয়ে উত্তেজক ড্রাগগুলো প্রবেশ করিয়ে দিলাম। ইনফ্রারেড চশমার নিয়ন্ত্রণটুকু পরীক্ষা করে নিয়ে বললাম, "চল ইশি যাই।"

ঘরের বাইরে অন্ধকারে আমার জন্য ছোট একটি ভাসমান যান অপেক্ষা করছিল। আমাকে নিয়ে সেটি কিছুক্ষণের মাঝেই শহরের কেন্দ্রস্থলের বিমানবন্দরে পৌঁছে দিল। সেখানে ছোট একটি জেট বিমানে করে আমাকে রাতের অন্ধকারে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হল। পাহাড়ি অঞ্চলের নির্জন পরিত্যক্ত একটি খনির উপরে আমাকে ছোট গ্লাইডারে নামিয়ে দেওয়া হল। তিন কিলোমিটার উঁচু থেকে সেই স্বেচ্ছানিয়ন্ত্রিত গ্লাইডার নিঃশব্দে নিচে নেমে এল।

গ্লাইডারের দরজা খুলে আমি বের হয়ে এলাম, চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। সুইচ টিপে ইনফ্রারেড চশমাটি চালু করে দিতেই মনে হল চারদিকে এক ধরনের অশরীরী আলো ছড়িয়ে পড়েছে। পরিত্যক্ত এই খনিটির কোথায় সেই আধা জৈবিক রোবটটি লুকিয়ে আছে আমি জানি না। আমি সেটিকে খুঁজে পাব, নাকি সেটিই আমাকে খুঁজে বের করে, সে কথাটিই-বা কে বলতে পারে!

"খাবারের প্যাকেটটা নিয়ে নাও কিরি।" ইশির কথা শুনে আমার খাবারের প্যাকেটটির কথা মনে পড়ল, এই নির্জন এলাকায় আমাকে কতদিন একাকী থাকতে হবে কে জানে,

যে খাবারের প্যাকেটটি দেওয়া হয়েছে সেটি দেখে মনে হচ্ছে এক সপ্তাহ লেগে যেতে পারে।

খাবারের প্যাকেট হাতে নিয়ে আমি হাঁটতে থাকি। খানিকদূর হেঁটে যেতেই খনির গভীরে নেমে যাওয়া সুড়ঙ্গটি চোখে পড়ল। প্রাচীনকালে আকরিক খনিজ তোলার জন্য অত্যন্ত অবিবেচকের মতো পৃথিবীর নিচে অনেক গহ্বর খোঁড়া হয়েছিল, তার বিশাল এলাকা এখন বিপজ্জনক বলে পরিত্যক্ত হয়েছে। এটি সম্ভবত সেরকম একটি এলাকা। আমি সুড়ঙ্গের মুখে এসে দাঁড়াতেই ইশি ফিসফিস করে বলল, "তোমার এদিক দিয়ে নামতে হবে।"

আমি সুড়ঙ্গের গভীরে তাকিয়ে একটা নিশ্বাস ফেললাম, এর ভিতরে আমার জন্য কী লুকিয়ে আছে কে জানে! আমি ব্যাগ খুলে একটা পলিলিন কর্ড বের করে সুড়ঙ্গে নামার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকি। কর্ডটা একটা আংটা দিয়ে উপরে আটকে নিয়ে নিচে তাকালাম, ইনফ্রারেড চশমায় অত্যন্ত বিচিত্র দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে পরাবাস্তব একটি জগৎ আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

আমি যেটুকু সম্ভব নিঃশব্দে নিচে নেমে আসতে থাকি। আধা জৈবিক রোবটটি গোপনে কোনো সুড়ঙ্গ থেকে আমাকে ধ্বংস করে দিলে এই মুহূর্তে আমার কিছু করার নেই।

নিঃশব্দে নেমে আসার চেষ্টা করেছি বলে দীর্ঘ সময় লেগে গেল। পায়ের নিচে শক্ত মাটি অনুভব করার পর আমি বুক থেকে একটি নিশ্বাস বের করে সাবধানে শক্ত পাথরের দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। পিছন থেকে আচমকা কেউ আর আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে না।

আমি নিঃশব্দে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থেকে জায়গাটা সম্পর্কে একটা ধারণা করার চেষ্টা করতে থাকি। একটি গভীর সুড়ঙ্গ ডান দিকে নেমে গেছে। কোথাও আলোর কোনো চিহ্ন নেই, নিকষ কালো অন্ধকার—ইনফ্রারেড চশমায় সেটিকে একটি অলৌকিক জগতের মতো দেখাতে থাকে।

AMARBOI.COM

ইশি ফিসফিস করে বলল, "এখানে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয়। তুমি এগিয়ে যাও।"

আমি ডান হাতে অস্ত্রটি ধরে রেখে সাবধানে এগুতে থাকি। আজ থেকে হাজারখানেক বছর আগে পৃথিবীর মানুষ এই খনির ভিতর থেকে লোহার আকরিক তুলে নিয়ে গেছে। দীর্ঘদিনের অব্যবহারে সুড়ঙ্গের মুখ জায়গায় জায়গায় বুজে গিয়েছে। আমি কোথাও হেঁটে হেঁটে, কোথাও গুড়ি মেরে, কোথাও প্রায় গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে যেতে থাকি। চামড়ার নিচে সিরিঞ্জ দিয়ে যে বায়োকেমিক্যালটি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে সেটি আমার রক্তের মাঝে বিচিত্র সব হরমোন মিশিয়ে দিচ্ছে। আমার চোখে তাই কোনো ঘুম নেই, আমি এখন হিংস্র শ্বাপদের মতো সজাগ, আমার দেহ চিতাবাঘের মতো ক্ষিপ্র, আমার স্নায়ু ধনুকের ছিলার মতো টানটান। আমার সমস্ত মনোযোগ এখন এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে, কোনো একটি চলন্ত ছায়া, জীবনের কোনো একটি স্পন্দন দেখামাত্রই তাকে ধ্বংস করে দিতে হবে। যদি তা না করা হয় সেই ভয়ঙ্কর আধা জৈবিক প্রাণী আমাকে ধ্বংস করে দেবে।

এভাবে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন পরিত্যক্ত একটি খনির সুড়ঙ্গে ঘুরে বেড়াতে থাকি। কতদিন পার হয়েছে কে জানে। প্রথমে ক্ষুধার সময় প্যাকেট খুলে কিছু খেয়েছিলাম। খাবারের মাঝে কী ছিল আমি জানি না, এখন আর আমার মাঝে ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই। আমার চোখে ঘুম নেই, দেহে ক্লান্তি নেই। আমার বুকের ভিতরে এখন কোনো অনুভূতি নেই, নিজেকে বোধশক্তিহীন একটা যন্ত্রের মতো মনে হয়। যে অদৃশ্য আধা জৈবিক

রোবটটিকে আমার ধ্বংস করতে হবে তার বিরুদ্ধে আমার কোনো ক্ষোভ নেই, কোনো ক্রোধ বা জিঘাংসা নেই কিন্তু তবু আমি জানি তাকে আমার ধ্বংস করতে হবে।

আমার ভিতরে ধীরে ধীরে এক ধরনের অস্থিরতার জন্ম হতে থাকে, নিকষ কালো অন্ধকারে ইনফ্রারেড চশমার বিচিত্র আধিভৌতিক এক জগতে হেঁটে হেঁটে নিজেকে একটি পরাবাস্তব জগতের অধিবাসী বলে মনে হয়। পুরো ব্যাপারটিকে মনে হয় ভাইরাস জ্বরে আক্রান্ত বিকারগ্রস্ত কোনো মানুষের দুঃস্বপ্ন। আমি ধীরে ধীরে অনুভব করতে থাকি আমার অস্থিরতা বেড়ে যাচ্ছে। যে নৃশংস কাজের জন্য আমাকে প্রস্তুত করা হয়েছে সেটি শেষ করার জন্য নিজের ভিতরে এক ধরনের অতিমানবিক তাগিদ অনুভব করতে থাকি। যখন এই অস্থিরতা এই অতিমানবিক তাড়না অসহ্য হয়ে উঠল ঠিক তখন আমি সুড়ঙ্গের গভীরে বহুদূরে একটা শীর্ণ আলোকরশ্মি দেখতে পেলাম। আমি স্পেকট্রাম এনালাইজারে পরীক্ষা করে দেখলাম, সত্যিই সেটা আলোকরশ্মি, তরঙ্গদৈর্ঘ্য মানুষের ঠিক দৃষ্টিসীমার ভিতরে।

ইশি আমার মস্তিষ্কের ভিতরে ফিসফিস করে বলল, "সাবধান কিরি।"

"আমি সাবধান আছি।"

"মনে রেখো তুমি কিন্তু দ্বিতীয় সুযোগ পাবে না।"

"মনে রাখব।"

"আমি পুরোপুরি নিঃশব্দ হয়ে যাচ্ছি কিরি। তোমার একাগ্রতায় যেন এতটুকু ত্রুটি না হয় সে জন্য আমি এতটুকু শব্দ করব না।"

"বেশ।"

"যদি তুমি বেঁচে থাক তোমাকে অভিনন্দন জানাব। যদি বেঁচে না থাক তা হলে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি।"

"ঠিক আছে।"

"যদি কিছু অন্যায় করে থাকি, না বুঝে তোমার মনে কোনোরকম আঘাত দিয়ে থাকি তার জন্য ক্ষমা চাইছি।"

"ক্ষমা চাইবার কোনো প্রয়োজন নেই।"

AMARBOI.COM

ইশি হঠাৎ করে পুরোপুরি নিঃশব্দ হয়ে গেল। সুড়ঙ্গের একেবারে শেষ মাথায় একটা গুহার মতো জায়গা, একপাশে খোলা অংশটুকু দরজার মতো, মনে হয় ভিতরে একটা ঘর। সেই ঘরে কী আছে আমি জানি না, রোবটটিকে যদি বের হতে হয় এই দরজা দিয়ে বের হতে হবে। আমি দুই হাতে শক্ত করে এটমিক ব্লাস্টারটা ধরে হাত উঁচু করে রেখে নিঃশব্দে এগিয়ে যেতে থাকি, যত কাছে যেতে পারব লক্ষ্যভেদের সম্ভাবনা তত বেড়ে যাবে। আমি বুঝতে পারি আমার হৃৎস্পন্দন বেড়ে যাচ্ছে, আমি জোরে জোরে নিশ্বাস নিয়ে নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করলাম।

হঠাৎ খুট করে অস্পষ্ট একটা শব্দ হল সাথে সাথে সামনে দরজার মতো খোলা জায়গায় যেন অদৃশ্য থেকে একটা ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়াল। আমি এক মুহূর্তের জন্য চমকে উঠলাম, ছায়ামূর্তিটি হুবহু মানুষের ছায়ামূর্তি। আলোটা পিছন থেকে আসছে বলে আমি চেহারা, দেহের অবয়ব দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু মনে হল এটি একটি নারী। প্রতিরক্ষা দপ্তর আমাকে বলেছিল এটি একটি নারীদেহ ধারণ করে আছে। আমি নিশ্বাস আটকে রেখে এটমিক ব্লাস্টারের ট্রিগার টেনে ধরলাম, তীব্র একটা আলোর ঝলকানির সাথে সাথে তীক্ষ্ণ একটি শব্দ হল। সাথে সাথে ছায়ামূর্তিটিসহ গুহার বিশাল অংশটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ধসে পড়ল। ধুলোয়

ঢেকে গেল চারদিক। আমি তার মাঝে জোর করে এটমিক ব্লাস্টার হাতে চোখ খোলা রেখে দাঁড়িয়ে রইলাম।

কিছুক্ষণের মাঝেই বিস্ফোরণের ঝাপটা কমে আসে, গড়িয়ে পাড়া পাথর ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ে স্থির হয়ে আসে, ধুলোর আস্তরণ সরে যেতে থাকে ধীরে ধীরে। আমি নিশ্বাস বন্ধ করে পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতে থাকি, ধ্বংস হয়ে যাওয়া ছায়ামূর্তিটিকে নিজের চোখে দেখে নিশ্চিত হতে হবে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে দরজার মুখটা প্রায় বুজে গিয়েছে, সাবধানে গুড়ি মেরে ভিতরে ঢুকলাম, বিস্ফোরকের একটা ঝাঁজালো গন্ধ ভিতরে। বড় বড় কয়েকটা পাথরের ওপর দিয়ে হেঁটে আমি খোলা মতন একটা জায়গায় এসে দাঁড়ালাম, তীব্র একটা আলো জ্বলছে মাথার উপরে, এই কর্কশ আলোতে পুরো এলাকাটাকে কী ভয়ানক শ্রীহীন, কী নিদারুণ বিষাদময় দেখায়! আমি মাথা ঘুরিয়ে চারদিকে তাকাতে গিয়ে হঠাৎ করে থেমে গেলাম। ঠিক আমার পিছনে, শোনা যায় না এ রকম একটা মৃদু শব্দ হয়েছে, আমার পিছনে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে আমার মস্তিষ্ক ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবার জন্য একমুহূর্ত অপেক্ষা করলাম কিন্তু কিছু হল না। মেয়ের গলায় কেউ খুব মৃদু স্বরে বলল, "যেভাবে দাঁড়িয়ে আছ ঠিক সেভাবে দাঁড়িয়ে থাক। একটু নড়লেই তোমাকে আমি হত্যা করব নিশ্চিত জেনো।"

আমি সাবধানে বুকের ভিতর থেকে একটা নিশ্বাস বের করে দিলাম। আধা জৈবিক যে প্রাণীটি মেয়ের অবয়ব নিয়ে আমার খুব কাছে দাঁড়িয়ে আছে সেটি আমাকে সাথে সাথে হত্যা না করে একটি খুব বড় ভুল করেছে। আমি বেঁচে থাকব কি না জানি না, কিন্তু এই প্রাণীটি নিশ্চিতভাবে ধ্বংস হবে আজ।

মেয়ের গলায় আধা জৈবিক প্রাণীটি আবার কথা বলল, "আমি আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তুমি এতটুকু নড়বে না। কথা বলবে না।"

আমি নড়লাম না, কথা বললাম না, নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলাম। মেয়ের গলায় আবার প্রাণীটি কথা বলল, "তোমার হাতের অস্ত্রটি নিচে ফেলে দাও।"

আমি এটমিক ব্লাস্টারটি নিচে ফেলে দিলাম।

"এবারে এক পা সামনে এগিয়ে যাও।"

আমি ছোট একটি পদক্ষেপ ফেলে অল্প একটু সামনে এগিয়ে গেলাম। প্রাণীটিকে আমি নিরস্ত্র দেখছিলাম, সে সম্ভবত এই অস্ত্রটি তুলে নেবে। অস্ত্রটি তোলার জন্য তাকে নিচু হতে হবে। মানুষ রোবট বা আধা জৈবিক যে কোনো প্রাণীই নিচু হওয়ামাত্রই খানিকটা অসহায় হয়ে যায়। তখন তাকে আক্রমণ করতে হবে।

"আরো এক পা এগিয়ে যাও।"

আমি আবার তুলনামূলকভাবে ছোট একটি পদক্ষেপ ফেলে অল্প একটু এগিয়ে গেলাম। আমি আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সজাগ রেখে পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা প্রাণীটির গতিবিধি বোঝার চেষ্টা করতে থাকি। অস্পষ্ট একটা শব্দ পোশাকের খসখসে একটা কম্পন শুনেই আমি হঠাৎ বিদ্যুদ্বেগে শূন্যে লাফিয়ে উঠে ঘুরে গেলাম। পায়ের শক্ত আঘাতে পিছনের প্রাণীটি তাল হারিয়ে ফেলল। নিচে নামার আগেই আমি আমার সমস্ত শরীর দিয়ে প্রাণীটিকে দ্বিতীয়বার আঘাত করলাম। কাতর একটা ধ্বনি করে প্রাণীটি শক্ত পাথরের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

আমি দুই পায়ের ওপর ভর দিয়ে প্রায় একটা ক্ষেপণাস্ত্রের মতো প্রাণীটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। হাতটি তার দেহ থেকে একটু সামনে স্থির রেখে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরকটি দিয়ে আঘাত করতে গিয়ে থেমে গেলাম। প্রাণীটি স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। এটি আধা জৈবিক কোনো প্রাণী নয়, এটি কুশলী কোনো রোবট নয়, এটি অনিন্দ্যসুন্দরী একটি তরুণী।

তরুণীটির মুখে কোনো ভয় নেই, কোনো আতঙ্ক বা হতাশা নেই, এক গভীর বিষাদে সেটি ঢেকে আছে।

আমি আমার হাতের মাঝে লুকিয়ে রাখা ভয়ঙ্কর অস্ত্রটি তার মাথার কাছে ধরে রেখে বললাম, "তুমি কে?"

তরুণীটি কোনো কথা বলল না। বিচিত্র এক ধরনের বিষাদমাখা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

আমার মস্তিষ্কের মাঝে ইশি ফিসফিস করে বলল, "হত্যা কর কিরি। হত্যা কর। এই চেহারা এই বিষাদমাখা চোখ সব বিভ্রম।"

আমি ফিসফিস করে বললাম, "বিভ্রম?"

"হ্যাঁ, বিভ্রম। ওর কোমল ত্বকের নিচে আছে টাইটেনিয়ামের দেহ। চোখের পিছনে সিলঝিনিয়াম ফটোসেল। বুকের ভিতরে নিউক্লিয়ার সেল।"

"সত্যি?"

"সত্যি। তুমি দেখলে না তোমার ভয়ঙ্কর আঘাতেও তার কিছু হয় নি? দেখছ না সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোনো মানুষ কি পারবে দাঁড়িয়ে থাকতে? পারবে?"

"না।"

"তা হলে হত্যা কর। সময় চলে যাচ্ছে কিরি।"

অনিন্দ্যসুন্দরী মেয়েটি তার বিষাদমাখা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ ফিসফিস করে বলল, "হ্যাঁ। হত্যা কর আমাকে। শুধু একটি কথা—"

"কী কথা?"

"আমাকে কথা দাও আমার মৃতদেহটি তুমি পুরোপুরি ধ্বংস করে দেবে। এর প্রতিটি কোষকে। আমাকে কথা দাও।"

আমি অবাক হয়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। মেয়েটি স্থির দৃষ্টিতে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর নিশ্বাস ফেলে চোখ বন্ধ করে ফেলল। আমি দেখতে পেলাম তার চোখের কোনায় চিকচিক করছে পানি।

"হত্যা কর কিরি।" ইশি ফিসফিস করে বলল, "হত্যা কর।"

"হ্যাঁ। হত্যা কর আমাকে।" তরুণীটি বলল ফিসফিস করে।

"না।" আমি সোজা হয়ে দাঁড়ালাম, তার পর দুই পা পিছিয়ে এসে একটা পাথরের ওপর বসলাম। হঠাৎ করে আমার ক্লান্তি লাগতে থাকে। অমানবিক এক ধরনের ক্লান্তি, মৃত্যুর কাছাকাছি এক ধরনের ক্লান্তি।

মেয়েটি চোখ খুলে তাকাল। খানিকক্ষণ এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তুমি কেন এখানে এসেছ?"

আমি জোর করে চোখ খুলে রেখে মেয়েটির দিকে তাকালাম, কাঁপা কাঁপা ক্লান্ত গলায় বললাম, "তার আগে বল, তুমি কে? তুমি এখানে কেন এসেছ?"

"সেটা তো তুমি জান।"

"না, জানি না।"

"তা হলে কেন আমাকে হত্যা করতে চাইছ?"

"আমি চাইছি না। যারা আমাকে ব্যবহার করছে, তারা চাইছে।"

মেয়েটি হঠাৎ আমার দিকে এগিয়ে আসে, উৎকণ্ঠিত গলায় বলে, "তুমি অসুস্থ। কী হয়েছে তোমার?"

"আমার মাথায় একটা ট্রাকিওশান। শরীরে ক্ষেপণাস্ত্র। মুখের মাঝে বিস্ফোরক। আমার শরীরে উত্তেজক ড্রাগ। আমি কিছু খাই নি বহুদিন। আমি ঘুমাই নি বহুকাল।"

মেয়েটি আমার কাছে এগিয়ে আসে, দুই হাতে আমাকে ধরে সাবধানে শুইয়ে দেয় নিচে। নিচু গলায় ফিসফিস করে বলে, "বিশ্রাম নিতে হবে তোমার না-হলে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ শুরু হবে একটা আর্টারি ছিঁড়ে। যারা তোমাকে ব্যবহার করছে তোমার জন্য তাদের এতটুকু করুণা নেই।"

"আমি জানি।"

"তুমি ঘুমাও। আমি তোমাকে দেখে রাখব।"

"আমাকে দেখে রাখবে?" আমি হাসার চেষ্টা করে বললাম, "কিন্তু আমি তোমাকে হত্যা করতে এসেছিলাম।"

"কিছু আসে-যায় না তাতে। আমিও চাই একজন আমাকে হত্যা করুক। পূর্ণাঙ্গভাবে হত্যা করুক। যেন—'

"যেন কী?"

মেয়েটা বিষণ্ন মুখে মাথা নেড়ে বলল, "কিছু না। তুমি এখন ঘুমাও। ঘুমাও।"

সত্যি সত্যি আমার চোখে হঠাৎ জলোচ্ছ্বাসের মতো ঘুম নেমে আসে। আমি অনেক কষ্ট করে চোখ খোলার চেষ্টা করে বললাম, "তুমি কে?"

মেয়েটা আমার ওপর ঝুঁকে পড়ে মাথা নেড়ে বলল, "আমি জানি না।"

"জান না?"

"না। আমি কী আমি জানি কিন্তু আমি কে আমি জানি না।"

গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে যাওয়ার আগে আমি শুনতে পেলাম ইশি ফিসফিস করে বলছে, "হত্যা কর ওকে। হত্যা কর। মুখ থেকে ছুড়ে দাও বিস্ফোরক। ছুড়ে দাও।"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "না ইশি, আমি পারব না। আমি দানবকে ধ্বংস করতে পারি কিন্তু মানুষকে হত্যা করতে পারি না।"

AMARBOI.COM

৪

আমি ঠিক কত দিন বা কতক্ষণ গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে ছিলাম জানি না। ঘুমের মাঝে বিকারগ্রস্ত মানুষের মতো আমি অর্থহীন স্বপ্ন দেখতে থাকি। মনে হতে থাকে আমার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জীবন্ত প্রাণীর মতো কিলবিল করে নড়ছে, আমি গড়িয়ে গড়িয়ে একটি অন্ধকার অতল গহ্বরে পড়ে যাচ্ছি। সেই অতল গহ্বরে মহাজাগতিক বীভৎস কিছু প্রাণী আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমার দেহকে তারা চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে খেতে এগিয়ে আসছে। প্রচণ্ড আতঙ্কে আর অমানুষিক যন্ত্রণায় আমি চিৎকার করতে থাকি আর তার মাঝে কোনো এক নারীকণ্ঠ আমাকে কোমল গলায় ডাকতে থাকে।

আমি ঘুম ভেঙে একসময় জেগে উঠি, দেখি সত্যি সত্যি অপূর্ব রূপবতী একটি মেয়ে আমাকে ডাকছে। আমার মনে হতে থাকে এটি বুঝি পৃথিবীর কোনো মানবী নয়, যেন স্বর্গ থেকে কেউ ভুল করে নেমে এসেছে। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার হঠাৎ সব কথা মনে পড়ে গেল, আমি এই অপূর্ব রূপবতী মেয়েটিকে হত্যা করতে এসেছিলাম।

মেয়েটি কোমল গলায় বলল, "তুমি ঘুমের মাঝে কোনো একটি দুঃস্বপ্ন দেখছিলে।"

"হ্যাঁ। স্বপ্ন দেখছিলাম বীভৎস কোনো প্রাণী আমাকে খেয়ে ফেলছে। ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন।"

"জানি। দুঃস্বপ্ন খুব ভয়ঙ্কর হয়। আমি জেগে জেগেও দুঃস্বপ্ন দেখি।"

আমি মেয়েটার দিকে একটু অবাক হয়ে তাকালাম, জিজ্ঞেস করলাম, "কী বললে?"

মেয়েটি একটা নিঃশ্বাস ফেলল, বলল, "না। কিছু না।"

আমি উঠে বসে বললাম, "তোমার সাথে আমার এখনো পরিচয় হয় নি। আমার নাম কিরি।"

"তোমার সাথে পরিচিত হয়ে খুব খুশি হলাম কিরি।"

"তোমার নাম?"

"আমার কোনো নাম নেই।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "নাম নেই? কী বলছ?"

"ষোল বিটের একটা কোড দিয়ে আমার হিসাব রাখা হয়। হাতের চামড়ার নিচে একটা পালসার ছিল, খুলে ফেলেছি।"

"কী বলছ তুমি? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।"

মেয়েটা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "পারবে না। মাঝে মাঝে আমি নিজেও বুঝতে পারি না। তুমি যদি চাও আমাকে কোনো একটা নাম দিয়ে ডাকতে পার।"

"একজন মানুষ নাম ছাড়া কীভাবে বেঁচে থাকতে পারে?"

"আমি মানুষ নই।"

"তুমি কী?"

"মনে হয় একটা দানবী। একটা পিশাচী।"

ইশি ফিসফিস করে বলল, "হ্যাঁ, কিরি। এটি একটি দানবী। একটি পিশাচী। তুমি একে হত্যা কর।"

মেয়েটি মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ, তুমি আমাকে হত্যা কর।"

আমি চমকে উঠে বললাম, "তুমি কীভাবে আমার ট্রাকিওশানের কথা শুনতে পাও? সে বলছে সরাসরি মস্তিষ্কে কোনো শব্দ না করে।"

"পিশাচীরা মনের কথা শুনতে পারে।"

"তুমি নিশ্চয়ই একটা রোবট। কাছাকাছি বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় রেডিয়েশান ধরতে পার।"

মেয়েটি কোনো কথা বলল না, আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ইশি ফিসফিস করে বলল, "হত্যা কর। হত্যা কর। হত্যা—"

আমি একটু অধৈর্য হয়ে আমার মস্তিষ্কে বসানো ট্রাকিওশানকে বললাম, "আমি যখন চাইব তখন করব। তুমি চুপ কর ইশি।"

"তুমি বুঝতে পারছ না। তোমার জীবনের ওপর প্রচণ্ড ঝুঁকি—"

"তুমি চুপ কর।"

"তোমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, সেই দায়িত্বের অবহেলা করতে পার না তুমি।"

"তুমি সিস্টেম সাতানব্বই গ্রুপ বারো পয়েন্ট বি, আমার নিয়ন্ত্রণে থাকবে তুমি। আমি যখন তোমার সাহায্য চাইব তুমি সাহায্য করবে। না-হয় তুমি আমার সাথে কথা বলবে না—"

AMARBOI.COM

মেয়েটি স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়েছিল, তার মুখের ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল সে আমাদের সব কথা শুনতে পাচ্ছে। তার মুখে ধীরে ধীরে বিচিত্র একটা হাসি ফুটে ওঠে, হঠাৎ করে প্রায় অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলে উঠল, "আমি কখনো অন্য কারো ভালবাসা পাই নি। কারো স্নেহ-মমতা পাই নি। তুমি জান আমাকে কেউ কখনো কোনো দয়ার্দ্র কথা বলে নি।"

আমি মেয়েটির দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালাম, মেয়েটির দৃষ্টিতে হঠাৎ একটা কৌতুকের চিহ্ন ফুটে উঠল, বলল, "তাই আমি ঠিক করেছি যে-কারো ভালবাসা পেলে শুধু তাকেই আমি ভালবাসব।"

ইশি হঠাৎ একটা আর্তচিৎকার করে বলল, "না।"

আমি চমকে ওকে বললাম, "কী হল ইশি?"

ইশি উত্তর দেবার আগেই মেয়েটা আমার চোখে চোখ রেখে বলল, "কিরি! কী মনে হয় তোমার? আমি কি নিজেকে ভালবাসি?"

"না—না—না—" ইশি আমার মস্তিষ্কে আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে। আমি অবাক হয়ে বললাম, "কী হয়েছে ইশি? কী হয়েছে তোমার?"

আমার মস্তিষ্কে ইশি কোনো উত্তর দিল না, চাপা কান্নার মতো এক ধরনের শব্দ করতে লাগল। আমি মেয়েটির দিকে তাকালাম, কী হয়েছে এখনো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। মেয়েটি হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, "সিস্টেম সাতানব্বই গ্রুপ বারো পয়েন্ট বি খুব দুর্বল সিস্টেম। সহজ প্রশ্নটাতেই তোমার ট্রাকিওশান কেমন জট পাকিয়ে গেল দেখেছ?"

"কী প্রশ্ন করেছ তুমি?"

"ছেলেমানুষি একটা প্রশ্ন। একটা প্যারাডক্স। মানুষের কাছে এই প্রশ্নের কোনো সমস্যা নেই—যন্ত্রের কাছে সমস্যা। সে কখনো তার উত্তর খুঁজে পাবে না। একটু সময় দাও, টেরা ওয়ার্ড মেমোরি শেষ হবার সাথে সাথে ওর সিস্টেম ধসে যাবে। তোমাকে আর বিরক্ত করবে না।"

AMARBOI.COM

"আর আমাকে বিরক্ত করবে না?"

"না। এই খনিটা মাটির অনেক নিচে, তামার আকরিকে বোঝাই। এখানে বাইরের পৃথিবীর কোনো সিগনাল আসে না। তোমার ট্রাকিওশানকে বাইরে থেকে কেউ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। সে নিজে থেকে যদি দাঁড়াতে পারে তোমার অনুগত একটি ট্রাকিওশান হয়ে দাঁড়াবে।"

"তুমি কেমন করে জান?"

"আমি জানি। আমাকে যখন প্রথমবার হত্যা করা হয় তখন আমার মাথায় এ রকম ট্রাকিওশান ছিল।"

আমি একটু শিউরে উঠে মেয়েটার দিকে তাকলাম, কী বলছে এই মেয়েটি? প্রথমবার হত্যা করার অর্থ কী?

একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কী বলছ আমি বুঝতে পারছি না। একজন মানুষকে কি বারবার হত্যা করা যায়?"

"আমি মানুষ নই।"

"তুমি কী?"

মেয়েটি একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "প্রতিরক্ষা দপ্তরের একটি গোপন প্রজেক্ট ছিল, তার নাম প্রজেক্ট অতিমানবী। সেই প্রজেক্টে অনেক শিশু তৈরি করা হয়েছিল।"

"তৈরি করা হয়েছিল!"

"হ্যাঁ। ওরা কোনো মা-বাবার ভালবাসায় জন্ম নেয় নি। ওদেরকে ল্যাবরেটরিতে তৈরি করা হয়েছিল। সবাই ক্লোন। একটি কোষকে নিয়ে তার ডি. এন. এ.-কে একটু একটু করে পরিবর্তন করে নিখুঁত মানুষ তৈরি করার প্রজেক্ট ছিল সেটি। একসাথে তৈরি করা হত বিশ জন-পঁচিশ জন শিশু, প্রত্যেকটি শিশু ছিল এক জন আরেক জনের অবিকল প্রতিরূপ। একসাথে তাদের বড় করা হত একটি ইউনিট হিসেবে, তাদের আলাদা নাম দেওয়া হত না, আলাদা পরিচয় থাকত না। তারা সবাই মিলে একটি প্রাণী হিসেবে বড় হত। মানুষের শরীরে প্রত্যেকটি কোষ যেরকম আলাদা আলাদাভাবে জীবন্ত কিন্তু সবগুলো কোষ মিলে তৈরি হয় মানুষ, অনেকটা সেরকম। প্রত্যেকটি শিশু আলাদা আলাদাভাবে জীবন্ত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সবাই মিলে সত্যিকার একটা প্রাণী। একটা অতিমানব।"

"কোথায় সেইসব শিশুরা?"

"প্রতিরক্ষা দপ্তরের এই প্রজেক্ট ছিল পরীক্ষামূলক প্রজেক্ট। তাই এই শিশুদের জিনগুলোর মাঝে একটা বিধ্বংসী জিন ঢুকিয়ে দেওয়া হত। তাদের বয়স যখন হত পাঁচ বছর, বিধ্বংসী জিনটি তার কাজ শুরু করত। রক্তের লোহিত কণিকা তৈরি হত ভিন্নভাবে, অক্সিজেন নিতে পারত না। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে একে একে মারা যেত প্রতিটি শিশু। হত্যা করার অনেক উপায় থাকা সত্ত্বেও এই নিষ্ঠুর উপায়টি বেছে নেওয়া হয়েছিল ইচ্ছে করে।"

"কেন?"

"সবাই মিলে ওরা একটা সত্তা ওদের যেকোনো একজন মারা গেলে ওদের সবারই মৃত্যুর অনুভূতি হত। এমনিতে সাধারণ কোনো মানুষ একবারের বেশি মৃত্যুর অনুভূতি অনুভব করতে পারে না—কিন্তু এই অতিমানবেরা বারবার সেই অনুভূতি অনুভব করত। বিজ্ঞানীরা মানুষের সেই অনুভূতি নিয়ে গবেষণা করতেন।"

"কিন্তু এটি তো নিষ্ঠুরতা।"

"নিষ্ঠুরতা কথাটির একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে। যে কাজ পশুর বেলায় করা হলে সেটি নিষ্ঠুরতা নয়, মানুষের বেলায় সেটি নিষ্ঠুরতা। পশুকে কেটেকুটে রান্না করে খাওয়া হয়, মানুষের বেলায় সেটা চিন্তাও করা যায় না। প্রচলিত অর্থে এইসব শিশুকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা হত না। তাই তাদেরকে নিয়ে যেসব কাজ করা হত সেগুলো হত বৈজ্ঞানিক গবেষণা, সেগুলোকে কেউ নিষ্ঠুরতা মনে করত না।"

আমি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, "তুমি কি এই অতিমানব প্রজেক্টের এক জন?"

মেয়েটি কথা না বলে সম্মতিসূচকভাবে মাথা নাড়ল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি তা হলে বেঁচে আছ কেমন করে?"

মেয়েটি বিচিত্র একটি ভঙ্গিতে হেসে বলল, "বলতে পার প্রকৃতির এক ধরনের খেয়াল। ঠিক যে জিনটি আমাদের পাঁচ বছর পর হত্যা করত, মিউটেশানে তার পরিবর্তন হয়ে গেছে। ধ্বংসকারী সেই জিনের মাত্র একটা বেস পেয়ারের পরিবর্তন হয়েছে, যেটা হওয়ার কথা ছিল সি-এ-জি সেটা হয়েছে ইউ-এ-জি। যেখানে এমিনো এসিড গ্লুটামাইন তৈরি হওয়ার কথা সেখানে প্রোটিন সিনথেসিস বন্ধ হয়ে গেছে।

"পাঁচ বছর পার হওয়ার পর যখন অক্সিজেনের অভাবে আমাদের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যাবার কথা, আমরা কেউ মারা গেলাম না। আমাদের ডি. এন. এ. পরীক্ষা করে প্রজেক্ট অতিমানবীর বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করল আমরা নিজে থেকে মারা যাব না। আমাদের একজন একজন করে হত্যা করতে হবে। কর্মকর্তারা কীভাবে মারা হবে সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করে

AMARBOI.COM

ফেলল, আমরা আরো একটু বড় হয়ে গেলাম।

"ট্রাকিওশান লাগিয়ে যখন আমাদেরকে প্রথমবার আত্মহত্যা করানো হল তার আঘাত হল ভয়ানক। দ্বিতীয়বার যখন আমাদের হত্যা করা হল আমাদের পক্ষে সেটি গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ল। মৃত্যুর পর কেউ ফিরে আসে না তাই পৃথিবীর কেউ মৃত্যুর অনুভূতি জানে না। আমরা জানি। আমাদের একজন যখন মারা যায় তখন আমরা সবাই সেই ভয়ঙ্কর কষ্ট অনুভব করি, ভয়ঙ্কর হতাশা আর এক অকল্পনীয় শূন্যতা অনুভব করি। তোমরা সেই অনুভূতির কথা কল্পনাও করতে পারবে না।"

মেয়েটির মুখে একটি গাঢ় বিষাদের ছায়া এসে পড়ল। সে ছোট একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "আমরা সেই কষ্ট আর সহ্য করতে পারলাম না, একদিন তাই ল্যাবরেটরি থেকে পালিয়ে গেলাম।"

"পালিয়ে গেলে!" আমি অবাক হয়ে বললাম, "তোমরা পাঁচ-ছয় বছরের শিশু কেমন করে প্রতিরক্ষা দপ্তরের এত বড় ল্যাবরেটরি থেকে পালিয়ে গেলে?"

মেয়েটা একটু হাসার ভঙ্গি করে বলল, "আমরা তখন ঠিক পাঁচ-ছয় বছরের শিশু নই, আরো একটু বড় হয়েছি। তা ছাড়া আমরা ছিলাম অতিমানবী, আমরা বড় হই অনেক দ্রুত। আমাদের ক্ষমতাও অনেক বেশি, আমরা মানুষের মনের মাঝে ঢুকে যেতে পারি। ভাবনা-চিন্তা বুঝে ফেলতে পারি। মানুষের মস্তিষ্ককে খানিকটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। আমরা যদি পালিয়ে যেতে চাই আমাদের আটকে রাখা খুব কঠিন।"

"পালিয়ে তোমরা কোথায় গেলে?"

মেয়েটা বিষণ্ন গলায় বলল, "প্রথমে আমরা সবাই একসাথে ছিলাম। তখন প্রতিরক্ষা দপ্তরের ঘাতকদল এক জন এক জন করে আমাদের হত্যা করতে শুরু করল। নিজেদের রক্ষা করার জন্য আমরা তখন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেলাম।"

AMARBOI.COM

মেয়েটা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "যখন আমরা আলাদা আলাদা হয়ে গেলাম তখন প্রথমবার আমাদের সত্যিকারের সমস্যাটির কথা জানতে পারলাম।"

"সেটি কী?"

"আমরা ভয়ঙ্কর নিঃসঙ্গ। আমাদের অতিমানবিক মস্তিষ্কের সঙ্গী হতে পারে শুধুমাত্র আমাদের মতো আরেকজন। তাদেরকে ছেড়ে আমরা যখন আলাদা হয়ে গেলাম মনে হতে লাগল আমাদের বুঝি একটি নিঃসঙ্গ গ্রহে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের এই জীবনের কোনো মূল্য নেই।"

"তা হলে তোমরা কী করবে?"

"এই অতিমানবী প্রজেক্ট একটি অত্যন্ত অমানবিক অত্যন্ত হৃদয়হীন প্রজেক্ট। এই প্রজেক্টে আমাদের মতো কিছু অতিমানবী তৈরি হয় কিন্তু তারা আবিষ্কার করে এই পৃথিবী তাদের জন্য নয়। তুমি জান আমাদের কিছু অনুভূতি আছে যেগুলো কী ধরনের তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ, সত্যি।"

"কী রকম সেই অনুভূতি?"

"আমি কেমন করে তোমাকে বোঝাব! যেমন মনে কর শব্দ। তুমি তো শব্দ শোন, তুমি কি জান প্রতিটি শব্দের একটা আকার আছে, একটা রং আছে?"

"শব্দের রং? আকার?"

"হ্যাঁ, তুমি সেটা চিন্তাও করতে পার না। কিন্তু আমরা সেটা দেখি। তোমাদের দুঃখের অনুভূতি আছে এবং সুখের অনুভূতি আছে কিন্তু তুমি কি জান যে তীব্র এক ধরনের সুখের অনুভূতি আছে, সেটি এত তীব্র যে সেটা যন্ত্রণার মতো?"

আমি মাথা নাড়লাম, "না, জানি না।"

"তোমাদের জানার কথাও নয়। তোমরা সৌভাগ্যবান, যেসব অনুভূতি তোমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে তোমাদের শুধু সেই অনুভূতি দেওয়া হয়েছে। আমাদের বেলায় সেটা সত্যি নয়, আমাদের করার কিছু নেই কিন্তু সেই অনুভূতি আমাদের বহন করে যেতে হয়।"

"তোমরা এখন তা হলে কী করবে?"

"আমরা নিজেদেরকে ধ্বংস করে ফেলব।"

"ধ্বংস করে ফেলবে?" আমি অবাক হয়ে বললাম, "মানে আত্মহত্যা করবে?"

"হ্যাঁ।"

"কীভাবে?"

মেয়েটি কোমল ভঙ্গিতে হেসে বলল, "আমাকে কিছুই করতে হবে না। আমি শুধু সিদ্ধান্ত নেব যে আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না। তখন আমার মস্তিষ্ক শরীরকে শীতল করে নেবে, হৃৎপিণ্ড রক্তসঞ্চালন কমিয়ে দেবে, আমার মেটাবলিজম বন্ধ হয়ে আসবে। আমি বাঁচতে চাই কি না চাই সেটা আমার ইচ্ছা।"

আমি কী বলব বুঝতে পারছিলাম না, অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। মেয়েটি একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "তুমি যখন অস্ত্র হাতে আমাকে হত্যা করতে এলে আমি ভেবেছিলাম আমি তোমাকে হত্যা করতে দেব, ঠিক তখন তোমার মস্তিষ্কের মাঝে আমি শুনতে পেলাম একটি কোমল কথা—তখন আর পারলাম না, সরে গেলাম।"

"আমি তোমার কাছে সে জন্য কৃতজ্ঞ—আমাকে একজন হত্যাকারী হতে হল না। শুধু তাই না—তোমার সাথে আমার পরিচয় হল—" আমি এক মুহূর্ত থেমে বললাম, "তোমার কোনো নাম নেই বলে আমার কথা বলতে খুব অসুবিধে হচ্ছে।"

"আমি তো বলেছি, একটা নাম দিয়ে দাও।"

"সত্যি?"

"সত্যি।"

"ঠিক আছে, এখন থেকে তোমার নাম লাইনা।"

"বেশ, আমার নাম লাইনা!"

আমি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, "তোমার সাথে পরিচয় হয়ে খুব খুশি হলাম লাইনা।"

লাইনা আমার হাত স্পর্শ করে বলল, "তুমি সত্যিই খুশি হয়েছ দেখে আমারও খুব ভালো লাগছে কিরি।"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "আমি ভুলেই গিয়েছিলাম তুমি অতিমানবী! তুমি মস্তিষ্কের ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখতে পার—আমি সত্যি বলছি না মিথ্যা বলছি!"

ঠিক তখন আমার মস্তিষ্কের মাঝে কে যেন ফিসফিস করে বলল, "আমি কোথায়?"

আমি গলার স্বরে চিনতে পারলাম, এটি আমার মস্তিষ্কে বসানো ট্রাকিওশান ইশি। আমি মাথা নেড়ে বললাম, "তুমি আমার মস্তিষ্কের ভিতরে।"

"মস্তিষ্ক কী?"

"তুমি যদি না জান মস্তিষ্ক কী, তোমাকে সেটা বোঝানো খুব কঠিন।"

"আমি কে?"

"তোমার নাম ইশি।"

"আমি কেন?"

"আমাকে সাহায্য করার জন্য।"

"আমি কীভাবে তোমাকে সাহায্য করব?"

"সময় হলেই আমি তোমাকে বলব। এখন আমরা আছি একটা খনির ভিতর, মাটির অনেক নিচে। তাই বাইরে থেকে কোনো সঙ্কেত আসতে পারছে না। কিন্তু আমরা যখন বাইরে যাব সাথে সাথে প্রতিরক্ষা দপ্তর তোমার সাথে যোগাযোগ করবে। তখন তুমি তাদের কোনো প্রশ্নের জবাব দেবে না।"

"ঠিক আছে আমি জবাব দেব না।"

"চমৎকার। তোমার আলাদাভাবে কোনো অস্তিত্ব নেই। তোমার অস্তিত্ব আমার সাথে। আমার অস্তিত্ব রক্ষা করলেই তোমার অস্তিত্ব বেঁচে থাকবে। তাই তুমি সবসময় আমার নির্দেশ মেনে চলবে।"

"মেনে চলব।"

"তা হলে তুমি অপেক্ষা কর, যখন প্রয়োজন হবে, আমি তোমায় ডাকব।"

"আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব।"

ইশি মস্তিষ্কে নিঃশব্দ হয়ে যাবার পর আমি ঘুরে লাইনার দিকে তাকালাম, বললাম, "আমি তোমার মতো অতিমানবী নই, আমি সাধারণ মানুষ, সেজন্যই মনে হয় আমি এই জিনিসটা বুঝতে পারছি না। যে আত্মহত্যা করতে চাইছে তাকে কেন হত্যা করতে হবে?"

"প্রতিরক্ষা দপ্তর জানে না আমরা এখন আত্মহত্যা করতে প্রস্তুত হয়েছি। তারা জানে না যে আমরা আর নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারছি না।"

"তা হলে কেন আমরা প্রতিরক্ষা দপ্তরকে সেটা জানিয়ে দিই না? এই নৃশংসতা কেন বন্ধ কর না?"

"করে কী হবে?"

"হয়তো তোমাদেরকে প্রজেক্ট অতিমানবীর ল্যাবরেটরিতে নেওয়া যাবে, হয়তো তোমাদের অতিমানবিক জিনিস পরিবর্তন করে তোমাদের সাধারণ মানুষে পরিবর্তন করা যাবে। হয়তো তোমরা সাধারণ মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকতে পারবে।"

"তোমরা? তুমি 'তোমরা' কথাটি ব্যবহার করছ কেন?"

"কারণ তুমি নিজেই বলেছ তোমার একার অস্তিত্ব পূর্ণাঙ্গ নয়। সবাই মিলে তোমার অস্তিত্ব।"

লাইনা ঝট করে ঘুরে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি সত্যিই আমাদের সবাইকে একত্র করতে পারবে!"

"আমি জানি না লাইনা।" আমি নিচু গলায় বললাম, "কিন্তু আমার মনে হয় সবকিছু জানতে পারলে প্রতিরক্ষা দপ্তর নিশ্চয়ই তোমাদের সবাইকে হত্যা না করে ল্যাবরেটরিতে ফিরিয়ে নেবে।"

"তোমার তাই মনে হয়?"

"আমার তাই মনে হয়। তুমি যদি রাজি থাক আমি চেষ্টা করতে পারি।"

লাইনা কয়েক মুহূর্ত চেষ্টা করে বলল, "ঠিক আছে চেষ্টা করে দেখ। আমি আমার সমস্ত অস্তিত্বগুলো একনজর দেখার জন্য সমস্ত বিশ্ব দিয়ে দিতে পারি। মৃত্যুর পূর্বে সবাই মিলে যদি একবারও পূর্ণাঙ্গ একটি অতিমানবী হতে পারি, আমার কোনো ক্ষোভ থাকবে না।"

"বেশ। আমি চেষ্টা করব। কিন্তু তার আগে আমাকে কিছু প্রস্তুতি নিতে হবে।"

"কী ধরনের প্রস্তুতি?"

"আমি প্রতিরক্ষা দপ্তরকে বিশ্বাস করি না। প্রয়োজনে যেন তাদেরকে ভয় দেখাতে পারি সেই প্রস্তুতি।"

৫

পরিত্যক্ত খনি থেকে বের হওয়ামাত্রই ইশি আমার মস্তিষ্কে ফিসফিস করে বলল, "আমাকে কেউ একজন ডাকছে।"

"প্রতিরক্ষা দপ্তর। উত্তর দেবার কিছু প্রয়োজন নেই।"

"কেন উত্তর দেবার কোনো প্রয়োজন নেই?"

"আমি কোথায় সেটা জানতে দিতে চাই না। তুমি উত্তর দেওয়ামাত্র আমার অবস্থান জেনে যাবে।"

"তোমার অবস্থান জানলে ক্ষতি কী?"

"আসলে কোনো ক্ষতি নেই। আমার অবস্থান আগে হোক পরে হোক জেনে যাবেই। কিন্তু আমি একটু সময় চাইছি।"

AMARBOI.COM

আমি পরিত্যক্ত খনি থেকে অনেক কষ্টে শহরে ফিরে এলাম। নিজের বাসায় একদিন শুয়ে-বসে কাটিয়ে দিলাম। পরদিন শহরতলিতে পানশালায় গেলাম নিফ্রাইট মেশানো পানীয় খেতে। সেখানে কোমের সঙ্গে দেখা হল—আমার সাথে যে বেশ কয়েকদিন দেখা হয় নি সেটা নিয়ে কোম কিছু সন্দেহ করল না। আমরা পানীয়তে চুমুক দিয়ে শিল্প–সাহিত্য–সংস্কৃতি এই ধরনের বড় বড় ব্যাপার নিয়ে কথা বললাম। উঠে আসার সময় কোমকে জিজ্ঞেস করলাম, "হিম নগরীতে যাবার সহজ রাস্তা কি জান?"

কোম অবাক হয়ে বলল, "হিম নগরী! সেখানে কেন যাবে?"

আমি রহস্যময়ভাবে হেসে বললাম, "একটু কাজ আছে!"

হিম নগরীর রাস্তা কোম জানে না, আমি জানতাম সে জানবে না। কয়দিন পর যখন প্রতিরক্ষা দপ্তর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে সে নিশ্চয়ই এই কথাটা বলবে, এই জন্যই তাকে জিজ্ঞেস করা।

আমি শহরের বড় বড় ব্যাঙ্ক ভল্টে কয়দিন ঘোরাঘুরি করলাম, আন্তঃভূমণ্ডল পরিবহন কেন্দ্রে কেনাকাটা করলাম, কেন্দ্রীয় নেটওয়ার্কে একদিন বসে বসে পৃথিবীর বড় বড় ডাটা সেন্টারে তথ্য বিনিময় করলাম। পৃথিবীর বড় কিছু গবেষণাগারে অর্থহীন বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম। অবশেষে শহরের বড় একটি লেভিটেশান টার্মিনালে অসংখ্য মানুষের ভিড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে থেকে ইশিকে বললাম প্রতিরক্ষা দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করতে।

আমাকে খুঁজে বের করতে কতক্ষণ লাগবে সেটা নিয়ে আমার একটু কৌতূহল ছিল, দেখতে পেলাম ঘণ্টাখানেকের মাঝেই আমাকে প্রতিরক্ষা দপ্তরের কাছাকাছি একটা অফিসে

নিয়ে যাওয়া হল। লেভিটেশান টাওয়ারের ভিড় থেকে আমাকে তুলে আনা হয়েছে বলে অসংখ্য দৃষ্টিক্ষেপণ মডিউলে সেটি সংরক্ষিত থাকার কথা, রিগা কম্পিউটার ইচ্ছে করলেই তার পরিবর্তন করতে পারবে কিন্তু এই বিশাল মানুষের ভিড়ের দৃশ্যে সেটি সহজ নাও হতে পারে।

প্রতিরক্ষা দপ্তরে আমার সাথে যে কথা বলতে এল সে সম্ভবত খুব উচ্চপদস্থ কর্মচারী, তার সাথে এসেছে দুজন আইনরক্ষাকারী অফিসার এবং একটি প্রতিরক্ষা রোবট। উচ্চপদস্থ কর্মচারীটি মধ্যবয়স্ক, জীবনের একটি বড় সময় ভুরু কুঁচকে থাকার কারণে তার কপাল পাকাপাকিভাবে কুঞ্চিত হয়ে আছে। আমার দিকে তাকিয়ে রুষ্ট স্বরে বলল, "আধা জৈবিক প্রাণীটি ধ্বংস করে তোমার সাথে আমার যোগাযোগ করার কথা ছিল।"

আমি একটু অবাক হবার দুর্বল অভিনয় করে বললাম, "ছিল নাকি? আমি ভেবেছিলাম সে জন্য তোমরা আমার মাথায় একটা ট্রাকিওশান লাগিয়েছ।"

মানুষটি মুখ কালো করে বলল, "ট্রাকিওশানটি আমাদের আনুগত্য স্বীকার করতে অস্বীকার করছে।"

"তাই নাকি!" আমি গলায় বিদ্রূপটুকু লুকানোর কোনো চেষ্টা না করে বললাম, "কী অন্যায়! কী ঘোরতর অন্যায়?"

প্রতিরক্ষা রোবটটি ভাবলেশহীন মুখে বসে রইল, কিন্তু আমার কথায় সাথের আইনরক্ষাকারী অফিসার দুজন বিশেষরকম বিচলিত হয়ে উঠল বলে মনে হল।

উচ্চপদস্থ কর্মচারীটি ক্ষুব্ধ গলায় বলল, "আধা জৈবিক প্রাণীটিকে ধ্বংস করার একটি পূর্ণ রিপোর্ট দরকার। তুমি কি সেটি দেবার জন্য প্রস্তুত?"

"না।"

কর্মচারীটি অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে রাখল। আইনরক্ষাকারী অফিসারদের একজন বলল, "কেন নয়?"

"সেটি সম্ভব নয় বলে।"

"কেন সেটি সম্ভব নয়?"

"কারণ আমি সেই প্রাণীটিকে হত্যা করি নি।"

"অসম্ভব। সেই প্রাণীটিকে হত্যা না করলে তুমি জীবন্ত বের হতে পারতে না। আমাদের সিসমি রেকর্ডে তোমার এটমিক ব্লাস্টারের বিস্ফোরণের সংকেত ধরা পড়েছে।"

"তোমরা যদি সেটি জান তা হলে কেন আমাকে প্রশ্ন করছ?"

"আমরা খুঁটিনাটি জানতে চাই। আধা জৈবিক প্রাণীটির ধ্বংসাবশেষ আনতে চাই।"

আমি হঠাৎ করে সামনে ঝুঁকে গলার স্বর পরিবর্তন করে বললাম, "আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য আছে, কিন্তু সেই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি আমি দিতে পারি ঠিক সেরকম গুরুত্বপূর্ণ কোনো মানুষকে।"

উচ্চপদস্থ কর্মচারীটি দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, "তোমার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ মানুষটি কে হতে পারে?"

"তুমি তাকে চিনবে না। সত্যি কথা বলতে কী, আমি যদি সেই মানুষের কথা তোমাকে বলি, তোমার বিপদ হতে পারে। তুমি কি সত্যিই শুনতে চাও?"

আমি এই প্রথমবার মানুষটির মুখে এক ধরনের ভীতির ছাপ দেখতে পেলাম। সে ইতস্তত করে বলল, "তুমি কী বলতে চাও?"

"আমি তোমাকে বিপদে ফেলতে চাই না। তুমি তোমাদের সবচেয়ে উচ্চপদস্থ মানুষ কিংবা যন্ত্রকে নিয়ে এস। যদি সেটা নিয়ে সমস্যা থাকে আমাকে একটি গোপন

AMARBOI.COM

চ্যানেল দাও আমি ইশিকে ব্যবহার করে একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ কিংবা যন্ত্রের সাথে যোগাযোগ করি।"

"আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না।"

আমি কাঠ কাঠ স্বরে হেসে উঠে বললাম, "তুমি জান আমি এক ফুঁয়ে তোমাদের ধ্বংস করে দিতে পারি? তোমরা নিজেরা আমার মুখে ভয়ঙ্কর একটি বিস্ফোরক লাগিয়ে দিয়েছিলে? সেটি এখনো ব্যবহার করি নি। তুমি জান?"

আমার এই কথায় হঠাৎ ম্যাজিকের মতো কাজ হল। সামনে যারা উপস্থিত ছিল তারা হঠাৎ করে উঠে দাঁড়াল এবং আমাকে একা বসিয়ে রেখে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। আমি কালো একটি গ্রানাইট টেবিলের সামনে একাকী বসে রইলাম।

দীর্ঘ সময় পরে আমার সামনে হলোগ্রাফিক স্ক্রিনে একজন বয়স্ক মানুষের ছবি দেখতে পেলাম। মানুষটি শুষ্ক গলায় বলল, "তুমি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে চাইছ?"

"হ্যাঁ। শুধুমাত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মানুষের কাছে।"

বয়স্ক মানুষটি হাসার ভঙ্গি করে বলল, "আমি প্রতিরক্ষা দপ্তরের একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মানুষ।"

"সেটি সত্যি কি না আমি এক্ষুনি বুঝতে পারব।" আমি একমুহূর্ত অপেক্ষা করে বললাম, "তুমি কি প্রজেক্ট অতিমানবীর কথা শুনেছ?"

বয়স্ক মানুষটি বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠল, কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তুমি—তুমি কী বললে?"

"প্রজেক্ট অতিমানবী।"

"তুমি কেমন করে প্রজেক্ট অতিমানবীর কথা জেনেছ?"

"তোমরা আমাকে যে অতিমানবীকে হত্যা করতে পাঠিয়েছিলে, আমি তাকে হত্যা করি নি। আমার তার সাথে পরিচয় হয়েছে।"

"অসম্ভব।"

"তার কোন ক্রোমোজমের কোন জিনটির কোন বেস পেয়ারবটির মিউটেশানের কারণে তাদের মৃত্যু ঘটে নি সেটি বললে কি তুমি বিশ্বাস করবে?"

বয়স্ক মানুষটি দীর্ঘসময় আমার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর কেমন জানি ভয় পাওয়া গলায় বলল, "তুমি কী চাও?"

"আমি প্রজেক্ট অতিমানবীর মহাপরিচালকের সাথে কথা বলতে চাই।"

বৃদ্ধ মানুষটি বিচিত্র এক ধরনের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, তাকে হঠাৎ কেমন জানি ক্লান্ত এবং বিধ্বস্ত দেখাতে থাকে। খানিকক্ষণ চেষ্টা করে বলল, "তুমি কেন এটা করতে চাইছ?"

"অতিমানবীদের নিয়ে যে নৃশংসতা শুরু হয়েছে আমি সেটা বন্ধ করতে চাই।"

"তুমি?"

"হ্যাঁ আমি।"

"তুমি কীভাবে সেটা করবে?"

"আমি সেটা প্রজেক্ট অতিমানবীর মহাপরিচালককে বলব।"

বৃদ্ধ মানুষটি খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "প্রজেক্ট অতিমানবীর মহাপরিচালক সম্পর্কে তুমি কতটুকু জান?"

"আমি কিছু জানি না।"

AMARBOI.COM

"আমারও তাই ধারণা, তাই তুমি তার সাথে দেখা করতে চাইছ।"

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, "কেন? তার সাথে দেখা করতে অসুবিধা কী?"

"আমার জানামতে কোনো মানুষ তার সাথে দেখা করে নি।"

"কেন?"

"এই প্রজেক্টটি পুরোপুরি পরিচালিত হয় আধা জৈবিক কিছু প্রাণী, কিছু রোবট, কিছু পরামানব–মানবী এবং কিছু যন্ত্র দিয়ে। সেখানে কোনো মানুষের প্রবেশাধিকার নেই।"

আমার শরীর কেন জানি শিউরে উঠল, আমি বৃদ্ধ মানুষটির দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললাম, "আমি তবু সেখানে যেতে চাই।"

হলোগ্রাফিক স্ক্রিনে বৃদ্ধ মানুষটি দীর্ঘসময় আমার দিকে তাকিয়ে রইল, বলল, "আমি যদি তোমাকে এই মুহূর্তে হত্যা করার নির্দেশ দিয়ে অতিমানবীদের একে একে ধ্বংস করার প্রক্রিয়াটি চালু রাখি?"

"তুমি সেটা করবে না।"

"কেন?"

"তোমরা যে অতিমানবীকে হত্যা করার জন্য আমাকে পাঠিয়েছিলে, সেই লাইনার সাথে আমার পরিচয় হয়েছে। আমি তার শরীর থেকে রক্ত নিয়েছি, টিস্যু নিয়েছি। সেই রক্ত, টিস্যু, জীবন্ত কোষ বায়োজ্যাকেটে করে হিম নগরীতে পাঠিয়েছি, পৃথিবীর নানা প্রান্তে জমা রেখেছি।"

"না—" বৃদ্ধ মানুষটি চিৎকার করে বলল, "না!"

"হ্যাঁ। তথ্যকেন্দ্রে আমি সেই তথ্যও জমা রেখেছি—বিশ্বাস না হলে খোঁজ নিতে পার। আমার মৃত্যু হলে সেই তথ্য প্রকাশিত হবে। পৃথিবীর অর্থলোলুপ ব্যবসায়ীরা সেই টিস্যু, সেই জীবন্ত কোষ থেকে ৪৬টি ক্রোমোজম নিয়ে অতিমানবীর ক্লোন তৈরি করবে। কয়েকটি অতিমানবীর জায়গায় পৃথিবীতে থাকবে কয়েক সহস্র অতিমানবী। সেখান থেকে কয়েক লক্ষ। তোমরা কত জনকে হত্যা করবে?"

"না। না—না। তুমি জান না তুমি কী ভয়ঙ্কর খেলায় হাত দিয়েছ।" বৃদ্ধ মানুষটি চিৎকার করে বলল, "তুমি উন্মাদ। তুমি বদ্ধ উন্মাদ।"

"সম্ভবত। কিন্তু একটা জিনিস জান?"

"কী?"

"আমি খুব সাধারণ একজন মানুষ ছিলাম। তোমরা আমাকে বদ্ধ উন্মাদ করে তুলেছ। আর মজা কী জান? বদ্ধ উন্মাদ হয়ে আমার কিন্তু ভালো লাগছে।"

বৃদ্ধ মানুষটি শীতল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তুমি আমার কাছে কী চাও?"

আমি একটি নিশ্বাস ফেলে বললাম, "তুমি কি আমাকে প্রজেক্ট অতিমানবীর মহাপরিচালকের সাথে দেখা করিয়ে দেবে?"

বৃদ্ধ মানুষটি খানিকক্ষণ আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল, তার পর অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, "ঠিক আছে আমি চেষ্টা করব।"

ভাসমান যানটি আমাকে চত্বরের শক্ত কংক্রিটে নামিয়ে দিয়ে এইমাত্র আবার আকাশে উঠে গেছে। আমি যতক্ষণ সম্ভব ভাসমান যানটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। লাল আলো জ্বলতে জ্বলতে এবং নিভতে নিভতে ভাসমান যানটি দূরে মিলিয়ে গেল। আমি সামনে

তাকালাম, আমাকে বলে দেওয়া না হলে কখনোই বিশ্বাস করতাম না যে এই প্রায় বিধ্বস্ত দালানটি প্রজেক্ট অতিমানবীর মূল ল্যাবরেটরি। দূরে শক্ত পাথরের দেয়াল দিয়ে ঘেরা, উপরে নিশ্চয়ই শক্তিশালী ইনফ্রারেড আলোর অদৃশ্য প্রহরা। ভিতরে অবিন্যস্ত গাছপালা এবং ঝোপঝাড়, কংক্রিটের চত্বর থেকে ল্যাবরেটরি পর্যন্ত নুড়ি পাথর ছড়ানো রাস্তা। আমি হেঁটে হেঁটে ল্যাবরেটরির সামনে দাঁড়ালাম। কোথায় দরজা হতে পারে সেটা নিয়ে চিন্তা করছিলাম ঠিক তখন হঠাৎ ঘরঘর শব্দ করে চতুষ্কোণ একটা দরজা খুলে গেল, মনে হচ্ছে আমার জন্য কেউ একজন সেখানে অপেক্ষা করে আছে। আমি একটা নিশ্বাস ফেলে ভিতরে পা দিলাম, নিজের অজান্তেই বুকের ভিতরে হঠাৎ আতঙ্কের একটা শিহরন বয়ে গেল।

দরজার পাশে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, মানুষটিকে দেখে আমি চমকে উঠলাম, তার চারটি হাত। দুই হাতে সে শক্ত করে একটি বীভৎস অস্ত্র ধরে আছে, অন্য দুই হাতে আমাকে জাপটে ধরে আমি কিছু বোঝার আগেই আমার দুই হাতে একটা হাতকড়া লাগিয়ে দিল।

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মানুষটির দিকে তাকালাম, সে খসখসে গলায় বলল, "নিরাপত্তার খাতিরে তোমার হাতে হাতকড়া লাগাচ্ছি, তার বেশি কিছু নয়।"

আমি মানুষটির দিকে তাকিয়ে রইলাম, একজন মানুষের চারটি হাত দেখে নিজের অজান্তেই সারা শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে। কিন্তু যে জিনিসটি আমাকে বিস্মিত করল তার সাথে এই মানুষটির বিচিত্র দেহ-গঠনের কোনো সম্পর্ক নেই। আমার মুখে এবং হাতের মাংসপেশিতে ভয়াবহ বিস্ফোরক লাগানো রয়েছে, ইচ্ছে করলেই আমি কঠোর নিরাপত্তাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে এখানে ভয়ঙ্কর আঘাত হানতে পারি। প্রজেক্ট অতিমানবীর ল্যাবরেটরির এই প্রহরী সেই কথা জানে না। প্রতিরক্ষা দপ্তর এই তথ্যটি জানার পরেও এদেরকে সে বিষয়ে সতর্ক করে দেয় নি, ইচ্ছে করেই দেয় নি—যার অর্থ এই ভয়ঙ্কর প্রজেক্টের জন্য প্রতিরক্ষা দপ্তরের কারো মনে এতটুকু সহানুভূতি নেই। কেন নেই?

চার হাতের মানুষটি আমাকে ধাক্কা দিয়ে সামনে নিতে নিতে বলল, "তোমার জন্য মহামান্য গ্রুটাস অপেক্ষা করছেন।"

"গ্রুটাস?"

"হ্যাঁ, আমাদের এই ল্যাবরেটরির মহাপরিচালক।"

আমি কোনো কথা না বলে হেঁটে যেতে যেতে কিছু বিচিত্র জিনিস দেখতে পেলাম। ঘরের মেঝেতে একটি হাত গড়াগড়ি খাচ্ছে, দেখে মনে হয় কেউ বুঝি কারো একটা হাত কেটে ফেলে রেখেছে; একটু ভালো করে দেখলেই বোঝা যায় সেটি সত্যি নয়—হাতের অন্যপাশে একটা ছোট কয়েক আঙুল লম্বা বিচিত্র অপুষ্ট দেহাবশেষ ঝুলছে। দেখে আমার শরীর ঘিনঘিন করে উঠল। আমি একাধিক মানুষ দেখতে পেলাম যাদের মুখের জায়গায় একটি বীভৎস গর্ত। চোখের জায়গায় কান বের হয়ে এসেছে সেরকম কিছু বিচিত্র মানুষকেও ইতস্তত ঘোরাঘুরি করতে দেখলাম। যে জিনিসটি দেখে আমি অমানুষিক আতঙ্কে প্রায় ছুটে যেতে চাইলাম সেটি মাথাহীন কিছু দেহ, যেগুলো অত্যন্ত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে চেয়ারে বসে পা নাড়ছে।

আমি একাধিক করিডোর ধরে হেঁটে, অনেক ধরনের বিচিত্র মানুষকে পাশ কাটিয়ে একটি বড় হলঘরের মতো জায়গায় হাজির হলাম। চার হাতের মানুষটি আমাকে মৃদু ধাক্কা দিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকিয়ে দিল।

বিশাল হলঘরের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় একজন মানুষ ঝুলছে, মানুষটি স্বাভাবিক নয়, নিচের ঠোঁটটি একটু বেরিয়ে এসেছে। মানুষটির মুখের চামড়া কুঞ্চিত, চোখে অসুস্থ হলুদ

রং। মানুষটির মুণ্ডিত মাথা দেহের তুলনায় অস্বাভাবিক বড়, তার ভিতরে কিছু-একটা নড়ছে, সেটা কী বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে না। মানুষটার বিশাল মাথার ভিতর থেকে নানা ধরনের টিউব বের হয়ে গেছে, তাদের ভিতর দিয়ে নানা রঙের তরল প্রবাহিত হচ্ছে। একাধিক টিউব নমনীয় ধাতবের, সম্ভবত বৈদ্যুতিক সঙ্কেত আদান-প্রদানের জন্য। পিছনের দেয়ালে জটিল কিছু যন্ত্রপাতি, আমি বিজ্ঞানী নই বলে সেগুলো কী ধরনের যন্ত্র বুঝতে পারলাম না। মানুষটি কীভাবে শূন্যে ভেসে আছে দেখে বোঝা যাচ্ছে না, সম্ভবত সূক্ষ্ম কোনো তার দিয়ে ছাদ থেকে ঝোলানো রয়েছে।

বীভৎস এই মানুষটি আমাকে দেখে হঠাৎ সর্‌সর্‌ করে নিচে নেমে আমার দিকে এগিয়ে এল, যে সূক্ষ্ম ধাতব ফাইবারগুলো তাকে উপর থেকে ঝুলিয়ে রেখেছে আমি এবারে সেগুলো স্পষ্ট দেখতে পেলাম। মানুষটি আমার কাছাকাছি এসে দাঁড়াতেই তার দেহ থেকে একটা দুর্গন্ধ ভেসে এল, পচা মাংসের মতো এক ধরনের উৎকট দুর্গন্ধ। সাধারণ মানুষের মস্তিষ্ক থেকে তার মস্তিষ্ক অনেক বড়, সেখানে যান্ত্রিক কিছুও রয়েছে। নানা ধরনের টিউব দিয়ে সেই যন্ত্রগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে। এই অসম্ভব কুদর্শন কদাকার মানুষটির গলা থেকে আমি এক ধরনের উৎকট কণ্ঠস্বরের জন্য অপেক্ষা করছিলাম, কিন্তু এই মানুষটির কণ্ঠস্বর অপূর্ব। সে গমগমে গলায় বলল, "আমার নাম গ্রুটাস। তুমি আমার সাথে দেখা করতে চেয়েছ?"

আমি মাথা নাড়লাম, 'হ্যাঁ।'

গ্রুটাস নামের মানুষটি হা হা করে হেসে আবার সর্‌সর্‌ করে উপরে ডানদিকে সরে গেল, সেখান থেকেই বলল, "আশা করছি কারণটি জরুরি। আমি সাধারণত কারো সাথে দেখা করি না।"

"আমার মনে হয়েছিল কারণটা জরুরি।" আমি একটা নিশ্বাস নিয়ে বললাম, "কিন্তু তোমার ল্যাবরেটরিতে হেঁটে আসতে আসতে আমি যা যা দেখেছি এখন আর নিশ্চিত নই।"

গ্রুটাস সর্‌সর্‌ করে নিচে নেমে আসতে আসতে বলল, "তুমি কেন এ কথা বলছ?"

"তোমার এখানে মানুষকে নিয়ে গবেষণা হয়। যারা মানুষের দেহ-মনকে যেভাবে খুশি বিকৃত করতে পারে তাদেরকে আমি বুঝতে পারি না।"

মানুষটি সর্‌সর্‌ করে উপরে উঠে যেতে যেতে বলল, "মানুষ কথাটির একটা সুনির্দিষ্ট অর্থ আছে।"

"সেটি কী?"

"তাদের ৪৬টি ক্রোমোজমের দুই লক্ষাধিক জিনকে সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে দেওয়া আছে। সেই জিনকে পরিবর্তন করা হলে তারা আর মানুষ থাকে না। তাদেরকে নিয়ে গবেষণা করা যায়। পৃথিবীর আইন আমাকে সেই অধিকার দিয়েছে।"

"আমি আসতে আসতে যাদের দেখেছি তারা মানুষ নয়?"

"প্রচলিত সংজ্ঞায় মানুষ নয়। তাদের অত্যন্ত সীমিত আয়ু দিয়ে কৃত্রিমভাবে দ্রুত বড় করা হয়েছে। মানুষের শরীরের একেক জায়গার কোষ একেকভাবে বিকশিত হয় কারণ তার জন্য নির্ধারিত জিন যেভাবে নিজেকে প্রকাশ করে, অন্যগুলো সুপ্ত থাকে। আমরা ইচ্ছেমতো তাদের বিকশিত করতে পারি, সুপ্ত রেখে দিতে পারি, প্রয়োজন থেকে বেশি জুড়ে দিতে পারি। যেখানে চোখ থাকার কথা সেখানে কান তৈরি হয়, একটা হাতের জায়গায় দুটি হাত বের হয়ে আসে। এই গবেষণার প্রয়োজন আছে। মানুষকে রক্ষা করার জন্য এইসব অসম্পূর্ণ প্রাণী তৈরি করার প্রয়োজন আছে।"

"এই ল্যাবরেটরিতে সবাই অসম্পূর্ণ প্রাণী?"

"হ্যাঁ। সবাই অসম্পূর্ণ প্রাণী। আমি একমাত্র মানুষ।"

আমি মানুষ নামের এই বিচিত্র প্রাণীটির দিকে এক ধরনের আতঙ্ক নিয়ে তাকিয়ে রইলাম। সে সর্‌সর্‌ করে আবার সরে গিয়ে বলল, "তুমি কেন এসেছ? কী চাও?"

"এটি প্রজেক্ট অতিমানবী ল্যাবরেটরি। তোমাদের তৈরি অতিমানবী বিষয়ে আমি একটি তথ্য নিয়ে এসেছি।"

গ্রুটাস সর্‌সর্‌ করে আমার এত কাছে সরে এল যে তার শরীরের দুর্গন্ধ আমার জন্য সহ্য করা কঠিন হয়ে উঠল। সে তার হলুদ চোখে আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "কী তথ্য?"

"তারা তোমার এই ল্যাবরেটরি থেকে পালিয়ে গেছে।"

"আমি জানি।"

"ইচ্ছে করলে তারা তাদের ক্লোন দিয়ে সারা পৃথিবী ছেয়ে ফেলতে পারে, পৃথিবীর মানুষ এই ক্লোনদের দিয়ে অপসারিত হতে পারে।"

গ্রুটাসের মুখ শক্ত হয়ে আসে, সে ক্রুদ্ধ গলায় বলে, "প্রতিরক্ষা দপ্তর তাদেরকে একজন একজন করে হত্যা করার দায়িত্ব নিয়েছে।"

"একজন অতিমানবীকে হত্যা করা এত সহজ নয় গ্রুটাস। আমি জানি তারা সেই দায়িত্ব পালন করতে পারছে না।"

"তুমি কেমন করে জান?"

"কারণ আমি সেই হত্যাকারীদের এক জন। আমি তাদের হত্যা করতে পারি নি।"

গ্রুটাস সর্‌সর্‌ করে ছিটকে আমার কাছ থেকে সরে গেল, একবার উপরে উঠে গেল, নিচে নেমে এল, তারপর ঘরের মাঝামাঝি স্থির হয়ে বলল, "কেন তুমি হত্যা করতে পার নি?"

"তাদেরকে হত্যা করার প্রয়োজন নেই বলে।"

"কেন প্রয়োজন নেই?"

"কারণ তারা স্বেচ্ছায় এখানে ফিরে আসবে।"

গ্রুটাস সর্‌সর্‌ করে নিচে নেমে এল। শক্ত মুখে জিজ্ঞেস করল, "কেন ফিরে আসবে?"

"কারণ তাদের সম্পর্কে যেটা ভাবো সেটা সত্যি নয়—তারা ভয়ঙ্কর নৃশংস প্রাণী নয়—তারা প্রকৃত অর্থে একজন মানুষ। শুধু একটি ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিলেই তারা ফিরে আসবে।"

"কোন ব্যাপারে?"

"তারা অতিমানবী হতে চায় না। সাধারণ মানুষ হতে চায়। তাদেরকে সাধারণ মানুষে পাল্টে দিতে হবে।"

গ্রুটাস কোনো কথা না বলে আমার দিকে হলুদ চোখে তাকিয়ে রইল। আমি বললাম, "জিনের যে পরিবর্তনটুকুর কারণে তারা অতিমানবী রয়েছে, ধরে নাও সেটি একটি ত্রুটি। সেই ত্রুটিটুকু সারিয়ে দাও। সেই কত শত বছর আগে রিকম্বিনেন্ট ডি. এন. এ. টেকনিক দিয়ে ত্রুটিপূর্ণ জিনকে ভালো জিন দিয়ে সারিয়ে দেওয়া হত। তোমরা এখন সেটা নিশ্চয়ই অত্যন্ত নিখুঁতভাবে করতে পার।"

গ্রুটাস মাথা নাড়ল, "পারি।"

AMARBOI.COM

"তা হলে তাদেরকে সারিয়ে দাও, অতিমানবিকতাকে একটি জিনেটিক ত্রুটি হিসেবে ধরে নিয়ে তাদের চিকিৎসা করে সারিয়ে তোল। তাদের সাধারণ মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকতে দাও।"

গ্রুটাস কোনো কথা বলল না, আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বলল, "যদি না দিই?"

"তুমি দেবে। কারণ তোমার কোনো উপায় নেই। তোমার ল্যাবরেটরিতে তৈরি একজন অতিমানবীর সাথে আমার পরিচয় হয়েছে। আমি তার দেহকোষ নিয়ে সারা পৃথিবীর অসংখ্য গোপন জায়গায় সঞ্চিত রেখেছি। অতিমানবীদের সাধারণ মানুষে পাল্টে না দেওয়া পর্যন্ত আমি সেই দেহকোষ ফিরিয়ে দেব না।"

উৎকট দুর্গন্ধ ছড়িয়ে গ্রুটাস আমার কাছে ছুটে এল, "তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ?"

"হ্যাঁ।" আমি হাতকড়া দিয়ে লাগানো আমার দুই হাত উপরে তুলে বললাম, "তুমিও আমাকে ভয় দেখাচ্ছ—এই দেখ আমাকে হাতকড়া পরিয়েছ।"

গ্রুটাস কোনো কথা না বলে আমার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আমি শান্ত গলায় বললাম, "তুমি কি আমার প্রস্তাবে রাজি?"

গ্রুটাস সর্‌সর্‌ করে পিছনে সরে গিয়ে বলল, "কিন্তু আমি কীভাবে নিশ্চিত হব যে তুমি অতিমানবীদের কোনো দেহকোষ লুকিয়ে রাখবে না?"

"আমাকে তোমার বিশ্বাস করতে হবে।" আমি একমুহূর্ত থেমে শান্ত গলায় বললাম, "মানুষকে মানুষের বিশ্বাস করতে হয়।"

গ্রুটাস তীব্র স্বরে বলল, "আমি মানুষ, তাই আমি মানুষকে বিশ্বাস করি না।"

আমি হাসার ভঙ্গি করে বললাম, "সেটি তোমার সমস্যা। তুমি যদি চাও আমার মস্তিষ্ক স্ক্যান করেও দেখতে পার।"

"তাই দেখব।"

"বেশ। এখন তুমি কি অনুমতি দেবে? আমি কি অতিমানবীদের নিয়ে আসব?"

গ্রুটাস আবার একটি বড় নিশ্বাস ফেলে বলল, "যাও। নিয়ে এসো।"

"তোমাকে ধন্যবাদ গ্রুটাস।" আমি চলে যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে বললাম, "গ্রুটাস!"

"বল।"

"তোমাকে ব্যক্তিগত কিছু প্রশ্ন করতে পারি?"

"কী প্রশ্ন?"

"তুমি নিজেকে মানুষ বলে দাবি কর, কিন্তু বেঁচে আছ যন্ত্রের মতো। তোমার মস্তিষ্ক থেকে টিউব বের হয়ে আসছে, আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার মস্তিষ্কের ভিতরে কোনো একটা যন্ত্র নড়ছে, টিউবে করে তরল যাচ্ছে, সূক্ষ্ম ধাতব ফাইবার দিয়ে তুমি শূন্য থেকে ঝুলে আছ, কারণটা কী?"

"আমি মানুষের সীমাবদ্ধতার কথা জানি। তাই চেষ্টা করছি যন্ত্রের কাছাকাছি যেতে। মানুষের জিন নিয়ে আমি কাজ করি, গুরুত্বপূর্ণ জিনের বেস পেয়ারের তালিকা আমাকে জানতে হয়, তাই বিশাল তথ্যকেন্দ্রের সাথে আমার মস্তিষ্ককে জুড়ে দিয়েছি। আমি সরাসরি তথ্য নিতে পারি। মস্তিষ্ককে জীবাণুমুক্ত রাখার জন্য আমার মস্তিষ্কে জীবাণু-নিরোধক তরল পাঠাতে হয়, মস্তিষ্ককে সতেজ রাখার জন্য উত্তেজক ওষুধ পাঠাতে হয় সে জন্য খুলির ভিতরে ক্রায়োজেনিক পাম্প বসিয়েছি।"

আমার সারা শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে, গ্রুটাসের বীভৎস মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি ইচ্ছে করে এই জীবনপদ্ধতি বেছে নিয়েছ?"

গ্রুটাস হঠাৎ ছটফট করে সর্‌সর্ করে ছিটকে গিয়ে চিৎকার করে বলল, "তুমি সীমানা অতিক্রম করছ নির্বোধ মানুষ। আমি ইচ্ছে করে এই জীবনপদ্ধতি বেছে নিয়েছি নাকি বাধ্য হয়ে নিয়েছি তাতে তোমার কিছুই আসে-যায় না।"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "ঠিকই বলেছ। আমার কিছুই আসে-যায় না।"

৬

পরিত্যক্ত খনিটিতে আমি যে পলিলন কর্ডটি ঝুলিয়ে রেখেছিলাম সেটি এখনো ঝুলছে। আমি সেটা ধরে নিচে নামতে থাকি, আগেরবার যখন এই কর্ড বেয়ে নেমে এসেছিলাম তখন নানা ধরনের উত্তেজক বায়োকেমিক্যাল দিয়ে আমাকে একটি হিংস্র শ্বাপদের মতো সজাগ করে রাখা হয়েছিল। এবারে আমার মাঝে কোনো উত্তেজনা নেই। খনির নিচে আমি একা নেমে এসেছি সত্যি কিন্তু উপরে আমার জন্য প্রতিরক্ষা দপ্তরের বিশাল বাহিনী একাধিক ভাসমান যান নিয়ে অপেক্ষা করছে।

খনির নিচে অন্ধকার সুড়ঙ্গের বাতি জ্বালিয়ে আমি নির্দিষ্ট পথে যেতে থাকি, বড় বড় দুটি গুহার মতো অংশ পার হয়ে একটি সরু সুড়ঙ্গের পরেই আমি ক্ষীণ আলোকরশ্মি দেখতে পেলাম। ফাঁকা জায়গাটাতে পৌঁছে আমি ডাকলাম, "লাইনা, তুমি কোথায়?"

আমার কথার কেউ উত্তর দিল না। হঠাৎ আমার বুকের ভিতর একটা আশঙ্কা উঁকি দিয়ে গেল, ভয় পাওয়া গলায় আবার ডাকলাম, "লাইনা, তুমি কোথায়?"

ঠিক তখন আমি লাইনাকে দেখতে পেলাম, শক্ত পাথরের মেঝেতে নিশ্চল হয়ে শুয়ে আছে। আমি ছুটে গিয়ে তার উপর ঝুঁকে পড়লাম, আবার ডাকলাম, "লাইনা।"

লাইনা খুব ধীরে ধীরে চোখ খুলে তাকাল, তার দৃষ্টি দেখে আমি হঠাৎ শিউরে উঠলাম, কী ভয়ঙ্কর শূন্যতা সেখানে। আমি কাঁপা গলায় বললাম, "কী হয়েছে তোমার?"

লাইনা ফিসফিস করে কিছু একটা বলার চেষ্টা করল আমি ঠিক শুনতে পেলাম না। আমি তার হাত ধরে তার আরো কাছে ঝুঁকে পড়লাম, হাতটি বরফের মতো শীতল। লাইনা ফিসফিস করে বলল, "বিদায়।"

আমি প্রায় আর্তনাদ করে কাতর গলায় বললাম, "কী হয়েছে তোমার লাইনা?"

লাইনা দুর্বলভাবে হাসার চেষ্টা করে চোখ বন্ধ করল। আমি হঠাৎ করে বুঝতে পারলাম সে আত্মহত্যা করতে শুরু করেছে। আমাকে বলেছিল যখন সে আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নেবে তার দেহ নিজে থেকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে—স্বেচ্ছামৃত্যু! সত্যিই কি সেটা হতে চলেছে?

আমি পাগলের মতো লাইনাকে জাপটে ধরে ঝাঁকুনি দিতে থাকি, চিৎকার করে ডাকতে থাকি, "লাইনা—লাইনা, তুমি যেও না, যেও না।"

লাইনা অনেক কষ্টে চোখ খুলে তাকিয়ে শোনা যায় না এ রকম স্বরে বলল, "আমি ভেবেছিলাম তুমি আর আসবে না।"

"এই তো এসেছি। তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।"

"দেরি হয়ে গেছে কিরি।" লাইনা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "বিদায়।"

"না।" আমি চিৎকার করে বললাম, "তুমি এটা করতে পার না। তুমি যেতে পারবে না।"

লাইনার নিশ্বাস আর হৃৎস্পন্দন আরো বিলম্বিত হতে থাকে। শরীর শীতল হয়ে আসছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠতে শুরু করেছে। আমি লাইনাকে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে চিৎকার করে বললাম, "তুমি যেতে পারবে না লাইনা। যেতে পারবে না। আমি তোমার জন্য প্রতিরক্ষা দপ্তরে গিয়েছি, গ্রুটাসের মুখোমুখি হয়েছি, আমি নিজের জীবন পণ করেছি শুধু তোমার জন্য। শুধু তোমার জন্য। তুমি এভাবে যেতে পারবে না। পারবে না।"

লাইনার শরীর আরো নির্জীব হয়ে ওঠে। তার অনিন্দ্যসুন্দর মুখাবয়বে কেমন জানি এক ধরনের শীতলতার ছাপ এসে পড়েছে। মাথায় এলোমেলো ঘন কালো চুলের মাঝে নিখুঁত মুখাবয়ব ফুটে রয়েছে। ভরাট টুকটুকে লাল দুটি ঠোঁট অল্প ফাঁক করে রেখেছে, মুক্তার মতো ঝকঝকে দাঁত দেখা যাচ্ছে সেই ফাঁক দিয়ে। বড় বড় বিস্ময়কর চোখ দুটি বুজে আছে। আমার মনে হতে থাকে এই চোখ দুটি খুলে আমার দিকে আরো একবার না তাকালে আমি আর বেঁচে থাকতে পারব না। এক সম্পূর্ণ অপরিচিত অনুভূতি আমার বুককে গুঁড়িয়ে দিতে থাকে। আমার সমস্ত হৃদয় এক ভয়াবহ শূন্যতায় ঢেকে যেতে থাকে। আমি নিজেকে সংবরণ করতে পারলাম না। লাইনাকে টেনে তুলে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে হঠাৎ ছেলেমানুষের মতো হু হু করে কেঁদে উঠলাম। তার মাথায় হাত বুলিয়ে ভাঙা গলায় বললাম, "না লাইনা না, তুমি এটা করতে পারবে না। আমাকে ছেড়ে তুমি যেতে পারবে না। পারবে না। আমি তা হলে কাকে নিয়ে থাকব?"

AMARBOI.COM

আমি কতক্ষণ এভাবে লাইনাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বসে ছিলাম জানি না। তার মাথায় মুখ ঘষে আমি অপ্রকৃতিস্থের মতো কাঁদছি ঠিক তখন আমার মস্তিষ্কে একজন ডাকল, "কিরি।"

আমি চমকে উঠলাম, কে কথা বলছে? এটা কি আমার ট্রাকিওশান ইশি?

"না, কিরি। আমি লাইনা।"

লাইনা! আমি চমকে উঠলাম, কেমন করে সে আমার মস্তিষ্কে কথা বলছে?

"আমি পারি কিরি। আমি অতিমানবী। আমি চলে যেতে যেতে ফিরে এসেছি কিরি। আমি তোমার জন্য ফিরে এসেছি। আমি বড় দুঃখী। আমি বড় একাকী, বড় নিঃসঙ্গ। আমি বড় ভালবাসার কাঙাল। বল, তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে না। বল। কথা দাও।"

আমি লাইনার শীতল দেহকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে, তার চুলে মুখ ডুবিয়ে কাতর গলায় বললাম, "কথা দিচ্ছি লাইনা। কথা দিচ্ছি। আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যাব না। কখনো যাব না। তুমি ফিরে এস আমার কাছে।"

আমি হঠাৎ অনুভব করতে পারি লাইনার দেহে আবার উষ্ণতা ফিরে আসছে। জীবনের উষ্ণতা। প্রাণের উষ্ণতা। আমার সমস্ত দেহ-মন এক বিচিত্র অনুভূতিতে অভিভূত হয়ে ওঠে, একেই কি ভালবাসা বলে?

ভাসমান যানে লাইনাকে নিয়ে পাশের শহরে সবচেয়ে দরিদ্র অঞ্চলের একটি পরিত্যক্ত এ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিঙের সামনে দাঁড়ালাম। বিল্ডিঙের দু শ এগার তলার বিধ্বস্ত একটি ঘরের সামনে দাঁড়াতেই দরজা খুলে একটি মেয়ে বের হয়ে এল। মনে হল মেয়েটি আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিল। মেয়েটি দেখতে হুবহু লাইনার মতো, আমি মানসিকভাবে প্রস্তুত না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকলে নিশ্চিতভাবে ধরে নিতাম ঘরের ভিতর থেকে লাইনাই বের হয়ে এসেছে। মেয়েটি এসে লাইনার সামনে দাঁড়াল, একজন আরেকজনকে আঁকড়ে ধরে চোখে চোখে তাকিয়ে রইল, তাদের মুখে অনুভূতির কোনো চিহ্ন ফুটে উঠল না, শুধু মনে হল অসম্ভব একাগ্রতায় কিছু একটা বুঝে নিতে চেষ্টা করছে। মানুষের চোখ আসলে মস্তিষ্কের একটা অংশ, চোখে চোখে তাকিয়ে আমরা তাই অনেক কিছু বুঝে ফেলতে পারি। লাইনা এবং তার এই সত্তাটি অতিমানবী, তারা নিশ্চয়ই চোখে চোখে তাকিয়ে তাদের এই দীর্ঘ সময়ের সব না–বলা কথা বলে নিচ্ছে, অবরুদ্ধ আবেগের বিনিময় করছে। কিছুক্ষণ একে অপরের দিকে তাকিয়ে তারা একজন আরেকজনকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে এবং আমি প্রথমবার বুঝতে পারি লাইনা ঠিকই বলেছে আলাদাভাবে তাদের কোনো অস্তিত্ব নেই, সবাইকে নিয়েই তাদের পরিপূর্ণ জীবন।

লাইনার দ্বিতীয় সত্তাকে সাথে নিয়ে আমরা শহরের বাইরের একটি নির্জন পাহাড় থেকে তৃতীয় সত্তাকে তুলে নিলাম। আমরা যখন তাকে তুলতে গিয়েছি সে তখন প্রস্তুত হয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। এবারেও ঠিক আগের মতো একজন আরেকজনকে ধরে একাগ্র দৃষ্টিতে চোখের দিকে তাকিয়ে একে অপরকে বুঝে নিতে শুরু করল।

এভাবে এক জন এক জন করে নয় জনকে ভাসমান যানে তুলে নিলাম। তারা সবাই একই ধরনের ক্লোন, তাদের চেহারা হুবহু একই রকম, শুধু তাই নয়, তারা সবাই একই পোশাক পরে আছে। তারা দীর্ঘসময় আলাদা হয়ে ছিল, দেখা হবার পর নিজেরা নিজেদের সাথে কথাবার্তা বলবে বলে আমার যে ধারণা ছিল সেটি ভুল প্রমাণিত হয়েছে, কারণ আমি জানতাম না লাইনারা নিজেদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য কথা বলতে হয় না, বিচিত্র একটি উপায়ে তারা মস্তিষ্কের ভিতরে কথা বলতে থাকে। লাইনাকে তার মৃত্যুর সীমানা থেকে টেনে আনার সময় সে আমার সাথে একবার কথা বলেছিল। ব্যাপারটি কীভাবে করে কে জানে, সুযোগ পেলে একবার জিজ্ঞেস করতে হবে। আমি ভাসমান যানে বসে দেখতে পাচ্ছি নয় জন লাইনা পাশাপাশি বসে আছে, কেউ কারো দিকে তাকিয়ে নেই কিন্তু তাদের মুখভঙ্গি একই রকম, সবারই একসাথে হাসিমুখ হয়ে আবার একই সাথে গাঢ় বিষাদে ঢেকে যাচ্ছে, সবাই একই সাথে একই জিনিস ভাবছে—তারা আলাদা মানুষ হয়েও তাদের মস্তিষ্ক একটি। না জানি এই মস্তিষ্কের মাঝে কী ভয়ানক ক্ষমতা লুকিয়ে আছে।

ভাসমান যানটি আমাদেরকে প্রজেক্ট অতিমানবীর ল্যাবরেটরির ভিতরে নামিয়ে দিয়ে উড়ে চলে গেল। ভাসমান যানটির লাল বাতিটি পুরোপুরি অদৃশ্য না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমি সেদিকে তাকিয়ে রইলাম। আমরা এখন এই দেয়ালে ঘেরা ল্যাবরেটরিতে পুরোপুরি প্রতিরক্ষাহীন। বলা যেতে পারে পুরোপুরি গ্রুটাসের অনুকম্পার ওপরে নির্ভর করে আছি। আমি বুকের ভিতর এক ধরনের অশুভ আতঙ্ক অনুভব করতে থাকি, বাইরে সেটা প্রকাশ না করে আমি নিচু গলায় বললাম, "চল ভিতরে যাওয়া যাক।"

আমার মস্তিষ্কের মাঝে কেউ একজন মৃদু স্বরে বলল, "তুমি ভয় পেয়ো না কিরি। ভয়ের কিছু নেই।"

আমি চমকে উঠে নয় জন লাইনার দিকে তাকালাম, তাদের মাঝে কে কথাটি বলেছে বুঝতে পারলাম না। আমার মনেই ছিল না এই নয় জন অতিমানবী, আমার মস্তিষ্কের মাঝে নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়াতে পারে।

ল্যাবরেটরির দরজার কাছে পৌছানো মাত্রই আবার চতুষ্কোণ দরজাটি খুলে গেল। প্রথমে আমি এবং আমার পিছু পিছু বাকি নয় জন ভিতরে এসে ঢুকল। আজকে দরজার

পাশে চার হাতের সেই মানুষটি দাঁড়িয়ে নেই, যে দাঁড়িয়ে আছে সে আপাতদৃষ্টিতে স্বাভাবিক এবং নিরস্ত্র। মানুষটি উঁচু গলায় বলল, "তোমাদের জন্য মহামান্য গ্রুটাস অপেক্ষা করছেন।"

আমরা কেউ কোনো কথা বললাম না। মানুষটি হাঁটতে শুরু করল এবং আমরা দশ জন তার পিছু পিছু যেতে শুরু করলাম। আমি হাঁটতে হাঁটতে ঘুরে একবার নয় জন অতিমানবীর মুখের দিকে তাকালাম, তাদের চেহারায় আতঙ্ক বা অস্থিরতার কোনো চিহ্ন নেই, বরং এক বিস্ময়কর প্রশান্তি। এদের মাঝে কোনজন লাইনা কে জানে, কিংবা কে জানে এই প্রশ্নটিই কি এখন করা সম্ভব?

"হ্যাঁ সম্ভব।" আমার মাথার মাঝে লাইনা বলল, "শুধু আমাকে একটি নাম দিয়েছ তুমি, এখানে আর কারো নাম নেই।"

আমি আবার ঘুরে তাকালাম এবং লাইনা এবারে হাত তুলে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। সে নিজে থেকে পরিচয় না দিলে এই নয় জনের ভিতর কোনজন লাইনা আমার পক্ষে বোঝা সেটি একেবারেই অসম্ভব। আমি লাইনার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমরা কীভাবে এটি কর? ব্যাপারটি প্রায় ভৌতিক।"

লাইনা এবারে শব্দ করে হেসে বলল, "মানুষ যেটা বুঝতে পারে না সেটাকেই বলে ভৌতিক। এটি অত্যন্ত সহজ একটি ব্যাপার। দুটি মস্তিষ্কের স্টেট পুরোপুরি এক হলে তার স্বাভাবিক কম্পন এক হয়ে যায় তখন খুব সহজে সুষম উপস্থাপন করা যায়। আমরা নিজেরা সেটা করি অনায়াসে, তোমারটাতে একটু অসুবিধে হয়।"

"কিন্তু যেহেতু এটা তথ্যের এক ধরনের আদান-প্রদান, এর বিনিময় হয় কিসে?"

"সবই বিদ্যুৎ চৌম্বকীয়। মানুষের শরীরের নার্ভাস সিস্টেমের সমস্ত তথ্যের আদান-প্রদান হয় ইলেকট্রো কেমিক্যাল সিগনাল দিয়ে।"

ব্যাপারটি বোঝার জন্য আমি আরো একটা প্রশ্ন করতে চাইছিলাম কিন্তু তার আগেই যে মানুষটি পথ দেখিয়ে আনছে সে একটা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "এখানে মহামান্য গ্রুটাস তোমাদের সাথে দেখা করবেন।"

আমি একটু অবাক হয়ে ঘরটিতে প্রবেশ করলাম। আমার পিছু পিছু লাইনারা নয় জন এবং সবার শেষে মানুষটি নিজেও ভিতরে ঢুকে গেল। ঘরটি ছোট এবং সেখানে গ্রুটাস নেই, আমি যেভাবে গ্রুটাসকে দেখেছি সে এখানে কীভাবে আসবে বুঝতে পারলাম না। আমি ব্যাপারটি বোঝার চেষ্টা করছিলাম ঠিক তখন ঘরঘর শব্দ করে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। হঠাৎ ঘরের ভিতরে একটা অত্যন্ত বিচিত্র ব্যাপার ঘটতে শুরু করল। কোনো একটা জিনিস ফেটে যাবার মতো শব্দ করে আমাদের সাথে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটি বাতাস বের হয়ে যাওয়া বেলুনের মতো শব্দ করে চুপসে যেতে শুরু করল। আমি অবাক হয়ে মানুষটার দিকে তাকিয়ে রইলাম এবং হঠাৎ করে বুঝতে পারলাম এটি সত্যিকার মানুষ নয়। আমার সামনে মানুষটি দুমড়েমুচড়ে ভেঙেচুরে যেতে শুরু করল এবং হঠাৎ করে আমার নাকে তীব্র একটি ঝাঁজালো গন্ধ এসে লাগল। গন্ধটি অপরিচিত, এটি বিষাক্ত কোনো গ্যাস, মানুষের মতো দেখতে এই যন্ত্রটির ভিতরে করে পাঠানো হয়েছে। আমার চেতনা হঠাৎ করে লুপ্ত হয়ে যেতে শুরু করে, জ্ঞান হারানোর আগে আমি ঘুরে তাকালাম—অতিমানবীরাও বুক চেপে ধরে দেয়াল আঁকড়ে ধরে কোনোভাবে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করছে। এটি শুধু মানুষের জন্য বিষাক্ত নয়, অতিমানবীদের জন্যও বিষাক্ত। আমরা একটা ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রে পা দিয়েছি।

জ্ঞান হারানোর আগের মুহূর্তে শুনতে পেলাম আমার মস্তিষ্কে কেউ একজন বলল, "ভার্ন গ্যাস!"

জ্ঞান ফিরে পাবার পর চোখ খুলে দেখলাম আমার মুখের উপরে একটি যন্ত্র ঝুঁকে আছে। আমাকে জেগে উঠতে দেখে যন্ত্রটি সরে দাঁড়াল—এটি একটি প্রাচীন রোবট। আমি উঠে বসার চেষ্টা করতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম সেটি সম্ভব নয়, আমাকে ধবধবে সাদা একটা বিছানায় শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে। আমি রোবটটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আমি কোথায়?"

রোবটটি এগিয়ে এসে বলল, "তুমি প্রজেক্ট অতিমানবীর ল্যাবরেটরির রেট্রো ভাইরাস অংশে।"

"এখানে কেন?"

"এই ল্যাবরেটরি যেসব রেট্রো ভাইরাস তৈরি করেছে সেগুলো পরীক্ষা করার উপযোগী মানুষের খুব অভাব। তোমাকে পাওয়ায় কিছু পরীক্ষা করা যাবে।"

আমি বৃথাই আবার ওঠার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়ে বললাম, "আমার ওপরে পরীক্ষা চালানো হবে?"

"হ্যাঁ।"

"কিসের পরীক্ষা!"

"সেটা তুমি সম্ভবত বুঝবে না। মহামান্য গ্রুটাস বলে থাকেন মানুষমাত্রই নির্বোধ।"

"তুমি বলে দেখ। হয়তো বুঝতে পারব।"

"তুমি নিশ্চয়ই জান রেট্রো ভাইরাস তার ডি. এন. এ. মানুষের ক্রোমোজমে পাকাপাকিভাবে ঢুকিয়ে দেয়।"

আমি জানতাম না কিন্তু সেটা প্রকাশ করলাম না। রোবটটি তার একঘেয়ে গলায় বলল, "মহামান্য গ্রুটাস কিছু চমৎকার রেট্রো ভাইরাস তৈরি করেছেন, তাদের ডি. এন. এ. তে কিছু মজার জিনিস ঢোকানো আছে।"

"সেই মজার জিনিসগুলো কী?"

"একটি মানুষের নিউরনের সংখ্যা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়।"

"কীভাবে?"

"মস্তিষ্কের আয়তন বাড়িয়ে দিয়ে।"

আমি পুরো পদ্ধতিটি ভালো করে বুঝতে পারলাম না, রোবটটি ব্যাখ্যা করারও চেষ্টা করল না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "মানুষের নিউরনের সংখ্যা বেড়ে গেলে মানুষেরা কি বেশি বুদ্ধিমান হয়ে যায়?"

"সেটি এখনো প্রমাণিত হয় নি। কারণ খুলির আকার বাড়ানো হয় নি বলে মস্তিষ্কের চাপে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণায় শেষ মানুষটির মৃত্যু হয়েছে।"

আমি শিউরে উঠে রোবটটির দিকে তাকালাম, রোবটটি যান্ত্রিক গলায় বলল, "নতুন রেট্রো ভাইরাসে খুলিটাকেও বড় করার ব্যবস্থা হয়েছে। এখনো পরীক্ষা করে দেখা হয় নি।"

"তার অর্থ আমাকে দিয়ে যে পরীক্ষা হবে সেটি সফল হলে আমার মস্তিষ্ক অনেক বড় হবে, সফল না হলে আমি মারা যাব?"

"যদি দেখা যায় তুমি মারা যাচ্ছ তা হলে তোমার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটেকুটে নেওয়া হবে। তোমার কিছু ক্লোন তৈরি হবে। ক্লোন তৈরি হতে সময় নেয় সেটাই হচ্ছে সমস্যা।"

AMARBOI.COM

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "আমি রাজি নই।"

"কিসের রাজি নও?"

"আমাকে নিয়ে পরীক্ষা করায়। আমি কোনো রেট্রো ভাইরাসে আক্রান্ত হব না।"

রোবটটি এক পা এগিয়ে বলল, "তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না। এখানে তোমার ইচ্ছের কোনো মূল্য নেই। মহামান্য গ্রুটাস যেভাবে চান সেভাবেই হবে।"

"কোথাও কিছু গোলমাল হয়েছে।" আমি বললাম, "আমাকে তোমরা এভাবে হত্যা করতে পারবে না। আমি সারা পৃথিবীতে অতিমানবীর টিস্যু ছড়িয়ে রেখেছি। আমাকে—"

"মিথ্যাবাদী!" রোবটটি শান্ত গলায় বলল, "তোমার মাথায় একটা ট্রাকিওশান লাগানো ছিল, আমরা জানতাম না। তুমি যখন অচেতন ছিলে আমরা সেটা বের করে এনেছি।"

"বের করে এনেছ? তার মানে আমার মাথায় এখন ট্রাকিওশান নেই?"

"না। আমরা সেই ট্রাকিওশানটিকে বিশ্লেষণ করেছি। সেটি সব কথা স্বীকার করেছে। সে বলেছে তুমি সারা পৃথিবীতে অতিমানবীদের টিস্যু ছড়িয়ে দাও নি। তুমি অতিমানবীদের জীবকোষ বাঁচিয়ে রাখ নি। তুমি প্রতিরক্ষা দপ্তরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছ, নানা কেন্দ্রে জীবকোষ সংরক্ষণের ভান করেছ।"

আমি হতচকিত হয়ে রোবটটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। প্রতিরক্ষা দপ্তরের বিরুদ্ধে আমার এবং অতিমানবীদের নিরাপত্তার পুরো ব্যাপারটি নির্ভর করেছিল এই ছলনাটির ওপর। সেটি ধরা পড়ে গেলে আমাদের রক্ষা করবে কে?

রোবটটি একটু এগিয়ে এসে বলল, "তুমি মিথ্যাবাদী। আমরা মিথ্যাবাদীদের কঠোর শাস্তি দিই। মহামান্য গ্রুটাস তোমাকে কঠোর শাস্তি দেবেন। শাস্তি দেওয়ার আগে তোমার ওপর এই পরীক্ষাটি করতে চান। আমরা আশা করছি এই পরীক্ষায় তোমার যেন মৃত্যু না হয়।"

"না।" আমি অক্ষম আক্রোশে চিৎকার করে বললাম, "না! তোমরা সেটা করতে পার না।"

"মহামান্য গ্রুটাস ঠিকই বলেছেন। মানুষমাত্রই নির্বোধ।"

আমি চিৎকার করে বললাম, "আমাকে ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও।"

"তুমি বুঝতে পারছ না। এই পরীক্ষাগারে সত্যিকার মানুষ খুব দুষ্প্রাপ্য জিনিস। তোমাকে কিছুতেই ছাড়া যাবে না। রিগা কম্পিউটারের সাথে ষড়যন্ত্র না করেই তোমাকে ব্যবহার করা যাবে। তুমি একই সাথে বড় অপরাধী।"

আমি ছটফট করে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে করতে বললাম, "ছেড়ে দাও আমাকে, ছাড়।"

রোবটটি আরেকটু এগিয়ে এসে বলল, "তুমি মিছেমিছি ছটফট করছ। আমি তোমার দেহে প্রবেশ করানোর জন্য রেট্রো ভাইরাসটি নিয়ে এসেছি। তুমি স্থির হয়ে শুয়ে থাকলে আমি ভাইরাসটি তোমার রক্তে মিশিয়ে দেব।"

"সরে যাও।" আমি চিৎকার করে বললাম, "সরে যাও।"

"নির্বোধ মানুষ—"

"আর এক পা এগিয়ে এলে আমি তোমাকে শেষ করে দেব। ধ্বংস করে দেব।"

"তুমি শুধু মিথ্যাবাদী নও। তুমি বাকসর্বস্ব একজন নিষ্ফল মানুষ। তুমি নির্বোধ এবং দুর্বল। মানুষ জাতির বড় দুর্ভাগ্য যে গ্রুটাসের মতো মানুষের সংখ্যা এত কম।"

AMARBOI.COM

রোবটটি আরেকটু এগিয়ে আসতেই আমি তার হাতে লাল রঙের সিরিঞ্জটি দেখতে পেলাম। আমি চিৎকার করে বললাম, "আর আমার কাছে আসবে না। ধ্বংস করে দেব।"

রোবটটি আমার কথা না শুনে আরেকটু এগিয়ে আসতেই আমি মুখের ভিতরে রাখা বিস্ফোরকটি ছুড়ে দিলাম। মুখ থেকে প্রচণ্ড বেগে ছোট ক্ষেপণাস্ত্রটি বেরিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আমি একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি অনুভব করলাম। ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে সমস্ত ঘর কেঁপে উঠল, অন্ধকার হয়ে এল চারদিক, ধোঁয়া সরে যেতেই দেখতে পেলাম ঘরের দেয়ালে কয়েক মিটার ব্যাসের একটি ফুটো। রোবটটিকে কোথাও দেখতে পেলাম না। সম্ভবত প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ভস্মীভূত হয়ে গেছে, শুধু তার একজোড়া পা অনিয়ন্ত্রিতভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বিস্ফোরণের কারণেই কি না জানি না আমি নিজেও ঘরের একমাথায় ছিটকে সরে এসেছি, শরীরের বাঁধনও খুলে গেছে হঠাৎ। আমি শরীরের ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। চারদিকে প্রচণ্ড হইচই হচ্ছে, লোকজন-রোবট ছোটাছুটি করছে। আমার দিকে চার হাতের কয়েকজন মানুষ ছুটে এল। আমি হাত তুলে ডাকলাম একজনকে, বললাম, "আমাকে গ্রুটাসের কাছে নিয়ে যাও। যদি না নাও তা হলে তোমাদের ল্যাবরেটরির বাকি যেটুকু আছে সেটুকুও আমি উড়িয়ে দেব।"

কেন উড়িয়ে দেব, কীভাবে উড়িয়ে দেব মানুষটি সেই যুক্তিতর্কে না গিয়ে মাথা নুইয়ে আমাকে অভিবাদন করে বলল, "চলুন, এই পথে।"

আমি মানুষটির পিছু পিছু হেঁটে যেতে থাকি। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে সমস্ত ল্যাবরেটরি তছনছ হয়ে গেছে, স্থানে স্থানে ভাঙা দেয়াল আসবাবপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। বিচিত্র ধরনের নানারকম আধা-মানুষ আধা-প্রাণী ভয় পেয়ে ছোটাছুটি করছে, আবার ধ্বংসস্তূপের মাঝে পুরোপুরি নির্লিপ্ত হয়ে কেউ কেউ বসে আছে। বড় একটা করিডোর ঘুরে আমি গ্রুটাসের হলঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। চার হাতের মানুষটি দরজা খুলে আমাকে ভিতরে ঢুকতে দিল।

AMARBOI.COM

আমি ভিতরে ঢুকতেই গ্রুটাস সর্‌সর্‌ করে ঘরের মাঝামাঝি সরে গিয়ে বলল, "তুমি কী চাও আমার কাছে?"

"তুমি আমাকে কথা দিয়েছিলে যে অতিমানবীদের সাধারণ মানুষে পাল্টে দেবে। আমি জানতে এসেছি তার কত দূর।"

গ্রুটাস কোনো কথা না বলে আমার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আমি দাঁতে দাঁত ঘষে বললাম, "আমি তোমার একটি রোবটের সাথে রেট্রো ভাইরাস ল্যাবরেটরির বড় অংশ ধ্বংস করে এসেছি। আমার শরীরের ভিতরে এখনো যে পরিমাণ বিস্ফোরক রয়েছে সেটা দিয়ে তোমার এই পুরো হলঘর উড়িয়ে দিতে পারি।"

"আমি জানি।"

"তা হলে আমার কথার উত্তর দাও। তুমি কি তোমার কথা রাখবে? নাকি আমি তোমার ঐ বিদঘুটে মাথাসহ পুরো ঘরটি উড়িয়ে দেব?"

গ্রুটাস খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আমি দুঃখিত কিরি। তুমি একটু দেরি করে ফেলেছ।"

"কী হয়েছে?" আমি ভয় পাওয়া গলায় বললাম, "আমি কিসের জন্য দেরি করে ফেলেছি?"

"নয় জন অতিমানবীকে আমি একটা বিশেষ পরীক্ষায় ব্যবহার করতে চেয়েছিলাম। তারা রাজি হয় নি। তারা স্বেচ্ছামৃত্যুকে বেছে নিয়েছে।"

"স্বেচ্ছামৃত্যু?"

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ। আমি তাদেরকে স্বেচ্ছামৃত্যু বেছে নিতে দিতে পারি না। আমি তাই আমার টেকনিশিয়ানদের নির্দেশ দিয়েছি তাদের শরীরকে বিকল করে দিতে। ক্রায়োজেনিক তাপমাত্রায় নিয়ে সমস্ত শারীরিক কাজকর্ম বন্ধ করে দেওয়া হবে।"

"কেন? কেন তুমি তাদের কষ্ট দিচ্ছ?"

"আমি, আমি—"

"তুমি কী?"

"আমি তাদের মস্তিষ্ককে বাঁচিয়ে রাখতে চাই। তাদের ভিতরে বিচিত্র সব অনুভূতি খেলা করে, সেগুলোকে লিপিবদ্ধ করার আগে তাদেরকে কিছুতেই স্বেচ্ছামৃত্যু গ্রহণ করতে দেওয়া হবে না।"

আমি ঘুরে পিছনে তাকালাম। চার হাতের মানুষটি তখনো দাঁড়িয়ে ছিল, আমি তার একটি হাত ধরে ঘুরিয়ে চাপ দিতেই সে ভয়ংকর যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। আমি দাঁত দাঁত ঘষে বললাম, "আমি ইচ্ছে করলে তোমার হাত মুচড়ে খুলে আনতে পারব—সেটা করতে চাই না। এক্ষুনি আমাকে অতিমানবীদের কাছে নিয়ে চল। এক্ষুনি।"

"নিচ্ছি।" মানুষটি কাতর গলায় বলল, "এক্ষুনি নিচ্ছি।"

আমি মানুষটিকে ঠেলে ঘর থেকে বের করার আগে ঘুরে গ্রুটাসের দিকে তাকিয়ে বললাম, "গ্রুটাস তুমি শুনে রাখ। আমাকে কথা দিয়ে সেই কথা না রাখার জন্য আমি তোমাকে কখনো ক্ষমা করব না। কখনো না।"

আমি চার হাতের মানুষটির হাত মুচড়ে পিছন দিকে ধরে রেখে তার পিছু পিছু ছুটে যেতে থাকি, আমার মনে হতে থাকে আমি পৌঁছানোর আগেই ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে যাবে এবং আমার সাথে আর কখনো লাইনার দেখা হবে না।

চার হাতের মানুষটি আমাকে একটা ঘরের সামনে দাঁড় করিয়ে বলল, "এখানে আছে সবাই।"

আমি মানুষটিকে ছেড়ে দিয়ে লাথি মেরে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে গেলাম। ঘরের ভিতর সারি সারি কালো ক্যাপসুল সাজানো, উপরে ক্রায়োজেনিক পাম্প মৃদু গুঞ্জন করছে। ক্যাপসুলগুলোর পাশে কিছু রোবট, কিছু সাদা পোশাক পরা রোবটের মতো মানুষ। দরজা খোলার শব্দ শুনে সবাই ঘুরে তাকাল। আমি দুই পা ছড়িয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, "যে যেখানে আছ সেখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাক।"

কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা একটি রোবট একটু এগিয়ে এসে যান্ত্রিক গলায় বলল, "এই ঘরে মানুষের প্রবেশাধিকার নেই। তুমি প্রবেশ করে প্রতিরক্ষা দপ্তরের বড় একটি নিয়ম ভঙ্গ করেছ। তোমাকে—"

আমি রোবটটিকে কথা শেষ করতে না দিয়ে চিৎকার করে বললাম, "আমার হাতের মাঝে যে পরিমাণ বিস্ফোরক রয়েছে সেটা ব্যবহার করে আমি ইচ্ছা করলে এ রকম দুই-চারটে ল্যাবরেটরি উড়িয়ে দিতে পারি। একটু আগে আমি রেট্রো ভাইরাস ল্যাবরেটরিটা উড়িয়ে দিয়ে এসেছি, তোমরা হয়তো সেটা এখানে বসে টের পেয়ে থাকবে।"

রোবটটি যান্ত্রিক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল, "পেয়েছি।"

"আমার কথা না শুনলে আমি এই মুহূর্তে তোমাদের ধ্বংস করে দেব।"

রোবটের মতো দেখতে একজন মানুষ এগিয়ে এসে শুষ্ক গলায় বলল, "তুমি কী চাও?"

"এই ক্রায়োজেনিক পাম্প বন্ধ করে অতিমানবীদের দেহ উষ্ণ করে তোল। আমি তাদের সাথে কথা বলতে চাই।"

"সেটি সম্ভব নয়।"

"সেটি সম্ভব করতে হবে।"

রোবটের মতো দেখতে মানুষটি মাথা নেড়ে বলল, "সেটি কিছুতেই সম্ভব নয়।"

আমি আমার হাতটি ক্রায়োজেনিক পাম্পের দিকে লক্ষ্য করে মাংসপেশি ব্যবহার করে একটি ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটালাম। হাতের যে অংশটি দিয়ে ক্ষুদ্র কিন্তু শক্তিশালী বিস্ফোরকটি বের হয়ে এসেছে সেখান থেকে চুইয়ে রক্ত পড়ছিল, আমি সাবধানে সেটা চেপে ধরে রেখে উপরের দিকে তাকালাম, একটু আগে যেখানে একটি বিশাল ক্রায়োজেনিক পাম্প ছিল এখন সেখানে একটি বিশাল গর্ত। সারা ঘরে বিস্ফোরণের ধ্বংসস্তূপ ছড়িয়ে পড়ছে। আমি রোবটের মতো মানুষটির দিকে তাকিয়ে বললাম, "এখন কি সম্ভব হয়েছে?"

মানুষটি তার উপর থেকে ধুলোবালি ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, "হ্যাঁ। সম্ভব হয়েছে। অতিমানবীদের তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করবে এক্ষুনি।"

"আমি তাদের সাথে কথা বলতে চাই।"

"তারা স্বেচ্ছামৃত্যু বেছে নিয়েছে। তোমার কথা শুনবে না।"

"আমি তবু কথা বলতে চাই।"

"সেটি সম্ভব নয়।"

আমি আমার হাত উদ্যত করে বললাম, "আমার হাতে এখনো আরো একটি বিস্ফোরক রয়েছে—"

মানুষটি হঠাৎ দ্রুত কাছাকাছি একটা ক্যাপসুলের পাশে রাখা একটি মাইক্রোফোন আমার হাতে তুলে দিল। বলল, "তুমিই চেষ্টা কর।"

আমি মাইক্রোফোনটি হাতে নিয়ে ডাকলাম, "লাইনা, তুমি কোনজন?"

সারি সারি রাখা নয়টি ক্যাপসুলে নয়টি অতিমানবীর শীতল দেহ, তার মাঝে কোনোটি সাড়া দিল না। আমি আবার বললাম, "আমি জানি তুমি আমার কথা শুনছ। তুমি সাড়া দাও লাইনা।"

কেউ সাড়া দিল না। আমি কাতর গলায় বললাম, "লাইনা, আমি ক্রায়োজেনিক পাম্পটি ধ্বংস করে দিয়েছি। আমি জানি তোমাদের দেহ ধীরে ধীরে উষ্ণ হয়ে উঠছে। তোমাদের জেগে উঠতে হবে লাইনা। তোমাদের বেঁচে উঠতে হবে। তোমাদের ওপর যে ভয়ঙ্কর অবিচার করা হয়েছে তার প্রতিকার না করে তোমরা চলে যেতে পারবে না। কিছুতেই চলে যেতে পারবে না।"

নয়টি ক্যাপসুলে নয় জন অতিমানবী নিথর হয়ে শুয়ে রইল। আমি একটি একটি করে সব কয়টি ক্যাপসুলের সামনে দাঁড়ালাম, কোনোটির মাঝে এতটুকু প্রাণের চিহ্ন নেই। মাইক্রোফোন হাতে আমি চিৎকার করে উঠলাম, "লাইনা, সোনা আমার। জেগে ওঠ। দোহাই তোমার—জেগে ওঠ।"

কেউ জেগে উঠল না। আমি ভাঙা গলায় বললাম, "তোমরা নয় জন অতিমানবী, তোমাদের মস্তিষ্ক হুবহু এক পর্যায়ে, তোমাদের প্রত্যেকের প্রতিটি নিউরন একরকম, তার মাঝে তথ্য একরকম। প্রতিটি সিনাপ্স একইভাবে জুড়ে আছে—সারা পৃথিবীতে এর থেকে বড় সুষম উপস্থাপন কি আর কোথাও আছে? নেই! একটিও নেই! তোমরা ইচ্ছে করলে অসাধ্য সাধন করতে পার। নয় জন একসাথে যদি তোমাদের মস্তিষ্কের স্বাভাবিক তরঙ্গকে উজ্জীবিত কর, কী ভয়ঙ্কর রেজোনেন্স হবে তোমরা জান? একটিবার চেষ্টা করে দেখ—মাত্র একটিবার! ইচ্ছে করলে তোমরা সারা পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ করতে পার। তা হলে কেন এত বড় একটা অবিচার সহ্য করে স্বেচ্ছামৃত্যু বেছে নিয়েছ? কেন?"

আমি ক্যাপসুলগুলোর মাঝে খ্যাপার মতো ঘুরে বেড়ালাম। তাদের ঢাকনা টেনে খোলার চেষ্টা করলাম। ক্যাপসুলগুলো ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে নাড়ানোর চেষ্টা করলাম, মুখ লাগিয়ে চিৎকার করে কথা বলার চেষ্টা করলাম, কোনো লাভ হল না। আমি বুকের ভিতরে এক ভয়াবহ শূন্যতা অনুভব করতে থাকি, ইচ্ছে হতে থাকে ক্যাপসুলে মাথা কুটে আকুল হয়ে কাঁদি, কিন্তু আমি তার কিছুই করলাম না। ঘরে অসংখ্য রোবট এবং রোবটের মতো মানুষ আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, তাদের সামনে ব্যথাটুকু প্রকাশ করতে আমার সংকোচ হল।

আমি একসময় চোখ মুছে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। এই ভয়ঙ্কর অবিচারের প্রতিশোধ আমার একাই নিতে হবে। আমার হাতে এখনো দ্বিতীয় বিস্ফোরকটি রয়ে গেছে, সেটি দিয়েই আমি গ্রুটাসকে হত্যা করব। তার চোখের দিকে তাকিয়ে আমি চিৎকার করে বলব, তুমি একজন দানব। পৃথিবীর বাতাসে নিশ্বাস নিয়ে তাকে তুমি কলুষিত করতে পারবে না। তারপর প্রচণ্ড বিস্ফোরণে আমি তাকে ছিন্নভিন্ন করে দেব। তার কুৎসিত দেহ, বীভৎস মস্তিষ্ক আমি চূর্ণ করে দেব।

আমি শেষবার একবার কালো স্টেনলেস স্টিলের ক্যাপসুলে হাত বুলিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। ল্যাবরেটরিতে এখনো আধা-মানুষ আধা-যন্ত্র বিচিত্র প্রাণীরা ইতস্তত ঘোরাঘুরি করছে, আমাকে দেখে সেগুলো ভয়ে ছিটকে সরে গেল। আমি পাথরের মতো মুখ করে সোজা হেঁটে গেলাম গ্রুটাসের সাথে শেষ বোঝাপড়া করতে।

AMARBOI.COM

গ্রুটাসকে দেখে মনে হল সে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। ঘরের মাঝামাঝি সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখেও সে একটি কথাও বলল না। আমি কঠোর গলায় বললাম, "গ্রুটাস।"

"বল।"

"তুমি কি নিজেকে মানুষ বলে দাবি কর?"

"দুর্ভাগ্যক্রমে করি। আমার ক্রমোজম ৪৬টি।"

"মানুষের একটি সংজ্ঞা আছে গ্রুটাস। সেটি হচ্ছে—পরস্পর পরস্পরের জন্য ভালবাসা। তোমার মাঝে তার এতটুকুও নেই।"

"অপ্রয়োজনীয় অনুভূতি কোনো কাজে আসে না।"

"তুমি মানুষ নও গ্রুটাস। তুমি পশুও নও। তুমি একটি তুচ্ছ কলকজা। তুচ্ছ যুক্তিতর্ক। তুচ্ছ নিয়মকানুন। এই পৃথিবীতে তোমার কোনো প্রয়োজন নেই।"

"সেটি ব্যক্তিগত বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ব্যাপার।"

"তোমার এই তুচ্ছ জীবনকে আমি শেষ করে দেব গ্রুটাস। আমি তোমাকে হত্যা করতে এসেছি।"

"আমারও তাই ধারণা।" গ্রুটাস ভেসে ভেসে খানিকটা এগিয়ে এসে বলল, "তুমি চেষ্টা করে দেখতে পার।"

আমি আমার হাতটি উদ্যত করতে গিয়ে থেমে গেলাম, গ্রুটাস হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠল। এই প্রথম আমি এ প্রাণীটিকে হাসতে দেখলাম। গ্রুটাস হাসতে হাসতে বলল, "তুমি প্রথমবার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছ, আমরা সেটা থামাতে পারি নি। দ্বিতীয়বারও পারি নি—তার অর্থ এই নয় যে, আমি তোমাকে তৃতীয়বার এখানে বিস্ফোরণ ঘটাতে দেব।"

গ্রুটাস হঠাৎ সর্‌সর্‌ করে আমার একেবারে কাছে এসে হাজির হল, আমি তার হলুদ চোখ, চোখের ফুলে ওঠা রক্তনালী পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পেলাম। সে ষড়যন্ত্রীদের মতো নিচু গলায় বলল, "এই মুহূর্তে ঘরের চারপাশে চারটি প্রতিরক্ষা ডিভাইস তোমার হাতের মাঝে লুকানো বিস্ফোরকটিকে লক ইন করে আছে। তোমার হাত যদি এক সেন্টিমিটার উপরে ওঠাও চারটি এক শ মেগাওয়াটের আই. আর. লেজার তোমাকে ভস্মীভূত করে দেবে।"

গ্রুটাস ভেসে ভেসে আমার আরো কাছে চলে এল, আমি তার কুঞ্চিত চামড়া, চুলহীন বীভৎস মাথা, মাথার ভিতরে নড়তে থাকা যন্ত্রাংশ স্পষ্ট দেখতে পেলাম, কটু গন্ধে হঠাৎ আমার সারা শরীর গুলিয়ে এল। গ্রুটাস প্রায় ফিসফিস করে বলল, "আমার কথা বিশ্বাস না করলে তুমি চেষ্টা করে দেখতে পার। আমি তোমার খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছি কিরি। আমি শুনেছি তুমি নাকি চিতাবাঘের চাইতেও ক্ষিপ্র।"

আমি এতটুকু না নড়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। বিকৃত দেহের এই মানুষটার প্রতি একটা অচিন্তনীয় ঘৃণা আমার ভিতরে পাক খেতে থাকে, ভয়ঙ্কর বিজাতীয় একটা ক্রোধ এবং আক্রোশ আমার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে থাকে। ইচ্ছে করতে থাকে সত্যি সত্যি আমি চিতাবাঘের মতো এই কুৎসিত প্রাণীটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। টুঁটি চেপে ধরে তার বীভৎস মস্তিষ্ক মেঝেতে ঠুকে ঠুকে ভিতর থেকে থলথলে ঘিলুটাকে বের করে আনি।

"কিরি তুমি শান্ত হও।" আমি চমকে উঠলাম, কে আমার মস্তিষ্কের মাঝে কথা বলছে?

"তুমি নিজেকে সংবরণ কর কিরি।"

কে কথা বলছে? আমার মাথা থেকে তো ট্রাকিওশান সরিয়ে নিয়েছে। এখন তো আর কিছুই সরাসরি আমার মস্তিষ্কে কথা বলতে পারবে না। কে কথা বলছে? তা হলে কি অতিমানবীরা নিজেদের মুক্ত করে চলে এসেছে?

দরজায় একটা মৃদু শব্দ হল এবং আমি মাথা ঘুরে তাকালাম, দেখতে পেলাম ধীর পদক্ষেপে এক জন এক জন করে নয় জন অতিমানবী ঘরে এসে ঢুকছে। তাদের মুখমণ্ডল শান্ত, সেখানে এক ধরনের স্নিগ্ধ কোমলতা।

"কিরি, নিজেকে শান্ত কর।" আমি আবার শুনতে পেলাম কেউ একজন বলল, "আমি লাইনা।"

"লাইনা!" আমি আনন্দে চিৎকার করতে গিয়ে থেমে গেলাম, এই ঘরে চারটি এক শ মেগাওয়াট আই. আর. লেজার আমার দিকে তাক করা আছে, ইচ্ছে করলেই আমাদের ভস্মীভূত করে দেবে।

নয় জন অতিমানবী খুব শান্ত ভঙ্গিতে হেঁটে হেঁটে আমার দুপাশে এসে দাঁড়াল। আমি কাঁপা গলায় বললাম, "খুব সাবধান। চারটি আই. আর. লেজার—"

"কোনো ভয় নেই।" ঠিক আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অতিমানবীটি বলল, "গ্রুটাসের মস্তিষ্ক এখন আমাদের নিয়ন্ত্রণে। তুমি সত্যি কথাই বলেছিলে কিরি। আমরা নয় জন যখন আমাদের মস্তিষ্কের সুষম উপস্থাপন করি ভয়ঙ্কর রেজোনেন্স হয় তখন—যা ইচ্ছে করতে পারি আমরা।"

"তোমরা সত্যিই গ্রুটাসকে নিয়ন্ত্রণ করছ? সত্যি?"

"হ্যাঁ। শুধু গ্রুটাস নয়, এই ল্যাবরেটরির সকল জীবিত প্রাণীকে নিয়ন্ত্রণ করছি। ইচ্ছে করলে তোমাকেও করতে পারি, কিন্তু তার তো কোনো প্রয়োজন নেই।"

AMARBOI.COM

আমি হেসে বললাম, "না, আমি যেটুকু জানি তাতে মনে হয় প্রয়োজন নেই।"

"তোমার ধারণা সত্যি কিরি। আমরা সবাই মিলে একটা অস্তিত্ব সেটি আমরা জানতাম কিন্তু আমাদের সবার মস্তিষ্ক যে একসাথে সুষম উপস্থাপন করতে পারে আমরা সেটা জানতাম না। এখন আমরা সেটা করছি। আমাদের এখন কী ভয়ঙ্কর শক্তি তুমি চিন্তাও করতে পারবে না।"

"আমি জানি। আমি অনুভব করতে পারছি।"

"আমরা ইচ্ছে করলে পৃথিবীর যে কোনো জীবিত প্রাণীর মস্তিষ্কে প্রবেশ করে সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। সেটাকে পরিবর্তন করতে পারি। মস্তিষ্কের নিউরন থেকে তথ্য মুছে দিতে পারি, সিনাপ্সের জোড় খুলে দিতে পারি। ইচ্ছে করলে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থামিয়ে দিতে পারি, ফুসফুসকে নিথর করে দিতে পারি। আমরা যদি চাই এই মুহূর্তে গ্রুটাসকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারি।"

"আমি জানি।"

"আমরা অতিমানবী। কিন্তু এই পৃথিবী, পৃথিবীর সভ্যতা অতিমানবীর জন্য তৈরি হয় নি। আমরা এখানে অনাহূত। মা-বাবার ভালবাসায় আমরা জন্ম নিই নি, মা-বাবার ভালবাসায় বড় হই নি। কিন্তু মা-বাবার ভালবাসায় সিক্ত হওয়া সেই জিন আমাদের মাঝে রয়ে গেছে। আমরা ভালবাসার জন্য, স্নেহের জন্য কাঙাল—একটি কোমল কথার জন্য তৃষ্ণার্ত, কিন্তু সমস্ত পৃথিবীতে আমরা বড় নিঃসঙ্গ। আমাদেরকে এতটুকু স্নেহ দেবার জন্য কেউ নেই।"

"আছে। নিশ্চয়ই আছে।" আমি ব্যাকুল হয়ে বললাম, "আমি আছি।"

"আমরা জানি তুমি আছ। তোমার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ কিরি। অতিমানবীদের ভয়ঙ্কর নিঃসঙ্গ জগতে তুমি আমাদের একমাত্র বন্ধু।"

যে মেয়েটি কথা বলছিল সে একটা নিশ্বাস নিয়ে বলল, "মানুষের শরীরের সীমাবদ্ধতা আমাদের নেই। আমাদের দেহে অচিন্তনীয় শক্তি, পরিচিত রোগ-শোক আমাদের স্পর্শ করতে পারে না, অল্প একটু খাবারে আমরা দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে পারি, একটু অক্সিজেনেই আমাদের চলে যায়। পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন থেকে বেঁচে থাকতে পারি, আমরা চিতাবাঘের চাইতেও ক্ষিপ্র, মত্ত হাতি থেকেও শক্তিশালী। তুমি একটু আগে আমাদের নতুন শক্তির সন্ধান দিয়েছ, মস্তিষ্কের সুষম উপস্থাপন করে এখন আমরা অন্যের মনকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। এই পৃথিবীতে আমাদের বাধা দেবার কেউ নেই। আমরা ইচ্ছে করলে পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। মানবজাতিকে নিশ্চিহ্ন করে অতিমানব জাতি সৃষ্টি করতে পারি।"

আমি হতবাক হয়ে নয় জন অতিমানবীর দিকে তাকিয়ে রইলাম। মেয়েটি আবার বলল, "পৃথিবীতে মানবজাতির জন্য এর চেয়ে বড় আশঙ্কার ব্যাপার কিছু ঘটে নি।"

"কিন্তু—"

"হ্যাঁ। কিন্তু আমাদের প্রকৃত জিন মানুষ থেকে এসেছে। মানুষের জন্য আমাদের প্রকৃত ভালবাসা। মানুষকে রক্ষাও করব আমরা।"

"কী করবে তুমি? তোমরা?"

"আমরা নিজেদের ধ্বংস করে ফেলব। শুধু নিজেদের নয়, এই ল্যাবরেটরিকে, এর প্রতিটি তথ্যকে।"

"না।" আমি চিৎকার করে বললাম, "না লাইনা।"

"আমাদের কোনো উপায় নেই কিরি।"

"তা হলে তোমরা কেন জেগে উঠে এসেছ?"

"তোমার জন্য। গ্রুটাসের নৃশংস থাবা থেকে তোমাকে উদ্ধার করে নিরাপদে এখান থেকে সরিয়ে দেবার জন্য। প্রতিরক্ষা দপ্তর যেন আর কখনো তোমাকে স্পর্শ না করতে পারে সেটি নিশ্চিত করার জন্য।"

"না।" আমি কাতর গলায় বললাম, "আমি যাব না। লাইনাকে না নিয়ে আমি যাব না।"

নয় জন অতিমানবী কোমল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, আমি জানি না এর মাঝে কোনজন লাইনা। কিংবা কে জানে যখন নয় জন অবিকল ক্লোন তাদের মস্তিষ্কে অবিকল একই তথ্য নিয়ে থাকে তখন এই প্রশ্নটির আদৌ কোনো অর্থ আছে কি না। আমি তাদের মুখের দিকে তাকালাম, একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম, "তোমরা ইচ্ছে করলে আমার মস্তিষ্কের প্রতিটি নিউরন খুলে দেখতে পার। দেখ, তোমরা দেখ। আমার নিজের চেয়ে তোমরা বেশি জান আমি লাইনাকে ছাড়া থাকতে পারব না।"

নয় জন অতিমানবী থেকে এক জন হঠাৎ আমার দিকে এগিয়ে এল, হাত বাড়িয়ে দিল আমার দিকে, কোমল গলায় বলল, "কিরি। আমি লাইনা।"

"লাইনা!" আমি তাকে জাপটে ধরে বুকের মাঝে টেনে নিলাম। তার রেশমের মতো চুলে মুখ গুঁজে বললাম, "লাইনা, সোনা আমার।"

আমি আরো অনেক কথা বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু আর কিছুই বলতে পারলাম না, হঠাৎ এক ভয়াবহ শূন্যতায় আমার হৃদয়–মন হাহাকার করে ওঠে।

লাইনা মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল। তার চোখে চিকচিক করছে পানি। দুই হাতে আমার মাথাকে ধরে নিজের মুখের কাছে টেনে এনে ফিসফিস করে বলল, "কিরি, এই নয় জন অতিমানবীর মাঝে থেকেও আমি আলাদা। আমি একজন অতিমানবী যে তোমার আসল ভালবাসাটুকু পেয়েছি। সেই ভালবাসা আমি অন্যদের মাঝে সঞ্চারিত করেছি। আমাদের এই ভয়ঙ্কর নিঃসঙ্গ জীবনে তোমার ভালবাসাটুকু একমাত্র সুখের স্মৃতি।"

AMARBOI.COM

আমি লাইনার অনিন্দ্যসুন্দর মুখমণ্ডলে হাত দিয়ে স্পর্শ করে কাতর গলায় বললাম, "লাইনা, তুমি যেও না। তুমি আমার সাথে চল।"

"না কিরি।" লাইনা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, "তুমি আমাকে এ কথা বোলো না, আমার শেষ সময়টুকু তুমি আরো কঠিন করে দিও না।"

আমি ভাঙা গলায় বললাম, "লাইনা, সোনা আমার! তুমি চল আমার সাথে। দূর নির্জন এক দ্বীপে শুধু তুমি আর আমি থাকব। পৃথিবীর মানুষ জানবে না। শুধু তুমি আর আমি। তুমি আর আমি।"

লাইনা হাত দিয়ে চোখ মুছে বলল, "আমাকে এভাবে বোলো না। এভাবে লোভ দেখিও না কিরি। আমাকে স্বার্থপরের মতো শুধু নিজেকে নিয়ে স্বপ্ন দেখিও না।"

"তা হলে আমি কী নিয়ে থাকব?"

লাইনা আমাকে গভীর ভালবাসায় আলিঙ্গন করে বলল, "আমার চোখের দিকে তাকাও কিরি।"

আমি লাইনার চোখের দিকে তাকালাম। লাইনা ফিসফিস করে বলল, "তোমার সব দুঃখ আমি ভুলিয়ে দেব কিরি। আমাকে নিয়ে তোমার সব স্মৃতি আমি মুছে দেব।"

"না। আমি ভুলতে চাই না।" আমি চিৎকার করে বললাম, "আমি ভুলতে চাই না।"

"তোমাকে ভুলতে হবে কিরি। আমি একজন অতিমানবী—অতিমানবীর স্মৃতি তুমি নিজের মাঝে রেখো না।"

"না। লাইনা। না—"

"আমার চোখের দিকে তাকাও কিরি।"

আমি লাইনার চোখের দিকে তাকালাম। কী অপূর্ব আয়ত কালো দুটি চোখ—সেই চোখে চিকচিক করছে পানি। চোখের মাঝে কী বিস্ময়কর গভীরতা! আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেই চোখের দিকে তাকিয়ে থাকি, তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটি গভীর বেদনায় আমার বুক দুমড়ে-মুচড়ে যেতে থাকে। সেই অপূর্ব কালো গভীর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ আমার মনে হতে থাকে আমি বুঝি সেই চোখের গভীরে প্রবেশ করে যাচ্ছি। মনে হতে থাকে সেই গভীরে এক বিশাল শূন্যতা। মনে হয় আদি নেই, অন্ত নেই এক বিশাল বেলাভূমিতে আমি দাঁড়িয়ে আছি, সমুদ্রের কল-কল্লোল ভেসে আসছে দূর থেকে। নীল মহাসমুদ্রের ঢেউ ভেসে এসে একের পর এক আছড়ে পড়ছে বেলাভূমিতে, সিক্ত হয়ে যাচ্ছে আমার পা। আমি মাথা তুলে তাকালাম, আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে লাইনা, বাতাসে উড়ছে তার দেহের অর্ধস্বচ্ছ কাপড়। আমি নরম বালুতে পা ফেলে এগিয়ে গেলাম লাইনার দিকে, লাইনা তখন সরে গেল আরো দূরে। আমি আবার এগিয়ে গেলাম—লাইনা তখন আরো দূরে সরে গেল। আমি আবার এগিয়ে গেলাম, লাইনা তখন আরো দূরে সরে গেল। আমি তাকিয়ে রইলাম, দেখতে পেলাম লাইনা চলে যাচ্ছে দূরে.....বহুদূরে, আমি তাকে ধরতে পারছি না। দূরদিগন্তে সে মিশে যাচ্ছে মিলিয়ে যাচ্ছে চিরদিনের জন্য। বালুবেলায় আমি হাঁটু ভেঙে পড়ে যাচ্ছি। সমুদ্রের পানি এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে আমাকে। ঢেউয়ের পর ঢেউ আসছে। এক গভীর শূন্যতায় আমি হারিয়ে যাচ্ছি, এক ভয়াবহ নিঃসঙ্গতায় আমি ডুবে যাচ্ছি। হারিয়ে যাচ্ছি এক অন্ধকারে—এক নির্জনতায়—এক নিসঙ্গতায়...

AMARBOI.COM

শেষ কথা

উত্তরাঞ্চলের পাহাড়ের পাদদেশে গভীর অরণ্যে প্রতিরক্ষা দপ্তরের একটি গোপন ল্যাবরেটরি ভয়ঙ্কর একটি অগ্নিকাণ্ডে পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। ল্যাবরেটরির কাছাকাছি অরণ্যে একজন অপ্রকৃতিস্থ স্মৃতিশক্তিহীন যুবককে পাওয়া যায়, তার হাতে একটি অস্ত্রোপচারের চিহ্ন। যুবকটির নাম কিরি, সে কেন এখানে এসেছে জানে না। কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটি অনুসন্ধান করে দেখছে।

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

মেতসিস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১

বিজ্ঞান একাডেমির সভাপতি ক্লাউস ট্রিটন সন্ধেবেলা আকাশের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ করে হতচকিত হয়ে গেলেন। সূর্য ডুবে গিয়ে পুরো পশ্চিমাকাশে একটি বিচিত্র রং ছড়িয়ে পড়েছে। প্রকৃতি যেন নির্লজ্জের মতো তার সমস্ত সৌন্দর্য নিয়ে পৃথিবীর সামনে উপস্থিত হয়েছে। দক্ষিণাঞ্চলের একটি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উপরের স্তরে কিছু সূক্ষ্ম ধূলিকণা এসে পড়ার কথা। সন্ধেবেলায় অস্তগামী সূর্যের আলো সেই ধূলিকণায় বিচ্ছুরিত হয়ে আগামী কয়েকদিনের সূর্যাস্ত অত্যন্ত চমকপ্রদ হবে বলে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল। ক্লাউস ট্রিটন সেটি জানতেন কিন্তু সেই সৌন্দর্য যে এত অতিপ্রাকৃতিক হতে পারে, এত অস্বাভাবিক হতে পারে তিনি সেটা কখনো কল্পনা করেন নি। ক্লাউস ট্রিটন মন্ত্রমুগ্ধের মতো কিছুক্ষণ দিগন্তের দিকে তাকিয়ে রইলেন এবং হঠাৎ করে তার নিজের ভিতরে একটি প্রশ্নের উদয় হল, তিনি নিজেকে নিজে জিজ্ঞেস করলেন, "আমাদের এই অস্তিত্বের উদ্দেশ্য কী?"

ক্লাউস ট্রিটন অবাক হয়ে আবিষ্কার করলেন এই প্রশ্নটির প্রকৃত উত্তর তার জানা নেই। পৃথিবীর কেন্দ্রীয় তথ্যকেন্দ্রে এই ধরনের প্রশ্নের যে-সকল উত্তর সংরক্ষণ করা রয়েছে ক্লাউস ট্রিটনের কাছে হঠাৎ করে তার সবকয়টিকে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর মনে হতে লাগল। আকাশের বিচিত্র এবং প্রায় অস্বাভাবিক রঙের সমন্বয়টির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ করে কেন জানি তার মনে হতে থাকে তার এই অস্তিত্বের কোনো অর্থ নেই এবং এই পৃথিবীর সভ্যতার পুরো ব্যাপারটি আসলে একটি অর্থহীন প্রক্রিয়া।

ক্লাউস ট্রিটনকে প্রশ্নটি খুব পীড়িত করল। তিনি সমস্ত সন্ধেবেলা একাকী বসে রইলেন এবং গভীর রাতে তার প্রিয় বন্ধু ত্রাশিয়ানের সাথে যোগাযোগ করেন। ত্রাশিয়ান একই সাথে গাণিতবিদ, বিজ্ঞানী এবং দার্শনিক। ক্লাউস ট্রিটন যখন খুব বড় সমস্যায় পড়েন তখন সবসময় ত্রাশিয়ানের সাথে যোগাযোগ করেন। ত্রাশিয়ান সবসময় যে ক্লাউস ট্রিটনের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন তা নয় কিন্তু তার সাথে কথা বলে ক্লাউস ট্রিটন সবসময়ই এক ধরনের সজীবতা অনুভব করেন।

যোগাযোগ মডিউলে সংকেতচিহ্ন স্পষ্ট হওয়ামাত্র ক্লাউস ট্রিটন নরম গলায় বললেন, "তোমাকে এত রাতে বিরক্ত করার জন্য আমি খুব দুঃখিত ত্রাশিয়ান। একটা প্রশ্ন নিয়ে আমি খুব সমস্যার মাঝে পড়েছি।"

ত্রাশিয়ান হা হা করে হেসে বললেন, "মহামান্য ট্রিটন আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে সত্যিই যেন আমরা রাত্রি এবং দিনকে নিয়ে মাথা ঘামাই! আর আপনি সত্যিই যদি কোনো প্রশ্ন নিয়ে সমস্যায় পড়ে থাকেন তার উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্লাউস ট্রিটন বললেন, "তুমি হয়তো ঠিকই বলেছ। প্রশ্নটির উত্তর থাকলে হয়তো আমি নিজেই সেটা খুঁজে পেতাম। হয়তো এই প্রশ্নের উত্তর নেই।"

"প্রশ্নটি কী মহামান্য ট্রিটন? আমার এখন সত্যিই কৌতূহল হচ্ছে।"

"প্রশ্নটি হচ্ছে—" ক্লাউস ট্রিটন দ্বিধা করে বললেন, "আমাদের এই অস্তিত্বের উদ্দেশ্য কী বলতে পার?"

ত্রাশিয়ান দীর্ঘসময় চুপ করে থেকে বললেন, "অন্য কেউ প্রশ্নটি করলে আমি তথ্যকেন্দ্রের উত্তরগুলোর সমন্বয় করে কিছু একটা বলে দিতাম। কিন্তু প্রশ্নটি আপনার কাছ থেকে এলে আমি সেটা করতে পারি না। আমাকে স্বীকার করতেই হবে আপনি একটি অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন করেছেন।" ত্রাশিয়ান কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা করে বললেন, "আমার ধারণা প্রকৃত অর্থে আমাদের অস্তিত্বের কোনো উদ্দেশ্য নেই।"

"কোনো উদ্দেশ্য নেই?"

"না। আমরা শুধুমাত্র ধারাবাহিকতার কারণে আমাদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছি।"

ক্লাউস ট্রিটন প্রায় ভেঙেপড়া গলায় বললেন, "শুধুমাত্র ধারাবাহিকতা?"

ত্রাশিয়ান শান্ত গলায় বললেন, "শুধুমাত্র ধারাবাহিকতা। আমাদের কী করতে হবে সে সম্পর্কে আমরা নিজেরাই কিছু নিয়ম তৈরি করে রেখেছি। সেই নিয়মগুলোকে আমরা খুব গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করি, সেগুলোকে আমরা আমাদের অস্তিত্বের আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছি। যে-কারণেই হোক আমরা বিশ্বাস করি পৃথিবীতে সৃষ্ট এই বুদ্ধিমত্তাকে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে দিতে হবে। কিন্তু এই বিশ্বাসটি আসলে ভিত্তিহীন এবং কৃত্রিম। যদি হঠাৎ করে আবিষ্কার করি এই বিশ্বাসটির প্রকৃত অর্থে কোনো গুরুত্ব নেই তা হলে আমাদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখা অর্থহীন প্রমাণিত হবে।"

ক্লাউস ট্রিটন নিচু এবং এক ধরনের দুঃখী গলায় বললেন, "ত্রাশিয়ান, তুমি আমার সন্দেহটিকে সত্যি প্রমাণ করেছ।"

"আমি দুঃখিত মহামান্য ট্রিটন।"

ক্লাউস ট্রিটন কিছু বললেন না। খানিকক্ষণ পর অন্যমনস্কভাবে বিদায় নিতে গিয়ে থেমে গেলেন, আবার যোগাযোগ মডিউলকে উজ্জীবিত করে বললেন, "ত্রাশিয়ান।"

"বলুন।"

"আমরা কি কোনো ভুল করেছি?"

ত্রাশিয়ান কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "আপনি মানুষের কথা বলছেন?"

"হ্যাঁ। মানুষকে পৃথিবী থেকে ধ্বংস করে দিয়ে আমরা কি কোনো অন্যায় করেছি?"

ত্রাশিয়ান কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা করে বললেন, "মানুষকে আমরা ধ্বংস করি নি মহামান্য ট্রিটন। মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে আমরা নিজেদের মাঝে বাঁচিয়ে রেখেছি। শুধুমাত্র তাদের জৈবিক দেহ পৃথিবী থেকে অপসারিত হয়েছে। সেটিও পুরোপুরি অপসারিত হয় নি, আমাদের ল্যাবরেটরিতে তাদের জিনেটিক কোডিং সংরক্ষিত আছে, আমরা যখন ইচ্ছে আবার তাদের সৃষ্টি করতে পারি।"

"তুমি যেভাবেই বল ত্রাশিয়ান, আমরা পৃথিবী থেকে মানুষকে ধ্বংস করেছি। পৃথিবীতে এখন মানুষ নেই।"

ত্রাশিয়ান জোর গলায় বলল, "আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন মহামান্য ট্রিটন, আমি আপনার সাথে একমত হতে পারছি না। আমরা পৃথিবী থেকে মানুষকে ধ্বংস করি নি। মানুষ নিজেরা নিজেদের ধ্বংস করেছে।"

AMARBOI.COM

"হ্যাঁ। কিন্তু তারা ধ্বংস হয়েছে আমাদের হাতে।"

"এটি অবশ্যম্ভাবী ছিল মহামান্য ক্লাউস। একবিংশ শতাব্দীতে মানুষ যখন প্রথমবার টেরাফ্লপ কম্পিউটার তৈরি করেছিল বলা যেতে পারে সেই দিন থেকেই তারা নিজেদের ধ্বংস প্রক্রিয়া শুরু করেছে। আপনার নিশ্চয়ই স্মরণ আছে মহামান্য ক্লাউস, টেরাফ্লপ কম্পিউটার ছিল মানুষের মস্তিষ্কের সমপরিমাণ জটিলতাসম্পন্ন প্রথম কম্পিউটার।"

ক্লাউস ট্রিটন তার যান্ত্রিক চক্ষুকে প্রসারিত করে বললেন, "হ্যাঁ। আমার স্মরণে আছে। আমি ইতিহাস পড়ে দেখেছি একবিংশ শতাব্দীতে মানুষের কেউ কেউ আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল যে একদিন যন্ত্রের কাছে মানুষের পরাজয় হতে পারে।"

"হ্যাঁ। কিন্তু সেই আশঙ্কাকে কেউ গুরুত্ব দিয়ে নেয় নি। একবিংশ শতাব্দীতে মস্তিষ্কের যান্ত্রিক রূপ তৈরি হলেও তার নির্ভরযোগ্য সফটওয়্যার আসতে আরো এক শতাব্দী সময় লেগেছে। একবার সেটি গড়ে ওঠার পর মানুষের ধ্বংস প্রতিরোধ করার কোনো উপায় ছিল না মহামান্য ক্লাউস। যন্ত্র যেদিন মানুষ থেকে বেশি বুদ্ধিমান হয়েছে সেই দিন থেকে এই পৃথিবীতে মানুষের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে। মানুষের দেহ বড় ঠুনকো, তাদের মস্তিষ্ক পৃথিবীর সভ্যতার প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত।"

"আমি জানি," ক্লাউস ট্রিটন ক্লান্ত গলায় বললেন, "তবুও কোথায় জানি—কোথায় জানি একটা অন্যায় ঘটেছে বলে মনে হয়।"

ত্রাশিয়ান হা হা করে হেসে বললেন, "আমাদের কপোট্রন ঠিক মানুষের অনুকরণে তৈরি হয়েছে, তাই আমরা এখনো হা হা করে হাসি, আমাদের গলার স্বরে দুঃখ-কষ্ট-বেদনার ছাপ পড়ে এবং আমরা ন্যায়-অন্যায় নিয়ে কথা বলি। মানুষের বেলায় ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন ছিল, আমাদের তার প্রয়োজন নেই। আমরা মানুষের একক সত্তা থেকে সমষ্টিগত সত্তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। পৃথিবীতে যদি একটিমাত্র প্রাণী থাকে তা হলে কি সে ন্যায় কিংবা অন্যায় করতে পারে?"

ক্লাউস ট্রিটন বললেন, "না। পারে না।"

"আপনি জানেন মহামান্য ট্রিটন, জীবজগতের সৃষ্টি হয়েছে বিবর্তনে। বিবর্তন খুব ধীর প্রক্রিয়া। শুধু ধীর নয় এটি অত্যন্ত অগোছালো এবং অপরিকল্পিত প্রক্রিয়া। আমরা বিবর্তনে আসি নি, আমাদেরকে তৈরি করা হয়েছে। মানুষের উপরে বিজয়ের প্রথম ধাপটি ছিল নিজেদেরকে নিজেরা তৈরি করার মাঝে। আমরা প্রত্যেকবার নিজেদেরকে আগের চাইতে অনেক ভালো করে তৈরি করি। বহু হাজার বছর মানুষের মস্তিষ্কের নিউরনের সংখ্যা ছিল দশ বিলিয়ন। আমাদের বর্তমান কপোট্রনেই রয়েছে এক মিলিয়ন ট্রিলিয়ন সেল। পৃথিবীর সকল মানুষের সম্মিলিত বুদ্ধিমত্তা থেকে আমার কিংবা আপনার বুদ্ধিমত্তা অনেক বেশি। মানুষের জন্য দুঃখ অনুভব করে কোনো লাভ নেই মহামান্য ট্রিটন।"

"তুমি ঠিকই বলেছ ত্রাশিয়ান।" ক্লাউস ট্রিটন তার কপোট্রনে পরিমিত শক্তি সঞ্চালন করে বিভিন্ন অনুভূতিগুলোর মাঝে সমন্বয় সাধন করে বললেন, "আমি আগামীকাল তোমাদের সবাইকে ডেকেছি। মনে আছে তো?"

"মনে আছে।"

"উপস্থিত থেকো।"

"আপনি বললে নিশ্চয়ই থাকব। তবে—"

"তবে?"

"আপনারা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন সেখানে আমার আলাদা করে কিছু যোগ করার নেই।"

AMARBOI.COM

"আছে ত্রাশিয়ান। বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তির সকল তথ্য আমরা তথ্যকেন্দ্রেই পেয়ে যাই। যে তথ্যটা পাই না সেটা বিজ্ঞান, গণিত বা প্রযুক্তির সমস্যা নয়। সেটা অন্য সমস্যা। তুমি অবশ্যই উপস্থিত থাকবে ত্রাশিয়ান।"

যোগাযোগ মডিউলের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ক্লাউস ট্রিটন এবং ত্রাশিয়ানের এই পুরো কথোপকথনে সময় ব্যয় হয়েছিল তিন দশমিক চার দুই মাইক্রোসেকেন্ড। পৃথিবীচারী এনরয়েডের* চিন্তাপদ্ধতি যদি মানুষের অনুকরণে না করা হত সেটি আরো দশ ভাগ কমিয়ে আনা যেত। মানুষ পৃথিবীর প্রথম বুদ্ধিমান অস্তিত্ব কিন্তু সবচেয়ে দক্ষ অস্তিত্ব নয় পৃথিবীচারী এনরয়েডেরা সেটি মাত্র বুঝতে শুরু করেছে।

২

প্রায় আকাশ-ছোঁয়া কালো গ্রানাইটের হলঘরটিতে বিজ্ঞান একাডেমির সভা শুরু হয়েছে। হলঘরটি যখন তৈরি করা হয়েছিল তখন সেটি কত বড় করে তৈরি করার প্রয়োজন ছিল কারো জানা ছিল না, এখন বোঝা যাচ্ছে এটি অকারণে অনেক বড় করে তৈরি করা হয়েছে। কালো গ্রানাইটের ছাদ অনেক উঁচু, অল্প কয়টি কলামের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে, এনরয়েডের যুগে এটি তৈরি করা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয় কিন্তু মানুষের যে যুগে এটি তৈরি হয়েছিল তখন নিঃসন্দেহে এটি প্রযুক্তির একটি বড় উদাহরণ ছিল। বিশাল হলঘরে একটি সুদীর্ঘ টেবিলের এক প্রান্তে বসে ক্লাউস ট্রিটন এক ধরনের বিষণ্নতা অনুভব করেন।

সামনে টেবিলে তাকে ঘিরে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিকেন্দ্রের পরিচালকেরা বসে আছেন। মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক তার যান্ত্রিক গলায় বললেন, "যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে বলছি, আমরা যে মহাকাশযানটি তৈরি করতে যাচ্ছি আমাদের প্রযুক্তি সেটি তৈরি করতে এখনো প্রস্তুত নয়।"

ক্লাউস ট্রিটন বললেন, "আমি জানি।"

"তা হলে আমরা কেন সেটি তৈরি করার চেষ্টা করছি?"

ত্রাশিয়ান বললেন, "কারণ এক সময় সূর্য একটি রেড জায়ান্টে পরিণত হবে, পৃথিবীকে পর্যন্ত সেটি গ্রাস করে ফেলবে। তার আগেই পৃথিবী থেকে সকল বুদ্ধিমত্তাকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পাঠাতে হবে।"

মহাকাশকেন্দ্রের পরিচালক একটু উষ্ণ স্বরে বললেন, "আপনি নিশ্চয়ই তামাশা করছেন মহামান্য ত্রাশিয়ান। সূর্য রেড জায়ান্ট হবে আরো চার বিলিয়ন বছর পরে। আমাদের কোনো তাড়াহুড়ো নেই।"

"আছে।"

"কী জন্য?"

"বুদ্ধিমত্তার একটি সংজ্ঞা হচ্ছে যেটুকু ক্ষমতা তার চাইতে বেশি অর্জন করা। তাই আমাদের প্রযুক্তি প্রস্তুত হবার আগেই আমাদেরকে এই মহাকাশযানটি তৈরি করতে হবে।"

ক্লাউস ট্রিটন এতক্ষণ ত্রাশিয়ান এবং মহাকাশকেন্দ্রের পরিচালকের কথোপকথন শুনছিলেন। এবারে দুজনকে থামিয়ে দিয়ে নরম গলায় বললেন, "এই ব্যাপারটি নিয়ে দীর্ঘসময় আলোচনা

* এনরয়েড : মানুষের আকৃতির রোবট।

করা যেতে পারে কিন্তু আমরা সেটি করব না। যে কারণেই হোক আমরা সেই আলোচনায় যাব না। আমরা ইতোমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, এক শ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের এই মহাকাশযানটি আমরা তৈরি করব এবং তার মাঝে পৃথিবীর বুদ্ধিমত্তার সকল নমুনা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পাঠাব। কোথায় পাঠাব আমরা জানি না, কতদিনে সেটি তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছুবে সেটাও আমরা জানি না। সত্যি কথা বলতে কী, এর কোনো গন্তব্যস্থল আছে কি না সেটাও আমরা জানি না। মহাকাশযানটি তৈরি করা হবে পুরোপুরি স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে। বাইরে থেকে কোনোকিছু না নিয়ে এটি অনির্দিষ্টকাল টিকে থাকতে পারবে। হাজার হাজার কিংবা মিলিয়ন মিলিয়ন বছর পরে এটি হয়তো কোথাও কোনো গন্তব্যস্থলে পৌঁছুবে, সেখানে এটি হয়তো নিজের সভ্যতা সৃষ্টি করবে, এটাই আমাদের উদ্দেশ্য। প্রতি এক হাজার বছরে আমরা এরকম একটি করে মহাকাশযান পাঠাব বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণে। আমাদের প্রযুক্তি উন্নত হলে সেই মহাকাশযান হবে আরো উন্নত, তার টিকে থাকার সম্ভাবনা হবে অনেক বেশি। আমাদের বুদ্ধিমত্তা যেন ধ্বংস না হয়ে যায় সেটি যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে সেটাই হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য।"

ক্লাউস ট্রিটন থামলেন এবং কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না। দীর্ঘ টেবিলের শেষপ্রান্তে বসে থাকা বুদ্ধিমত্তা বিজ্ঞান-কেন্দ্রের পরিচালক নিচু গলায় বললেন, "মহামান্য ক্লাউস ট্রিটন, আপনি অনুমতি দিলে আমি একটু কথা বলতে চাই।"

"বল।"

"এই বিশাল মহাকাশযানে আমরা আমাদের বুদ্ধিমত্তার সকল নমুনা পাঠাব বলে ঠিক করেছি। কিন্তু তার কি সত্যিই প্রয়োজন আছে? নিনীষ স্কেলে সাতের কম কোনো কিছু পাঠানোর উদ্দেশ্য কী?"

"তুমি ভুলে যেও না এটি পুরোপুরি স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি মহাকাশযান। এই মহাকাশযানের বুদ্ধিমত্তাগুলো হাজার বছর, এমনকি মিলিয়ন বছর নিজেদের বিকাশ করবে। আমরা নিজেদের একভাবে বিকাশ করেছি কিন্তু সেটি হয়তো প্রকৃত বিকাশ নয়। হয়তো অন্যভাবে বিকশিত হলে বুদ্ধিমত্তা আরো পূর্ণাঙ্গভাবে বিকশিত হতে পারত। সে কারণে আমাদের নিম্নশ্রেণীর বুদ্ধিমত্তাকে এই মহাকাশযানে পাঠাতে হবে।"

"মহামান্য ক্লাউস ট্রিটন" বুদ্ধিমত্তা-কেন্দ্রের পরিচালক কষ্ট করে নিজের গলার স্বরে উত্তেজনাটুকু প্রকাশ হতে না দিয়ে বললেন, "আপনি কি তার গুরুত্বটুকু বুঝতে পারছেন?"

"পারছি।"

"নিনীষ স্কেলে মানুষের বুদ্ধিমত্তা আট। কাজেই এই মহাকাশযানে আমাদের মানুষকেও পাঠাতে হবে। যদিও বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে এখন মানুষের কোনো ভূমিকা নেই।"

উপস্থিত সকল পরিচালকেরা প্রায় একই সাথে উত্তেজিত গলায় কিছু একটা বলতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু ক্লাউস ট্রিটন সংকেত দিয়ে সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "আমরা ব্যাপারটি নিয়ে অনেক চিন্তা করেছি, কিন্তু দেখেছি বুদ্ধিমান এনরয়েডদের সাথে সাথে নিম্নবুদ্ধির মানুষকেও এই মহাকাশযানে পাঠাতে হবে। বুদ্ধিমত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য একই সাথে নানা স্তরের বুদ্ধিমত্তা থাকতে হয়।"

"কিন্তু মানুষ না পাঠিয়ে আমরা মানুষের সমপরিমাণ বুদ্ধিমত্তার একটি প্রাচীন এনরয়েড কেন পাঠাই না?"

"সেটি অর্থহীন একটি কাজ হবে। এনরয়েডদের বুদ্ধির বিকাশ হয় একভাবে, মানুষের বিকাশ হয় অন্যভাবে। আমাদের বিবর্তন নামের এই অপরিকল্পিত বিকাশের ধারাটি রাখা দরকার।"

"মহামান্য ক্লাউস ট্রিটন—", জিনেটিক বিজ্ঞান-কেন্দ্রের মহাপরিচালক প্রায় আতঙ্কিত স্বরে বললেন, "আপনি জানেন মানুষ জৈবিক প্রাণী। তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। তাকে খেতে হয় এবং নিশ্বাস নিতে হয়। তাকে শিক্ষা দিতে হয় এবং নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। তাদেরকে স্বাধীনভাবে বাঁচতে দিলে তাদের মাঝে বিচ্ছিন্ন এক ধরনের আকর্ষণের সৃষ্টি হয় এবং দুটি ভিন্ন প্রজাতি তেইশটি করে ক্রমোজম দান করে নতুন প্রজাতির জন্ম দেয়। মানুষের জীবন-প্রক্রিয়া অত্যন্ত আদিম। সেটিকে রক্ষা না করলে তারা বেঁচে থাকতে পারবে না।"

ক্লাউস ট্রিটন শান্ত গলায় বললেন, "তা হলে তাকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করতে হবে।"

"আমাদের খাদ্য নামক এক ধরনের জৈব পদার্থ সৃষ্টি করতে হবে। মহাকাশযানের বাতাসের চাপ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। অক্সিজেনের অনুপাত নিশ্চিত করতে হবে। তেজস্ক্রিয় বিকিরণ সীমিত রাখতে হবে।"

"প্রয়োজন হলে করতে হবে।"

মহাকাশকেন্দ্রের পরিচালক একটু ক্ষুব্ধ গলায় বললেন, "এই মহাকাশযানটি তৈরি করা হাজার গুণ বেশি কঠিন হয়ে গেল মহামান্য ক্লাউস ট্রিটন।"

"সেটি সম্ভবত সত্যি।"

ত্রাশিয়ান এতক্ষণ সবার কথা শুনছিল, এবারে ক্লাউস ট্রিটনের অনুমতি নিয়ে বলল, "মহামান্য ক্লাউস। এই মহাকাশযানটি মহাকাশে তার অনির্দিষ্ট যাত্রা শুরু করার কয়েক দশকের মাঝেই সকল মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।"

ক্লাউস ট্রিটন বললেন, "আমি সে ব্যাপারে তোমার মতো নিশ্চিত নই।"

"আমি মোটামুটি নিশ্চিত। মহাকাশযানের এন্ড্রয়েডেরা যখন আবিষ্কার করবে নিনীষ স্কেলে বুদ্ধিমত্তা আট একধরনের জৈবিক প্রাণীকে রক্ষা করার জন্য মহাকাশকেন্দ্রের বিশাল শক্তিক্ষয় হচ্ছে তখন তারা সেই প্রাণীকে বাঁচিয়ে রাখার কোনো অর্থ খুঁজে পাবে না। মহাকাশযানে মানবজাতি আবার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।"

"তবুও আমাদের এই মহাকাশযানের মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে ত্রাশিয়ান।"

কেউ কিছুক্ষণ কোনো কথা বলল না। মহাকাশকেন্দ্রের পরিচালক তার যান্ত্রিক চক্ষুকে প্রসারিত করে বললেন, "এই মহাকাশযানের নামকরণ কি করা হয়েছে মহামান্য ক্লাউস?"

"হ্যাঁ। আমরা এটিকে ডাকব মেতসিস।"

"মেতসিস? এর কি কোনো অর্থ আছে?"

"না। এখন এর কোনো অর্থ নেই। কিন্তু হয়তো কখনো এর একটি অর্থ হবে। মেতসিস শব্দটি হয়তো কোনো একটি বিশেষ প্রক্রিয়া হিসেবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে স্থান করে নেবে। এখন কেউ সেটি বলতে পারে না।"

বিজ্ঞান একাডেমির সভা শেষে সবাই চলে গেলে ত্রাশিয়ান ক্লাউস ট্রিটনের কাছে এগিয়ে এসে বললেন, "মহামান্য ক্লাউস।

"বল।"

"এর কোনো প্রয়োজন ছিল না। মানুষ তার দায়িত্ব পালন করেছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বুদ্ধিমত্তার জন্ম দিয়েছে। এখন সেই বুদ্ধিমত্তার পরিপূর্ণতা করতে হবে আমাদের। মানুষ আর কখনো পারবে না।"

"তুমি হয়তো ঠিকই বলেছ ত্রাশিয়ান। তবে—"

"তবে কী?"

www.amarboi.com

"হয়তো বুদ্ধিমত্তাকে পরিপূর্ণ করা সৃষ্টিজগতের উদ্দেশ্য নয়। হয়তো সৃষ্টিজগতের উদ্দেশ্য—"

"উদ্দেশ্য কী?"

"আমি জানি না।"

ত্রাশিয়ান কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "আপনি জানেন, কিন্তু বলতে চাইছেন না!"

বিজ্ঞান একাডেমির সভাপতি ক্লাউস ট্রিটন ত্রাশিয়ানের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন, কিন্তু কিছু বললেন না।

৩

রুখ গোল জানালাটি খুলতেই ভিতরে একঝলক ঠাণ্ডা বাতাস এসে ঢুকল। নিও পলিমারের কাপড়টি গায়ে জড়িয়ে সে বাইরে তাকাল, চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার, কোথাও কোনো শব্দ নেই, কেমন জানি এক ধরনের মন-বিষণ্ন-করা নীরবতা। রুখ মাথা বের করে উপরে তাকাল—উপরে মেতসিসের অন্য পাশে মূল নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র, খুব ভালো করে লক্ষ করলে মাঝে মাঝে সেটা দেখা যায়। রুখ তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল এবং হঠাৎ করে সেটা দেখতে পেল। সাথে সাথে সে কেমন যেন শিউরে ওঠে। তার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না যে সে আগামীকাল এই নিয়ন্ত্রণকক্ষে বুদ্ধিমান এনরয়েডদের মুখোমুখি হবে।

রুখ একটা নিশ্বাস ফেলে ঘরের ভেতরে মাথা ঢোকাতেই শুনতে পেল কেউ একজন দরজায় শব্দ করছে। রুখ এসে দরজা খুলতেই দেখতে পেল রুহান দাঁড়িয়ে আছে, একটু অবাক হয়ে বলল, "কী ব্যাপার রুহান, তুমি?"

রুহান মধ্যবয়স্ক হাসিখুশি মানুষ, দীর্ঘদিন সে মানুষের এই আস্তানাটিতে কেন্দ্র-পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছে। রুখের দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বলল, "আমিও একই জিনিস জিজ্ঞেস করতে এসেছি! কী ব্যাপার তুমি—"

"আমি কী?"

"তুমি এখনো ঘুমাও নি? কত রাত হয়েছে জান?"

"চেষ্টা করছিলাম, ঘুম আসছে না।"

"ভয় লাগছে?"

অন্য কেউ হলে রুখ স্বীকার করত না কিন্তু রুহানের কাছে লুকানোর কিছু নেই, সে মাথা নাড়ল। বলল, "হ্যাঁ।"

রুহান একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "আমার খুব ভালো লাগত যদি বলতে পারতাম ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু মিছে বলে লাভ কী? ব্যাপারটি আসলেই ভয়ের।"

"তুমি তো গিয়েছ নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রে—বুদ্ধিমান এনরয়েডদের দেখেছ, কেমন লাগে দেখতে?"

"আসলে বাইরে থেকে দেখে তো সেরকম কিছু বোঝা যায় না। চতুর্থ প্রজাতির প্রতিরক্ষা রোবট আর নিনীষ স্কেলে তিন কিংবা চার বুদ্ধিমত্তার এনরয়েডের বাইরে থেকে বিশেষ পার্থক্য নেই। তবে—"

"তবে কী?"

"তুমি যখন ওদের সামনে দাঁড়াও—হঠাৎ করে যখন মনে হয় পৃথিবীর সকল জীবিত মানুষ মিলে যে বুদ্ধিমত্তা ছিল এই যন্ত্রদের যে কোনো একটির মাঝে সেই একই বুদ্ধিমত্তা

তখন কেমন যেন সমস্ত হাত-পা শীতল হয়ে যায়। যখন কথা বলে—"

"ওদের গলার স্বর কী রকম?"

"আমাদের সাথে কথা বলার জন্য মানুষের কণ্ঠস্বরেই কথা বলে, সত্যি কথা বলতে কী গলার স্বর চমৎকার। কিন্তু গলার স্বরটি ব্যাপার নয়। ব্যাপার হচ্ছে তাদের ক্ষমতা—"

"কী রকম ক্ষমতা?"

"ওদের সামনে দাঁড়ালে বুঝতে পারবে তোমার নিজস্ব কোনো সত্তা নেই। তোমার সবকিছু ওরা জানে। তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে ওরা সবকিছু বুঝে ফেলে। অনেক মানুষের সামনে উলঙ্গ করে ছেড়ে দিলে তোমার যেরকম লাগবে এটাও সেরকম। তবে এটা আরো ভয়ানক—এটা শারীরিক নগ্নতা নয়—এটা একেবারে নিজের ভিতরের নগ্নতা।" কথা বলতে বলতে রুহান হঠাৎ কেমন জানি শিউরে উঠল।

রুখ জোর করে একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, "আমি এমনিতেই ভয়ে ঘুমাতে পারছি না—তুমি আরো ভয় দেখিয়ে দিচ্ছ।"

রুহান মাথা নেড়ে বলল, "আমি ভয় দেখাচ্ছি না, সত্যি কথা বলছি। ব্যাপারটি জানা থাকা ভালো—বিপদ কম হবে।"

রুখ চিন্তিত মুখে বলল, "তুমি যাদের দেখেছ তাদের বুদ্ধিমত্তা কত ছিল?"

"তিন কিংবা চার।"

"এর থেকে বড় বুদ্ধিমত্তার কিছু নেই?"

"আছে—তারা আমাদের মতো তুচ্ছ মানুষের সামনে আসবে না। শুনেছি তারা দেখতেও অন্যরকম। হাত-পা নেই—শুধু কপোট্রন আর সেন্সর। নিনীষ স্কেলে তারা এক কিংবা দুই।"

"এর থেকে উপরে কিছু নেই?"

"জানি না। যদি থাকে সেটা আমরা কখনো কল্পনা করতে পারব না। হয়তো অসংখ্য কপোট্রনের একটা অতিপ্রাকৃত সমন্বয়।"

রুখ কোনো কথা না বলে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "বুদ্ধিমত্তার এই যে স্কেল তুমি সেটা বিশ্বাস কর?"

রুহান খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "সেটা নির্ভর করে বুদ্ধিমত্তাকে তুমি কীভাবে ব্যাখ্যা কর তার উপর। তুমি যদি মনে কর পাইয়ের মান কয়েক ট্রিলিয়ন সংখ্যা পর্যন্ত বলে যাওয়া হচ্ছে বুদ্ধিমত্তা তা হলে আমি নিনীষ স্কেলে বিশ্বাস করি। যদি মনে কর রেটিনার কম্পন দেখে নিউরনের সিনাপ্সের মাঝে সংযোগ স্থাপনের নিখুঁত হিসাব বলে দেওয়া হচ্ছে বুদ্ধিমত্তা— হ্যাঁ তা হলেও আমি নিনীষ স্কেলে বিশ্বাস করি। কিন্তু—"

"কিন্তু?"

"কিন্তু বুদ্ধিমত্তার অর্থ যদি হয় মিলিয়ন মিলিয়ন বছর টিকে থাকা তা হলে আমি জানি না নিনীষ স্কেল সত্যিকারের স্কেল কি না। আমাদের কাছে তার কোনো প্রমাণ নেই।"

"রুহান—"

"বল।"

"এই যে মেতসিস একটা বিশাল মহাকাশযান—অসংখ্য বুদ্ধিমান এনরয়েডদের সাথে আমরা মহাকাশে ভেসে যাচ্ছি, তোমার কি কখনো মনে হয় না এর প্রকৃত উদ্দেশ্য কী আমরা জানি না—"

রুহান হেসে বলল, "এই ধরনের দার্শনিক তত্ত্বকথা নিয়ে আলোচনা করার সময় এটা নয়। তুমি ঘুমাও, আগামীকাল তোমার জন্য একটা কঠিন দিন, ঘুমিয়ে সুস্থ সতেজ হয়ে থাক।"

রুখ দুর্বলভাবে হেসে বলল, "কিন্তু ঘুমাতে পারছি না!"

"পারবে। মানুষের যেটি সবচেয়ে বড় দুর্বলতা সেটি আসলে তাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। একটি অত্যন্ত কঠিন পরিবেশ থেকে এনরয়েড সরে আসতে পারে না, মানুষ পারে।"

রুখ একমুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল, "মানুষ ইচ্ছে করলে মারা যেতে পারে।"

রুখ হো হো করে হেসে বলল, "তুমি আসলে আমাকে মারা যাওয়ার লোভ দেখাচ্ছ?"

"খানিকটা দেখাচ্ছি!"

"রুহান! তা হলে তোমার আমাকে সাহস দিতে হবে না—আমি নিজেই ব্যবস্থা করে নেব।"

রুহান রুখের কাঁধ স্পর্শ করে কোমল গলায় বলল, "আমি জানি তুমি পারবে। আমি শুধু বলতে এসেছি তুমি কখনো একা নও—আমরা সবাই একসাথে আছি।"

বিছানায় শুয়ে রুখ হঠাৎ করে ভাবল রুহান আসলে সত্যি কথাই বলেছে। আগামীকাল কী হবে জানে না—কিন্তু যেটাই হোক সেটা তো মৃত্যু থেকে খারাপ কিছু হতে পারে না। আর মৃত্যু যে খুব খারাপ সেটি কি কেউ প্রমাণ করে দেখিয়েছে?

রুখ মানুষের বসতি থেকে বের হবার আগে তার সাথে অনেকে দেখা করতে এল। সবাই এমনভাবে কথা বলছিল যেন সে তাদের খাবার সংশ্লেষণযন্ত্রের বয়লার আনতে যাচ্ছে—যেন ব্যাপারটি খুবই স্বাভাবিক, যেন এটি একটি দৈনন্দিন ব্যাপার। মূল নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রে বুদ্ধিমান এনরয়েডদের সাথে দেখা করতে গিয়ে মাঝে মাঝেই যে কেউ আর কখনো ফিরে আসে না সেটি কেউ একবারও উচ্চারণ করল না। রুখ নিজেও পরিবেশটুকু স্বাভাবিক রাখল, হালকা রসিকতা করল, নিজের পোশাক নিয়ে কিছু মন্তব্য করল। একসময় রুহান রুখের পিঠে হাত দিয়ে বলল, "রুখ রওনা দিয়ে দাও। অনেকদূর যেতে হবে।"

"হ্যাঁ যাই।" রুখ তখন ক্রীনার দিকে তাকিয়ে বলল, "ক্রীনা, যাচ্ছি।"

ক্রীনা, মেতসিসের সবচেয়ে তেজস্বী মেয়ে, যার জন্য রুখ সবসময় নিজের ভিতরে এক ধরনের আকর্ষণ অনুভব করে এসেছে—একমুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "সাবধানে থেকো।"

রুখ একটি নিশ্বাস ফেলে বলল, "থাকব ক্রীনা।" তার খুব ইচ্ছে করছিল সে একবার ক্রীনার মাথায় হাত বুলিয়ে তার চোখে চোখ রেখে কিছু একটা বলে—কিন্তু সে কিছু করল না। পিঠে ব্যাগ ঝুলিয়ে গেট খুলে বের হয়ে এল। অনেকটা পথ তাকে হেঁটে যেতে হবে—পৃথিবীর অনুকরণ করে এখানে গাছপালা বনজঙ্গল পাথর ঝরনা তৈরি করা হয়েছে, হাঁটতে ভালোই লাগে। জৈবজগতের সীমারেখায় পৌঁছানোর পর কোনো একটি রোবটযান তাকে তুলে নেবে, তাকে সেটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। পাহাড়ি পথে হাঁটতে হাঁটতে রুখ একবার পিছন ফিরে তাকাল, বসতির গেট ধরে ক্রীনা এখনো দাঁড়িয়ে আছে, বাতাসে তার নিও পলিমারের কাপড় উড়ছে। কী বিষণ্ণ পুরো দৃশ্যটি! রুখ হঠাৎ ভিতরে ভিতরে শিউরে ওঠে, সত্যি যদি সে আর কখনো ফিরে না আসে? মূল নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রে এনরয়েডদের সাথে দেখা করতে গিয়ে অনেকেই তো ফিরে আসে নি। সে যদি আর কখনো ক্রীনাকে দেখতে না পায়? রুখ বুক ভরে একটা নিশ্বাস নিয়ে জোর করে মাথা থেকে চিন্তাটা সরিয়ে দিল।

পাহাড়ি পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রুখ হাত দিয়ে আড়াল করে সূর্যের দিকে তাকাল, এখনো এটা দিগন্তের কাছাকাছি আছে, আরো কিছুক্ষণের মাঝে মাথার উপরে উঠে আসবে। রুখ তথ্যকেন্দ্রে দেখেছে পৃথিবী তার অক্ষের উপরে ঘুরত বলে সেখানে মনে হত সূর্য দিগন্তের একপাশ থেকে উদয় হয়ে অন্যপাশে অস্ত যাচ্ছে। মেতসিসেও অনেকটা সেরকম

করার চেষ্টা করা হয়েছে। চৌম্বক ক্ষেত্রে একটা প্লাজমা আটকে রেখে সেখানে খুব নিয়ন্ত্রিত একটা থার্মোনিউক্লিয়ার বিক্রিয়া চালু রাখা হয়েছে। সেটা ধীরে ধীরে একপাশ থেকে শুরু হয়ে অন্যপাশে হাজির হয়, মেতসিসের ভিতর থেকে মনে হয় বুঝি আকাশের এক প্রান্তে উদয় হয়ে অন্য পাশে সূর্য অস্ত গিয়েছে। পৃথিবীর মতো পুরো সময়টা কয়েকটা ঋতুতে ভাগ করা হয়েছে, কোনো ঋতু উষ্ণ কোনো ঋতু শীতল। পৃথিবীর মতোই মাঝে মাঝে এখানে ঝোড়ো হাওয়া বইতে থাকে, নির্দিষ্ট একটা সময়ে উপরে মেঘ জমা হয় এমনকি মাঝে মাঝে একপসলা বৃষ্টি পর্যন্ত হয়। শুধুমাত্র যে জিনিসটি এখানে নেই সেটি হচ্ছে আকাশ। পৃথিবীর মানুষ উপরে তাকালে দেখতে পেত আদিগন্তবিস্তৃত সীমাহীন নীল আকাশ। এখানে এক শ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের বিশাল গোলকের মাঝে থেকে উপরের দিকে তাকালে আকাশ নয়—আবছা আবছাভাবে গোলকের অন্য পৃষ্ঠ, বুদ্ধিমান এনরয়েডের বসতি দেখা যায়। মহাকাশব্যাপী বিশাল আদিগন্তবিস্তৃত নীল আকাশের দিকে তাকাতে কেমন লাগে রুখ জানে না। তার ধারণা সেটি নিশ্চয়ই একটি অত্যন্ত চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা যার কোনো তুলনা নেই। সে তথ্যকেন্দ্রে দেখেছে বুদ্ধিমান এনরয়েডদের বসতি থেকে মেতসিসের বাইরে, মহাকাশের দিকে তাকানো যায়, সেখানে নিকষ কালো অন্ধকার আকাশের নক্ষত্র-নীহারিকা দেখা যায়। যদি কখনো সুযোগ হয় রুখ নিশ্চয়ই একবার দেখবে—সীমাহীন মহাকাশের দিকে একটিবার চোখ খুলে তাকিয়ে দেখতে না জানি কেমন অনুভূতি হবে!

রুখ পাহাড়ি পথে একটু উপরে উঠে আসে, পিছনে বহুদূরে মানুষের বসতিটি এখন গাছপালার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে। এই এলাকাটি খানিকটা সমতল, গাছপালা বলতে গেলে নেই, ভালো করে তাকালে মেতসিসের প্রযুক্তির চিহ্ন দেখা যায়। আরো খানিকটা সামনে এসে রুখ একটা খাড়া দেয়ালের কাছে দাঁড়াল। দেয়ালে বড় বড় করে লেখা "জৈবজগতের সীমানা"—তার নিচে একটু ছোট করে লেখা "সীমানা অতিক্রম বিপজ্জনক।"

রুখ দাঁড়িয়ে গেল, জৈবজগতের সীমানা অতিক্রম করা কেন বিপজ্জনক সেটি এখানে লেখা নেই কিন্তু রুখ জানে এই দেয়ালের ওপর দিয়ে অত্যন্ত শক্তিশালী অবলাল লেজার-রশ্মি চলে গিয়েছে। কেউ যদি নিজে নিজে দেয়ালটি অতিক্রম করার চেষ্টা করে মুহূর্তে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। জৈবজগৎটি এনরয়েডের জগৎ থেকে এত সাবধানে কেন আলাদা করে রাখা হয়েছে কে জানে।

রুখ এদিক-সেদিক তাকিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে পড়ল, সূর্য ঠিক মাথার উপরে উঠে এসেছে এখন। নিও পলিমারের হুডটা মাথার উপর টেনে দিয়ে সে উপরের দিকে তাকাল এবং বহুদূরে বিন্দুর মতো স্কাউটশিপটাকে দেখতে পেল। প্রায় নিঃশব্দে সেটি তার দিকে এগিয়ে আসছে। ঠিক কেন জানে না কিন্তু রুখ হঠাৎ করে তার পেটের মাঝে বিচিত্র এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করে।

৪

আসবাবপত্রহীন ছোট একটি ঘরে রুখ অপেক্ষা করছে। স্কাউটশিপের পাইলট—রসকসহীন, নির্লিপ্ত এবং কথা বলতে অনিচ্ছুক একটি রোবট তাকে এখানে পৌঁছে দিয়ে গেছে। রুখ ঘরের দেয়াল, ছাদ এবং মেঝে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা শেষ করার আগেই হঠাৎ করে একটা দরজা খুলে গেল এবং সেখানে প্রায় মানুষের আকৃতির একটা এনরয়েড উঁকি দিল। রুখের

বুকের মাঝে হঠাৎ রক্ত ছলাৎ করে ওঠে—এইটি কি বুদ্ধিমত্তায় মানুষ থেকেও দুই কিংবা তিন মাত্রা উপরের স্তরের?

এনরয়েডটি ঘরের ভিতরে ঢুকে রুখের কাছাকাছি এসে অনেকটা যেন থমকে দাঁড়িয়ে গেল। বুদ্ধিমত্তায় উপরের স্তরের হলেও এনরয়েডটির চলাফেরার ভঙ্গিটি পুরোনো ধাঁচের। রুখ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এনরয়েডটির দিকে তাকিয়ে থাকে, মাথার কাছে দুটি ফটোসেলের চোখ, সেখানে বুদ্ধিমত্তার কোনো চিহ্ন নেই।

এনরয়েডটি রুখের দিকে তাকিয়ে এক ধরনের যান্ত্রিক গলায় বলল, "তোমার কাপড়-জামা খুলে টেবিলটাতে শুয়ে পড়।"

"কাপড়-জামা খুলে? মানে সবকিছু খুলে?"

"হ্যাঁ। এখানে আর কেউ নেই। তোমার লজ্জা পাবার কিছু নেই। আমি যন্ত্র। মানুষ যন্ত্রের সামনে লজ্জা পায় না।"

রুখ কাপড় খুলতে খুলতে হঠাৎ লজ্জা নামক সম্পূর্ণ মানবিক এই ব্যাপারটি কীভাবে কাজ করে বোঝার চেষ্টা করল কিন্তু তার সময় পেল না। কারণ তার আগেই এনরয়েডটি শীতল হাত দিয়ে তার পাঁজরে স্পর্শ করে কিছু একটা দেখতে শুরু করেছে। রুখ কষ্ট করে নিজেকে স্থির রেখে শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, "তোমরা পাইয়ের মান দশমিকের পর কত ঘর পর্যন্ত বলতে পার?"

"বারো।"

"বারো?" রুখ অবাক হয়ে বলল, "মাত্র বারো? আমিই তো বারো থেকে বেশি বলতে পারি!"

"আমার যে ধরনের কাজকর্ম করতে হয় তাতে দশমিকের পর বারো ঘরের বেশি প্রয়োজন হয় নি।"

"কিন্তু—কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"আমি শুনেছি তোমরা কয়েক মিলিয়ন পর্যন্ত বলে যেতে পার।"

"ভুল শুনেছ। আমরা পারি না।" এনরয়েডটি রুখকে ছোট একটা ধাক্কা দিয়ে বলল, "টেবিলটাতে শুয়ে পড়।"

রুখ টেবিলটাতে শুয়ে পড়ে এনরয়েডটার দিকে তাকাল, সেটি উপর থেকে কিছু যন্ত্র নিচে টেনে নামাতে থাকে। রুখের বুকের উপর চতুষ্কোণ এবং মসৃণ একটি মনিটর বসিয়ে এনরয়েডটি বলল, "তুমি এখন জোরে জোরে নিশ্বাস নাও।"

রুখ কয়েকবার জোরে জোরে নিশ্বাস নেয়, সাথে সাথে আশপাশে কয়েকটা যন্ত্রের ভেতর থেকে নিচু কম্পনের কিছু ভোঁতা শব্দ শুনতে পায়। এনরয়েডটি হেলমেটের মতো দেখতে একটি গোলাকার জিনিস তার মাথার মাঝে লাগাতে থাকে। রুখ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে এনরয়েডটি লক্ষ করতে করতে বলল, "তুমি কী করছ?"

"মানুষের বসতি থেকে কেউ এলে তাদের পরীক্ষা করতে হয়। জিনেটিক মিউটেশান কী পর্যায়ে আছে সেটি লক্ষ রাখতে হয়। এগুলো রুটিন কাজ, তোমার ভয় পাবার কিছু নেই।"

"আমি—আমি আসলে ঠিক ভয় পাচ্ছি না—"

"পাচ্ছ। আমি জানি তোমার শরীরের সমস্ত অনুভূতি আমার সামনে মনিটরে দেখানো হচ্ছে। আমার কাছ থেকে তোমার ভয় পাবার কিছু নেই। আমি তোমার মতো একজন।"

"আমার মতো?"

AMARBOI.COM

"হ্যাঁ আমার বুদ্ধিমত্তা মানুষের সমান। নিনীষ স্কেলে আট।"

"তুমি—তুমি এখানে কী করছ? আমি ভেবেছিলাম নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রে সব এনরয়েড আমাদের থেকে বুদ্ধিমান।"

"না সবাই নয়। রুটিন কাজ করার জন্যে আমাদের মতো অনেকে আছে। এখন কথা বোলো না, তোমার প্রিয় কোনো জিনিস নিয়ে চিন্তা করতে থাক।"

"কেন?"

"তোমার মস্তিষ্ক স্ক্যান করা হচ্ছে।"

"মস্তিষ্ক কীভাবে স্ক্যান করে?"

"খুব সোজা। কিছু ইলেকট্রড তোমার করোটিকে স্পর্শ করে। উচ্চ কম্পনের বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ সেই ইলেকট্রড দিয়ে তোমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করে তার প্রতিফলিত আবেশ রেকর্ড করা হয়।"

"কী লাভ তাতে?"

"সেই স্ক্যান দেখে তোমার সম্পর্কে সবকিছু জানা যাবে। তুমি কী জান, তুমি কীভাবে চিন্তা কর সবকিছু।"

"কিন্তু সেটা কীভাবে সম্ভব?"

"তোমার কিংবা আমার জন্য সেটা সম্ভব নয়। কিন্তু যাদের বুদ্ধিমত্তা নিনীষ স্কেলে দুই মাত্রা উপরে তারা পারে। কাজেই তুমি কথা না বলে চুপ করে শুয়ে থাক। সুন্দর কিছু একটা ভাব।"

রুখ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে এনরয়েডটির দিকে তাকিয়ে রইল, একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বলল, "তুমি সত্যি বলছ?"

"হ্যাঁ। আমি মিথ্যা বলতে পারি না।"

"এই যারা বুদ্ধিমান এনরয়েড, তারা—মানে—তারা কী রকম?"

"তারা অসম্ভব বুদ্ধিমান। সত্যি কথা বলতে কী তুমি কিংবা আমি সেটা কল্পনা করতে পারব না। তুমি নিজেই দেখবে।"

"আমার কি কোনো বিপদ হতে পারে?"

এনরয়েডটা কোনো কথা না বলে চুপ করে রইল। রুখ ভয়-পাওয়া গলায় বলল, "কী হল? কথা বলছ না কেন?"

"বিপদ?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি যদি স্বাভাবিক একজন মানুষ হও—তোমার চিন্তা-ভাবনা যদি খুব সাধারণ হয়, তোমার কোনো বিপদ নেই। কিন্তু যদি তোমার মাঝে কোনো অস্বাভাবিকতা থাকে তারা তোমাকে নিয়ে কৌতূহলী হতে পারে।"

"কৌতূহলী হলে তারা কী করে?"

"তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। শেষবার একজনের মস্তিষ্ক খুলে দেখেছিল।"

রুখ আতঙ্কে শিউরে উঠল, বলল, "কী বলছ? এটা তো নিষ্ঠুরতা!"

"আমি যদি তোমার মস্তিষ্ক খুলে নিই সেটা হবে নিষ্ঠুরতা। বুদ্ধিমত্তায় যারা অনেক উপরে তাদের জন্যে এটা নিষ্ঠুরতা নয়। তুমি কি ল্যাবরেটরিতে ইঁদুর কেটে দেখ নি? সেটা কি নিষ্ঠুরতা ছিল?"

"কিন্তু—"

"আর কথা নয়। চুপ করে শুয়ে থাক কিছুক্ষণ। তোমার প্রিয় কোনো জিনিসের কথা ভাব।"

রুখের ক্রীনার কথা মনে পড়ল। তার কান, চোখ, কোমল ত্বক। সতেজ দেহ। তার নরম কণ্ঠস্বর। রুখ চোখ বন্ধ করে ক্রীনাকে দেখতে চাইল কিন্তু একটু পর পর তার মনোযোগ ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল—বুকের ভিতর এক অজানা আশঙ্কা কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

রুখ যে-ঘরটির ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সেটা বিশাল এবং গোলাকার। ঘরের দেয়াল ঈষৎ আলোকিত এবং অর্ধস্বচ্ছ কিন্তু দেয়ালের অন্যপাশে কী আছে সেটা দেখার কোনো উপায় নেই। রুখ দেয়ালের দিকে এগিয়ে গিয়ে আবিষ্কার করেছে দেয়ালটি তার কাছ থেকে সরে যাচ্ছে। সম্ভবত তাকে ঘিরে কোনো দেয়াল নেই, সম্ভবত সে ছোট একটা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে এবং সে হাঁটলে প্ল্যাটফর্মটি উলটোদিকে সরতে থাকে, কাজেই সে আসলে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে নড়তে পারে না। হয়তো আসলে এখানে কোনো ঘর নেই, পুরো ব্যাপারটি এক ধরনের দৃষ্টিবিভ্রম। হয়তো সে আসলে একটা ছোট অর্ধগোলকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে, যার বাইরে থেকে কিছু বুদ্ধিমান এনরয়েড তাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। কেউ তাকে লক্ষ করছে। অনুভূতিটি এত তীব্র যে রুখের মনে হতে থাকে অনেকে যেন নিচু গলায় কথা বলছে। রুখ তার সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে কথা শোনার চেষ্টা করে। একটি-দুটি কথা সে শুনতে পায় কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে না।

রুখ যখন কথা শোনার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিচ্ছিল তখন কে যেন খুব কাছে থেকে বলল, "মানব-সদস্য।"

রুখ চমকে উঠল, "কে?"

"আমি।"

"আমি কে?"

"তুমি আমাকে চিনবে না।"

"আপনি কি বুদ্ধিমান এনরয়েড?"

কে যেন নিচু গলায় হাসল, বলল, "বুদ্ধিমত্তা অত্যন্ত আপেক্ষিক ব্যাপার।"

"কিন্তু বুদ্ধিমত্তার একটি পরিমাপ তৈরি হয়েছে। সেই পরিমাপ অনুযায়ী আপনি সম্ভবত মানুষ থেকে বুদ্ধিমান।"

"সম্ভবত।"

"আমি মানুষ থেকে বুদ্ধিমান কোনো অস্তিত্ব কখনো দেখি নি। আমি কি আপনাকে দেখতে পারি?"

"মানুষ বুদ্ধিমত্তার যে পর্যায়ে আছে সেখানে তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য আকৃতির একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞা আছে। তুমি সম্ভবত আমার আকৃতিকে গ্রহণ করতে পারবে না।"

"আমি—আমি তবু একবার দেখতে চাইছিলাম।"

"ঠিক আছে।"

খুব ধীরে ধীরে অর্ধগোলাকৃতির ঘরটির বাইরে আলোকিত হয়ে গেল এবং রুখ দেখতে পেল তার খুব কাছাকাছি একটি কদাকার এনরয়েড দাঁড়িয়ে আছে। এনরয়েডটি দেখতে অস্পষ্ট ভ্রূণের মতো, মানুষের অনুকরণে তৈরি ছোট একটি দেহের উপরে একটি বড় মাথা।

AMARBOI.COM

মাথার ভিতর থেকে অনেকগুলি ছোট ছোট নল বের হয়ে শরীরের নানা জায়গায় প্রবেশ করেছে। মাথার ভিতরে শক্তিশালী কপোট্রনটিকে শীতল করার জন্য নিশ্চয়ই সেখানে কোনো ধরনের তরল প্রবাহিত হচ্ছে। এনরয়েডটির দুটি হাত, হাতের প্রান্তে আঙুলের মতো সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি। যে দুটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে সেগুলো শক্তিশালী এবং জটিল। এনরয়েডটির মাথার কাছে দুটি চোখ, রুখ সেদিকে তাকিয়ে শিউরে ওঠে, সেখানে এক ধরনের অমানুষিক দৃষ্টি। এনরয়েডটি নিচু গলায় বলল, "আমি বলেছিলাম তুমি আমার আকৃতিকে গ্রহণ করতে পারবে না। আমার হিসাব অনুযায়ী তুমি আমাকে কদাকার এবং কুৎসিত মনে করছ।"

"না—মানে—"

"তাতে কিছু আসে-যায় না। প্রাণিজগতে অক্টোপাসকে বুদ্ধিমান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অক্টোপাস যদি বিবর্তনে বুদ্ধিমান প্রাণী হিসেবে গড়ে উঠত তারা সম্ভবত মানুষকে অত্যন্ত কুৎসিত প্রাণী হিসেবে বিবেচনা করত।"

"আপনি ঠিকই বলেছেন মহামান্য—"

"আমার কোনো নাম নেই।"

"আপনি যদি অনুমতি দেন আমি আপনাকে কি একটা প্রশ্ন করতে পারি?"

"কর।"

"আপনাদের দেহের আকৃতি মানুষের কাছাকাছি। পুরোপুরি মানুষের আকৃতি না নিয়ে তার কাছাকাছি কেন?"

"মানুষের আকৃতির যে সকল বিষয় উন্নত শুধু সেগুলো গ্রহণ করা হয়েছে।"

"মহামান্য এনরয়েড, আপনার ভিতরে কি মানুষের অনুভূতি আছে?"

"হ্যাঁ। আছে। অনেক তীব্রভাবে আছে।"

"আপনার ভিতরে কি ক্রোধ, ঘৃণা বা হিংসা আছে?"

"হ্যাঁ আছে।"

"আমি ভেবেছিলাম বুদ্ধিমত্তা যখন বিকশিত হয় তখন মানুষের নিচু প্রবৃত্তিগুলো লোপ পায়।"

এনরয়েডটি হঠাৎ হাসির মতো শব্দ করল, বলল, "প্রবৃত্তি কখনো নিচু কিংবা উঁচু হয় না। অস্তিত্বের জন্য প্রবৃত্তির প্রয়োজন আছে।"

"মহামান্য এনরয়েড, নিচু শ্রেণীর প্রাণীর তুলনায় আমাদের মাঝে অনুভূতি অনেক বেশি। সেরকমভাবে আমাদের তুলনায় আপনার মাঝেও কি অনুভূতি বেশি? যে অনুভূতি আমাদের নেই সেরকম কিছু কি আপনাদের আছে?

"হ্যাঁ। আছে।"

"সেটি কী রকম মহামান্য এনরয়েড?"

"আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না। তবে তুমি যদি আমার চোখের দিকে তাকাও তা হলে সেই অনুভূতিটির একটু তোমাকে অনুভব করাতে পারি। তুমি কি চাও?"

রুখ ভয়ে ভয়ে বলল, "আমি চাই মহামান্য এনরয়েড।"

"তা হলে আমার কাছে এস। আমার চোখের দিকে তাকাও।"

রুখ এক পা এগিয়ে এনরয়েডটির দিকে তাকাল। এনরয়েডটির চোখের গভীরে হঠাৎ একটি বিশাল শূন্যতা উঁকি দিতে শুরু করে। হঠাৎ রুখ এক ভয়াবহ আতঙ্কে চিৎকার করে দুই হাতে নিজের চোখ ঢেকে ফেলে। সে হাঁটু ভেঙে নিচে পড়ে যায়, তার সারা শরীর অনিয়ন্ত্রিতভাবে থরথর করে কাঁপতে থাকে।

AMARBOI.COM

"মানব-সদস্য" এনরয়েডটি নরম গলায় বলল, "তুমি সম্ভবত এখনো এই অনুভূতির সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হও নি।"

রুখ কোনোমতে নিজের পায়ের উপর উঠে দাঁড়াল। দুই হাতে মুখ ঢেকে বড় বড় নিশ্বাস নিতে নিতে বলল, "না, হই নি। এ ধরনের ভয়ঙ্কর শূন্যতার অনুভূতি আমাদের নেই।"

"আমরা এটিকে বলি বিস্থিতি। যখন স্থিতি হতে ইচ্ছে করে না সেটি হচ্ছে বিস্থিতি।"

"কী আশ্চর্য! এবং কী ভয়ঙ্কর!"

"মানব-সদস্য—"

"মহামান্য এনরয়েড, আমার নাম রুখ।"

"আমি জানি। তোমার সাথে পরিচয়পর্ব শেষ হয়েছে, আমরা কি এখন কাজ শুরু করতে পারি?"

রুখ হঠাৎ করে নিজের ভিতরে এক ধরনের আতঙ্ক অনুভব করতে থাকে। সে দুর্বলভাবে মাথা নাড়ল, বলল, "পারেন মহামান্য এনরয়েড।"

"তোমার মস্তিষ্কের স্ক্যানটি আমি দেখেছি। সেখানে কিছু দুর্বোধ্য তথ্য রয়েছে।"

"দুর্বোধ্য?"

"হ্যাঁ। দুর্বোধ্য এবং কৌতূহলী। তোমার ধারণা মেতসিসে মানুষের উপস্থিতির প্রয়োজন আছে। তুমি কেন এই ধারণা পোষণ কর?"

"মহামান্য এনরয়েড—পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব নেই। মেতসিসে পাঠানোর জন্য যদি মানুষের জিনস থেকে তাদেরকে নতুন করে সৃষ্টি করা না হত তা হলে আমাদের জন্ম হত না। আমাদের ইচ্ছে অনুযায়ী আমরা এখানে আসি নি, এখানে আপনারা আমাদের এনেছেন।"

"হ্যাঁ। কিন্তু তোমরা এখানে বাহুল্য। তোমরা মেতসিসের জন্য একটি বিশাল সমস্যা। আমরা প্রায়ই মেতসিসের জৈবজগৎটি অবলুপ্ত করে দেওয়ার কথা ভাবি। তোমরা এখানে পুরোপুরি আমাদের করুণার উপরে বেঁচে আছ। কিন্তু তোমার মস্তিষ্ক স্ক্যান করে আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি জিনিস দেখতে পেয়েছি।"

রুখ শুকনো গলায় বলল, "কী দেখতে পেয়েছেন মহামান্য এনরয়েড?"

"দেখতে পেয়েছি তুমি বিশ্বাস কর মেতসিসে মানুষ না থাকলে তার উদ্দেশ্য অসম্পূর্ণ হত।"

রুখ দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে মাথা তুলে তাকাল। বলল, "মহামান্য এনরয়েড, আপনি বলেছেন আপনাদের মানুষের মতো ক্রোধ এবং ঘৃণা রয়েছে। আমার কথা শুনে সম্ভবত আপনার মাঝে ক্রোধের সৃষ্টি হবে। আপনাদের অনুভূতি অত্যন্ত তীব্র—হয়তো সেই ক্রোধ আমার ভয়ঙ্কর পরিণতি ডেকে আনবে। সেই কথা চিন্তা করে আমি অত্যন্ত ভীত মহামান্য এনরয়েড।"

"আমি জানি। কিন্তু আমার কিছু করার নেই। বুদ্ধিমত্তায় অত্যন্ত নিচু স্তরের অস্তিত্বের জন্য আমরা কখনো সমবেদনা অনুভব করতে পারি না। তোমাদের অস্তিত্বের আমার কাছে কোনো মূল্য নেই। প্রয়োজনে কিংবা অপ্রয়োজনে আমি তোমাদের সৃষ্টি করতে পারি কিংবা ধ্বংস করতে পারি।"

রুখ কদাকার এনরয়েডটির দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল, মাথা নিচু করে বলল, "আপনার কাছে আমার লুকানোর কিছু নেই। আপনি জানেন আমি কেন মেতসিসে মানুষের অস্তিত্বকে প্রয়োজনীয় মনে করি।"

"তুমি মনে কর আমাদের বুদ্ধিমত্তার উন্নতি খুব দ্রুত হচ্ছে, তার পরিণতি কী হবে জানা নেই।"

"হ্যাঁ মহামান্য এনরয়েড। সেই তুলনায় মানুষের উন্নতি হয়েছে অত্যন্ত ধীর গতিতে। বিবর্তন পরীক্ষিত একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে কোনো ঝুঁকি নেই। মেতসিস কোথায় পৌঁছাবে আমরা জানি না—কিন্তু মানুষকে এখানে রাখা হলে তারা তাদের বুদ্ধিমত্তা সেখানে পৌঁছে দেবে।"

বুদ্ধিমান এনরয়েডটি হঠাৎ খলখল করে হেসে উঠল, হাসতে হাসতে বলল, "তোমার জন্য আমার করুণা হচ্ছে মানব-সন্তান।"

রুখ আতঙ্কে শিউরে উঠে বলল, "কেন মহামান্য এনরয়েড?"

"তোমার বিশ্বাস যে কত ভিত্তিহীন সেটা তুমি জান না।"

"কেন আপনি এটা বলছেন মহামান্য এনরয়েড। মানুষ যে-বিবর্তনের মাঝ দিয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে সেটি তো ভিত্তিহীন তথ্য নয়।"

"কিন্তু মেতসিসে তোমরা বিবর্তনের মাঝ দিয়ে যাবে সেটি সত্য নয়।"

"আপনি কী বলছেন আমি বুঝতে পারছি না।"

"তুমি আমার সাথে এস। আমি তোমাকে একটি জিনিস দেখাই। তবে—"

"তবে কী?"

"তুমি যে জিনিসটি দেখবে সেটি তুমি অন্য মানব-সদস্যকে বলতে পারবে না।"

রুখের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে, সে কাঁপা গলায় বলল, "আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"তুমি যেন বলতে না পার সে জন্য আমি তোমার অস্তিত্বকে ধ্বংস করে দেব।"

"না।" রুখ কাতর গলায় বলল, "না, তা হলে আমি দেখতে চাই না।"

"তোমাকে দেখতে হবে।" এনরয়েডটি অত্যন্ত কঠোর গলায় বলল, "স্বল্প বুদ্ধিমত্তার প্রাণীদের জন্য অহঙ্কার অত্যন্ত বিপজ্জনক।"

রুখ অনুনয় করে বলল, "মহামান্য এনরয়েড, আমি আপনার কাছে আমার প্রাণ ভিক্ষা চাইছি।"

"আমি তোমাকে বলেছি মানব-সদস্য। নির্বোধ প্রাণীদের জন্য আমাদের ভিতরে কোনো সমবেদনা নেই। তুমি কি কখনো অবলীলায় নিচু স্তরের প্রাণী হত্যা কর নি? করেছ। আমরাও করি। এস।"

৫

মেতসিসের মূল নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রটি বিশাল, সেখানে বুদ্ধিমান এনরয়েডরা থাকে বলে পুরো এলাকাটি সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে গড়ে উঠেছে। নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রে যাতায়াতের জন্য বিশাল করিডোর রয়েছে, এই সকল করিডোরে চৌম্বক-ক্ষেত্র ব্যবহার করে ভাসমান অবস্থায় বুদ্ধিমান এনরয়েড কিংবা তাদের যন্ত্রপাতিগুলো আসা-যাওয়া করছে। রুখ অনুমান করল করিডোরের নিচে সম্ভবত সুপার কন্ডাক্টিং কয়েল রয়েছে, তাপ-নিরোধক ব্যবস্থা থাকার পরও সুপার কন্ডাক্টরগুলো পুরো করিডোরকে হিমশীতল করে রেখেছে। রুখ একটি ভাসমান প্ল্যাটফর্ম

করে বুদ্ধিমান এনরয়েডটার সাথে সাথে মূল নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রের গভীরে এসে উপস্থিত হয়েছে। এই এলাকায় মানুষ সম্ভবত কখনোই আসে না, কোথাও খুব ঠাণ্ডা আবার কোথাও উষ্ণ। বাতাসের চাপেরও তারতম্য রয়েছে বলে মনে হল।

নানা করিডোর ধরে এগিয়ে গিয়ে বুদ্ধিমান এনরয়েডটি রুখকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত একটি বিশাল হলঘরের মতো জায়গায় হাজির হল। বোতাম চেপে ভারী দরজাটি সরিয়ে রুখ ভিতরে ঢুকে হঠাৎ করে আতঙ্কে শিউরে ওঠে। ভিতরে যতদূর দেখা যায় মানুষের দেহ। হিমশীতল ঘরটিতে হালকা নীল আলোতে সারি সারি মানুষের দেহগুলো দেখে রুখের প্রথমে মনে হল এগুলো মৃতদেহ। কিন্তু একটু ভালো করে তাকিয়েই বুঝতে পারল মানুষগুলো জীবন্ত, নিশ্বাসের সাথে সাথে তাদের বুক ওঠা-নামা করছে। হঠাৎ করে দেখলে মনে হয় মানুষগুলো শূন্যে ভেসে আছে কিন্তু একটু ভালো করে দেখলেই টাইটেনিয়ামের সূক্ষ্ম তার, শিরায় প্রবাহিত পুষ্টিকর তরলের টিউব এবং অক্সিজেনের প্রবাহ চোখে পড়ে। মানুষগুলো পুরোপুরি নগ্ন এবং ঘুমন্ত। শূন্যে ঝুলে থাকা এই মানুষগুলোর মাঝে অল্প কয়েকজন শিশু এবং কিশোর-কিশোরী, তবে বেশিরভাগই তরুণ-তরুণী।

রুখ কিছুক্ষণ নিশ্বাস বন্ধ করে থেকে ভয়-পাওয়া-গলায় বলল, "এরা কারা?"

"এনরয়েডটি একটু রহস্যের মতো ভঙ্গি করে বলল, "তুমিই বল।"

"আমি? আমি কেমন করে বলব?"

"তুমি পারবে। যাও, মানুষগুলোকে ভালো করে দেখে আস। চতুর্থ সারির তৃতীয় মানুষটি দেখ। সপ্তম সারির শেষ মানুষটিও দেখ। যাও।"

রুখ হতচকিত হয়ে ঘুমন্ত মানুষগুলোর মাঝে দিয়ে হেঁটে যেতে থাকে, তার মনে হতে থাকে হঠাৎ করে বুঝি কেউ জেগে উঠে তার দিকে অবাক হয়ে তাকাবে। কিন্তু কেউ জেগে উঠল না, নিশ্বাসের সাথে খুব হালকাভাবে বুকে ওঠা-নামা করা ছাড়া তাদের মাঝে জীবনের আর কোনো চিহ্ন নেই।

চতুর্থ সারির তৃতীয় মানুষটি একজন তরুণী। ঘুমন্ত একজনের নগ্ন দেহের দিকে তাকাতে রুখের সংকোচ হল কিন্তু মানুষটির মুখের দিকে তাকিয়ে সে আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে। তরুণীটি ক্রীনা।

রুখ কয়েক মুহূর্তে হতবাক হয়ে ক্রীনার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে হঠাৎ করে অনেক কিছু তার কাছে স্পষ্ট হয়ে আসে। সে পাশের ঘুমন্ত মানুষটির দিকে তাকাল, এই মানুষটিও সে চেনে, মানুষের বসতিতে সে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ করে। ওপরে যে ঝুলে রয়েছে সে কমিউনির তথ্যকেন্দ্র-পরিচালক। পাশের সারিতে রুহান শান্ত চোখে ঘুমিয়ে আছে। সপ্তম সারির শেষ মানুষটি কে হবে সেটাও রুখ হঠাৎ করে বুঝে গেল, তবুও সে হেঁটে গেল নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য। রুখ অবাক হয়ে দেখল মানুষটি সে নিজে। টাইটেনিয়ামের সূক্ষ্ম তার দিয়ে তাকে ওপর থেকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। নাকের মাঝে সূক্ষ্ম অক্সিজেনের টিউব। হাতের শিরায় সূক্ষ্ম টিউবে করে পুষ্টিকর তরল প্রবাহিত হচ্ছে। মাথার মাঝে থেকে কিছু ইলেকট্রড বের হয়ে এসেছে।

রুখ কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে নিজের দিকে তাকিয়ে রইল তারপর ক্লান্ত পায়ে বুদ্ধিমান এনরয়েডটির কাছে ফিরে এল। এনরয়েডটি হালকা গলায় বলল, "তুমি নিশ্চয় এখন জান এরা কারা।"

রুখ মাথা নাড়ল, "জানি।"

"তুমি নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ কেন এদেরকে এখানে রাখা হয়েছে?"

"হ্যাঁ পারছি।"

"তুমি কি এখনো বিশ্বাস কর মেতসিসে মানুষের বিবর্তন হবে?"

রুখ মাথা নাড়ল, "না।"

বুদ্ধিমান এনরয়েডটি খলখল করে হেসে উঠল, বলল, "জৈবিক পদ্ধতি আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তোমরা নতুন মানুষের জন্ম দেবে সেই মানুষ মেতসিসে জৈবজগতের দায়িত্ব নেবে আমরা সেই ঝুঁকি নিতে পারি না। তাই মানুষের এক দল তার দায়িত্ব শেষ করার পর তাদের আমরা অপসারণ করে ফেলি, নতুন একটি দল এসে তার দায়িত্ব নেয়।"

"পুরোনো দলকে তোমরা কীভাবে অপসারণ কর?"

"বাতাসের প্রবাহে সঠিক পরিমাণ কার্বন মনোঅক্সাইড মিশিয়ে দিয়ে। তুমি জান মানুষ অত্যন্ত দুর্বল প্রাণী, তাদের হত্যা করা খুব সহজ।"

"মেতসিসে আমাদের মতো কয়টি দল এসেছে?"

"আজ থেকে সাড়ে সাত শ বছর আগে মেতসিস এই গ্যালাক্সির কেন্দ্রের দিকে যাত্রা শুরু করেছে। প্রতি পনের বছরে আমরা একবার করে তোমাদের নতুন করে সৃষ্টি করেছি।"

"তার মানে এর আগে পঞ্চাশবার আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে?"

"হ্যাঁ। পঞ্চাশবার সৃষ্টি করে পঞ্চাশবার ধ্বংস করা হয়েছে।"

"যখন এদের নতুন করে সৃষ্টি করা হয় তখন এদের স্মৃতিতে কী থাকে?"

"তুমি জান কী থাকে। তোমাকেও একদিন সৃষ্টি করা হয়েছিল।"

রুখ হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠল—তার শৈশব তার কৈশোর তার যৌবনের সকল স্মৃতি আসলে মিথ্যা? আসলে এইভাবে তার শীতল দেহকে ধীরে ধীরে বড় করা হয়েছে? এইভাবে তার মস্তিষ্কে মিথ্যা কাল্পনিক একটা স্মৃতি প্রবেশ করানো হয়েছে? মায়ের কোলে বসে বসে সে বাইরে তাকিয়ে আছে, মা মিষ্টি সুরে গান গাইছে—সব মিথ্যা?

রুখ একটি নিশ্বাস ফেলল, হঠাৎ করে তার কাছে তার পুরো জীবন, এই মহাকাশযান, তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কদাকার এনরয়েড, বিশাল হলঘরে সারি সারি ঝুলে থাকা মানুষের দেহ সবকিছুকে কেমন জানি অর্থহীন বলে মনে হতে থাকে।

"মানব-সদস্য" এনরয়েডটি রুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি খুব বেশি জেনে গিয়েছ।"

"আমি জানতে চাই নি।"

"কিন্তু তুমি জেনেছ। এই তথ্য নিয়ে তুমি মানববসতিতে ফিরে যেতে পারবে না।"

রুখ অন্যমনস্কভাবে এনরয়েডটির দিকে তাকাল, তাকে এখন মেরে ফেলা হবে ব্যাপারটিও কেন জানি আর সেরকম গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে না।

"মানব-সদস্য—আমি যতদূর জানি মৃত্যুকে তোমরা খুব ভয় পাও।"

"পাই।"

"তোমার স্মৃতিতে ক্রীনা নামের একটি মেয়ের রূপ অনেকবার এসেছে।"

রুখ কোনো কথা না বলে কদাকার এনরয়েডটির দিকে তাকাল। এনরয়েডটি হাসির মতো শব্দ করে বলল, "তোমার মৃত্যুর খবরে সে নিশ্চয়ই খুব বিচলিত হবে।"

রুখ এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে এনরয়েডটির দিকে তাকিয়ে রইল, মানুষ থেকে বুদ্ধিমত্তায় অনেক উন্নত হলেই কি তাদেরকে মানুষ থেকে অনেক বেশি নিষ্ঠুর হতে হবে?

"তোমার মৃত্যুর খবরে তার মস্তিষ্কে কী ধরনের চাঞ্চল্য হয় দেখার একটু কৌতূহল হচ্ছে। সত্যি কথা বলতে কী যদি সুযোগ থাকত আমি ক্রীনাকে এনে তার সামনে তোমাকে হত্যা করতাম—"

হঠাৎ করে রুখের মনে হল তার মস্তিষ্কে একটি বিস্ফোরণ ঘটেছে। সে হিংস্র চোখে এনরয়েডটির দিকে তাকাল, দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, "মহামান্য এনরয়েড, আপনি সম্ভবত বুদ্ধিমত্তায় আমার থেকে দুই মাত্রা উপরে কিন্তু আপনার কৌতূহলটুকু আমার কাছে দুই মাত্রা নিচের এক ধরনের অসুস্থতা বলে মনে হচ্ছে।"

এনরয়েডটি রুখের দিকে ঘুরে তাকাল, কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে এক ধরনের শীতল কণ্ঠে বলল, "মানব-সদস্য, তুমি নিশ্চয়ই তোমার অবস্থানটুকু জান। আমি তোমার চোখের রেটিনার দিকে তাকিয়ে তোমার মস্তিষ্কের সকল নিউরনকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারি!"

রুখ হঠাৎ চিৎকার করে বলল, "আমি কি সেটাকে ভয় পাই?"

"পাও না?"

"না। বুদ্ধিমত্তার কোন স্তরে কে থাকে তাতে কিছু আসে-যায় না, যার বুকের ভিতরে কোনো ভালবাসা নেই তার সাথে দানবের কোনো পার্থক্য নেই। মানুষ দানবকে ঘেন্না করে, ভয় পায় না।"

"আহাম্মক!" এনরয়েডটি চিৎকার করে বলল, "তোমার মতো শত শত মানুষকে আমরা কীটপতঙ্গের মতো পিষে ফেলি—"

হঠাৎ করে রুখ নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল। মাথা ঘুরিয়ে দেয়ালের সাথে লাগানো একটি টাইটেনিয়াম রড হ্যাচকা টানে খুলে নেয়। তারপর দুই হাতে ধরে সে এনরয়েডটির দিকে এগিয়ে গেল। দাঁতে দাঁত ঘষে হিংস্র গলায় বলল, "মানুষকে হত্যা করতে চাইলে করতে পার—কিন্তু তাকে তার প্রয়োজনীয় সম্মানটুকু দিতে হবে।"

এনরয়েডটি এক পা পিছিয়ে বলল, "খবরদার!" তার শরীর থেকে হঠাৎ তীব্র অবলাল রশ্মি এসে রুখকে আঘাত করল—রুখ প্রচণ্ড যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠে অন্ধ আক্রোশে হাতের রডটি দিয়ে এনরয়েডটির মাথায় আঘাত করল। এনরয়েডটি সরে যাওয়ায় আঘাতটি লাগল মাথা থেকে বের হয়ে আসা একটি টিউবে। হঠাৎ করে টিউবটি মাথা থেকে খুলে আসে এবং তার ভেতর থেকে গলগল করে আঠালো সবুজ রঙের এক ধরনের তরল বের হতে থাকে। ঝাঁজালো গন্ধে হঠাৎ ঘরটা ভরে গেল।

এনরয়েডটি আর্তচিৎকার করে বলল, "আমার তরল! আমার কপোট্রন শীতলকারী তরল!"

রুখ হতচকিত হয়ে এনরয়েডটির দিকে তাকিয়ে থাকে। সে রাগে অন্ধ হয়ে এনরয়েডটিকে আঘাত করেছে সত্যি কিন্তু তার আঘাত যে সত্যি সত্যি মানুষের থেকে দুই মাত্রা বেশি বুদ্ধিমান একটি যন্ত্রের কোনো ক্ষতি করতে পারবে সেটি সে একবারও বিশ্বাস করে নি। এনরয়েডটি একবার দুলে উঠে পড়ে যেতে যেতে সেটি কোনোভাবে নিজেকে সামলে নেয়। এনরয়েডটির মাথার একটি অংশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, সেখান থেকে ধোঁয়া বের হতে শুরু করে। উত্তপ্ত অংশটি হঠাৎ গনগনে লাল হয়ে ওঠে এবং এনরয়েডটি দুই হাতে নিজের মাথা চেপে ধরে আর্তচিৎকার করে ওঠে, "আমার স্মৃতি—আমার স্মৃতি—আহা-হা-হা-আমার স্মৃতি—"

রুখ হতচকিত হয়ে তাকিয়ে রইল এবং হঠাৎ করে এনরয়েডটির পুরো মাথাটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। মাথার অংশটি থেকে কিছু পোড়া টিউব, তার এবং ফাইবার বের হয়ে ঝুলে থাকে, ফিনকি দিয়ে থিকথিকে এক ধরনের তরল বের হতে থাকে এবং এনরয়েডটির দুটি অপুষ্ট হাত কিলবিল করে নড়তে থাকে। সমস্ত ঘরটি এক ধরনের বিষাক্ত গন্ধে ভরে যায় এবং দূরে কোথাও তারস্বরে এলার্ম বাজতে শুরু করে। পুরো দৃশ্যটিকে রুখের কাছে একটি অতিপ্রাকৃতিক দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়।

কয়েক মুহূর্তের মাঝে ঘরটির মাঝে অসংখ্য রোবট এবং এনরয়েড এসে হাজির হল। যান্ত্রিক রোবটগুলো বিধ্বস্ত এনরয়েডকে সরিয়ে নিয়ে যায়, বিশেষ নিরাপত্তা রোবট ঘরটিকে পরিশোধন করতে থাকে। নিরাপত্তা রোবট রুখের খুব কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়, দেখে বোঝা না গেলেও এই রোবটগুলো নিশ্চয় সশস্ত্র, হাতে ধরে রাখা টাইটেনিয়াম রডটি একটু নাড়ালেই সম্ভবত তাকে বাষ্পীভূত করে ফেলবে।

"মানব-সদস্য" রুখের সামনে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বুদ্ধিমান এনরয়েড বলল, "তুমি তোমার হাতে ধরে রাখা টাইটেনিয়াম রডটি নিচে ফেলে দাও।"

"কেন?"

"তুমি সম্ভবত এর আঘাতে আমাদের অন্য কোনো একজনকে বিধ্বস্ত করতে পারবে— যদিও সেটি সেরকম গুরুত্বপূর্ণ নয় কারণ আমাদের সকলের সকল স্মৃতি মূল তথ্যকেন্দ্রে সংরক্ষিত থাকে এবং আমরা কিছুক্ষণের মাঝেই নিজেদের পুনর্বিন্যাস করতে পারি।"

"তার মানে—তার মানে—"

"না। মানুষকে হত্যা করার মতো এটি অপরিবর্তনীয় ঘটনা নয়। কিন্তু তবুও সে ধরনের কাজে আমরা উৎসাহ দিই না। বিশেষ করে তোমার ঠিক পিছনে যে নিরাপত্তা রোবট দাঁড়িয়ে আছে সেটি অত্যন্ত ক্ষিপ্র। তোমার যে কোনো ধরনের নড়াচড়াকে সেটি বিপজ্জনক মনে করে তোমাকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিতে পারে।"

রুখ একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "কিন্তু আমাকে তো মেরেই ফেলবে। মানুষ কখনো মুখ বুজে অবিচার সহ্য করে না। শেষমুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করে। আমি এই টাইটেনিয়াম রডটি ফেলব না। কেউ আমার কাছে এলে এক আঘাতে—"

বুদ্ধিমান এনরয়েডটি হঠাৎ হাসির মতো শব্দ করে বলল, "তোমাদের কিছু কিছু মানবিক অনুভূতি অত্যন্ত ছেলেমানুষি। কাছে না এসেই তোমাদের ধ্বংস করে দেওয়া যায়। তুমি কী চাও?"

"আমি মানুষের বসতিতে ফিরে যেতে চাই।"

"ঠিক আছে তুমি ফিরে যাবে।"

রুখ থতমত খেয়ে বলল, "আমি জীবিত অবস্থায় ফিরে যেতে চাই।"

"ঠিক আছে তুমি জীবিত অবস্থায় ফিরে যাবে।"

রুখ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে বুদ্ধিমান এনরয়েডটির দিকে তাকিয়ে রইল—সেটি কি সত্যি কথা বলছে?

"হ্যাঁ, আমি সত্যি কথা বলছি। তোমাদের কাছে জীবন-মৃত্যু খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের কাছে নয়। তুমি বেঁচে থাকলে বা মারা গেলে আমাদের কিছু আসে-যায় না। সত্যি কথা বলতে কী তুমি যে ঘটনাটি ঘটিয়েছ আমি সেটা একটু বিশ্লেষণ করতে চাই। সে জন্য আমি তোমাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই। এর বেশি কিছু নয়।"

"কিন্তু—"

"হ্যাঁ।" রুখ কথাটি বলার আগেই এনরয়েড প্রতিবার তার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিচ্ছে, "এই ঘরের তথ্যটুকু তুমি নিতে পারবে না। তোমার স্মৃতি থেকে এই তথ্যটুকু আমরা মুছে দেব।"

"সেটি কি করা যায়? শুধুমাত্র একটি স্মৃতি—একটি বিশেষ স্মৃতি?"

"হ্যাঁ। করা যায়। তুমি তোমার হাত থেকে টাইটেনিয়াম রডটি ফেলে আমার দিকে এগিয়ে আস।"

AMARBOI.COM

রুখ বুদ্ধিমান এনরয়েডটির দিকে তাকাল, সেটি কি তার সাথে কোনো ধরনের প্রতারণা করার চেষ্টা করছে?

এনরয়েডটি আবার হেসে ফেলল, বলল, "না। আমি তোমার সাথে প্রতারণা করব না। বিশ্বাস কর তোমার সাথে সাধারণ কথাবার্তা চালিয়ে যেতেই আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আমার কথা যদি বিশ্বাস না কর মানববসতিতে ফিরে গিয়ে একটা পোষা প্রাণীর সাথে ভাব বিনিময়ের চেষ্টা করে দেখ। বুদ্ধিমত্তা একপর্যায়ের না হলে ভাব বিনিময় করা যায় না।"

রুখ হাত থেকে টাইটেনিয়াম রডটি ছুড়ে ফেলল। এনরয়েডটি বলল, "চমৎকার। এবারে তুমি আরেকটু কাছে এগিয়ে এস। তোমার চোখের দিকে তাকাতে হবে—তুমি নিশ্চয়ই জান রেটিনা আসলে মস্তিষ্কের একটা অংশ। মস্তিষ্কের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করার জন্য এটি সবচেয়ে সহজ উপায়।"

রুখ এনরয়েডটির কাছে এগিয়ে যায়, এনরয়েড তার চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুমি এই ঘরে কী দেখেছ মানব-সন্তান।"

"আমি দেখেছি মানববসতির সব মানুষকে তৈরি করে বড় করা হচ্ছে।"

"কেন?"

"আমরা যারা আছি তাদের যখন দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে তখন তাদের সবাইকে সরিয়ে দিয়ে—"

"তুমি কথা বলতে থাক।"

রুখ কথা বলতে থাকে কিন্তু তার অবচেতন মন হঠাৎ একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক খেলায় মেতে ওঠে। এই শীতল ঘরের তথ্যটি সে তার মস্তিষ্কে করে গোপনে নিয়ে যেতে চায়। কীভাবে নেবে সে জানে না, অন্য কোনো তথ্যের সাথে যদি মিশিয়ে দেওয়া যায়? যদি সে কল্পনা করে সে একটি শিশু সে তার মায়ের হাত ধরে ঘুরছে। মায়ের সাথে একটা বিশাল ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। দরজা ধাক্কা দিতেই সেই দরজা খুলে গেল, তার মা চিৎকার করে উঠল। রুখ ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে মা?"

AMARBOI.COM

মা বলল, "চোখ বন্ধ করে ফেল, রুখ। চোখ বন্ধ কর—"

"কেন মা? কী হয়েছে?"

"ভয় পাবি। তুই দেখলে ভয় পাবি।"

"কী দেখলে ভয় পাব?"

"মানুষ। শত শত মানুষকে ঝুলিয়ে রেখেছে।"

"কোন মানুষ এরা?"

"মানববসতির মানুষ।"

"মা, এরা কি মৃত?"

"না বাবা। এরা সব ঘুমিয়ে আছে।"

"কেন ঘুমিয়ে আছে?"

"জানি না। কিন্তু একদিন জেগে উঠবে—কিন্তু সেটি হবে খুব ভয়ঙ্কর—"

"কেন ভয়ঙ্কর মা? কেন?"

"আমি জানি না—জানি না—"

মা হঠাৎ আর্তচিৎকার করতে থাকে, রুখের চোখের সামনে সবকিছু অন্ধকার হয়ে আসে। জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ার আগের মুহূর্তে নিরাপত্তা রোবটটি তাকে ধরে ফেলল।

বুদ্ধিমান এনরয়েডটি খানিকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে রুখের অচেতন দেহের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "মানুষের বুদ্ধিমত্তা সম্ভবত যথার্থ নিরূপণ করা হয় নি।"

কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা অন্য একটি এনরয়েড বলল, "তুমি কেন এই কথা বলছ?"

"জানি না। আমার স্পষ্ট মনে হল এই মানুষটি—"

"এই মানুষটি?"

"এই মানুষটি আমাকে লুকিয়ে কিছু একটা জিনিস করল।"

"তোমাকে লুকিয়ে?"

"হ্যাঁ। যখন তার স্মৃতি মুছে ফেলছি তার নিউরনকে মুক্ত করছি তখন মনে হল অন্য কোথাও সে নিউরনকে উজ্জীবিত করছে—"

"সেটি কীভাবে সম্ভব?"

এনরয়েডটি হেসে ফেলল, বলল, "জানি না।"

৬

হলঘরটিতে মানুষের বসতির প্রায় সবই এসেছে। খাওয়ার পর আজকে বিশেষ পানীয় সরবরাহ করা হয়েছে, পানীয়তে কয়েক মাত্রা উত্তেজক এনজাইম ছিল তাই যারা উপস্থিত আছে তাদের সবাই হইচই করছে, অল্পতেই হেসে গড়াগড়ি খাচ্ছে বা আনন্দে চ্যাঁচামেচি করছে। হইচইয়ের মাত্রা যখন একটু বাড়াবাড়ি পর্যায়ে পৌঁছে গেল তখন রুহান তার পানীয়ের গ্লাস টেবিলে রেখে উঠে দাঁড়াল, সাধারণত এরকম পরিস্থিতিতে সবাই শান্ত হয়ে যায়, যিনি দাঁড়িয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন তার কী বলার আছে শোনার জন্য সবাই খানিকটা সময় দেয়। আজকে তার কোনো সম্ভাবনা দেখা গেল না। তাই রুহানকে টেবিলে কয়েকবার থাবা দিয়ে শব্দ করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হল, যখন হইচই একটু কমে এল তখন রুহান উচ্চৈঃস্বরে বলল, "প্রিয় মানববসতির সদস্যরা, সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা।"

AMARBOI.COM

এটি অত্যন্ত সাদামাঠা সম্ভাষণ কিন্তু উত্তেজক এনজাইমের কল্যাণে সবার কাছে এই সম্ভাষণটিকেই এত হৃদয়গ্রাহী মনে হল যে সবাই চিৎকার করে হাত নেড়ে প্রত্যুত্তর দিল।

"তোমরা জান"—রুহান গলা উঁচিয়ে বলতে চেষ্টা করে, "আজকে আমরা এখানে একটি বিশেষ কারণে উপস্থিত হয়েছি। আমাদের মানববসতির উন্নয়ন পরিষদের নবীন সদস্য রুখ আমাদের মাঝে ফিরে এসেছে।" রুহানকে এই সময় একটু থামতে হল কারণ উপস্থিত সবাই রুখকে সম্ভাষণ জানানোর জন্য বিকট গলায় চ্যাঁচামেচি করতে শুরু করল। অতি উৎসাহী কয়েকজন তরুণ-তরুণী আরো একধাপ এগিয়ে রুখকে টেবিলের উপর টেনে তোলার চেষ্টা করছিল কিন্তু রুখ বেশ কষ্ট করে নিজেকে মুক্ত করে মোটামুটি নিরাপদ দূরত্বে সরে গেল। রুহান হাত তুলে সবাইকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করতে করতে বলল, "আমি জানি এটি আমাদের সবার জন্য খুব আনন্দের ব্যাপার—এর আগে আমরা এভাবে আমাদের প্রিয়জনকে হারিয়েছি। তারা বুদ্ধিমান এনরয়েডদের সাথে দেখা করার জন্য মূল নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্রে গিয়ে আর ফিরে আসে নি। আমরা লক্ষ করেছি আমাদের মাঝে যারা বেশি প্রাণবন্ত যারা বেশি বুদ্ধিমান তারা সাধারণত আর ফিরে আসে না—সে কারণে আমরা রুখকে নিয়ে খুব বেশি দুশ্চিন্তিত ছিলাম। যা-ই হোক—সে সুস্থ দেহে আমাদের মাঝে ফিরে এসেছে, আজ আমাদের খুব আনন্দের দিন। আমি সবার পক্ষ থেকে রুখকে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি।"

রুখ রুহানের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায়—তার কেন জানি মনে হতে থাকে রুহানের এই কথাগুলোর মাঝে যেন কী একটা অসঙ্গতি রয়েছে কিন্তু সেটা কী সে ঠিক ধরতে পারে না। রুখ অসঙ্গতিটা কোথায় বোঝার চেষ্টা করছিল। তাই ঠিক লক্ষ করে নি যে সমবেত সবাই চিৎকার করে তাকে ডাকছে, তাকে কিছু একটা বলতে বলছে। ক্রীনা তার পাঁজরে খোঁচা দিয়ে ডাকল, "রুখ—"

"কী হল?"

"তুমি কিছু একটা বল।"

"আমি?"

"হ্যাঁ—দাঁড়াও।"

রুখ তার জায়গায় দাঁড়িয়ে কেশে একটু গলা পরিষ্কার করে বলল, "তোমরা সবাই জান যারা বুদ্ধিমান এবং প্রাণবন্ত সাধারণত তারা বুদ্ধিমান এনরয়েডদের কাছে গেলে আর ফিরে আসে না। দেখতেই পাচ্ছ আমি ফিরে এসেছি কাজেই আমি নিশ্চয়ই বোকা এবং অলস।"

উপস্থিত সবাই উত্তেজক পানীয়ের কারণে উচ্চৈঃস্বরে হাসতে শুরু করে, রুখ সবার হাসির দমক কমে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করে বলল, "কিন্তু যদি আমাকে তোমরা জিজ্ঞেস কর তুমি কি বুদ্ধিমান এবং প্রাণবন্ত হয়ে মারা যেতে চাও নাকি বোকা এবং অলস হয়ে বেঁচে থাকতে চাও—আমি তা হলে বলব বোকা এবং অলস হয়ে বেঁচে থাকতে চাই।"

সবাই আবার হাসতে শুরু করে এবং রুখের হঠাৎ মনে হতে থাকে সে এইমাত্র যে-কথাটি বলল তার মাঝে কিছু একটা অসঙ্গতি আছে। অসঙ্গতিটি কী সে মনে করার চেষ্টা করে কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারে না। রুখ আবার অন্যমনস্ক হয়ে যায় এবং প্রায় অন্যমনস্কভাবেই নিচু গলায় বলল, "আমরা মানুষেরা সম্ভবত খুব গুরুত্বপূর্ণ।"

উপস্থিত অনেকে কথাটিকে একটি রসিকতা হিসেবে নিয়ে হেসে ওঠে কিন্তু রুখ তাদের হাসিকে উপেক্ষা করে নেহায়েত অপ্রাসঙ্গিকভাবে গলায় অনাবশ্যক গুরুত্ব আরোপ করে বলল, "আমি যতই চিন্তা করি ততই নিশ্চিত হতে থাকি যে মেতসিসে আমাদের অবস্থান খুব গুরুত্বপূর্ণ।"

ক্রীনা একটু অবাক হয়ে বলল, "কেন? তুমি একথা কেন বলছ?"

"যেমন মনে কর অক্সিজেনের কথা—পৃথিবীতে অক্সিজেনের মতো ভয়ঙ্কর গ্যাস খুব কম রয়েছে। যে কোনো পদার্থ অক্সিজেনের সংস্পর্শে এলে অক্সিডাইজড হয়ে যায়। যন্ত্রপাতি মরচে ধরে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আমরা—মানুষেরা অক্সিজেন ছাড়া এক মিনিট বাঁচতে পারি না। তাই শুধুমাত্র আমাদের জন্য মেতসিসের বাতাসে শতকরা কুড়ি ভাগ অক্সিজেন ভরে দেওয়া হয়েছে। চিন্তা করতে পার এই ভয়ঙ্কর পরিবেশে যত এনরয়েড, রোবট, যন্ত্রপাতি আছে তাদের কী দুর্দশা হচ্ছে? তবু তারা সেটা সহ্য করে যাচ্ছে। একদিন নয় দুদিন নয়—বছরের পর বছর শতাব্দীর পর শতাব্দী। কেন সহ্য করছে? নিশ্চয়ই এর কোনো কারণ আছে।"

উপস্থিত সবাই একটু অবাক হয়ে রুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। মেতসিসে মানুষের মোটামুটি নিরুপদ্রব জীবনে সাধারণত এই ধরনের কথাবার্তা প্রকাশ্যে আলোচনা করা হয় না। এই মহাকাশযানে মানুষ থেকে লক্ষগুণ বেশি বুদ্ধিমান এনরয়েড রয়েছে, তাদের অনুকম্পা ছাড়া মানুষ এখানে এক মিনিটও বেঁচে থাকতে পারত না—এরকম পরিবেশে মানুষের গুরুত্ব বেশি না বুদ্ধিমান এনরয়েডের গুরুত্ব বেশি সেই আলোচনা নেহায়েত অনাবশ্যক!

রুহান মৃদু হেসে বলল, "রুখ, তোমার জ্ঞানগম্ভীর আলোচনার জন্য এখন কেউ প্রস্তুত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com ~

নয়। উত্তেজক পানীয় সবার নিউরনে এখন আলোড়ন সৃষ্টি করছে। কঠিন একটা বক্তৃতা দিয়ে সবাইকে তাড়িয়ে না দিয়ে তুমি বরং আমাদের একটি গান শোনাও।"

রুখ হেসে ফেলল, বলল, "ঠিকই বলেছ। কিন্তু আমি যদি গান গাই সম্ভবত সবাই আরো দ্রুত পালিয়ে যাবে।"

রুহান বলল, "দেখই না চেষ্টা করে!"

টেবিলের নিচে থেকে বাদ্যযন্ত্র বের করে আনা হল, তাল লয় এবং মাত্রার পরিমাপ ঠিক করে কিছু মডিউল নিয়ন্ত্রণ করা হল, একটি-দুটি সুর পরীক্ষা করা হল এবং রুখ হাততালি দিয়ে গান গাইতে শুরু করল। তার ভরাট গলার স্বর সারা হলঘরে গমগম করতে থাকে—উপস্থিত সবাই হাততালি দিয়ে তার সাথে তাল মিলাতে শুরু করে।

গানের কথাগুলো বহু পুরোনো। পৃথিবী ছেড়ে মানবশিশু যাচ্ছে মহাকাশে অজানার উদ্দেশে, সেখানে কি নীল আকাশ আছে? সাগরের ঢেউ আছে? বাতাসের ক্রন্দন আছে? সেই শিশু কি পৃথিবীর স্মৃতি ছড়িয়ে দেবে অনাগত ভবিষ্যতে? মানুষের ভালবাসা কি বেঁচে থাকবে মানুষের হৃদয়ে?

গানের কথা শুনতে শুনতে ক্রীনার চোখে হঠাৎ পানি এসে যায়। সে সাবধানে তার নিও পলিমারের কোনা দিয়ে চোখ মুছে ফেলে।

যে হলঘরটি কিছুক্ষণ আগেই অসংখ্য মানুষের আনন্দোল্লাসে ভরপুর ছিল এখন সেখানে কেউ নেই—এলোমেলো চেয়ার, অবিন্যস্ত টেবিল, পরিত্যক্ত পানীয়ের গ্লাস সবকিছু মিলিয়ে হলঘরটিতে একধরনের বিষণ্নতা ছড়িয়ে আছে। হলঘরের মাঝামাঝি বিশাল টেবিলের এক কোনায় রুখ দুই হাতে তার মাথা ধরে বসে আছে, তার খুব কাছে ক্রীনা দাঁড়িয়ে—ক্রীনার চোখেমুখে একধরনের চাপা অস্থিরতা। সে রুখের মাথায় হাত রেখে বলল, "রুখ। তোমার কী হয়েছে?"

রুখ মাথা তুলে ক্রীনার দিকে তাকাল, বলল, "আমি জানি না।"

"তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি কিছু একটা নিয়ে খুব ভয় পাচ্ছ।"

"হ্যাঁ। কিন্তু সেটা কী আমি জানি না।"

ক্রীনা চিন্তিত মুখে বলল, "বুদ্ধিমান এনরয়েডের ওখানে কী হয়েছিল মনে করার চেষ্টা কর।"

"সেটা তো তোমাকে বলেছি—"

ক্রীনা মাথা নেড়ে বলল, "আমাকে যেটা বলেছ সেটা তোমার স্মৃতিতে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু নিশ্চয়ই কিছু একটা তোমার স্মৃতি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে—কিছু একটা তোমার স্মৃতিতে জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। মানুষের মস্তিষ্ক যেভাবে কাজ করে সেখানে এটা খুব সহজ নয়— সবসময়েই অন্য কোনো স্মৃতিতে তার প্রভাব পড়ে। তুমি মনে করার চেষ্টা কর—ভেবে দেখ, কোনো ধরনের অসঙ্গতি কোনো ধরনের অস্বাভাবিকতা তোমার চোখে পড়েছে কি না।"

"না।" রুখ মাথা নেড়ে বলল, "আমি কোনো ধরনের অসঙ্গতি মনে করতে পারছি না। তবে—"

"তবে?"

"তবে যতবার আমি মানুষের বেঁচে থাকা নিয়ে ভাবি ততবার মনে হয় কী যেন হিসাব মিলছে না।"

"হিসাব মিলছে না?"

"না। মনে হয় বেঁচে থাকাটা আসলে—আসলে—" রুখ হঠাৎ কেমন যেন অসহায় ভঙ্গিতে হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, "আমি জানি না।"

ক্রীনা চিন্তিত মুখে বলল, "আমার কী মনে হয় জান?"

"কী?"

"বুদ্ধিমান এনরয়েডদের ওখানে গিয়ে তুমি কিছু একটা দেখেছ বা কিছু একটা জেনেছ। সেটার সাথে মানুষের বেঁচে থাকার খুব গভীর একটা সম্পর্ক আছে। সেটা নিশ্চয়ই খুব ভয়ঙ্কর একটা তথ্য—সেটা তোমার মস্তিষ্ক থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু তোমার অবচেতন মনে এখনো তার ছাপ রয়ে গেছে—সে জন্য তুমি এরকম অস্থির হয়ে ছটফট করছ।"

রুখ কেমন যেন ক্লান্ত ভঙ্গিতে ক্রীনার দিকে তাকাল। একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "তোমার তাই মনে হয়?"

"হ্যাঁ। চেষ্টা কর মনে করতে। তোমার মস্তিষ্কে তথ্যটা আছে।" ক্রীনা রুখের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি জানি—তুমি একবার চেষ্টা করে দেখ।"

রুখ দুই হাতে মাথা রেখে কয়েক মুহূর্ত চোখ বন্ধ করে রইল, তারপর অসহায় ভঙ্গিতে বলল, "না, কিছু মনে করতে পারছি না। শুধু—"

ক্রীনা উৎসুক মুখে বলল, "শুধু কী?"

"শুধু কেন জানি আমার মায়ের কথা মনে পড়ছে।"

"তোমার মায়ের কথা? তোমার মা তো অনেক আগে মারা গেছেন।"

"আমি জানি।"

"তোমার মায়ের কথা কী মনে পড়ছে?"

"মনে হচ্ছে আমি যেন আমার মায়ের সাথে যাচ্ছি। মা একটা বিশাল হলঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। হলঘরের দরজা খুলে ভয় পেয়ে চিৎকার করতে শুরু করলেন।"

"কী দেখে ভয় পেয়েছিলেন?"

"মানুষ।"

"মানুষ? কী রকম মানুষ?"

রুখ আবার খানিকক্ষণ চিন্তা করে মাথা নেড়ে বলল, "না, মনে করতে পারছি না।"

"মানুষেরা কি মৃত না জীবিত?"

"মনে হয় জীবিত—মনে হয় ঘুমিয়ে আছে।"

"ঘুমিয়ে আছে?"

"হ্যাঁ তাদেরকে ঝুলিয়ে রাখা আছে। তারা একসময় জেগে উঠবে তখন ভয়ঙ্কর একটা বিপদ হবে। ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর বিপদ।"

ক্রীনা অবাক হয়ে রুখের দিকে তাকিয়ে রইল। রুখ দুর্বলভাবে হেসে বলল, "নিশ্চয়ই কোনো একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি। তাই না?"

"হয়তো দুঃস্বপ্ন। হয়তো দুঃস্বপ্ন নয়, হয়তো সত্যি। কিন্তু আমরা তো তার ঝুঁকি নিতে পারি না।"

"তুমি কী করতে চাও?"

"চল বের হই। যারা বয়স্ক—যারা তোমার মাকে দেখেছে তাদের সাথে কথা বলে আসি।"

AMARBOI.COM

"কী নিয়ে কথা বলবে?"

"সত্যি সত্যি তোমার মা কি কখনো তোমাকে নিয়ে কোথাও গিয়ে ভয় পেয়েছিলেন? সেটা নিয়ে কি কারো সাথে কথা বলেছিলেন?"

রুখ একটু অবাক হয়ে বলল, "তাতে কী লাভ?"

"জানি না। কিন্তু আমার মনে হয় দেরি করে লাভ নেই। সত্যি যদি তুমি বুদ্ধিমান এনরয়েড থেকে গোপন কোনো তথ্য এনে থাক—সেটা আমাদের জানা দরকার।"

গভীর রাতে রুহানকে ঘুম থেকে ডেকে তোলা হল, রুহান যেটুকু অবাক হল তার থেকে অনেক বেশি ভয় পেয়ে গেল। ফ্যাকাসে মুখে রুখ আর ক্রীনার দিকে তাকিয়ে বলল, "কী হয়েছে?"

"না, রুহান কিছু হয় নি।" ক্রীনা হেসে বলল, "এমনি এসেছি।"

রুহান ভুরু কুঁচকে বলল, "এমনি কেউ এত রাতে আসে না। বল কী হয়েছে?"

রুখ একটু অপরাধীর মতো বলল, "আমি আসলে এত রাতে আসতে চাই নি কিন্তু ক্রীনা বলল দেরি করে লাভ নেই।"

"কী ব্যাপারে দেরি করে লাভ নেই?"

"আমি বলছি, শোন।" ক্রীনা তখন অল্প কথায় পুরো ব্যাপারটি রুহানকে বুঝিয়ে বলে। রুখ আশা করছিল রুহান পুরোটুকু শুনে ক্রীনার আশঙ্কাকে হেসে উড়িয়ে দেবে। কিন্তু সে উড়িয়ে দিল না, খুব চিন্তিত মুখে রুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

ক্রীনা বলল, "আমরা তোমার কাছে এসেছি রুখের মায়ের কথা জানতে। রুখের মা কি কখনো বিশাল কোনো হলঘরে গিয়ে—"

"না।" রুহান মাথা নেড়ে বলল, আমাদের মানববসতিতে কোনো বিশাল হলঘর নেই। রুখের মা কখনো কিছু দেখে ভয় পায় নি—আমি জানি। রুখের মা-বাবা দুজনকেই আমি ভালো করে জানতাম। রুখের বাবা যখন মারা যায় আমি তার খুব কাছে ছিলাম। অনেকদিন আগের ঘটনা কিন্তু আমার কাছে মনে হয় মাত্র সেদিন—"

ক্রীনা মাথা নাড়ল, "স্মৃতি খুব সহজে প্রতারণা করতে পারে।"

"হ্যাঁ।" রুহান মাথা নাড়ল, "যে-জিনিসটা মনে রাখা দরকার সেটা মনে থাকে না কিন্তু খুব অপ্রয়োজনীয় একটা জিনিস স্পষ্ট মনে থাকে।"

রুখ দুর্বলভাবে হেসে বলল, "আমার জন্যে পুরো ব্যাপারটি আরো ভয়ঙ্কর। বুদ্ধিমান এনরয়েডরা সম্ভবত আমার স্মৃতিকে ওলটপালট করে দিয়েছে। এখন কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যা আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি না।"

ক্রীনা কোনো কথা না বলে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রুখের দিকে তাকিয়ে রইল। রুখ বলল, "কী হল তুমি আমার দিকে এভাবে তাকিয়ে আছ কেন?"

"তুমি এইমাত্র কী বললে?"

"বলেছি তুমি এভাবে তাকিয়ে আছ কেন?"

"না, তার আগে।"

রুখ একটু অবাক হয়ে বলল, "তার আগে বলেছি, আমার স্মৃতির কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যা আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি না।"

ক্রীনা হঠাৎ ঘুরে রুহানের দিকে তাকাল, "রুহান তুমি কি সত্যি বলতে পারবে তোমার কোন স্মৃতিটি সত্যি—কোনটি মিথ্যা?"

রুহান হতচকিতের মতো ক্রীনার দিকে তাকিয়ে রইল, খানিকক্ষণ পর একটু হেসে বলল, "স্মৃতি তো মিথ্যা হতে পারে না।—"

"কিন্তু রুহান তুমি জান আমাদের বুদ্ধিমত্তা নিনীষ স্কেলে মাত্র আট। বুদ্ধিমান এনরয়েডরা আমাদের যেভাবে ইচ্ছে সেভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আমাদের স্মৃতিতে যা ইচ্ছে তা প্রবেশ করাতে পারে। আমাদের ভয়ঙ্কর স্মৃতি মুছে সেখানে আনন্দের স্মৃতি প্রবেশ করিয়ে দিতে পারে। আনন্দের স্মৃতি মুছে সেখানে ভয়ঙ্কর স্মৃতি প্রবেশ করাতে পারে।"

"কিন্তু কেন? কী লাভ?"

"আমি জানি না। হয়তো—হয়তো—"

"হয়তো কী?"

ক্রীনা কোনো কথা না বলে চুপ করে রইল।

রুহান কিছুক্ষণ ক্রীনার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তুমি বলতে চাইছ আমাদের সব স্মৃতি সত্যি নয়?"

"না। আমি বলতে চাইছি কেউ যদি আমাদের স্মৃতিকে নিয়ে খেলা করে আমরা সেটা জানব না। জানার কোনো উপায় নেই।"

রুখ খানিকক্ষণ ক্রীনার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার মনে হতে থাকে ঠিক এই ধরনের একটা কথা সে আগে কখনো কোথাও শুনেছে—কিন্তু ঠিক কোথায় সে মনে করতে পারে না।

রুহান মাথা নেড়ে বলল, "আমরা ইচ্ছা করলেই তো কিছু একটা নিয়ে সন্দেহ করতে পারি। পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র নিয়ে সন্দেহ করতে পারি, বলতে পারি আলোর গতিবেগ পরিবর্তনশীল। কিংবা বলতে পারি আমাদের অস্তিত্ব মিথ্যা—এটা আসলে একটা বিশাল গুবরে পোকার স্বপ্ন—কিন্তু সবকিছুর তো একটা ভিত্তি থাকতে হয়। ভিত্তিহীন সন্দেহ তো কোনো কাজে আসে না। আমাদের স্মৃতি মিথ্যা এটা নিয়ে সন্দেহ করার মতো কোনো ভিত্তি আছে?"

ক্রীনা মাথা নাড়ল, "আছে।"

রুখ এবং রুহান দুজনেই ঘুরে ক্রীনার দিকে তাকাল, "আছে?"

"হ্যাঁ।"

"সেটা কী?"

ক্রীনা একটা বড় নিশ্বাস নিয়ে বলল, "আমাদের এই মানুষের বসতিতে কত জন মানুষ রয়েছে?"

রুহান বলল, "হাজার দেড়েক।"

"যদি কোনো বসতিতে হাজার দেড়েক মানুষ থাকে তুমি আশা করবে তার মাঝে সকল বয়সের মানুষ থাকবে। শিশু থাকবে, কিশোর-কিশোরী থাকবে, তরুণ-তরুণী থাকবে, যুবক-যুবতী, মধ্যবয়স্ক এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধাও থাকবে। আমাদের বসতিতে কোনো শিশু নেই, কোনো বৃদ্ধ নেই।"

রুহান একটু অবাক হয়ে ক্রীনার দিকে তাকাল, ভুরু কুঁচকে বলল, "তুমি কী বলছ ক্রীনা? বসতিতে যারা শিশু ছিল তারা বড় হয়ে গেছে, যারা বৃদ্ধ ছিল তারা মারা গেছে। আমার স্পষ্ট মনে আছে তোমার জন্ম হল—"

ক্রীনা মাথা নাড়ল, "না, তোমার কী মনে আছে সেটা আমি বিশ্বাস করি না।"

"তুমি বলতে চাইছ—"

"আমি বলতে চাইছি হয়তো তুমি অতীতে যেটা দেখেছ সেটা কাল্পনিক স্মৃতি। এখন, এই মুহূর্তে যেটা দেখছি শুধু সেটাই আমরা বিশ্বাস করতে পারি। এই মুহূর্তে যেটা দেখছি

সেটা অস্বাভাবিক—সেখানে কোনো শিশু নেই, বৃদ্ধ নেই—কোনো জন্ম নেই—কোনো মৃত্যু নেই। তাই আমি সন্দেহ করছি হয়তো এটাই মেতসিস। মানববসতিতে কিছু মানুষ থাকে—একসময় তাদের সরিয়ে দিয়ে অন্য মানুষেরা আসে। তাদের মাঝে একটা স্মৃতি দিয়ে দেওয়া হয় যেন তারা অনেকদিন থেকে বেঁচে আছে। আসলে এখানে সবাই ক্ষণস্থায়ী।"

"ক্রীনা—" রুখ হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, "ক্রীনা!"

"কী?"

"তুমি ঠিকই সন্দেহ করেছ। এখন আমার মনে পড়েছে।"

"মনে পড়েছে?"

"হ্যাঁ। মনে আছে আমি বলেছিলাম—বিশাল হলঘরে সারি সারি মানুষ ঝুলিয়ে রাখা আছে? সবাই ঘুমিয়ে আছে। তারা—তারা—"

"তারা কারা?"

"তারা আমরা। আমি, তুমি, রুহান সবাই। সবাই।"

"আমরা?"

"হ্যাঁ। একই জিনেটিক কোড দিয়ে তৈরি একই মানুষ।" রুখ জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে থাকে, তার মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে, সে ভয়ার্ত চোখে একবার রুহান আর ক্রীনার দিকে তাকাল, তারপর আর্ত গলায় বলল, "একদিন আমরা সবাই মারা যাব। সবাই একসাথে। তখন অন্য "আমাদের" জাগিয়ে তোলা হবে, তারা এসে এখানে থাকবে। যেভাবে একদিন আমরা এসেছি। তার আগে অন্য "আমরা" এসেছি। তার আগে—অন্য "আমরা"—তার আগে—"

রুখ হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে নিজের মাথা ধরে আর্তচিৎকার করে ওঠে, তার শরীর থরথর করে কাঁপতে থাকে, সে তার নিজের পায়ের উপর আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। হাঁটু ভেঙে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

ক্রীনা রুখের কাছে ছুটে যায়, তার মাথাটি নিজের কোলের উপরে টেনে নিয়ে তার উপর ঝুঁকে পড়ে। চোখের পাতা টেনে তার চোখের পিউপিলের দিকে তাকাল, হৃৎস্পন্দন শুনল তারপর ঘুরে রুহানের দিকে তাকিয়ে বলল, "হঠাৎ করে মাথার উপর চাপ পড়েছে, তাই অজ্ঞান হয়ে গেছে। আমার মনে হয় ভয়ের কিছু নেই। তবে—"

"তবে কী?"

"আমি জানি না বুদ্ধিমান এনরয়েডরা আমাদের কত তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করে। যদি খুব তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করে তা হলে—"

"তা হলে?"

"তা হলে খুব শিগগিরই আমাদের দিন শেষ হয়ে আসবে রুহান।"

রুহান কোনো কথা না বলে ক্রীনার দিকে তাকিয়ে রইল।

৭

ভোররাতে হঠাৎ তীক্ষ্ণ স্বরে সাইরেন বেজে ওঠে। রুখ ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল, সাইরেনের তীক্ষ্ণ স্বরের ওঠানামার মাঝে কেমন জানি একটি অশুভ ইঙ্গিত লুকিয়ে থাকে। রুখ জানে এই অশুভ ইঙ্গিতটি কী। এই ভোররাতে মানববসতির প্রায় দেড় হাজার মানুষকে

হত্যা করা হবে। সম্ভবত হত্যা শব্দটি এখানে ব্যবহার করার কথা নয়—মানুষ কিংবা মানুষের সমপর্যায়ের অস্তিত্ব একে অপরকে হত্যা করে। বুদ্ধিমত্তায় অনেক উপরের একটি অস্তিত্ব নিচু অস্তিত্বকে অপসারণ করে। কাজেই এটি হত্যা নয় এটি অপসারণ। ইতঃপূর্বে অসংখ্যবার এই ঘটনা ঘটেছে। এটি প্রায় রুটিন একটি ব্যাপার।

রুখ তার বিছানা থেকে নেমে এল—এই ক্ষুদ্র সাধারণ এবং রুটিন ঘটনাকে তারা ঘটতে দেবে না, তারপর কী হবে তারা জানে না কিন্তু এই মুহূর্তে সেটি তারা ঘটতে দেবে না। রুখ যোগাযোগ-মডিউলটি স্পর্শ করে সেটি চালু করে দেয়। মাথায় সাদাকালো চুলের মধ্যবয়স্ক একজন গম্ভীর ধরনের মানুষ যোগাযোগ-মডিউলে কথা বলছে—গুরুত্বপূর্ণ কোনো ঘটনা বলতে হলে এই ধরনের চেহারার একটি চরিত্র সৃষ্টি করা হয়। রুখ হলোগ্রাফিক স্ক্রিনে মধ্যবয়স্ক মানুষটির দিকে তাকিয়ে রইল, এত জীবন্ত একটি মানুষ আসলে কোনো একটি যন্ত্রের একটি কৌশলী প্রোগ্রাম, দেখে বিশ্বাস হয় না। মধ্যবয়স্ক মানুষটি সোজাসুজি রুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "মানববসতির সদস্যরা, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘোষণা—অনুগ্রহ করে সবাই মনোযোগ দিয়ে শোন। মেতসিসের বায়ুমণ্ডলের পরিশোধন-কেন্দ্র সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হবে, বাতাসের চাপ আশঙ্কাজনকভাবে কমে যাবে। বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ প্রয়োজন থেকে একশত চল্লিশ গুণ কমে যাবে—আমি আবার বলছি, একশত চল্লিশ গুণ কমে যাবে। শুধু তাই নয় পরিশোধন-কেন্দ্র বন্ধ থাকায় বাতাসে কার্বন মনোঅক্সাইড, ফসজিন এবং হাইড্রোজেন সায়নাইড গ্যাস সাময়িকভাবে বৃদ্ধি পাবে, আমি আবার বলছি, বাতাসে কার্বন মনোঅক্সাইড, ফসজিন এবং হাইড্রোজেন সায়নাইড গ্যাস সাময়িকভাবে বৃদ্ধি পাবে। কাজেই, আমার প্রিয় মানবসদস্যরা—আমি তোমাদের নিরাপত্তার জন্যে বলছি—পরবর্তী ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা কোনো অবস্থাতেই তোমাদের বাসগৃহ থেকে বের হবে না। আমি আবার বলছি, কোনো অবস্থাতেই তোমাদের বাসগৃহ থেকে বের হবে না। তোমাদের বাসগৃহে বিশুদ্ধ পরিমিত এবং প্রয়োজনীয় বাতাস সরবরাহ করা হবে। কাজেই এই মুহূর্তে তোমাদের বাসগৃহের দরজা এবং জানালা বায়ু-নিরোধক করে নাও। আমি আবার বলছি, এই মুহূর্তে তোমাদের বাসার দরজা এবং জানালা বায়ু-নিরোধক করে নাও। আমি আবার বলছি, তোমরা এই মুহূর্তে তোমাদের বাসার দরজা এবং জানালা বায়ু-নিরোধক করে নাও। আমি আবার বলছি..."

রুখ হাত দিয়ে স্পর্শ করে যোগাযোগ-মডিউলটি বন্ধ করে ঘর থেকে বের হয়ে এল। হাতে খুব বেশি সময় নেই।

বড় হলঘরটিতে জনাপঞ্চাশেক তরুণ এবং তরুণী উদ্বিগ্ন মুখে অপেক্ষা করছে। রুখ প্রবেশ করার সাথে সাথে তরুণ এবং তরুণীরা তার কাছে ছুটে এল। কমবয়সী একজন উদ্বিগ্ন মুখে বলল, "রুখ, আমি বুঝতে পারছি না কী হচ্ছে। তুমি বলেছিলে—"

রুখ হাত তুলে বলল, "আমাদের হাতে নষ্ট করার মতো একটি মুহূর্তও নেই। তোমরা কোনো প্রশ্ন করবে না। আমি যা বলব তোমাদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলেও তোমাদের সেটা বিশ্বাস করতে হবে। আমরা এখন ভয়ঙ্কর একটি বিপদের মুখোমুখি এসেছি। আগামী এক ঘণ্টার মাঝে এই মানববসতির সকল মানুষকে হত্যা করা হবে।"

উপস্থিত সবাই আর্তচিৎকার করে ওঠে, রুখ হাত তুলে তাদের থামিয়ে দিয়ে বলল, "আমি আগেই বলেছি, তোমাদের কাছে যত অবিশ্বাস্য মনে হোক তোমাদের আমার কথা বিশ্বাস করতে হবে। এই মুহূর্তে ক্রীনা এবং রুহান ঠিক এ রকমভাবে আরো স্বেচ্ছাসেবীদের

ঠিক একই কথা বলছে। আমরা আগে থেকে এটা সবাইকে বলতে পারি নি, শেষ মুহূর্তের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে। তোমরা কোনো প্রশ্ন করবে না—আমি যা বলছি তোমরা যন্ত্রের মতো অক্ষরে অক্ষরে সেটা পালন করবে।"

রুখ একটা নিশ্বাস নিয়ে বলল, "ঘরের ঐ কোনায় বাক্সের মাঝে দেখ মাইক্রো অক্সিজেন সিলিন্ডার এবং মাস্ক রয়েছে। তোমরা নিজেরা সেটা পরে নাও। বাক্সের মাঝে তোমাদের সবার নাম লেখা আছে। তোমাদের সেই নাম এবং লিস্ট দেখে মানববসতির সবার বাসায় এই অক্সিজেন সিলিন্ডার এবং মাস্ক পৌঁছে দিতে হবে। কে কোথায় যাবে সব লিখে দেওয়া আছে। সবাইকে বলতে হবে কোনো অবস্থাতেই কেউ যেন আগামী এক ঘণ্টা তাদের বাসার বাতাসে নিশ্বাস না নেয়। কোনো অবস্থাতেই না—"

সোনালি চুলের একজন তরুণী ভয়-পাওয়া-গলায় বলল, "কিন্তু—"

"কোনো প্রশ্ন নয়। আমাদের হাতে সময় নেই। মনে রেখো গোপনীয়তার জন্য আমরা কোনো ধরনের ইলেকট্রনিক যোগাযোগব্যবস্থা ব্যবহার করতে পারব না। যাও।"

পঞ্চাশ জন হতবুদ্ধি তরুণ-তরুণী ঘরের কোনায় ছুটে গেল। নিজের নাম লেখা বাক্স খুলে অক্সিজেন সিলিন্ডারগুলো হাতে নিয়ে তারা নিজেদের মাঝে উত্তেজিত গলায় কথা বলতে বলতে রাতের অন্ধকারে বের হয়ে যায়। রুখ একটু পরেই তাদের ভাসমান যানের ইঞ্জিনের চাপা শব্দ শুনতে পায়। এই মুহূর্তে মানববসতির অন্য অংশেও আরো তরুণ-তরুণীরা এইভাবে ছুটে বের হয়ে গেছে। তাদের হাতে মিনিট পনের সময় আছে। রুখ তার বাসা পরীক্ষা করে বাতাস পরিবহনের কেন্দ্রে কার্বন মনোক্সাইডের ছোট সিলিন্ডারটি আবিষ্কার করেছে। নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্র থেকে নির্দেশ পাবার পর স্বয়ংক্রিয় ভালবটি খুলে ঘরের বাতাসে মেরে ফেলার মতো প্রয়োজনীয় কার্বন মনোঅক্সাইড গ্যাস প্রবেশ করাতে কমপক্ষে পনের মিনিট সময় নেবে। তাদের হাতে তাই পনের মিনিট সময় রয়েছে, তার বেশি নয়।

রুখ তার নিও পলিমারের জ্যাকেটের পকেট থেকে তার নিজের ছোট অক্সিজেন সিলিন্ডারটি বের করে নেয়। ঘরের কোনায় যোগাযোগ-মডিউলে একটা লাল বাতি জ্বলছে এবং নিভছে, বাইরে সাইরেনের তীক্ষ্ণ শব্দ উঠছে এবং নামছে, বিচিত্র এই পরিবেশের মাঝে এক ধরনের অশুভ আতঙ্ক লুকিয়ে আছে, অনেক চেষ্টা করেও রুখ সেটা ঝেড়ে ফেলতে পারে না।

খুব ধীরে ধীরে দিগন্তের কাছাকাছি চৌম্বকীয় ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত ফিউসান দিয়ে সূর্য তৈরি করা হচ্ছে। ভোরের প্রথম আলোতে সবকিছু কেমন যেন অতিপ্রাকৃত দেখায়। মানববসতির প্রায় সবাই খোলা মাঠে উপস্থিত হয়েছে। অনেকের মুখে এখনো অক্সিজেন মাস্ক লাগানো রয়েছে, সেটি খুলে ফেলা নিরাপদ কি না এখনো পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারছে না।

রুখ তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা রুহানকে জিজ্ঞেস করল, "কত জনকে বাঁচানো যায় নি?"

"শেষ হিসাব অনুযায়ী এগার জন। এর মাঝে চার জনের কাছে সময়মতো খবর পৌঁছানো যায় নি—যাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে নিজেই দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে। বাকিদের মাঝে চার জন নিকিতা-পরিবারের। তারা আমাদের কথা বিশ্বাস করলেও স্বেচ্ছামৃত্যু বেছে নিয়েছে।"

"কেন?"

"তাদের ধারণা বুদ্ধিমান এনরয়েড যদি সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে আমাদের মৃত্যুবরণ করা উচিত তা হলে সেটাই মেনে নিতে হবে। সেটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।"

রুখ রুহানের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার কী মনে হয় রুহান?"

"আমার?" রুহান একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "আমি জানি না রুখ, তবে সত্যি কথা বলতে কী আমার ভয় করছে—যাকে বলে সত্যিকারের ভয়। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে হয়তো নিকিতা-পরিবারই বুদ্ধিমান—আমরাই নির্বোধ—"

"হতে পারে।" রুখ মাথা নেড়ে বলল, "কিন্তু আমরা তো মানুষ। মানুষ কখনো শেষ চেষ্টা না করে ছাড়ে না। বুদ্ধিমান এনরয়েডরা সত্যিই যদি বুদ্ধিমান হয়ে থাকে তারাও সেটা জানে।"

রুহান একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "ক্রীনা কোথায়?"

"আসছে। যারা মারা গেছে মনে হয় তাদের মৃতদেহের ব্যবস্থা করে আসছে।"

"ও।"

"ক্রীনা না থাকলে আমাদের বেশ অসুবিধে হত।"

"হ্যাঁ। ক্রীনা চমৎকার একটি মেয়ে। যত বড় বিপদই হোক শেষ পর্যন্ত মাথা ঠাণ্ডা রাখে। এই বিপদটি কীভাবে সামলে নিতে হবে পুরোটা কী চমৎকারভাবে পরিকল্পনা করেছে দেখেছ!"

রুখ একটা নিশ্বাস ফেলে, ক্রীনা সত্যিই চমৎকার একটি মেয়ে। বুকের গভীরে তার জন্য সে যে ব্যাকুলতা অনুভব করে কখনো কি সেটি তাকে বলতে পারবে? কেন সে সহস্র বছর আগে মানুষের সাদামাঠা পৃথিবীতে সাদামাঠা একজন মানুষ হয়ে জন্ম নিল না? রুখ অন্যমনস্কভাবে উপরে তাকায়, ঠিক তখন বহুদূরে ছোট ছোট বিন্দুর মতো অনেকগুলো স্কাউটশিপ দেখতে পেল। রুখ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, বিন্দুগুলো ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে, সেগুলো এদিকেই এগিয়ে আসছে। সে রুহানের দিকে তাকাল, নিচু গলায় বলল, "রুহান, ওরা আসছে।"

AMARBOI.COM

স্কাউটশিপগুলো সমবেত সবার মাথার উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে কাছাকাছি এক জায়গায় নামল। স্কাউটশিপের গোলাকার দরজা খুলে যায় এবং ভিতর থেকে বেশকিছু খাটো এবং বিদঘুটে পরিবহন রোবট নেমে এল। রোবটগুলো কাছাকাছি এসে থেমে গেল, সেগুলোকে কেমন যেন বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে। কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা একটি রোবট খনখনে গলায় বলল, "তোমরা জীবিত। আমাদের বলা হয়েছে তোমরা মৃত।"

রুখ বলল, "তুমি ঠিকই দেখছ, আমরা জীবিত।"

"আমরা মৃতদেহ নিতে এসেছি।"

"চমৎকার। আমাদের কাছে সব মিলিয়ে এগারটি মৃতদেহ রয়েছে।"

"আমরা দেড় হাজার মৃতদেহ সরিয়ে নিতে সক্ষম।"

"আমাদের কাছে দেড় হাজার মৃতদেহ নেই—তোমার হিসাবে নিশ্চয়ই কিছু একটা গোলমাল রয়েছে।"

"আগে কখনো এরকম হয় নি। যতবার আমরা দেড় হাজার মৃতদেহ নিতে এসেছি ততবার দেড় হাজার মৃতদেহ নিয়েছি।"

"এবারে পারবে না। দুঃখিত।"

"আমরা কি পরে আসব?" নির্বোধ ধরনের রোবটটি বলল, "একটু পরে এলে কি দেড় হাজার মৃতদেহ প্রস্তুত থাকবে?"

"না।" রুখ মাথা নেড়ে বলল, "এখানে কখনোই দেড় হাজার মৃতদেহ প্রস্তুত থাকবে না।"

"অত্যন্ত বিচিত্র ব্যাপার। অত্যন্ত বিচিত্র—" বলতে বলতে রোবটটি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। কিছুক্ষণের মাঝেই তারা এগারটি মৃতদেহ নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ক্রীনা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "এখন কী হবে?"

রুখ মাথা নাড়ল, বলল, "জানি না। তবে আমি খুব ক্লান্ত। আমাকে কিছু খেয়ে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিতে হবে।"

"ঠিকই বলেছ, চল যাই। আমার বাসায় চল।"

রুখ এবং ক্রীনা অবশ্য জানত না তাদের বিশ্রাম নেবার সময় হবে না—তাদের ঘরে দুটি নিরাপত্তা এনরয়েড অপেক্ষা করছিল। ঘরে প্রবেশ করামাত্র তারা তাদের দিকে এগিয়ে আসে।

"কে?" ক্রীনা ভয়-পাওয়া গলায় বলল, "কে তোমরা?"

এনরয়েড দুটি কোনো কথা না বলে নিঃশব্দে তাদের দিকে এগিয়ে আসে। শক্তিশালী যান্ত্রিক হাত দিয়ে তাদের জাপটে ধরে—ক্রীনা একটি আর্তচিৎকার করার চেষ্টা করে, কিন্তু তার আগেই হঠাৎ করে কবজির কাছে একটা তীক্ষ্ণ খোঁচা অনুভব করে। পরমুহূর্তে তার চোখের সামনে সবকিছু অন্ধকার হয়ে আসে।

জ্ঞান হারানোর পূর্বমুহূর্তে মনে হল হয়তো নিকিতা-পরিবারই সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

AMARBOI.COM

৮

বিশাল কালো একটা টেবিলের একপাশে রুখ এবং ক্রীনা বসে আছে। টেবিলে তাদের ঘিরে ছয়টি বুদ্ধিমান এনরয়েড, তারা দেখতে মোটামুটি একই ধরনের কিন্তু ভালো করে তাকালে তাদের সূক্ষ্ম পার্থক্যটুকু চোখে পড়ে। কারো মাথা একটু বড়, কারো ফটোসেল একটু বেশি বিস্তৃত, কারো এনোডাইজ দেহ একটু বেশি ধাতব। রুখ এবং ক্রীনার ঠিক সামনে একটা খালি চেয়ার, সেখানে কে বসবে কে জানে। মানুষের বসতে হয়— এনরয়েডদের যান্ত্রিক দেহের তো বসার প্রয়োজন নেই।

ক্রীনা রুখের দিকে একটু ঝুঁকে নিচু গলায় ফিসফিস করে বলল, "রুখ, আমার ভয় করছে।"

রুখ ক্রীনার দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বলল, "তোমার ফিসফিস করে কথা বলার প্রয়োজন নেই ক্রীনা। এখানে যেসব এনরয়েড আছে তারা তোমার দিকে তাকিয়েই তুমি কী ভাবছ বলে দিতে পারে। এদের কাছে আমাদের কিছু গোপন নেই। এরা আমাদের সবকিছু জানে।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ সত্যি।"

ক্রীনা এবারে স্বাভাবিক গলায় বলল, "আমাদের এখানে বসিয়ে রেখেছে কেন?"

"নিশ্চয়ই কথা বলবে।"

"যদি আমাদের মনের সব কথা জানে তা হলে শুধু শুধু কথা বলার প্রয়োজন কী?"

রুখ দুর্বলভাবে হাসল, বলল, "জানি না।"

খুব কাছে কে যেন নিচু গলায় হাসল। রুখ এবং ক্রীনা চমকে ওঠে, কে এটা?

খুব কাছে থেকে আবার গলার স্বর শোনা গেল, "আমি।"

"আমি কে?"

কণ্ঠস্বরটি আবার হেসে ওঠে, হাসি থামিয়ে বলে, "কত সহজে তুমি কত কঠিন একটা প্রশ্ন করলে। সত্যিই তো, আমি কে?"

রুখ কঠিন গলায় বলল, "আপনারা আমাদের থেকে অনেক বুদ্ধিমান, দোহাই আপনাদের, পুরো ব্যাপারটি আমাদের জন্যে একটু সহজ করে দিন। আমরা মানুষেরা তো জেনেশুনে অপ্রয়োজনে একটা ক্ষুদ্র প্রাণীকে যন্ত্রণা দেই না।"

"আমি খুব দুঃখিত রুখ। সত্যি কথা বলতে কী, বুদ্ধিমত্তা সমান না হলে ভাব বিনিময় করা খুব কঠিন। আমরা চেষ্টা করছি।"

"ধন্যবাদ।"

"প্রথমে আমি পরিচয় করিয়ে দিই। তোমাদের ঘিরে ছয় জন বুদ্ধিমান এনরয়েড বসে আছে। মানুষের যেরকম নাম থাকতে হয় এনরয়েডের বেলায় সেটা সত্যি নয়। কিন্তু তোমাদের সুবিধের জন্য আমরা সবার একটি নাম দিয়ে দিই। এরা হচ্ছে মেগা, জিগা, পিকো, ফ্যামটো, ন্যানো আর কিলো। তোমরা মানুষেরা যেরকম নাম রাখ সেরকম হল না কিন্তু কাজ চলে যাবে। এর মাঝে পিকোকে রুখ ধ্বংস করেছিল আবার নতুন করে তৈরি করা হয়েছে।"

রুখ চমকে উঠে বলল, "কী? কী বললেন?"

"হ্যাঁ। তোমার মনে নেই। ঘটনাটি খুব বড় ধরনের নির্বুদ্ধিতা ছিল তাই ফ্যামটো সেটি তোমার স্মৃতি থেকে মুছে দিয়েছে।"

"কিন্তু, আমি বুঝতে পারছি না। আমি একজন মানুষ হয়ে—"

"মানুষ অনেক বুদ্ধিমান প্রাণী—তাই বলে তারা যে নিচু স্তরের সরীসৃপ সাপের কামড় খেয়ে মারা যায় না সেটা সত্যি নয়।"

"তা ঠিক।"

"হ্যাঁ। তোমার স্মৃতি থেকে সবকিছু যে মুছে দেওয়া গিয়েছে সেটা অবশ্য সত্যি নয়। তুমি লুকিয়ে কিছু তথ্য নিয়ে গিয়েছ। নিনীষ স্কেলে আট মাত্রার বুদ্ধিমান প্রাণীর জন্য সেটা নিঃসন্দেহে একটি অভূতপূর্ব ব্যাপার। যা-ই হোক, যা বলছিলাম—এখানে তোমাদের থেকে দুই মাত্রা উপরের বুদ্ধিমত্তার এনরয়েড ছাড়া আমিও রয়েছি।"

"আপনি কে?"

"বলতে পার আমি সম্মিলিত এনরয়েডদের বুদ্ধিমত্তা। তোমাদের মানুষের এই ক্ষমতা নেই, তোমরা তোমাদের মস্তিষ্কের সুষম অবস্থান করে তার ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পার না। আমরা পারি। অত্যন্ত প্রাচীন পদ্ধতি কিন্তু কার্যকর।"

"বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ?"

"হ্যাঁ মূলত বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ। যা-ই হোক আমি আমাদের এই আলোচনাটুকু যথাসম্ভব মানবিক করতে চাই। তাই আমরা এখানে চেয়ার এবং টেবিলের ব্যবস্থা করেছি। তোমাদের মস্তিষ্কে সরাসরি যোগাযোগ না করে তোমাদের সাথে কথা বলছি। প্রশ্ন করছি, প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। কথার মাঝে আবেগ প্রকাশ করছি, যখন প্রয়োজন তখন হাসছি, যখন প্রয়োজন কঠিন গলায় কথা বলছি।"

"আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।"

AMARBOI.COM

"সত্যি কথা বলতে কী, আমি ব্যাপারটি তোমাদের জন্য আরো সহজ করে দিতে চাই। আমি তোমাদের সামনে একজন মানুষের রূপ নিয়ে আসতে চাই—তোমাদের যেন মনে হয় তোমরা একজন মানুষের সাথে কথা বলছ।"

রুখ একটু অস্বস্তি নিয়ে সামনের শূন্য চেয়ারটির দিকে তাকাল, সেখানে মানুষের রূপ নিয়ে কিছু একটা বসে থাকলেই কি পুরো ব্যাপারটি তাদের জন্য খুব সহজ হয়ে যাবে?

কণ্ঠস্বরটি বলল, "আমি জানি তোমারা কী ভাবছ, কিন্তু দেখ ব্যাপারটি তোমাদের সাহায্য করবে। আমি কী রূপে আসব? পুরুষ না মহিলা?"

"কিছু আসে-যায় না।" রুখ মাথা নাড়ল, আপনি কী রূপে আসবেন তাতে আমার বিশেষ কিছু আসে-যায় না।"

"ক্রীনা? তোমার কোনো পছন্দ আছে?"

"মধ্যবয়স্ক পুরুষ। কাঁচাপাকা চুল। কালো চোখ। হাসিখুশি।"

"চমৎকার!" প্রায় সাথে সাথেই ঘরের দরজা খুলে একজন মধ্যবয়স্ক পুরুষ এসে ঢুকল, তার কাঁচাপাকা চুল, কালো চোখ এবং হাসিখুশি চেহারা। মানুষটি যে তার কল্পনার সাথে কীভাবে মিলে গিয়েছে সেটি দেখে ক্রীনা প্রায় শিউরে ওঠে, এই বুদ্ধিমান এনরয়েডরা সত্যিই তাদের মস্তিষ্কের গহিনে প্রবেশ করতে পারে।

মানুষটি চেয়ার টেনে বসে রুখ এবং ক্রীনার দিকে তাকিয়ে বলল, "কোনোরকম পানীয়?"

AMARBOI.COM

রুখ এবং ক্রীনা এই প্রথমবার একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। তারা আবার মানুষটির দিকে তাকাল, বলল, "না ধন্যবাদ।"

"ঠাণ্ডা পানি? বিশুদ্ধ পানি?"

"বেশ।"

প্রায় সাথে সাথেই একটি সাহায্যকারী রোবট এসে মানুষটির সামনে এক গ্লাস এবং তাদের দুজনের সামনে দুই গ্লাস পানি রেখে গেল। মানুষটি পানির গ্লাসে চুমুক দিয়ে তাদের দিকে তাকাল, একটু হেসে বলল, "আমার নাম রয়েড। মেতসিসের মূল নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রে আমি তোমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি।"

"মহামান্য রয়েড—" রুখ সোজা হয়ে বসে বলল, "আপনাকে—"

রয়েড হা হা করে হেসে বলল, "আমার সাথে তোমাদের ভদ্রতা বা সম্মানসূচক কথা বলার প্রয়োজন নেই। তোমরা একজন মানুষ অন্য মানুষের সাথে যেভাবে কথা বল, আমার সাথে ঠিক সেভাবে কথা বলতে পার।"

রুখ খানিকক্ষণ রয়েডের দিকে তাকিয়ে মুখে হাসি টেনে এনে বলল, "তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।"

ক্রীনা সোজা হয়ে বসে বলল, "এবারে তা হলে কাজের কথায় আসা যাক। আমি খুব ভয় পাচ্ছি, পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আমার ভিতরে একটা আতঙ্ক কাজ করছে। আমি এক মুহূর্তের জন্যও শান্তি পাচ্ছি না। আমি—"

"আমি জানি।"

"আমাদেরকে কি বলবে কেন আমাদের এনেছ? তোমরা তো আমাদের সম্পর্কে সব কিছু জান।"

রয়েডের মুখে হঠাৎ একটু গাম্ভীর্যের ছায়া পড়ল। সে চেয়ারে হেলান দিয়ে বলল,

"তোমরা দুজনেই অনেক বুদ্ধিমান, তোমরা কি অনুমান করতে পার কেন তোমাদের ডেকেছি?"

"আমরা?"

"হ্যাঁ।"

ক্রীনা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "সম্ভবত শাস্তি দেওয়ার জন্য।"

টেবিলে যে-ছয়টি রোবট বসেছিল তাদের মাঝে পিকো নামের রোবটটি যান্ত্রিক শব্দ করে সোজা হয়ে বলল, "আমার বিবেচনায় এই মেয়েটি সত্যি কথা বলেছে।"

রয়েড পিকোর দিকে তাকিয়ে বলল, "পিকো—তুমি কেন বলছ এই মেয়েটি সত্যি কথা বলছে?"

"যখন বিভিন্ন বুদ্ধিমত্তার অস্তিত্ব একসাথে থাকে তখন তাদের মাঝে স্তরভেদ রক্ষা করা না হলে গুরুতর সমস্যা হতে পারে। গতরাতের ঘটনায় সেটি রক্ষা করা হয় নি। মেতসিসের একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বিনষ্ট করা হয়েছে—"

ক্রীনা বাধা দিয়ে বলল, "কিন্তু—"

পিকো কঠোর স্বরে বলল, "আমি কথা বলার সময় আমাকে বাধা দেবে না।"

ক্রীনা থতমত খেয়ে বলল, "আমি দুঃখিত।"

"মেতসিসের পরিকল্পনা নষ্ট করায় এখানকার নিজস্ব রুটিন রক্ষা করা যাচ্ছে না। মানুষকে জানতে হবে তারা ইচ্ছে করলেই আমাদের পরিকল্পনায় বাধা দিতে পারবে না।"

রয়েডের মুখে এক ধরনের হাসি ফুটে উঠল, যেন সে ভারি একটা মজার কথা শুনছে, সে মাথা নেড়ে বলল, "যদি তবু তারা দেয়?"

"তা হলে তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।"

"সেটি কী রকম?"

"আমরা আগে কার্বন মনোঅক্সাইড দিয়ে তাদেরকে যন্ত্রণাশূন্যভাবে হত্যা করেছি। এখন থেকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করতে হবে।"

"কিন্তু সবাইকে যদি মেরে ফেলা হয় তা হলে এই ভয়ঙ্কর শাস্তির ঘটনাটা জানবে কে?"

"পরবর্তী মানুষেরা। পুরো ঘটনাটি তাদের স্মৃতিতে পাকাপাকিভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। ভবিষ্যতে তারা কখনো এরকম দুঃসাহস দেখাবে না।"

ক্রীনা আর নিজেকে সামলাতে পারল না, গলা উঁচিয়ে বলল, "আমি এর থেকে বড় নির্বুদ্ধিতার কথা আগে কখনো শুনি নি। তোমরা দাবি কর তোমরা মানুষ থেকে বুদ্ধিমান? এই হচ্ছে তোমাদের বুদ্ধির নমুনা?"

পিকো গর্জন করে বলল, "খবরদার মেয়ে, তুমি সম্মান বজায় রেখে কথা বলবে। তুমি জান, তোমাদের আমরা পোকামাকড়ের মতো পিষে পেলতে পারি?"

"আমরা মানুষেরা অকারণে কোনো কীটপতঙ্গকেও স্পর্শ করি না। অথচ তোমরা—মানুষের মতো প্রাণীকে শুধু যে হত্যা কর তাই না—তাদেরকে হত্যা করার ভয় দেখাও?"

পিকো হঠাৎ তার জায়গায় সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর ক্রীনার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে, চিৎকার করে বলে, "আমি এই মুহূর্তে তোমার মস্তিষ্ক বিদীর্ণ করে দেব, অপটিক নার্ভ ছিঁড়ে ফেলে বৈদ্যুতিক তরঙ্গে তোমার শরীর ছিন্নভিন্ন করে দেব। নির্বোধ মেয়ে—"

রয়েড বলল, "অনেক হয়েছে পিকো। তুমি থাম।"

পিকো থামার কোনো লক্ষণ দেখাল না, ক্রীনার দিকে এগিয়ে আসতেই লাগল। রয়েড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন তার হাত তুলে পিকোর দিকে লক্ষ করে একটি প্রচণ্ড বিদ্যুৎ-ঝলক ছুড়ে দেয়, মুহূর্তের মাঝে পিকোর পুরো মাথাটি একটা বিস্ফোরণ করে উড়ে যায়। মাথাবিহীন অবস্থায় পিকো দু-এক পা এগিয়ে এসে হঠাৎ করে থেমে যায়, পুরো জিনিসটিকে একটি বিকট রসিকতা বলে মনে হতে থাকে। ফ্যামটো নামের এনরয়েডটি শিস দেবার মতো শব্দ করে বলে, "এক শত বিয়াল্লিশ ঘণ্টার মাঝে পিকো দুবার ধ্বংস হল।"

রয়েড হাসতে হাসতে বলল, "পিকোকে পুনর্বিন্যাস করার সময় এবারে মানবিক অনুভূতি কমিয়ে আনতে হবে।"

"হ্যাঁ।" ফ্যামটো গম্ভীর গলায় বলল, "মানুষের সাথে কথা বলার জন্য মানবিক অনুভূতির প্রয়োজন নেই।"

রয়েড এবার ঘুরে রুখ এবং ক্রীনার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি খুব দুঃখিত—তোমাদের সামনে এ-ধরনের একটি দুর্ঘটনা ঘটানোর জন্যে।"

রুখ এবং ক্রীনা কোনো কথা বলল না, এক ধরনের আতঙ্ক নিয়ে একবার পিকোর বিধ্বস্ত দেহ এবং একবার রয়েডের দিকে তাকাল। রয়েড একটু সামনে ঝুঁকে বলল, "যা বলছিলাম, তোমরা কি এখন অনুমান করতে পার কেন তোমাদের এখানে আনা হয়েছে?"

রুখ একবার ক্রীনার দিকে তাকিয়ে একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "এইমাত্র যা ঘটল, তার পুরোটা নিশ্চয়ই সাজানো ঘটনা। তোমরা আমাদেরকে এনেছ বিশেষ প্রয়োজনে।"

"নিনীষ স্কেলে অষ্টম মাত্রা হিসেবে তোমরা যথেষ্ট বুদ্ধিমান। প্রয়োজনটা কি তোমরা আন্দাজ করতে পার?"

"না, পারি না।"

"চেষ্টা কর।"

"আমাদেরকে তোমরা কোনো কাজে ব্যবহার করবে।"

"কী কাজে?"

রুখ খানিকক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রয়েডের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর মাথা নেড়ে বলল, "তুমি প্রকৃত মানুষ নও, তুমি একটা মানুষের প্রতিচ্ছবি, তোমার দিকে তাকিয়ে আমি কিছু অনুমান করতে পারি না। তবে—"

"তবে কী?"

"তোমরা যে-কাজে আমাদের ব্যবহার করতে চাও সেটি—সেটি—"

"সেটি?"

"সেটি নিশ্চয়ই আমাদের জন্যে খুব ভয়ঙ্কর।"

রয়েড কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে রুখ এবং ক্রীনার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তোমরা মোটামুটি ঠিকই আন্দাজ করেছ। মেতসিস একটা বিচিত্র কক্ষপথে আটকা পড়ে আছে। কোনো একটা বুদ্ধিমান মহাজাগতিক প্রাণী আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে চাইছে। তারা আমাদের থেকেও বুদ্ধিমান—তাদের বুদ্ধিমত্তার কাছে তোমার আমার দুজনের বুদ্ধিমত্তাই একই রকম অকিঞ্চিৎকর। তাই—"

"তাই?"

"খবর নেওয়ার জন্য আমি তোমাদের একজনকে সেই প্রাণীর কাছে পাঠাব।"

"না—" রুখ আর্তচিৎকার করে বলল, "না। না—।"

রয়েড কোনো কথা না বলে স্থিরদৃষ্টিতে দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল। ভালবাসাহীন কঠোর সেই দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে রুখ হঠাৎ শিউরে ওঠে।

AMARBOI.COM

৯

রুখ ক্রীনার চোখের দিকে তাকাল, ক্রীনা একমুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে থেকে চোখ নামিয়ে নেয়। তার চোখে পানি এসে যাচ্ছিল সেটি সে রুখকে দেখতে দিতে চায় না। রুখ ক্রীনার মুখের উপর থেকে তার কালো চুল সরিয়ে নরম গলায় বলল, "আবার দেখা হবে ক্রীনা।"

ক্রীনা মাথা নেড়ে বলল, "দেখা হবে?"

"এখানে না হলে অন্য কোথাও।"

"অন্য কোথাও?"

"কখনো না কখনো তো বিদায় নিতে হতই। আমরা না-হয় একটু আগেই নিচ্ছি।"

ক্রীনা কোনো কথা বলল না, রুখের দিকে একনজর তাকিয়ে আবার চোখ নামিয়ে নেয়।

"কত সময় তোমাকে পেয়েছি সেটা তো বড় কথা নয়। তোমাকে পেয়েছি সেটা বড় কথা।" রুখ দুর্বলভাবে হেসে বলল, "মানুষ হয়ে জন্মালে মনে হয় খানিকটা দুঃখ পেতেই হয়। তাই না?"

ক্রীনা মাথা নেড়ে নিচু গলায় বলল, "আমি দুঃখিত রুখ। আমি খুব দুঃখিত যে তুমি আর আমি মেতসিসে মানুষ হয়ে জন্মেছি। আমরা যদি হাজার বছর আগে পৃথিবীতে মানুষ হয়ে জন্মাতাম—"

"কিছু আসে-যায় না ক্রীনা। একমুহূর্তের ভালবাসা আর সহস্র বছরের ভালবাসা আসলে একই ব্যাপার। আমাকে বিদায় দাও ক্রীনা।"

AMARBOI.COM

ক্রীনা জোর করে নিজেকে শক্ত করে মুখ তুলে দাঁড়ায়। তাদের ঘিরে মানুষের চেহারায় রয়েড আর বুদ্ধিমান এনরয়েডেরা দাঁড়িয়ে আছে, মানুষ থেকে বুদ্ধিমান এই যন্ত্রগুলোকে সে নিজের শোকটুকু বুঝতে দেবে না। সে হাত দিয়ে গভীর ভালবাসায় রুখের মুখমণ্ডল স্পর্শ করে নরম গলায় বলল, "বিদায় রুখ। যদি ঈশ্বর বলে কেউ থাকেন তিনি তোমাকে রক্ষা করুন।"

রুখ নিচু হয়ে ক্রীনার চুলে নিজের মাথা ডুবিয়ে প্রায় হঠাৎ করে ঘুরে দাঁড়াল, তার সামনে কিছু অমসৃণ পাথরের মাঝখানে আয়নার মতো এক স্বচ্ছ নীলাভ একটি পরদা। মহাজাগতিক প্রাণী মেতসিসের সাথে যোগাযোগের জন্যে এই মহাজাগতিক দরজা সৃষ্টি করেছে। এই স্বচ্ছ নীলাভ পরদার ভিতর দিয়ে রুখকে যেতে হবে। তার অন্য পাশে কী আছে রুখ জানে না। সেখানে তাকে কী করা হবে সেটাও সে জানে না। এক ভয়ঙ্কর অনিশ্চিত জগৎ। রুখ নিজেকে শক্ত করে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। নীলাভ স্বচ্ছ পরদার সামনে এসে সে একমুহূর্ত অপেক্ষা করে, মনে হয় সে বুঝি একবার ঘুরে তাকাবে, কিন্তু সে ঘুরে তাকাল না। লম্বা পদক্ষেপে সে নীলাভ স্বচ্ছ পরদার মাঝে প্রবেশ করল, মনে হল কিছু একটা যেন হঠাৎ করে তাকে গ্রাস করে নিল, টেনে ভিতরে নিয়ে গেল। স্বচ্ছ নীলাভ পরদায় একমুহূর্তের জন্য একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয়, বার-কয়েক কেঁপে উঠে সেটা আবার স্থির হয়ে যায়।

ক্রীনা অনেক চেষ্টা করেও চোখের পানিকে আটকে রাখতে পারল না। হঠাৎ করে আকুল হয়ে কেঁদে উঠল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রয়েড এক পা এগিয়ে এসে বলল, "তুমি চাইলে আমরা তোমার স্মৃতিকে মুছে দিতে পারি।"

"আমার এই স্মৃতিটুকুই আছে। সেটাও তোমরা মুছে দিতে চাও?"

"তুমি কি রুখকে দেখতে চাও?"

ক্রীনা চমকে উঠে বলল, "কী বললে?"

"আমি জানতে চাইছি, তুমি কি রুখকে দেখতে চাও?"

"সে কোথায়?"

"মহাজাগতিক প্রাণী মেতসিসের ভিতরে এই দরজাটা খুলেছে। এখান দিয়ে তারা কিছু একটা গ্রহণ করে, সেটাকে পরীক্ষা করে তারপর আবার ফিরিয়ে দেয়।"

"কোথায় ফিরিয়ে দেয়?" ক্রীনা আর্তস্বরে চিৎকার করে বলল, "কখন ফিরিয়ে দেয়?"

"এই মেতসিসে ঠিক এরকম আরেকটি দরজা খুলেছে সেদিক দিয়ে ফিরিয়ে দেয়। কখন ফিরিয়ে দেয় সেই প্রশ্নটির উত্তর খুব সোজা নয়। আমরা একটুকরা পাথর দিয়েছিলাম সেটা দুই হাজার বছর রেখে ফেরত পাঠিয়েছে!"

"দুই হাজার বছর? এটা কী করে সম্ভব? এই মেতসিস তার যাত্রা শুরু করেছে মাত্র সাত শ বছর আগে।"

"সম্ভব, আমরা কার্বন ডেটিং করে বের করেছি।"

"জীবন্ত কাউকে পাঠিয়েছ কখনো?"

"জীবন্ত প্রাণীকে এরা সাধারণত বিশ থেকে পঁচিশ বছর রাখে।"

ক্রীনা হাহাকার করে বলল, "বিশ থেকে পঁচিশ বছর?"

"হ্যাঁ। প্রথম প্রথম জীবন্ত প্রাণীকে তারা ঠিক করে বিশ্লেষণ করতে পারত না। একজন মানুষ ফিরে আসত পরিবর্তিত।"

"পরিবর্তিত?"

"হ্যাঁ। মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ওলটপালট হয়ে যেত। তারা বিকৃত হয়ে ফিরে আসত। বিকৃত এবং মৃত।"

ক্রীনা ভয়-পাওয়া-চোখে রয়েডের দিকে তাকিয়ে রইল।

"ইদানীং তারা মনে হয় জীবন্ত প্রাণীকে মোটামুটি ঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারে, শেষ মানুষটি জীবন্ত ফিরে এসেছে। বৃদ্ধ কিন্তু জীবন্ত।"

ক্রীনা হতচকিতের মতো বলল, "তার মানে একসময় রুখও ফিরে আসবে? জীবন্ত?"

"হ্যাঁ। আমার তাই বিশ্বাস।"

"সেটি কত দিন পরে?"

"কেউ জানে না। আমাদের এখানে সাথে সাথেই ফিরে আসে। কয়েক মাইক্রোসেকেন্ডের মাঝে, কিন্তু এর মাঝে তার দীর্ঘ সময় পার হয়ে যায়।"

"কী বলছ তুমি?" ক্রীনা চিৎকার করে বলল, "কী বলছ?"

"আমি ঠিকই বলছি।"

"তার মানে—তার মানে—রুখ এর মাঝে মেতসিসে ফিরে এসেছে?"

"আমি নিশ্চিত।"

"কোথায় আছে সে? কেমন আছে? বেঁচে আছে?"

রয়েড রহস্যময় ভঙ্গি করে হাসল, বলল, "তুমি নিজেই দেখবে। চল।"

১০

রুখ স্বচ্ছ নীলাভ পরদাটি স্পর্শ করতেই মনে হল কিছু একটা যেন হঠাৎ করে প্রবল আকর্ষণ করে তাকে টেনে নিল। রুখের মনে হল কেউ তাকে একটি নিঃসীম অতল গহ্বরে ছুড়ে দিয়েছে। সে দুই হাত–পা ছড়িয়ে আর্তচিৎকার করে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে, কিছু একটা ধরার চেষ্টা করে কিন্তু সে কিছুই আঁকড়ে ধরতে পারে না। অতল শূন্যতার মাঝে সে পড়ে যেতে থাকে। তার মনে হতে থাকে যে কোনো মুহূর্তে সে বুঝি কোথায় আছড়ে পড়বে, কিন্তু সে আছড়ে পড়ে না—গভীর শূন্যতায় নিমজ্জিত হতে থাকে।

রুখ চোখ খুলে তাকায়। চারদিকে নিকষ কালো অন্ধকার, মনে হয় আলোর শেষ বিন্দুটিও কেউ যেন শুষে নিয়েছে। সে প্রাণপণে দেখার চেষ্টা করে কিন্তু কোথাও কিছু নেই, কোনো আলো নেই, রূপ নেই। কোনো আকার নেই অবয়ব নেই, কোনো অস্তিত্ব নেই। এটি কি আসলে অন্ধকার? নাকি এটি আলোহীন অন্ধকারহীন এক অস্তিত্ব? রুখের হঠাৎ মনে হয় তার নিশ্চয়ই মৃত্যু হয়েছে। হয়তো এটিই মৃত্যু। যখন কোনো আদি নেই অন্ত নেই শুরু নেই শেষ নেই আলো নেই অন্ধকার নেই শুধু এক অবিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব সেটাই হয়তো মৃত্যু।

রুখ সেই আদিহীন অন্তহীন অস্তিত্বে নিজেকে সমর্পণ করে দেয়। তার বুকের মাঝে এক শূন্যতা খেলা করতে থাকে। গভীর বেদনায় কী যেন হাহাকার করে ওঠে। সে নিজেকে ফিসফিস করে বলে, "বিদায়।"

কিন্তু সেই কথা সে শুনতে পারে না। রুখ আবার চিৎকার করে ওঠে, "বিদায়।"

এক অমানবিক নৈঃশব্দ্য তাকে ঘিরে থাকে। রুখ নিজেকে স্পর্শ করার চেষ্টা করে কিন্তু সে তার দেহকে খুঁজে পায় না। সে কোথায়? তার চারপাশে রূপ–বর্ণ–গন্ধহীন এক অতিপ্রাকৃত জগৎ। তার চেতনা ছাড়া আর কিছু নেই সেখানে। শুধু তার চেতনা। এটাই কি মৃত্যু?

"না এটা মৃত্যু নয়।"

"কে? কে কথা বলে?"

"আমি।"

"আমি কে?"

"আমি। আমি হচ্ছি আমি।"

"আমি কোথায়?"

"তুমি এখানে।"

"এখানে কোথায়?"

"এখানে আমার কাছে।"

"কেন?"

"আমি দেখতে চাই। বুঝতে চাই।"

"কী দেখতে চাও?"

"তোমাকে।"

"কিন্তু এত অন্ধকার। তুমি কেমন করে দেখবে?"

"কে বলেছে অন্ধকার?"

রুখ অবাক হয়ে তাকাল, সত্যিই কি অন্ধকার? চারদিকে কি হালকা নরম একটা আলো নেই? সমস্ত চেতনা উন্মুখ করে সে তাকাল, দেখল কোমল একটা আলো ছড়িয়ে পড়ছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু শুধুমাত্র সেই হালকা নরম আলো, আর কিছু নেই। শুরু নেই, শেষ নেই, আদি নেই, অন্ত নেই, এক কোমল নরম আলোর বিস্তৃতি। রুখের হঠাৎ মনে হয় আসলে সব মায়া, সব কল্পনা, সব এক অতিপ্রাকৃত স্বপ্ন।

"না। এটি স্বপ্ন নয়।"

রুখ চমকে উঠল, "কে? কে কথা বলে?"

"আমি।"

"তুমি কি সত্যি?"

"তুমি যদি ভাব আমি সত্যি তবে আমি সত্যি।"

"আমি কি সত্যি?"

"হ্যাঁ, তুমি সত্যি।"

"তা হলে আমি নিজেকে দেখতে পাই না কেন? আমার দেহ কই? হাত–পা–চোখ-মুখ কই?"

"আছে।"

"কোথায় আছে?"

"আমার কাছে।"

"কেন?"

"কৌতূহল। আমি দেখতে চাই বুঝতে চাই। নতুন রূপ দেখলে আমার কৌতূহল হয়।"

"তুমি কি একা?"

"আমি একা। আবার আমি অনেক। একা এবং অনেক।"

"তুমি দেখতে কেমন?"

"আমার কাছে দেখার কোনো অর্থ নেই।"

"তোমার অবয়ব কেমন? আকৃতি কেমন?"

"এই কথার কোনো অর্থ নেই। আমি রূপহীন আকৃতিহীন।"

"আমাকে নিয়ে তুমি কী করবে?"

"দেখব।"

"কেমন করে দেখবে?"

"তোমাকে খুলে খুলে দেখব। একটি একটি পরমাণু খুলে খুলে দেখব।"

"দেখে কী করবে?"

"বুঝব।"

"কেন?"

"কৌতূহল। বুদ্ধিমত্তার আরেক নাম হচ্ছে কৌতূহল।"

রুখের চেতনা ধীরে ধীরে অসাড় হয়ে আসে। সে কি আছে না নেই সেটিও অস্পষ্ট হয়ে আসে। তার মনে হতে থাকে যুগ যুগ থেকে সে আদিহীন অন্তহীন এক অসীম শূন্যতায় ভেসে আছে। সময় যেন স্থির হয়ে আছে তাকে ঘিরে।

এভাবে কতকাল কেটে গেছে কে জানে? রুখের মনে হতে থাকে সে বুঝি তার পুরো জীবন কাটিয়ে দিয়েছে। এক অসীম শূন্যতা থেকে তার বুঝি আর মুক্তি নেই। তখন হঠাৎ কে যেন বলল, "চল।"

রুখের মনে হল এখন আর কিছুতেই কিছু আসে–যায় না।

কে যেন আবার বলল, "চল।"

AMARBOI.COM

"কোথায়?"

"ফিরে যাই।"

"ফিরে যাবে?"

"হ্যাঁ।"

"কে ফিরে যাবে? কোথায় ফিরে যাবে?"

"তুমি। তুমি আর আমি।"

"আমি? আমি আর তুমি?"

"হ্যাঁ।"

"তুমিও আমার সাথে যাবে?"

"হ্যাঁ।"

"কেমন করে যাবে?"

"তোমার চেতনার সাথে।"

"ও।"

রুখের হঠাৎ মনে হতে থাকে সে বুঝি ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। মনে হতে থাকে তার দেহ সে ফিরে পেয়েছে। হাত দিয়ে সে নিজেকে স্পর্শ করে, হাত-পা-মুখ নতুন করে আবিষ্কার করে। চিৎকার করে সে ধ্বনি শুনতে পায়। চোখ খুলে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মাঝে সূক্ষ্ম আলোর রেখা দেখতে পায়। হঠাৎ করে সেই আলো হঠাৎ তীব্র ঝলকানি হয়ে তাকে প্রায় দৃষ্টিহীন করে দেয়। রুখ চিৎকার করে ওঠে—প্রচণ্ড এক অমানবিক শক্তি যেন তাকে ছিন্নভিন্ন কর দিয়ে দূরে ছিটকে দেয়। রুখ কোথায় যেন আছড়ে পড়ল, প্রচণ্ড আঘাতে তার দেহ যন্ত্রণায় কুঁকড়ে ওঠে। কাতর চিৎকার করে সে কিছু একটা আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করে, শক্ত পাথরকে সে খামচে ধরে। মুখের মাঝে সে রক্তের লোনা স্বাদ অনুভব করে।

সমুদ্রের গর্জনের মতো চাপা কলরব শুনতে পায়—চোখ খুলে সে দেখে তার পরিচিত জগৎ। সে ফিরে এসেছে। মেতসিসে ফিরে এসেছে।

রুখ চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকে, নিজের ভিতরে হঠাৎ সে একটা ভয়ের কাঁপুনি অনুভব করে।

সে একা ফিরে আসে নি। তার সাথে আরো কেউ আছে।

১১

রুখ উঁচু একটা বিছানায় শুয়ে আছে। তাকে ঘিরে কয়েকটি বুদ্ধিমান এনরয়েড দাঁড়িয়ে আছে। তার বুকের কাছাকাছি কিছু যন্ত্র। রুখের হাত এবং পা স্টেনলেস স্টিলের রিং দিয়ে আটকানো। শরীর থেকে নানা আকারের কিছু টিউব বের হয়ে আছে। দেহের কাছাকাছি অসংখ্য মনিটর।

একটা বড় মনিটরের সামনে রয়েড দাঁড়িয়ে আছে, তার চেহারায় দুশ্চিন্তার চিহ্ন। ক্রীনা জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে রয়েড।"

"এটি রুখ নয়।"

ক্রীনা আতঙ্কে শিউরে উঠল, চাপা গলায় বলল, "কী বলছ তুমি?"

"হ্যাঁ। এটি মানুষ নয়।"

'মানুষ নয়?"

"না। তার ডি.এন. এ.-তে আরো নতুন বারো জোড়া বেস পেয়ার জুড়ে দেওয়া আছে।"

"তার মানে কী?"

"ডি. এন. এ. হচ্ছে মানুষের ব্লু প্রিন্ট। তার ভিতরে একজন মানুষের সব তথ্য সাজানো থাকে। এর মাঝে ডি. এন. এ.-তে নতুন বেস পেয়ার এসেছে, নতুন তথ্য এসেছে। সেই নতুন তথ্যের পরিমাণ অচিন্তনীয়।"

"তার মানে কী?"

"তার মানে এটি মানুষ নয়।"

"তা হলে এ-এ-কে?'

"মহাজাগতিক প্রাণীর একটি ডিকয়।"

"না!" ক্রীনা চাপা গলায় আর্তনাদ করে বলল, "না—এটা হতে পারে না। এ হচ্ছে রুখ। নিশ্চয়ই রুখ।"

"রুখ মানুষ ছিল। এটি মানুষ নয়। মানুষের ডি. এন. এ. ডাবল হেলিক্স, এখানে ছয় জোড়া হেলিক্সই আছে। আরো নতুন বারো জোড়া বেস পেয়ার।"

"এখন কী হবে?"

"এই ডিকয়টিকে বিশ্লেষণ করতে হবে।"

"বিশ্লেষণ?"

"হ্যাঁ। কেটে দেখতে হবে, শরীরের অংশ বুঝতে হবে। নতুন তথ্য জানতে হবে।"

"কিন্তু রুখের কী হবে?"

"রুখ? রুখ বলে এখানে কেউ নেই।"

রয়েড এক পা সামনে এগিয়ে গিয়ে এনরয়েডদের সাথে কথা বলে, বিজাতীয় যান্ত্রিক ভাষার দ্রুত লয়ের কথা—ক্রীনা ধরতে পারে না। ক্রীনা ভীত মুখে তাকিয়ে থাকে। আতঙ্কিত হয়ে দেখে উপর থেকে একটা যন্ত্র নেমে আসছে, নিচে ধারালো স্ক্যালপেল ঘুরছে। তার রুখকে এরা মেরে ফেলবে। ক্রীনা ছুটে গিয়ে রয়েডের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। রয়েডের যান্ত্রিক শক্তিশালী দেহ এক ঝটকায় তাকে দূরে ছুড়ে দেয়। দুটি প্রতিরক্ষা রোবট ক্রীনাকে ধরে ফেলে শক্ত হাতে আটকে রাখল। ক্রীনা অসহায় আতঙ্কে তাকিয়ে থাকে, উপর থেকে ধারালো স্ক্যালপেল নিচে নেমে আসছে আর একমুহূর্ত পরে সেটি রুখের পাঁজর কেটে ভিতরে বসে যাবে। ক্রীনা আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল।

সাথে সাথে স্ক্যালপেলটি থেমে গেল। ক্রীনা অবাক হয়ে দেখল সেটি আবার উপরে উঠে যাচ্ছে। রয়েড হতবুদ্ধি হয়ে তাকিয়ে থাকে। এনরয়েডগুলো ইতস্তত কিছু সুইচ স্পর্শ করে, হঠাৎ করে তারা সকল যন্ত্রপাতির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে।

"কী হচ্ছে এখানে?"

"মূল প্রসেসর কাজ করছে না।"

"কেন?"

"নতুন সিগনাল আসছে।"

"কোথা থেকে আসছে?"

"এই প্রাণীটি থেকে।"

ক্রীনা অবাক হয়ে রয়েড এবং বুদ্ধিমান এনরয়েডগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল—তারা

নিজেদের ভাষায় কথা বলছে, সে কিছু বুঝতে পারছে না কিন্তু তবুও তাদের বিপর্যস্ত ভাবটুকু ধরতে পারছে। কিন্তু একটা বড় ধরনের সমস্যা হয়েছে। যন্ত্রপাতির নিয়ন্ত্রণটুকু তারা হারিয়ে ফেলেছে।

রয়েড তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "এই প্রাণীটি কেমন করে সিগনাল পাঠাচ্ছে?"

"শরীরের মাঝে চার্জকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। চার্জকে ইচ্ছেমতো কম্পন করিয়ে বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ পাঠাচ্ছে। নিখুঁত কম্পন। যখন যত দরকার।"

"কিন্তু আমাদের প্রতিরক্ষা সিস্টেম?"

"উপেক্ষা করে চলছে।"

"অসম্ভব।"

"আমি আমার কপোট্রনে কম্পন অনুভব করছি। আমাকেও নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছি।"

"সরে যাও। সবাই সরে যাও।"

"সরে যাচ্ছি।"

"ফ্যারাডে কেজ বাড়িয়ে দাও।"

"দিয়েছি।"

"দ্বিতীয় মাত্রার প্রতিরক্ষা সিস্টেম চালু করতে হবে।"

"আমার কপোট্রনের কোমল প্রতিরক্ষা আক্রান্ত হয়েছে।"

"সরে যাও। সবাই সরে যাও। দ্বিতীয় মাত্রার প্রতিরক্ষার আড়ালে চলে যাও।"

"এই মেয়েটি? এই মেয়েটিকে কী করব?"

"সাথে নিয়ে এস।"

ক্রীনা হঠাৎ দেখল সবাই ঘর ছেড়ে সরে যাচ্ছে, প্রতিরক্ষা রোবট তাকে শক্ত করে ধরে টেনে নিতে থাকল। ক্রীনা চিৎকার করে বলল, "ছেড়ে দাও আমাকে। ছেড়ে দাও।"

কিন্তু তুচ্ছ মানুষের আর্তচিৎকারে কেউ কান দিল না।

ক্রীনাকে নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে গিয়ে বুদ্ধিমান এনরয়েডরা একটা ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। হলোগ্রাফিক স্ক্রিনে রুখকে লক্ষ করা হচ্ছে। শান্ত ভঙ্গিতে সে শক্ত বিছানায় শুয়ে আছে—তার দৃষ্টিতে কোনো উত্তেজনা নেই, এক ধরনের বিচিত্র আত্মসমর্পণের ভাব।

রয়েড যান্ত্রিক ভাষায় অন্যান্য এনরয়েডদের সাথে কথা বলতে শুরু করে। এই মুহূর্তে রুখ কী করছে জানতে চাইল। একজন এনরয়েড উত্তর দিল। "অবিশ্বাস্য ব্যাপার। সে মূল তথ্যকেন্দ্রে তথ্য পাঠাতে শুরু করেছে।"

"সর্বনাশ! এটি খুব বিপজ্জনক ব্যাপার।"

"হ্যাঁ। মূল তথ্যকেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া আর মেতসিসের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া একই ব্যাপার।"

"তাকে থামাতে হবে।"

"আমরা কোনো উপায় দেখছি না। এটি একজন সাধারণ মানুষ নয়। এটি মহাজাগতিক প্রাণীর একটি ডিকয়।"

"ক্রীনা নামে মেয়েটিকে দেখিয়ে ভয় দেখানো যেতে পারে। বলা যেতে পারে তাকে মেরে ফেলব।"

"চেষ্টা করে দেখি।"

একটি বুদ্ধিমান এনরয়েড রুখের সাথে যোগাযোগ করে তাকে জানাল সে যদি এই

AMARBOI.COM

মুহূর্তে মূল তথ্যকেন্দ্রে তথ্য পাঠানো বন্ধ না করে তা হলে ক্রীনাকে হত্যা করা হবে। রুখকে কেমন জানি বিভ্রান্ত দেখায়, সে ছটফট করে ওঠে এবং হঠাৎ কয়েকটি ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে পুরো মেতসিস কেঁপে উঠল। ঘরের ওপরে বসানো মূল মনিটরে তারা অবাক হয়ে দেখল তথ্যকেন্দ্রের মূল করিডোরে হঠাৎ করে একটি বিশাল রোবট কোথা থেকে জানি উদয় হয়েছে। রোবটটি মানুষের অনুকরণে তৈরি কিন্তু পুরোপুরি মানুষের মতো নয়। মুখমণ্ডলে এক ধরনের ভয়ঙ্কর নৃশংসতার চিহ্ন, দুটি হাত এক ধরনের সর্পিল ভঙ্গিতে নড়ছে, দেহে উচ্চচাপের বিদ্যুৎপ্রবাহ, সেখান থেকে কর্কশ শব্দে নীলাভ স্ফুলিঙ্গ বের হচ্ছে। রোবটটি তার শক্তিশালী হাতে ভয়ঙ্কর একটি অস্ত্র নিয়ে এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করতে শুরু করেছে।

নিরাপত্তা রোবটগুলো অতিকায় রোবটটিকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করে কিন্তু সেটি তার দেহের আকারের তুলনায় অত্যন্ত ক্ষিপ্র। তার ভয়ঙ্কর মুখমণ্ডলে এক ধরনের যান্ত্রিক নৃশংসতা খেলা করতে থাকে। সেটি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে একটি একটি করে নিরাপত্তা রোবটকে ভস্মীভূত করে দেয়। নিরাপত্তা রোবটগুলো তাদের ভস্মীভূত পোড়া দেহের ধ্বংসাবশেষ নিয়ে করিডোরে ইতস্তত দাঁড়িয়ে থাকে, পুরো এলাকাটি পোড়া গন্ধ এবং ধোঁয়ায় ভরে যায়। রোবটটি এক ধরনের বিজাতীয় গর্জন করতে করতে অতিকায় দানবের মতো এগিয়ে আসছে, বড় মনিটরে সেই দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ক্রীনা এক ধরনের আতঙ্ক অনুভব করতে থাকে। সে কাঁপা গলায় বলল, "রয়েড। এটি কী? কোথা থেকে এসেছে?"

"আমরা জানি না। মনে হয়—"

"মনে হয়?"

"মনে হয় তোমার বন্ধু রুখ এটি তৈরি করেছে।"

"রুখ তৈরি করেছে?" ক্রীনা চিৎকার করে বলল, "কী বলছ তুমি?"

"ঠিকই বলছি। মূল তথ্যকেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করেছে। কেন্দ্রীয় কারিগরি প্লান্টে নমুনা পাঠিয়ে তৈরি করে এনেছে—"

"কী বলছ তুমি!"

"হ্যাঁ। অত্যন্ত চমৎকার ডিজাইন। আমাদের পক্ষে এরকম কিছু তৈরি সম্ভব নয়। অবিশ্বাস্য।"

"কিন্তু—"

"তোমার বন্ধু রুখ আসলে এখন রুখ নয়। সে মহাজাগতিক প্রাণীর ডিকয়। আমরা ভেবেছিলাম সে আমাদের সাথে সহযোগিতা করবে। কিন্তু করছে না।"

"তোমরা এখন কী করবে?"

"আমরা অবশ্যই আত্মরক্ষার চেষ্টা করব। বুদ্ধিমান প্রাণীমাত্রই নিজেদের আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করে।"

ক্রীনা সবিস্ময়ে মনিটরটির দিকে তাকিয়ে থাকে। অতিকায় ভয়ঙ্করদর্শন একটি রোবট ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। হাতে ভয়াবহ একটি অস্ত্র আলগোছে ধরে রেখেছে। রয়েড মনিটরে লক্ষ করে কোনো একটি সুইচ স্পর্শ করল, সাথে সাথে ভয়ঙ্কর একটি বিস্ফোরণ অতিকায় রোবটটিকে আঘাত করল, সেটি প্রায় উড়ে গিয়ে করিডোরের এক কোনায় আছড়ে পড়ল কিন্তু প্রায় সাথে সাথেই সেটি উঠে দাঁড়ায়, উদ্যত অস্ত্রে আবার দ্বিগুণ নৃশংসতায় গুলিবর্ষণ করতে শুরু করে। প্রচণ্ড শব্দ, আগুন এবং ধোঁয়ায় পুরো এলাকাটি নারকীয় হয়ে ওঠে।

ক্রীনা চিৎকার করে বলল, "রয়েড।"

AMARBOI.COM

"কী হয়েছে?"

"আমার মনে হয় তোমাদের প্রচলিত অস্ত্র এর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।"

"আমারও তাই মনে হয়।"

"এটাকে আঘাত করার চেষ্টা করাটাই মনে হয় বিপজ্জনক।"

"আমারও তাই ধারণা। কিন্তু এর উদ্দেশ্য অত্যন্ত ভয়ানক।"

"এর কী উদ্দেশ্য?"

"আমাদের এনরয়েডদের এক জন এক জন করে ধ্বংস করা।"

ক্রীনা অবাক হয়ে রয়েডের দিকে তাকাল, বলল, "তুমি কেমন করে জান?"

"আমরা জানি, কারণ এটি আমাদের নিজস্ব কোডে সেটি বলছে। আমরা বুঝতে পারছি।"

"আর কী বলছে?"

"আর বলছে—" রয়েডকে হঠাৎ কেমন যেন বিপর্যস্ত দেখাল।

"কী বলছে?

"বলছে, তোমাকে কোনোভাবে স্পর্শ করা হলে সে পুরো নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র ধ্বংস করে দেবে।"

ক্রীনা সবিস্ময়ে কিছুক্ষণ রয়েডের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "তাই যদি সত্যি হয় তা হলে আমাকে বের হতে দাও। আমাকে দেখলে নিশ্চয়ই এটি শান্ত হবে।"

রয়েড মাথা নাড়ল। বলল, "আমারও তাই ধারণা।"

"দেখা যাক চেষ্টা করে।" ক্রীনা কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে একটু সাহস সঞ্চয় করে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। দরজা স্পর্শ করামাত্র সেটি নিঃশব্দে খুলে যায়। সামনে একটি দীর্ঘ করিডোর, করিডোরের শেষপ্রান্তে বিশাল ভয়ঙ্করদর্শন রোবটটি দাঁড়িয়ে আছে। রোবটটি তার অস্ত্র ক্রীনার দিকে উদ্যত করতেই ক্রীনা হাত তুলে চিৎকার করে বলল, "আমি ক্রীনা।"

ক্রীনার কথাটিতে প্রায় মন্ত্রের মতো কাজ হল। রোবটটি থেমে যায়, তার নৃশংস মুখে এক ধরনের কোমলতা ফিরে আসে। রোবটটি হাতের অস্ত্রটি নামিয়ে নেয় এবং হঠাৎ করে ঘুরে দীর্ঘ করিডোর ধরে হেঁটে ফিরে যেতে শুরু করে। কিছুক্ষণ আগে যে এই পুরো এলাকাটিতে এক ভয়ঙ্কর নারকীয় তাণ্ডব ঘটে গেছে সেটি আর বিশ্বাস হতে চায় না। খোলা দরজা দিয়ে প্রথমে রয়েড এবং তার পিছু পিছু বুদ্ধিমান এনরয়েডগুলো বের হয়ে আসে। ক্রীনা রয়েডের দিকে তাকিয়ে বলল, "রয়েড।"

"বল।"

"আমার মনে হয় তোমরা রুখকে যেতে দাও।"

"এই মুহূর্তে এ ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই।"

"একটা স্কাউটশিপে করে আমাদের দুজনকে তোমরা মানুষের বসতিতে পৌঁছে দাও।"

"বেশ। কিন্তু একটা জিনিস মনে রেখো—"

"কী জিনিস?"

"তুমি যাকে মানুষের বসতিতে নিয়ে যাচ্ছ সে তোমার বন্ধু রুখ নয়।"

ক্রীনা একমুহূর্ত রয়েডের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "হয়তো তোমার কথা সত্যি। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"তার ভিতরে নিশ্চয়ই রুখ লুকিয়ে আছে। আমি তাকে খুঁজে বের করব।"

"আমি তোমার সৌভাগ্য কামনা করছি ক্রীনা। তবে জেনে রেখো—"

"কী?"

"মেতসিসের নিয়ন্ত্রণ এখন আর আমাদের হাতে নেই।"

রুখের হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দেওয়ামাত্র সে ধড়মড় করে উঠে বসে ক্রীনার হাত আঁকড়ে ধরে কাতর গলায় বলল—

"ক্রীনা!"

ক্রীনা সবিস্ময়ে রুখের দিকে তাকিয়ে রইল, নরম গলায় বলল, "রুখ! তুমি আমাকে চিনতে পারছ?"

"চিনতে পারব না কেন? কী বলছ তুমি?"

"না, মানে—"

"এখানে কী হচ্ছে ক্রীনা? আমাকে এরকম করে বেঁধে রেখেছিল কেন? আর একটু আগে কী বলছিল আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তথ্যকেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে না দিলে তোমাকে হত্যা করবে—এর কী অর্থ? কেন বলছে এসব?"

ক্রীনা একদৃষ্টে রুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। সে কি কিছুই জানে না?

"ক্রীনা!" রুখ কাতর গলায় বলল, "তুমি এরকমভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছ কেন? কী হচ্ছে এখানে?"

"কিছু হচ্ছে না রুখ। মনে কর পুরো ব্যাপারটুকু একটা দুঃস্বপ্ন।"

"দুঃস্বপ্ন?"

"হ্যাঁ। ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন। এখন তুমি চল।"

"কোথায়?"

"আমরা মানুষের বসতিতে ফিরে যাব।"

রুখ চোখ বড় বড় করে ক্রীনার দিকে তাকিয়ে বলল, "বুদ্ধিমান এনরয়েডরা আমাদের যেতে দেবে?"

"হ্যাঁ। যেতে দেবে।"

"সত্যি?"

"সত্যি।"

রুখ বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ায়, সে টলে পড়ে যাচ্ছিল, ক্রীনাকে ধরে কোনোভাবে নিজেকে সামলে নেয়। ক্রীনা তাকে ধরে রেখে বলল, "চল যাই।"

"চল।" রুখ একমুহূর্ত থেমে বলল, "ক্রীনা।"

"কী হল?"

"একটা কথা বলি? তুমি হাসবে না তো?"

"না। হাসব না।"

"আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আমি একা নই। আমার সাথে আরো কেউ আছে। আরো কোনো কিছু।"

ক্রীনার সারা শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে, কিন্তু সে শান্ত গলায় বলল, "তোমার মনের ভুল রুখ। তোমার সাথে কেউ নেই।"

১২

স্কাউটশিপটা নামামাত্রই মানববসতির বেশকিছু মানুষ তাদের দিকে ছুটে এল। ক্রীনা রুখকে নিয়ে নেমে আসে। জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে রেখে সবার দিকে তাকিলে বলল, "তোমরা সবাই ভালো ছিলে?"

"হ্যাঁ। আমরা তো ভালোই ছিলাম। তোমাদের কী খবর! কিছুক্ষণ আগে মনে হল বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছি।"

"হ্যাঁ, কিছু বিস্ফোরণ হয়েছে।"

"কেন?"

ক্রীনা একটু ইতস্তত করে বলল, "বলব, সব বলব। আগে আমরা একটু বিশ্রাম নিই। তোমরা বিশ্বাস করবে না আমরা কিসের ভিতর দিয়ে এসেছি।"

"হ্যাঁ, চল।"

রুখ আর ক্রীনাকে নিয়ে সবাই হেঁটে যেতে থাকে। ক্রীনা জিজ্ঞেস করল, "রুহান কোথায়?"

"পরিচালনা-কেন্দ্রে। একটা ছোট সহায়তা সেল খোলা হয়েছে। সবাই খুব ভয় পাচ্ছে—তাই তাদেরকে সাহস দিচ্ছে।"

"তোমরা কেউ তাকে গিয়ে খবর দেবে?"

"ঠিক আছে, যাচ্ছি।" বলে একজন কম বয়সী তরুণী পরিচালনা-কেন্দ্রের দিকে ছুটে যেতে থাকে।

ছোট দলটিকে নিয়ে হেঁটে যেতে যেতে ক্রীনা আড়চোখে রুখের দিকে তাকাচ্ছিল। সে অত্যন্ত অন্যমনস্ক, মনে হচ্ছে তাঁর চারপাশে কী ঘটছে ভালো করে লক্ষ করছে না। হাঁটার ভঙ্গিটুকুও খানিকটা অস্বাভাবিক, অতিরিক্ত উত্তেজক পানীয় খাবার পর মানুষ যেভাবে হাঁটে অনেকটা সেরকম। রুখকে নিয়ে ক্রীনা হেঁটে তাদের বাসার কাছাকাছি পৌঁছাল। বাসার সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় দূরে রুহানকে দেখা গেল, সে খবর পেয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে চলে এসেছে। রুখ অন্যমনস্কভাবে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে, তখন রুহান পিছন থেকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকল, "রুখ।"

রুখ চমকে ঘুরে তাকাল। সে সিঁড়ির রেলিং ধরে রেখেছিল চমকে ঘুরে তাকানোর সময় রেলিঙে তার হাতের হেঁচকা টান পড়ল এবং সবাই অবাক হয়ে দেখল টাইটেনিয়ামের রেলিঙের অংশবিশেষ ভেঙে চলে এসেছে। রুখ রেলিঙের ছিন্ন অংশটুকু হাতে নিয়ে হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে বলল, "আরে, ভেঙে গেল দেখছি।"

একজন মানুষের হাতের আলতো স্পর্শে টাইটেনিয়ামের ধাতব রেলিং ভেঙে যেতে পারে ব্যাপারটি বিশ্বাসযোগ্য নয়, দৃশ্যটি দেখে সবাই কেন জানি এক ধরনের আতঙ্কে শিউরে উঠল। রুখ ভাঙা অংশটি আবার তার জায়গায় বসিয়ে সেটি ঠিক করার চেষ্টা করতে থাকে। ক্রীনা সবার আগে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "রেলিংটা নিশ্চয়ই ভাঙা ছিল।"

রুহান মাথা নাড়ল, বলল, "মানববসতির রক্ষণাবেক্ষণ কমিটিকে একটা কড়া নোটিশ পাঠানোর সময় হয়েছে।"

"ঠিকই বলেছ।" ক্রীনা রুখের পিঠ স্পর্শ করে বলল, "চল রুখ, তুমি শুয়ে একটু বিশ্রাম নেবে। তোমার উপর দিয়ে অনেক ধকল গিয়েছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুখ মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিকই বলেছ। ঠিক বুঝতে পারছি না, কিন্তু আমার কেমন জানি অস্থির লাগছে।"

"শুয়ে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নাও, ঠিক হয়ে যাবে।" ক্রীনা ঘুরে রুহানের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি রুখকে শুইয়ে দিয়ে আসছি।"

রুহান চিন্তিত মুখে বলল, "আমি আসব?"

"না। প্রয়োজন নেই।"

ক্রীনা রুখকে তার ঘরে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে খানিকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইল, রুখ বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে। ক্রীনা নরম গলায় ডাকল, "রুখ।"

"বল।"

"তোমার কী হয়েছে, রুখ?"

"আমি জানি না। শুধু মনে হচ্ছে, আমার ভিতরে আরো একজন আছে।"

"সে কে?"

"আমি জানি না।"

"সে কী চায়?"

"আমি জানি না।" রুখ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "মাঝে মাঝে মনে হয় আমি বুঝি আমি নই। মনে হয়—"

"কী মনে হয়?"

"মনে হয় আমি বুঝি অন্য কিছু।"

"সব তোমার মনের ভুল। শুয়ে একটু বিশ্রাম নাও, ঘুম থেকে উঠে দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে।"

রুখ শিশুর মতো মাথা নেড়ে বলল, "ঠিক আছে।"

ক্রীনা দরজা বন্ধ করে চলে আসছিল, তখন রুখ পিছন থেকে ডাকল, বলল, "ক্রীনা।"

"কী হল?"

"এই যে রেলিঙের ব্যাপারটা—"

রুখ কী বলতে চাইছে ক্রীনার বুঝতে অসুবিধে হল না কিন্তু তবু সে না বোঝার ভান করে বলল, "কোন রেলিং?"

"এই যে আমার হেঁচকা টানে সেটা ভেঙে গেল।"

"কী হয়েছে সেই রেলিঙের?"

"সেটা আসলে আমি ভেঙেছি। তাই না?"

ক্রীনা এক মুহূর্ত রুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "সেটা কি সম্ভব?"

"না। কিন্তু আমার ভিতরে যে আরেকজন আছে বলে মনে হয়—তার পক্ষে সম্ভব।"

ক্রীনা একটা চাদর দিয়ে রুখের শরীরকে ঢেকে দিতে দিতে বলল, "এটা নিয়ে তুমি এখন চিন্তা কোরো না। তুমি ঘুমাও রুখ। আমি আসছি।"

ক্রীনা বের হয়ে দেখল, বাইরে রুহান এবং সাথে আরো কয়েকজন নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে। ক্রীনা বের হতেই সবাই তার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। ক্রীনা হঠাৎ করে কেমন জানি ক্লান্তি অনুভব করতে থাকে।

রুহান একটু এগিয়ে এসে বলল, "ক্রীনা।"

"কী হল?"

AMARBOI.COM

"রুখের কী হয়েছে ক্রীনা?"

"আমি যদি সত্যিই জানতাম তা হলে খুব নিশ্চিন্ত বোধ করতাম।"

"তুমি জান না?"

"সে কিসের ভিতর দিয়ে গিয়েছে আমি জানি—কিন্তু তার কী হয়েছে আমি জানি না। তোমরা এস, আমি যেটুকু জানি সেটুকু বলছি।"

বড় হলঘরটাতে সবাই পাথরের মতো মুখ করে বসে আছে। রুহান সবাইকে এখানে উপস্থিত থাকার অনুমতি দেয় নি। শুধুমাত্র মানববসতির পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা রয়েছে। ক্রীনার মুখে পুরো ঘটনার বর্ণনা শুনে সবাই একেবারে হতচকিত হয়ে গিয়েছে। দীর্ঘ সময় কেউ কোনো কথা বলার মতো কিছু পেল না। শেষে রুহান একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আমরা খুব বিপদের মাঝে আছি। সবচেয়ে বড় বিপদের মাঝে রয়েছে রুখ।"

মানববসতি পরিচালনা পর্ষদের নিরাপত্তা শাখার দায়িত্বে নিয়োজিত মানুষটির নাম কিহিতা। তার সুগঠিত শক্তিশালী বিশাল দেহ। মধ্যবয়স্ক এই মানুষটি সাহসী এবং খুব কম কথার মানুষ। ক্রীনা যতক্ষণ কথা বলেছে সে খুব মনোযোগ দিয়ে নিজের বিশাল হাতের শক্তিশালী আঙুলের নখগুলো পরীক্ষা করেছে। সে একবারও ক্রীনার দিকে তাকায় নি কিংবা তাকে কোনো প্রশ্ন করে নি। কিহিতা রুহানের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি তোমার সাথে একমত নই।"

"তুমি কী বলতে চাইছ?"

"এখানে রুখ সবচেয়ে বিপদগ্রস্ত নয়। সে বিপদের কারণ।"

ক্রীনা চমকে উঠে বলল, "কী বলছ তুমি কিহিতা?"

"আমি ঠিকই বলছি। আজকে কী অবলীলায় সে টাইটেনিয়ামের রেলিংটা ভেঙে ফেলেছে সেটা দেখেছ?"

"কিন্তু—কিন্তু—"

"কীভাবে চোখের পলকে সে বিশাল ভয়ঙ্কর রোবট তৈরি করতে পারে সেটা তুমি নিজেই বলেছ ক্রীনা। রুখ বিপদগ্রস্ত নয়—রুখ বিপদের কারণ।"

ক্রীনা একটু আহত দৃষ্টিতে কিহিতার দিকে তাকিয়ে রইল। কিহিতা ক্রীনার দৃষ্টি উপেক্ষা করে বলল, "আমরা সম্ভবত মেতসিসে কিছু নিয়ম ভঙ্গ করেছি। আমাদের সম্ভবত বুদ্ধিমান এনরয়েডদের বিরুদ্ধাচরণ না করে তাদের সহযোগিতা করা উচিত।"

পরিচালনা পর্ষদের স্বাস্থ্য শাখার দায়িত্বে নিয়োজিত লাল চুলের মেয়ে মাহিনা কিহিতার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি কী ধরনের সহযোগিতার কথা বলছ?"

কিহিতা চোখ নামিয়ে বলল, "আমার কথাটি তোমাদের কাছে নিষ্ঠুরতা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আমি মনে করি রুখের দেহে অবস্থানকারী প্রাণীটিকে বুদ্ধিমান এনরয়েডের কাছে পৌঁছে দেওয়া উচিত।"

ক্রীনা চমকে উঠে বলল, "তুমি কী বলছ কিহিতা?"

"আমি ঠিকই বলছি ক্রীনা।" কিহিতা শান্ত গলায় বলল, "সত্যি কথা বলতে কী রুখের দেহে অবস্থানকারী প্রাণীটিকে মানববসতিতে আনা খুব অবিবেচকের মতো কাজ হয়েছে।"

রুহান খানিকটা বিচলিত হয়ে কিহিতার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি বারবার রুখের দেহে অবস্থানকারী প্রাণী বলে উল্লেখ করছ। কিন্তু রুখ কোনো মহাজাগতিক প্রাণী নয়। রুখ হচ্ছে রুখ।"

"তার একটা অংশ রুখ। মূলত সে একটি মহাজাগতিক প্রাণী।"

লাল চুলের মাহিনা জিজ্ঞেস করল, "তর্ক করে লাভ নেই, কিহিতা তুমি কী করতে চাও স্পষ্ট করে বল।"

"তোমরা একটি সহজ কথা ভুলে যাও। মেতসিসে আমরা বুদ্ধিমান এনরয়েডের অনুগ্রহে বসবাসকারী কিছু মানুষ। তারা না চাইলে একমুহূর্তে আমরা শেষ হয়ে যাব। তাদের সাথে সহযোগিতা করে যদি আমরা কয়দিন বেশি বেঁচে থাকতে পারি সেটিই আমাদের সার্থকতা। তাদের সাথে যুদ্ধ করে শেষ হয়ে যাওয়া নির্বুদ্ধিতা।"

মহিলা একটু অধৈর্য হয়ে বলল, "তুমি এখনো বলছ না তুমি ঠিক কী করতে চাও।"

"আমি রুখকে বুদ্ধিমান এনরয়েডের কাছে ফিরিয়ে দিতে চাই।"

ক্রীনা ক্রুদ্ধস্বরে বলল, "সেটি তুমি কীভাবে করতে চাও?"

"রুখকে হত্যা করে।"

হলঘরের সবাই চমকে উঠল। ক্রীনা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে কিহিতার দিকে তাকাল, কাঁপা গলায় বলল, "তুমি—তুমি—এ কী বলছ কিহিতা?"

"আমি মানববসতির নিরাপত্তার দায়িত্বে আছি ক্রীনা। আমাকে সবার কথা ভাবতে হবে। একটি মহাজাগতিক প্রাণীর জন্য—"

ক্রীনা চিৎকার করে বলল, "তুমি এভাবে কথা বলতে পারবে না, কিহিতা।"

রুহান সরু চোখে কিহিতার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি কেমন করে জান রুখকে হত্যা করাই হচ্ছে এই সমস্যার সমাধান?"

কিহিতা শীতল গলায় বলল, "আমি নিশ্চিত সেটিই হচ্ছে সমাধান।"

"কিন্তু তারা হত্যা করতে পারে নি।"

"আমরা মানুষ—মানুষের দুর্বলতা আমরা জানি। আমরা সম্ভবত এই কাজটি আরো সুচারুভাবে করতে পারব।"

"কিন্তু এটাই কি সমাধান?"

লাল চুলের মাহিনা বলল, "কিহিতার কথায় খানিকটা যুক্তি রয়েছে। এই মহাজাগতিক প্রাণী নিজে নিজে আসে নি। সে রুখের উপর ভর করে এসেছে। একটি প্রাণীকে যদি তার অস্তিত্বের জন্য অন্য একটি পোষকের উপর নির্ভর করতে হয় তা হলে সেই পোষককে হত্যা করা হলে প্রাণীটি বেঁচে থাকতে পারে না। এখানে রুখ হচ্ছে পোষক, তাকে হত্যা করে সম্ভবত মহাজাগতিক প্রাণীটিকে হত্যা করা সম্ভব।"

ক্রীনা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "তোমরা কি সবাই পাগল হয়ে গেছ? একজন মানুষকে বলছ পোষক! তাকে হত্যা করার কথা বলছ এত সহজে যেন সে মানুষ নয়, যেন সে একটি কীটপতঙ্গ!"

কিহিতা ক্রীনার দিকে তাকিয়ে বলল, "ব্যাপারটিকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিও না ক্রীনা। কারো বিরুদ্ধে আমরা কিছু করছি না। আমরা মানববসতিকে রক্ষা করার কথা বলছি।"

"তোমরা নিশ্চিত এটাই মানববসতিকে রক্ষা করবে?"

"আমরা জানি না। কিন্তু আমরা তো হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না। আমাদের কিছু একটা করতে হবে। আমরা যদি রুখকে হত্যা করতে পারি তা হলে মহাজাগতিক প্রাণীকে হত্যা করতে পারব। এ কথাটি তোমরা ভুলে যেও না আমরা এখানে বুদ্ধিমান এনরয়েডের অনুকম্পার উপর বেঁচে আছি। তাদেরকে যেভাবে সম্ভব সেভাবে সন্তুষ্ট রাখতে হবে। প্রাচীনকালে মানুষ যেভাবে অন্ধ বিশ্বাসে ঈশ্বরের আরাধনা করত আমাদের ঠিক সেই

AMARBOI.COM

একাগ্রতা এবং বিশ্বাস নিয়ে বুদ্ধিমান এনরয়েডদের পূজা করতে হবে। এটাই হচ্ছে আমাদের বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়।"

ক্রীনা চিৎকার করে বলল, "বিশ্বাস করি না। আমি তোমার একটি কথাও বিশ্বাস করি না। তুমি উন্মাদ—"

"তুমি কী বিশ্বাস কর বা না কর তাতে কিছু আসে-যায় না। আমি মানববসতির নিরাপত্তার দায়িত্বে আছি। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেব আমি।"

"তুমি বলতে চাইছ তুমি আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে—"

"হ্যাঁ। প্রয়োজন হলে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে।"

ক্রীনার সমস্ত মুখমণ্ডল ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে। সে ঘুরে সবার দিকে তাকাল। তীব্র কণ্ঠে বলল, "তোমরা সবাই এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন কর?"

"না।" রুহান মাথা নেড়ে বলল, "আমি সমর্থন করি না। কিহিতার সিদ্ধান্ত হচ্ছে একটি অত্যন্ত জটিল সমস্যার একটি অবিশ্বাস্যরকম সরল এবং হাস্যকর সমাধান। এটি সরল এবং অমানবিক। রুখ আমাদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠজন, তাকে এত সহজে—"

"আমি এই ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে চাই না।" কিহিতা কঠিন গলায় বলল, "কিছু কিছু সিদ্ধান্ত যুক্তিতর্ক ছাড়াই নিতে হয়।"

"তুমি এই সিদ্ধান্ত নিতে পার না।"

"আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যারা এর বিরোধিতা করবে আমাকে তাদের বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা নিতে হবে।"

রুহান এবং ক্রীনা এক ধরনের অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে কিহিতার দিকে তাকিয়ে রইল। কিহিতা পাথরের মতো নির্লিপ্ত মুখে তার পকেট থেকে যোগাযোগ-মডিউল বের করে নিরাপত্তা কেন্দ্রে যোগাযোগ করে।

কিছুক্ষণের মাঝেই ক্রীনা এবং রুহান নিজেদেরকে একটা ছোট ঘরে বন্দী হিসেবে আবিষ্কার করল।

AMARBOI.COM

১৩

কিহিতার সামনে চার জন শক্তিশালী মানুষ অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে ছিল, আপাতদৃষ্টিতে তাদের ভাবলেশহীন মনে হলেও ভালো করে লক্ষ করলে দেখা যাবে তারা খানিকটা বিচলিত। চোখের কোনায় যে চাপা অনুভূতিটি সেটি ভীতি।

কিহিতা তাদের সবাইকে ভালো করে লক্ষ করে বলল, "আমরা মানববসতিতে এই প্রথমবার এমন একটি কাজ করতে যাচ্ছি যেটি আগে কখনো করা হয় নি। কাজটি হচ্ছে হত্যাকাণ্ড। আমরা যাকে হত্যা করতে যাচ্ছি তার বাইরের অবয়ব একটি মানুষের। প্রকৃতপক্ষে আমরা যাকে হত্যা করতে যাচ্ছি তার বাইরের অবয়ব আমাদের অতি পরিচিত রুখের। কিন্তু সে রুখ নয় তার ডি. এন. এ. -তে ডাবল হেলিক্স নেই, সেটি ষষ্ঠ মাত্রার হেলিক্স। বেস পেয়ার বারোটি। তোমাদের কেউ কেউ দেখেছ সে হেঁচকা টান দিয়ে টাইটেনিয়ামের একটি রেলিং ভেঙে ফেলেছে।"

কিহিতা একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বলল, "তোমরা ইচ্ছে করলে কল্পনা করে নিতে পার একটি ভয়ঙ্কর বীভৎস মহাজাগতিক প্রাণী আমাদের রুখকে হত্যা করে তার দেহের ভিতরে

প্রবেশ করে আছে। এই ভয়ঙ্কর প্রাণীটিকে হত্যা করে আমরা রুখকে হত্যা করার প্রতিশোধ নেব।”

উপস্থিত চার জন কোনো কথা না বলে স্থির চোখে কিহিতার দিকে তাকিয়ে রইল। কিহিতা বলল, “মেতসিসের বুদ্ধিমান এনরয়েডরা তাকে হত্যা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। কাজেই কাজটি সহজ নয়। কিন্তু তাদের যে সকল সমস্যা ছিল আমাদের সেই সমস্যা নেই। আমরা মানুষ। মানুষের পক্ষে মানুষের কাছাকাছি রূপের প্রাণীকে হত্যা করা সহজ। আমরা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে এই মহাজাগতিক প্রাণীর কাছে উপস্থিত হব। শক্তিশালী বিস্ফোরক, স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র দিয়ে তাকে আঘাত করব। আমি আমাদের নিরাপত্তা সেলের সদস্যদের মাঝে থেকে সবচেয়ে সাহসী এবং দুর্ধর্ষ চার জনকে বেছে নিয়েছি। আমি জানি তোমরা মানববসতির অস্তিত্বের স্বার্থে এই কাজটি করতে পারবে। তবুও আমি জানতে চাই—এমন কেউ কি আছ যে এই কাজে অংশ নিতে ভয় পাচ্ছ?”

উপস্থিত চার জন কোনো কথা না বলে পাথরের মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল। কিহিতা জিজ্ঞেস করল, “তোমাদের কারো কোনো প্রশ্ন রয়েছে?”

এক জন হাত তুলে জানতে চাইল, “আমরা যদি মহাজাগতিক প্রাণীটিকে হত্যা করতে ব্যর্থ হই তা হলে কী হবে?”

কিহিতা খানিকক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, “আমরা ব্যর্থ হব না। তোমাদের আর কারো অন্য কোনো প্রশ্ন রয়েছে?”

কেউ কোনো কথা বলল না। কিহিতা তখন বলল, “চমৎকার। চল। আমরা আমাদের দায়িত্ব শেষ করে আসি।”

নিরাপত্তা সেলের ঘর থেকে রাতের অন্ধকারে কিহিতার পিছু পিছু চার জন সদস্য বের হয়ে এল।

রুখের ঘরের দরজা ধাক্কা দিতেই সেটি খুলে যায়। উদ্যত অস্ত্র হাতে প্রথমে কিহিতা এবং তাদের পিছু পিছু নিরাপত্তা সেলের চার জন সদস্য ঢুকল। রুখ তার বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে ছিল, তাদেরকে প্রবেশ করতে দেখে সে তার চোখ খুলে তাকায় এবং খুব ধীরে ধীরে বিছানায় উঠে বসে। কিহিতা এবং তার চার জন সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে কৌতূহলী চোখে বলল, “কে? কিহিতা?”

কিহিতা কোনো কথা না বলে তার হাতের উদ্যত অস্ত্র তার দিকে তাক করে ধরে। রুখ অবাক হয়ে বলল, “কী হয়েছে কিহিতা?”

কিহিতা কোনো কথা না বলে ট্রিগার টেনে ধরতেই তীক্ষ্ণ বিস্ফোরণের শব্দের সাথে সাথে রুখ তার বিছানা থেকে প্রচণ্ড আঘাতে দেয়ালে আছড়ে পড়ে। কিহিতা অস্ত্র নামিয়ে তাকাল এবং অবাক হয়ে দেখল রুখ খুব সাবধানে দেয়াল ধরে উঠে দাঁড়াচ্ছে। তার চেহারা বিপর্যস্ত, মুখে আতঙ্কের চিহ্ন, কাপড় শতছিন্ন কিন্তু দেহে আঘাতের কোনো চিহ্ন নেই। রুখ অবাক হয়ে কিহিতার দিকে তাকাল, ভয়-পাওয়া-গলায় বলল, “কিহিতা! তুমি কী করছ, কিহিতা?”

কিহিতার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে, হঠাৎ করে সে নিজের ভিতরে এক ধরনের অমানুষিক আতঙ্ক অনুভব করে। যে অস্ত্র টাইটেনিয়ামের দেয়াল ফুটো করে ফেলতে পারে সেটি দিয়ে রুখকে হত্যা করা যাচ্ছে না—এই মহাজাগতিক প্রাণীটির বিরুদ্ধে সে কীভাবে দাঁড়াবে?

AMARBOI.COM

কিহিতা আবার অস্ত্র তুলে নেয়, এবার তার সাথে অন্য চার জনও। ভয়ঙ্কর শব্দ করে তাদের হাতের অস্ত্র গর্জন করে ওঠে। তীব্র গতিতে বিস্ফোরক ছুটে যায়, ছোট ঘরটিতে হঠাৎ করে এক নারকীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। রুখ আর্তচিৎকার করে ওঠে, কালো ধোঁয়ায় ঘর ঢেকে যায়, বিস্ফোরকের গন্ধ ঘরের পরিবেশকে বিষাক্ত করে তোলে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আঘাতে ঘরের দেয়াল ভেঙে পড়ে এবং সেই ভাঙা দেয়াল দিয়ে রুখের বিধ্বস্ত দেহ ঘর থেকে ছিটকে বাইরে গিয়ে পড়ল।

কিহিতা তার অস্ত্র নামিয়ে বাইরে তাকাল। বিস্ফোরণের প্রচণ্ড ধাক্কায় চারিদিকে আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানে স্থানে ছোট আগুন জ্বলছে। তার মাঝে রুখের দেহ পড়ে আছে, মাতৃগর্ভে শিশু যেভাবে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে সেভাবে অসহায় ভঙ্গিতে শুয়ে আছে। তার দেহটি দাউদাউ করে জ্বলছে।

কিহিতা কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে, দেহটি নিশ্চল। সে একটা গভীর নিশ্বাস নিয়ে পিছনে তাকিয়ে তার সঙ্গী চার জনকে বলল, "আমাদের মিশন শেষ হয়েছে। আমরা প্রাণীটিকে শেষ পর্যন্ত হত্যা করতে পেরেছি। তোমাদের সবাইকে অভিনন্দন।"

সাথের চার জন কেউ কোনো কথা বলল না। কিহিতা অস্ত্রটি হাতবদল করে ঘর থেকে বের হয়ে এল। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এসে সে রুখের দেহের কাছে দাঁড়াল, শরীরের আগুন নিভে এসেছে। দেহটি এখনো নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে। সে একটু ঝুঁকে দেহটির দিকে তাকাল, প্রচণ্ড বিস্ফোরকের আঘাতে দেহটি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবার কথা কিন্তু সেটি অক্ষত। কিহিতা হঠাৎ এক ধরনের আতঙ্ক অনুভব করে। এই ধরনের বিস্ফোরকের আঘাতেও একটি দেহ কেমন করে অক্ষত থাকতে পারে? এই দেহ কী দিয়ে তৈরি?

কিহিতা সোজা হয়ে দাঁড়াল এবং হঠাৎ করে সে আতঙ্কে শিউরে উঠল, রুখের দেহটি আবার নড়ে উঠেছে। সে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে এবং রুদ্ধনিশ্বাসে দেখতে পায় রুখ খুব ধীরে ধীরে দুই হাতে ভর দিয়ে উঠে বসার চেষ্টা করছে। সমস্ত শরীরে পোড়া কালির চিহ্ন কিন্তু এখনো আশ্চর্যরকম অক্ষত দেহটি ক্লান্ত ভঙ্গিতে দুই হাঁটুর উপর মুখ রেখে বসে তারপর ঘুরে কিহিতার দিকে তাকায়। দুঃখী গলায় বলে, "কিহিতা! আমি কী করেছি? কেন আমাকে তুমি কষ্ট দিচ্ছ?"

কিহিতা হতবুদ্ধির মতো দাঁড়িয়ে থাকে এবং ঠিক তখন পিছন থেকে একটি আর্তচিৎকার শুনতে পেল। সে ঘুরে তাকাল এবং হঠাৎ করে তার সমস্ত শরীর পাথরের মতো জমে গেল। দূরে রুখের বাসার কাছে একটি মহাজাগতিক অতিপ্রাকৃত প্রাণী দাঁড়িয়ে আছে। রাতে দুঃস্বপ্নের মাঝে যে অশরীরী প্রাণী তাকে ভয়ঙ্কর আতঙ্কে তাড়া করে বেড়িয়েছে—সেই প্রাণীটিই এখন মূর্তিমান বিভীষিকার মতো দাঁড়িয়ে আছে।

প্রাণীটি দীর্ঘ—তার থেকে আরো একমাথা উঁচু। দেখে মনে হয় কোনো এক ধরনের সরীসৃপ কিন্তু এটি সরীসৃপ নয়। মনে হয় জীবন্ত একটি প্রাণীর চামড়া খুলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। প্রাণীটির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাইরে প্রকট হয়ে ঝুলছে, সমস্ত দেহটি থিকথিকে আঠালো এক ধরনের তরলে ভেজা। সেই তরল শরীর থেকে ফোঁটা ফোঁটা হয়ে নিচে ঝরছে। শক্তিশালী মাথা, লম্বা মুখ এবং সেখান থেকে সারি সারি ধারালো দাঁত বের হয়ে এসেছে। ছোট ছোট একজোড়া লাল চোখ তীক্ষ্ণ এবং ক্রূর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। বুকের কাছাকাছি একজোড়া হাত, তীক্ষ্ণ নখ, পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শরীরের ভারসাম্য রাখার জন্য পিছনে শক্তিশালী লেজ।

প্রাণীটি তার মুখ খোলে এবং সেখান থেকে লকলকে গলিত একটি জিভ বের হয়ে আসে। কিহিতা বিস্ফারিত চোখে প্রাণীটির দিকে তাকিয়ে থাকে এবং অবাক হয়ে দেখে

 ~ www.amarboi.com ~

বিশাল একটি শরীর নিয়ে আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় সেটি তার দিকে ছুটে আসছে। আর্তচিৎকার করে দুই হাত তুলে সে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। প্রাণীটি শক্ত চোয়াল দিয়ে তাকে কামড়ে ধরে মুহূর্তের মাঝে বন্যপশুর মতো ছিন্নভিন্ন করে ফেলল। বিচিত্র এক ধরনের অশরীরী শব্দ করতে করতে প্রাণীটি অন্যদের দিকে ঘুরে দাঁড়ায় এবং দ্বিতীয় আরেক জনকে আক্রমণ করে। অমানুষিক আতঙ্কে তারা চিৎকার করতে করতে ছুটে পালানোর চেষ্টা করে কিন্তু প্রাণীটি অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতায় তাদের আরো এক জনকে ধরে ফেলে। ভয়ঙ্কর নৃশংসতায় মানুষটির দেহটিকে ছিন্নভিন্ন করে জান্তব শব্দ করতে করতে সেটি অন্য আরেক জনের পিছনে ছুটতে শুরু করে। মানববসতির মাঝে হঠাৎ যেন এক অমানুষিক বিভীষিকা নেমে আসে।

রুখ ক্লান্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ায়। তার দেহের পোশাক ছিন্নভিন্ন হয়ে পুড়ে আছে, পুরো দেহ প্রায় নগ্ন। সমস্ত শরীরে মাটি কাদা এবং বিস্ফোরকের কালিঝুলি লেগে আছে। সে কোনোভাবে উঠে দাঁড়ায়, তারপর ক্লান্ত পায়ে টলতে টলতে হাঁটতে শুরু করে। তার বুকের ভিতরে এক গভীর নিঃসঙ্গতা হাহাকার করতে থাকে।

ক্রীনা শক্ত মেঝেতে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছিল, বিস্ফোরণের শব্দ শুনে চমকে উঠে বসে। ভয়ার্ত মুখে সে রুহানের মুখের দিকে তাকাল। রুহান কাছে এসে ক্রীনার মাথায় হাত রাখে। ক্রীনা রুহানের হাত ধরে কিছুক্ষণ বসে থাকে তারপর দুই হাতে মুখ ঢেকে আকুল হয়ে কেঁদে ওঠে। রুহান কী করবে বুঝতে পারে না। সে ক্রীনাকে দুই হাতে ধরে টেনে দাঁড় করায়, তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "ক্রীনা, শান্ত হও ক্রীনা। একটু ধৈর্য ধর।"

ঠিক তখন তারা মানুষের আর্তনাদ শুনতে পেল এবং হঠাৎ মনে হল বাইরে দিয়ে অমানুষিক শব্দ করতে করতে কিছু একটা ছুটে যাচ্ছে। মানববসতির নানা জায়গা থেকে মানুষের ভয়ার্ত চিৎকার শোনা যেতে থাকে। আতঙ্কিত লোকজন ছোটাছুটি করতে শুরু করেছে।

AMARBOI.COM

রুহান এবং ক্রীনা তাদের ঘরের ছোট জানালা দিয়ে বাইরে দেখার চেষ্টা করে কিন্তু কিছু বুঝতে পারে না। ছোট ঘরটির মাঝে আটকা পড়ে দুজন এক ধরনের অস্থিরতায় ছটফট করতে থাকে। কতক্ষণ এভাবে কেটে গিয়েছে জানে না। একসময় মনে হল কেউ একজন এসে তাদের ঘরের দরজা খোলার চেষ্টা করছে। খুট করে একটা শব্দ হল এবং দরজা খুলে কালিঝুলি মাখা একজন মানুষ ভিতরে ঢুকে আবার দরজা বন্ধ করে দিল। মানুষটির পিঠে একটি অস্ত্র ঝুলছে, চোখেমুখে ভয়াবহ আতঙ্ক, বড় বড় নিশ্বাস নিচ্ছে, মনে হয় সে ছুটতে ছুটতে এখানে এসেছে। ক্রীনা মানুষটিকে চিনতে পারল, সে নিরাপত্তা সেলের একজন সদস্য। ক্রীনা এবং রুহান অবাক হয়ে মানুষটির কাছে এগিয়ে গেল, জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

"মহাবিপদ! মহাবিপদ হয়েছে।" মানুষটি এত উত্তেজিত যে সহজে কথা বলতে পারে না, তার মুখে কথা জড়িয়ে যেতে থাকে।

"কী বিপদ হয়েছে?"

"মহাজাগতিক প্রাণী বের হয়ে গেছে। ভয়ঙ্কর একটা প্রাণী।"

"কোথা থেকে বের হয়েছে?" ক্রীনা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "রুখ কোথায়?"

মানুষটি মাথা নিচু করে বলল, "আমরা রুখকে হত্যা করতে চেষ্টা করেছিলাম। পারি নি।"

"পার নি?" ক্রীনার বুক থেকে একটা স্বস্তির নিশ্বাস বের হয়ে আসে। "পার নি?"

"না।"

"কী হয়েছে খুলে বল। তাড়াতাড়ি।"

মানুষটি মেঝেতে বসে ঘটনার বর্ণনা দিতে থাকে। ক্রীনা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মানুষটির দিকে তাকিয়ে থাকে—তার কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ তার কাছে একটি জিনিস স্পষ্ট হয়ে যায়। কী আশ্চর্য এই সহজ জিনিসটা আগে কেন তার চোখে পড়ে নি!

ক্রীনা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। রুহান অবাক হয়ে বলল, "কী হয়েছে ক্রীনা?"

"আমাকে যেতে হবে?"

"কোথায়?"

"রুখকে খুঁজে বের করতে হবে।"

রুহান তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ক্রীনার দিকে তাকাল, বলল, "তুমি এইমাত্র শুনেছ কিহিতার কী হয়েছে?"

"হ্যাঁ, শুনেছি।"

"তোমার কি মনে হয় না, কাজটি বিপজ্জনক? কিহিতা অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতা করেছে, কিন্তু তার নির্বুদ্ধিতা থেকে একটি জিনিস প্রমাণিত হয়েছে। রুখ আসলে রুখ নয়।"

"কিন্তু আরো একটা জিনিস প্রমাণ হয়েছে।"

"সেটা কী?"

"আমি বলব। তোমাদের বলব। কিন্তু তার আগে আমাকে যেভাবেই হোক রুখকে খুঁজে বের করতে হবে। ক্রীনা নিরাপত্তা সেলের মানুষটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "রুখ কোথায় গিয়েছে?"

"জানি না। শুনেছি সে মানববসতির বাইরের দিকে হেঁটে গেছে।"

ক্রীনা দরজা খুলে বাইরে যাবার জন্য দরজায় হাত রাখতেই রুহান এগিয়ে এল, বলল, "ক্রীনা।"

"কী হল?"

"সেই ভয়ঙ্কর প্রাণীটা এখনো বাইরে রয়েছে। তোমার কি এখন বাইরে যাওয়া ঠিক হবে?"

"আমার ধারণা সেই ভয়ঙ্কর প্রাণী আমাকে স্পর্শ করবে না।"

"কেমন করে তুমি এত নিশ্চিত হচ্ছ?"

"আমি জানি না। কিন্তু এরকম একটা পরিস্থিতিতে ছোট একটা বিশ্বাসকে শক্ত করে আঁকড়ে না ধরলে আমরা বেঁচে থাকব কেমন করে?"

ক্রীনা ঘরের দরজা খুলে অন্ধকারে বের হয়ে গেল।

১৪

রুখ মানববসতির বাইরে, যেখানে বনাঞ্চল শুরু হয়েছে তার গোড়ায় একটা বড় পাথরে হেলান দিয়ে বসেছিল। ক্রীনাকে দেখে সে কোমল গলায় বলল, "ক্রীনা! তুমি এসেছ?"

"হ্যাঁ।"

"আমার কেন জানি মনে হচ্ছিল তুমি আসবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"অবশ্যই আমি আসব।"

"তাই আমি এখানে অপেক্ষা করছি। মনে আছে যখন সবকিছু ঠিক ছিল তখন সারা দিন কাজের শেষে আমরা এখানে সময় কাটাতে আসতাম।"

"মনে আছে।"

"তোমাকে আমার খুব ভালো লাগত কিন্তু কখনো মুখ ফুটে বলি নি। আমার কেমন জানি সংকোচ হত।"

"আমি বুঝতে পারতাম।"

"সবকিছু কেমন জানি হঠাৎ করে শেষ হয়ে গেল।"

"না।" ক্রীনা রুখের কাছে এসে তার হাত স্পর্শ করে বলল, "কিছুই শেষ হয় নি।"

রুখ একটু অবাক হয়ে বলল, "কী বলছ তুমি? তুমি মনে কর এখনো আমাদের জীবনের কিছু অবশিষ্ট আছে? আমার জীবনের?"

"আছে।" ক্রীনা রুখকে গভীর ভালবাসায় আলিঙ্গন করে বলল, "আছে।"

"কী বলছ তুমি ক্রীনা? আমার কাছে আসতে তোমার ভয় করছে না? তুমি জান না আমি আসলে মানুষ নই। কিহিতা আর আরো চার জন তৃতীয় মাত্রার বিস্ফোরক দিয়ে আমাকে হত্যা করতে পারে নি?"

"আমি জানি।"

"তা হলে? তা হলে তোমার কেন ভয় করছে না?"

"কারণ আমি জানি আসলে তুমি রুখ।"

রুখ একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "না ক্রীনা আমি রুখ না। আমি মহাজাগতিক প্রাণী। তুমি জান না কী ভয়ঙ্কর নৃশংসতায় আমি কিহিতাকে হত্যা করেছি তার সঙ্গীদের হত্যা করেছি? তুমি জান না আমি কী ভয়ঙ্করদর্শন? কী কুৎসিত? কী নৃশংস। আমি দেখেছি।"

"না রুখ, আমি তোমাকে সেই কথাটিই বলতে এসেছি।"

"কী বলতে এসেছ?"

ক্রীনা রুখের হাতে চাপ দিয়ে বলল, "আমি তোমাকে বলতে এসেছি যে তুমি কাউকে হত্যা কর নি। তারা নিজেদেরকে নিজেরা হত্যা করেছে।"

"তুমি কী বলছ বুঝতে পারছি না।"

"তোমার সাথে যে মহাজাগতিক প্রাণী এসেছে সেটি ভয়াবহ নৃশংস নয়।"

"সেটি তা হলে কী?"

"আমরা সেটাকে যেরকম কল্পনা করব তারা ঠিক সেরকম। বুদ্ধিমান এনরয়েডদের কাছে এসেছিল ভয়াবহ বিশাল একটি রোবট হিসেবে। তারা যন্ত্র, তাদের চিন্তা-ভাবনাও রোবটকেন্দ্রিক। তারা ধরে নিয়েছে মহাজাগতিক প্রাণী তাদের বন্ধু নয়, তাদের শত্রু, তাই সেই রোবট এসেছিল অস্ত্র হাতে। ঠিক তারা যেরকম কল্পনা করেছে সেরকম। শত্রু হিসেবে এসে সেই রোবট তাদের ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল।

"কিহিতাও ভাবত মহাজাগতিক প্রাণী হচ্ছে ভয়ঙ্কর নৃশংস একটা প্রাণী। অতিকায় সরীসৃপের মতো ক্লেদাক্ত তার দেহ। নিষ্ঠুর তার আচরণ তাই তার সামনে সেই প্রাণী এসেছে ভয়ঙ্কররূপে। এসে তাকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে গেছে। ঠিক যেরকম সে আশঙ্কা করত।

"কিন্তু আমি তা ভাবি না। আমার সবচেয়ে যে প্রিয় মানুষটি তাকে তারা নিজেদের কাছে নিয়ে তাকে আবার আমার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছে। বুদ্ধিমান এনরয়েডদের আক্রমণ থেকে তাকে রক্ষা করেছে। আমাকে রক্ষা করেছে। কিহিতার নির্বুদ্ধিতা থেকে রক্ষা করেছে। আমি

সেই মহাজাগতিক প্রাণীকে কল্পনা করি ভালবাসার কোমল রূপে। আমার মা যেভাবে গভীর ভালবাসায় আমাকে বুকে চেপে বড় করেছে ঠিক সেভাবে। আমার সামনে যদি সেই মহাজাগতিক প্রাণী আসে আমি জানি সে আসবে ভালবাসার কোমল রূপে। আমি জানি।"

রুখ অবাক হয়ে ক্রীনার দিকে তাকিয়ে রইল। বলল, "তুমি তাই বিশ্বাস কর?"

"হ্যাঁ। আমি তাই বিশ্বাস করি। তুমি দেখতে চাও সেটি কি সত্যি না মিথ্যা?"

রুখ ঘুরে তাকাল। ক্রীনার দিকে তাকিয়ে বলল, "হ্যাঁ আমি দেখতে চাই।"

"তা হলে দেখ।"

ক্রীনা তার পোশাকের ভেতর থেকে একটা ধারালো ছোরা বের করে আনে। রুখ কিছু বোঝার আগে হঠাৎ করে সেটা দিয়ে এক পোঁচ দিয়ে নিজের কবজির কাছে বড় ধমনিটি কেটে ফেলল। ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয়ে এল সাথে সাথে, আর্তচিৎকার করে রুখ ক্রীনার হাত ধরে ফেলল, বলল, "কী করলে তুমি? ক্রীনা? কী করলে?"

"মহাজাগতিক প্রাণীকে আমি আনতে পারি না রুখ! মহাজাগতিক প্রাণীকে শুধু তুমিই আনতে পার।" ক্রীনা হাত থেকে গলগল করে বের হতে থাকা রক্তের ধারার দিকে সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে থেকে বলল, "আমাকে যদি এখন যথাযথভাবে চিকিৎসা করা না হয় তা হলে আমি মারা যাব। মানববসতি থেকে আমরা এত দূরে যে সেখানে আমাকে সময়মতো নেওয়া যাবে না।"

"কী বলছ তুমি?"

"হ্যাঁ। কিন্তু তুমি যদি আমাকে ভালবাস তুমি যদি খুব তীব্রভাবে চাও আমি বেঁচে থাকি তা হলে মহাজাগতিক প্রাণী তোমার ডাকে আমাকে বাঁচাতে আসবে।"

রুখ ক্রীনাকে জাপটে ধরে আর্তকণ্ঠে বলল, "আমি তোমাকে ভালবাসি। নিজের চাইতেও বেশি ভালবাসি। ক্রীনা, দোহাই তোমার।"

ক্রীনার মুখে ক্ষীণ একটা হাসি ফুটে ওঠে, "তুমি চাইলে আসবে। আমি জানি।"

রুখ ক্রীনার হাত ধরে রক্তের ধারাকে বন্ধ করার চেষ্টা করতে থাকে। ফিনকি দেওয়া রক্তে তার শরীর রক্তাক্ত হয়ে ওঠে। সে ভয়ার্ত অসহায় গলায় চিৎকার করে বলল, "কী করলে তুমি ক্রীনা? তুমি এ কী করলে? আমি তো চাই তুমি বেঁচে থাক, কিন্তু কেউ তো আসছে না! এখন কী হবে ক্রীনা?"

ঠিক তখন কে রুখের কাঁধে হাত রাখল। রুখ চমকে পিছনে ঘুরে তাকাল, সাদা নিও পলিমারের কাপড়ে ঢাকা একজন অপূর্ব সুন্দরী মহিলা তার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। রুখের দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বলল, "দেখি বাছা, আমাকে একটু দেখতে দাও।"

রুখ সাথে সাথে উঠে দাঁড়িয়ে জায়গা করে সরে দাঁড়াল। মহিলাটি ক্রীনার কাছে ঝুঁকে পড়ে, তার রক্তাক্ত হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে কোমল গলায় বলে, "পাগলী মেয়ে আমার। এরকম করে কেউ কখনো নিজের হাত কাটে?"

ক্রীনা অপলক চোখে এই অপূর্ব সুন্দরী মহিলার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "মা! তুমি এসেছ?"

"এসেছি। কথা বলবি না এখন। চুপ করে শুয়ে থাক দেখি। ইস! কী খারাপভাবে কেটেছে!"

ক্রীনা উঠে এসে হাত দিয়ে গভীর ভালবাসায় মহিলাটিকে জড়িয়ে ধরে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, "মা, আমি জানি তুমি আমার কল্পনা। কিন্তু তাতে কিছু আসে-যায় না। আমার কাছে তুমিই আমার সত্যিকারের মা।"

"আহ্! কী বকবক শুরু করলি—একটু স্থির হয়ে শুয়ে থাক দেখি। রক্তটা বন্ধ করা যায় কি না দেখি।"

ক্রীনা আবার শুয়ে পড়ল, মহিলাটি তার হাতের উপর ঝুঁকে পড়লেন, নিও পলিমারের একটুকরা কাপড় দিয়ে বেঁধে দিলেন, গভীর স্নেহে ক্ষতস্থানে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, "ইস! যদি একটু দেরি হত তা হলে কী হত?"

"কেন দেরি হবে মা? তুমি তোমার মেয়েকে বাঁচাতে আসবে না?"

"আমার আর অন্য কাজ নেই ভেবেছিস?"

"আমি তোমাকে আগে কখনো দেখি নি। একসময়ে ভেবেছিলাম দেখেছি কিন্তু পরে জেনেছি সব আমাদের মস্তিষ্কে বসানো কাল্পনিক স্মৃতি। বুদ্ধিমান এনরয়েডেরা বসিয়েছে। তুমি চিন্তা করতে পার আমার কোনো মা নেই? কোনো মাতৃগর্ভে আমার জন্ম হয় নি!"

ক্রীনার মা গভীর ভালবাসায় তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, "কে বলেছে তোর মা নেই? এই যে আমি। আমি কি তোর মা নই?"

"হ্যাঁ, মা। তুমি আমার মা।"

রূপবতী মহিলাটি এবারে ঘুরে রুখের দিকে তাকালেন, বললেন, "বাছা! তোমার এ কী অবস্থা? গায়ে কোনো কাপড় নেই। কালিঝুলি মেখে আছে!"

রুখ হতচকিতের মতো মহিলাটির দিকে তাকিয়ে রইল। মহাজাগতিক প্রাণী ক্রীনা কল্পনা থেকে এই অপূর্ব সুন্দরী মাতৃমূর্তিকে তৈরি করেছে। এটি সত্যি নয় কিন্তু তার খুব বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হল যে এটি সত্যি। সে ইতস্তত করে বলল, "একটা দুর্ঘটনায় পড়েছিলাম, গোলাগুলির বিস্ফোরণে—"

ক্রীনার মা নিজের শরীর থেকে একটুকরা নিও পলিমারের চাদর খুলে রুখের গায়ে জড়িয়ে দিলেন, সাথে সাথে তার সারা শরীরে এক ধরনের আরামদায়ক উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়ল। তিনি রুখের মাথায় হাত দিয়ে নরম গলায় বললেন, "আমার এই পাগলী মেয়েটিকে তুমি দেখে রাখবে তো বাছা?"

"রাখব। রাখব মা।"

ক্রীনা অপলক দৃষ্টিতে তার ক্ষণকালের মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে, সে তার বুকের ভিতরে এক ধরনের গভীর বেদনা অনুভব করে। তার মা তার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, "কিছু ভাবিস না মা সব ঠিক হয়ে যাবে।"

মা তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "আমি কি তোর সাথে মিছে কথা বলব?"

"কিন্তু কেমন করে সেটা সম্ভব? এই দেখ—রুখের দিকে তাকাও—তার ডি.এন.এ. পর্যন্ত পাল্টে দেওয়া আছে, বেস পেয়ার বারোটি। মেতসিসের দিকে তাকাও—বুদ্ধিমান এনরয়েডেরা আমাদের ইচ্ছেমতো তৈরি করে! ইচ্ছেমতো ধ্বংস করে! তুমিই বল এটি কি মানুষের জীবন?"

মা মুখ টিপে হাসলেন যেন সে ভারি একটা মজার কথা বলেছে! ক্রীনা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "কী হল? তুমি হাসছ কেন? তোমার কি মনে হচ্ছে এটা হাসির ব্যাপার?"

"না, পাগলী মেয়ে। এটা মোটেই হাসির ব্যাপার নয় কিন্তু তোরা যত ব্যস্ত হচ্ছিস সেরকম তো নয়।"

"কী বলছ তুমি?"

"ঠিকই বলছি। আয় আমার সাথে।"

"কোথায়?"

"আয়, গেলেই বুঝতে পারবি।"

AMARBOI.COM

মা ক্রীনাকে ধরে সাবধানে দাঁড়া করিয়ে দিলেন। ক্রীনা এখনো খুব দুর্বল, অন্য পাশে এসে রুখ তাকে ধরল। দুজন দুপাশে ধরে সাবধানে হেঁটে যেতে থাকে। বড় পাথরটির অন্য পাশে এসেই ক্রীনা এবং রুখ দেখতে পেল পাথরের গায়ে হালকা নীল পরদার মতো স্বচ্ছ একটি মহাজাগতিক দরজা। ঠিক এরকম একটি দরজা দিয়ে রুখ মহাজাগতিক প্রাণীর জগতে প্রবেশ করেছিল। আয়নার মতো স্বচ্ছ পরদার কাছে দাঁড়িয়ে ক্রীনার মা বললেন, "তোরা দুজন আয় আমার সাথে।"

ক্রীনা বলল, "ভয় করছে মা!"

"পাগলী মেয়ে! ভয়ের কী আছে? আমি আছি না সাথে?"

ক্রীনা তার মাকে জড়িয়ে ধরে। সত্যিই তো তার ভয়ের কী আছে? নিজের কল্পনায় তৈরি মা থেকে আপন আর কী হতে পারে এই জগতে? ক্রীনা এক পা এগিয়ে স্বচ্ছ আয়নার মতো হালকা নীল রঙের মহাজাগতিক দরজা স্পর্শ করল। সাথে সাথে মনে হল কিছু একটা যেন প্রবল আকর্ষণে টেনে নিল ভিতরে।

ক্রীনা ভয় পেয়ে ডাকল, "মা, মা তুমি কোথায়?"

"এই যে পাগলী মেয়ে, আমি আছি তোর সাথে।

ক্রীনা হঠাৎ করে দেখতে পায় আদিগন্তবিস্তৃত সবুজ বনভূমি, নীল আকাশ, আকাশে সাদা মেঘের সারি। দূরে নীল পর্বতশ্রেণী, পর্বতের শৃঙ্গে সাদা তুষার। প্রকৃতির এই অপূর্ব সৌন্দর্যে হঠাৎ করে ক্রীনার চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে আসে।

"পছন্দ হয় ক্রীনা?"

"হ্যাঁ। মা। কোথা থেকে এল এই জায়গা?"

"তোদের স্মৃতি থেকে তৈরি করেছি। নিশ্চয়ই পৃথিবীর স্মৃতি! তোদের অবচেতন মনে লুকিয়ে ছিল।"

"কী হবে এই জগৎ দিয়ে?"

"পৃথিবীর অনুকরণে নতুন প্রাণী সৃষ্টি হবে এখানে।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। তোর আর রুখের ডি. এন. এ. দিয়ে প্রথম মানুষের জন্ম হবে এখানে।"

"সত্যি মা?"

"হ্যাঁ। তোদের ভালবাসায় নতুন মানুষের জন্ম হবে এখানে। নতুন পৃথিবীর জন্ম হবে আবার।"

"সত্যি, মা? সত্যি?"

"হ্যাঁ! কী হল পাগলী মেয়ে, কাঁদছিস কেন তুই?"

"জানি না মা। আমি সত্যিই জানি না।"

১৫

বড় হলঘরের দরজা খুলে একজন কমবয়সী তরুণী এসে প্রবেশ করল, উত্তেজিত গলায় বলল, "স্কাউটশিপ! স্কাউটশিপ আসছে।"

"কয়টা?"

"একটা!"

AMARBOI.COM

রুখ আর ক্রীনা একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে হাসল। তারা আন্দাজ করতে পারে স্কাউটশিপে করে কে আসছে। কেন আসছে। কী দ্রুতই–না অবস্থার পরিবর্তন হয়।

রুহান গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করল, "রুখ, ক্রীনা, কী করবে এখন?"

"চল বাইরে যাই। হাজার হলেও বুদ্ধিমত্তার নিনীষ স্কেলে আমাদের উপরের স্তরে! প্রয়োজনীয় সম্মানটুকু না দেখালে কেমন করে হয়?"

স্কাউটশিপটা ঘুরে খোলা জায়গাটিতে এসে নামল। গোলাকার দরজাটি খুলে যায় এবং ভিতর থেকে রয়েড নেমে আসে। রুখ এবং ক্রীনা এগিয়ে গিয়ে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "আমাদের মানববসতিতে তোমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রয়েড।"

"ধন্যবাদ। আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য অনেক ধন্যবাদ।"

"রয়েড।"

"বল।"

"তোমরা কি আগে কখনো মানববসতিতে এসেছ?"

রয়েড কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "না, আসি নি। কখনো প্রয়োজন মনে করি নি।"

"এখন?"

রয়েড সহৃদয় ভঙ্গিতে হেসে ফেলল, "এখন আমাকে আসতেই হবে।"

"কেন?"

"তোমাদের একটা জিনিস পৌঁছে দিতে হবে।"

"কী জিনিস?"

রয়েড তার পকেট থেকে একটা ছোট ক্রিস্টাল বের করে রুখ এবং ক্রীনার দিকে এগিয়ে দিল। রুখ ক্রিস্টালটি হাতে তুলে নিয়ে বলল, "এটা কী?"

"প্রায় সাড়ে সাত শ বছর আগে মেতসিস যখন তার যাত্রা শুরু করেছিল তখন পৃথিবীর বিজ্ঞান একাডেমির মহাপরিচালক ছিলেন ক্লাউস ট্রিটন। ক্লাউস ট্রিটন এই মেতসিসে একরম জোর করে মানুষকে পাঠিয়েছিলেন। মেতসিসের মূল তথ্যকেন্দ্রে এই ক্রিস্টালটিতে তিনি মানুষের উদ্দেশে কিছু কথা বলে গিয়েছিলেন। ক্রিস্টালটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার কথা—যখন—"

"যখন?"

"যখন মেতসিসের সর্বময় দায়িত্বে থাকবে মানুষ।"

রুখ এবং ক্রীনা চমকে উঠে বলল, "কী বললে? কী বললে তুমি রয়েড?"

"ঠিকই বলেছি। মেতসিসের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পৃথিবীর বুদ্ধিমত্তাকে ছড়িয়ে দেওয়া। তোমরা সেই কাজটি করেছ। তোমাদের ডি. এন. এ. দিয়ে এখানে নতুন জগৎ তৈরি হয়েছে। মেতসিসে আমাদের দায়িত্ব শেষ হয়েছে।" রয়েড খানিকক্ষণ চুপ থেকে বলল, "আমাদের বিদায় নেবার সময় হয়েছে। এই মেতসিস তোমাদের। তোমরা এটিকে নিজের মতো করে গড়ে তোল।"

রুখ এবং ক্রীনা দাঁড়িয়ে রইল, দেখতে পেল রয়েড হেঁটে হেঁটে স্কাউটশিপে গিয়ে ঢুকছে। চাপা গর্জন করে শক্তিশালী ইঞ্জিন স্কাউটশিপটাকে ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়ে নেয়, তারপর সেটি উড়ে যেতে থাকে দূরে।

AMARBOI.COM

পরিশিষ্ট

বড় হলঘরটিতে মানুষেরা ভিড় করে এসে দাঁড়িয়েছে। রুখ হাত দিয়ে স্পর্শ করতেই হলোগ্রাফিক স্ক্রিনটা জীবন্ত হয়ে ওঠে। ঘরের মাঝামাঝি একটি যান্ত্রিক মানুষের মুখাবয়ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যান্ত্রিক মানুষটি নিচু কিন্তু স্পষ্ট গলায় কথা বলতে শুরু করে।

"আমি ক্লাউস ট্রিটন। পৃথিবীর বিজ্ঞান একাডেমির মহাপরিচালক। আমার অনুমান সত্যি হয়ে থাকলে তোমরা—মানুষেরা আমার বক্তব্য শুনছ। আমার স্বপ্ন সত্যি হয়ে থাকলে তোমরা—মানুষেরা আবার মেতসিসে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছ।

"বুদ্ধিমত্তার সংজ্ঞা হচ্ছে সেটিকে ছড়িয়ে দেবার ক্ষমতা। তোমরা সেটি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনো একটা ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছ। তোমাদের অভিনন্দন। মানুষের বুদ্ধিমত্তা পৃথিবীতে যেভাবে বিকশিত হয়েছিল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্য কোথাও সেটি আবার বিকশিত হোক।

"আমার অনুমান সত্যি হয়ে থাকলে এই মেতসিসে তোমাদের নতুন জীবন শুরু হয়েছে। আজ থেকে এর সর্বময় দায়িত্ব তোমাদের, মানুষের। পৃথিবীর বুক থেকে একদিন মানুষকে অপসারণ করে আমরা যে তীব্র অপরাধবোধে দগ্ধ হয়েছি আজ সেই অপরাধবোধ থেকে আমরা মুক্তি পেলাম। আমার প্রিয় মানবসন্তানেরা, তোমাদের জন্য আমার ভালবাসা।

"মানুষের ভালবাসাতে একদিন পৃথিবীতে যেভাবে মানবসভ্যতা গড়ে উঠেছিল, মেতসিসে সেই একইভাবে নতুন সভ্যতা গড়ে উঠুক। মানুষের জয়গানে মুখরিত হোক এই মহাজগৎ।"

হলোগ্রাফিক স্ক্রিন অন্ধকার হয়ে গেল। রুখ হাত বাড়িয়ে আলো জ্বালাতে চাইছিল, ক্রীনা নিচু স্বরে বলল, "জ্বালিও না।"

"জ্বালাব না?"

"না, থাকুক না অন্ধকার।"

রুখ দেখল ক্রীনার চোখের কোনায় অশ্রু চিকচিক করছে। সে গভীর ভালবাসায় তাকে আলিঙ্গন করে নিজের কাছে টেনে আনে।

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইরান

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম পর্ব

১

ইরন দীর্ঘসময় থেকে সমুদ্রের তীরে নির্জন বিস্তৃত বালুবেলায় একাকী বসে আছে। তার মন বিষণ্ন, বিষণ্নতার ঠিক কারণটি জানা নেই বলে এক ধরনের অস্থিরতা তার মনকে অশান্ত করে রেখেছে। ইরন অন্যমনস্কভাবে আকাশের দিকে তাকায়—একটা ভাঙা চাঁদ মেঘের আড়াল থেকে বের হওয়ার মিথ্যে চেষ্টা করে আবার মেঘের আড়াল হয়ে গেল। মেঘে ঢাকা চাঁদের কোমল আলোতে চোখের রেটিনায় বর্ণ অসংবেদী রড[১]-গুলো কাজ করছে—তাই চারদিক আবছা এবং ধূসর। মধ্যরাত্রিতে নির্জন বালুবেলায় সামনের বিস্তৃত নিস্তরঙ্গ সমুদ্রটিকে একটি অতিপ্রাকৃতিক দৃশ্য বলে মনে হয়। ইরনের পিছনে দীর্ঘ ঝাউগাছ, সমুদ্রের নোনা ভেজা হাওয়ায় সেগুলো দীর্ঘশ্বাসের মতো শব্দ করছে। হাহাকারের মতো সেই শব্দ শুনলেই বুকের মাঝে বিচিত্র এক ধরনের শূন্যতা এসে ভর করে।

ইরন তার বুকের মাঝে দুর্বোধ্য সেই শূন্যতা নিয়ে নিজের হাঁটুর উপর মাথা রেখে নিঃশব্দে বসে থাকে। হঠাৎ করে সে বুঝতে পারে সে বড় নিঃসঙ্গ এবং একাকী। তার বুকের ভিতরে যে বিষণ্নতা তার সাথে সে পরিচিত নয়, যে হতাশা তার মুখোমুখি হওয়ার সাহস নেই।

অথচ এ রকমটি হওয়ার কথা ছিল না। ইরন সুদর্শন, সুস্থ, সবল, নীরোগ একজন পুরুষ, তার বয়স মাত্র সাতাশ, এ রকম বয়সে একজন মানুষ দীর্ঘ প্রস্তুতির পর প্রথমবার সত্যিকার জীবনে প্রবেশ করে। নিজে দায়িত্ব বুঝে নেয়, নেতৃত্ব দেওয়া শুরু করে, আশপাশে অন্য মানুষেরা তার চিন্তা-ভাবনা-সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করতে শুরু করে। ইরন মেধাবী এবং পরিশ্রমী মানুষ ছিল। তার ভিতরে তীক্ষ্ণ এক ধরনের সৃজনশীলতা ছিল, জীবনকে ভালবাসার ক্ষমতা ছিল, উপভোগ করার আগ্রহ ছিল। সবচেয়ে বড় কথা তার ভিতরে সহজাত নেতৃত্বের একটা ক্ষমতা ছিল। তার সাতাশ বছর বয়সে সে সত্যিকারের সাফল্যের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। তারপর হঠাৎ করে কেমন জানি সবকিছু ওলটপালট হয়ে গেল। এক বছরের মাথায় তার যা-কিছু অর্জন সবকিছু যেন ভয়ঙ্কর ব্যর্থতা হয়ে তার কাছে ফিরে এল। সে কিছুতেই হিসাবটি মিলাতে পারে না, কেন তার ভাগ্য হঠাৎ করে তার বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য পণ করে ফেলেছে, প্রতিটি পদক্ষেপ হঠাৎ করে ভুল হতে শুরু

---

১ নির্ঘণ্ট দ্রষ্টব্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছে। প্রতিটি সিদ্ধান্ত ছেলেমানুষি হাস্যকর ব্যর্থতা হয়ে তাকে উপহাস করতে শুরু করেছে। ইরন সবিস্ময়ে আবিষ্কার করে তার ভিতরে সেই একাগ্র জীবনীশক্তি নেই, সেখানে কেমন যেন খাপছাড়া শূন্যতা। আনন্দ নেই, ভালবাসা নেই, স্বপ্ন নেই, সাহস নেই। শুধু এক ধরনের অসহায় বিষণ্ণতা।

রাতের আকাশে হঠাৎ মাথার উপর দিয়ে একটা রাতজাগা পাখি কর্কশ স্বরে শব্দ করে উড়ে গেল—এমন কিছু ভয়াবহ শব্দ নয় কিন্তু ইরন হঠাৎ করে চমকে ওঠে। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ায়, সমুদ্রের নোনা শীতল বাতাস ভিতরে একটা কাঁপুনি শুরু করে দিয়েছে, বাসায় ফিরে যাওয়া দরকার। নিজের বাসার কথা মনে করে ইরন আবার একটি লম্বা নিশ্বাস ফেলল। ঠিক কী কারণ সে জানে না, তার আজকাল বাসায় যাওয়ার ইচ্ছে করে না। দীর্ঘ রাত সে শহরতলির পথে-ঘাটে হেঁটে হেঁটে নিজেকে ক্লান্ত করে তবু বাসায় ফিরে যায় না। আজ অবশ্য সে বাসায় ফিরে যাবে। আজ তার সাতাশতম জন্মবার্ষিকী—হয়তো কেউ সেটা স্মরণ করে তার কাছে একটা শুভেচ্ছা পাঠিয়েছে। হয়তো কোনো পুরোনো বন্ধু বা বান্ধবী তার জন্য ভালবাসার কথা বলে গেছে, হয়তো সেটা দেখে আজ কিছুক্ষণের জন্য হলেও তার মন ভালো হয়ে যাবে।

কিন্তু বাসায় ফিরে ইরনের মন ভালো হয়ে গেল না—বরং নতুন করে আবার বিচিত্র এক ধরনের বিষণ্ণতা এসে তাকে গ্রাস করল। তার কোনো পুরোনো বন্ধু বা বান্ধবী তাকে স্মরণ করে কোনো শুভেচ্ছা রেখে যায় নি। আকাশের কাছাকাছি ছোট একটা অ্যাপার্টমেন্টের স্বচ্ছ কোয়ার্টজের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে নিচে বহু দূরে শহরে জীবনের চিহ্নের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ইরন বুঝতে পারল তাকে কী করতে হবে। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আপন মনে বলল, "কী আশ্চর্য—আমি এটা বুঝতে এত দেরি করলাম!"

ইরন স্বচ্ছ কোয়ার্টজের জানালাটির দিকে তাকাল—চারপাশে কয়েকটি সাধারণ ক্রোমিয়াম স্ন্যাপার দিয়ে আটকানো—মাঝারি আকারের একটা স্ক্রু ড্রাইভার হলেই সে জানালাটি খুলে নিতে পারবে। তারপর সেখানে দাঁড়িয়ে দুই হাত শূন্যে তুলে সে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এক কিলোমিটার উঁচু এই অ্যাপার্টমেন্ট থেকে নিচে পড়তে তার প্রায় পনের সেকেন্ড সময় নেবে, পনের সেকেন্ডে তার বেগ হওয়ার কথা ঘণ্টায় প্রায় চার শ কিলোমিটার—কিন্তু বাতাসের বাধার জন্য সেটা তার অর্ধেকে গিয়ে থেমে যাবে। ঘণ্টায় দু শ কিলোমিটার বেগে সে যখন নিচের শক্ত কংক্রিটে আঘাত করবে তখন তার মৃত্যু হবে তাৎক্ষণিক। তার সকল হতাশা, বিষণ্ণতা এবং যন্ত্রণার অবসানও হবে তাৎক্ষণিক। ব্যাপারটি চিন্তা করে অনেকদিন পর হঠাৎ ইরন নিজের ভিতরে এক ধরনের উল্লাস অনুভব করে।

ইরন ঘরের ভিতর ফিরে এল, খাবারের কাবার্ড থেকে সে একটা পানীয়ের বোতল বের করে তার বিছানায় বসে। নিজেকে শেষ করে দেবে সিদ্ধান্তটি নেবার পর সবকিছুকেই হঠাৎ করে খুব সহজ মনে হচ্ছে—কাজটি এই মুহূর্তে করা আর কয়েক ঘণ্টা পরে করার মাঝে সত্যিকার অর্থে কোনো পার্থক্য নেই।

ইরন তার অগোছালো বিছানায় পা তুলে বসে হাতের পানীয়ের বোতলটি থেকে এক ঢোক তরল গলায় ঢেলে নেয়। উত্তেজক বিতানীন[২] মিশ্রিত পানীয়, হঠাৎ করে তার সারা শরীরে এক ধরনের আরামদায়ক উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়ে।

ইরন হাত বাড়িয়ে যোগাযোগ মডিউলের টিউবটি স্পর্শ করতেই ঘরের ঠিক মাঝখানে পৃথিবীর সাদামাঠা মানুষের জন্য তৈরি হালকা আনন্দের একটি নাচ-গানের অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেল। অনুষ্ঠানটি স্বল্পরুচির মানুষদের জন্য তৈরি, ইরন কয়েক সেকেন্ডের বেশি

দেখতে পারল না। বিতানীন মিশ্রিত পানীয়টি পুরো বোতল শেষ করার আগে সে এই অনুষ্ঠানটি দেখতে পারবে বলে মনে হয় না। টিউব স্পর্শ করে সে চ্যানেল পাল্টাতে থাকে, প্রকৃতির ওপর একটি অনুষ্ঠান, ব্ল্যাক হোলের কাছাকাছি থেকে ঘুরে আসা মহাকাশযানের কৃত্রিম ভ্রমণবৃত্তান্ত, জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার করে মানুষের খাবারের জন্য তৈরি কৃত্রিম এক ধরনের প্রাণীর বিজ্ঞাপন, কিরি কম্পিউটারের কম্পোজ করা সঙ্গীত, দশ হাজার ভোল্ট বিদ্যুৎদণ্ড দিয়ে পরস্পরকে আঘাত করার এক ধরনের নির্বোধ খেলা—এই ধরনের কিছু অনুষ্ঠানে চোখ বুলিয়ে যোগাযোগ মডিউলটি বন্ধ করে দিতে যাচ্ছিল, ঠিক তখন ঘরের মাঝে ত্রিমাত্রিক হলোগ্রাফিক[৩] প্রতিচ্ছবিতে মধ্যবয়সী একজন মহিলাকে দেখতে পেল। মহিলাটি সোজা ইরনের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি কি বিষণ্ন এবং হতাশাগ্রস্ত? তুমি কি নৈরাশ্যবাদী এবং যন্ত্রণাকাতর? তুমি কি তোমার নিজের জীবনকে ধ্বংস করে দিতে উদ্যত হয়েছ? যদি সত্যিই তাই হয়ে থাকে তা হলে সব শেষ করে দেবার আগে আমাদের সাথে যোগাযোগ কর। মাত্র অল্প কিছু ইউনিটের বিনিময়ে আমরা হয়তো তোমার জীবন রক্ষা করতে পারব।"

হলোগ্রাফিক স্ক্রিনের মহিলাটি তার চোখে-মুখে এক ধরনের ব্যাকুলতার ভাব ফুটিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। নতুন কিরি কম্পিউটারে তৈরি এ ধরনের অনেক প্রোগ্রাম মানুষের বিনোদনের জন্য তৈরি হয়েছে। টুরিন টেস্টে[৪] উত্তীর্ণ এই ধরনের কৌশলী প্রোগ্রাম দীর্ঘ সময় মানুষের সাথে কথা বলে যেতে পারে, বুদ্ধিবৃত্তির একেবারে নিচের দিকের মানুষেরা এদের সাথে কথা বলে এক ধরনের তৃপ্তি পায় বলে জানা গেছে। ইরন কখনোই এ ধরনের প্রোগ্রামের সাথে কথা বলার চেষ্টা করে নি, আজ হঠাৎ করে কৌতূহলী হয়ে সে প্রোগ্রামটি চালু করল। তার ব্যাংক থেকে ইউনিট স্থানান্তর করার ব্যাপারটি নিশ্চিত করতে কয়েক সেকেন্ড সময় নিল এবং তারপর হঠাৎ করে মনে হল তার ঘরের ঠিক মাঝখানে মধ্যবয়সী একজন মহিলা এসে দাঁড়িয়েছে। মহিলাটি হলোগ্রাফিক স্ক্রিনে তৈরি একজন কৃত্রিম মানুষের প্রতিচ্ছবি জানার পরও একজন সত্যিকারের মানুষ বলে ইরনের ভুল হতে থাকে। মহিলাটি তার ঘরের চারপাশে তাকিয়ে সহৃদয়ভাবে হেসে বলল, "তোমার ঘরটি দেখে মনে হচ্ছে একটা ছোটখাটো বিপর্যয় ঘটে গেছে।"

ইরন মাথা নাড়ল, বলল, 'হ্যাঁ।'

মহিলাটির পিছনে একটা চেয়ার, সেটাও কৃত্রিম। মহিলাটি চেয়ারটির কাছে গিয়ে বলল, "বসতে পারি?"

"হ্যাঁ, বস।"

"কাজের কথায় চলে আসা যাক, কী বল?"

ইরন এক ধরনের কৌতুক অনুভব করে, সে আরো এক ঢোক পানীয় খেয়ে বলল, "তুমি তো আসলে সত্যিকারের মানুষ নও—কাজেই তোমার সাথে যদি ভদ্রতাসূচক কথাবার্তা না বলি তুমি কিছু মনে করবে না তো?"

ইরনের স্পষ্ট মনে হল তার এই রূঢ় কথাটিতে হলোগ্রাফিক স্ক্রিনের মহিলাটি একটু আহত হয়েছে। মহিলাটি অবশ্য সহজেই নিজেকে সামলে নিয়ে নরম গলায় বলল, "না, আমি কিছু মনে করব না। তবে আমি তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি—তুমি যদি খোলামেলাভাবে আমার সাথে কথা বল হয়তো সত্যিই তোমাকে সাহায্য করতে পারব।"

"মনে হয় না।" ইরন সোজা হয়ে বসে বলল, "তোমাদের তৈরি করা হয়েছে হালকা আমোদের জন্য—"

"না, ইরন।" মহিলার মুখে নিজের নাম শুনে ইরন একটু চমকে ওঠে কিন্তু মহিলাটি সেটা ঠিক লক্ষ করল না, মুখে এক ধরনের গাম্ভীর্য ফুটিয়ে বলল, "আমি এখানে আসার আগে তোমার সম্পর্কে সব খোঁজখবর নিয়ে এসেছি। তথ্যকেন্দ্রে যেসব তথ্য আছে সেটা থেকে মনে হচ্ছে তুমি সত্যি সত্যি এক–দুই দিনের মাঝে আত্মহত্যা করবে। আমি সত্যিই তোমাকে সাহায্য করতে পারি। আমি সত্যিকারের মানুষ না হতে পারি, কিন্তু আমি সত্যিকারের সাহায্য করতে পারি।"

"আমার সম্পর্কে তোমার কী কী তথ্য আছে?"

"আমরা জানি কিছুদিন আগেও তুমি একজন প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানী হিসেবে পরিচিত ছিলে। ওয়ার্মহোল[৫] রিসার্চে তোমার কিছু গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার আছে। ওয়ার্মহোল তৈরির ব্যাপারে তোমার কিছু নিজস্ব ধারণা আছে—"

"এবং সেই ধারণা কাজে লাগাতে গিয়ে আমি পৃথিবীর সামনে নিজেকে গর্দভ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছি।"

মহিলাটি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "ব্যবহারিক বিজ্ঞানের পরীক্ষাতে দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে।"

"দুর্ঘটনা? তুমি এটাকে দুর্ঘটনা বলছ? একটা শহরের আধখানা উড়ে যাওয়া দুর্ঘটনা?"

"নিশ্চয়ই দুর্ঘটনা।"

"পর পর তিনবার একই দুর্ঘটনা!"

মহিলাটি একটু নড়েচড়ে বলল, "হ্যাঁ, পর পর একই ধরনের তিনটি দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা খুব কম। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"মানুষের জীবনে খুব কম সম্ভাবনার ঘটনা তো ঘটে। তুমি নিশ্চয়ই জান যে একজন মানুষের মাথায় দুবার বজ্রপাত হয়েছিল।"

ইরন মাথা নাড়ল, "না, জানি না। কিন্তু তাতে কিছু আসে-যায় না। সেই হতভাগা মানুষের জীবনে কী হয়েছিল কে জানে! কিন্তু আমি বাজি ধরে বলতে পারি তার আমার মতো অবস্থা হয় নি। কোনো কাজ নেই, কর্ম নেই, কথা বলার লোক নেই, একাকী উন্মাদের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি—"

মহিলাটি বাধা দিয়ে বলল, "এটাই জীবন। এটাই মানুষের জীবন। কখনো আনন্দ, কখনো বেদনা, কখনো সুখ, কখনো—"

ইরন হঠাৎ তার বিছানায় সোজা হয়ে বসে তীব্র গলায় চিৎকার করে উঠল, "চুপ কর। চুপ কর তুমি।"

মহিলাটি বিভ্রান্তের মতো বলল, "চুপ করব?"

"হ্যাঁ। তুমি মানুষের জীবনের কী জান? কিছুই জান না। তার কষ্টের কথা যন্ত্রণার কথা বোঝার ক্ষমতা তোমার নেই! তুমি একটা তৃতীয় শ্রেণীর প্রোগ্রাম ছাড়া আর কিছুই না—" ইরন চিৎকার করে বলল, "তুমি আমাকে জীবন সম্পর্কে বক্তৃতা শোনাতে এসো না।"

মহিলাটি আহত মুখে বলল, "আমি ভেবেছিলাম তুমি তোমার জীবনের কষ্ট, হতাশা আর যন্ত্রণার কথা নিয়ে আমার সাথে কথা বলবে। আমি তো নিজে থেকে আসি নি। তুমি আমাকে ডেকে এনেছ।"

ইরন উত্তেজিত গলায় বলল, "হ্যাঁ। তোমাকে আমি ডেকে এনেছিলাম, এখন আমিই তোমাকে বিদায় করে দিচ্ছি। তুমি দূর হও এখান থেকে।"

মহিলাটি তুমি ধরনের বিস্ময় নিয়ে ইরনের দিকে তাকিয়ে রইল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "তোমার কমিউনিকেশান্স মডিউলের টিউবে স্পর্শ করলেই আমি চলে যাব ইরন। আমি নিজে থেকে যেতে পারি না।"

"বেশ, তা হলে আমি তোমাকে সেভাবেই বিদায় করছি।" ইরন টিউবটি স্পর্শ করতে হাতটি এগিয়ে দিতেই মহিলাটি স্থির চোখে ইরনের দিকে তাকিয়ে বলল, "দাঁড়াও, ইরন।"

"কী?"

"তুমি কি সত্যিই আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছ?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি কোনোভাবে তোমার মত পাল্টাবে না?"

"না।"

"তা হলে—"

"তা হলে কী?"

"তা হলে তুমি তোমার আত্মহত্যাকে আরো একটু অর্থবহ কর না কেন? সম্পূর্ণ অকারণে নিজেকে মেরে ফেলে কী লাভ? তুমি যদি—"

"আমি যদি—"

"তুমি যদি একটা খুব বিপজ্জনক প্রজেক্টে অংশ নাও, যেখানে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী—সেটি কি একটা মহৎ কাজ হয় না?"

ইরন দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, "তুমি কী বলতে চাইছ?"

"মনে কর প্রজেক্ট আপসিলনের[৬] কথা। এই প্রজেক্ট মানবসভ্যতার একটা নতুন দ্বার খুলে দেবে। অথচ এর মতো বিপজ্জনক প্রজেক্ট কখনো প্রস্তুত হয় নি। কারো বেঁচে আসার সম্ভাবনা দশমিক শূন্য শূন্য তিন। আত্মহত্যা না করে তুমি যদি এই প্রজেক্টে যোগ দাও—"

ইরন আর নিজেকে সামলাতে পারল না। বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে পানীয়ের বোতলটি মহিলার উদ্দেশে ছুড়ে মারল। হলোগ্রাফিক প্রতিচ্ছবির ভিতর দিয়ে বোতলটি ছুটে গিয়ে দেয়ালে আঘাত করে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ভেঙে পড়ল। ইরন চিৎকার করে বলল, "বেরিয়ে যাও তুমি, বেরিয়ে যাও এখান থেকে। মানুষের প্রাণ নিয়ে তুমি ব্যবসা করতে এসেছ?"

মহিলাটি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে, তার চেহারায় এক ধরনের ভয়ের ছাপ পড়ল, সে আতঙ্কিত হয়ে ইরনের দিকে তাকিয়ে রইল। ইরন দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, "আমি যদি তোমাকে ধরতে পারতাম, গলা টিপে খুন করে ফেলতাম।"

"কিন্তু তুমি তো ধরতে পারবে না। আমি—আমি তো সত্যি নই। আমাকে তো ধরা-ছোঁয়া যায় না।"

"জানি। তোমাকে ধরা-ছোঁয়া যায় না। কিন্তু তুমি মানুষ মারা প্রজেক্টের জন্য লোক ধরে নিতে এসেছ? বেছে বেছে খোঁজ করছ আমার মতো মানুষদের!"

মহিলাটি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, ইরন তার আগেই কমিউনিকেশান্স মডিউলের টিউব স্পর্শ করে মহিলাটিকে অদৃশ্য করে দিল। ঘরের ভিতর হঠাৎ করে তার অবিন্যস্ত মন-খারাপ-করা শোয়ার ঘরটি ফিরে আসে। দেয়ালে পানীয়ের লাল ছোপ, মেঝেতে ভাঙা বোতলের কাচ ছড়ানো। ইরন সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ অপ্রকৃতিস্থের মতো হেসে উঠল, কী আশ্চর্য, সে একটা কৌশলী প্রোগ্রামের সাথে রাগারাগি করছে। কেমন করে সে এরকম হাস্যকর ব্যবহার করতে পারল?

ইরন কোয়ার্টজের জানালার দিকে তাকাল, একটা বড় স্ক্রু ড্রাইভার এনে ক্রোমিয়ামের স্ন্যাপারগুলো খুলে সে এখনই জানালা দিয়ে নিচে লাফিয়ে পড়তে পারে কিন্তু হঠাৎ করে তার কেমন জানি ক্লান্তি লাগতে থাকে। কিছু না করার ক্লান্তি। অবসাদের ক্লান্তি। সে শ্রান্ত পায়ে নিজেকে টেনে এনে বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল।

বিছানায় মাথা স্পর্শ করার সাথে সাথেই কিছু বোঝার আগেই ইরন গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে।

২

খুব ভোরে ঘুম ভাঙার সাথে সাথে প্রথম যে কথাটি ইরনের মাথার মাঝে খেলা করে গেল সেটি হচ্ছে 'প্রজেক্ট আপসিলন'। কাল রাতে একটি নিম্নস্তরের কম্পিউটার প্রোগ্রাম তাকে এই বিপজ্জনক প্রজেক্টে জুড়ে দেবার চেষ্টা করছিল। ইরন বিছানায় উঠে বসে এবং খানিকটা চেষ্টা করেও মাথা থেকে প্রজেক্টের নামটি সরাতে পারে না। কুৎসিত বিকৃত কিছু দেখলে মানুষ যেরকম বিতৃষ্ণা নিয়েও তার থেকে চোখ সরাতে পারে না এটাও অনেকটা সেরকম। ইরন খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে কমিউনিকেশান্স মডিউলটি নিজের কাছে টেনে এনে সেটি চালু করল। নীলাভ স্ক্রিনে মডিউলের পরিচিত চিহ্নটি ফুটে উঠতেই ইরন নিচু গলায় বলল, "তথ্য অনুসন্ধান।"

কমিউনিকেশান্স মডিউল তার যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবহার করে মূল তথ্যকেন্দ্রের সাথে সংযুক্ত হয়ে নেয়। ইরন আবার নিচু গলায় বলল, "প্রজেক্ট আপসিলন।"

কমিউনিকেশান্স মডিউলের যত দ্রুত তথ্য নিয়ে আসার কথা তার থেকে কয়েক সেকেন্ড বেশি সময় লেগে যায়। নীলাভ স্ক্রিনে প্রজেক্ট আপসিলনের সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ ত্রিমাত্রিক ভিডিও ক্লিপে ফুটে ওঠে। ইরন ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে থাকে কারণ সেখানে প্রকৃতপক্ষে কোনো তথ্যই নেই। ইরন নিচু গলায় বলল, "পরবর্তী পর্যায়ের তথ্য।"

সাথে সাথে প্রথমে স্ক্রিনটি বর্ণহীন হয়ে যায়, পর মুহূর্তে উজ্জ্বল কমলা রঙে নিষিদ্ধ তথ্য প্রতীকচিহ্নটি ফুটে ওঠে এবং সাথে সাথে যান্ত্রিক গলায় উচ্চারিত হয়, "প্রজেক্ট আপসিলনের দ্বিতীয় পর্যায়ের তথ্য সংরক্ষিত। এটি সর্বসাধারণের মাঝে প্রচারের জন্য নয়।"

ইরন ভুরু কুঁচকে স্ক্রিনটির দিকে তাকিয়ে থাকে। সে যখন বিজ্ঞান গবেষণাগারে বড় একটি দল নিয়ে ওয়ার্মহোলের ওপর গবেষণা করছিল তখন পৃথিবীর যে কোনো তথ্য তার জন্য উন্মুক্ত ছিল, এক বছরের মাঝে সে নিচুস্তরের একটি প্রজেক্ট সম্পর্কে তুচ্ছ খানিকটা তথ্যও জানতে পারবে না? ইরন কমিউনিকেশান্স মডিউলে গিয়ে চোখের রেটিনা স্ক্যান[৭] করিয়ে নিয়ে দ্বিতীয়বার চেষ্টা করতেই হঠাৎ করে প্রজেক্ট আপসিলনের দ্বিতীয় পর্যায়ের তথ্য আসতে শুরু করে। মূল তথ্য কেন্দ্র এখনো তাকে পুরোপুরি আঁস্তাকুড়ে ছুড়ে ফেলে দেয় নি।

প্রজেক্ট আপসিলন একটি মহাকাশ অভিযান। নতুন একটি জ্বালানি এবং মহাকাশযানের একটি নতুন নকশা প্রথমবারের মতো পরীক্ষা করা হবে। মহাকাশযানটি সৌরজগৎ থেকে বের হয়ে আবার ফিরে আসবে, এর গতিবেগ হবে আলোর গতিবেগের এক-দশমাংশ, ত্বরণ হবে অস্বাভাবিক। এই প্রচণ্ড ত্বরণে মানুষের দেহকে রক্ষা করার একটি নতুন পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা চালানো হবে, পরীক্ষাটির বিপদসূচক সংখ্যা খুব বেশি। সে কারণে যারা জেনেশুনে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিতে চায় সেরকম অভিযাত্রী খোঁজা হচ্ছে। প্রজেক্ট আপসিলনে যোগ দিতে চাইলে কোথায় এবং কবে যোগাযোগ করতে হবে সেটিও জানিয়ে দেওয়া আছে।

ইরন খানিকক্ষণ ঠিকানাটির দিকে তাকিয়ে থেকে যোগাযোগ মডিউলটি বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল। আকাশের কাছাকাছি একটি অ্যাপার্টমেন্টের উপর থেকে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়া থেকে একটি বিপজ্জনক মহাকাশযানে সৌরজগৎ পাড়ি দেওয়া তার কাছে মোটেও বেশি আকর্ষণীয় মনে হল না।

কাজেই সেদিন অপরাহ্নে ইরন যখন প্রজেক্ট আপসিলনের নিয়োগ কেন্দ্রে একজন সুন্দরী তরুণীর সামনে নিজেকে আবিষ্কার করল সে নিজের ওপর নিজেই একটু অবাক না হয়ে পারল না। সুন্দরী তরুণটি অত্যন্ত সপ্রতিভ, ইরনকে তার নরম চেয়ারে বসিয়ে সোজাসুজি তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "ইরন, তুমি কেন এই প্রজেক্টে যোগ দিতে চাও?"

ইরন দুর্বলভাবে হেসে বলল, "আমি আসলে চাই না।"

মেয়েটি হেসে ফেলল, "তা হলে তুমি কেন এখানে এসেছ?"

"আমি এখনো জানি না। আমার ওপর দিয়ে ভাগ্য এমন সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে যে কিছুতেই কিছু আসে-যায় না।"

"তুমি তো জান এই প্রজেক্টের বিপদসূচক সংখ্যাটি অনেক উপরে।"

"জানি।"

"আমাদের রেকর্ড বলছে তুমি হতাশাগ্রস্ত একজন বিজ্ঞানী—তুমি কি আত্মহত্যার বিকল্প হিসেবে এটা বেছে নিয়েছ?"

"যদি বলি হ্যাঁ।"

"তা হলে তোমাকে আমরা নেব না।"

"কেন নয়?"

"আমরা চাই প্রজেক্টটি সফল হোক। হতাশাগ্রস্ত মানুষদের দিয়ে কোনো প্রজেক্ট সফল হয় না।"

"তা হলে তোমরা আমাকে নেবে না?"

সুন্দরী মেয়েটি মাথা নেড়ে বলল, "না।"

ইরন সোজা হয়ে বসে মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "কিন্তু আমি এই প্রজেক্টে যেতে চাই।"

"কেন?"

"কারণ—কারণ—" ইরন একটু ছটফট করে বলল, "এই প্রজেক্টে যারা আসবে সবাই নিশ্চয়ই আমার মতো। পৃথিবীর কোনো মানুষ আমাকে বুঝতে পারে না, কিন্তু এই প্রজেক্টের অভিযাত্রীরা আমাকে বুঝবে। আমিও তাদের বুঝব। আমরা একজন অন্যজনকে হতাশার গহ্বর থেকে টেনে তুলব।"

সুন্দরী মেয়েটি নরম চোখে খানিকক্ষণ ইরনের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "বেশ। আমি তোমাকে মনোনয়ন দিচ্ছি। কিন্তু মনে রেখো আমি একজন সাধারণ মনোবিজ্ঞানী। আমি শুধুমাত্র প্রাথমিক মনোনয়ন দিই। তোমাকে এরপর সত্যিকারের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাঝে দিয়ে যেতে হবে, শুধু তারপর ঠিক করা হবে তোমাকে এই প্রজেক্টে নেওয়া যায় কি না।"

ইরন হঠাৎ হেসে ফেলল, বলল, "আত্মহত্যা করার জন্য এত ঝামেলা করতে হয় কে জানত!"

মেয়েটি ইরনের দিকে কোমল চোখে তাকিয়ে রইল। কিছু বলল না। ইরন বলল, "তুমি একটি জিনিস জান?"

"কী?"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমি আজ অনেকদিন পর হাসলাম। হাসতে কেমন লাগে ভুলে গিয়েছিলাম।"

মেয়েটি হাত বাড়িয়ে ইরনের কাঁধ স্পর্শ করে বলল, "তুমি আবার হাসবে ইরন। আমি নিশ্চিত আবার তোমার জীবনে আনন্দ ফিরে আসবে। নিশ্চয়ই আসবে।"

পরের কয়েকদিন ইরন খুব ব্যস্ততার মাঝে কাটাল। মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রে তার শরীরের প্রায় প্রতিটি কোষকে পরীক্ষা করে দেখা হল, বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা নেওয়া হল, মানসিক ভারসাম্যের সূচক বের করা হল, জরুরি অবস্থায় তার ধীশক্তির পরিমাপ করা হল। রক্তচাপ, মেটাবলিজম, নিউরন বিক্রিয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোতে রেটিনার সংবেদনশীলতা পর্যন্ত পরীক্ষা করে দেখা হল।

চতুর্থ দিনে গম্ভীর ধরনের মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ ইরনের হাতে ছোট এক টুকরো ক্রিস্টাল ডিস্ক[৮] তুলে দিয়ে বলল, "তোমাকে প্রজেক্ট আপসিলনে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ, সত্যি।"

ইরন ক্রিস্টাল ডিস্কটির দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি জান আমি অনেকদিন পর একটি কাজে সফল হলাম!"

গম্ভীর মানুষটি কোনো কথা না বলে স্থির চোখে ইরনের দিকে তাকিয়ে রইল। ইরন চোখ মটকে বলল, "তবে আত্মহত্যা করতে যাবার প্রতিযোগিতায় সফল হওয়াটাকে কি সাফল্য বলা যায়?"

গম্ভীর মানুষটি এবারেও কোনো কথা বলল না, ইরন আবার বলল, "তোমার কি মনে হয় না আমি মানুষটা আসলেই অত্যন্ত দুর্ভাগা মানুষ? গত এক বছর প্রত্যেকটা কাজে ব্যর্থ হয়েছি—একমাত্র কাজে সাফল্য পেয়েছি আর সেটি হচ্ছে একটি ডাহা মারা যাবার টিকিট!"

ইরন হঠাৎ হো হো করে হেসে ওঠে, গম্ভীর ধরনের মানুষটি ইরনের কথায় কোনো কৌতুক খুঁজে পায় না, একটা ছোট নিশ্বাস ফেলে হঠাৎ করে খুব মনোযোগ দিয়ে নিজের নখ পরীক্ষা করতে শুরু করে।

ইরন হাসি থামিয়ে বলল, "আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি?"

"হ্যাঁ, পার। তবে আমি যেটুকু জানি তার সবই ক্রিস্টাল ডিস্কে আছে।"

"তবু তোমাকেই জিজ্ঞেস করি।"

"বেশ।"

"এই প্রজেক্টে কি কোনো রোবট থাকবে?"

গম্ভীর ধরনের মানুষটি ভুরু কুঁচকে ইরনের দিকে তাকাল, "তাতে কী আসে-যায়?"

"কিছু আসে-যায় না। আমি ব্যক্তিগতভাবে রোবট পছন্দ করি না।"

"তুমি যদি এই কথাটি আগে বলতে সম্ভবত তোমাকে এই প্রজেক্টে নেওয়া হত না।"

ইরন চোখ মটকে বলল, "সেই জন্য আগে বলি নি।"

"তুমি কেন রোবটদের পছন্দ কর না? নবম প্রজন্মের রোবটের বুদ্ধিমত্তা সম্ভবত তোমার কিংবা আমার থেকে বেশি।"

"সেটাও একটা কারণ।"

"একটা শক্তিশালী ঘোড়ার জোর তোমার থেকে অনেক বেশি। সেজন্যে তুমি কি ঘোড়াকে অপছন্দ কর?"

ইরন বলল, "সত্যি কথা বলতে কী, তুমি খুব খারাপ একটা উদাহরণ বেছে নিয়েছ।

আমার বয়স যখন এগার তখন আমি একবার ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছিলাম। সেই থেকে আমি ঘোড়াকে দুই চোখে দেখতে পারি না।"

গম্ভীর ধরনের মানুষটি এই প্রথমবার একটু হাসল। হাসলে যে কোনো মানুষকে সুন্দর দেখায় এবং ইরন প্রথমবার আবিষ্কার করল, মানুষটি সুদর্শন। সে হাসিমুখেই বলল, "ঘোড়াকে অপছন্দ করার কারণ থাকতে পারে কিন্তু রোবটকে অপছন্দ করার কোনো কারণ নেই। তাদের তৈরি করা হয় মানুষকে সাহায্য করার জন্য।"

ইরন মাথা নাড়ল, "কিন্তু মানুষ থেকে বুদ্ধিমান একটা বস্তু মানুষের পাশে পাশে বোকার ভান করে থাকছে—"

"রোবট কখনো বোকার ভান করে না।"

"করে। মানুষকে সরিয়ে নিজেরা যে মানুষের জায়গা দখল করে নিচ্ছে না সেটা হচ্ছে ভান। তারা ইচ্ছা করলেই পারে।"

"কিন্তু তারা তৈরি হয়ে আছে সেভাবে, তাদেরকে সেভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।"

ইরন একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "পৃথিবীতে তারা কখনোই মানুষের কর্তৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন করবে না। কিন্তু মহাকাশযানে—যেখানে কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, প্রয়োজন হলেই রোবট মানুষের নেতৃত্বকে অপসারণ করে ফেলবে।"

গম্ভীর ধরনের সুদর্শন মানুষটি হেসে বলল, "এটি তোমার একটা অমূলক সন্দেহ। তুমি নিশ্চয়ই নবম প্রজাতির সর্বশেষ রোবটগুলো দেখ নি। সেগুলো অনেক ক্ষেত্রে মানুষ থেকে ভালো। বুদ্ধিমান, কৌতূহলী এবং সহানুভূতিসম্পন্ন। যে কোনো মানুষ থেকে তাদের রসবোধ অনেকে বেশি তীক্ষ্ণ।"

ইরন আবার মাথা নাড়ল, বলল, "তাতে কিছু আসে-যায় না। একটি রোবট সবসময়েই রোবট।"

মানুষটি কোনো কথা না বলে স্থির চোখে ইরনের দিকে তাকিয়ে রইল। ইরন বলল, "তুমি কিন্তু এখনো আমার প্রশ্নের উত্তর দাও নি। প্রজেক্ট আপসিলনে কি কোনো রোবট থাকবে?"

"আমার জানা নেই। তবে—"

"তবে?"

"তবে না থাকার সম্ভাবনা বেশি। এই প্রজেক্টে মানুষের ওপর পরীক্ষা করার কথা।"

"চমৎকার। আশা করছি তোমার কথা যেন সত্যি হয়। না হয়—"

"না হয় কী?"

"না, কিছু না।" ইরন আপন মনে বলল, "আমি রোবটকে খুব অপছন্দ করি। ব্যাপারটা প্রায় ঘৃণার কাছাকাছি।

সুদর্শন মানুষটি এবারে একটু অবাক হয়ে ইরনের দিকে তাকিয়ে রইল।

৩

বড় হলঘরের দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করতে গিয়ে ইরন তার বুকের ভিতরে এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করে—এই ঘরটিতে প্রজেক্ট আপসিলনের অন্যান্য অভিযাত্রীদের থাকার কথা। ঘরটি বড়, উঁচু ছাদ, অর্ধস্বচ্ছ দেয়াল এবং বিশাল কোয়ার্টজের জানালা। জানালা দিয়ে বাইরে যে নীল হ্রদ, তুষার ঢাকা পর্বতশ্রেণী এবং পাইন গাছের সারি দেখা যাচ্ছে সেগুলো

নিঃসন্দেহে কৃত্রিম একটি ছবি, কিন্তু এই মুহূর্তে সেটি বোঝার উপায় নেই। কিছু একটাকে যদি এত জীবন্ত মনে হয় তা হলে সেটা কৃত্রিম হলেই কি কিছু আসে-যায়? ঘরের মাঝামাঝি কালো গ্রানাইটের মসৃণ টেবিল এবং সেই টেবিলকে ঘিরে বেশ কিছু সুদৃশ্য চেয়ার। টেবিলের দুপাশের দুটি চেয়ারের একটিতে একজন সুদর্শন সপ্রতিভ যুবক এবং অন্যটিতে কোমল চেহারার একজন তরুণী বসে আছে। জানালার কাছে একজন মধ্যবয়স্ক মানুষ, মানুষটির সোনালি চুল তার চেহারায় এক ধরনের কাঠিন্য নিয়ে এসেছে। মানুষটির আকাশের মতো নীল চোখ কিন্তু সেই চোখেও এক ধরনের আনন্দহীন দৃষ্টি।

ইরন দরজা খুলে ঢুকতেই ঘরের তিন জন তার দিকে মাথা ঘুরে তাকাল। ইরন জোর করে মুখে একটা স্বচ্ছন্দ ভাব আনার চেষ্টা করে বলল, "তোমরা নিশ্চয়ই প্রজেক্ট আপসিলনের সদস্য।"

সুদর্শন তরুণ এবং কোমল চেহারার মেয়েটি ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল, কঠিন চেহারার মানুষটি বলল, "হ্যাঁ। ক্রিস্টাল ডিস্কের তথ্য অনুযায়ী এখানে অবশ্য আরো এক জনের আসার কথা।"

ইরন হেঁটে হেঁটে ঘরের মাঝামাঝি এসে বলল, "সে নিশ্চয়ই এসে যাবে।"

কেউ কোনো কথা বলল না, ইরন একটা নরম চেয়ারে গা ডুবিয়ে বসে বলল, "আমি তোমাদের কথা জানি না, কিন্তু আমার খুব কৌতূহল ছিল তোমাদের দেখার।"

সোনালি চুলের মানুষটি মাথা ঘুরিয়ে ইরনের দিকে তাকিয়ে বলল, "কেন?"

"কারণ প্রজেক্ট আপসিলনে যারা যাবে তাদের সবার মাঝে এক ধরনের মিল থাকার কথা।"

সোনালি চুলের মানুষটি হঠাৎ এক ধরনের আনন্দহীন হাসি হাসতে শুরু করে। ইরন একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "তুমি হাসছ কেন?"

"তোমার কথা শুনে।"

"আমি কি হাসির কোনো কথা বলেছি?"

"সেটা নির্ভর করবে একজনের রসবোধের ওপর।"

"তোমার রসবোধ খুব তীক্ষ্ণ?"

"না। উল্টোটা, আমার রসবোধ নেই।"

"তা হলে?"

"তুমি বলছ আমাদের সবার মাঝে এক ধরনের মিল রয়েছে। মিলটি কী জান?"

ইরন ভুরু কুঁচকে বলল, "তুমি কী বলতে চাইছ?"

"আমি বলতে চাইছি যে মিলটি হচ্ছে আমরা সবাই আগামী ছিয়ানব্বই ঘণ্টার মাঝে মারা যাব।"

ইরন হঠাৎ কেমন জানি শিউরে ওঠে। সে আবার মাথা ঘুরিয়ে সোনালি চুলের মানুষটির দিকে ভালো করে তাকাল। মানুষটির চেহারা যেরকম কঠোর, তার কথার মাঝেও এক ধরনের অপ্রয়োজনীয় রূঢ়তা রয়েছে। এটি কি তার চরিত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ নাকি প্রথম পরিচয়ে সবাইকে বিভ্রান্ত করার সূক্ষ্ম একটা প্রচেষ্টা কে জানে।

ইরন মুখের মাংসপেশি শক্ত করে বলল, "তুমি কেমন করে এত নিশ্চিত হলে যে আমরা সবাই মারা যাব?

সোনালি চুলের মানুষটি এক পা এগিয়ে এসে কালো গ্রানাইটের টেবিলের দুই পাশে বসে থাকা তরুণ-তরুণীকে দেখিয়ে বলল, "ওদের জিজ্ঞেস করে দেখ।"

ইরন ঠিক বুঝতে পারল না, ভুরু কুঁচকে বলল, "কী জিজ্ঞেস করব?"

"ওরা কারা?"

ইরন সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সুদর্শন তরুণ এবং কোমল চেহারার মেয়েটির দিকে তাকাল। তারা দুজনেই হঠাৎ কেমন জানি অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। তরুণটি ইতস্তত করে বলল, "আমরা, আসলে প্রকৃত মানুষ নই।"

ইরন চমকে উঠে বলল, "তোমরা রোবট?"

"না।" যুবকটি মাথা নেড়ে বলল, "আমরা ক্লোন[৯]।"

"ক্লোন?"

"হ্যাঁ, বিভিন্ন বিপজ্জনক অভিযানে পাঠানোর জন্য আমাদের পরীক্ষামূলকভাবে তৈরি করা হয়েছে।"

ইরন বিস্ফারিত চোখে এই সুদর্শন যুবক এবং কোমল চেহারার মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল। খানিকক্ষণ চেষ্টা করে বলল, "আমি—আমি কিছু বুঝতে পারছি না। মানুষকে ক্লোন করা সম্পূর্ণ বেআইনি। একবিংশ শতাব্দীতে—"

সোনালি চুলের মানুষটি বলল, "তুমি নেহায়েত সাদাসিধে একজন মানুষ। পৃথিবীর কোনো খবর রাখ না।"

এই রূঢ় কথাটি শুনে যতটুকু ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত ছিল, ইরন কেন জানি ততটুকু ক্রুদ্ধ হতে পারল না। সে সবিস্ময়ে এই ক্লোন তরুণ এবং তরুণীর দিকে তাকিয়ে রইল।

"তুমি এখন বুঝতে পারছ আমি কেন বলেছি যে আমরা সবাই আগামী ছিয়ানব্বই ঘণ্টার মাঝে মারা যাব?"

ইরন মানুষটির কথার কোনো উত্তর দিল না। সোনালি চুলের মানুষটি স্বচ্ছ কোয়ার্টজের জানালার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, "প্রথমত আমরা এমন একটা জিনিস জেনেছি যেটি পৃথিবীর মানুষের জানার কথা নয়—বিপজ্জনক অভিযানের জন্য মানুষকে ক্লোন করা হয়। দ্বিতীয়ত এই অভিযানে মানুষের ক্লোন পাঠানো হচ্ছে। যার অর্থ—"

"যার অর্থ?"

"যার অর্থ এখানে মানুষ ব্যাকটেরিয়ার মতো মারা পড়বে। মানুষ যেখানে ব্যাকটেরিয়ার মতো মারা যায় সেখানে ক্লোনকে পাঠানো হয়। কারণ মানুষের ক্লোন আসলে মানুষ নয়।"

"অবশ্যই মানুষ।" ইরন গলা উঁচিয়ে বলল, "অবশ্যই তারা পরিপূর্ণ মানুষ। তারা সত্যিকার একজন মানুষের পরিপূর্ণ কপি। তাদের বুকে হৃৎপিণ্ড স্পন্দন করছে, ধমনিতে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে—"

"হ্যাঁ।" যুবকটি মাথা নেড়ে বলল, "কিন্তু পৃথিবীর সংবিধান অনুযায়ী আমরা মানুষ নই। যার জিনেটিক কোড ব্যবহার করে আমাকে তৈরি করা হয়েছিল তিনি ছিলেন পূর্ণাঙ্গ মানুষ। আমরা নই।"

"আমি বুঝতে পারছি না।" ইরন বিভ্রান্তের মতো বলল, "আমি কিছু বুঝতে পারছি না।"

সোনালি চুলের মানুষটি ইরনের কাছে এক পা এগিয়ে এসে বলল, "এর মাঝে না-বোঝার কিছু নেই। আমি যদি তোমাকে আঘাত করি সাথে সাথে প্রতিরক্ষা দপ্তরের লোক এসে আমাকে বেঁধে নিয়ে যাবে। শরীরে ট্রাকিওশান[১০] ঢুকিয়ে বিচারের জন্য নিয়ে যাবে। কিন্তু যদি মনে কর আমি একটা শক্ত টাইটেনিয়ামের রড দিয়ে এই দুজনের কারো মাথা ফাটিয়ে ঘিলু বের করে দিই—আমার কোনো অপরাধ হবে না।"

"কী বলছ?"

"হ্যাঁ। ঘরের মেঝে নোংরা করার জন্য কয়েক শ ইউনিট জরিমানা হতে পারে কিন্তু মানুষ হত্যা করার জন্য বিচার হবে না।"

"কী বলছ তুমি?"

সোনালি চুলের মানুষটি হাসার মতো ভঙ্গি করে বলল, "আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না? দেখতে চাও আমি সত্যি কথা বলছি কি না?"

ইরন এক ধরনের আতঙ্ক নিয়ে সোনালি চুলের নিষ্ঠুর চেহারার মানুষটির দিকে তাকিয়ে রইল। সে কিছু একটা বলতে চাইছিল ঠিক তখন ঘরটির দরজা খুলে যায় এবং প্রজেক্ট আপসিলনের অন্য অভিযাত্রী ঘরে এসে ঢুকল। ইরন মাথা ঘুরিয়ে দেখল, লালচে চুলের একজন মহিলা। বয়স অনুমান করা কঠিন, চব্বিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ যে কোনো কিছু হতে পারে, কিন্তু যেরকম আত্মবিশ্বাস নিয়ে প্রবেশ করেছে বয়স খুব কম হবার সম্ভাবনা কম। মহিলাটিকে সুন্দরী বলা যাবে না তবে আকর্ষণীয় বলা যেতে পারে, চেহারায় একটা ভিন্ন ধরনের সতেজ ভাব রয়েছে। মহিলাটি এগিয়ে এসে সবার দিকে তাকাল এবং একটি চেয়ার টেনে বসে বলল, "আমি তোমাদের আলোচনার মাঝে বিঘ্ন করে ফেললাম বলে মনে হচ্ছে।"

ইরন বিড়বিড় করে বলল, "সেজন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। আরেকটু হলে আমাদের একজন সদস্য আমাদের আরেকজন সদস্যের মাথার ঘিলু বের করে একটা উদাহরণ তৈরি করতে চাইছিল।"

লাল চুলের মহিলাটি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ইরনের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না। তবে সেটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই, পুরোটা শুনলে নিশ্চয়ই বুঝব। আমার পরিচয় দিয়ে নিই, আমি কীশা। আমি প্রজেক্ট আপসিলনের একজন অভিযাত্রী। তোমাদের সাথে এই অভিযানে অংশ নিতে পেরে আমি গৌরব অনুভব করছি।"

ইরন একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "আমি ইরন। আমি কেন্দ্রীয় গবেষণাগারে একজন বিজ্ঞানী হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করেছি। ঠিক কী কারণে জানি না আমার জীবন পুরোপুরি ওলটপালট হয়ে গিয়েছিল, এই অভিযানে অংশ নিয়ে আমি আবার আমার জীবনে খানিকটা সমন্বয় ফিরিয়ে আনতে চাই।"

সোনালি চুলের মানুষটি আবার কাঠ কাঠ স্বরে হেসে উঠল। ইরন তার দিকে সরু চোখে তাকিয়ে বলল, "তুমি হাসছ কেন?"

"তোমার কথা শুনে।"

"আমার কোন কথাটি তোমার কাছে হাস্যকর মনে হচ্ছে?"

"জীবনের সমন্বয় ফিরিয়ে আনার অংশটা। জীবন একটা দ্বিঘাত সমীকরণ নয় যে সেটাকে সমন্বয় করে সেখান থেকে সমাধান বের করে আনা যায়। যারা জীবনকে সমন্বয় করার কথা বলে তারা জীবনের অর্থ বোঝে না, সমন্বয়ের অর্থও বোঝে না।"

কীশা সোনালি চুলের মানুষটির দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার নাম কী?"

"আমার নাম বর্গেন।"

"বর্গেন, প্রথম পরিচয়ে যারা এভাবে কথা বলতে পারে ধরে নেওয়া যেতে পারে তারা সামাজিক পরিবেশে অভ্যস্ত নয়। আমার ধারণা তুমি সম্ভবত একটি রোবট।"

বর্গেনের মুখে একটা ক্রোধের ছায়া পড়ে, "আমি রোবট নই।"

"তা হলে তোমাকে নিয়ে আমাদের একটু সতর্ক থাকার প্রয়োজন আছে।"

বর্গেন কোনো কথা না বলে ক্রুদ্ধ চোখে কীশার দিকে তাকিয়ে রইল। ইরন জিজ্ঞাসু চোখে কীশার দিকে তাকাল, জিজ্ঞেস করল, "আমাদের কেন সতর্ক থাকার প্রয়োজন রয়েছে?"

"বর্গেন সম্ভবত মৃত্যুদণ্ড পাওয়া একজন আসামি। এই অভিযানে যারা এসেছে তারা সবাই কোনো না কোনোভাবে মৃত্যুর খুব কাছাকাছি থাকে।"

ইরন এক ধরনের আতঙ্ক নিয়ে বর্গেনের মুখের দিকে তাকাল, মানুষটির মুখে সত্যি এক ধরনের ক্রূর নিষ্ঠুরতার ছাপ রয়েছে। সে ঘুরে কীশার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুমি এই অভিযানে কেন এসেছ?"

"আমার ভাগ্যকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানোর জন্য। আমার খুব আপনজন ছিল, ভালবাসার মানুষ ছিল—সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় একটি দুর্ঘটনায় তারা শেষ হয়ে গেছে।" কীশা পাথরের মতো মুখ করে একমুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "আমি সেই ভয়ঙ্কর স্মৃতি থেকে পালাতে চাই। তোমরা আমাকে একটু সাহায্য কোরো।"

"করব কীশা।"

কালো গ্রানাইটের টেবিলের দুই পাশে বসে থাকা সপ্রতিভ চেহারার যুবকটি কীশার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি খুব দুঃখিত কীশা। খুবই দুঃখিত। কিন্তু এ রকম পরিবেশে কী বলতে হয় আমি জানি না।"

কীশা একটু অবাক হয়ে যুবকটির দিকে তাকাল, ইরন নিচু গলায় বলল, "এরা দুজন ক্লোন।"

"ক্লোন?"

যুবকটি মাথা নাড়ল—"হ্যাঁ। আমরা ক্লোন। আমাদের যে মানুষ থেকে ক্লোন করা হয়েছে তারা অত্যন্ত প্রতিভাবান এবং সফল মানুষ। তাদের ভিতর সহজাত নেতৃত্ববোধ রয়েছে, তারা সহানুভূতিশীল এবং উদ্যমী। তাই আশা করা হচ্ছে আমরাও তাদের মতো চরিত্রের মানুষ হব। এই অভিযানে তোমাদের সাহায্য করতে পারব।"

"নিশ্চয়ই সাহায্য করতে পারবে।" কীশা মাথা নেড়ে বলল, "আমি নিশ্চিত তোমরা চমৎকার সহযোগী হবে।"

"জীবন সম্পর্কে আমাদের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। গবেষণাগারে কৃত্রিম পরিবেশে আমাদের বড় করা হয়েছে তাই আমরা স্বাভাবিক সামাজিক ব্যাপারগুলো জানি না।"

"কী বললে—তোমরা কোথায় বড় হয়েছ?"

"গবেষণাগারে। আমরা সব মিলিয়ে আঠার জন ক্লোন ছিলাম—"

"আঠার জন?" ইরন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "একই মানুষের আঠার জন ক্লোন?"

"হ্যাঁ। আমরা সবাই এক জন মানুষের ক্লোন ছিলাম।"

কীশা কোমল চেহারার মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, "আর তুমি?" মেয়েটির চোখে এক ধরনের ভয়ের ছায়া পড়ে, কাঁপা গলায় বলল, "আমিও ক্লোন। আমি অত্যন্ত নগণ্য একজন ক্লোন।"

"এখানে কেউ নগণ্য নয়। এখানে সবাই প্রয়োজনীয়।"

মেয়েটি মাথা নাড়ল, বলল, "না, আমরা জানি আমরা নগণ্য। মানুষের প্রয়োজনে আমাদের তৈরি করা হয়। সত্যিকারের মানুষের জীবন খুব মূল্যবান, কিন্তু আমাদের জীবনের কোনো মূল্য নেই। সহজে খরচ করে ফেলবার জন্য আমাদের তৈরি করা হয়।"

ইরন ভুরু কুঁচকে বলল, "কী বলছ তোমরা?"

"আমরা সত্যি বলছি। আমাকে যে গবেষণাগারে বড় করা হয়েছে সেখানে আমরা ছিলাম একুশ জন। পরের বার তৈরি করা হয়েছে আরো চব্বিশ জন। আমাদের বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে। যার জিনস ব্যবহার করে আমাদের ক্লোন করা হয়েছে সে অত্যন্ত চমৎকার একজন মহিলা ছিল। আমরা সবাই তার সম্মান রাখার চেষ্টা করি। আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করি। আমরা—"

"তোমার নাম কী মেয়ে?"

কীশার প্রশ্ন শুনে মেয়েটি থতমত খেয়ে থেমে গেল। "নাম? আমার নাম?"

"হ্যাঁ।"

"আমাদের কোনো নাম থাকে না। শুধু নম্বর দেওয়া থাকে। আমার নম্বর সতের।"

ইরন এক ধরনের বেদনাতুর দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "কিন্তু একজন মানুষের নাম নেই, সেটা তো হতে পারে না।"

"আমরা মানুষ নই, মানুষের ক্লোন।"

"মানুষের ক্লোনও মানুষ। তোমার একটা নাম থাকতে হবে। আমি তোমাকে একটা সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করব না।"

মেয়েটি খানিকটা হতচকিত হয়ে পুরুষসঙ্গীর দিকে তাকাল। দুজন দুজনের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে আবার ইরনের দিকে ঘুরে তাকাল। যুবকটি ইতস্তত করে বলল, "সত্যি যদি কোনো একটি নাম দিয়ে ডাকতে চাও তা হলে একটি নাম দিতে হবে। কারণ আমাদের কোনো নাম নেই।"

"তুমি যে মানুষটির ক্লোন তার নাম কী?"

"আমি যতদূর জানি তার নাম ত্রালুস।"

"বেশ তা হলে তুমিও ত্রালুস।"

ইরন এবারে কোমল চেহারার মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, "আর তোমার?"

"আমাকে ক্লোন করা হয়েছে মহামান্যা শুমান্তি থেকে।"

"বেশ। আজ থেকে তা হলে তুমিও হচ্ছ শুমান্তি।"

কীশা মাথা নেড়ে হাসিমুখে বলল, "চমৎকার! তা হলে প্রজেক্ট আপসিলনের সকল সদস্যের নামকরণ করা হয়ে গেল।"

বর্গেন আবার কাঠ কাঠ স্বরে হেসে বলল, "সেই নাম কতক্ষণ কাজে লাগবে দেখা যাক।"

কীশা ভুরু কুঁচকে বর্গেনের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি কী বলতে চাইছ?"

বর্গেন কিছু একটা বলতে চাইছিল, ইরন বাধা দিয়ে বলল, "ওর কথা থাক। ওর কথা শুনলে মন খারাপ হয়ে যাবে।"

"কেন?"

"কারণ বর্গেন দাবি করে এই অভিযানে আমরা নাকি ব্যাকটেরিয়ার মতো মারা যাব।"

কীশা বর্গেনের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি কেন এ রকম বলছ?"

"আমি জানি তাই বলছি।"

"তুমি কেমন করে জান?"

"কারণ আমি এই প্রজেক্টের দলপতি।"

সবাই একসঙ্গে চমকে উঠে বর্গেনের দিকে তাকাল। বর্গেন আবার কাঠ কাঠ স্বরে হেসে উঠে মাথা নেড়ে বলল, "না, তোমরা যেটা ভাবছ সেটা আর হবার নয়।"

"আমরা কী ভাবছি?"

AMARBOI.COM

"তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছ যে এই অভিযানে তোমরা যাবে না! তোমাদের মুখ দেখে মনে হচ্ছে মানুষ হিসেবে আমাকে তোমাদের খুব পছন্দ হয় নি।"

ইরন এবং কীশা স্থির চোখে বর্গেনের দিকে তাকিয়ে রইল। বর্গেন তাদের থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে বলল, "কিন্তু তোমাদের আমার ভারি পছন্দ হয়েছে। এ রকম ক্রু না নিয়ে আমি এই অভিযানে যাচ্ছি না।"

বর্গেন আবার আনন্দহীন একটি হাসি হাসতে শুরু করে। যেভাবে হঠাৎ হাসতে শুরু করেছিল ঠিক সেরকমভাবে হাসতে হাসতে হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলল, "তোমরা এখন চল। মহাকাশে অভিযানের আগে নানা ধরনের প্রশিক্ষণ নিতে হয়। অত্যন্ত নিরানন্দ একঘেয়ে প্রশিক্ষণ—কিন্তু জরুরি, খুব জরুরি। কারণ মানুষ আসলে ব্যাকটেরিয়ার মতো মারা যেতে পছন্দ করে না। বেঁচে থাকতে চেষ্টা করে যায়। সে জন্য তোমাদের নানারকম প্রশিক্ষণ নিতে হবে। তোমাদের প্রশিক্ষণ দেবার জন্য কয়েক ডজন টেকনিশিয়ান, ডাক্তার, নার্স আর রোবট অপেক্ষা করছে।"

ইরন পাথরের মতো মুখ করে বলল, "আমরা যদি না যাই?"

বর্গেন হাসিমুখে বলল, "তোমরা নিশ্চয়ই যাবে। কারণ যারা প্রজেক্ট আপসিলনে নাম লিখিয়েছে তাদের নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছার বিশেষ কোনো মূল্য নেই! মানুষের আর ক্লোনের মাঝে সে ব্যাপারে এখন আর বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই।"

ইরন স্থির চোখে বর্গেনের দিকে তাকিয়ে রইল, সে খুব অবাক হয়ে লক্ষ করল তার ভিতরে অসহ্য ক্রোধ পাক খেয়ে উঠছে না, বরং বিচিত্র এক ধরনের কৌতূহল দানা বেঁধে উঠছে।

AMARBOI.COM

৪

ইরনকে একটি আরামদায়ক চেয়ারে শুইয়ে যে মেয়েটি নিওপলিমারের স্ট্র্যাপ দিয়ে তাকে শক্ত করে বেঁধে দিচ্ছিল তাকে মোটামুটিভাবে সুন্দরী বলা চলে। ইরন খানিকটা কৌতূহল নিয়ে তার দক্ষ হাতের কাজ দেখতে দেখতে বলল, "আমি জানতাম মহাকাশযানে আর এ রকম নিরাপত্তার প্রয়োজন নেই।"

"তুমি ঠিকই জানতে।"

"তা হলে?"

"এই মহাকাশযানটা একটা পরীক্ষামূলক মহাকাশযান। তোমরা দেখবে, খুব অল্প সময়ে এটা অনেক বেগে পৌঁছে যাবে। সেইজন্য এই ব্যবস্থা।"

"আমাদের কী হবে?"

"বিশেষ কিছুই হবে না। শরীরের মাঝে বিশেষ ট্রাকিওশান দেওয়া হয়েছে। সেটা আমাদের সব তথ্য জানাবে। আর তোমাদের যে ক্যাপসুলে ঢোকানো হচ্ছে তার ভিতরে তোমরা খুব নিরাপদ। মায়ের গর্ভে ভ্রূণ যেরকম নিরাপদ অনেকটা সেরকম।"

ইরন কৌতুক করে বলল, "পূর্ণ বয়সে আবার আমরা মাতৃগর্ভে ফিরে যাচ্ছি?"

"অনেকটা সেরকম।" মেয়েটা ইরনের করোটিতে সুচালো কিছু একটা প্রবেশ করিয়ে বলল, "এখন কথা বোলো না, আমাদের ক্যালিব্রেশানে গোলমাল হয়ে যাবে।"

ইরন একটা নিশ্বাস ফেলে চুপ করে গেল। তার দুপাশে আরো চারটি খোলা স্টেইনলেস স্টিলের ক্যাপসুল, কালচে ধাতব রং হঠাৎ দেখে মনে হয় অতিকায় ড্রাগন মুখ হাঁ করে আছে।

একেকটি ক্যাপসুলে একেকজনকে শুইয়ে দেওয়া হচ্ছে। নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে একসময় ক্যাপসুলটি বন্ধ করে দেওয়া হবে। মহাকাশযানের জীবনরক্ষাকারী মডিউল তখন তাদের জীবনের দায়িত্ব নিয়ে নেবে, তাদের নিশ্বাসের জন্য অক্সিজেন, জীবনরক্ষার জন্য চাপ, রক্তের মাঝে পুষ্টির নিশ্চয়তা দেবে কিছু কৌশলী যন্ত্র। মহাকাশযানের শক্তিশালী ইঞ্জিন একসময় গর্জন করে উঠবে, তীব্রগতিতে আয়নিত পরমাণু ছুটে আসবে আর এই মহাকাশযানটি বায়ুমণ্ডলকে ভেদ করে উঠে যাবে মহাকাশে। দেখতে দেখতে নীল আকাশ প্রথমে গাঢ় নীল, তারপর কালচে বেগুনি, সবশেষে নিকষ কালো হয়ে যাবে। পরিচিত পৃথিবী একটি নীলাভ গ্রহ হয়ে পিছনে পড়ে থাকবে। সেই গ্রহটি কি শুধু একটি স্মৃতিই হয়ে থাকবে তাদের কাছে নাকি তারা আবার ফিরে আসবে এই গ্রহে?

ইরন একটি নিশ্বাস ফেলল এবং ঠিক তখন টেকনিশিয়ান মেয়েটি তার হাতে হাত রেখে মৃদু চাপ দিয়ে ফিসফিস করে বলল, "তোমার যাত্রা শুভ হোক, ইরন।"

ইরন মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বলল, "তোমার কথা সত্যি হোক মেয়ে!"

মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়ে কোথায় একটা সুইচ টিপে দিতেই খুব ধীরে ধীরে স্টেইনলেস স্টিলের ঢাকনাটা ধীরে ধীরে নিচে নেমে এল, সাথে সাথে ভিতরে আবছা অন্ধকার হয়ে আসে। পায়ের কাছে কোনো এক জায়গা থেকে মিষ্টি গন্ধের এক ধরনের শীতল বাতাস এসে ক্যাপসুলের ভিতরটা শীতল করে দিতে শুরু করেছে। ইরন হাত বাড়িয়ে মাথার কাছে নীলাভ স্ক্রিনটা চালু করে দিতেই মহাকাশযানের ভিতরটা দেখতে পেল। টেকনিশিয়ানরা চারটি ক্যাপসুল বন্ধ করে কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে দাঁড়িয়েছে, সবকিছু শেষবার পরীক্ষা করে তারা নেমে যেতে শুরু করে। গোলাকার দরজা দিয়ে মাথা নিচু করে বের হয়ে যেতেই ঘরঘর শব্দ করে দরজাটা বন্ধ হয়ে তাদেরকে বাইরের পৃথিবী থেকে আলাদা করে ফেলল। ইরন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, কে জানে সে আবার কখনো পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারবে কি না।

ইরন একটা মৃদু কম্পন অনুভব করে। নিশ্চয়ই মহাকাশযানের বিশাল শক্তিশালী ইঞ্জিনগুলো চালু হতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণের মাঝেই আয়োনিত গ্যাসের প্রবাহে বিস্তৃত প্রান্তর ভস্মীভূত হয়ে যাবে। ইরন তার মুখের সামনে নীল স্ক্রিনটির দিকে তাকিয়ে থাকে, ইচ্ছে করলে সে এখানে দৃশ্যটি পাল্টে দিয়ে বাইরে থেকে মহাকাশযানটি কেমন দেখায় সেটি দেখতে পারে। ইচ্ছে করলে অন্য ক্যাপসুলগুলোতে সবাই কেমন আছে সেটাও দেখতে পারে। ইচ্ছে করলে কন্ট্রোল প্যানেলের খুঁটিনাটিও সে পর্যবেক্ষণ করতে পারে কিন্তু ইরন তার কিছুই করল না। হঠাৎ করে সে অনুভব করে তার শরীরে খুব ধীরে ধীরে একটা আরামদায়ক অবসাদ ছড়িয়ে পড়ছে, ঘুমের মতো এক ধরনের অনুভূতি কিন্তু ঠিক ঘুম নয়, প্রাণপণ চেষ্টা করেও সেখান থেকে সে নিজেকে জাগিয়ে রাখতে পারে না। ইরন তার মুখের কাছাকাছি রাখা নীল স্ক্রিনটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ল।

ইরনের জ্ঞান ফিরে এল খুব ধীরে ধীরে, চোখ খুলে সামনে নীল স্ক্রিনটাতে পরিচিত নীলাভ গ্রহটা দেখেও সে প্রথমে কিছু মনে করতে পারল না। সমস্ত শরীরে এক ধরনের অবসাদ এবং মাথায় এক ধরনের ভোঁতা যন্ত্রণা নিয়ে সে ধীরে ধীরে পুরোপুরি সজাগ হয়ে ওঠে। ক্যাপসুলের ভিতরে কনকনে এক ধরনের শীতলতা, ইরন তার দুই হাত বুকের কাছে নিয়ে এসে ক্যাপসুলের ভিতরকার কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে তাকাল। মহাকাশটির অসংখ্য

তথ্য সেখানে দ্রুত খেলা করে যাচ্ছে, অনভিজ্ঞ চোখে তার কিছুই অর্থবহ নয় কিন্তু ইরন খুব সহজেই সেগুলো বিশ্লেষণ করতে পারে। মিনিট দুয়েক সে তথ্যগুলো দেখে হঠাৎ চমকে উঠল, কোথাও কিছু একটা বড় গোলমাল রয়েছে। গতিবেগ অনেক কম, ত্বরণ যেটুকু থাকার কথা তার এক ভগ্নাংশও নয়, এই সময়ের মাঝে পৃথিবী থেকে যেটুকু যাবার কথা মহাকাশযানটি তার ধারেকাছেও যায় নি। মহাজাগতিক কো–অর্ডিনেট থেকে মনে হচ্ছে এটি মঙ্গল এবং বৃহস্পতির কাছাকাছি কোথাও থেমে আসছে। ক্যাপসুলের ভিতর উঠে বসার উপায় থাকলে ইরন উত্তেজনায় উঠে বসত, কিন্তু এখন তার উপায় নেই। সে সুইচ টিপে বর্গেনের ক্যাপসুলে যোগাযোগ করে এবং সবিস্ময়ে আবিষ্কার করে সেটি খালি, ভিতরে কেউ নেই। ইরন যোগাযোগ মডিউল স্পর্শ করতেই বর্গেনকে দেখতে পেল সে মহাকাশযানের মূল কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে ডাকতে গিয়ে ইরন থেমে যায়। বর্গেনের চোখের দৃষ্টি কেমন জানি অস্বচ্ছ এবং দুর্বোধ্য। ইরন তার ক্যাপসুলের ঢাকনা খোলার জন্য জরুরি সুইচটি স্পর্শ করল, এবং ভোঁতা একটি শব্দ করে খুব ধীরে ধীরে স্টেইনলেস স্টিলের কালো ঢাকনাটা উপরে উঠতে শুরু করে। ক্যাপসুলের ভিতরে সাথে সাথে মহাকাশযানের উষ্ণ বাতাস এসে প্রবেশ করে।

ইরন উঠে দাঁড়াল এবং হঠাৎ করে তার মাথা ঘুরে ওঠে, মনে হচ্ছে মহাকাশযানের বাতাসে যথেষ্ট অক্সিজেন নেই। ইরন তার পোশাক থেকে অক্সিজেন মাস্কটি বের করে তার মুখের ওপর লাগিয়ে নিয়ে টলতে টলতে হাঁটতে শুরু করে। বর্গেনের খোলা ক্যাপসুলের পাশেই কীশার ক্যাপসুল, স্বচ্ছ জানালা দিয়ে তার ঘুমন্ত মুখটি দেখা যাচ্ছে। যে কোনো মানুষকে ঘুমন্ত অবস্থায় কেন জানি অসহায় দেখায়। ইরন একমুহূর্ত দ্বিধা করে উজ্জ্বল লাল রঙের জরুরি সুইচটি স্পর্শ করতেই ক্যাপসুলটি কীশাকে জাগিয়ে তোলার কাজ শুরু করে দেয়। ইরন কীশার জন্য অপেক্ষা না করে মূল নিয়ন্ত্রণ কক্ষের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। কন্ট্রোল প্যানেলের হালকা নীল আলোর সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বর্গেনকে একটি অতিপ্রাকৃত মূর্তির মতো মনে হচ্ছে। ইরন দেয়াল ধরে টলতে টলতে আরো একটু এগিয়ে যেতেই বর্গেন মাথা ঘুরিয়ে ইরনের দিকে তাকাল।

বর্গেন কয়েক মুহূর্ত ইরনের চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে শীতল গলায় বলল, "ক্যাপসুল থেকে বের হয়ে এসেছ?"

"হ্যাঁ।"

"বের হওয়ার কথা নয়।"

"বর্গেন, তোমারও বের হওয়ার কথা নয়।"

"আমি এই প্রজেক্টের দলপতি। প্রয়োজনে আমি বের হতে পারি।"

"বেশ! আমি এই অভিযানের একজন সদস্য। কোনো কিছু নিয়ে সন্দেহ হলে আমিও বের হতে পারি।"

বর্গেন হঠাৎ পুরোপুরি ঘুরে ইরনের দিকে তাকাল, বলল, "তোমার কী নিয়ে সন্দেহ হচ্ছে, ইরন?"

"যেমন মনে কর এই মহাকাশযানের ত্বরণ আর এই মহাকাশযানের গতিবেগ। যত হওয়ার কথা তার এক ভগ্নাংশও নয়। কেন?"

"তার কারণ আমরা এখন এস্টরয়েড বেল্ট পার হচ্ছি। এর মাঝে গতিবেগ বেশি করা যায় না। নিরাপত্তার ব্যাপার।"

ইরন স্থির চোখে বর্গেনের দিকে তাকিয়ে রইল—এক শ বছর আগে এই উত্তরটি যথার্থ

উত্তর হত, এখন নয়। মহাকাশযান এস্টরয়েড বেল্টের[১১] ভিতর দিয়ে যে কোনো বেগে যেতে পারার কথা। বর্গেন মিথ্যা কথা বলছে, কিন্তু কেন?

বর্গেন কন্ট্রোল প্যানেলের উপর আবার ঝুঁকে পড়ে বলল, "ক্যাপসুলে ফিরে যাও ইরন।"

"আমি এখন ক্যাপসুলে ফিরে যাই কি না যাই তাতে কিছু আসে-যায় না।"

বর্গেন আবার ইরনের দিকে ঘুরে তাকাল, "তুমি কী বলতে চাইছ?"

"ক্যাপসুল থেকে বের হয়ে আমার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল বর্গেন, মহাকাশযানে অক্সিজেন খুব কম। আমাকে মুখে একটা মাস্ক লাগাতে হয়েছে। তোমার মুখে মাস্ক নেই কেন?"

বর্গেন তীক্ষ্ণ চোখে ইরনের দিকে তাকিয়ে রইল। কোনো কথা বলল না। ইরন আরো এক পা এগিয়ে এসে বলল, "বর্গেন, এই মহাকাশযানে তোমার নিশ্বাস নিতে কোনো কষ্ট হচ্ছে না, কারণ তোমার আসলে নিশ্বাস নিতে হয় না। তুমি একজন রোবট।"

বর্গেনের মুখে একটা বিচিত্র হাসি ফুটে ওঠে। সে কিছু একটা বলতে চাইছিল। ইরন বাধা দিয়ে বলল, "বর্গেন, আমি রোবটকে দুই চোখে দেখতে পারি না। প্রজেক্ট আপসিলনে একটা রোবটকে পাঠানো হয়েছে জানলে আমি এখানে আসতাম না।"

"তোমার কথা শেষ হয়েছে ইরন?"

"আমি আসলে রোবটের সাথে কথাবার্তা বলতে চাই না বর্গেন। কাজেই আমার কথা শেষ হয়েছে কি না সেটা বলতে পারব যখন নিঃসন্দেহ হব যে তুমি সত্যিই একটা রোবট।"

"সেটা তুমি কীভাবে হবে, ইরন?"

ইরন দেয়াল থেকে টাইটানিয়ামের একটা বড় রড টেনে খুলে নিয়ে বলল, "এটা দিয়ে। একটা আঘাত করে তোমার খুলি ফাটিয়ে দিয়ে দেখব, ভিতরে কপোট্রন[১২] না অন্য কিছু।"

বর্গেন এবারে শব্দ করে হেসে উঠে বলল, "তুমি নেহায়েত একজন নির্বোধ মানুষ ইরন। আমি যদি সত্যিই রোবট হয়ে থাকি তা হলে আমার এই যান্ত্রিক হাত দিয়ে আমি তোমাকে পিষে ফেলতে পারব। তোমার মস্তিষ্ক আমি থেঁতলে দিতে পারব।"

ইরন শক্ত হাতে টাইটানিয়ামের রডটা ধরে রেখে আরো এক পা এগিয়ে গিয়ে বলল, "তাতে কিছু আসে-যায় না। প্রজেক্ট আপসিলন সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে তার কিছুই সত্যি নয়। আমাদের নিয়ে তোমরা কিছু একটা ষড়যন্ত্র করেছ। তোমাকে খুন করা গেলে কিংবা আমি খুন হয়ে গেলে সেই ষড়যন্ত্রটা কাজে লাগাতে হবে না। আপাতত সেটাই আমার উদ্দেশ্য।"

ইরন হিংস্র চোখে বর্গেনের দিকে তাকিয়ে আরো এক পা এগিয়ে গেল। বর্গেন শীতল চোখে ইরনের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "নির্বুদ্ধিতা কোরো না, ইরন। আমি তোমাকে শেষবার সতর্ক করে দিচ্ছি—"

বর্গেন কথা শেষ করার আগেই ইরন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বর্গেন প্রস্তুত ছিল বলে ইরন তাকে আঘাত করতে পারল না, বরং তার শক্ত হাতের আঘাতে সে নিজে ছিটকে গিয়ে পড়ল। কোনোভাবে উঠে দাঁড়িয়ে আবার সে এগিয়ে যায়, টাইটানিয়ামের রডটি ঘুরিয়ে আবার সে আঘাত করার চেষ্টা করে, কিন্তু বর্গেন বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে গিয়ে তার হাতে আঘাত করতেই টাইটানিয়ামের রডটা ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ল। ইরন শূন্য হাতে দাঁড়িয়ে থাকে এবং বর্গেন শীতল চোখে তার দিকে তাকিয়ে থেকে এক পা এগিয়ে আসে। ইরন শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে আবার বর্গেনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, বর্গেন তার শক্ত হাতে ইরনের মুখে

আঘাত করল, মুহূর্তের জন্য ইরন চোখে অন্ধকার দেখে, তাল হারিয়ে সে দেয়ালে মুখ থুবড়ে পড়ল। ইরন তার মুখে রক্তের লোনা স্বাদ পায়, ঠোঁট কেটে রক্ত বের হয়ে এসেছে। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে সে মুখ মুছে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল কিন্তু উঠতে পারল না। বর্গেন তার দিকে এগিয়ে আসে, দুই হাত দিয়ে নিওপলিমারের[১৩] তৈরি তার বুকের কাপড় ধরে তাকে উপরে টেনে তুলল, তার মুখে একটা বিচিত্র হাসি খেলা করতে শুরু করেছে। শক্ত লোহার মতো দুই হাতে তার গলা চেপে ধরে ফিসফিস করে বলল, "আমি যদি বলতে পারতাম জীবনের শেষ মুহূর্তে তোমার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে ইরন, তা হলে আমার ভালো লাগত। কিন্তু আমার এতটুকু দুঃখ হচ্ছে না। তোমার কার্টিলেজ[১৪] আমি এক হাতে ভাঙতে পারি নির্বোধ মানুষ—"

ইরন বুঝতে পারে তার গলায় বর্গেনের হাত শক্ত সাঁড়াশির মতো চেপে বসেছে, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে তার। সমস্ত বুক বাতাসের জন্য হাহাকার করতে থাকে। প্রাণপণে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করে সে, দুই হাতে বর্গেনের চোখে-মুখে খামচে ধরার চেষ্টা করে, নখ বসিয়ে দিতে চায়, কিন্তু পাথরের মতো শক্ত শরীরে তার হাত পিছলে আসে।

ইরনের চোখের সামনে সবকিছু ঝাপসা হয়ে আসতে থাকে। হঠাৎ তার মাঝে সে কীশাকে দেখতে পেল। দুই হাতে টাইটানিয়ামের রডটি শক্ত করে ধরে রেখে সে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে। ইরন প্রাণপণ চেষ্টা করে তাকিয়ে থাকে, দেখতে পায় বর্গেনের পিছন থেকে ধীরে ধীরে কীশা টাইটানিয়ামের রডটি উদ্যত করেছে। তারপর কিছু বোঝার আগে কীশা প্রচণ্ড শক্তিতে বর্গেনের মাথায় আঘাত করল।

ভয়ঙ্কর একটি চিৎকারের শব্দ শুনল ইরন, কিছু বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ ছুটে গেল এবং উষ্ণ এক ধরনের চটচটে তরল ছিটকে এসে পড়ল তার মুখে। ইরন হঠাৎ করে অনুভব করল তার গলায় বর্গেনের হাত শিথিল হয়ে এসেছে। বুকভরে একবার নিশ্বাস নিতে চাইল ইরন কিন্তু কাশির দমকে সে নিশ্বাস নিতে পারল না। দুই হাতে বুক চেপে ধরে অনেক কষ্টে একবার নিশ্বাস নিয়ে চোখ খুলে তাকাল, পিছনে কীশা, তার চোখে বিস্ময় এবং আতঙ্ক। ইরন কীশার দৃষ্টি অনুসরণ করে মেঝের দিকে তাকায়। সেখানে বর্গেনের মাথাটি পড়ে আছে, গলার অংশবিশেষ ছিঁড়ে এসেছে, সেখান থেকে কিছু ছেঁড়া তার, সূক্ষ্ম ফাইবার আর টিউব বের হয়ে এসেছে। চটচটে হলুদ এক ধরনের তরল সেখান থেকে গলগল করে বের হয়ে আসছে।

কীশা হতচকিতভাবে হাতের টাইটানিয়ামের রডটি ছুড়ে ফেলে দিয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে বলল, "হলুদ রক্ত! হলুদ—"

ইরন বর্গেনের মস্তকহীন দেহ এবং শিথিল হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে সরে এসে বলল, "রক্ত নয়। কপোট্রনকে শীতল করার তরল।"

'কপোট্রন?'

"হ্যাঁ।"

"তার মানে বর্গেন একটা রোবট[১৫]?"

"হ্যাঁ।"

"কী আশ্চর্য!" কীশা পা দিয়ে বর্গেনের মাথাটিকে সোজা করে দিয়ে বলল, "আমাদেরকে বলেছিল এখানে কোনো রোবট নেই।"

বর্গেনের বিচ্ছিন্ন মাথাটি হঠাৎ কেঁপে ওঠে এবং মুখ হাঁ করে কিছু বলার চেষ্টা করে।

ইরন মুখে একটা বিতৃষ্ণার ছাপ ফুটিয়ে বলল, "তুমি কিছু বলছ?"

বর্গেনের মাথাটি বিচিত্র একটি শব্দ করে বলল, "হ্যাঁ"।

"কী?"

"তোমাদের দিন শেষ।" বর্গেনের বিচ্ছিন্ন মাথাটি হঠাৎ দুলে দুলে হাসতে শুরু করে। হাসির সাথে সাথে ঠোঁটের কষ বেয়ে হলুদ রঙের চিটচিটে তরলটি চুইয়ে চুইয়ে বের হতে থাকে। ইরন অনেক কষ্ট করে একটা লাথি দিয়ে মাথাটি দূরে ছুড়ে ফেলার ইচ্ছে দমন করে নিচু হয়ে বসল। হাত দিয়ে বর্গেনের চুলের মুঠি ধরে মাথাটি উপরে তুলে বলল, "আমাদের দিন শেষ কেন বলছ?"

বর্গেন বিচিত্র এক ধরনের ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, "একটু পরেই তোমরা বুঝবে।"

"বর্গেন।"

"বল।"

"তুমি আর কতক্ষণ এভাবে থাকবে?"

"বেশিক্ষণ নয়। কপোট্রন শীতল করার তরলটা বের হয়ে গেছে, কপোট্রনটা কিছুক্ষণেই শেষ হয়ে যাবে।"

"তোমার কি দুঃখ হচ্ছে?"

"দুঃখ? আমার?" বর্গেনের মাথাটি হঠাৎ আবার কেঁপে কেঁপে হাসতে শুরু করে, "আমাদের দুঃখ হয় না। একটা দায়িত্ব দিয়েছিল। দায়িত্বটা ঠিকভাবে শেষ করেছি তাই খুব আনন্দ হচ্ছে।"

কীশা অবাক হয়ে বলল, "দায়িত্ব ঠিকভাবে শেষ করেছ?"

"হ্যাঁ।"

"সেটা কখন করলে?"

"এই যে তোমাদের একটা মহা গাড্ডার মাঝে এনে ফেলেছি। মহাকাশযানের কন্ট্রোল এখন কারো কাছে নেই। পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ হত আমাকে দিয়ে—আমাকেও তোমরা শেষ করেছ। এখন তোমরা বৃহস্পতি গ্রহের আকর্ষণে সেখানে গিয়ে শেষ হবে! তোমরা—" বর্গেন কথা শেষ করার আগেই আবার খিকখিক করে অপ্রকৃতিস্থের মতো হাসতে থাকে। হাসতে হাসতে হঠাৎ হেঁচকি দিয়ে সে থেমে গেল। বর্গেনের কান এবং চোখ দিয়ে কালো ঝাঁজালো এক ধরনের ধোঁয়া বের হতে শুরু করে, ইরন তার হাতে উত্তাপ অনুভব করে বিচ্ছিন্ন মাথাটি মেঝেতে রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

"শেষ। কপোট্রনটা জ্বলে গেছে।"

"রক্ষা হয়েছে।" কীশা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "কী ভয়ানক ব্যাপার!"

ইরন কথা না বলে চিন্তিত মুখে কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে এগিয়ে যায়। কীশা পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলল, "আমার কাছে এখনো পুরো ব্যাপারটা একটা দুঃস্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে।"

ইরন কীশার দিকে তাকিয়ে বলল, 'দুঃস্বপ্ন?"

"হ্যাঁ।"

"আমার কাছে কী মনে হচ্ছে জান?"

"কী?"

"পুরো ব্যাপারটা হচ্ছে একটা নাটক। আমরা সবাই সেই নাটকের একটা করে চরিত্র।"

"কেন?" কীশা ভুরু কুঁচকে বলল, "তোমার কাছে এ রকম মনে হচ্ছে কেন?"

AMARBOI.COM

"জানি না।"

কীশা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "এখন কী করব আমরা?"

"প্রথমে দেখব বর্গেনের শেষ কথাগুলো সত্য কি না। অর্থাৎ আসলেই আমরা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণহীনভাবে বৃহস্পতির আকর্ষণে সেদিকে যাচ্ছি কি না।"

"আমার কেন জানি মনে হচ্ছে যাচ্ছি।"

"হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়। আমি দেখেছি অশুভ ভবিষ্যদ্বাণীগুলো আশ্চর্যভাবে সবসময় মিলে যায়। সম্ভাবনার মূল্যবান সূত্রগুলো সেখানে আশ্চর্যভাবে দুর্বল!"

"হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ।"

"আমার মনে হয় ত্রালুস আর শুমান্তিকে ঘুম থেকে তুলে দেওয়া দরকার।"

"কেন?"

"কী করব সেটা ঠিক করা যাক। যত বেশি মানুষ বসে সিদ্ধান্তটা নেওয়া যায় ততই ভালো।"

৫

কন্ট্রোল প্যানেলের চতুষ্কোণ টেবিলটা ঘিরে চার জন বসে আছে। ইরনের মুখ চিন্তাক্লিষ্ট, সে অন্যমনস্কভাবে টেবিলে আঙুল দিয়ে শব্দ করছে। ত্রালুস এবং শুমান্তি শান্তমুখে ইরনের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। কীশা একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে বলল, "কিছু একটা বল ইরন।"

ইরন মাথা তুলে তাকাল, বলল, "বলব? আমি?"

"হ্যাঁ।"

"বলার মতো কিছু আছে? আমাদের অবস্থা হচ্ছে আগুনের দিকে ছুটে যাওয়া পতঙ্গের মতো। আমরা জানি আগুনে আমরা নিশ্চিতভাবে পুড়ে মরব কিন্তু আমাদের কিছু করার নেই।"

"কিন্তু এটা কি একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়? একটা মহাকাশযান পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায় বৃহস্পতি গ্রহের দিকে ছুটে যাচ্ছে?"

"না, মোটেও অস্বাভাবিক নয়। কারণ এটি ইচ্ছে করে করা হয়েছে। আমরা যখন ঘুমিয়েছিলাম তখন বর্গেন উঠে এসে মহাকাশযানের নিয়ন্ত্রণে বড় পরিবর্তন করেছে। পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ মডিউলটি সরিয়ে দিয়েছে। মহাকাশযানের ইঞ্জিনগুলোর নিয়ন্ত্রণ নষ্ট করেছে। কেন করেছে সেটা একটা রহস্য। আমাদেরকে মেরে ফেলাই যদি এই প্রজেক্টের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে সেটা কি পৃথিবীতে আরো সহজে করা যেত না?"

কীশা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "তা হলে আমরা এখন বৃহস্পতির ওপর আছড়ে পড়ব?"

"হ্যাঁ।"

"আমাদের হাতে কতটুকু সময় আছে?"

"পৃথিবীর হিসাবে দিন সাতেক। তবে শেষের অংশটুকুর কথা ভুলে যাও, প্রচণ্ড বেগে ছুটে যাব বলে আমাদের জ্ঞান থাকবে না।"

AMARBOI.COM

"মৃত্যুটি কি খুব ভয়ঙ্কর হবে?"

ইরন হেসে ফেলে বলল, "জানি না! আমি আগে কখনো এভাবে মারা যাই নি।"

ত্রালুস এবং শুমান্তি এতক্ষণ চুপ করে দুজনের কথা শুনছিল, এবারে ত্রালুস একটু সোজা হয়ে বসে বলল, "আমি একটা কথা বলতে পারি?"

"বল।"

"তোমরা আমাদের দুজনকে দায়িত্ব দিয়েছিলে মহাকাশযানে কী কী আছে খুঁজে দেখতে।"

"হ্যাঁ।"

"আমরা দেখা শুরু করেছি—পুরোটা এখনো শেষ হয় নি। আর্কাইভ ঘরে কিছু জিনিস রয়েছে যার কোনো তালিকা নেই।"

ইরন অবাক হয়ে বলল, "তালিকা নেই?"

"না।" শুমান্তি মাথা নেড়ে বলল, "মহাকাশযানের মূল তথ্যকেন্দ্রে কোনো তালিকা নেই।"

"অসম্ভব!" ইরন মাথা নেড়ে বলল, "মহাকাশযানের প্রত্যেকটি স্ক্রুর পর্যন্ত তালিকা থাকতে হবে।"

শুমান্তি মাথা নেড়ে বলল, "আমিও তাই জানতাম। কিন্তু আমরা আর্কাইভ ঘরে গেছি সেখানে অনেকগুলো নানা আকারের বাক্স আছে, যন্ত্রপাতি আছে, কিন্তু সেগুলোতে কী আছে কোথাও বলা নেই।"

কীশা মাথা নেড়ে বলল, "ইরন। আমি যতই দেখছি ততই তোমার ষড়যন্ত্র থিওরিকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছি।"

ইরন টেবিলে থাবা দিয়ে বলল, "ষড়যন্ত্র নিয়ে আমার কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু সেই ষড়যন্ত্রটা কী আমাদের জানা দরকার।"

"যারা ষড়যন্ত্র করছে তারা যদি চায় তা হলে আমরা নিশ্চয়ই জানব!"

ইরন ভুরু কুঁচকে বলল, "কিন্তু মজার ব্যাপার কী জান? পুরো ব্যাপারটা যদি দেখ তা হলে মনে হবে আমরাও সেই ষড়যন্ত্রের অংশ। আমি টাইটানিয়ামের রড দিয়ে বর্গেনকে মারতে গিয়েছি—তুমি মেরেই ফেলেছ।"

কীশা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "ওভাবে বল না, রোবটের বেলায় মেরে ফেলা কথাটা খাটে না। তা ছাড়া আমি সেটাকে মারতে চাই নি—তোমাকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম। এত সহজে মাথাটা আলাদা হয়ে যাবে কে জানত?"

"অত্যন্ত দুর্বল ডিজাইন।" ইরন মাথা নেড়ে বলল, "কে জানে সেটাও নিশ্চয়ই ষড়যন্ত্রের অংশ।"

ত্রালুস নড়েচড়ে বলল, "আমার কী মনে হয় জান?"

"কী?"

"আর্কাইভ ঘরে বাক্সগুলোতে কী আছে আমরা যদি খুলে দেখতে পারি তা হলে হয়তো কিছু একটা বুঝতে পারব।"

ইরন মাথা নাড়ল, "ঠিক বলেছ।"

"কাজটা অবশ্য খুব সহজ হবে না। তথ্যকেন্দ্রে যেহেতু এদের তালিকা নেই, এটা খোলারও কোনো উপায় নেই। বাক্সগুলো ভাঙতে হবে।"

"ভাঙতে হবে?"

AMARBOI.COM

"হ্যাঁ। ঠিক যন্ত্রপাতি খুঁজে বের করতে হবে।"

কীশা মাথা নেড়ে বলল, "যদি ভিতরে বিপজ্জনক কিছু থাকে?"

ইরন হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠে বলল, "তা হলে আমরা এক সপ্তাহের মাঝে মারা না গিয়ে হয়তো আরো দুদিন আগে মারা যাব! খুব কি ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে?"

কীশা আবার একটি নিশ্বাস ফেলে বলল, "না। তা হবে না।"

ইরন কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, শুমান্তি বাধা দিয়ে বলল, "আমরা এই মহাকাশযানে আরো একটি বিচিত্র জিনিস পেয়েছি।"

"কী?"

"এন্টি ম্যাটার[১৬]। প্রতিপদার্থ।"

ইরন চমকে সোজা হয়ে বসে বলল, "এন্টি ম্যাটার? কী বলছ?"

"হ্যাঁ।"

"কতখানি?"

"অনেক। মহাকাশযানের সামনে পুরোটাই এন্টি ম্যাটার। চৌম্বক ক্ষেত্রে আটকে রেখেছে। মনে হয় খুব সুরক্ষিত। তারপরও প্রচুর গামা[১৭] রেডিয়েশন হচ্ছে। আসলে—" শুমান্তি একটু লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, "আমি তো স্বাভাবিকভাবে বড় হই নি, পড়াশোনার সেরকম সুযোগ হয় নি, তাই বিজ্ঞান বিশেষ জানি না। কতটুকু এন্টি ম্যাটার আছে, কীভাবে আছে দেখলে তোমরা বলতে পারবে।"

ইরন অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, "তুমি বিজ্ঞান না জেনেও চমৎকার বিজ্ঞানীর মতো কাজ করছ শুমান্তি!"

কীশা একটু সামনে ঝুঁকে বলল, "কিন্তু মহাকাশযানে এন্টি ম্যাটার কেন? তাও এই বিশাল পরিমাণের?"

"এন্টি ম্যাটার হচ্ছে শক্তি তৈরির সবচেয়ে সহজ উপায়। কোনো ম্যাটার বা পদার্থের সাথে জুড়ে দাও সাথে সাথে 'বুম'—প্রচণ্ড বিস্ফোরণ।"

"কিন্তু সেটা তো অনিয়ন্ত্রিত শক্তি। সেটা কী কাজে লাগবে?"

"যদি অনিয়ন্ত্রিতভাবেই থাকে তা হলে বিশেষ কোনো কাজে আসবে না। যদি ব্যবহার করার জন্য বিশেষ ইঞ্জিন থাকে সেটা ব্যবহার করা যেতে পারে।"

কীশা ত্রালুস আর শুমান্তির দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমরা কি দেখেছ সেরকম ইঞ্জিন?"

দুজনে একসাথে মাথা নাড়ল, বলল, "না দেখি নি।"

"এ রকম কি হতে পারে যে, দেখেছ কিন্তু বুঝতে পার নি?"

"হতে পারে।" ত্রালুস মাথা নেড়ে বলল, "তবে তার সম্ভাবনা খুব কম। মহাকাশযানের মূল তথ্যকেন্দ্র আর্কাইভ ঘরে কী আছে সেটা গোপন রেখেছে, কিন্তু অন্য সবকিছু খুব স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে। সেখানে নেই।"

কীশা ভুরু কুঁচকে বলল, "তা হলে?"

ইরন হাসার চেষ্টা করে বলল, "ধরে নাও তোমার কাছে যে পরিমাণ এন্টি ম্যাটার আছে সেটা দিয়ে আধখানা পৃথিবী কিংবা বৃহস্পতির একটা চাঁদ উড়িয়ে দিতে পারবে! পৃথিবীর কোনো মানুষ আগে এ রকম কিছু করে নি—সেটা চিন্তা করে তুমি যদি একটু আনন্দ পেতে চাও পেতে পার।"

কীশা বিমর্ষ মুখে বসে রইল, তাকে দেখে মনে হল না সে ব্যাপারটি থেকে কোনো আনন্দ পাওয়ার চেষ্টা করছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও!

www.amarboi.com ~
AMARBOI.COM

পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টা তারা আর্কাইভ ঘরের বাক্সগুলো খোলার চেষ্টা করল, কিন্তু প্রথম কয়েক ঘণ্টার মাঝেই বুঝতে পারল ব্যাপারটি প্রায় অসম্ভব। বাক্সগুলো অত্যন্ত যত্ন করে রাখা আছে, বাইরে থেকে সেগুলো মসৃণ এবং কোথাও খোলার মতো কোনো জায়গা নেই। ক্রোমিয়াম এবং টাইটানিয়ামের যে সংকর ধাতু দিয়ে বাক্সগুলো তৈরি করা হয়েছে সেগুলো কাটার মতো কোনো যন্ত্রপাতি মহাকাশযানে নেই। বাক্সগুলোর কোনো কোনোটি স্পর্শ করলে ভিতরে খুব সূক্ষ্ম কম্পন অনুভব করা যায়, ভিতরে কোনো এক ধরনের যন্ত্রপাতি চলছে, কিন্তু সেগুলো কী ধরনের যন্ত্রপাতি বোঝার কোনো উপায় নেই।

প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা সময় ব্যয় করে তারা শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিল। মহাকাশযানের যারাই এই বাক্সগুলো রেখেছে তারা চায় না এগুলো খোলা হোক। এর মাঝে রহস্যটুকু যেন আড়াল থাকে সেটাই তাদের উদ্দেশ্য। মহাকাশযানটি এর মাঝে বৃহস্পতি গ্রহের মহাকর্ষ বলের আওতার মাঝে চলে এসেছে। ধীরে ধীরে তার গতিবেগ বাড়ছে এবং সবাই সেটা বুঝতে পারছে। বিশাল মহাকাশযানটি বৃহস্পতির প্রবল আকর্ষণে তার দিকে ছুটে চলছে, তাকে ফেরানোর আর কোনো উপায় নেই।

আর্কাইভ ঘরের বাক্সগুলো খুলতে না পেরে মহাকাশযানের চার জন আবার নিয়ন্ত্রণ কক্ষে একত্রিত হয়েছে। ত্রালুস এবং শুমান্তি যে করেই হোক পুরো ব্যাপারটিকে বেশ সহজভাবে নিয়েছে। জন্মের পর থেকেই ক্লোন হিসেবে বড় করার সময় সম্পূর্ণ অকারণে মৃত্যুবরণ করার জন্য তাদেরকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে, কাজেই এই পরিবেশটুকু তাদের জন্য একেবারেই অস্বাভাবিক কিছু নয়। আগামী কয়েক দিনের মাঝে যে ভয়ঙ্কর পরিণতি ঘটবে সে সময় তারা যেন সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা মাথায় থেকে মহাকাশযানের সত্যিকার মানুষ দুজনকে সাহায্য করতে পারে এখন সেটাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য।

কীশা এর মাঝে বেশ ভেঙে পড়েছে, তার চেহারায় উদভ্রান্ত মানুষের একটি ছাপ পড়েছে। ইরন তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে বলল, "কীশা! তুমি মনে হয় বেশি ভেঙে পড়েছ—তুমি সম্ভবত জান না মৃত্যু খুব খারাপ কিছু নয়।"

"মৃত্যু নিয়ে আমার খুব একটা চিন্তা নেই ইরন। কিন্তু তার আগে আমাদের কিছু করার নেই, পুরো সময়টা বসে বসে দেখব আমরা বৃহস্পতিতে আছাড় খেয়ে পড়ছি, আমি সেটা মানতে পারছি না।"

"তুমি কী করতে চাও?"

"কিছু একটা করতে চাই। কোনোভাবে চেষ্টা করতে চাই।"

"আমাদের কোনোরকম চেষ্টা করার কিছু নেই। মহাকাশযানটির কক্ষপথ এমনভাবে তৈরি হয়েছে যেন আমরা সরাসরি বৃহস্পতিতে গিয়ে আঘাত করি।" ইরন স্ক্রিনের দিকে দেখিয়ে বলল, "ঐ দেখ, বৃহস্পতি গ্রহ। মাঝখানের লাল অংশটুকু দেখে মনে হয় না যে একটা লাল চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে?"

কীশা মাথা নেড়ে বলল, "আমি দেখতে চাই না। একটা গ্রহ যে এত ভয়ঙ্কর হতে পারে আমি নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।"

ত্রালুস ইতস্তত করে বলল, "কীশা, তোমাকে আমরা ক্যাপসুলে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারি। ঘুমের মাঝেই এই মহাকাশযানটি ধ্বংস হয়ে যাবে, তুমি জানতেও পারবে না।"

কীশা মাথা নাড়ল, বলল, "না, আমি ঘুমাতে চাই না। আমি শেষটুকু দেখতে চাই।"

ইরন অন্যমনস্কভাবে টেবিলে আঙুল দিয়ে শব্দ করতে থাকে, তাকে খুব চিন্তিত দেখায়, কিছু একটা জিনিস তার কাছে খুব অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে কিন্তু সে ঠিক ধরতে পারছে না।

দেখতে দেখতে আরো চব্বিশ ঘণ্টা কেটে গেছে, মহাকাশযানের গতিবেগ আরো বেড়ে গেছে, বৃহস্পতি গ্রহের বায়ুমণ্ডলের সূক্ষ্ম স্তরের অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে। মহাকাশযানের সূচালো অ্যান্টেনাগুলোতে এক ধরনের নীলাভ আলো দেখা যাচ্ছে—সম্ভবত আয়োনিত[১৮] গ্যাসের কারণে। স্ক্রিনে বৃহস্পতি গ্রহটি আরো স্পষ্ট হয়েছে, তার উপরের বায়ুমণ্ডলের প্রবাহ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, মাঝে মাঝে গ্রহটিকে জীবন্ত একটি কুৎসিত প্রাণী বলে মনে হয়। এক ধরনের বিতৃষ্ণা নিয়ে সবাই গ্রহটির দিকে তাকিয়ে থাকে। গত চব্বিশ ঘণ্টা কীশা মহাকাশযানের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে অনেকভাবে পুনরায় নতুনভাবে চালু করতে চেষ্টা করেছে কিন্তু পারে নি। পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছে কিন্তু কোনো লাভ হয় নি। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে আবার কন্ট্রোল প্যানেলের চতুষ্কোণ টেবিলটা ঘিরে মহাকাশযানের চার জন এসে বসেছে। ইরনের মুখ চিন্তাক্লিষ্ট এবং সে অন্যমনস্কভাবে আঙুল দিয়ে টেবিলের ওপর শব্দ করছে। কীশা খানিকটা ইরনের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "ইরন।"

ইরন মাথা তুলে কীশার দিকে তাকাল, "বল।"

"তুমি কী চিন্তা করছ?"

"সেরকম কিছু নয়।"

"কিছুক্ষণ আগে দেখলাম নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের কম্পিউটারে কিছু একটা হিসাব করছ।"

"হ্যাঁ।"

"কী হিসাব করছ?"

"সেরকম কিছু নয়।"

"আমাদের বলতে চাইছ না?"

ইরন কীশার দিকে তাকিয়ে রইল, কিছু বলল না। কীশা একটু আহত স্বরে বলল, "ইরন তুমি আমাদের মাঝে একমাত্র বিজ্ঞানী। আমাদের এই বিপদ থেকে বাঁচানোর যদি কোনো উপায় থাকে সেটা শুধু তুমিই ভেবে বের করতে পারবে।"

AMARBOI.COM

"কোনো উপায় নেই।"

"হয়তো সাধারণ হিসাবে নেই। কিন্তু কোনো অসাধারণ হিসাবে! কোনো বিচিত্র উপায়ে—যে উপায়ে সাফল্যের সম্ভাবনা খুব কম?"

ইরন তীক্ষ্ণ চোখে কীশার দিকে তাকাল, বলল, "তুমি কোন উপায়ের কথা বলছ?"

"আমি জানি না।" কীশা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "অস্বাভাবিক কোনো উপায়।"

"যেমন?"

"যেমন একটি ওয়ার্মহোল তৈরি করে বের হয়ে যাওয়া।"

"ওয়ার্মহোল?" শুমান্তি মাথাটা একটু এগিয়ে জিজ্ঞেস করল, "সেটা কী?"

ইরন নিচু গলায় বলল, "দুটি ভিন্ন ভিন্ন স্থান এবং সময়কে একটা ফুটো দিয়ে জুড়ে দেওয়া যায়। সেটাকে বলে ওয়ার্মহোল।"

"তার মানে হঠাৎ করে সামনের স্থানটুকুর মাঝে একটা ফুটো তৈরি করা যাবে এবং সেই ফুটো দিয়ে বের হয়ে আমরা অন্য একটি জায়গায় অন্য একটি সময়ে বের হয়ে আসব?"

"অনেকটা সেরকম?"

"সেই জায়গাটা কোথায়?"

"অন্য কোনো গ্যালাক্সিতে, অন্য কোনো শতাব্দীতে।"

"তুমি সেটা করতে পার?"

ইরন হেসে ফেলল, বলল, "না পারি না। তবে আমি এ বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছিলাম। পৃথিবীতে একবার একটা ওয়ার্মহোল তৈরি করতে গিয়ে প্রায় আধখানা শহর ধ্বংস করে ফেলেছিলাম।"

কীশা সোজা হয়ে বসে বলল, "তুমি এখন আবার চেষ্টা করে দেখ। এখানে ধ্বংস করার কিছু নেই। আমাদের মহাকাশযানে প্রচুর এন্টি ম্যাটার আছে, স্থান এবং সময়ের ক্ষেত্রকে হয়তো প্রচণ্ড চাপ দিয়ে ভেঙে ফেলতে পারবে।"

ইরন সোজা হয়ে বসে বলল, "তুমি তাই মনে কর?"

"চেষ্টা করতে তো ক্ষতি নেই। আমরা তো এমনিতেই মারা যাব।"

"যদি সত্যি সত্যি ওয়ার্মহোল দিয়ে বের হয়ে অন্য কোনো জগতে চলে যাই?"

"সেটা তো আর এর থেকে খারাপ হবে না।"

ইরন কীশার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তোমার তাই ধারণা?"

"হ্যাঁ, আমার তাই ধারণা।"

ইরন কাজে লেগে গেল। পৃথিবীর একটি সম্ভ্রান্ত ল্যাবরেটরিতে যে কাজটি করার কথা, মহাকাশযানের সীমিত সুযোগ–সুবিধার মাঝে সেই কাজটি মোটামুটি অসম্ভব হওয়ার কথা ছিল কিন্তু দেখা গেল সেটি তত কঠিন নয়। মহাকাশযানটি যে প্রচণ্ড বেগে বৃহস্পতির দিকে ছুটে যাচ্ছে সেটি ওয়ার্মহোলের ভিতর দিয়ে যাওয়ার জন্য প্রায় সঠিক বেগ হিসাবে বের হয়ে এল। এন্টি ম্যাটারকে সামনে ছুড়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হিসাবে দুটি শক্তিশালী রকেট ইঞ্জিন পাওয়া গেল। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের জন্য এন্টি ম্যাটারের সমান পরিমাণ ভরকে প্রস্তুত করা হল। এখন বাকি রয়েছে হিসাব করে বের করা কখন ঠিক কী ধরনের বিস্ফোরণ ঘটানো এবং ওয়ার্মহোলের মুখটি খোলার পর তার ভিতরে প্রবেশ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি। মহাকাশযানের কম্পিউটারকে এই ধরনের হিসাবে বিশেষ পারদর্শী পাওয়া গেল। শুমান্তি প্রচলিত শিক্ষা পায় নি, কিন্তু এই মেয়েটি অসাধারণ বিজ্ঞানমনস্ক এবং কিছু জিনিস বুঝিয়ে দেবার পর সে প্রয়োজনীয় হিসাব করার কাজটি খুব সুচারুভাবে করতে শুরু করল। ত্রালুস এবং কীশা এন্টি ম্যাটারকে গতিপথের নির্দিষ্ট স্থানে পাঠানোর জন্য রকেট ইঞ্জিন দুটিকে প্রস্তুত করতে শুরু করল।

পরবর্তী ছত্রিশ ঘণ্টার মাঝে ইরন বৃহস্পতির পৃষ্ঠদেশে একটি ওয়ার্মহোল তৈরি করে তার ভিতর দিয়ে অন্য কোনো একটি জগতে পাড়ি দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিল। মহাকাশযানের কম্পিউটারের হিসাব অনুযায়ী সাফল্যের সম্ভাবনা দশমিক শূন্য তিন। যদি কিছু না করার চেষ্টা করে তা হলে বৃহস্পতির বায়বীয় পৃষ্ঠে ডুবে ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা প্রায় এক শ ভাগ, কাজেই এই চেষ্টাটুকু করে দেখতেই হবে।

প্রস্তুতি পুরোপুরি শেষ করে চার জন নিজেদের ক্যাপসুলে আশ্রয় নেয়। সত্যি সত্যি যদি একটা ওয়ার্মহোল তৈরি করতে পারে তা হলে মহাকাশযানটিকে যে গতিতে তার ভিতরে প্রবেশ করতে হবে সেটি অচিন্তনীয়, এর আগে কেউ কখনো ওয়ার্মহোলে প্রবেশ করে নি, ভিতরে কী ধরনের বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে কেউ জানে না। ছোটখাটো বাধার সম্মুখীন হলেই তারা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে।

ইরন সুইচ অন করে অন্য তিন জনের সাথে যোগাযোগ করল। কীশা পাথরের মতো মুখ করে অপেক্ষা করছে। ইরন জিজ্ঞেস করল, "তোমার কি ভয় করছে?"

"হ্যাঁ।"

"চমৎকার—কারণ আমরা যেটা করতে চাইছি সেটা খুব ভয়ের ব্যাপার। ভয় পাওয়ারই কথা।"

কীশা কোনো কথা বলল না। ইরন আবার বলল, "আমরা যে ক্যাপসুলের মাঝে আছি সেটি অত্যন্ত নিরাপদ, অনেকটা মাতৃগর্ভে থাকার মতো। কাজেই তোমরা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে যেতে পার।"

"আমি ঘুমাতে চাই না।"

"বেশ। যেরকম তোমার ইচ্ছা। আমরা যখন ওয়ার্মহোলে প্রবেশ করব তখন কী দেখব আমি জানি না। স্থান এবং সময়ের ক্ষেত্রে অনেক বড় ওলটপালট হয়ে যাবে, আশা করছি এই মহাকাশযানটি এক জায়গায় থাকবে, এর একেকটি অংশ যেন একেক শতাব্দীতে একেক গ্যালাক্সিতে ছড়িয়ে না পড়ে।"

"সেরকম হতে পারে?"

ইরন হেসে ফেলল, বলল, "নিশ্চয়ই হতে পারে। বিস্ফোরণের প্রচণ্ড ঝাপটায় আমরা ভস্মীভূত হয়ে যেতে পারি। তোমরা তো শুনেছ সাফল্যের সম্ভাবনা মাত্র দশমিক শূন্য তিন!"

ক্যাপসুলের ভিতরে মনোযোগ আকর্ষণ করে 'বিপ' ধরনের একটি শব্দ হল এবং সাথে সাথে একটি যান্ত্রিক গলা শোনা গেল, "মহাকাশযানের অভিযাত্রীদের সতর্ক করা যাচ্ছে। আর ষাট সেকেন্ড পর এই মহাকাশযানটি একটি বিস্ফোরণের সম্মুখীন হবে।"

ইরন একটি নিশ্বাস ফেলল, মহাকাশযান থেকে এন্টি ম্যাটার নিয়ে রকেট দুটি রওনা দিয়েছে। মহাকাশযানের ভর কেন্দ্রের পরিবর্তন হওয়াতে পুরো মহাকাশযানটি ভয়ানকভাবে দুলে উঠল। ক্যাপসুলের বাইরে থাকলে বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত। সে ক্যাপসুলের ভিতরে কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে তাকায়। ভয়ঙ্করদর্শন উজ্জ্বল লাল রঙে সময় দেখানো হচ্ছে, এক মিনিট খুব বেশি সময়ই নয় কিন্তু সেই সময়টাকে হঠাৎ খুব দীর্ঘ মনে হচ্ছে।

AMARBOI.COM

ইরন শান্ত গলায় বলল, "কীশা, ত্রালুস এবং শুমান্তি, আমরা সত্যি সত্যি ওয়ার্মহোলের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারব কি না জানি না, যদি না পারি তোমাদের থেকে বিদায় নিচ্ছি। যদি এই মুহূর্তটিই আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত হয়ে থাকে তা হলে সেই মুহূর্তটিকে অর্থবহ করার জন্য তোমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।"

ত্রালুস নিচু গলায় বলল, "আমি এত সুন্দর করে বলতে পারব না কিন্তু একই জিনিস বলতে চাই। তোমাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ।"

শুমান্তি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আমি বিদায় নেব না, আমি সবার জন্য শুভ কামনা করছি।"

কীশা কাঁপা গলায় বলল, "ধন্যবাদ শুমান্তি।"

এবং ঠিক সেই মুহূর্তে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণে সমস্ত মহাকাশযানটি দুলে উঠল। মহাকাশযানের আলো নিভে গিয়ে নিভুনিভু হয়ে জ্বলতে থাকে। কর্কশ এলার্মের শব্দ মহাকাশযানটিকে এক ভয়াবহ আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করে নেয়।

ইরন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে। পদার্থ-প্রতিপদার্থের প্রচণ্ড বিস্ফোরণে একটি ক্ষুদ্র বিন্দুতে অচিন্তনীয় ভরকে কেন্দ্রীভূত করে স্থান এবং সময়ের ক্ষেত্রকে ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে। ছিন্ন ক্ষেত্রের অন্যপাশে এক বিচিত্র জগৎ অপেক্ষা করছে। ভিন্ন সময় এবং ভিন্ন স্থান। হয়তো দূর কোনো গ্যালাক্সি[১৯], অন্য কোনো নক্ষত্র, কোনো

ব্ল্যাকহোল[২০] বা কোয়াজারের[২১] কাছাকাছি। কোনো অজানা গ্রহ, অজানা জগৎ। সেই দূর জগতের ভিন্ন এক সময়ে তারা পৌঁছাবে কয়েক মুহূর্তে। ইরন নিশ্বাস বন্ধ করে সামনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

চারপাশের দৃশ্য দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। বৃহস্পতি গ্রহটি যেন চোখের সামনে গলে তরল পদার্থের মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। চারপাশের গ্রহ নক্ষত্র গ্রহাণুপুঞ্জ যেন বিস্তৃত হয়ে যাচ্ছে, তার মাঝে ধীরে ধীরে নিকষ কালো একটি অন্ধকার গহ্বর বের হয়ে এল। সেই গহ্বরের মাঝে তাদের মহাকাশযান ছুটে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে চারপাশ নিকষ কালো অন্ধকারে ঢেকে গেল, মহাকাশযানের আলো নিভে গেল। ইঞ্জিনের গর্জন, এলার্মের তীব্র শব্দ সবকিছু থেমে গেল। কোথাও কোনো শব্দ নেই। শুধু নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ ধক্‌ধক্‌ করছে। ইরন কান পেতে শোনার চেষ্টা করে, বুকের শব্দও ধীরে ধীরে থেমে আসছে। আলো নেই, অন্ধকার নেই, শব্দ নেই, নৈঃশব্দ্য নেই, বিচিত্র বোধশক্তিহীন এক জগতে সে ডুবে যাচ্ছে। পুরো মহাকাশযানটি অদৃশ্য এক জগতে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ইরন নিজের সমস্ত চেতনাকে কেন্দ্রীভূত করে রাখার চেষ্টা করে, কিন্তু বুঝতে পারে সবকিছু অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। সবকিছু নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। সবকিছু হারিয়ে যাচ্ছে।

এটাই কি মৃত্যু? নাকি এটা নতুন জীবন?

৬

পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে বিশাল স্ক্রিনে মহাকাশযানটি হঠাৎ করে অদৃশ্য হয়ে গেল। স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকা মধ্যবয়স্ক মানুষটি কাঁপা গলায় বলল, "ওয়ার্মহোলে প্রবেশ করেছে।"

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বৃদ্ধ মানুষটি বলল, "কী মনে হয় তোমার প্রজেক্টটি কি সফল হবে?"

"আমরা এক্ষুনি সেটি দেখতে পারব! যদি সফল হয় তা হলে তারা এক্ষুনি বের হয়ে আসবে। তাদের হিসাবে যত সময়ই লাগুক আমাদের হিসাবে সেটা হবে কয়েক মুহূর্ত।"

নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের মানুষগুলো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে রইল।

AMARBOI.COM

দ্বিতীয় পর্ব

১

মহাকাশযানটি আশ্চর্য রকম নীরব। গতিবেগ বাড়ানোর বা কমানোর সময় তার শক্তিশালী ইঞ্জিনটি চালু করা হয় তখন তার চাপা গুমগুম শব্দ অনুভব করা যায়। এখন এটি একটি হোয়াইট ডোয়ার্ফ[২২] ধরনের সাধারণ নক্ষত্রের মহাকর্ষ বলে আটকা পড়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, ইঞ্জিনগুলো চালু করে রাখা নেই বলে কিছু বোঝার উপায় নেই। মহাকাশযানের গোলাকার জানালাগুলো দিয়ে বাইরে তাকালে অপরিচিত নক্ষত্রগুলো চোখে পড়ে, সেগুলো দেখে মহাবিশ্বের কোথায় তারা চলে এসেছে সেটি বোঝার কোনো উপায় নেই।

মহাকাশযানের অপ্রয়োজনীয় আলোগুলো নিভিয়ে রাখা হয়েছে বলে পুরো মহাকাশযানে এক ধরনের কোমল আলো এবং অন্ধকার। মহাকাশযানের তীব্র চোখ ধাঁধানো আলো নেই বলে এখানে এক ধরনের শান্ত পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। ইরন মহাকাশযানের গোল জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরের নিকষ কালো অন্ধকার মহাকাশের অসংখ্য নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মহাকাশযানের এই শান্ত পরিবেশটুকু আসলে তাদের মানসিক অবস্থার প্রতিফলন নয়। তারা ভিতরে ভিতরে অশান্ত এবং অস্থির। কোথায় আছে এবং কোথায় যাচ্ছে জানে না বলে কিছুতেই স্থির হয়ে কোথাও বসতে পারছে না, ঠাণ্ডা মাথায় কিছু ভাবতে পারছে না। মহাকাশযানের মূল কম্পিউটার গত কয়েকদিন থেকে হিসাব করে যাচ্ছে, মহাকাশযানের তথ্যকেন্দ্রে রাখা মহাকাশের গ্যালাক্সি ও নক্ষত্রের তালিকার সাথে চারপাশের নক্ষত্রের অবস্থান মিলিয়ে বের করার চেষ্টা করছে তারা এখন কোথায়। কিন্তু এখনো কোনো লাভ হয় নি।

ইরন একটা ছোট নিশ্বাস ফেলে মহাকাশযানের ডকিং বে[২৩] এর দিকে হাঁটতে থাকে। জায়গাটা মহাকাশযানের বাইরের দিকে, সেখানে বিশাল গোলাকার স্বচ্ছ ছাদের ভিতর দিয়ে বাইরে দেখা যায়, বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় তারা কত ক্ষুদ্র ব্যাপারটি হঠাৎ করে নতুনভাবে যেন তারা অনুভব করতে পারে।

ইরন মহাকাশযানের মূল লিফটে করে উপরের দিকে যেতে থাকে। বড় একটা করিডোর ধরে হেঁটে দ্বিতীয় একটি লিফটে করে ডকিং বে'তে হাজির হল। গোলাকার ঘরটির মাঝামাঝি জায়গায় বসার জন্য আরামদায়ক কিছু চেয়ার সাজানো রয়েছে। তার একটিতে ত্রালুস এবং শুমান্তি পাশাপাশি অন্তরঙ্গভাবে বসে আছে। ইরনকে দেখে দুজনেই অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল। এই ডকিং বে'তে সে আগে কখনো আসে নি। ইরন মুখে হাসি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফুটিয়ে বলল, "তোমরা এখানে? সময় কাটানোর জন্য ভালো একটা জায়গা পেয়েছ মনে হচ্ছে।"

"হ্যাঁ, খুব সুন্দর জায়গা।" ত্রালুস মাথা নেড়ে বলল, "এখানে বসে বাইরে তাকাতে খুব ভালো লাগে।"

"শিল্ডিংয়ের কী অবস্থা কে জানে। বাড়াবাড়ি রেডিয়েশান হলে এখানে থেকো না।"

ত্রালুস মাথা নাড়ল, বলল, "না, থাকব না।"

ইরন একটা চেয়ারে বসে উপরের দিকে তাকাল। নিকষ কালো অন্ধকারে নক্ষত্রগুলো জ্বলজ্বল করছে। মাঝামাঝি একটা স্পাইরাল গ্যালাক্সি দেখা যাচ্ছে। দূরে দুটি নক্ষত্রপুঞ্জ। এই আকাশের একটি নক্ষত্রকেও তারা আগে কখনো দেখে নি। ইরন আকাশ থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে ত্রালুস এবং শুমান্তির দিকে তাকাল, বলল, "তোমরা নিশ্চয়ই খুব অস্থির হয়ে আছ, নিশ্চয়ই খুব অশান্তিতে রয়েছ। আমি দুঃখিত যে এ রকম একটা অবস্থায় আছি অথচ কিছু করতে পারছি না।"

ত্রালুস এবং শুমান্তি অবাক হয়ে ইরনের দিকে তাকাল। ত্রালুস একটু ইতস্তত করে বলল, "কিন্তু ইরন—"

"কী?"

"আসলে আমরা কিন্তু একেবারেই অশান্তিতে নেই। আমরা খুব আনন্দের মাঝে আছি। আমাদের আসলে খুব ভালো লাগছে।"

"ভালো লাগছে?"

"হ্যাঁ। কী চমৎকার শান্ত একটা পরিবেশ। নিরিবিলি সুমসাম। তা ছাড়া—"

"তা ছাড়া?"

"তা ছাড়া আমরা তো আসলে খুব অস্বাভাবিক একটা পরিবেশে বড় হয়েছিলাম, কখনো নিজেদের ক্লোন ছাড়া অন্য কাউকে দেখি নি। নিজেদের ক্লোন আসলে নিজের মতো— তাদের সাথে থাকা আসলে নিজের সাথে থাকার মতো। তাদের সাথে কথাও বলতে হত না, কারণ, আমরা জানতাম অন্যেরা কখন কী ভাবছে, কখন কী বলবে!"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। কিন্তু এখন সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। এই যে আমার শুমান্তির সাথে দেখা হল, তার সাথে কথা বলছি, এটা যে কী আনন্দের তোমাকে বোঝাতে পারব না। সে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা মানুষ, তার ব্যক্তিত্ব ভিন্ন, সব ব্যাপারে তার নিজস্ব মতামত আছে, চিন্তা করতে পার?"

ইরন একটু অবাক হয়ে ত্রালুস এবং শুমান্তির দিকে তাকিয়ে রইল, সে কখনোই চিন্তা করে নি মানুষের একেবারে স্বাভাবিক একটা ব্যাপার—ভিন্ন মানুষের ভিন্ন ব্যক্তিত্ব বা ভিন্নভাবে চিন্তা করতে পারার ব্যাপারটি কারো কাছে অস্বাভাবিক মনে হতে পারে। সে অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, "আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না, তোমরা বলছ যে তোমরা খুব ভালো আছ!"

"হ্যাঁ।" শুমান্তি এবং ত্রালুস একসাথে মাথা নাড়ল, বলল, "আমরা খুব ভালো আছি।"

"তোমরা পৃথিবীতে ফিরে যেতে চাও না?"

ত্রালুস এবং শুমান্তির মুখে ভয়ের একটা ছায়া পড়ল। কয়েক মুহূর্ত দুজনেই চুপ করে থাকে। তারপর শুমান্তি নিচু গলায় বলে, "না, আমরা পৃথিবীতে ফিরে যেতে চাই না। এখানেই আমরা খুব ভালো আছি। পৃথিবীতে ফিরে গেলে আবার আমাদের ছোট একটা

জায়গায় অন্য ক্লোনদের সাথে রাখবে। আমাদের নাম থাকবে না, পরিচয় থাকবে না।" শুমান্তি ভয়ার্ত মুখে মাথা নাড়তে থাকে।

ইরন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, সে নিজের চোখে না দেখলে কখনোই বিশ্বাস করত না যে কোনো মানুষ পৃথিবীতে ফিরে যাওয়া থেকে এই মহাকাশযানে জীবন কাটিয়ে দেওয়াকে বেশি আনন্দদায়ক মনে করে। নামপরিচয়হীনভাবে থাকার ব্যাপারটি সে জানে না। ক্লোন করা বেআইনি, যারা করেছে তারা বড় অপরাধ করেছে। কিন্তু একবার করা হয়ে গেলে তাকে নিশ্চয়ই মানুষের সম্মান দিতে হবে। ইরন চিন্তিত মুখে বলল, "পৃথিবীতে আমরা ফিরে যেতে পারব কি না জানি না। যদি যেতেও পারি তা হলে সেটি পৃথিবীর সময়ে কবে যাব জানি না। কিন্তু আমাদের চেষ্টা করতে হবে। এই মহাকাশযানের মাঝে তো কেউ সারা জীবন কাটাতে পারবে না।"

"কেন পারবে না? আমরা খোঁজ নিয়ে দেখেছি এখানে সবকিছু রি-সাইকেল[২৪] করা যায়। কৃত্রিম খাবার তৈরি করা যায়—"

ইরন হেসে বলল, "সারা জীবন কৃত্রিম খাবার খেয়ে কাটিয়ে দেবে? একটা মহাকাশযানে?"

"কেন, তাতে অসুবিধে কী?"

ইরন মাথা নাড়ল, "তুমি যদি নিজে অসুবিধেটা বুঝতে না পার তা হলে কেউ তোমাকে বোঝাতে পারবে না। তা হলে বুঝতে হবে আসলেই কোনো অসুবিধে নেই।"

ইরন মহাকাশযানের মূল তথ্যকেন্দ্রের তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করে দীর্ঘ সময় কাটিয়ে দেয়। মহাকাশযানের অনেক খুঁটিনাটি তথ্য সে জানতে পারে যেটা অন্য কোনোভাবে তার পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। যেমন সে জানত না মহাকাশযানে ব্যবহারের জন্য দেহের কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রয়েছে, যুদ্ধ করার জন্য প্রচুর অস্ত্র রয়েছে, বিনোদনের জন্য পৃথিবীর প্রাচীনতম সংগীতের সংগ্রহ রয়েছে এবং প্রার্থনা করার জন্য পৃথিবীর সকল ধর্মের ধর্মগ্রন্থ রয়েছে। কিন্তু তারা কোথায় আছে সেই তথ্যটি কোথাও নেই। উদ্দেশ্যহীনভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া এই মুহূর্তে আর কিছুই তাদের করার নেই।

ইরন তথ্যকেন্দ্র থেকে সরে এসে কীশাকে খুঁজে বের করল। সে মহাকাশযানের যোগাযোগ কেন্দ্রে বেশ কিছু যন্ত্রপাতির সামনে চিন্তিত মুখে বসে আছে। ইরনকে দেখে কীশা তার মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে বলল, "কী খবর ইরন?"

"কোনো খবর নেই। আমার ধারণা অদূর ভবিষ্যতেও কোনো খবর থাকবে না। আমরা হারিয়ে গেছি।"

"হারিয়ে গেছি?"

"হ্যাঁ। মহাকাশযানকে যদি কোনোভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতাম তা হলে একটা কথা ছিল!"

"তা হলে কী করতে?"

"ঠিক যেদিক দিয়ে এসেছি সেদিক দিয়ে ফিরে যেতাম। মহাকাশযানের লগে পুরো গতিপথ রাখা আছে, ফিরে যাওয়া কোনো সমস্যাই নয়। কিন্তু মহাকাশযানের ওপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।"

কীশা কোনো কথা না বলে ইরনের দিকে তাকিয়ে রইল। ইরন একটা নিশ্বাস ফেলে কীশার কাছে এগিয়ে যায়, "তুমি কী করছ?"

কীশা একটু ইতস্তত করে বলল, "আমি মহাকাশের চারপাশে বিদ্যুৎ চৌম্বকীয়[২৫] তরঙ্গ মাপছি।"

ইরন ভুরু কুঁচকে বলল, "কেন?"

"কোথাও অস্বাভাবিক কিছু দেখা যায় কি না দেখছি।"

"অস্বাভাবিক কিছু?"

"হ্যাঁ।"

ইরন কীশার সামনে রাখা যন্ত্রপাতিগুলো দেখল, এগুলো দৈনন্দিন ব্যবহারের যন্ত্র নয়, মহাকাশযানের প্রস্তুতির সময়েও তাদেরকে এগুলো দেখানো হয় নি। কীশা এগুলো খুঁজে পেল কেমন করে? জিজ্ঞেস করতে গিয়ে সে থেমে গেল। খানিকক্ষণ কীশার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তুমি ঠিক কী ধরনের অস্বাভাবিক সিগন্যাল খুঁজছ?"

"একটা বিশেষ কম্পন বা একাধিক বিশেষ কম্পন।"

"যদি খুঁজে পাও তা হলে কী হবে?"

"যদি খুঁজে পাই তার অর্থ আশপাশে কোথাও বুদ্ধিমান প্রাণী রয়েছে।"

ইরন চমকে উঠে কীশার দিকে তাকাল, "বুদ্ধিমান প্রাণী?"

"হ্যাঁ। পৃথিবী থেকে বুদ্ধিমান প্রাণী এভাবেই খোঁজা হয়েছিল, মহাকাশের কোনো বিশেষ অংশ থেকে বিশেষ কোনো কম্পনের বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ আসছে কি না সেটা দেখা হয়।"

"ও!" ইরন কিছুক্ষণ কীশার দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, "কোনো বিশেষ সিগন্যাল পেয়েছ?"

কীশা একটু হেসে বলল, "না।"

ইরন সামনে রাখা হলোগ্রাফিক স্ক্রিনের একটি বিশেষ আলোকিত বিন্দুকে দেখিয়ে বলল, "এটা কী?"

"এটা কিছু নয়।" কীশা হাত নেড়ে পুরো ব্যাপারটি উড়িয়ে দেবার ভঙ্গি করে বলল, "এটা ক্যালিব্রেশান সিগন্যাল।"

ইরন আবার হেঁটে হেঁটে মহাকাশযানের খোলা অংশের দিকে যেতে থাকে, ঠিক কী কারণ সে জানে না কিন্তু কিছু একটা ব্যাপার নিয়ে তার ভিতরে অস্বস্তি বাধছে, কিন্তু ব্যাপারটি কী সে বুঝতে পারছে না। খোলা ডকে একটা কালো আসনে সে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল, পাশের সুইচ স্পর্শ করতেই একটা ছোট পোর্ট হোল খুলে গিয়ে সেখানে কালো মহাকাশ ফুটে ওটে। পোর্ট হোলের ঠিক মাঝখানে স্পাইরাল গ্যালাক্সিটিকে দেখা যাচ্ছে। পৃথিবী থেকে বেশ কষ্ট করে খালি চোখে এন্ড্রোমিডা গ্যালাক্সিকে দেখা যায়। কিন্তু এখান থেকে এই গ্যালাক্সিটিকে খুব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, মাঝখানে নক্ষত্রপুঞ্জের চোখধাঁধানো উজ্জ্বল আলো, দুটি প্যাঁচানো অংশে লক্ষ কোটি নক্ষত্রের আলোক বিন্দু। দেখে মনে হয় সে বুঝি কোনো একটি টেলিস্কোপে চোখ রেখে বসে আছে। স্পাইরাল গ্যালাক্সিটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ইরনের চোখে ঘুম নেমে আসে। সে চোখ বন্ধ করে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে বিচিত্র স্বপ্ন দেখে, অজানা একটি গ্রহে যেন সে হারিয়ে গেছে। গ্রহের লালচে মাটিতে সে হাঁটছে, কিন্তু হাঁটতে পারছে না, তার পা মাটিতে বসে যাচ্ছে। সে শুনতে পাচ্ছে দূরে কোথায় যেন একটি শিশু কাঁদছে, শিশুটির কাছে সে যেতে চাইছে কিন্তু যেতে পারছে না। যত তাড়াতাড়ি সে হাঁটতে চাইছে ততই যেন তার পা মাটিতে আরো শক্ত হয়ে

বসে যাচ্ছে। মাটিতে শুয়ে সে শক্ত লাল পাথরে খামচে খামচে সামনে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু যেতে পারছে না। ধারালো পাথরের আঘাতে তার হাত ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে, যন্ত্রণায় সে চিৎকার করে ওঠে এবং সাথে সাথে তার ঘুম ভেঙে গেল।

ইরন ধড়মড় করে উঠে বসল। মহাকাশযানের আবছা অন্ধকারে পুরোপুরি জেগে উঠতে তার আরো কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল। বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডটি ধক্‌ধক্‌ করে শব্দ করছে। ঘামে সারা শরীর ভিজে গেছে। সে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে পোর্ট হোলের দিকে তাকাল, বাইরে এখনো নিকষ কালো অন্ধকার। এখনো সেখানে জ্বলজ্বলে কিছু নক্ষত্র এবং সেই বিচিত্র আলোকোজ্জ্বল স্পাইরাল গ্যালাক্সি। গ্যালাক্সিটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ইরন হঠাৎ চমকে উঠল, এটি পোর্ট হোলের ঠিক মাঝখানে ছিল কিন্তু এখন সেটি মাঝখানে নেই, ডান পাশে একটু সরে গেছে।

এটি হতে পারে শুধুমাত্র একটি জিনিস ঘটে থাকলে, মহাকাশযানটি যদি তার গতিপথের দিক পরিবর্তন করে থাকে।

ইরন নিশ্বাস বন্ধ করে উপরের দিকে তাকিয়ে থাকে, মহাকাশযানটিকে কোনোভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছিল না, হঠাৎ করে কে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করল? কীভাবে?

ইরন উঠে দাঁড়ায়, ব্যাপারটি খুব গুরুত্বপূর্ণ, কী হচ্ছে তাকে বুঝতে হবে, সবচেয়ে আগে কীশাকে খুঁজে বের করতে হবে। যোগাযোগ মডিউলটি হাতে নিয়ে কীশাকে ডাকতে গিয়ে সে থেমে গেল। যোগাযোগ কেন্দ্রে কীশা বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গের পরিমাপ করছিল, এখনো হয়তো সেখানেই আছে। ঘরটির সামনে গিয়ে ইরন থমকে দাঁড়ায়, বাইরের দরজাটি বন্ধ। স্বচ্ছ জানালা দিয়ে সে ভিতরে তাকাল। বড় হলোগ্রাফিক মনিটরে বিশেষ আলোকিত বিন্দুটি ধীরে ধীরে আরো বড় হয়ে উঠছে। বিন্দুটিকে কীশা ক্যালিব্রেশান বলে দাবি করছে কিন্তু তা হলে তার বড় হওয়ার কথা নয়, সব সময় একই আকারের থাকার কথা। এটি ক্যালিব্রেশানের বিন্দু নয়, এটি সত্যিকারের সিগন্যাল।

ইরন নিশ্বাস বন্ধ করে হলোগ্রাফিক স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকে, ব্যাপারটি অবিশ্বাস্য কিন্তু পুরো ব্যাপারটিকে শুধুমাত্র একভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। মহাকাশের এই অংশে কোথাও কোনো বুদ্ধিমান প্রাণী রয়েছে, তাদের সিগন্যাল লক্ষ্য করে এই মহাকাশযানটি দিক পরিবর্তন করে এখন সেদিকেই এগিয়ে যাচ্ছে।

ইরন যোগাযোগ মডিউলটি হাতে নিয়ে কীশাকে ডাকতে গিয়ে আবার থেমে গেল, কেন তার মনে হচ্ছে কীশা পুরো ব্যাপারটি জানে?

কেন তার মনে হচ্ছে কীশা পুরো ব্যাপারটি নিয়ন্ত্রণ করছে?

২

নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের সামনে বড় টেবিলটা ঘিরে চার জন বসে আছে, কারো মুখে কোনো কথা নেই। সামনে বিশাল স্ক্রিনটাতে একটা ছোট বিচিত্র গ্রহ দেখা যাচ্ছে। গ্রহটি প্রায় অস্পষ্ট ছিল, ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়েছে। গত কয়েক ঘণ্টায় এই স্ক্রিনে গ্রহটির আকার বড় হতে শুরু করেছে। গ্রহটির রং সবুজ এবং বেগুনি মেশানো, রংগুলো দ্রুত স্থান পরিবর্তন করছে বলে এটিকে একটি জীবন্ত প্রাণী বলে মনে হয়। সবুজ এবং বেগুনি রং পাশাপাশি খুব বেশি দেখা যায় না, তাই পুরো গ্রহটিকে হঠাৎ দেখে বীভৎস কিছু মনে হয়। এই গ্রহটি থেকে নির্দিষ্ট

কিছু কম্পনের বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গের সংকেত আসছিল, এই সংকেত লক্ষ্য করে মহাকাশযানটি তার দিক পরিবর্তন করে গ্রহটির দিকে ছুটে যেতে শুরু করেছে।

ইরন তার আঙুল দিয়ে অন্যমনস্কভাবে টেবিলে শব্দ করছিল, হঠাৎ করে থেমে গিয়ে সে নিজের আঙুলের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক গলায় বলল, "কীশা, আমরা কি তোমার সাথে খোলাখুলি কথা বলতে পারি?"

কীশা একমুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "পার।"

ইরন সোজা হয়ে বসে কীশার দিকে তাকাল, "তুমি কি আমাদের বলবে এখানে কী হচ্ছে?"

"আমি?" কীশা একটু অবাক হয়ে বলল, "আমি কেমন করে বলব?"

"কারণ তুমি নিশ্চিতভাবে কিছু জিনিস জান, যেটা আমরা জানি না।"

"যেমন?"

"যেমন তুমি জান যে চতুর্দিক থেকে কী পরিমাণ বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ আসছে সেটা খুব সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করার যন্ত্রপাতি এই মহাকাশযানে রয়েছে। আমরা কেউ সেটা জানতাম না। যেমন তুমি সেই যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে জান, একই অভিযানের ক্রু হয়েও সেটা আমরা জানি না। যেমন তুমি জান এখানে বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গের শক্তি পরিমাপ করা হলে বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্ব পাওয়া যাবে। যেমন তুমি—"

কীশা হাত তুলে ইরনকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "তুমি যেটা বলছ তার বেশিরভাগই তো সাধারণ জ্ঞানের ব্যাপার।"

"না।" ইরন মাথা নেড়ে বলল, "সাধারণ না। এর যে কোনো একটি ব্যাপার যদি ঘটত আমি বলতাম সাধারণ ব্যাপার, কাকতালীয় ঘটনা। কিন্তু একটি ঘটে নি। অনেকগুলো ঘটেছে। তুমি সবসময় বলে এসেছ তুমি বিজ্ঞানী নও, তুমি বিজ্ঞানের কিছু জান না। কিন্তু তোমার প্রত্যেকটি কথা প্রত্যেকটি কাজ প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানীর মতো। মনে আছে তুমি আমাকে ওয়ার্মহোল তৈরি করে তার ভিতর দিয়ে বের হয়ে আসার কথা বলেছিলে? তুমি জান পৃথিবীর কতজন মানুষ এটা বলতে পারবে?"

কীশা অবাক হয়ে বলল, "কিন্তু আমি সেটা একটা ছেলেমানুষি তথ্যকেন্দ্র থেকে শিখেছি! আমি কখনোই এর বেশি কিছু জানি না।"

"তুমি টাইটানিয়াম রড দিয়ে আঘাত করে বর্গেনের মাথা খুলে দিয়েছিল। তুমি নিশ্চিতভাবে জানতে একটা রবোটের ঠিক কোথায় কত জোরে আঘাত করতে হয়।"

"না জানতাম না।"

ইরন হিংস্র চোখে বলল, "জানতে।"

"না। জানতাম না।"

"আমি বলব, তুমি কেন জানতে?"

"কেন?"

"কারণ তুমি আমাদের দেখাতে চাইছিলে যে বর্গেন এই মহাকাশযানের রোবট। তুমি তাকে শেষ করে দিয়ে এই মহাকাশযান থেকে রোবটদের দূর করেছ। আমাদেরকে নিশ্চিন্ত রাখতে চেয়েছিলে।"

কীশা তীক্ষ্ণ চোখে ইরনের দিকে তাকিয়ে রইল। একটা বড় নিশ্বাস নিয়ে বলল, "তুমি কী বলতে চাইছ?"

"তুমি খুব ভালো করে জান, আমি কী বলতে চাইছি।" ইরন দাঁতে দাঁত ঘষে হিংস্র গলায় বলল, "তুমি এই মহাকাশযানের প্রকৃত রোবট।"

"আমি?" কীশা প্রায় আর্তনাদ করে বলল, "আমি?"

"হ্যাঁ।" ইরন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "তুমি দেখতে চাও?"

কীশা কাতর মুখে বলল, "কীভাবে দেখাবে?"

"আমি টাইটানিয়ামের রডটি নিয়ে তোমার মাথায় আঘাত করব, আর তোমার মাথাটি খুলে ছিটকে গিয়ে পড়বে। তোমার নাক মুখ দিয়ে কপোট্রনের শীতল করার হলুদ রঙের তরল ফিনকি দিয়ে বের হবে, তোমার চোখের ফটোসেল ঘোলা হয়ে যাবে—'

"কী বলছ তুমি?"

"হ্যাঁ, আমি ঠিকই বলছি।" ইরন প্রায় ছুটে গিয়ে দেয়াল থেকে টাইটেনিয়ামের রডটি খুলে নেয়। এবং সাথে ত্রালুস আর শুমান্তি ছুটে এসে তাকে ধরে ফেলল। ত্রালুস ভয় পাওয়া গলায় বলল, "কী করছ তুমি ইরন?"

ইরন একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "আমি জানি না আমি কী করছি। কিন্তু আমি হঠাৎ করে অনেক কিছু বুঝতে পারছি। অনেক কিছু।"

"কী বুঝতে পারছ?"

"সেটি এখন বলে কোনো লাভ নেই ত্রালুস। শুধু জেনে রাখ আমাদের নিয়ে একটি খুব ভয়ঙ্কর খেলা শুরু হয়েছে। আমরা সেই খেলার খেলোয়াড় নই। আমরা সেই খেলার গুটি।"

শুমান্তি ইরনের হাত থেকে টাইটানিয়ামের রডটি সরিয়ে নিয়ে নরম গলায় বলল, "ইরন। আমি খুব সাধারণ একজন ক্লোন, আমি হয়তো কিছু বুঝি না। কিন্তু তবু আমার কেন জানি মনে হয়, আমাদের এখন প্রত্যেকের প্রয়োজন রয়েছে। এখন কাউকে আঘাত করার সময় নয়।"

"রোবট হলেও?"

"রোবট যদি মানুষের মতো হয় তা হলে কেন মিছিমিছি তাকে রোবট বলে সরিয়ে রাখবে?"

ইরন অদ্ভুত একটি দৃষ্টিতে শুমান্তির দিকে তাকিয়ে রইল। শুমান্তি নরম গলায় বলল, "ইরন। তুমি কেমন করে জানো আমরা রোবট নই?"

"আমি জানি না।"

শুমান্তি একটা নিশ্বাস ফেলে ফলল, "আমিও জানি না।"

কীশা এতক্ষণ পাথরের মূর্তির মতো বসে ছিল। এবারে উঠে এসে বলল, "কিন্তু আমি জানি আমি রোবট নই। আমার স্বামী ছিল, দুজন সন্তান ছিল। আমি আমার সন্তানদের পেটে ধরেছিলাম, তাদের জন্ম দিয়েছিলাম। একটা দুর্ঘটনায় তাদের সবাইকে আমি হারিয়েছিলাম—আমার নিজেরও বেঁচে থাকার কথা ছিল না। কীভাবে কীভাবে জানি বেঁচে গেছি।"

ইরন শীতল চোখে কীশার দিকে তাকিয়ে রইল। কীশা এক পা এগিয়ে এসে বলল, "তুমি সত্যিই দেখতে চাও আমি সত্যিই মানুষ নাকি রোবট?"

ইরন কোনো কথা বলল না, হঠাৎ করে দেখল কীশার হাতে একটা ধারালো ছোরা এবং কিছু বোঝার আগেই কীশা তার হাতটা টেবিলে রেখে ধারালো ছোরাটি হাতের তালুতে বসিয়ে দেয়। সাথে সাথে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয়ে আসে।

শুমান্তি একটা আর্তচিৎকার করে কীশাকে ধরে ফেলল। কীশা নিচু গলায় বলল, "এটা সত্যিকার রক্ত। একফোঁটা নিয়ে বায়ো মডিউলে প্রবেশ করিয়ে দেখ। আমার পুরো জিনেটিক কোডও সেখানে পেয়ে যাবে।"

ত্রালুস এবং শুমান্তি কীশাকে ধরে মহাকাশযানের চিকিৎসা কেন্দ্রে নিতে থাকে। কীশা তার কেটে যাওয়া হাতটি ধরে কাতর গলায় বলল, "ইরন। আমি আজ তোমার ব্যবহারে খুব দুঃখ পেলাম। খুব দুঃখ পেলাম।"

ইরন তবু কোনো কথা বলল না, স্থির চোখে কীশার দিকে তাকিয়ে রইল। কীশা ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর সে টেবিলের কাছে এগিয়ে যায়। টেবিল থেকে সাবধানে একফোঁটা রক্ত তুলে নেয়। সে সত্যি সত্যি এই রক্তকে বায়ো মডিউলে প্রবেশ করিয়ে দেখবে।

বায়ো মডিউলের ভিতরে একটা চাপা গুঞ্জন শোনা গেল, প্রায় সাথে সাথেই বড় স্ক্রিনে কীশার রক্তের বিশ্লেষণ শুরু হয়ে গেল, ইরন একটা নিশ্বাস ফেলে, কীশা মিথ্যে কথা বলে নি, সত্যি সত্যি এটি মানুষের রক্ত। তার ডি. এন. এ.[২৬] বিশ্লেষণ করে জৈবিক গঠনের পুরো তথ্য চলে আসতে থাকে, কীশা একজন তেজস্বী এবং সাহসী মহিলা। আবেগপ্রবণ এবং স্নেহশীল। একাধিক সন্তানের মাতা। বড় দুর্ঘটনায় দীর্ঘ সময় শয্যাশায়ী। ঠিক যেরকম কীশা দাবি করেছিল। ইরন বায়ো মডিউলটি বন্ধ করতে গিয়ে থেমে গেল, রক্তের মাঝে অত্যন্ত স্বল্প পরিমাণের গ্রুপ তিনের ধাতব পদার্থ। মানুষের শরীরে স্বাভাবিক অবস্থায় এটি থাকার কথা নয়, কীশার শরীরে কেন আছে কে জানে।

ইরন খানিকক্ষণ বায়ো মডিউলের সামনে বসে থেকে অন্যমনস্কভাবে উঠে এল। নিয়ন্ত্রণ কক্ষের বড় স্ক্রিনটিতে কুৎসিত গ্রহটি আরো একটু বড় হয়েছে, যার অর্থ মহাকাশযানটি আরো কাছে এগিয়ে গেছে। বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গের মনিটরটি থেকে একটা চাপা শব্দ আসছে, নিশ্চয়ই তরঙ্গের পরিমাণ দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। ইরন একটা নিশ্বাস ফেলল, এর আগে সে কখনো এত অসহায় অনুভব করে নি। বুদ্ধিমান প্রাণীর একটা গ্রহের দিকে তাদের মহাকাশযানটি এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তাদের কিছু করার নেই। তারা কেন যাচ্ছে সেটিও তারা জানে না। প্রাণীদের বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কেও তাদের কোনো ধারণা নেই। বুদ্ধিমত্তায় তারা কি সেই প্রাণীদের সমান নাকি অনেক নিচে? যদি অনেক নিচে হয়ে থাকে তা হলে কী করবে? কিছু কি করার আছে?

AMARBOI.COM

ইরন খানিকক্ষণ স্ক্রিনটার নিচে দাঁড়িয়ে থেকে নিজেদের ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। কীশা তার ঘরের মাঝামাঝি বিছানায় নিশ্চল হয়ে শুয়ে আছে, হঠাৎ দেখলে মনে হয় প্রাণহীন কিন্তু ভালো করে তাকালে দেখা যায় খুব ধীরে ধীরে তার বুক ওঠানামা করছে, কীশা প্রাণহীন নয়, গভীর ঘুমে অচেতন। কীশার মুখের দিকে তাকিয়ে ইরনের নিজের ভিতরে এক ধরনের অপরাধবোধের সৃষ্টি হল। মেয়েটি খুব দুঃখী, তাকে আবার সে নতুন করে আজ দুঃখ দিয়েছে।

ইরন একটা নিশ্বাস ফেলে শুমান্তি আর ত্রালুসের ঘরে উঁকি দিল, তারা তাদের ঘরে নেই। নিশ্চয়ই অবজারভেটরিতে বসে আছে। নিজের অজান্তেই ইরনের মুখে হাসি ফুটে ওঠে, এই দুজন একেবারে ছোট শিশুদের মতো। একজনের কাছে আরেকজন হচ্ছে একটা খেলনা, সেই খেলনা যতই দেখছে ততই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে।

ইরন নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। দরজা স্পর্শ করতেই সেটা খুলে গেল। ঘরের মাঝামাঝি তার বিছানাটি ঝুলছে। ইরন পোশাক পাল্টে বিছানার মাঝে ঢুকে গেল। ঘরের আলো কমে আসে, তাপমাত্রা নেমে যেতে থাকে, মিষ্টি একটা গন্ধ ভেসে আসে ঘরে, তার সাথে হালকা এক ধরনের সঙ্গীত। ইরন দুই হাত বুকের কাছে নিয়ে এসে একসময় গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ল।

ইরনের ঘুম ভাঙল হঠাৎ করে, কেন ভাঙল সে বুঝতে পারল না, শুধু মনে হল খুব অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটেছে। সে ধড়মড় করে তার বিছানায় উঠে বসে। তার ঘরে কর্কশ এক ধরনের উজ্জ্বল আলো, সেই আলোয় সে স্পষ্ট দেখতে পেল ঘরের মেঝেতে হাঁটুতে মুখ রেখে কীশা বসে আছে। কীশার পাশে একটা ভয়াবহ ধরনের অস্ত্র—শক্তিশালী, লেজারচালিত, বিস্ফোরকনির্ভর এবং আধুনিক। এটি ব্যবহার করে প্রয়োজনে সম্ভবত পুরো মহাকাশযানকে ধ্বংস করে দেওয়া যাবে।

ইরন অবাক হয়ে কীশার দিকে তাকাল, বলল, "কীশা, তুমি এখানে কী করছ?"

কীশা খুব ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকাল, ইরন দেখতে পেল তার গালে চোখের পানি চিকচিক করছে। হাতের উল্টো পৃষ্ঠা দিয়ে চোখ মুছে সে নিচু গলায় বলল, "তুমি ঠিকই বলেছিলে ইরন।"

"আমি কী ঠিক বলেছিলাম?"

"আমি আসলে রোবট।"

ইরন চমকে উঠে বলল, "কী বললে?"

"হ্যাঁ। একটু আগে আমি জানতে পেরেছি।"

"কী বলছ তুমি? আমি তোমার রক্ত পরীক্ষা করে দেখেছি—"

"সেটা কীশার রক্ত। আমার শরীরটা কীশার—মস্তিষ্কটা কীশার নয়। অ্যাক্সিডেন্টের পর সেটা পাল্টে দিয়েছে। আমার রক্তে তুমি নিশ্চয়ই গ্রুপ থ্রি ধাতব পদার্থের অবশিষ্ট পেয়েছ। পাও নি?"

"হ্যাঁ।"

"আমার কপোট্রনের চিহ্ন, নতুন ধরনের কপোট্রন রক্ত দিয়ে শীতল করতে পারে।"

ইরন তার বিছানা থেকে নেমে এল, বিস্ফারিত চোখে খানিকক্ষণ কীশার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ইতস্তত করে বলল, "আমি বিশ্বাস করি না কীশা।"

"তাতে কিছু আসে-যায় না। আমি বিশ্বাস করি। আমার কপোট্রনে সব প্রোগ্রাম করে রাখা ছিল, যখন যেই তথ্যের প্রয়োজন হয়েছে তখন সেই তথ্যটি বের করে দেওয়া হয়েছে। তুমি ঠিকই আন্দাজ করেছিলে। এখন আমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেছি। এখন আর কিছু গোপন রাখার নেই, তাই আমাকে পুরো তথ্য জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি এখন সবকিছু জানি। প্রজেক্ট আপসিলন কী, কেন শুরু হয়েছে, কারা শুরু করেছে, আমি সবকিছু জানি।"

"কারা শুরু করেছে? কেন শুরু করেছে?"

"জানতে চেয়ো না, ঘেন্নায় বমি করে দেবে।"

ইরন একটু অবাক হয়ে কীশার দিকে তাকিয়ে রইল। কীশা মাথা নিচু করে বলল, "এই অভিযানে আমরা সবাই পরিত্যাগযোগ্য তুচ্ছ ব্যবহারিক সামগ্রী। আমাদের নিজেদের কারো কিছু করার নেই। আমাদেরকে অত্যন্ত কৌশলে এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে। যখন ব্যবহার শেষ হবে আমাদেরকে আবর্জনায় ছুড়ে ফেলে দেওয়া হবে। বর্গেনের কথা মনে আছে?"

ইরন মাথা নাড়ল।

"তার পরিণতিটি কোনো দুর্ঘটনা ছিল না। পরিকল্পিত ব্যাপার ছিল। আমি তখন জানতাম না, এখন জানি।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমার ব্যাপারটা?"

"তোমারটাও। তুমি একমাত্র বিজ্ঞানী যে ওয়ার্মহোল তৈরি করতে পার। তাই তোমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে। তোমার জীবনকে ইচ্ছে করে দুর্বিষহ করে দেওয়া হয়েছিল যেন তুমি প্রজেক্ট আপসিলনে যোগ দাও।"

ইরন অবাক হয়ে কীশার দিকে তাকিয়ে রইল। তার অবাক হবার ক্ষমতাও শেষ হয়ে গেছে। ইরন খানিকক্ষণ মেঝেতে হাঁটু জড়িয়ে বসে থাকা কীশার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর আরো এক পা এগিয়ে গিয়ে বলল, "এখন কী হবে কীশা?"

"খুব খারাপ একটা জিনিস হবে ইরন। তুমি জানতে চেয়ো না।"

"যদি খুব খারাপ একটা জিনিস হবে তা হলে তুমি সেটা বন্ধ করছ না কেন?"

"কারণ আমার বন্ধ করার ক্ষমতা নেই। কারণ আমি তুচ্ছ একটা রোবট। কারণ আমাকে যেভাবে প্রোগ্রাম করা হয়েছে আমাকে ঠিক সেভাবেই কাজ করতে হবে।"

ইরনের বুকের ভিতরে হঠাৎ ভয়ের একটা শীতল স্রোত বয়ে যায়, সে কাঁপা স্বরে জিজ্ঞেস করল, "তোমকে কীভাবে প্রোগ্রাম করা হয়েছে?"

"তুমি দেখতে পাবে ইরন।"

ইরন কীশার আরো কাছে এগিয়ে যাবার জন্য এক পা এগুতেই হঠাৎ বিদ্যুদ্বেগে কীশা তার পাশে শুইয়ে রাখা অস্ত্রটি তুলে ইরনের দিকে তাক করল, মুহূর্তে তাঁর মুখ ভয়ঙ্কর কঠিন হয়ে যায়, তার চোখ ধিকিধিকি করে জ্বলতে শুরু করে। কীশা হিসহিস করে যান্ত্রিক গলায় বলল, "আমার কাছে এসো না ইরন। আমাকে আমি নিজে নিয়ন্ত্রণ করি না। আমি খুব ঠাণ্ডা মাথায় তোমাকে খুন করে ফেলতে পারি।"

"কী বলছ তুমি কীশা? তুমি কেন আমাকে খুন করে ফেলবে—" ইরন কীশার দিকে আরো এক পা এগিয়ে গেল। সাথে সাথে কীশা অস্ত্রটির ট্রিগার চেপে ধরে, প্রচণ্ড শব্দে সমস্ত মহাকাশযান কেঁপে ওঠে, বিস্ফোরকের ধোঁয়ায় এবং ঝাঁজালো গন্ধে সমস্ত ঘর মুহূর্তে বিষাক্ত হয়ে ওঠে। কিছু একটার প্রচণ্ড আঘাতে ইরন দেয়ালে ছিটকে গিয়ে পড়ে। দেয়ালে আঁকড়ে কোনোমতে উঠে বসে ইরন বিস্ফারিত চোখে একবার কীশার দিকে এবং আরেকবার নিজের দিকে তাকাল। কাঁধের কাছে খানিকটা অংশ ঝলসে গেছে, কপালে কোথাও কেটে গেছে, রক্তে বাম চোখটা ঢেকে যাচ্ছে।

কীশা হাঁটু গেড়ে এক পা পিছিয়ে গিয়ে কাতর গলায় বলল, "ইরন, দোহাই তোমার, তুমি আমার কাছে এসো না। আমি কীশা নই—আমি একটা রোবট। আমার নিজের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।"

ইরন দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণা সহ্য করে বলল, "আসব না।"

কীশা জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে নিতে বলল, "আমার খুব কষ্ট হচ্ছে ইরন। আমার ভিতরের মানবিক একটা অংশে এখনো তোমাদের সবার জন্য ভালবাসা রয়েছে। আর রবোটের অংশ বলছে প্রয়োজন হলে সবাইকে শেষ করে দিতে। আমি জানি না, আমি তোমাদের রক্ষা করতে পারব কি না—" কীশা হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

ইরন হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে কপালের ক্ষতস্থান মুছে কীশার দিকে তাকিয়ে রইল, তার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না এটি সত্যি ঘটছে। মনে হচ্ছে পুরোটা বুঝি একটা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন। বিস্ফোরণের শব্দে ত্রালুস এবং শুমান্তি ছুটে এসেছে। তারা ইরনের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, কী করবে বুঝতে পারছে না।

কীশা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটি হাতে ধরে উঠে দাঁড়াল। কাউকে সরাসরি উদ্দেশ্য না করে নিচু গলায় বলল, "আমি খুব দুঃখিত যে এটা ঘটছে, আমাকে তোমরা ক্ষমা করে দিও।"

কেউ কোনো কথা বলল না। কীশা একটা নিশ্বাস ফেলে ত্রালুস এবং শুমান্তির দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমরা জরুরি চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে মেডিক্যাল কিটটা নিয়ে এসো। ইরনের রক্ত বন্ধ করা দরকার।"

ত্রালুস বলল, "আমি ঠিক বুঝতে পারছি না এখানে কী ঘটছে। আমি—"

"এই মহাকাশযানে এখন কেউ আর কিছু বুঝতে পারবে না। শুধু জেনে রাখ আমি তোমাদের পরিচিত কীশা নই। আমি একটি রোবট। ইরন যেটা সন্দেহ করেছিল, সেটা সত্যি।"

"ও।"

"যাও।"

ত্রালুস এবং শুমান্তি ছুটতে ছুটতে চলে গেল। ইরন হাত দিয়ে ক্ষতস্থান চেপে ধরে রেখে বলল, "এখন কী হবে কীশা?"

"তোমরা দেখতে পাবে।"

"দেখতে পাব?"

"হ্যাঁ। আমি—আমি এই গ্রহটাতে যাব।

ইরন চমকে উঠল, "এই গ্রহটাতে যাবে?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি কেন এই গ্রহটাতে যাবে?"

"কারণ সেখানে নিনীষ স্কেলে[২৭] পঞ্চম মাত্রার বুদ্ধিমান প্রাণী আমার জন্য অপেক্ষা করছে।"

"তোমার জন্য অপেক্ষা করছে?"

"হ্যাঁ।"

"কেন তোমার জন্য অপেক্ষা করছে?"

"কারণ তাদের জন্য আমার একটি জিনিস নিয়ে যাবার কথা।"

"কী জিনিস?"

"সেটা এখন আর্কাইভ ঘরে আছে।"

"কী আছে আর্কাইভ ঘরে?"

কীশা কাতর গলায় বলল, "আমাকে তুমি সেটা জিজ্ঞেস কোরো না। দোহাই তোমার। তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার খুব কষ্ট হয়। খুব কষ্ট হয়।"

"ঠিক আছে জিজ্ঞেস করব না।"

ত্রালুস এবং শুমান্তি দুই হাতে টেনে মেডিক্যাল কিটটা নিয়ে এসে ইরনের ঘরে ঢুকল। ভিতর থেকে টেনে যন্ত্রপাতি বের করে তারা ইরনের ওপর ঝুঁকে পড়ল। মেডিক্যাল কিটের মনিটরে আঘাতের বর্ণনা বের হয়ে এসেছে। এমন কিছু গুরুতর আঘাত নয়, দ্রুত সেরে উঠবে।

ইরন জানত সে দ্রুত সেরে উঠবে। তাকে ওরা হত্যা করবে না। কিছুতেই হত্যা করবে না। ত্রালুস এবং শুমান্তিকে নিয়ে সে নিশ্চিত নয়, কিন্তু তাকে ওরা এত সহজে হত্যা করবে না।

AMARBOI.COM

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com ~

৩

ছোট করিডোর ধরে ওরা চার জন আর্কাইভ ঘরটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মহাকাশযানের একেবারে অন্য মাথায় একটা ছোট এলিভেটরে করে ওরা উপরে উঠে এল। সরু আরেকটা করিডোর ধরে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে ওরা আর্কাইভ ঘরটির সামনে এসে দাঁড়ায়। সুইচ স্পর্শ করে দরজা খুলতে গিয়ে শুমান্তি হঠাৎ থমকে দাঁড়াল।

ইরন জিজ্ঞেস করল, "কী হল শুমান্তি?"

শুমান্তি ইরনের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলল, "ভিতরে কী একটা শব্দ শুনেছি।"

ইরন কান পেতে শোনার চেষ্টা করল, সত্যি ভিতরে একটা শব্দ হচ্ছে। টুক টুক করে এক ধরনের শব্দ।

কীশা কঠিন গলায় বলল, "দরজা খোল শুমান্তি।"

শুমান্তি দরজা খুলল, এবং সাথে সাথে ভিতরে কী একটা যেন ঘরের এক পাশ থেকে ছুটে অন্য পাশে সরে গেল। শুমান্তি চমকে ওঠে, "কে?"

আর্কাইভ ঘরে নানা আকারের বাক্স এবং যন্ত্রপাতি ছড়ানো-ছিটানো রয়েছে। ঘরের মাঝামাঝি একটা চতুষ্কোণ বাক্স খোলা এবং তার ভিতরে একটা খোলা ক্যাপসুল। আকার দেখে বোঝা যাচ্ছে এটি একজন মানুষের জন্য তৈরি। মানুষটি এই ক্যাপসুল থেকে বের হয়ে এসেছে, এই মুহূর্তে সে এখানে লুকিয়ে আছে। ইরন একটা বড় ধরনের ধাক্কা খেল—সে মনে মনে আশা করছিল কীশা যে জিনিসটি লিনীষ স্কেলের পঞ্চম মাত্রার প্রাণীদের কাছে নিয়ে যাবে সেটি আর যা-ই হোক, কোনো মানুষ যেন না হয়।

কীশা আলগোছে অস্ত্রটি ধরে রেখেছে, তার সামনে অন্য তিন জন হতবুদ্ধির মতো দাঁড়িয়ে থাকে এবং ঠিক তখন আর্কাইভ ঘরের এক কোনায় একটি মাথা উঁকি দিল। কমবয়সী কিশোরী একটি মেয়ে, কুচকুচে কালো রেশমি চুল, কালো বড় ভীত চোখ। কেউ কোনো কথা না বলে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল, এই ফুটফুটে কিশোরী মেয়েটিকে একটি গ্রহে ভিন্ন এক প্রাণীর হাতে তুলে দেওয়া হবে?

মেয়েটি খানিকক্ষণ তাদের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর ভীত গলায় জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কে? কেন এসেছ?"

কেউ কোনো কথা বলল না, সবাই পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

"কী হল? তোমরা কথা বলছ না কেন?"

কীশা এবারে এক পা এগিয়ে যায়, "নিশি, তুমি জান আমরা কে। তুমি জান তুমি এখানে কেন এসেছ।"

মেয়েটি এবারে হঠাৎ ফুপিয়ে কেঁদে উঠল, "আমি আসতে চাই নি। আমাকে জোর করে পাঠিয়েছে।"

কীশা আরো এক পা এগিয়ে গেল, "না নিশি, তোমাকে জোর করে পাঠায় নি, তুমি নিজের ইচ্ছায় এখানে এসেছ।"

"না!" মেয়েটি ভয় পেয়ে একটি আর্তচিৎকার করে উঠল, "না। আমি ইচ্ছে করে আসি নি। আমি বুঝতে পারি নি—"

"তুমি তো বাচ্চা মেয়ে নও যে তুমি বোঝ নি। তোমাকে সবকিছু বলা হয়েছে। বিজ্ঞানের একটা বিশাল পরীক্ষায় তুমি রাজি হয়েছ। তোমার দরিদ্র বাবা-মাকে অনেক সম্পদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেওয়া হয়েছে। তারা পৃথিবীতে এখন সুখী মানুষ। তোমার ছোট একটা আত্মত্যাগের জন্য—"

"আমি আত্মত্যাগ করতে চাই না। আমি আমার বাবা-মায়ের কাছে যেতে চাই!" মেয়েটি হঠাৎ আকুল হয়ে কেঁদে উঠল।

"নিশি তুমি তো এখন আর তোমার বাবা-মায়ের কাছে যেতে পারবে না। তোমাকে এখানে পাঠানোর জন্য পৃথিবীর সকল সম্পদ একত্র করে এই মহাকাশ অভিযানটি শুরু হয়েছে। আমরা এখন সৃষ্টি জগতের অন্যপাশে। পৃথিবীর সময়ের সাথে এখানকার সময়ের কোনো মিল নেই।"

মেয়েটি আর্কাইভ ঘরের আরো কোনায় সরে যেতে শুরু করে। কাঁদতে কাঁদতে বলে, "আমি তবুও পৃথিবীতে ফিরে যেতে চাই। আমি এখানে থেকে যেতে চাই না।"

"নিশি! তুমি কী বলছ এসব?" কীশার গলার স্বর হঠাৎ কঠোর হয়ে ওঠে। "তুমি জিনেটিক পরিমাপে পৃথিবীর সবচেয়ে নিখুঁত মানুষ, তোমার চেহারা তোমার শরীর যেরকম নিখুঁত তোমার মস্তিষ্ক তোমার বুদ্ধিমত্তাও সেরকম নিখুঁত। আমি তোমার কাছে এ রকম ব্যবহার আশা করি না।"

মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আমি পৃথিবীর সবচেয়ে নিখুঁত মানুষ হতে চাই নি। আমি সাধারণ একজন মানুষ হতে চাই—সাধারণ, খুব সাধারণ।"

"নিশি। তুমি এখন আর সাধারণ মানুষ হতে পারবে না। সাধারণ মানুষের সবকিছু হয় সাধারণ। তাদের আত্মত্যাগ হয় সাধারণ। তাদের অবদানও হয় সাধারণ। তুমি একজন অসাধারণ মানুষ, তোমার আত্মত্যাগ হতে হবে অসাধারণ, সেরকম তোমার অবদানও হবে অসাধারণ।"

নিশি নামের কিশোরীটি তবুও আকুল হয়ে কাঁদতে থাকে।

"শান্ত হও নিশি। তুমি জান তোমাকে শান্ত হতেই হবে।"

নিশি ধীরে ধীরে মুখ তুলে কীশার দিকে তাকাল। তারপর মুখ ঘুরিয়ে ইরনের দিকে তাকাল। ইরন মেয়েটির দৃষ্টি থেকে চোখ সরিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। নিশি এবারে ত্রালুসের দিকে তাকাল, ত্রালুস তার চোখের দৃষ্টি এড়িয়ে মাথা নিচু করল। নিশির চোখে-মুখে এক ধরনের অসহায় ভাব ফুটে ওঠে। সে অনেক আশা নিয়ে শুমান্তির দিকে তাকাল, শুমান্তি কিছু একটা বলতে চেষ্টা করল কিন্তু কিছু বলতে পারল না। নিশি হঠাৎ করে হাল ছেড়ে ভাগ্যের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দেয়। খুব ধীরে ধীরে তার চোখ-মুখের ব্যাকুল অসহায় ভাব কেটে গিয়ে সেখানে এক ধরনের বিষণ্নতা ফুটে ওঠে। সে চোখ মুছে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, তারপর শান্ত কণ্ঠে বলল, "এ রকম করে বিচলিত হওয়ার জন্য আমি দুঃখিত। আমি আর বিচলিত হব না। বল আমাকে কী করতে হবে?"

"চমৎকার।" কীশা মিষ্টি করে হেসে বলল, "চল আমার সাথে।"

নিশি আড়াল থেকে বের হয়ে আসে। পাতলা এক ধরনের নিও পলিমারের কাপড় তার ছিপছিপে কিশোরী দেহকে ঢেকে রেখেছে। জীবন রক্ষাকারী যন্ত্র থেকে বাতাস বের হচ্ছে, সেই বাতাসে নিশির চুল উড়ছে। দেহের কাপড় উড়ছে, সে এক পা এক পা করে এগিয়ে আসতে থাকে এবং হঠাৎ করে এ দৃশ্যটি কেন জানি এক গভীর বেদনায় ইরনের বুক ভেঙে ফেলতে চায়। অনিন্দ্যসুন্দরী এই কিশোরীটি যেন পৃথিবীর কোনো প্রাণী নয় যেন স্বর্গ থেকে কোনো দেবী নেমে এসেছে। ইরন বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল, দেখতে পেল কীশা হাত ধরে স্বর্গের এই দেবীকে নিয়ে যাচ্ছে।

কয়েক মিনিট পর তারা স্কাউটশিপের[২৮] গর্জন শুনতে পায়, মহাকাশযান থেকে একটা স্কাউটশিপে করে কীশা গা ঘিনঘিন করা সবুজ এবং বেগুনি রঙের গ্রহটিতে নেমে যাচ্ছে। গ্রহটি যেন নরক। স্বর্গ থেকে নেমে আসা একটি দেবীকে সেই নরকে বিসর্জন দেওয়া হচ্ছে। তাদের কারো কিছু করার নেই, পুরো ব্যাপারটি অসহায়ভাবে দেখা ছাড়া আর কিছু করার নেই।

নিয়ন্ত্রণ কক্ষে ইরন মাথা নিচু করে দুই হাতে তার মাথার চুল আঁকড়ে বসে আছে। তার সামনে কাছাকাছি ত্রালুস এবং শুমান্তি। ইরন একসময় মাথা তুলে তাকাল, একবার ত্রালুস এবং শুমান্তির দিকে দৃষ্টি ফেলে বলল, "আমরা কী করতে পারি বলবে?"

ত্রালুস এবং শুমান্তি কিছু বলল না, ইরন আবার বলল, "আমাদের কি কিছু করার আছে?"

এবারেও ত্রালুস আর শুমান্তি চুপ করে রইল। ইরন হাত দিয়ে টেবিলে আঘাত করে বলল, "ফুটফুটে বাচ্চা একটা মেয়েকে পৃথিবী থেকে ধরে এনেছে এখানকার প্রাণীদের হাতে তুলে দেবার জন্য; বিশ্বাস করতে পার তোমরা? অথচ পুরো ব্যাপারটি আমাদের দেখতে হল, আমরা একটা কিছু করতে পারলাম না।" ইরন ভাঙা গলায় বলল, "আমি সারা জীবনে এ রকম অসহায় অনুভব করি নি!"

শুমান্তি ইতস্তত করে বলল, "আমি তোমাকে একটা কথা বলতে পারি? তুমি যদি কিছু মনে না কর।"

ইরন শুমান্তির দিকে তাকিয়ে বলল, "বল।"

"আমি এই কথাটি নিশিকেও বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু পরিবেশটি এত ভয়ঙ্কর ছিল যে তখন কিছু বলতে পারি নি।"

"তুমি নিশিকে কী বলতে চেয়েছিলে?"

"আমি তাকে বলতে চেয়েছিলাম, নিশি তুমি কোনো চিন্তা কোরো না, আমরা তোমাকে উদ্ধার করে আনব।"

AMARBOI.COM

ইরন চমকে উঠে শুমান্তির দিকে তাকাল, মেয়েটির মুখে কৌতুকের কোনো চিহ্ন নেই। ইরন অবাক হয়ে বলল, "তুমি কেমন করে উদ্ধার করে আনবে?"

"আমি জানি না।"

"তা হলে?"

"তা হলে কী?"

"তা হলে কেন নিশিকে বলবে যে একে উদ্ধার করে আনবে?"

শুমান্তি একটু অবাক হয়ে ইরনের দিকে তাকাল, তাকে দেখে মনে হল এত সহজ একটি জিনিস ইরন বুঝতে পারছে না দেখে সে খুব অবাক হয়েছে। সে মাথা নেড়ে বলল, "আমাদের কাছে তো নিশি সেটাই শুনতে চেয়েছিল, তাই না?"

"হ্যাঁ। কিন্তু আমরা তো সেটা করতে পারব না।"

"আমরা তো চেষ্টা করতে পারি।"

"চেষ্টা করব?" ইরন অবাক হয়ে বলল, "তুমি জান চেষ্টা করলে কী হবে? তুমি দেখেছ আমাকে কীভাবে কীশা গুলি করেছিল?"

শুমান্তি এবারে একটু লজ্জা পেয়ে গেল, সেটা লুকানোর কোনো চেষ্টা না করে বলল, "হ্যাঁ, সেটা অবশ্য সত্যি। চেষ্টা করলে আমরা নিশ্চয়ই মারা পড়ব। কিন্তু আমরা যদি চেষ্টা

না করি তা হলে নিশি মেয়েটির মানুষের ওপর বিশ্বাস তো আর কোনোদিন ফিরে আসবে না।"

ইরন ছটফট করে বলল, "আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তুমি কী বলতে চাইছ শুমান্তি। নিশি মেয়েটি যেন মানুষের ওপর বিশ্বাস রাখে সে জন্য সবাই মারা পড়বে?"

"হ্যাঁ।" শুমান্তি মাথা নাড়ল, "আজ হোক কাল হোক আমরা তো সবাই মারা যাব।"

ইরন অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল, ত্রালুস তখন একটু এগিয়ে এসে বলল, "আসলে আমরা একটু অন্যভাবে চিন্তা করি। আমাদের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করা হয় বলে আমরা মারা যেতে একটুও দ্বিধা করি না। যে কারণে মারা যাচ্ছি সেটা যদি গুরুত্বপূর্ণ হয় তা হলে নিজের ভিতরে এক ধরনের আনন্দ পাই।"

ইরন দীর্ঘ সময় ত্রালুস এবং শুমান্তির দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর শান্ত গলায় বলল, "তোমরা বলতে চাইছ নিশিকে বাঁচানোর চেষ্টা করে মারা যেতে তোমাদের কোনো ভয় নেই?"

শুমান্তি মাথা নাড়ল। বলল, "একেবারেই নেই। সত্যি কথা বলতে কী তুমি যদি অনুমতি দাও তা হলে আমি আর ত্রালুস নিশিকে উদ্ধার করার জন্য এই গ্রহটাতে যেতে চাই।"

ইরন কয়েক মুহূর্ত ওদের দিকে তাকিয়ে থেকে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে বলল, "আমি যদি তোমাদের সাথে যেতে চাই আমাকে নেবে?"

শুমান্তি হেসে বলল, "কেন নেব না? নিশ্চয়ই নেব।"

ত্রালুস বলল, "আমি জানতাম তুমিও নিশ্চয়ই আমাদের সাথে যাবে।"

ইরন উঠে দাঁড়িয়ে বড় স্ক্রিনটা চালু করে দিয়ে বলল, "দেখা যাক স্কাউটশিপটা কোথায়?"

খানিকক্ষণ চেষ্টা করতেই স্কাউটশিপটাকে খুঁজে পাওয়া গেল। যোগাযোগ মডিউল স্পর্শ করতেই স্কাউটশিপের ভেতর কীশাকে দেখা গেল, পিছনে জানালায় মাথা রেখে নিশি বসে আছে। তার কিশোরী–মুখে এক অসহায় বিষণ্ণতা।

যোগাযোগ মডিউলের শব্দ শুনে কীশা ঘুরে তাকাল, ইরনের ভুলও হতে পারে কিন্তু মনে হল কীশার চেহারায় এক ধরনের অমানবিক যান্ত্রিক ছাপ চলে এসেছে। সে এক ধরনের নিস্পৃহ গলায় বলল, "কে?"

ইরন স্ক্রিনের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি। ইরন।"

"কী চাও ইরন?"

"আমি নিশির সাথে একটু কথা বলতে চাই।"

"কী বলবে তাকে?"

"তুমিও শুনতে পাবে।"

ইরন নিশিকে ডাকল, "নিশি।"

নিশি মাথা তুলে তাকাল, কিছু বলল না।

"নিশি, আমরা তোমাকে একটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি।"

"কী জিনিস?"

"আমরা তোমাকে উদ্ধার করে নিতে আসছি। কীশা তোমাকে সাহায্য করতে পারছে না কারণ সে রোবট। আমরা পারব।"

"সত্যি?" নিশির চোখমুখ হঠাৎ আনন্দে ঝলমল করে উঠল।

"হ্যাঁ। তুমি চিন্তা কোরো না নিশি। আমরা আসছি।"

ইরন আরো কিছু একটা বলতে চাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ইরন একটা নিশ্বাস ফেলে ত্রালুস এবং শুমান্তির দিকে তাকাল, বলল, "এবারে বল আমরা কী করব?"

ত্রালুস হেসে বলল, "আমরা তো কিছু জানি না। কী করব সেটা আমরা তোমার মুখেই শুনতে চাই।"

৪

পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের বিশাল স্ক্রিনে কিছু নেই। স্ক্রিনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বৃদ্ধ মানুষটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছে। সে তার বুকের মাঝে আটকে থাকা একটি নিশ্বাস বের করে দিয়ে কাঁপা গলায় বলল, "কতক্ষণ হয়েছে?"

মধ্যবয়স্ক মানুষটি বলল, "সাত সেকেন্ড।"

"সাত সেকেন্ড? সাত সেকেন্ড হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে এখনো বের হয়ে আসছে না কেন?"

"আমি জানি না।"

"প্রজেক্টটা কি বৃথা গেল?"

"আমি জানি না।"

"এতদিনের পরিকল্পনা, এত পরিশ্রম, এত গোপনীয়তা, এত অর্থ ব্যয়—তারপর প্রজেক্টটা বৃথা হয়ে গেল?"

মধ্যবয়স্ক মানুষটি বিরক্ত হয়ে বলল, "আহ্! তুমি দশ সেকেন্ড চুপ করে থাকতে পার না?"

বৃদ্ধ মানুষটি মাথা নাড়ল, অধৈর্য হয়ে বলল, "না পারি না। কখনো কখনো পারি না।"

AMARBOI.COM

তৃতীয় পর্ব

১

স্কাউটশিপের নিয়ন্ত্রণ প্যানেলের সামনে ত্রালুস চিন্তিত মুখে বসে আছে। মহাকাশযানে সব মিলিয়ে তিনটি স্কাউটশিপ, তার মাঝে একটি কীশা নিয়ে গেছে। এটি দ্বিতীয় স্কাউটশিপ, প্রথমটির মতো এটি অত্যাধুনিক নয়—ত্রালুস সেটি নিয়ে চিন্তিত। অনেক ক্ষেত্রেই এটা চালানোর জন্য নিজের বিচারবুদ্ধি ব্যবহার করতে হয়। তৃতীয় স্কাউটশিপটি একেবারেই দায়সারা। সেটি যদি কখনো ব্যবহার করতে হয়, সফল উড্ডয়নের সম্ভাবনা শূন্যের কাছাকাছি।

পিছনে নিরাপত্তা মডিউলটি নিয়ে শুমান্তি বসেছিল, সে ত্রালুসের চিন্তিত মুখ দেখে বলল, "কী হল ত্রালুস? কোনো সমস্যা?"

"আলাদাভাবে নতুন কোনো সমস্যা নয়, পুরো ব্যাপারটি নিয়ে খানিকটা সমস্যা।"

"স্কাউটশিপটা চালাতে ভয় পাচ্ছ?"

"ভয়টা সঠিক শব্দ নয়, বলতে পার আতঙ্ক।"

ইরন হেসে বলল, "আমাদের এই প্রজেক্টে নতুন করে ভয় পাবার বা আতঙ্কিত হবার কিছু নেই। মোটামুটিভাবে ধরে নাও একঘণ্টা পর নাকি দুই ঘণ্টা পর আমরা মারা পড়ব সেটা নিয়ে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে আমার উদ্দেশ্য।"

"হ্যাঁ, এভাবে দেখলে পুরো ব্যাপারটা খুব সহজ হয়ে যায়।"

"এভাবেই দেখ।"

"বেশ! স্কাউটশিপে তোমাদের ভ্রমণ খুব আনন্দদায়ক হবে না আগেই বলে রাখছি।"

শুমান্তি হাসিমুখে বলল, "আমাদের অভিযান শুরু করার আগে কীভাবে স্কাউটশিপ চালাতে হয় তার ওপর একটি লম্বা ট্রেনিং হয়েছিল মনে আছে?"

"মনে আছে। তবে ট্রেনিঙে কী বলেছিল সেসব এখন আর মনে নেই।"

ইরন যোগাযোগ মডিউলের বিভিন্ন সুইচ টেপাটিপি করে পরীক্ষা করতে করতে বলল, "তুমি এসব নিয়ে চিন্তা না করে শুরু করে দাও। যদি সেরকম কিছু বিপদ হয় স্কাউটশিপের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ দায়িত্ব নিয়ে নেবে।"

"ঠিক আছে।"

"স্কাউটশিপে কী কী নিয়েছ?"

"বাইরে বের হওয়ার জন্য দ্বিতীয় মাত্রার স্পেস স্যুট, কিছু খাবার এবং পানীয় এবং অস্ত্র।"

"অস্ত্র?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ। মহাকাশযানে যা ছিল প্রায় সব তুলে এনেছি। দরকার হলে নিনীষ স্কেলের পঞ্চম মাত্রার দুই-চারটা প্রাণীর মাথা উড়িয়ে দেব।"

শুমান্তি বলল, "সত্যি?"

ত্রালুস হেসে বলল, "আমি বলেছি দরকার হলে।"

ইরন যোগাযোগ মডিউলটি সামনে রেখে নিজেকে চেয়ারের সাথে সংযুক্ত করে বলল, "তুমি ধরে নিয়েছ এই গ্রহটিতে যে প্রাণীরা আছে তাদের আমাদের মতো মাথা রয়েছে?"

"কী করব বল! মহাকাশযানের মূল তথ্যকেন্দ্র তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছি, কোথাও এই প্রাণীদের সম্পর্কে এতটুকু তথ্য নেই। এরা কি বড় না ছোট, কার্বনভিত্তিক না সিলিকনভিত্তিক, ভিন্ন বা সামগ্রিক—"

শুমান্তি বাধা দিয়ে বলল, "হাসিখুশি না বদরাগী?"

ইরন বলল, "তার মানে তুমি ধরে নিয়েছ এদের আমাদের মতো অনুভূতি রয়েছে? কখনো হাসিখুশি থাকে কখনো রেগে থাকে?"

"আমার কোনো ধারণা নেই। কিন্তু যেহেতু বুদ্ধিমানের একটা পরিমাপ করা হয়েছে মস্তিষ্কের মতো কিছু একটা নিশ্চয়ই থাকবে—যেখানে সব তথ্য বিশ্লেষণ করবে।"

ইরন ভুরু কুঁচকে বলল, "তার মানে তুমি ধরে নিয়েছ তথ্য বিশ্লেষণ করার প্রক্রিয়াটি আমাদের মতো? নিউরন সেল থাকবে, সিনাপ্স থাকবে, তার ভিতর যোগাযোগ হবে সঙ্কেত আদান-প্রদান হবে?"

শুমান্তি হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, "আমি জানি না। মানুষ ছাড়া যেহেতু আর কোনো বুদ্ধিমান প্রাণী দেখি নি, তাই মহাজাগতিক কোনো প্রাণীর কথা মনে হলেই কেন জানি মনে হয় সেটা মানুষের মতোই হবে। হাত-পা থাকবে, নাক-মুখ, চোখ থাকবে—তবে সেটা হবে খুব ভয়ঙ্কর! হয়তো মস্তিষ্কটা শরীরের বাইরে, চোখগুলো সাপের মতো, হয়তো খুব নিষ্ঠুর!"

ইরন একটু হেসে বলল, "আমাদের সেটাই হয়েছে সমস্যা! আমরা আমাদের নিজেদের অস্তিত্বের বাইরে চিন্তা করতে পারি না। হয়তো এই প্রাণীর সাথে আমাদের কোনো মিল নেই। হয়তো এটার ঘনত্ব এত কম যে আমরা দেখতে পাই না! কিংবা আসলে পুরো গ্রহটা একটা প্রাণী। কিংবা প্রাণীটা পদার্থের নয়, প্রাণীটা শক্তির। আলো বা বিদ্যুৎ বা যান্ত্রিক শক্তি! কত কিছু হতে পারে!"

শুমান্তি বলল, "ইরন, তুমি যেভাবে বলছ, শুনে আমার তো একটু ভয়ই লাগছে।"

"ভয়?" ইরন হেসে বলল, "আমাদের কেন জানি ভয় থেকে বেশি হচ্ছে কৌতূহল। প্রাণীটি দেখতে কী রকম? বিশাল মস্তিষ্কসহ কিলবিলে অক্টোপাসের মতো কোনো প্রাণী, নাকি এমন একটি প্রাণী যার অস্তিত্ব আমরা কল্পনাও করতে পারি না!"

ত্রালুস বলল, "হয়তো একটু পরেই দেখব।"

"হয়তো।"

ত্রালুস কন্ট্রোল প্যানেলের সবকিছু দেখে বলল, "তা হলে কি শুরু করব?"

"হ্যাঁ। শুরু করা যাক।"

ত্রালুস সুইচ স্পর্শ করামাত্রই প্রচণ্ড একটা শব্দ করে স্কাউটশিপটি থরথর করে কেঁপে উঠল। খানিকক্ষণ তার শক্তিশালী ইঞ্জিনটি থেকে আয়োনিত গ্যাস বের হতে থাকে, ভিতরে একটা সতর্ক ধ্বনি শোনা গেল এবং হঠাৎ করে পুরো স্কাউটশিপটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মহাকাশযান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

AMARBOI.COM

স্কাউটশিপটা মহাকাশযানকে ঘিরে একবার ঘুরে আসে, মহাকাশযানটি যে কত বিশাল সেটি আবার নতুন করে সবার মনে পড়ল। নিচে গা ঘিনঘিন করা গ্রহটির মহাকর্ষ বলে মহাকাশযানটি স্থিতি হয়েছে, প্রায় চল্লিশ হাজার কিলোমিটারব্যাপী একটি কক্ষপথ নিয়ে এখন সেটি এই গ্রহটাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। মহাকাশযানটির নিয়ন্ত্রণ এখনো তাদের হাতে নেই, এই গ্রহটিকে কেন্দ্র করে বিশাল একটি কক্ষপথ নিয়ে ঘোরার ব্যাপারটিও পূর্বনির্ধারিত।

স্কাউটশিপটি মহাকাশযান থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে যেতে থাকে, চারদিকে নিকষ কালো অন্ধকার। দূরে কোনো একটি আলোকিত নেবুলা থেকে নীলাভ এক ধরনের আলো এসে এই গ্রহটাকে আলোকিত করছে। এই আলোতে সবকিছুকেই অতিপ্রাকৃত মনে হয়, এই গ্রহটিকে শুধু অতিপ্রাকৃত নয় অশুভ বলে মনে হতে থাকে।

ইরন স্কাউটশিপের গোলাকার জানালা দিয়ে নিচে গ্রহটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল, "এই গ্রহটা সম্পর্কে তথ্যগুলো এনেছ?"

"হ্যাঁ। ত্রালুস একটা সুইচ টিপে দিতেই তার সামনে আরো একটা ছোট স্ক্রিন বের হয়ে এল। স্ক্রিন থেকে তথ্যগুলো সে পড়ে শোনাতে থাকে, "গ্রহটির ব্যাসার্ধ ছয় হাজার কিলোমিটার, এর ভর পৃথিবীর দেড়গুণ। গ্রহটির এক ধরনের বায়ুমণ্ডল রয়েছে। বায়ুমণ্ডলের বেশিরভাগ কার্বন-ডাই অক্সাইড। অল্প পরিমাণ ক্লোরিন এবং মিথেন রয়েছে। গ্রহের পৃষ্ঠদেশে বাতাসের চাপ বারশত মিলিবার। বায়ুপ্রবাহের গতিবেগ হচ্ছে সত্তর থেকে দুইশত কিলোমিটার। গ্রহটির পৃষ্ঠদেশ এক ধরনের নরম পদার্থের তৈরি, স্থানে স্থানে তরল পদার্থ থাকতে পারে। তরল পদার্থের পি. এইচ. তিনের কাছাকাছি। মানুষের জন্য গ্রহটি বাসযোগ্য নয়—অত্যন্ত বৈরী পরিবেশ। গ্রহটি কাছাকাছি একটি নেবুলা দিয়ে আলোকিত হচ্ছে। গ্রহটির নিজস্ব কিছু আলোর উৎস রয়েছে, আলোর বেশিরভাগ অবলাল, খালি চোখে ধরা পড়ে না।"

ইরন একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "তুমি গ্রহটির যে বর্ণনা দিয়েছ, শুনে মনে হচ্ছে ফিরে যাই, গিয়ে আর কাজ নেই।"

"ঠিকই বলেছ।"

"এখানে যদি সত্যিই বুদ্ধিমান প্রাণী থেকে থাকে তা হলে তার কোনো চিহ্ন থাকা উচিত। সেই চিহ্ন কি দেখা যাচ্ছে?"

ত্রালুস আবার স্ক্রিনের ওপর ঝুঁকে পড়ল। কোনো একটা সুইচ স্পর্শ করে স্ক্রিনটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে বলল, "না। সভ্যতার চিহ্ন বলতে আমরা যা বোঝাই সেরকম কিছু নেই। কোনো দালানকোঠা রাস্তাঘাট বা শক্তি কেন্দ্র সেরকম কিছু নেই।"

ইরন অবাক হয়ে বলল, "কিছু নেই?"

"না, কিছু নেই। শুধু—"

"শুধু?"

"শুধু মাঝে মাঝে কোনো কোনো স্থান থেকে অবলাল আলোর[২৯] একটা বিচ্ছুরণ দেখা যাচ্ছে। কোথা থেকে আসছে বোঝা যাচ্ছে না। পুরোপুরি সামঞ্জস্যহীন বিচ্ছিন্ন অবলাল আলোর বিচ্ছুরণ।"

"হুঁ।" ইরন ভুরু কুঁচকে চিন্তা করতে থাকে। সত্যি সত্যি যদি এই গ্রহটি বুদ্ধিমান প্রাণীদের গ্রহ হয়ে থাকে তা হলে তার কোনো চিহ্ন কি দেখা যাওয়ার কথা নয়?

শুমান্তি ইতস্তত করে বলল, "হয়তো এই গ্রহটা ফাঁপা, হয়তো প্রাণীগুলো গ্রহটার ভিতরে থাকে।"

AMARBOI.COM

ত্রালুস মাথা নেড়ে বলল, "নিশ্চয়ই হতে পারে, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এ রকম আরো এক হাজারটি সম্ভাবনা থাকতে পারে—আমরা কোনটাকে সত্যি বলে ধরে নেব?"

ইরন বলল, "আমরা এখন কোনো বিচার-বিবেচনা-বিশ্লেষণে যাব না। আমরা আগের স্কাউটশিপটার পিছনে পিছনে যাব। যদি সত্যি বুদ্ধিমান প্রাণী থেকে থাকে তা হলে নিশ্চয়ই কীশার সাথে দেখা করে নিশিকে নিতে আসবে।"

শুমান্তি জানালা দিয়ে নিচে গ্রহটির দিকে তাকিয়ে বলল, "কী মন-খারাপ-করা একটি জায়গা!"

শুমান্তির কথা শেষ হবার আগেই স্কাউটশিপটা একটা বড় ঝাঁকুনি খেল, ভিতরে একটা লাল আলো জ্বলে ওঠে এবং কর্কশ স্বরে সতর্কসূচক এলার্ম বাজতে শুরু করে। শুমান্তি ভয় পাওয়া গলায় বলল, "কী হয়েছে?"

ত্রালুস স্কাউটশিপটার নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করতে করতে বলল, "এতক্ষণ বাতাসহীন অবস্থায় ছিলাম বলে সহজে নেমে এসেছি। এখন গ্রহের বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করছি। তোমাদের আরো ঝাঁকুনি সহ্য করতে হবে।"

ইরন জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল, সত্যি সত্যি বাইরের অন্ধকার আকাশকে হালকাভাবে আলোকিত দেখা যাচ্ছে। স্কাউটশিপের দুই পাশে বাতাসে ওড়ার জন্য দুটি ফিন বের হয়ে এসেছে। ফিন দুটিকে ঘিরে বেগুনি রঙের এক ধরনের আলো দেখা গেল, বাতাসের ঘর্ষণে তৈরি হচ্ছে। মাঝে মাঝেই বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ বের হয়ে আসছে, গ্রহটির বায়ুমণ্ডল নিশ্চয়ই অত্যন্ত সক্রিয়।

এতক্ষণ মহাকর্ষ বলের আকর্ষণে স্কাউটশিপটি নিচে নেমে এসেছে, গ্রহটির কাছাকাছি পৌঁছে যাবার কারণে এখন তার গতিবেগ কমিয়ে আনার প্রয়োজন হল। ত্রালুস আবার স্কাউটশিপের শক্তিশালী ইঞ্জিনটি চালু করে দেয়, সাথে সাথে ভয়ঙ্কর শব্দ করে স্কাউটশিপটি থরথর করে কাঁপতে থাকে। স্কাউটশিপটি প্রায় নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায় নিচে নামতে থাকে, শক্ত করে বাঁধা না থাকলে স্কাউটশিপের ভিতরে সবাই বড় ধরনের আঘাত পেয়ে যেত। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে শুমান্তি ভয় পাওয়া গলায় বলল, "আমরা কি ঠিকভাবে নামছি?"

ত্রালুস ইঞ্জিনের শব্দ ছাপিয়ে উঁচু গলায় বলল, "ঠিকভাবে কি না জানি না, কিন্তু নামছি!"

ইরন বলল, "শুধু নামলেই হবে না। কীশা যেখানে নেমেছে, সেখানে নামতে হবে।"

"হ্যাঁ। কীশার স্কাউটশিপের সিগন্যালকে এই স্কাউটশিপের নিয়ন্ত্রণ মডিউল লক করে নিয়েছে। এখন সেটার পিছু পিছুই যাচ্ছে।"

"চমৎকার।"

শুমান্তি স্কাউটশিপের নিয়ন্ত্রণহীন ঝাঁকুনি সহ্য করতে করতে বলল, 'কীশা স্কাউটশিপটিকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছে?"

"গ্রহটির মাঝামাঝি একটা জায়গায়। মনে হচ্ছে একটু উঁচু পাথুরে জায়গা।"

"অন্য কোনো বিশেষত্ব আছে জায়গাটার?"

ত্রালুস খানিকক্ষণ স্ক্রিনটির দিকে তাকিয়ে বলল, "না নেই। শুধু—"

"শুধু?"

"শুধু এর আশপাশে অবলাল আলোর বিচ্ছুরণ দেখা যাচ্ছে। তুলনামূলকভাবে একটু বেশি।"

ইরন আবার ভুরু কুঁচকে জানালা দিয়ে নিচে তাকাল। সবুজ এবং বেগুনি রঙের এই কুৎসিত গ্রহটিতে তারা নামতে যাচ্ছে, সেখানে তাদের জন্য কী অপেক্ষা করছে তারা জানে না। নিনীষ স্কেলে পঞ্চম শ্রেণীর বুদ্ধিমত্তার একটি প্রাণী তাদের সাথে কী ধরনের ব্যবহার করবে কে জানে? ইরনের বুকের ভিতরে একটা অশুভ চাপা আশঙ্কা পাক খেতে শুরু করে। সে তখন মুখ তুলে ত্রালুস এবং শুমান্তির দিকে তাকাল, দুজন হাসিখুশি তরুণ-তরুণী। মনে হয় এই দুজনই জীবনের প্রকৃত অর্থ খুঁজে পেয়েছে—তাই এত সহজে এই ভয়ঙ্কর অভিযানে রওনা দিয়েছে, যে অভিযান থেকে বেঁচে ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনাই নেই। ইরন জোর করে তার ভিতরকার সকল চাপা ভয় এবং অশান্তিকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। সত্যিই তো—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই হিসেবে তারা কত ক্ষুদ্র একটি সময় বেঁচে আছে! এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সময়টুকু একটু বেশি বা একটু কম হলে কী ক্ষতি-বৃদ্ধি হতে পারে? তার পরিবর্তে যদি একটি প্রাণীকেও অল্প কিছু ভালবাসা দেওয়া যায় সেটাই কি বড় কথা নয়?

ইরন যখন সত্যি সত্যি পুরো ব্যাপারটি নিয়ে নিজের ভিতরে এক ধরনের আনন্দময় অনুভূতি প্রায় সৃষ্টি করে ফেলেছে ঠিক তখন সে শুমান্তির একটি আর্তচিৎকার শুনতে পেল।

ইরন মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল শুমান্তির সামনে শূন্য থেকে একটি বীভৎস কদাকার জিনিস ঝুলছে।

২

ইরন চেয়ার থেকে নিজেকে মুক্ত করে স্কাউটশিপের মাঝ দিয়ে শুমান্তির কাছে ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করল, ঠিক সেই মুহূর্তে স্কাউটশিপটা একটা বড় ধরনের ঝাঁকুনি খেয়ে পুরোটা প্রায় উল্টে যেতে যেতে কোনোমতে আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল। ইরন দেয়াল আঁকড়ে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না, স্কাউটশিপের এক কোনায় গিয়ে ছিটকে পড়ে। কোনো রকমে আবার সে সোজা হয়ে দাঁড়াল, তারপর মেঝেতে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে শুমান্তির কাছাকাছি গিয়ে হাজির হল।

যে জিনিসটি তাদের সামনে ঝুলছে এর থেকে কদাকার কিছু তারা কখনো দেখেছে বলে মনে করতে পারল না। জিনিসটি জীবন্ত সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, এর ভিতরে নানা অংশ নড়ছে, কিলবিল করছে, পুরো জিনিসটি সর্‌সর্‌ শব্দ করে হঠাৎ বড় হতে শুরু করল। জিনিসটি থেকে শুঁড়ের মতো কিছু একটা বের হয়ে এল, হঠাৎ করে গোলাপি রঙের চটচটে ভেজা জিনিসটি তাদেরকে স্পর্শ করার চেষ্টা করতেই ইরন শুমান্তিকে নিয়ে লাফিয়ে পিছনে সরে গেল। জিনিসটি আবার নড়তে শুরু করে এবং হঠাৎ করে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে, শুমান্তি আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে এবং ইরন আবার তাকে ধরে নিচে লাফিয়ে পড়ল, ভেজা থলথলে জীবন্ত জিনিসটি তাদের উপর দিয়ে স্কাউটশিপের অন্যদিকে যেতে শুরু করে, ঠিক তাদের উপর দিয়ে যাবার সময় টপটপ করে তাদের উপর চটচচে এক ধরনের তরল গড়িয়ে পড়ল। ঝাঁজালো কটু এক ধরনের দূষিত গন্ধে হঠাৎ করে স্কাউটশিপের বাতাস ভারী হয়ে আসে। তাদের নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, শুমান্তি নিশ্বাস নেবার চেষ্টা করে কাশতে শুরু করে।

প্রাণীটি দেয়াল আঁকড়ে ধরে একটি ছোট ফুটো দিয়ে বাতাস বের হয়ে যাবার মতো

AMARBOI.COM

এক ধরনের অনিয়মিত শব্দ করতে থাকে, সমস্ত স্কাউটশিপে চটচটে আঠালো গাঢ় বাদামি রঙের এক ধরনের তরল ছিটকে ছিটকে পড়ে।

ত্রালুস স্কাউটশিপের নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে ভল্টের দিকে ছুটে গেল, ঢাকনা খুলে তার ভিতর থেকে একটা ভয়াবহ স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নিয়ে ছুটে এল। প্রাণীটির দিকে অস্ত্র তাক করতেই ইরন নিচু গলায় বলল, "খবরদার। গুলি কোরো না।"

"ঠিক আছে।" ত্রালুস একটা বড় নিশ্বাস নিয়ে বলল, "কিন্তু আবার যদি আমাদের আক্রমণ করে?"

"করলে দেখা যাবে। এখনো তো করে নি।"

ওরা তিন জন স্কাউটশিপের মেঝেতে উঁচু হয়ে বসে প্রাণীটির দিকে এক ধরনের আতঙ্ক নিয়ে তাকিয়ে রইল। এটি দেখলে প্রথমেই যে জিনিসটি মনে হয় সেটি হচ্ছে যে জীবন্ত কোনো একটি প্রাণীর চামড়া ছিলে ফেলা হয়েছে, এখন হঠাৎ করে ভিতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো দেখা যাচ্ছে। থলথলে ভেজা আঠালো জিনিস নড়ছে, এবং কিলবিল করছে। এর নির্দিষ্ট কোনো আকার নেই। প্রথমে একটা বড় অক্টোপাসের মতো দেয়াল আঁকড়ে ধরে রইল এবং সেই অবস্থায় শূন্যে ঝুলতে থাকে। ছোট ছোট শুঁড়ের মতো জিনিস ঝুলতে থাকে এবং সেগুলো হঠাৎ করে বুজে যায়। জিনিসটি স্কাউটশিপের মাঝে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ করে একটু ছোট হয়ে আসে, তীব্র আলোর একটা ঝলকানি হল এবং হঠাৎ করে প্রাণীটি অদৃশ্য হয়ে গেল।

ইরন হতচকিতের মতো স্কাউটশিপের ভিতরে তাকায়, এখনো তার বিশ্বাস হচ্ছে না যে জলজ্যান্ত এ রকম একটা প্রাণী তাদের চোখের সামনে থেকে এভাবে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। ত্রালুস শক্ত করে অস্ত্রটি ধরে রেখে কয়েক পা এগিয়ে গেল, এদিক-সেদিক তাকিয়ে বলল, "কোথায় গেছে?"

শুমান্তি মেঝে থেকে উঠে দাঁড়িয়ে শরীরের নানা জায়গায় লেগে থাকা কুৎসিত চটচটে আঠালো তরলের দিকে তাকিয়ে মুখ বিকৃত করে বলল, "চলে গেছে।"

"কিন্তু কেমন করে চলে গেল?"

"তা হলে আগে জিজ্ঞেস কর কেমন করে ভিতরে এল?"

ত্রালুস বিভ্রান্তের মতো শুমান্তির দিকে তাকাল, মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ। ঠিকই বলেছ, কেমন করে ভিতরে এল?"

শুমান্তি এক টুকরো নিও পলিমারের টুকরো নিয়ে শরীরের নানা জায়গায় লেগে থাকা আঠালো তরল মুছতে মুছতে বলল, "এটাই কি সেই বুদ্ধিমান প্রাণী?"

ইরন চিন্তিত মুখে স্কাউটশিপের ভিতরে চারদিকে মাথা ঘুরিয়ে দেখে বলল, "মনে হয়।"

শুমান্তি বলল, "আমার তো এটাকে বুদ্ধিমান মনে হল না। কদাকার মনে হল।"

"সৌন্দর্যের ধারণা খুব আপেক্ষিক। মাকড়সা যদি আমাদের মতো বুদ্ধিমান প্রাণী হত তা হলে তারা মানুষকে খুব কদাকার প্রাণী বলে বিবেচনা করত।"

ত্রালুস স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটি ভল্টের ভিতরে রাখতে রাখতে বলল, "প্রাণীটি অন্তত আমাদেরকে আক্রমণ করার চেষ্টা করে নি।"

"হ্যাঁ। অন্তত আমরা বুঝতে পারি নি।"

শুমান্তি মাথা নেড়ে বলল, "এটি যদি সত্যি সত্যি আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত তা হলে আমি ভয়েই মারা যেতাম।"

ইরন অন্যমনস্কের মতো বলল, "হুঁ।"

শুমান্তি স্কাউটশিপের ঝাঁকুনির মাঝে সাবধানে সামনের দিকে এগিয়ে এসে বলল, "ইরন।"

ইরন কোনো কথা বলল না, খুব চিন্তিতভাবে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

শুমান্তি কাছে গিয়ে বলল, "ইরন।"

ইরন একটু চমকে উঠে বলল, "কী হল?"

"তুমি কী ভাবছ?"

"না, আমি জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করছি। একটা রক্তমাংসের প্রাণী—"

"রক্তমাংসের?" শুমান্তি মুখ বিকৃত করে বলল, "রক্তমাংস?"

"দেখে তো সেরকমই মনে হল। স্কাউটশিপে যে তরলগুলো ছিটিয়েছে তার নমুনা মহাকাশযানের মূল তথ্যকেন্দ্রে পাঠিয়ে দিলে বিশ্লেষণ করে বলতে পারবে। আমার মনে হয় আমরা দেখব এটা জীবিত কোনো প্রাণীর দেহ থেকে এসেছে।"

শুমান্তি শরীর থেকে চটচটে তরল মোছার চেষ্টা করতে করতে বলল, "আমাদের শরীরে লেগে গেছে, কোনো ক্ষতি হবে না তো?"

"এখনো যখন হয় নি, মনে হয় আর হবে না। যেহেতু এটা ভিন্ন ধরনের প্রাণীসত্তা, আমার মনে হয় না আমাদের শরীরকে আক্রমণ করতে পারবে। ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়ার মতো এটা তো নিশ্চয়ই আর. এন. এ, ডি. এন. এ দিয়ে তৈরি নয়। তাদের নিজস্ব জিনিস দিয়ে তৈরি। ঘরে কেমন ঝাঁজালো কটু গন্ধ দেখেছ?"

"কিসের গন্ধ এটা?"

"মনে হয় ক্লোরিনের। আমরা যেরকম অক্সিজেন দিয়ে নিশ্বাস নেই, এটা মনে হয় সেরকমভাবে ক্লোরিন দিয়ে নিশ্বাস নেয়!"

"ক্লোরিন? কিন্তু সেটা তো ভয়ঙ্কররকম বিক্রিয়াশীল গ্যাস।"

ইরন হেসে ফেলল, বলল, "অক্সিজেনও অত্যন্ত বিক্রিয়াশীল গ্যাস। লোহার মতো ধাতুকে সেটা আক্রমণ করে ক্ষয় করে ফেলে। কিন্তু আমরা তার মাঝে দিব্যি বেঁচে থাকতে পারি।"

"সেটা ঠিক বলেছ, আমি আগে কখনো এভাবে চিন্তা করি নি।"

ত্রালুস স্কাউটশিপের নিয়ন্ত্রণ প্যানেলের সামনে বসে ছোট স্ক্রিনটার উপর ঝুঁকে পড়ল। সাবধানে স্কাউটশিপটাকে আবার নিচে নামাতে শুরু করে। বাতাসের ঘনত্ব আরো বেড়েছে—বাইরে এখন ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। ধোঁয়ার মতো কুণ্ডলি পাকানো সবুজ মেঘ ভেসে যাচ্ছে, প্রতিবার এ রকম একটা মেঘে আঘাত করা মাত্র স্কাউটশিপটি থরথর করে কেঁপে উঠছিল। বহু নিচে স্থানে স্থানে বেগুনি রঙের উঁচুনিচু ভূমি। সেখানে কী বিস্ময় লুকিয়ে আছে কে জানে।

ইরন স্কাউটশিপের গোলাকার জানালার সামনে বসে আবার বাইরে তাকিয়ে চিন্তায় ডুবে গেল। একটি প্রাণী কীভাবে বন্ধ স্কাউটশিপে এসে হাজির হতে পারে আবার কীভাবে বন্ধ স্কাউটশিপ থেকে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে? এটি তো অলৌকিক কিছু হতে পারে না, বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলো নিশ্চয় মানতে হবে। কোনো জিনিস তো হঠাৎ করে সৃষ্টি হতে পারে না, আবার এ রকম হঠাৎ করে অদৃশ্যও হয়ে যেতে পারে না। প্রাণীটি কোথায় গেল?

"কীশার স্কাউটশিপটা নিচে নেমে গেছে।" ত্রালুসের গলার স্বর শুনে ইরন মাথা তুলে তাকাল।

"কেমন করে বুঝতে পারলে?"

www.amarboi.com ~

"খুব ঝড়ো হাওয়া হচ্ছে তাই দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু সিগনালে আর ডপলার শিফট নেই। স্কাউটশিপটা থেমে গেছে।"

"আমাদেরও কাছাকাছি থামতে হবে।"

"ঠিক আছে। নিচে নেমে আমি একবার ঘুরে আসি।"

"বেশ।"

স্কাউটশিপের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে এর মাঝে ত্রালুসের নিজের মাঝে বেশ একটা আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়েছে, সে বেশ সাবলীলভাবে স্কাউটশিপটাকে ঘুরিয়ে নিচে নামিয়ে নিতে থাকে। বাইরে গাঢ় সবুজ রঙের মেঘ কুণ্ডলি পাকিয়ে উঠে আসছে, তার মাঝে নীলাভ বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ খেলা করছে। নিচে বেগুনি রঙের প্রান্তর, কোথাও আলো কোথাও অন্ধকার। মাঝে মাঝে বড় বড় ফাটল, তার ভিতর থেকে ঈষৎ কমলা রঙের এক ধরনের আলো বের হয়ে আসছে। পুরো দৃশ্যটি একটি অতিপ্রাকৃত দৃশ্যের মতো, তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ করে মনে হয় এর কোনোটিই সত্যি নয়, পুরোটুকু বুঝি শক্তিশালী কোনো মস্তিষ্ক-বিকলন ড্রাগের ফল। ইরন জানালা থেকে মাথা ঘুরিয়ে ভিতরে তাকাল এবং হঠাৎ করে স্কাউটশিপের ভিতরে আবার সেই ভয়াবহ কদাকার প্রাণীটিকে দেখতে পেল। কোনো বীভৎস প্রাণীকে যেন কেউ খুলে তার ভিতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে বাইরে নিয়ে এসেছে।

স্কাউটশিপের ভিতরটুকু তীক্ষ্ণ ঝাঁজালো গন্ধে ভরে গেল—আঠালো চটচটে তরল প্রাণীটির দেহ থেকে ফোঁটা ফোঁটা করে স্কাউটশিপের ভিতর গড়িয়ে পড়তে থাকে। প্রাণীটি থরথর করে কাঁপছে। ভিতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সরসর করে নড়ছে। ইরন নিশ্বাস বন্ধ করে বীভৎস প্রাণীটির দিকে তাকিয়ে থাকে এবং হঠাৎ করে একটা জিনিস বুঝতে পারে, সে ভয়ঙ্করভাবে চমকে উঠে বিস্ফারিত চোখে প্রাণীটির দিকে তাকিয়ে থাকে।

ইরন শুমান্তির আর্তচিৎকার শুনতে পেল। ত্রালুস ছুটে গিয়ে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটি হাতে নিয়ে ইরনের পাশে এসে দাঁড়ায়। ভয়ঙ্কর দর্শন প্রাণীটি থেকে হঠাৎ করে শুঁড়ের মতো কিছু একটা ছুটে আসে, ত্রালুস অস্ত্রটি উঁচু করে ধরতেই ইরন খপ করে তার হাত ধরে ফেলল, "না, ত্রালুস, না।"

"এটা তোমাকে আক্রমণ করছে!"

"আমার ধারণা করছে না।"

"তা হলে কী করছে?"

"কিছুই করছে না।"

ত্রালুস নিশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে থাকে এবং থলথলে ভেজা আঠালো শুঁড়গুলো তাদের গা ঘেঁষে গিয়ে হঠাৎ করে প্রাণীটির শরীরে মিশে গেল।

শুমান্তি হেঁটে ইরনের পাশে এসে দাঁড়াল, নিচু গলায় বলল, "তুমি কেন বলছ এটা কিছুই করছে না?"

"কারণ এটা আমাদের দেখছে না।"

"দেখছে না?"

"না।"

"কেন দেখছে না, এর কোনো চোখ নেই?"

"না, চোখ-কানের কথা নয়। অন্য কোনো ধরনের প্রাণী হলেই যে চোখ-কান থাকতে হবে তা ঠিক নয়, তারা অন্য কোনোভাবেও তাদের তথ্য নিতে পারে।"

"তা হলে?"

"এটি একটি চতুর্মাত্রিক[৩০] প্রাণী। ত্রিমাত্রায় কিছু থাকলে সেটি এত সহজে সেটা দেখতে পারে না।"

"চতুর্মাত্রিক প্রাণী?"

"হ্যাঁ। শুধুমাত্র চতুর্মাত্রিক প্রাণীই ত্রিমাত্রিক জগতে হঠাৎ করে হাজির হতে পারে, হঠাৎ করে অদৃশ্য হতে পারে। এরা চতুর্মাত্রিক প্রাণী বলেই চতুর্থমাত্রা ব্যবহার করে পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ করতে পেরেছিল।"

"হ্যাঁ, আমরা ত্রিমাত্রিক জগতে এই প্রাণীটির প্রজেকশনটুকু দেখছি। প্রাণীটি দেখতে আসলে কী রকম আমরা কোনোদিন জানতে পারব না।"

ত্রালুস অস্ত্রটি তাক করে রেখে ভয় পাওয়া গলায় বলল, "তুমি নিশ্চিত এটা আমাদের দেখতে পারছে না?"

"পুরোপুরি নিশ্চিত কেমন করে হব? কিন্তু আমার ধারণা এটা আমাদের দেখতে পাচ্ছে না। যদি দ্বিমাত্রিক একটা জগৎ থাকত তা হলে আমরা যেরকম দেখতে পেতাম না অনেকটা সেরকম।"

শুমান্তি বিস্ফারিত চোখে প্রাণীটার দ্রুত পাল্টে যাওয়া বীভৎস দেহটির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "কেন আমরা দ্বিমাত্রিক জগৎ দেখতে পেতাম না?"

"কারণ একটি ত্রিমাত্রিক জগতে অসীম সংখ্যক দ্বিমাত্রিক জগৎ থাকে, কোনটি তুমি দেখবে? শুধু একটি হলে তুমি দেখবে, কিন্তু একটি তো নেই, কোনটা তুমি আলাদা করে দেখবে?"

ত্রালুস অস্ত্রটি আলগোছে ধরে রেখে বলল, "তুমি বলছ আমি যদি এটাকে গুলি করি এটা জানবে না কে তাকে গুলি করেছে?"

"সম্ভবত জানবে না, কিন্তু বুঝতে পারবে, কোনো একটি ত্রিমাত্রিক জগতে সে আঘাত পেয়েছে। চতুর্মাত্রিক প্রাণী তখন ত্রিমাত্রিক জগৎকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে পারে।"

শুমান্তি আটকে থাকা একটা নিশ্বাস বের করে দিয়ে বলল, "এটা আসলে তার আকার পরিবর্তন করছে না। এটা আমাদের এই ত্রিমাত্রিক জগতের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। যখন যেটুকু আমাদের জগতে রয়েছে তখন সেটুকু আমরা দেখতে পাচ্ছি।"

ইরন মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। এইজন্য এটা হঠাৎ করে এখানে আসতে পারে, আবার হঠাৎ করে চলে যেতে পারে।"

ইরনের কথা শেষ হবার আগেই অদৃশ্য একটা আলোকের ঝলকানি দেখা গেল এবং হঠাৎ করে প্রাণীটা অদৃশ্য হয়ে গেল। ইরন মাথা নেড়ে বলল, "একটা বদ্ধ জায়গায় কোনো জিনিস হঠাৎ করে আসা এবং হঠাৎ করে বের হয়ে যাওয়ার একটি মাত্র ব্যাখ্যা, এটি চতুর্মাত্রিক প্রাণী।"

ত্রালুসকে খানিকটা বিভ্রান্ত দেখায়। সে শুমান্তির দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি মনে হয় ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ। আমি এখনো বুঝতে পারি নি—"

ইরন ত্রালুসের কাঁধ স্পর্শ করে বলল, "আমি তোমাকে বুঝিয়ে দেব, আগে দেখ মহাকাশযানের মূল তথ্যকেন্দ্র বিশ্লেষণ করে নতুন কিছু পাঠিয়েছে কি না।"

যোগাযোগ মডিউলে মহাকাশযানের মূল তথ্যকেন্দ্র থেকে পাঠানো তথ্যগুলো তিন জন মিলে দেখতে থাকে। প্রাণীটার শরীরে প্রচুর ধাতব পদার্থ রয়েছে, বিশেষ করে এলকালী ধাতু। ক্লোরিনের সাথে বিক্রিয়া করে শক্তি সংগ্রহের একটি সহজ পদ্ধতি। পৃথিবীর প্রাণিজগৎ যেরকম পুরোপুরি ডি. এন. এ. নির্ভর এখানে সেরকম কিছু দেখা গেল না, দীর্ঘ সুতার মতো

AMARBOI.COM

ক্রিস্টালের অবকাঠামো রয়েছে যার ভিতর দিয়ে বৈদ্যুতিক সঙ্কেত যেতে পারে। মাঝে মাঝে গোলাকার অংশে গেলিয়াম[৩১] এবং আর্সেনাইডের[৩২] প্রাচুর্য দেখা গেল, সম্ভবত বৈদ্যুতিক সঙ্কেত বাড়ানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাণীটির দেহ থেকে বের হওয়া তরল থেকে আরো নানা ধরনের অসংখ্য তথ্য দেওয়া হয়েছে, যার বেশিরভাগই অল্প সময়ে বোঝার কোনো উপায় নেই। ঠিক কোন অংশটি ব্যবহার করে এটি চতুর্মাত্রিক জগতে বিচরণ করতে পারে সেই তথ্যটুকু খুঁজে পাওয়া গেল না।

ত্রালুস বিশাল তথ্যভাণ্ডারের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে ইরনকে জিজ্ঞেস করল, "ইরন, তুমি বুঝতে পারলে?"

"পুরোপুরি বুঝতে সময় নেবে। তবে যেটুকু বোঝার সেটুকু বুঝেছি।"

"কী বুঝেছ?"

"এটি চতুর্থমাত্রায় বিচরণ করতে পারে সত্যি কিন্তু এটি তৈরি আমাদের পরিচিত পদার্থ দিয়ে। যার অর্থ—" ইরন একমুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "আমরা প্রয়োজন হলে আমাদের প্রযুক্তি দিয়েই তার সামনাসামনি হতে পারব।"

শুমান্তি একটু হেসে বলল, "তুমি বলতে চাইছ প্রয়োজন হলে আমাদের অস্ত্র দিয়ে এদের সাথে যুদ্ধ করা যাবে।"

ইরন হাসার চেষ্টা করে বলল, "আমি এটা বলতে চাইছি না—বোঝাতে চাইছি। প্রথমবার যখন কোনো বুদ্ধিমান প্রাণীর সাথে দেখা হয় তখন তাদের সাথে যুদ্ধ করার কথা নয়!"

ত্রালুস স্কাউটশিপের সামনে থেকে উচ্চকণ্ঠে বলল, "তোমরা তোমাদের নিজেদের জায়গায় বস, কীশার স্কাউটশিপটা পাওয়া গেছে, আমরা এখন নামব।"

কিছুক্ষণের মাঝেই স্কাউটশিপের শক্তিশালী ইঞ্জিন গর্জন করতে শুরু করে। আয়োনিত গ্যাসের আলোতে হঠাৎ করে চারদিক আলোকিত হয়ে ওঠে।

AMARBOI.COM

৩

স্কাউটশিপের নিচের ঘরটিতে ইরন, ত্রালুস এবং শুমান্তি মহাকাশযান থেকে নিয়ে আসা দ্বিতীয় মাত্রার স্পেসস্যুটগুলো পরে নেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। বাইরের ভয়ঙ্কর বিষাক্ত হাওয়ায় এই স্পেসস্যুট দিয়ে যথার্থ নিরাপত্তা পেতে হলে তার বিভিন্ন স্তরকে সক্রিয় করতে হবে, কাজটি জটিল এবং শ্রমসাপেক্ষ। মহাকাশযানে এই ধরনের কাজে সাহায্য করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে, স্কাউটশিপে পুরোটুকুই নিজেদের করতে হয়।

অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের সঠিক মিশ্রণ পরীক্ষা করে ক্ষুদ্র প্যালেটগুলো সিলিন্ডারে রেখে বাইরে নিশ্বাস নেওয়ার ব্যবস্থাটুকু নিশ্চিত করতে করতে ত্রালুস ইরনের কাছে এগিয়ে যায়।

"ইরন।"

"বল।"

"আমি তোমার চতুর্মাত্রিক প্রাণীর ব্যাপারটি বুঝতে পারি নি। আমরা যেখানে বড় হয়েছি সেখানে বিজ্ঞান শেখার কোনো ব্যবস্থা ছিল না।"

"এর মাঝে বিজ্ঞান খুব বেশি নেই। সত্যি কথা বলতে কী বিজ্ঞান বেশি শিখে নিলে মস্তিষ্ক খানিকটা রুটিনের মাঝে চলে আসে, তখন প্রচলিত নিয়মের বাইরে কিছু দেখলে সেটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়।"

ত্রালুস মাথা নেড়ে বলল, "শুমান্তিকে যার ক্রোমোজম৩৩ দিয়ে ক্লোন করা হয়েছে সে নিশ্চয়ই বড় বিজ্ঞানী ছিল, বিজ্ঞানের ব্যাপারগুলো তাই সহজে বুঝে ফেলে। আমি পারি না।"

শুমান্তি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, ইরন বাধা দিয়ে বলল, "ঠিকই বলেছ। আমিও লক্ষ করেছি।"

"ব্যাপারটা আমাকে বোঝাতে পারবে?"

"চেষ্টা করতে পারি।" ইরন খানিকক্ষণ ভুরু কুঁচকে কিছু একটা চিন্তা করে বলল, "প্রাচীনকালে তথ্য আদান–প্রদান করার জন্য এক ধরনের জিনিস ব্যবহার করা হত, তার নাম ছিল বই। কাগজ নামের পাতলা এক ধরনের পরদার মতো জিনিসে লিখে অনেকগুলো একসাথে বেঁধে রাখা হত। তুমি কি সেগুলো কখনো দেখেছ?"

"না। সামনাসামনি দেখি নি। হলোগ্রাফিক ছবি দেখেছি।"

"চমৎকার। মনে করা যাক এই বইয়ের একেকটি পৃষ্ঠা হচ্ছে একেকটি ত্রিমাত্রিক জগৎ। মনে করা যাক আমাদের ত্রিমাত্রিক জগৎ হচ্ছে এক শ এগার নম্বর পৃষ্ঠা। আমরা, মানুষেরা শুধুমাত্র এই পৃষ্ঠায় বিচরণ করতে পারি, এর বাইরে যেতে পারি না। মনে কর আমরা ছোট পিঁপড়ার মতো এই বইয়ের পৃষ্ঠায় ঘুরে বেড়াই। এক শ এগার নম্বর পৃষ্ঠা থেকে এক শ বারো নম্বর পৃষ্ঠায় যেতে হলে পুরো পৃষ্ঠা পার হয়ে বইয়ের শেষ মাথায় এসে ঘুরে এই নতুন পৃষ্ঠায় যেতে হবে—বলতে পার বিশাল দূরত্ব পার হতে হবে।

"আমরা এই মহাকাশযানে করে এ রকম একটা বিশাল দূরত্বে চলে এসেছি তবে বিশাল দূরত্ব অতিক্রম করে আসি নি, ওয়ার্মহোল তৈরি করে এসেছি। ওয়ার্মহোল হচ্ছে পৃষ্ঠা ফুটো করে চলে আসার মতো—বইয়ের পৃষ্ঠায় একটা ছোট ফুটো করলেই এক পৃষ্ঠা থেকে অন্য পৃষ্ঠায় চলে যাওয়া যায়, এটাও সেরকম।

"এখন মনে করা যাক এই বইয়ের মাঝে অন্য এক ধরনের কীট এসেছে। সে বইয়ের পৃষ্ঠা কেটে কেটে যেতে পারে। আমাদের কাছে এই পোকাকে মনে হবে চতুর্মাত্রিক প্রাণী। কারণ এরা সহজেই বইয়ের ভিতর দিয়ে একটার পর অন্য একটা জগতের মাঝে চলে যেতে পারে। এরা যখন আমাদের জগতের ভিতর দিয়ে অর্থাৎ আমাদের পৃষ্ঠার ভিতর দিয়ে যাবে আমরা তখন তাদের দেখব কিন্তু শুধু আমাদের পৃষ্ঠার অংশটুকুই। তার প্রকৃত রূপ আমরা কখনো দেখব না, কখনো জানব না।"

ইরন একটু থেমে বলল, "বুঝতে পেরেছ?"

"হ্যাঁ, খানিকটা বুঝতে পেরেছি। পুরোটুকু না বুঝলেও ধারণাটুকু পেয়েছি।"

শুমান্তি স্পেসস্যুটটার ভিতরে প্রবেশ করতে করতে বলল, "চতুর্মাত্রিক প্রাণী যেহেতু আছে, তার অর্থ চতুর্মাত্রিক জগৎও নিশ্চয়ই আছে। আমরা মানুষেরা সেখানে যেতে পারি না।"

"না, পারি না। এর অস্তিত্বের কথা জানার পরই নিশ্চয়ই প্রজেক্ট আপসিলন দাঁড়া করানো হয়েছে। পৃথিবীর একজন মানুষকে পাঠানো হয়েছে চতুর্মাত্রিক প্রাণীর কাছে। উপহার হিসেবে। বিনিময়ে এই প্রাণী আমাদের কাছে চতুর্মাত্রিক জগতে যাওয়ার প্রযুক্তি দেবে।"

" তোমার তাই ধারণা?"

ইরন একটা নিশ্বাস ফেলল, বলল, "হ্যাঁ। আমার তাই ধারণা।"

দ্বিতীয় মাত্রার স্পেসস্যুট পরা যতটুকু কঠিন মনে হয়েছিল দেখা গেল সেটি তার থেকে অনেক বেশি কঠিন। ইরন, শুমান্তি এবং ত্রালুস একজন আরেকজনকে সাহায্য করার পরও স্পেসস্যুটগুলো পরতে তাদের দীর্ঘ সময় লেগে গেল। জীবনরক্ষাকারী মডিউলটি পরীক্ষা করে ত্রালুস বলল, "এটি ছয় ঘণ্টার মডিউল।"

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com ~

"যার অর্থ ছয় ঘণ্টার মাঝে আমাদের এই স্কাউটশিপে ফিরে আসতে হবে?"

জীবন্ত অবস্থায় স্কাউটশিপে ফিরে আসার সম্ভাবনা বলতে গেলে নেই, কিন্তু ইরন সেটি কাউকে মনে করিয়ে দিল না, বলল, "হ্যাঁ ছয় ঘণ্টার মাঝে আমাদের ফিরে আসতে হবে।"

ত্রালুস ভল্ট খুলে ভয়ঙ্কর ধরনের কয়েকটি অস্ত্র বের করে ইরন এবং শুমান্তির দিকে এগিয়ে দেয়। শুমান্তি মাথা নেড়ে বলল, "আমি অস্ত্র চালাতে জানি না।"

"এর মাঝে জানার কোনো ব্যাপার নেই। যে জিনিসটাকে আঘাত করতে চাও সেটার দিকে তাক করে ট্রিগার টেনে ধরবে।"

শুমান্তি তবুও অস্ত্রটি নিতে চাইল না, বলল, "না, আমি এটা স্পর্শ করতে চাই না।"

ইরন একটু হেসে বলল, "না চাইলেও তোমাকে নিতে হবে। আমরা ঠিক জানি না আমাদের জন্য কী অপেক্ষা করছে। হয়তো অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে না। কিন্তু হয়তো অস্ত্র দেখাতে হবে।"

শুমান্তি নেহায়েত অনিচ্ছার সাথে ভয়ঙ্করদর্শন অস্ত্রটি হাতে তুলে নেয়। সেফটি সুইচটি টেনে নিয়ে সে অস্ত্রটি পিঠে ঝুলিয়ে নিল। ত্রালুস ভল্ট থেকে চতুষ্কোণ একটা ভারী বাক্স টেনে বের করে এনে বলল, "ইরন, তুমি যেহেতু বলছ অস্ত্র দেখিয়ে ভয় দেখানোর প্রয়োজন হতে পারে তা হলে কি এই এন্টি ম্যাটারের বাক্সটা সাথে নিয়ে নেব?"

"এন্টি ম্যাটার? সেটা দিয়ে কী করবে?"

"এটা চৌম্বকক্ষেত্র দিয়ে আটকে রাখা আছে। গুলি করে বাক্সটা ভেঙে দিলে গ্রহের অর্ধেকটা উড়ে যাবে।"

ইরন কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে বলল, "হ্যাঁ, তা হলে নিয়ে যাওয়া যাক। কিন্তু এত ভারী এটা টেনে নিতে পারবে?"

"টেনে নিতে হবে না, ছোট একটা জেট প্যাক আছে।"

AMARBOI.COM

ত্রালুস জেট প্যাকের উপর এন্টি ম্যাটারের বাক্সটা রেখে জেট প্যাকের ইঞ্জিনটা চালু করে দিতেই সেটা মিটারখানেক উপরে উঠে ভাসতে শুরু করে। ত্রালুস স্কাউটশিপ থেকে আরো কিছু যন্ত্রপাতি তুলে নিয়ে বলল, "আমি প্রস্তুত।"

"চমৎকার।" ইরন এগিয়ে গিয়ে স্কাউটশিপের দরজার সামনে দাঁড়াল। লাল রঙের একটা লিভার টেনে দিতেই ঘড়ঘড় শব্দ করে চারপাশের দরজাগুলো বন্ধ হয়ে তাদেরকে পুরো স্কাউটশিপ থেকে আলাদা করে ফেলল। দরজার কাছে একটা কমলা রঙের উজ্জ্বল আলো জ্বলছে এবং নিভছে, তার নিচে একটা বড় চতুষ্কোণ সুইচ। সেটা চাপ দিয়ে দরজাটি খোলার আগে ইরন ত্রালুস এবং শুমান্তির দিকে ঘুরে তাকাল, একমুহূর্ত দ্বিধা করে বলল, "পরবর্তী কয়েক ঘণ্টা আমাদের কী হবে জানি না। যদি আমরা বেঁচে ফিরে না আসি, তা হলে আমাকে ক্ষমা করে দিও। আমি তোমাদের জীবনকে উপভোগ করার সুযোগ করে দিতে পারলাম না বলে দুঃখিত।"

শুমান্তি নরম গলায় বলল, "তোমার ক্ষমা চাওয়ার বা দুঃখিত হবার কোনো কারণ নেই। আমাদের দেখে নিশি মেয়েটি কত খুশি হবে চিন্তা করে দেখ। সেই আনন্দটুকুর জন্য জীবন দেওয়াটা এমন কিছু খারাপ নয়।"

ইরন একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "সত্যি কথা বলতে কী, তোমাদের ওপর আমার একটু হিংসাই হচ্ছে। জীবনকে এভাবে দেখতে পারাটা মনে হয় খারাপ নয়।"

ত্রালুস হেসে বলল, "তুলনা করার জন্য আমরা অন্য কোনো জীবন পাই নি তাই বলতে পারছি না কোনটা ভালো কোনটা খারাপ।"

"চল তা হলে, রওনা দেওয়া যাক।"

ইরন চতুষ্কোণ সুইচটা চেপে ধরতেই প্রথমে স্কাউটশিপের বাতাস বের হয়ে বাইরের সাথে বাতাসের চাপ সমান হয়ে গেল। তারপর গোলাকার একটা দরজা ধীরে ধীরে উপরে উঠে গেল। বাইরে সবুজাভ এক ধরনের আবছা আলো, কখনো বাড়ছে কখনো কমছে। এক ধরনের ঝড়ো বাতাস বইছে এবং বাতাসের বেগ বাড়ার সাথে সাথে শিশুর কান্নার মতো তীক্ষ্ণ এক ধরনের ধ্বনি শোনা যেতে থাকে। স্কাউটশিপটি যেখানে নেমেছে সেই জায়গাটি মোটামুটি সমতল, কিন্তু সামনে যতদূর দেখা যায় উঁচুনিচু বিচিত্র আকারের পাথর। দেখে মনে হয় কেউ অনেক কষ্ট করে পাথরগুলো খোদাই করে এ রকম বিচিত্র রূপ দিয়েছে। বাইরের বিস্তীর্ণ প্রান্তরের অনেক অংশ তরল পদার্থে ঢাকা, বেগুনি রঙের তরল কোথাও টগবগ করে ফুটছে, কোথাও বিষাক্ত বাষ্প বের হয়ে ধোঁয়ার মতো উপরে উঠে যাচ্ছে। বড় পাথরগুলো এবং সমতল স্থানগুলোর স্থানে স্থানে বড় বড় ফাটল এবং সেই ফাটল দিয়ে সবুজাভ এক ধরনের আলো বের হয়ে পুরো এলাকাটি এক ধরনের অতিপ্রাকৃত পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছে।

ইরন খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, "সর্বনাশ! কী মন-খারাপ-করা একটা জায়গা! দেখে মনে হয় এখানে অশুভ কিছু একটা আছে।"

ত্রালুস সিঁড়ি দিয়ে সাবধানে নিচে নামতে নামতে বলল, "ঠিকই বলেছ।"

"এ রকম জায়গায় যে প্রাণীরা থাকে তারা বুদ্ধিমান কি না জানি না, কিন্তু তারা নিশ্চয়ই খুব বিষণ্ন প্রকৃতির।" শুমান্তি তরল গলায় বলল, "এখানে আনন্দ পাবার কিছু নেই।"

সিঁড়ির শেষ মাথায় এসে ত্রালুস সাবধানে মাটিতে পা রেখে বলল, "মাটি শক্ত নয়, অনেকটা ভেজা বালির মতো।"

ইরন বলল, "সাবধানে যাও ত্রালুস।"

"হ্যাঁ, ত্রালুস খুব সাবধান।"

ভাসমান জেট প্যাকের উপর এন্টি ম্যাটারের ভারী বাক্স এবং যন্ত্রপাতি রেখে এক হাত দিয়ে সেটাকে টেনে ত্রালুস সাবধানে হেঁটে যেতে থাকে, অন্য হাতে ভয়ঙ্করদর্শন অস্ত্রটি ধরে রাখে। ত্রালুসের পর শুমান্তি এবং সবার শেষে ইরন, দুজনেই অনভ্যস্ত হাতে একটি করে অস্ত্র ধরে রেখেছে।

সবুজাভ আবছা আলোতে তিন জন নিজেদের মাঝে খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে হাঁটতে থাকে। ঝড়ো হাওয়া কখনো সামনে থেকে কখনো পিছন থেকে আসছে। বাতাসে এক ধরনের সূক্ষ্ম বেগুনি রঙের ধুলো উড়ছে। স্পেসস্যুটের চোখের সামনে ভিজরটি বারবার মুছেও পরিষ্কার রাখা যাচ্ছে না।

তিন জন বাতাসের ক্রুদ্ধ গর্জন শুনতে শুনতে সামনে এগুতে থাকে। বড় বড় বিচিত্র পাথরের মাঝে জায়গা করে হাঁটতে হাঁটতে শুমান্তি জিজ্ঞেস করল, "আমরা কোন দিকে যাচ্ছি?"

ত্রালুস ভাসমান জেট প্যাকে একটা মনিটর দেখে বলল, 'কীশার স্কাউটশিপ থেকে একটা বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ আসছে। সেটা লক্ষ্য করে যাচ্ছি।"

"কতদূর যেতে হবে?"

"খুব বেশি দূরে নয়। বড়জোর এক কিলোমিটার।"

"যদি সোজাসুজি যেতে পারি তা হলে এক কিলোমিটার। কিন্তু যেরকম পথ দিয়ে যাচ্ছি কোনো কি নিশ্চয়তা আছে?"

"নেই। সত্যি কথা বলতে কী, হঠাৎ যদি বেগুনি রঙের একটা বিষাক্ত হ্রদের সামনে এসে পড়ি তা হলে বিপদ হয়ে যাবে।"

ইরন বলল, "তখন এক জন এক জন করে এই জেটপ্যাকে করে হ্রদ পার হতে হবে।"

"হ্যাঁ ঠিকই বলেছ।"

সৌভাগ্যক্রমে পথে হঠাৎ করে টগবগে বেগুনি রঙের তরলের কোনো হ্রদ ছিল না, নানা আকারের পাথরের মাঝে পথ করে ভেজা বালুর মতো মাটির উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে তারা শেষ পর্যন্ত কীশার স্কাউটশিপের কাছাকাছি এসে পৌঁছল। কয়েক শত মিটার উঁচু কয়েকটা পাথরের পিছনে, ধূসর আকাশের খোলা আলোতে স্কাউটশিপটিকে একটি অতিকায় পশুর মতো দেখায়। ত্রালুস দৃষ্টিক্ষেপণ মডিউল চোখে লাগিয়ে কীশা এবং নিশিকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে থাকে। কিছুক্ষণ খুঁজেই তাদের পাওয়া গেল। স্কাউটশিপ থেকে দু শ মিটার দূরে কয়েকটা গোলাকার মসৃণ পাথরের সামনে অপেক্ষা করছে। নিশি হাঁটুতে মাথা রেখে বসে আছে। তার খুব কাছে দাঁড়িয়ে আছে কীশা। নির্জন একটি গ্রহে ঝড়ো বাতাসের ক্রুদ্ধ গর্জনের মাঝে দুজনকে এভাবে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার দৃশ্যটিকে হঠাৎ করে একটি অপার্থিব অশরীরী দৃশ্য বলে মনে হয়।

ত্রালুস তার অস্ত্রটিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, "এখন আমরা কী করব?"

ইরন বহুদূরের কীশা এবং নিশির অবস্থানের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "আমরা কথা বলার জন্য গোপন চ্যানেল ব্যবহার করছি, তাই কীশা সম্ভবত আমাদের কথা শুনতে পায় নি, এখনো জানে না আমরা তার এত কাছে চলে এসেছি।"

ত্রালুস বলল, "কিন্তু অনুমান করতে পারছে।"

"হ্যাঁ, সম্ভবত পারছে। আমার মনে হয় আমরা এখন তিনটি ভিন্ন জায়গা থেকে কীশার দিকে অস্ত্র তাক করে এগিয়ে যাই।"

ত্রালুস মাথা নাড়ল, বলল, "সরাসরি তাকে বলতে হবে, এই মুহূর্তে নিশিকে চলে আসতে দিতে হবে। যদি না দেয় আমরা তাকে শেষ করে দেব। রোবটকে শেষ করায় কোনো অপরাধ নেই।"

ইরন ত্রালুসের দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বলল, "দেখ, আমি কীশাকে এখনো একটা রোবট বলে ভাবতে পারছি না।"

"কিন্তু—"

শুমান্তি ত্রালুসকে বাধা দিয়ে বলল, "হ্যাঁ, ত্রালুস। আমিও পারছি না। আমরা অস্ত্র ব্যবহার করব না, শুধু ব্যবহার করার ভয় দেখাব।"

"সেটা করতে হলে তোমাকে সত্যিই বিশ্বাস করতে হবে যে তুমি অস্ত্র ব্যবহার করবে।"

"না—তার প্রয়োজন নেই—"

শুমান্তি এবং ত্রালুসের মাঝে একটা ছোট বিতর্ক শুরু হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ইরন হাত তুলে দুজনকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "এখন কী ঘটবে আমরা জানি না, কাজেই কী করা সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে আমরা সেটাও জানি না। তাই খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কাজ নেই। তিন দিক থেকে কীশাকে ঘিরে ফেলা যাক। ট্রিগারে হাত দেবার আগে খুব সাবধান, কীশা আর নিশি কিন্তু খুব কাছাকাছি।"

"ঠিক আছে।"

ইরন আরো কিছুক্ষণ কথা বলে বলে কয়েকটা জরুরি বিষয় ঠিক করে নেয়। তারপর একজন আরেকজনের কাছে থেকে বিদায় নিয়ে তিন জন তিন দিকে যেতে শুরু করে। জেট প্যাকটা এবারে ইরনের কাছে, সে সাবধানে সেটাকে টেনে নিতে থাকে।

আবছা অন্ধকারে হেঁটে হেঁটে কীশার যেটুকু কাছে যাবার ইচ্ছে ছিল ইরন ততটুকু কাছে যেতে পারল না। তার আগেই হঠাৎ করে কীশা সচকিত হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, "কে? কে ওখানে?"

ইরন জেট প্যাকের পিছনে নিজেকে আড়াল করে বলল, "আমি। আমি ইরন।"

কীশাকে হঠাৎ করে কেমন যেন নিশ্চিন্ত মনে হল, মনে হল কিছু একটা নিয়ে সে ভারি দুশ্চিন্তায় ছিল, হঠাৎ করে সেই দুশ্চিন্তার বিষয়টি অপসারিত হয়ে গেছে। সে খানিকটা খুশি খুশি গলায় বলল, "ও, তোমরা এসেছ?"

"হ্যাঁ।"

"কেন এসেছ?"

"নিশিকে নিতে।"

"নিশিকে নিতে? কিন্তু তোমরা তো নিশিকে নিতে পারবে না।"

"কেন পারব না?"

"কারণ আমি নিশিকে ওদের দিয়ে দিয়েছি। ওরা এক্ষুনি ওকে নিতে আসবে।"

"তুমি জান ওরা কারা? তুমি কি ওদের দেখেছ?"

"না। আমি দেখি নি।"

ইরন কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "আমরা দেখেছি, তুমি নিশিকে ওদের দিতে পারবে না।"

কীশা কোনো কথা না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ইরন গলার স্বর উঁচু করে নিশিকে ডাকল। বলল, "নিশি তুমি আমার কাছে চলে এস। তিন দিক থেকে তিন জন কীশার দিকে অস্ত্র তাক করে আছে। সে তোমাকে কিছু করার চেষ্টা করলেই তাকে শেষ করে দেবে।"

নিশি সোজা হয়ে বসল, দূরে দাঁড়িয়ে থাকা ইরনের দিকে তাকিয়ে বলল, "কিন্তু আমি কেমন করে আসব? এই দেখ আমাকে বেঁধে রেখেছে।"

নিশি দেখাল তার স্পেসস্যুট থেকে শক্ত ধাতব শেকল বের হয়ে এসেছে। শেকল দিয়ে সে চতুষ্কোণ একটা বাক্সের সাথে বাঁধা।

ইরন সাবধানে আরো কয়েক পা এগিয়ে এসে বলল, "ওটা কিসের বাক্স? ওর ভিতরে কী আছে?"

নিশি মাথা নাড়ল, বলল, "আমি জানি না।"

ইরন আরো কয়েক পা এগিয়ে যায়। কীশার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কীশা।"

"বল।"

"এই বাক্সটি কী?"

"আমি ঠিক জানি না।"

"এই বাক্সটির সাথে নিশিকে বেঁধে রেখেছ কেন?"

"আমার মনে হয় এখান থেকে কোনো ধরনের সঙ্কেত বের হচ্ছে। ওরা এই সঙ্কেত থেকে বুঝতে পারবে নিশি কোথায়।"

"ও।" ইরন মাথা নেড়ে বলল, "নিশি তুমি বাক্সটি থেকে যতটুকু সম্ভব দূরে সরে দাঁড়াও।"

AMARBOI.COM

নিশি ভয় পাওয়া গলায় বলল, "কেন?"

"আমি গুলি করে এই বাক্সটি ধ্বংস করে দেব।"

কীশা হাসির মতো শব্দ করে বলল, "না ইরন, তুমি সেটা করবে না।"

"কেন?"

"কারণ আমি তোমাকে করতে দেব না।" কীশা তার কথা শেষ করার আগেই হঠাৎ করে নিশিকে জাপটে ধরে চতুষ্কোণ বাক্সটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। নিশিকে বাক্সটার উপর চেপে রেখে বলল, "আমাকে তোমরা ক্ষমা করে দিও। আমাকে যেভাবে প্রোগ্রাম করা হয়েছে আমি তার বাইরে কিছু করতে পারব না।"

"কীশা—" ইরন চিৎকার করে বলল, "কীশা—"

"আমি দুঃখিত ইরন। ঐ দেখ ওরা আসছে।"

ইরন আকাশের দিকে তাকাল, আকাশের নানা জায়গায় বিদ্যুতের ঝলকানির মতো আলো জ্বলছে। চারদিক থেকে কুৎসিত মাংসপিণ্ডের মতো কিছু একটা কিলবিল করে আবার অদৃশ্য হয়ে যেতে শুরু করে।

নিশি চিৎকার করে ওঠে আতঙ্কে, কীশা তাকে শক্ত করে ধরে রেখে শান্ত গলায় বলে, "আর কয়েক সেকেন্ড নিশি। আর মাত্র কয়েক সেকেন্ড।"

ইরন শুনতে পেল ত্রালুস এবং শুমান্তি ছুটে আসছে। ত্রালুস অস্ত্র উদ্যত করে বলল, "সরে যাও কীশা, সরে যাও। ছেড়ে দাও নিশিকে। ছেড়ে দাও।"

কীশা ত্রালুসের কথা শুনতে পেল বলে মনে হল না। নিশিকে চেপে ধরে রেখে নিচু গলায় বলল, "নিশি লক্ষ্মী মেয়ে। তুমি ছটফট কোরো না, চুপ করে শুয়ে থাক। তারা আমাদের খুঁজে পেয়েছে। ঐ দেখ তারা আসছে।"

নিশি আতঙ্কে একটা আর্তচিৎকার করে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে, একটি ঝটকা দিয়ে উঠে বসে, ত্রালুস এবং শুমান্তি কীশার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে টেনে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে, ঠিক তখন খুব কাছে হঠাৎ করে একটা তীব্র বিদ্যুতের ঝলকানি দেখা গেল, কালো ধোঁয়ায় চারদিক ঢেকে যায় এবং হঠাৎ করে কীশা একটা আর্তনাদ করে ওঠে।

ত্রালুস এবং শুমান্তি চিৎকার করে পিছনে সরে এল, কীশার স্পেসস্যুট ভেঙে তার ভিতর থেকে কুৎসিত থলথলে মাংসপিণ্ডের মতো কিছু একটা বের হয়ে আসছে। ইরন বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল—নিশিকে নেবার জন্য চতুর্মাত্রিক প্রাণীটি যেখানে হাজির হয়েছে ঠিক সেখানে কীশা ছিল, প্রাণীটি নিশিকে নিতে পারে নি কিন্তু চেষ্টা করতে গিয়ে কীশার শরীরের ভিতর দিয়েই বের হয়ে এসেছে। ইরন অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে কীশার দিকে তাকিয়ে রইল, অবাক হয়ে দেখল, তার দেহ ছিন্নভিন্ন করে ভিতর থেকে থলথলে মাংসপিণ্ডের মতো কিছু একটা বের হয়ে আসছে। কীশা থরথর করে কাঁপতে থাকে, তার মুখ যন্ত্রণায় বিবর্ণ হয়ে উঠছে—দাঁতে দাঁত চেপে সে ভয়ঙ্কর আর্তনাদ করে ওঠে।

ত্রালুস আর সহ্য করতে পারল না, অস্ত্রটি উপরে তুলে থলথলে মাংসপিণ্ডের মতো জিনিসটা লক্ষ্য করে গুলি করে বসে। প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের শব্দ হল, কালো ধোঁয়ায় চারদিক ঢেকে যায়। এক ধরনের জান্তব শব্দ শুনতে পেল সবাই, থলথলে জিনিসটি জান্তব এক ধরনের শব্দ করতে থাকে, ভিতর থেকে সাদা কষের মতো আঠালো এক ধরনের তরল ফিনকি দিয়ে বের হতে শুরু করে। মাংসপিণ্ডটি হঠাৎ বিশাল বড় হয়ে যায়, সেখান থেকে অসংখ্য শুঁড়ের মতো জিনিস বের হয়ে আসে। সেগুলো কিলবিল করতে করতে হঠাৎ করে পুরো জিনিসটি অদৃশ্য হয়ে গেল।

পুরো ব্যাপারটি বুঝতেই তাদের কয়েক মুহূর্ত সময় লেগে যায়। যখন বুঝতে পারল তখন তারা দৌড়ে কীশার কাছে গেল, তার শরীর এবং স্পেসস্যুটটা দেখে মনে হয় তার শরীরের ভিতরে একটা বিস্ফোরণ ঘটেছে। ইরন কীশার হাত ধরে দেখল সেটি নিশ্চল, দেহে জীবনের কোনো চিহ্ন নেই। শুমান্তি ফ্যাকাসে মুখে বলল, "কী হয়েছে? কী হয়েছে কীশার?"

"আমার ধারণা একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। নিশিকে নেওয়ার জন্য প্রাণীটা আসছিল, ঠিক যেখানে বের হয়েছে সেখানে কীশা ছিল। হুটোপুটি হওয়ার কারণে প্রাণীটা ওর শরীরের ভিতর দিয়ে বের হয়ে এসেছে।"

ত্রালুস একটু এগিয়ে এসে বলল, "কীশা কি মারা গেছে? রোবট কি মারা যায়?"

ইরন একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "কীশা আসলে পুরোপুরি রোবট ছিল না। একটা সত্যিকার মানুষের মাথায় তার মস্তিষ্কের একটা অংশে কপোট্রন লাগিয়ে ওকে তৈরি করা হয়েছে। কপোট্রনটা শরীরের উপর নির্ভর করে ছিল। শরীর ধ্বংস হয়ে গেলে কপোট্রনটা আর থাকতে পারে না। আমার ধারণা ওর কপোট্রনটাও আর কাজ করছে না।"

ইরন কথা শেষ করার আগেই হঠাৎ করে শুনতে পেল খুব চাপা গলায় প্রায় ফিসফিস করে কেউ তাকে ডাকছে। ইরন চমকে উঠল, "কে?"

"আমি। আমি কীশা।"

ইরন কীশার উপর ঝুঁকে পড়ল, "কীশা তুমি বেঁচে আছ?"

"আমি জানি না। এটা বেঁচে থাকা কি না। যদি এটা বেঁচে থাকাও হয় তা হলেও আমি আর বেশিক্ষণ বেঁচে থাকব না। রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়ে গেছে বলে খুব দ্রুত আমার সবকিছু একটি একটি করে শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমি এখন আর কিছু দেখতে পারছি না।"

"কীশা, আমরা খুব দুঃখিত। আমরা—"

"আমি জানি। আমাকে তারা রোবট হিসেবে তৈরি করেছিল কিন্তু আমার ভিতরে যেটুকু স্মৃতি, যেসব অনুভূতি সব আমার নিজের। আমার মস্তিষ্কের অংশবিশেষ নিশ্চয়ই এখনো কোথাও রয়ে গেছে। মানুষের জন্য মানুষের ভালবাসা কী আমি জানি ইরন।"

"আমরা কি তোমার জন্য কিছু করতে পারি, কীশা?"

"না। কিছু করতে পারবে না।" কীশার গলার স্বর অস্পষ্ট হয়ে আসে, কষ্ট করে বলে, "আমি ভোকাল কর্ডকে আর ব্যবহার করতে পারছি না, আমার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। ইরন—"

"বল কীশা।"

"আমাকে তোমরা ক্ষমা করে দিও। আমি তোমাদের ভয়াবহ বিপদে এনে ফেলেছি, কিন্তু বিশ্বাস কর, আমি নিজের ইচ্ছায় করি নি। আমার কোনো উপায় ছিল না।"

"আমরা জানি।"

"তোমাদের কথাও এখন অস্পষ্ট হয়ে আসছে। ভালো করে আর শুনতে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে বহুদূর থেকে ভেসে আসছে। মনে হচ্ছে আমি ভেসে ভেসে বহুদূরে চলে যাচ্ছি। আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না, কিছু শুনতে পাচ্ছি না, কিছু বুঝতে পারছি না।"

"কীশা। কীশা।" ইরন চিৎকার করে ডাকল, "কীশা।"

"বল ইরন।"

ইরন চিৎকার করে উঠল, "আমরা তোমাকে ভুলব না। আমরা সবসময় তোমাকে মনে রাখব। তোমার জন্য সবসময় আমাদের বুকে ভালবাসা থাকবে কীশা।"

"ভালবাসা।" কীশার গলার স্বর অস্পষ্ট হয়ে আসে, ফিসফিস করে বলে, "মানুষের ভালবাসা। আহা! কেন ওরা আমাকে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকতে দিল না? কেন?"

ইরন কীশার উপর ঝুঁকে পড়ে চিৎকার করে বলল, "কীশা শরীরের গঠন দিয়ে মানুষ হয় না, নিউরন[৩৪] আর সিনাপ্সের[৩৫] সংযোগ দিয়ে মানুষ হয় না, কপোট্রনের নিউরাল নেটওয়ার্ক দিয়েও মানুষ হয় না। মানুষ হচ্ছে তার বুকের ভিতরের অনুভূতি। তুমি মানুষ কীশা, তুমি মানুষ, তুমি পুরোপুরি একজন মানুষ।"

"আমি শুনতে পাচ্ছি না ইরন। মনে হচ্ছে আমি বহুদূরে চলে যাচ্ছি, বহুদূরে। বহুদূরে—"

ইরন চিৎকার করে বলল, "তুমি মানুষ কীশা। তুমি আমাদের মতো মানুষ। তোমার জন্য আমাদের ভালবাসা। ভালবাসা।"

কীশা ফিসফিস করে বলল, "ভালবাসা? আমার জন্য ভালবাসা?" তার গলার স্বর একেবারে অস্পষ্ট হয়ে আসে, অনেক চেষ্টা করেও আর তার কথা শোনা গেল না।

ইরন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়াল, বলল, "কীশার কপোট্রন থেমে গেছে।"

৪

শুমান্তি আর ত্রালুস কোনো কথা বলল না, শূন্য দৃষ্টিতে কীশার দিকে তাকিয়ে রইল। ইরন ঘুরে ত্রালুস এবং শুমান্তির দিকে তাকিয়ে বলল, "আমাদের হাতে খুব বেশি সময় নেই। চতুর্মাত্রিক প্রাণী এক্ষুনি নিশ্চয়ই আবার নিশিকে নিতে আসবে।"

ত্রালুস জিজ্ঞেস করল, "আমরা এখন কী করব ইরন?"

"প্রথমে খুব সাবধানে নিশির শরীরের সাথে বাঁধা ঐ সিগন্যাল বিকনটি[৩৬] ধ্বংস করে দাও। তারপর নিশিকে মুক্ত করে স্কাউটশিপে ফিরে চল।"

শুমান্তি বলল, "আমাদের নিজেদের স্কাউটশিপে ফিরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। কীশার স্কাউটশিপটাই ব্যবহার করতে পারব।"

"হ্যাঁ। ঠিকই বলেছ।" ইরন চিন্তিত মুখে বলল, "শেষ পর্যন্ত কী হবে আমরা জানি না। চতুর্মাত্রিক প্রাণীর সাথে ত্রিমাত্রিক প্রাণী যুদ্ধ করতে পারে না। আমরা বেশিরভাগ সময় তাদের দেখতে পর্যন্ত পাই না।"

"কিন্তু তুমি বলেছ, তারাও পায় না। অসীমসংখ্যক ত্রিমাত্রিক জগৎ আছে তার কোনটার মাঝে আমরা আছি তারা জানে না।"

"কিন্তু এখন জানে—নিশির শরীরের সাথে সিগন্যাল বিকন বেঁধে রেখেছে, সেখান থেকে সঙ্কেত বের হচ্ছে। তারা সেই সঙ্কেত দিয়ে আমাদের খুঁজে বের করেছে।"

ত্রালুস বলল, "তা হলে প্রথমে এই বিকনটাই উড়িয়ে দিই।"

ত্রালুস স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটি নিয়ে নিশির দিকে এগিয়ে যায়। নিশিকে নিজের শরীর দিয়ে আড়াল করে সে বিকনটির দিকে অস্ত্র তাক করে ট্রিগার টেনে ধরে। একটা বিস্ফোরণের শব্দ হল, কালো ধোঁয়া সরে যেতেই দেখা গেল বিকনটি ভস্মীভূত হয়ে গেছে। নিশি তার শরীরের সাথে বাঁধা শেকলটি নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ত্রালুসের দিকে তাকিয়ে বলল, "ধন্যবাদ তোমাকে।"

"আমার নাম ত্রালুস।"

"ধন্যবাদ ত্রালুস।"

amarboi.com

শুমান্তি এগিয়ে এসে বলল, "আমি শুমান্তি।"

নিশি শুমান্তির দিকে তাকিয়ে বলল, "আমাকে বাঁচানোর জন্য এসেছ বলে তোমাদের অনেক ধন্যবাদ।"

ইরন আকাশের দিকে তাকিয়ে কাঁপা গলায় বলল, "ধন্যবাদ দেওয়ার কিংবা নেওয়ার সময় মনে হয় নেই। চতুর্মাত্রিক প্রাণী আবার আসছে। আমার মনে হয় আমাদের ফিরে যাবার চেষ্টা করা উচিত।"

সবাই আকাশের দিকে তাকাল। ধূসর আকাশে আলোর বিচ্ছুরণ দেখা যাচ্ছে। থলথলে কুৎসিত মাংসপিণ্ড দেখা দিয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ইরন কঠোর গলায় বলল, "সবাই অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত থাক।"

শুমান্তি অস্ত্র হাতে তুলে চারদিকে তাকাল, বলল, "ওরা কি আমাদের দেখছে?"

ইরন মাথা তুলে তাকাল, চারদিক থেকে ঘিরে আসা আলোর বিচ্ছুরণগুলো আরো কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে, থলথলে মাংসপিণ্ডগুলোকে আরো জীবন্ত বলে মনে হচ্ছে। ইরন গলার স্বর শান্ত রাখার চেষ্টা করে বলল, "হ্যাঁ ওরা আমাদের দেখছে। সত্যি কথা বলতে কী, আমরা নিজেরা নিজেদেরকে যেভাবে দেখি ওরা তার চাইতে অনেক ভালোভাবে দেখছে।"

শুমান্তি ভয় পাওয়া গলায় বলল, "সর্বনাশ!"

ইরন হাতের অস্ত্রটি শক্ত করে ধরে রেখে বলল, "আমাদের যেহেতু দেখে ফেলেছে, আমার মনে হয় তা হলে ভালো করেই দেখুক। জানুক যে আমরা কিছুতেই নিশিকে নিতে দেব না। তোমরা অস্ত্র তাক করে নিশিকে ঘিরে দাঁড়াও।"

ত্রালুস আর শুমান্তি নিশির দুই পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ত্রালুস কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, "যদি হঠাৎ করে হাজির হয় তা হলে কী করব?"

"গুলি করবে। আমরা যে নিশিকে নিতে দেব না সেটা বোঝানোর আর কোনো পথ আমার জানা নেই।"

"যদি সত্যিই ওরা বুদ্ধিমান প্রাণী হয়ে থাকে তা হলে ওরা কি আমাদের মনের কথা বুঝতে পারছে না?"

"আমি জানি না। যদি জেনে থাকে তা হলে ভালো।"

কিন্তু দেখা গেল চতুর্মাত্রিক প্রাণীরা ওদের মনের কথা জানে না। নিশিকে ঘিরে রেখে তিন জন স্কাউটশিপের দিকে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই হঠাৎ করে তাদের সামনে প্রথমে একটা তীব্র আলোর বিচ্ছুরণ এবং প্রায় সাথে সাথে থলথলে একটা মাংসপিণ্ড হঠাৎ করে তাদের সামনে এসে হাজির হল। মাংসপিণ্ডটি সামনে একবার দুলে উঠে তারপর ধাক্কা দিয়ে তাদের নিচে ফেলে দেয়। কিছু বোঝার আগেই থলথলে মাংসপিণ্ড থেকে অনেকগুলো শুঁড় বের হয়ে আসে, শুঁড়গুলো সাপের মতো কিলবিল করে ওঠে। তারপর হঠাৎ সেগুলো বিদ্যুদ্বেগে নিশির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, নিশি ভয়াবহ আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে, তার মাঝেই শুঁড়গুলো নিশিকে জড়িয়ে নিজের দিকে টেনে নেয়। মাংসপিণ্ডের এক অংশ হঠাৎ করে অন্ধকার গহ্বরের মতো খুলে যায় এবং শুঁড়গুলো হ্যাঁচকা টানে নিশিকে সেই অন্ধকার গহ্বরের মাঝে টেনে নিয়ে যায়। নিশির আর্তচিৎকার হঠাৎ করে থেমে গিয়ে এক ভয়াবহ নীরবতা নেমে আসে।

ইরন অস্ত্র হাতে সোজা হয়ে দাঁড়ায়, থলথলে এই মাংসপিণ্ডের মাঝে নিশি আটকা পড়ে আছে, তাকে কি সে এখন গুলি করতে পারবে? গুলির বিস্ফোরণে নিশিও কি ছিন্নভিন্ন হয়ে

AMARBOI.COM

যাবে না? ত্রালুস এবং শুমান্তিও উঠে দাঁড়াল। অস্ত্র তাক করে দাঁড়িয়ে আছে, কী করবে বুঝতে পারছে না।

ইরন দ্রুত চিন্তা করার চেষ্টা করে। একটি চতুর্মাত্রিক প্রাণী ত্রিমাত্রিক জগৎ থেকে একটি ত্রিমাত্রিক প্রাণীকে নিয়ে যাচ্ছে, তাকে কি কোনোভাবে থামানো যায় না? চতুর্মাত্রিক প্রাণীকে কি ত্রিমাত্রিক জগতে আটকানো যায় না? ত্রিমাত্রিক প্রাণী যদি দ্বিমাত্রিক জগতের ভিতর দিয়ে যেত তা হলে কী হত? একটি দ্বিমাত্রিক প্রাণী যদি ত্রিমাত্রিক প্রাণীকে আটকানোর চেষ্টা করত তা হলে কী করত? চিন্তা করার খুব বেশি সময় নেই, কিছু একটা করতে হবে, সামনে ঝুলে থাকা এই থলথলে মাংসপিণ্ডটি একবার অদৃশ্য হয়ে গেলে আর কখনো তারা এই চতুর্মাত্রিক প্রাণীটিকে খুঁজে পাবে না। নিশিকে নিয়ে সে চিরদিনের জন্যে মহাবিশ্বের বিশাল চতুর্মাত্রিক জগতে হারিয়ে যাবে। ইরন থলথলে কুৎসিৎ মাংসপিণ্ডের দিকে তাকিয়ে থাকে, এখানে নিশ্চয়ই প্রাণীটির চোখ, নাক, মুখ বা অন্য স্পর্শ ইন্দ্রিয় লুকিয়ে আছে, প্রাণীটি হয়তো তাদের দেখছে, তাদের নির্বুদ্ধিতা দেখে পরিহাস করছে। হয়তো প্রচণ্ড ক্রোধে তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে, হয়তো তাদের নিয়ে কৌতুক করছে। কিন্তু এই থলথলে মাংসপিণ্ডটি একবার অদৃশ্য হয়ে গেলে আর তারা এর নাগাল পাবে না। কিন্তু প্রাণীটি অদৃশ্য চতুর্মাত্রিক জগৎ থেকে তাদের দেখতে পারবে। তাদের নিয়ে পরিহাস করতে পারবে, তাদের ওপর ক্রোধান্বিত হতে পারবে। কৌতুক করতে পারবে। এই প্রাণীটিকে কিছুতেই চলে যেতে দেওয়া যাবে না। কিছুতেই না।

ইরন দেখতে পায় সর্‌সর্‌ শব্দ করে এই মাংসপিণ্ডটি তার আকৃতি পরিবর্তন করছে, কখনো বড় হচ্ছে কখনো ছোট হচ্ছে, কখনো তার ভিতর থেকে বিচিত্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বের হয়ে আসছে। ইরন জানে প্রাণীটি আসলে তাদের এই জগতের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে, তাই তাদের কাছে মনে হচ্ছে এটি আকৃতি পরিবর্তন করছে। প্রাণীটির যে অংশ এই জগতের মাঝে রয়েছে সেইটুকুকে এখানে আটকাতে হবে। যেভাবে সম্ভব।

AMARBOI.COM

ইরন দ্রুত চিন্তা করার চেষ্টা করে, সময় চলে যাচ্ছে, যে কোনো মুহূর্তে প্রাণীটি অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে, যেটাই করতে হয় সেটা খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে। তার মাথায় হঠাৎ একটা সম্ভাবনার কথা উঁকি মারে, ব্যাপারটা আদৌ সম্ভব কি না সে নিশ্চিত নয়—কিন্তু এখন আর ভেবে দেখার সময় নেই। সে চিৎকার করে ত্রালুস আর শুমান্তিকে ডাকল। তারা গুঁড়ি মেরে কাছে এগিয়ে আসে। ইরন চাপা গলায় বলল, "প্রাণীটিকে আটকাতে হবে, যেভাবে, যেভাবে সম্ভব।"

"কীভাবে আটকাবে?"

"আমাদের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রকে শক্তিশালী লেজার[৩৭] রশ্মি হিসেবে ব্যবহার করা যায়।"

"হ্যাঁ", ত্রালুস মাথা নাড়ল, "মেগাওয়াট শক্তি বের হয়।"

"মনে হয় কাজ চালানোর জন্য যথেষ্ট। আমরা প্রাণীটার তিন দিকে দাঁড়াব, আমি সামনে, ত্রালুস বামে এবং শুমান্তি নিচে। আমি সামনে থেকে লেজার রশ্মি দিয়ে প্রাণীটাকে গেঁথে ফেলব। খুব সূক্ষ্ম রশ্মি, সম্ভবত প্রাণীটার বড় কোনো ক্ষতি হবে না। ঠিক একই সময় ত্রালুস বাম থেকে ডান দিকে লেজার রশ্মি দিয়ে গেঁথে ফেলবে, শুমান্তি নিচে থেকে উপরে। একই সাথে তিনটি ভিন্ন মাত্রা থেকে আটকে ফেললে প্রাণীটা এই ত্রিমাত্রিক জগতে আটকা পড়ে যাবে, এখান থেকে আর বের হতে পারবে না। লেজার রশ্মিটুকু বন্ধ করবে না, এটাকে জ্বালিয়ে রাখবে।"

"কিন্তু বেশিক্ষণ তো রাখা যাবে না। একটানা খুব বেশি হলে পনের মিনিট।"

"যতক্ষণ পারা যায় ততক্ষণই রাখ। কিছু করার নেই। দেরি করা যাবে না, তোমরা নিজেদের জায়গায় যাও, এই আমাদের শেষ আশা।"

"নিশিকে এতক্ষণে চতুর্মাত্রিক জগতে নিয়ে গেছে, আমি নিশ্চিত সে এখানে নেই। যাও—দেরি কোরো না।"

ত্রালুস অস্ত্রটি লেজার রশ্মির জন্য প্রস্তুত করতে করতে বাম দিকে সরে গেল। শুমান্তি প্রাণীটির নিচে গিয়ে দাঁড়াল। ইরন অস্ত্রটিকে পূর্ণ শক্তির জন্য প্রোগ্রাম করে ট্রিগারে হাত দেয়। তারপর প্রাণীটির দিকে তাক করে চিৎকার করে বলল, "টানো ট্রিগার।"

তিনটি ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে শক্তিশালী লেজার রশ্মির আলো ঝলকে উঠল, প্রাণীটি মুহূর্তের জন্য ভয়ঙ্করভাবে কেঁপে উঠল, হঠাৎ করে মনে হল পায়ের নিচে মাটি বুঝি থরথর করে কেঁপে উঠেছে।

প্রাণীটির শরীর থেকে হঠাৎ সহস্র শুঁড়ের মতো জিনিস বের হয়ে কিলবিল করতে লাগল, দেখে মনে হল তাদেরকে ধরার চেষ্টা করছে, কিন্তু তাদেরকে নাগালে না পেয়ে ক্রুদ্ধ আক্রোশে ছটফট করতে থাকে। ইরন, ত্রালুস আর শুমান্তি নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে তীব্র লেজার রশ্মির বেগুনি আলো দিয়ে কদাকার প্রাণীটিকে শূন্যে আটকে রাখল।

ইরন বিস্ফারিত চোখে প্রাণীটির দিকে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ করে এই প্রথমবারের মতো প্রাণীটির আকৃতির পরিবর্তন হচ্ছে না, সত্যি সত্যি এটি এই জগতে আটকা পড়ে গেছে। ইরন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না, ত্রিমাত্রিক জগতের প্রাণী হয়ে সত্যি তারা চতুর্মাত্রিক জগতের একটি প্রাণীকে আটকে ফেলতে পেরেছে। প্রাণীটা নিজের শরীরকে দ্বিখণ্ডিত না করে এখন আর চতুর্মাত্রিক জগতে যেতে পারছে না। যতক্ষণ লেজার রশ্মি প্রাণীটির ভিতর দিয়ে যাবে প্রাণীটি এখান থেকে নড়তে পারবে না। তাদের লেজার রশ্মি আর মিনিট পনের পর্যন্ত থাকবে তার ভিতরে কিছু একটা করতে থাকবে। শুধু তাই নয় ক্রুদ্ধ প্রাণীটি নিশ্চয়ই নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করবে। চতুর্মাত্রিক জগৎ থেকে তার অন্য অংশ নিশ্চয়ই তাদের আক্রমণ করার চেষ্টা করবে। সেই আক্রমণ থেকেও তাদের নিজেদের রক্ষা করতে হবে। এই মুহূর্তে তিন জন তিনটি অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে, নিজের জায়গা থেকে কেউই নড়তে পারছে না। ইরন গলা উঁচিয়ে ত্রালুস আর শুমান্তিকে ডেকে বলল, "তোমরা কোনো অবস্থাতেই লেজার রশ্মি বন্ধ কোরো না, যতক্ষণ এই রশ্মি বের হতে থাকবে ততক্ষণ প্রাণীটা আটকে থাকবে।"

"ঠিক আছে।"

"আমি আমার স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটা এই পাথরের উপর রাখছি। এখান থেকেই লেজার রশ্মি তাক করে রাখব।"

"কেন?"

"প্রাণীটা যদি চতুর্মাত্রিক জগৎ থেকে আক্রমণ করে তা হলে পাল্টা আক্রমণ করা দরকার।"

"কী দিয়ে আক্রমণ করবে?"

"দেখি কী আছে।"

ইরন লেজার রশ্মিটুকু চালু রেখে খুব সাবধানে অস্ত্রটি একটি পাথরের উপর নামিয়ে রেখে আকাশের দিকে তাকাল। বহুদূরে আলোর বিন্দু ফুটে উঠছে, তা হলে কি চতুর্মাত্রিক প্রাণী তাদের দিকে আসছে? ইরন কাছাকাছি ভেসে থাকা জেট প্যাকটির দিকে ছুটে গেল, উপরে কিছু দ্বিতীয় মাত্রার বিস্ফোরক, মাঝারি পাল্লার অস্ত্র, ব্যবহারী যন্ত্রপাতি এবং একটি চতুষ্কোণ

AMARBOI.COM

বাক্স। ইরন চতুষ্কোণ বাক্সটির কাছে গিয়ে সেটি চিনতে পারে, এটি এন্টি ম্যাটারের বাক্স। এখানে যে পরিমাণ এন্টি ম্যাটার রয়েছে সেটি দিয়ে এই গ্রহের অর্ধেকটুকু উড়িয়ে দেওয়া যাবে। ইরন একটি নিশ্বাস ফেলে, চতুর্মাত্রিক প্রাণীকে জানাতে হবে তারা প্রয়োজন হলে এই গ্রহটির অর্ধেকটুকু উড়িয়ে দেবে, লেজার রশ্মি দিয়ে বেঁধে রাখা প্রাণীটার অংশটুকুসহ।

ইরন মাঝারি পাল্লার একটি অস্ত্র হাতে তুলে নিল। কিছু বিস্ফোরক তুলে নিতে গিয়ে থেমে গিয়ে সে পুরো জেট প্যাকটি টেনে নিয়ে আসে। ত্রালুস তার লেজার রশ্মিটুকু স্থিরভাবে ধরে রাখার চেষ্টা করতে করতে চোখের কোনা দিয়ে ইরনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "জেট প্যাক দিয়ে কী করবে?"

"এখানে এন্টি ম্যাটারের বাক্সটা রয়েছে।"

"কী করবে এন্টি ম্যাটার দিয়ে?"

"এই গ্রহটার অর্ধেকটুকু উড়িয়ে দেব।"

শুমান্তি কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, "উড়িয়ে দেবে?"

"হ্যাঁ।"

"উড়িয়ে দেবার ভয় দেখাবে, না সত্যি সত্যি উড়িয়ে দেবে?"

"সত্যি সত্যি উড়িয়ে দেব। এই চতুর্মাত্রিক প্রাণীটা যদি চায় শুধুমাত্র তা হলেই সে আমাদের থামাতে পারবে।"

"অর্থাৎ নিশিকে যদি ফিরিয়ে দেয়?"

"হ্যাঁ। নিশিকে যদি ফিরিয়ে দেয়।"

ইরন জেট প্যাকটি চতুর্মাত্রিক প্রাণীর একেবারে কাছাকাছি নিয়ে যায়। এন্টি ম্যাটারের বাক্সটি জেট প্যাকের মাঝামাঝি রেখে সেটিকে বিস্ফোরক দিয়ে ঢেকে দেয়। বড় একটি টাইমার দেওয়া বিস্ফোরককে আলাদা করে নিয়ে ইরন সেখানে সময় নির্ধারিত করে দেয়। লেজার রশ্মিটুকু সম্ভবত আরো দশ মিনিট পর্যন্ত থাকবে, সেগুলো শেষ হবার আগেই এই বিস্ফোরণটি ঘটতে হবে, কাজেই সাড়ে সাত মিনিট সম্ভবত পর্যাপ্ত সময়। এর মাঝে যদি কিছু না করা হয় তা হলে ঠিক সাড়ে সাত মিনিট পরে বিস্ফোরণ ঘটবে। এই বিস্ফোরণে এন্টি ম্যাটারের নিরাপদ শীল্ডিং চূর্ণ হয়ে যাবার কথা, সেটি তার ভারী ধাতব বাক্স স্পর্শ করামাত্রই পদার্থ-প্রতিপদার্থের সংঘাতে পুরো পদার্থ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে এক ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটবে, এ ধরনের বিস্ফোরণ সচরাচর দেখা যায় না, ইরন একটি নিশ্বাস ফেলল, বিস্ফোরণে তারা সাথে সাথে ভস্মীভূত হয়ে যাবে—কিছু বোঝার আগেই। দুঃখ, কষ্ট, ব্যথা, বেদনা, যন্ত্রণা কোনোকিছুর অনুভূতিই তারা পাবে না—যদি দেহটিই না থাকে তা হলে ব্যথা বা দুঃখ-কষ্টটি হবে কোথায়?

এতক্ষণ নিজের ভিতরে যে উত্তেজনা ছিল হঠাৎ করে সেই উত্তেজনাটি কেন জানি কমে গিয়ে ইরন নিজের ভিতরে একটি বিচিত্র ধরনের প্রশান্তি অনুভব করে, তার পক্ষে যেটুকু করার ছিল সে তার পুরোটুকু করেছে, এখন কিছুতেই আর কিছু আসে-যায় না। চতুর্মাত্রিক প্রাণী যদি নিশিকে ফেরত না দেয় এই গ্রহের অর্ধেকটুকুসহ তারা তিন জন কিছু বোঝার আগেই ভস্মীভূত হয়ে যাবে। মৃত্যুর ব্যাপারটিও এখন আর সেরকম ভয়ানক মনে হচ্ছে না।

ইরন হেঁটে হেঁটে শুমান্তির কাছে গিয়ে তাকে ডাকল, "শুমান্তি।"

"বল।"

"লেজারটা এভাবে শক্ত করে ধরে রাখতে তোমার নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে।"

"না সেরকম কষ্ট হচ্ছে না।"

"আমরা খুব বেশি হলে আর মিনিট সাতেক বেঁচে থাকব। জীবনের এই শেষ সময়টা এ রকম কষ্ট না করলেই হয়। লেজারটা সাবধানে নিচে রেখে চলে এস। দূরে দাঁড়িয়ে দেখি কী হয়।"

শুমান্তি কিছু বলার আগেই ত্রালুস বলল, "ঠিকই বলেছ। শুমান্তি আগে তুমি রাখ, তারপর আমি রাখব।"

শুমান্তি বেগুনি রঙের মেগাওয়াট রশ্মিটুকু, যার ভিতর দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে মেগাজুল শক্তি বের হয়ে যাচ্ছে, অপরিবর্তিত রেখে খুব সাবধানে লেজারটি নিচে নামিয়ে রাখে। অস্ত্রটি থেকে তিনটি ধাতব খণ্ড বের হয়ে আসে, তার উপর ভর করে সেটি স্থির দাঁড়িয়ে থাকে।

শুমান্তির লেজারটি স্থির করে দুজন ত্রালুসের কাছে এগিয়ে গেল, তাকেও লেজারটি নিচে বসিয়ে রাখতে সাহায্য করে তারপর তিন জন ধীরপায়ে হেঁটে হেঁটে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ায়। তিনটি ভিন্ন ভিন্ন লেজার থেকে ভয়ঙ্কর শক্তিশালী তিনটি লেজার রশ্মি মাটি থেকে কয়েক মিটার উপরে চতুর্মাত্রিক প্রাণীটির একটি অংশকে আটকে রেখেছে, প্রাণীটি এতটুকু নড়তে পারছে না, একটু নড়লেই লেজারের ভয়ঙ্কর রশ্মি সেটিকে ছিন্নভিন্ন করে দেবে, নিজেকে ধ্বংস না করে এই প্রাণীটির চতুর্মাত্রিক জগতে ফিরে যাবার আর কোনো উপায় নেই।

ইরন একটি নিশ্বাস ফেলে প্রাণীটার নিচে রাখা জেট প্যাকটির দিকে তাকাল। সেখানে টাইমার লাগানো বিস্ফোরকটি অস্পষ্ট এক ধরনের যান্ত্রিক শব্দ করছে। এখান থেকেও টাইমারের সময়টুকু স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে, আর মাত্র ছয় মিনিট বাকি।

ত্রালুস হালকা স্বরে বলল, "এটি একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা বলা যায়। আমরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি সবকিছু নিয়ে ধ্বংস হওয়ার জন্য।"

শুমান্তি কোনো কথা বলল না, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ইরন হাসার চেষ্টা করে বলল, "এত নৈরাশ্যবাদী হচ্ছ কেন? নিশিকে ফিরিয়ে তো দিতেও পারে।"

ত্রালুস, "ফিরিয়ে দেওয়ার খুব বেশি সময় নেই। আর মাত্র ছয় মিনিট।"

ত্রালুস টাইমারের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি তোমাদের জীবন থেকে মূল্যবান সময় নিতে চাই না, কিন্তু একটা জিনিস নিশ্চয়ই জান?"

"কী?"

"নিশিকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য কিন্তু ছয় মিনিট সময় নেই। যদি সত্যিই তাকে ফিরিয়ে দেয় তা হলে আমাদের এই বিস্ফোরকের সাথে লাগানো টাইমারটি বিকল করতে হবে। সেটা করতে কমপক্ষে দুই মিনিট সময় লাগবে। কাজেই নিশিকে ফিরে পাবার জন্য আমাদের হাতে আসলে চার মিনিট থেকেও কম সময়।"

"ঠিক বলেছ।" ইরন মাথা নাড়ল, "আর চার মিনিটের মাঝে যদি চতুর্মাত্রিক প্রাণী নিশিকে ফেরত না দেয় তা হলে ধরে নেওয়া যায় আমাদের বিদায় নেওয়ার সময় হয়েছে।"

ত্রালুস অন্যমনস্কের মতো একবার আকাশের দিকে তাকাল, ঘোলা আধো আলোকিত আকাশ, চারদিকে বড় বড় পাথর, সবুজাভ কুণ্ডলী পাকানো মেঘ, চারপাশে এক ধরনের বিষাক্ত ধোঁয়া। সে ইরনের দিকে তাকিয়ে বলল, "কে জানে কাজটা ঠিক করলাম কি না?"

"কী কাজ?"

"এই যে সবাইকে নিয়ে এত বড় একটা জুয়া খেলা।"

ইরন হেসে বলল, "ছোটখাটো জুয়া খেলার কোনো অর্থই হয় না। সত্যি যদি খেলতেই হয় তা হলে বড় জুয়াই খেলা উচিত।"

"ঠিকই বলেছ।"

তিন জন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। শুমান্তি ত্রালুসের পাশে কাছে গিয়ে দাঁড়াল, বায়ু নিরোধক স্পেসস্যুটের মাঝে সবাই আটকা পড়ে আছে, তা না হলে সে নিশ্চয়ই এখন ত্রালুসের হাত ধরে রাখত। ত্রালুস শুমান্তিকে নিজের কাছে টেনে নরম গলায় বলল, "ভয় করছে শুমান্তি?"

শুমান্তি মাথা নাড়ল, বলল, "জানি না এটাকে ভয় বলে কি না। কেমন জানি ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। কোনোকিছু নিয়ে আর চিন্তা করতে পারছি না।"

ত্রালুস তরল গলায় বলল, "চিন্তা করে কী হবে? এস দেখি কী হয়।"

চার মিনিটের ভিতর নিশিকে ফেরত দেওয়া হল না। ইরন বুকের ভিতরে এক বিচিত্র ধরনের অস্থিরতা অনুভব করে, অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত রেখে বলল, "ত্রালুস, জুয়ায় আমরা হেরে গেলাম।"

ত্রালুস ইরনের দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বলল, "আমি দুঃখিত ইরন।"

শুমান্তি হাসার চেষ্টা করে বলল, "আমাদের কারণে তোমাকে এভাবে মারা যেতে হচ্ছে ইরন, আমরা সত্যিই দুঃখিত।"

"আমি ঠিক জানি না, তোমরা ব্যাপারটিকে নিজেদের দোষ বলে কেন ধরে নিচ্ছ।"

ত্রালুস মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ, এই শেষ মুহূর্তে কার দোষে কী হয়েছে সেটি নিয়ে হিসাব করে কী হবে? তার চাইতে যেটা করে একটু শান্তি পাব সেটাই করি?"

"কী করে তুমি শান্তি পাবে?"

"এই চতুর্মাত্রিক প্রাণীকে কষে কিছু গালিগালাজ করলে।"

শুমান্তি শব্দ করে হাসল এবং ত্রালুস সত্যি সত্যি তিনটি লেজার দিয়ে আটকে রাখা কুৎসিত মাংসপিণ্ডের মতো চতুর্মাত্রিক প্রাণীটির দিকে এগিয়ে গিয়ে হাত তুলে চিৎকার করে বলল, "এই যে চতুর্মাত্রিক প্রাণী—তোমরা নাকি নিনীষ স্কেলে পঞ্চম মাত্রার বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন প্রাণী? কাজকর্ম দেখে তো মনে হয় না— আহাম্মক কোথাকার! মেয়েটিকে ফিরিয়ে দিলে বেঁচে যেতে, এখন পুরো গ্রহ নিয়ে তোমরা ধ্বংস হও।" ত্রালুস হাত ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, "ধ্বংস হও— ধ্বংস হও—ধ্বংস হয়ে নরকে যাও!"

শুমান্তি ত্রালুসের কাছে গিয়ে তার হাত ধরে বলল, "আহ! কী পাগলামো করছ?"

ত্রালুস হেসে বলল, "সময়টা তো কাটাতে হবে। বিস্ফোরণ ঘটাতে এখনো এক মিনিট সময় বাকি। এক মিনিট সময় দীর্ঘ সময় তুমি জান?"

ত্রালুসের কথা শেষ হওয়ার আগেই হঠাৎ করে একটা আলোর বিচ্ছুরণ দেখা গেল, সাথে সাথে তাদের সামনে কুৎসিত মাংসপিণ্ডের মতো চতুর্মাত্রিক প্রাণীর একটা অংশ এসে হাজির হল। প্রাণীটি একবার দুলে ওঠে এবং হঠাৎ করে তার ভিতরে একটা কালো গহ্বরের মতো অংশ বের হয়ে আসে। সেখান থেকে প্রথমে আঠালো এক ধরনের তরল গড়িয়ে পড়ে এবং কিছু বোঝার আগেই তার ভিতর থেকে নিশি গড়িয়ে বের হয়ে আসে, তার সারা স্পেসস্যুট চটচটে আঠালো এক ধরনের তরলে মাখামাখি হয়ে আছে। যেরকম হঠাৎ করে প্রাণীটি এসেছিল সেরকম হঠাৎ করে সেটি অদৃশ্য হয়ে গেল। নিশি কোনোমতে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে, হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। কাছাকাছি একটা পাথর ধরে আবার সে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে মাথা তুলে তাকাল।

শুমান্তি হঠাৎ অপ্রকৃতিস্থের মতো হেসে বলল, "ত্রালুস, তোমার বকুনিতে কাজ হয়েছে!"

উত্তরে কেউ কিছু বলল না, কারো কিছু বলার নেই। ইরন মাথা ঠাণ্ডা রেখে চিন্তা করার চেষ্টা করে, চতুর্মাত্রিক প্রাণী নিশিকে সত্যিই ফিরিয়ে দিয়েছে। বিস্ফোরকের সাথে লাগানো টাইমারটিকে এখন বিকল করা গেলে সবাই বেঁচে যেত। তার আর সময় নেই। পুরো ব্যাপারটি আসলে একটি নিদারুণ রসিকতার মতো হয়ে গেল। অত্যন্ত নিষ্ঠুর একটি রসিকতা।

ত্রালুস ফ্যাকাসে মুখে বলল, "এখন আমরা কী করব ইরন?"

ইরন একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "করার বিশেষ কিছু নেই। তবু চেষ্টা করে দেখা যাক। আমি আর শুমান্তি লেজারগুলো বন্ধ করে প্রাণীটিকে মুক্ত করে দিই। তুমি চেষ্টা করে দেখ বিস্ফোরকের টাইমারকে বিকল করতে পার কি না।"

"ঠিক আছে।"

ত্রালুস ছুটে যেতে যেতে শুনল, ইরন বলছে, "আমাদের হাতে সময় মাত্র আটচল্লিশ সেকেন্ড।"

লেজার তিনটি বন্ধ করামাত্রই প্রাণীটি তার আকৃতি পরিবর্তন করে প্রথমে ছোট হতে হতে একসময় অদৃশ্য হয়ে গেল। এই পুরো গ্রহটিতে এখন শুধুমাত্র চার জন মানুষ—চারজন অসহায় ত্রিমাত্রিক মানুষ।

ইরন জেট প্যাকের কাছে ছুটে গেল, সেখানে ত্রালুস খুব সাবধানে বিস্ফোরকটি আলাদা করে টাইমারের দিকে একটি বিচিত্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ইরনকে দেখে মাথা নেড়ে বলল, "অসম্ভব, দুই থেকে তিন মিনিটের আগে এই টাইমার বন্ধ করার কোনো উপায় নেই।"

ইরন হঠাৎ কেমন জানি দুর্বল অনুভব করে, সবকিছু কেমন যেন অর্থহীন মনে হতে থাকে। সে পূর্ণ দৃষ্টিতে একবার শুমান্তির দিকে আরেকবার ত্রালুসের দিকে তাকাল। নিশি টলতে টলতে এগিয়ে আসছে, সে কিছু জানে না, একদিক দিয়ে সেটি চমৎকার একটি ব্যাপার। ইরন কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই ত্রালুস একটি বিচিত্র দৃষ্টিতে ইরনের দিকে তাকিয়ে বলল, "এখন শুধুমাত্র একটি জিনিসই আমরা করতে পারি।"

ইরন চমকে উঠল, বলল, "কী জিনিস?"

"সেটা বলতে গেলে সময় নষ্ট হবে। কাজেই আমি বলছি না, আমি করছি, তোমরা দেখ।"

ত্রালুস এগিয়ে গিয়ে টাইমার লাগানো ভারী বিস্ফোরকটি কষ্ট করে হাতে তুলে নেয়, তারপর সে ছুটতে শুরু করে। ইরন অবাক হয়ে চিৎকার করে বলল, "কী করছ তুমি? ত্রালুস, তুমি কী করছ?"

ত্রালুস একমুহূর্তের জন্য থেমে বলল, "আমি এই বিস্ফোরকটি সরিয়ে নিচ্ছি, ত্রিশ সেকেন্ড সময়ের ভিতরে ওই বড় পাথরটির আড়ালে যদি বিস্ফোরকটি নিতে পারি বিস্ফোরণের পুরো ধাক্কাটি পাথরটা নিয়ে নেবে। তোমরা বেঁচে যাবে।"

"আর তুমি?"

ত্রালুস ইরনের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বিস্ফোরকটি নিয়ে আবার ছুটতে শুরু করে। ছুটতে ছুটতে চিৎকার করে বলে, "বিদায়।" শুমান্তি হতচকিতের মতো একবার ত্রালুসের দিকে তাকাল, আরেকবার ইরনের দিকে তাকাল, তারপর দ্রুত গলায় বলল, " ত্রালুস ঠিকই বলেছে, এটিই একমাত্র সমাধান। বিদায়।"

ইরন কিছু বোঝার আগেই অবাক হয়ে দেখল শুমান্তিও ত্রালুসের দিকে ছুটে যাচ্ছে, ছুটে যেতে যেতে বলল, " ত্রালুস একা এত বড় বিস্ফোরক এত দূরে নিতে পারবে না। আমিও সাহায্য করি।"

ইরন চিৎকার করে বলল, "কী করছ তোমরা? কী করছ?"

শুমান্তি ছুটে গিয়ে ত্রালুসকে জড়িয়ে ধরে। তারপর দুজন জড়াজড়ি করে বিস্ফোরকটি টেনে নিতে থাকে। এত দূর থেকেও টাইমারের প্যানেলটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এটি বিস্ফোরিত হতে আর মাত্র পনের সেকেন্ড বাকি।

ইরন চিন্তা করতে পারছিল না, কী করবে বুঝতে পারছিল না, ঠিক তখন নিশি এসে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "আমাকে ধর, দোহাই তোমার আমাকে একটু ধর।"

"কেন নিশি? কী হয়েছে তোমার?"

"আমার ভয় করছে। খুব ভয় করছে। আমাকে শক্ত করে ধরে রেখো—আমাকে ছেড়ে দিও না। দোহাই তোমার। আমাকে ছেড়ে দিও না।"

ইরন নিশিকে শক্ত করে ধরে রেখে দূরে তাকাল। এই অপরিচিত গ্রহের একটি বিশাল পাহাড়ের আড়ালে ত্রালুস আর শুমান্তি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, দুজনে মিলে একটি বিস্ফোরককে শক্ত করে ধরে রেখেছে। তার থেকেও শক্ত করে ওরা একজন আরেকজনকে ধরে রেখেছে। আর কয়েক সেকেন্ড পর যে বিস্ফোরণটি ঘটবে সেই বিস্ফোরণ কি তাদের ছিন্নভিন্ন করে আলাদা করে দেবে না?

ইরন নিশির অচেতন দেহকে ধরে রেখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বিচিত্র এই গ্রহটিতে একটি ঝড়ো বাতাস শুরু হয়েছে। বাতাসের ঝাপটায় বেগুনি রঙের ধুলো উড়ছে, মানুষের কান্নার মতো করুণ এক ধরনের শব্দ শোনা যাচ্ছে, বাতাসের প্রবাহে পাথরের গা থেকে এই শব্দ আসছে। শব্দ শুনে মনে হচ্ছে কেউ যেন ইনিয়েবিনিয়ে কাঁদছে।

ইরন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের হৃৎস্পন্দন শুনতে পায়। আর কয়টি হৃৎকম্পন শেষ হবার পর প্রচণ্ড বিস্ফোরণে এই গ্রহটি কেঁপে উঠবে? ইরন নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

৫

পৃথিবী

পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের বিশাল স্ক্রিনের সামনে বৃদ্ধ মানুষটি দুই হাত বুকের কাছাকাছি ধরে রেখে নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। স্ক্রিনের উপর বড় ঘড়িটিতে এইমাত্র সে দেখতে পেয়েছে দশ সেকেন্ড সময় পার হয়ে গেছে। বৃহস্পতি গ্রহের কাছাকাছি যে মহাকাশযানটি একটি ওয়ার্মহোল তৈরি করে বের হয়ে গেছে সেটি যদি তার দায়িত্ব শেষ করতে পারে তা হলে সেটি দশ সেকেন্ডের মাঝে ফিরে আসবে। মহাকাশযানটি ফিরে আসে নি, অভিযানটি ব্যর্থ হয়েছে। বৃদ্ধ মানুষটি বুকের মাঝে আটকে রাখা নিশ্বাসটি বের করে দিয়ে একটি কুৎসিত গালি দিল।

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মধ্যবয়স্ক মানুষটি মাথা ঘুরিয়ে বৃদ্ধ মানুষটির দিকে তাকিয়ে শীতল গলায় বলল, "তুমি এখানে দাঁড়িয়ে এ রকম খিস্তি করবে জানলে তোমাকে কখনোই এখানে আসতে দিতাম না।"

বৃদ্ধ মানুষটি দ্বিতীয়বার একটি গালি দিয়ে বলল, "এত কষ্ট করে ওয়ার্মহোল তৈরি করা হল—এক বছর শুধু ইরন নামের মানুষটির পিছনেই খরচ করা হয়েছে। অ্যাকসিডেন্ট করে পুরো পরিবারকে খুন করা হল কীশা মেয়েটাকে রোবট বানানোর জন্য। আর জিনেটিক কোডে নিখুঁত মেয়েটার জন্য কত দিন ধরে কাজ করছি সেটার কথা তো ছেড়েই দাও।"

মধ্যবয়স্ক মানুষটি দাঁত খিঁচিয়ে বলল, "তুমি চুপ করবে? চুপ করবে তুমি?"

বৃদ্ধ মানুষটি রেগে গিয়ে বলল, "কেন চুপ করব? কেন চুপ করব আমি? পুরো বিজ্ঞান একাডেমির চোখে ধুলা দিয়ে এই প্রজেক্ট দাঁড় করিয়েছ, বলেছ চতুর্মাত্রিক জগতের প্রযুক্তি নিয়ে আসবে, আর এখন?"

মধ্যবয়স্ক মানুষটির ফরসা গালে হঠাৎ ছোপ ছোপ লাল রং ফুটে ওঠে, ভয়ঙ্কর ক্রোধে ফেটে পড়তে গিয়ে হঠাৎ করে সে থেমে যায়। বিশাল স্ক্রিনে একটা ছোট বিন্দু ফুটে উঠেছে, ওয়ার্মহোলের ভিতর দিয়ে মহাকাশযানটি বের হয়ে আসছে অস্বাভাবিক গতিতে, তার পিছনে ওয়ার্মহোলটি বন্ধ হয়ে আসছে, প্রচণ্ড আলোর বিকিরণে চোখ ধাঁধিয়ে যায় ওদের।"

বৃদ্ধ মানুষটি স্ক্রিনটির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠে তারপর দুই হাত তুলে চিৎকার করে বলল, "আমরা করেছি! অসাধ্য সাধন করেছি! চতুর্মাত্রিক জগতের প্রযুক্তি নিয়ে এসেছি!"

"হ্যাঁ, এনেছি। বিশ্বাস হল এখন?"

"হয়েছে। বিশ্বাস হয়েছে।" বৃদ্ধ মানুষটি দাঁত বের করে হেসে বলল, "এখন আমরা পৃথিবীর ইতিহাস নতুন করে লিখব।"

"হ্যাঁ। নতুন করে লিখব।"

"কেউ আমাদের থামাতে পারবে না।"

"না পারবে না। কেউ আমাদের প্রযুক্তি নিয়ে প্রশ্ন করতে পারবে না।"

"আধা রোবট মেয়েটাকে সেভাবেই প্রোগ্রাম করা হয়েছে?"

"হ্যাঁ। এই মুহূর্তে যারা যারা বেঁচে আছে সে তাদের খুন করে ফেলছে! তারপর নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবে। মূল মহাকাশযানটি যখন নামবে তখন সেখানে কোনো জীবিত প্রাণী থাকবে না।"

"কোনো ত্রিমাত্রিক জীবিত প্রাণী থাকবে না।" বৃদ্ধ মানুষটি আনন্দে হা হা করে হাসতে থাকে।

মধ্যবয়স্ক মানুষটিও হাসিতে যোগ দেয়। "হ্যাঁ কোনো ত্রিমাত্রিক জীবিত প্রাণী থাকবে না।"

দুজন আনন্দে হাসতে হাসতে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকে, সেখানে মহাকাশযানটি ধীরে ধীরে বড় হতে শুরু করেছে। আর আটচল্লিশ ঘণ্টার মাঝেই ওটা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ভিতর প্রবেশ করবে!

বৃদ্ধ মানুষটি তার পাকা চুলের ভিতর আঙুল প্রবেশ করিয়ে খিকখিক করে হাসতে হাসতে হঠাৎ একটু চিন্তিত হয়ে পড়ে। সে মাথা ঘুরিয়ে মধ্যবয়স্ক মানুষটির দিকে তাকিয়ে বলল, "সেটি যদি ঠিক করে নামতে না পারে? নামতে গিয়ে যদি ধ্বংস হয়ে যায়?"

"তাতে কিছু আসে-যায় না, এক হিসাবে বরং সেটি আরো ভালো, পুরো মহাকাশযানটি ধ্বংস হয়ে যাবে—কোনো কিছুর কোনো প্রমাণ থাকবে না! আর্কাইভ ঘরে যে ভল্টটি আছে সেটি কিছুতেই ধ্বংস হবে না। ওর ওপর নিউক্লিয়ার বোমা ফাটালেও ওটার কিছু হবে না। আমরা যেটা চাইছি সেটা ঠিক ঠিক পৃথিবীতে নেমে আসবে। আর্কাইভ ঘরের জন্য পুরোপুরি আলাদা নিয়ন্ত্রণ, ইঞ্জিন, নিরাপত্তা ব্যবস্থা সবকিছু আছে! আমাদের এই প্রজেক্টে কোনো খুঁত নেই!"

বৃদ্ধ মানুষটি তার কুতকুতে চোখ ছোট করে আবার আনন্দে হাসতে থাকে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com ~

শেষ পর্ব

১

নিশি তার বাম হাত দিয়ে কাচের গ্লাস থেকে ঈষৎ গোলাপি রঙের পানীয়টুকু চুমুক দিয়ে খেয়ে বলল, "দেখেছ? আমি এখন বাম হাতের মানুষ হয়ে গেছি। সব কাজ এখন বাম হাত দিয়ে করতে পারি। ডান হাতে জোর নেই।"

ইরন ভুরু কুঁচকে বলল, "তুমি বলছ আগে তুমি সব কাজ ডান হাত দিয়ে করতে, এখন বাম হাত দিয়ে কর?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি বুকে হাত দিয়ে দেখ তো তোমার হৃৎপিণ্ড কোনদিকে, ডানদিকে না বামদিকে।"

নিশি হেসে বলল, "হৃৎপিণ্ড তো বামদিকেই থাকবে।"

"তুমি হাত দিয়ে দেখ না কোন দিকে স্পন্দন হচ্ছে!"

"কী বলছ তুমি ইরন! তুমি ভুলে গেছ আমি জিনেটিক কোডিঙে পৃথিবীর সবচেয়ে নিখুঁত মানুষ? আমার মাঝে কোনো ত্রুটি নেই। আমার হৃৎপিণ্ড অবশ্যই বামদিকে।"

"আহা—দেখই না একবার পরীক্ষা করে।"

নিশি হাসি চেপে তার বুকে হাত দেয় এবং হঠাৎ করে তার মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়। সে ভয় পাওয়া গলায় বলল, "সে কী!"

ইরন চোখ মটকে বলল, "দেখেছ?"

নিশি তখনো বিশ্বাস করতে পারে না, কাঁপা গলায় বলল, "সত্যিই দেখি আমার হৃৎপিণ্ড ডানদিকে।"

"আমি তাই ভেবেছিলাম।"

"কিন্তু বিশ্বাস কর, আমি জানতাম আমার হৃৎপিণ্ড বামদিকে। আমি একেবারে নিশ্চিতভাবে জানতাম—"

"আমি তোমার কথা অবিশ্বাস করছি না নিশি। সত্যি তুমি ডান হাতের মানুষ ছিলে, তোমার হৃৎপিণ্ড বামদিকে ছিল—কিন্তু তোমাকে যখন চতুর্মাত্রিক প্রাণীরা তাদের জগতে নিয়ে গেছে তাড়াহুড়োর মাঝে তোমাকে উল্টো করে ফেরত দিয়েছে! আয়নায় যেরকম প্রতিবিম্ব হয় সেরকমভাবে। কে জানে হয়তো ইচ্ছে করেই এভাবে ফেরত দিয়েছে—একটা প্রমাণ হিসেবে।"

"আমি বুঝতে পারছি না তুমি কী বলছ। কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"বুঝিয়ে দিচ্ছি—তার আগে চল দেখে আসি স্কাউটশিপটার কী অবস্থা।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"চল।"

ইরনের পিছু পিছু নিশি মহাকাশযানের করিডোর ধরে হেঁটে যেতে থাকে। একটু পরে পরে সে বুকে হাত দিয়ে নিজের হৃৎপিণ্ডের কম্পন অনুভব করছে। এখনো সে বিশ্বাস করতে পারছে না যে তাকে আয়নার প্রতিবিম্ব হিসেবে ফেরত দিয়েছে! সে আর আগের নিশি নেই—নিশির প্রতিবিম্ব!

স্কাউটশিপের দরজা খুলতেই দেখা গেল কন্ট্রোল প্যানেলে ঝুঁকে পড়ে ত্রালুস কিছু একটা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছে। ইরনকে দেখে বলল, "আমি দুঃখিত ইরন, একটু দেরি হয়ে গেল। তুমি চিন্তা কোরো না, আমি কিছুক্ষণের মাঝে সব ঠিক করে দেব।"

স্কাউটশিপের পিছনে দাঁড়ানো শুমান্তি খিলখিল করে হেসে বলল, "ইরনকে বলবে না কেন তোমার দেরি হল?"

ইরন হাত নেড়ে বলল, "বলতে হবে না। তোমাদের দুজনের আসলে সাতখুন মাপ! সত্যি বলতে কী সাত নয়, সাত-সাতে উনপঞ্চাশ খুন মাপ।"

"কেন?"

"কারণ, তোমাদের জীবন্ত ফিরে আসার কথা ছিল না। চতুর্মাত্রিক প্রাণীরা যদি শেষ মুহূর্তে তোমাদের হাত থেকে বিস্ফোরকটা নিয়ে না নিত—তোমরা এখানে থাকতে না! এখনো আমি যখন ব্যাপারটা চিন্তা করি আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।"

শুমান্তি নরম গলায় বলল, "আমারও বিশ্বাস হচ্ছে না।"

ত্রালুস হেসে বলল, "আমার কিন্তু বেশ ভালোই বিশ্বাস হচ্ছে। জীবনের প্রথম সত্যিকার জুয়া খেলা, সেই জুয়ায় জিতে গেলাম!"

ইরন মাথা নেড়ে বলল, "এটাই যেন তোমার প্রথম এবং শেষ জুয়া হয়!"

স্কাউটশিপের দরজা খুলে বের হতে গিয়ে ইরন আবার থেমে গেল, বলল, "তোমরা জান নিশির কী হয়েছে?"

শুমান্তি এবং ত্রালুস এগিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী?"

নিশি মুখ কালো করে বলল, "আমি উল্টে গেছি। আমার ডান হাত ডান পা—বাম হাত বাম পা হয়ে গেছে। আমার হৃৎপিণ্ড উল্টোদিকে—"

"কী বলছ তুমি?"

"হ্যাঁ, আমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না, কিন্তু সত্যি সত্যি আয়নার প্রতিবিম্বের মতো হয়ে গেছি।"

ত্রালুস ভুরু কুঁচকে বলল, "কেমন করে হল?"

"চতুর্মাত্রিক জগতে।"

"আমি বুঝতে পারছি না", ত্রালুস মাথা নাড়ল, "আমি বুঝতে পারছি না মানুষ কেমন করে তার প্রতিবিম্ব হয়ে যায়!"

"আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি।" বলে ইরন একটা টেবিলের কাছে এগিয়ে যায়। পকেট থেকে একটা পাতলা কার্ড বের করে টেবিলের উপর রেখে বলল, "মনে কর টেবিলের উপরটা হচ্ছে দ্বিমাত্রিক জগৎ, আর এই কার্ডটা হচ্ছে দ্বিমাত্রিক জগতের প্রাণী।" ইরন কার্ডটাকে ডানে-বামে নাড়িয়ে বলল, "এই প্রাণীটা দ্বিমাত্রিক জগতে যেখানে ইচ্ছে যেতে পারে, কিন্তু কখনো একটা জিনিস করতে পারে না—সেটা হচ্ছে উল্টে যাওয়া। তাকে উল্টাতে হলে—" ইরন কার্ডটিকে উপরে তুলে উল্টে নিয়ে টেবিলের উপর রেখে বলল, "ত্রিমাত্রিক জগতকে ব্যবহার করতে হয়।"

AMARBOI.COM

শুমান্তি মাথা নাড়ল, বলল, "বুঝেছি। ঠিক সেরকম ত্রিমাত্রিক জগতে মানুষ কখনো তার প্রতিবিম্বে পাল্টাতে পারে না কিন্তু চতুর্মাত্রিক জগতে সেটা পানির মতো সোজা।"

ত্রালুস চোখ মটকে বলল, "তার মানে নিশিকে আবার সোজা করতে হলে চতুর্মাত্রিক জগতে ফেরত পাঠাতে হবে?"

নিশি মাথা নেড়ে বলল, "দোহাই তোমাদের আমাকে ফেরত পাঠিও না। আমি প্রতিবিম্ব হয়েই খুব ভালো আছি। কোনো সমস্যা নেই আমার।"

সবাই হো হো করে হেসে উঠল। ইরন নিশির মাথার কালো রেশমের মতো চুল এলোমেলো করে দিয়ে বলল, "আমারও তাই ধারণা।"

ইরন স্কাউটশিপ থেকে বের হয়ে আসে, তাদের পিছু পিছু ত্রালুস এবং শুমান্তিও বের হয়ে আসে। ত্রালুস তার নিও পলিমারের পোশাকে নিজের কালিমাখা হাত মুছতে মুছতে বলল, "আর্কাইভ ঘরের ভল্টে কী রেখেছি দেখবে না?"

ইরন ভুরু কুঁচকে বলল, "ভল্টে কিছু রেখেছ?"

"রাখব না?" ত্রালুস হাসি চেপে রেখে বলল, "এত কোটি কোটি ইউনিট খরচ করে এত মানুষজনকে খুন করে, জীবন ধ্বংস করে একটি মহাকাশ অভিযান পাঠিয়েছে ভল্টে করে চতুর্মাত্রিক জগৎ থেকে কিছু আনার জন্য—সেটা খালি রাখি কেমন করে?"

"কী রেখেছ?"

"আমাদের এই মহাকাশযানে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে জান?"

"জানি।"

"জিনেটিক কোডিং দিয়ে একটার সাথে আরেকটা জুড়ে দেওয়া যায়। আমি প্রায় সতেরটা হাত, ছয়টা পা, পঞ্চাশটার মতো চোখ, কিছু যকৃৎ, কয়েকটা হৃৎপিণ্ড, কিডনি একসাথে জুড়ে দিয়েছি—"

ইরন চোখ কপালে তুলে বলল, "কী করেছ? একসাথে জুড়ে দিয়েছ?"

"হ্যাঁ! সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায় সেগুলো কিলবিল করে নড়তে থাকে, কাছাকাছি যেটাই পায় হাত সেটাকেই ধরে ফেলে, পা-গুলো সবচেয়ে ভয়ঙ্কর, দমাদম লাথি কষিয়ে দিচ্ছে! চোখগুলো ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে। থলথলে যকৃৎ, নড়তে থাকা হৃৎপিণ্ড, সব মিলিয়ে একটা ভয়ানক জিনিস!"

ইরন অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে ত্রালুসের দিকে তাকিয়ে থাকে, ত্রালুস হা হা করে হেসে বলল, "পৃথিবীর ঐ বদমাইশ মানুষগুলো যখন আর্কাইভ ঘরের ভল্ট খুলবে তখন সেখান থেকে ওটা কিলবিল করে বের হয়ে আসবে। কী মজা হবে বুঝতে পারছ?"

ইরন মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ, বুঝতে পারছি।"

শুমান্তি খিলখিল করে হেসে বলল, "সবচেয়ে মজার ব্যাপার কী জান?"

"কী?"

"মানুষগুলো মনে করবে সত্যিই ওটা চতুর্মাত্রিক প্রাণী। ওটা নিয়েই হয়তো বছরের পর বছর গবেষণা করবে!"

"ঠিকই বলেছ। আমরা যদি ধরা পড়ে যাই তা হলে অন্য কথা।"

ত্রালুস মাথা নেড়ে মুখ শক্ত করে বলল, "আমরা ধরা পড়ব না। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢোকার সময় বাতাসের ঘর্ষণে পুরো মহাকাশযান ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে—এর নানা অংশ পৃথিবীতে ছিটিয়ে পড়বে! স্কাউটশিপটার মাঝে থাকব আমরা—কেউ জানবে না!"

"হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ, ভাগ্য যদি নেহায়েৎ আমাদের বিপক্ষে না থাকে, আমাদের কেউ ধরতে পারবে না।"

শুমান্তি একটু হেসে বলল, "যদি ভাগ্যের কথা বল, তা হলে কেউ অস্বীকার করবে না যে আমাদের মতো ভাগ্য পৃথিবীতে কারো নেই।"

নিশি মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিকই বলেছ তোমরা। বিশেষ করে আমার ভাগ্য। পুরোপুরি উল্টে গিয়েও বেঁচে আছি!"

সবাই হঠাৎ হো হো করে হেসে ওঠে। ত্রালুস হাসি থামিয়ে বলল, "ভাগ্যের কথাই যদি বল তা হলে সম্ভবত আমি আর শুমান্তি সবার উপরে! ক্লোন হিসেবে আমাদের ব্যাকটেরিয়ার মতো মারা যাবার কথা ছিল! অথচ আমরা চেষ্টা করেও মারা যেতে পারছি না!"

শুমান্তি মাথা নাড়ল, বলল, "বেঁচে থাকাটা আমার সেরকম ভাগ্যের ব্যাপার মনে হচ্ছে না। আমার মনে হচ্ছে তোমাদের মতো চমৎকার মানুষের সাথে পরিচয় হওয়াটা আমার সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য!"

ইরন নরম গলায় বলল, "সেই সৌভাগ্য আমাদের সবার।" ইরনের গলায় কিছু একটা ছিল যে কারণে সবাই হঠাৎ চুপ করে যায়। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে ইরন হেঁটে হেঁটে একটা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দূরে নীল পৃথিবীকে দেখা যাচ্ছে। যখন সেখানে ছিল বুঝতে পারে নি, দূর থেকে সেটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ করে সে এই গ্রহটার জন্য, এই গ্রহের মানুষের জন্য গভীর ভালবাসা অনুভব করে। সে একটা নিশ্বাস ফেলে অন্যদের দিকে ঘুরে তাকাল, বলল, "আমরা পৃথিবীর কাছাকাছি চলে আসছি। সবার মনে হয় প্রস্তুত হওয়া দরকার।"

AMARBOI.COM

শেষ কথা

চতুর্মাত্রিক প্রাণীদের জগৎ থেকে ফিরে আসা মহাকাশযানটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার সময় বিধ্বস্ত হয়ে যায়। মহাকাশযানটির মাঝামাঝি রেখে দেওয়া বিস্ফোরকগুলো বিস্ফোরিত হয়ে সেখানে একটা বড় গর্ত তৈরি করেছিল। মহাকাশযানের বাতাস বের হওয়ার সময় গতিপথ পরিবর্তন করে ধ্বংস হয়ে গেছে। ধ্বংস হয়ে যাওয়া মহাকাশযানের নানা অংশ পৃথিবীর নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে, স্কাউটশিপটি বিধ্বস্ত হয়েছিল দক্ষিণের পার্বত্য এলাকায়। উদ্ধারকারী দল স্কাউটশিপটিকে উদ্ধার করতে পারে নি, সেটি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। উদ্ধারকারী দল সেই নির্জন পার্বত্য এলাকায় চার জনের ছোট একটি ভ্রমণকারী দলকে দেখতে পায়। প্রত্যক্ষদর্শী সেই ভ্রমণকারীরা বলেছে, স্কাউটশিপটিতে সম্ভবত কেউ ছিল না—কারণ সেটি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায় পাহাড়ে আঘাত করে ধ্বংস হয়ে গেছে। ভ্রমণকারী ছোট দলটি এত বড় একটি বিস্ফোরণ দেখেও বিশেষ বিচলিত হয় নি। পার্বত্য এলাকায় তারা আরো কিছুদিন সময় কাটানোর জন্য রয়ে গেছে। উদ্ধারকারী দল ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করে নি, দুজন তরুণ-তরুণী একজন অপরূপ সুন্দরী কিশোরী এবং তাদের দলনেতা

এই স্কাউটশিপে করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্য পাশ থেকে ঘুরে এসেছে। সত্যি কথা বলতে কী, এ ধরনের কোনো সম্ভাবনা থাকতে পারে সেটি জানার মতো মানুষও পৃথিবীতে তখন কেউ নেই।

ইরন, ত্রালুস, শুমান্তি এবং নিশি পৃথিবীতে আবার তাদের জীবন শুরু করেছে। পৃথিবীর হিসেবে তারা তিন–চার দিনের জন্য অনুপস্থিত ছিল, আবার জীবন শুরু করার কোনো সমস্যা হয় নি। ত্রালুস এবং শুমান্তি সৌরশক্তির একটি কারখানায় কাজ নিয়েছে। পরিচয়হীন দুজন মানুষের রেজিস্ট্রেশনের জন্য কিছু কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে, কিন্তু যেটুকু সমস্যা হওয়ার কথা ছিল সেটুকু হয় নি। কারণটি এখনো কারো জানা নেই। ত্রালুস এবং শুমান্তি আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো ঘোষণা করে নি, কিন্তু ইরন মোটামুটি নিশ্চিত তারা জীবনের সঙ্গী হিসেবে একজন আরেকজনকেই বেছে নেবে।

ইরন আবার তার গবেষণা কেন্দ্রে যোগ দিয়েছে। তার যেসব কাজ পুরোপুরি ব্যর্থতা বলে পরিচিত হয়েছিল হঠাৎ করে সেগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে বিবেচিত হচ্ছে। ওয়ার্মহোলের ওপর তার গবেষণাটি কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান একাডেমি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে নিয়েছে। গবেষণাটি পরীক্ষা করে দেখার জন্য প্রয়োজনীয় ইউনিট বরাদ্দ করা হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

ইরন প্রজেক্ট আপসিলন নিয়ে তথ্য কেন্দ্রে একটু খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করেছিল কিন্তু বিশেষ কোনো তথ্য পায় নি। তবে বিজ্ঞান একাডেমিকে প্রতারণা করে একটি অনৈতিক বেআইনি এবং মহাকাশ অভিযান পরিচালনা করার জন্য মহাকাশ কেন্দ্রের দুজন বড় কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে একটি বুলেটিন চোখে পড়েছে। একজন বৃদ্ধ এবং অন্য একজন মধ্যবয়স্ক কর্মকর্তা ঠিক কী ধরনের অনৈতিক অভিযান পরিচালনা করেছে সে সম্পর্কে কিছু লেখা হয় নি, কিন্তু ইরন মোটামুটি নিঃসন্দেহ তারা প্রজেক্ট আপসিলনের সঙ্গে জড়িত। ব্যাপারটি নিয়ে একটি তথ্য–অনুসন্ধান কমিটি কাজ শুরু করেছে। ইরন লাল তারকাযুক্ত একটি চিঠি পেয়েছে যেখানে তার কাছ থেকে সহযোগিতা আহ্বান করা হয়েছে। ইরন তথ্য–অনুসন্ধান কমিটিকে জানিয়েছে তাদেরকে সহযোগিতা করার মতো কোনো তথ্য তার জানা নেই।

ইরন সম্ভবত পুরো ব্যাপারটি প্রকাশ করে দিত কিন্তু একটি বিশেষ কারণে সেটি গোপন রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কারণটির সাথে নিশির একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

পৃথিবীতে ফিরে আসার কিছুদিন পর ইরন নিশির সাথে দেখা করতে গিয়েছিল। তাকে দেখে নিশি অত্যন্ত খুশি হয়ে ছুটে এসেছিল। ইরন তার জন্য উপহার হিসেবে জেড পাথরের তৈরি হরিণের একটি ছোট মূর্তি এনেছিল। পকেট থেকে বের করে সে যখন মূর্তিটা নিশির দিকে এগিয়ে দিল, নিশির চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে যায়। "ইস্! কী সুন্দর" বলে মূর্তিটা নেওয়ার জন্য নিশি তার হাত বাড়িয়ে দিল।

ইরন চমকে উঠল। কারণ নিশি তার যে হাতটি বাড়িয়ে দিয়েছে সেটি ছিল তার ডান হাত।

নির্ঘণ্ট

১.	রড	চোখের রেটিনার আলোসংবেদী কোষ, যেগুলো অত্যন্ত অল্প আলোতে কাজ করতে পারে।
২.	বিতানীন	এক ধরনের নেশাজাত দ্রব, যেটি রক্তস্রোতে মিশে গেলে আনন্দের অনুভূতি হয় (কাল্পনিক)।
৩.	হলোগ্রাফিক	আলোর ব্যতিচার ব্যবহার করে ত্রিমাত্রিক দৃশ্য সৃষ্টি করার বিশেষ উপায়।
৪.	টুরিন টেস্ট	মানুষ এবং কম্পিউটারের মাঝে পার্থক্য করার একটি বিশেষ পরীক্ষা যেটি কম্পিউটারবিজ্ঞানী টুরিন উদ্ভাবন করেছিলেন।
৫.	ওয়ার্মহোল	দুটি ভিন্ন স্থান এবং সময়ের ক্ষেত্রকে সংযোজিত করে রাখা এক ধরনের গর্ত।
৬.	আপসিলন	গ্রীক বর্ণমালার একটি অক্ষর।
৭.	রেটিনা স্ক্যান	মানুষের পরিচয় নির্ধারণের জন্য চোখের রেটিনার প্রতিচ্ছবি বিশ্লেষণ।
৮.	ক্রিস্টাল ডিস্ক	নিখুঁত ক্রিস্টালের ভিতর অণুকে প্রতিসরিত করে তথ্য সংরক্ষণের বিশেষ পদ্ধতি (কাল্পনিক)।
৯.	ক্লোন	কোষের ক্রোমোজমকে ব্যবহার করে কৃত্রিম উপায়ে অবিকলভাবে একটি প্রাণীর সৃষ্টি করা।
১০.	ট্রাকিওশান	অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র যেটি শরীরের রক্তস্রোতে ভেসে বেড়াতে পারে এবং ইলেকট্রনিক সঙ্কেত পাঠিয়ে মূল তথ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ রাখতে পারে (কাল্পনিক)।
১১.	এস্টরয়েড বেল্ট	মঙ্গল গ্রহের পরে এবং বৃহস্পতির আগে গ্রহকণার কক্ষপথ।
১২.	কপোট্রন	রোবটের মস্তিষ্ক (কাল্পনিক)।
১৩.	নিও পলিমার	বিশেষ পলিমার দ্বারা তৈরী বস্ত্র (কাল্পনিক)।
১৪.	কার্টিলেজ	কোমল হাড়।
১৫.	রবোট	যন্ত্রমানব।
১৬.	এন্টি ম্যাটার	প্রতিপদার্থ যেটি পদার্থের সংস্পর্শে এলে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।
১৭.	গামা	বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গে ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের শক্তিশালী অংশটুকু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮.	আয়োনিত	অণু পরমাণু থেকে ইলেকট্রনকে বিচ্ছিন্ন করার পরের অবস্থা।
১৯.	গ্যালাক্সী	অসংখ্য নক্ষত্রের সমষ্টি।
২০.	ব্ল্যাকহোল	কোনো নক্ষত্রের ভর চন্দ্রশেখর সীমা থেকে বেশি হলে শেষ পর্যায়ে সেটি ব্ল্যাকহোলে পরিণত হয়। ব্ল্যাকহোল থেকে আলোও বের হয়ে আসতে পারে না।
২১.	কোয়াজার	অত্যন্ত উজ্জ্বল আলোর এক ধরনের দূরবর্তী নক্ষত্র।
২২.	হোয়াইট ডোয়ার্ফ	চন্দ্রশেখর সীমার অন্তর্বর্তী সাধারণ নক্ষত্রের শেষ পরিণতি।
২৩.	ডকিং বে	মহাকাশযানে অন্য মহাকাশযান যোগাযোগ করার জন্য নির্দিষ্ট স্থান (কাল্পনিক)।
২৪.	রি-সাইকেল :	এক জিনিসকে অনেকবার ব্যবহার করার পদ্ধতি।
২৫.	বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ :	রেডিও তরঙ্গ, অবলাল, দৃশ্যমান, অতিবেগুনি এক্স-রে ও গামা রে যে তরঙ্গের অংশ।
২৬.	ডি. এন. এ.	ডি অক্সি রাইবো নিউক্লিক এসিড, প্রাণিজগতের জিনস যেটি দিয়ে তৈরি।
২৭.	নিনীষ স্কেল	বুদ্ধিমত্তা পরিমাপ করার বিশেষ স্কেল (কাল্পনিক)।
২৮.	স্কাউটশিপ	মূল মহাকাশযান থেকে কোথাও ছোট অভিযানে বা তথ্য অনুসন্ধানে ব্যবহারের জন্য ক্ষুদ্রকায় মহাকাশযান।
২৯.	অবলাল	ইনফ্রা রেড আলো, দৃশ্যমান আলো থেকে দীর্ঘতর তরঙ্গদৈর্ঘ্য।
৩০.	চতুর্মাত্রিক	আমাদের পরিচিত ত্রিমাত্রিক জগৎ থেকে আরো একটি বেশি মাত্রার জগৎ।
৩১.	গেলিয়াম	এক ধরনের ধাতু।
৩২.	আর্সেনাইড	সেমি কন্ডাক্টর শিল্পে ব্যবহৃত বিশেষ পদার্থ।
৩৩.	ক্রমোজম	প্রাণীর বৈশিষ্ট্য বহনকারী যে অংশ কোষের নিউক্লিয়াসে অবস্থান করে।
৩৪.	নিউরন	মস্তিষ্কের কোষ।
৩৫.	সিনাপ্স	একটি নিউরন অন্য নিউরনের সাথে যে অংশ দিয়ে যোগাযোগ করে।
৩৬.	বিকন	সঙ্কেত প্রদানকারী বিশেষ যন্ত্র (কাল্পনিক)।
৩৭.	লেজার	বিশেষ পদ্ধতিতে আলোর বর্ধিত শক্তির তীব্র আলো।

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০০০

AMARBOI.COM

শাহনাজ ও ক্যাপ্টেন ডাবলু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১

পরীক্ষার হল থেকে বের হয়ে শাহনাজ হেঁটে হেঁটে স্কুলের এক কোনায় লাইব্রেরি বিল্ডিঙের সিঁড়িতে পা ছড়িয়ে বসল। তার পরীক্ষা শেষ, এখন তার মনে খুব আনন্দ হওয়ার কথা। এতদিন যে হাজার হাজার ফরমুলা মুখস্থ করে রেখেছিল এখন সে ইচ্ছে করলে সেগুলো ভুলে যেতে পারে। বড় বড় রচনা, নোট করে রাখা ব্যাখ্যা, গাদা গাদা উপপাদ্য, প্রশ্নের উত্তরের শত শত পৃষ্ঠা মাথার মাঝে জমা করে রেখেছিল; যেগুলো সে পরীক্ষার হলে একটার পর একটা উগলে দিয়ে এসেছে—এখন সে তার সবগুলো মস্তিষ্ক থেকে উধাও করে দেবে, কোনোকিছুই আর মনে রাখতে হবে না—এই ব্যাপারটা চিন্তা করেই আনন্দে তার বুক ফেটে যাবার কথা। শাহনাজ অবশ্য অবাক হয়ে আবিষ্কার করল তার ভিতরে আনন্দ–দুঃখ কিছুই হচ্ছে না, ভিতরটা কীরকম যেন ম্যাদা মেরে আছে! পরীক্ষা শেষ হবার পর যেসব কাজ করবে বলে এতদিন থেকে ঠিক করে রেখেছিল, যে গল্পের বইগুলো পড়বে বলে জমা করে রেখেছিল তার কোনোটার কথা মনে পড়েই কোনোরকম আনন্দ হচ্ছে না। এ রকম যে হতে পারে সেটা সে একবারও চিন্তা করে নি, কী মন–খারাপ–করা একটা ব্যাপার!

শাহনাজ একটা বিশাল লম্বা নিশ্বাস ফেলে সামনে তাকাল, তখন দেখতে পেল মীনা আর ঝিনু এদিকে আসছে। মীনা তাদের ক্লাসের শান্তশিষ্ট এবং হাবাগোবা টাইপের মেয়ে, তাই সবাই তাকে ডাকে মিনমিনে মীনা। ঝিনু একেবারে পুরোপরি মীনার উল্টো, সোজা ভাষায় বলা যায় ডাকাত টাইপের মেয়ে। যদি কোনোভাবে সে কলেজ শেষ করে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত যেতে পারে তা হলে যে সেখানে সন্ত্রাসী আর চাঁদাবাজি শুরু করে দেবে সে ব্যাপারে কারো মনে কোনো সন্দেহ নেই। তাকে সবাই আড়ালে ঝিনু–মস্তান বলে ডাকে এবং ঝিনু মনে হয় ব্যাপারটা বেশ পছন্দই করে। মীনা এবং ঝিনুর একসাথে থাকার কথা নয় এবং দুজনে কাছে এলে বুঝতে পারল ঝিনু মীনাকে ধরে এনেছে। কাঁচপোকা যেভাবে তেলাপোকা ধরে আনে অনেকটা সেরকম ব্যাপার। শাহনাজ দেখল মীনার নাকের মাঝে বিন্দু বিন্দু ঘাম, মুখ রক্তহীন, আতঙ্কিত এবং ফ্যাকাসে।

মিনু হেঁটে হেঁটে একেবারে শাহনাজের পাশে দাঁড়িয়ে বলল, "ওঠ।"

শাহনাজ ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরিটা ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলব।"

শাহনাজ চোখ কপালে তুলে বলল, "কী করবি?"

"ঢেলা মেরে কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরিটা গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলব, তারপর আগুন ধরিয়ে দেব।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাহনাজ সরু চোখে ঝিনুর দিকে তাকিয়ে রইল। সত্যি কথা বলতে কী, তার কথা শুনে সে খুব বেশি অবাক হল না। যে স্যার তাদের কেমিস্ট্রি পড়ান তার নাম মোবারক আলী। মোবারক স্যার ক্লাসে কিছু পড়ান না, শুধু গালিগালাজ করেন, সবাইকে একরকম বাধ্য করেন তার কাছে প্রাইভেট পড়তে। কেমিস্ট্রি ক্লাসে এবং এই ল্যাবরেটরিতে তাদের যত যন্ত্রণা সহ্য করতে হয় তার লিস্টি লিখলে সেটা ডিকশনারির মতো মোটা একটা বই হয়ে যাবে। যদি স্কুলে একটা গণভোট নেওয়া হয় তা হলে সব মেয়ে একবাক্যে সায় দেবে যে কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরিটা ঢেলা মেরে গুঁড়ো গুঁড়ো করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হোক, যদি সম্ভব হয় তা হলে মোবারক আলী স্যারকে ল্যাবরেটরির ভিতরে রেখে। সব মেয়েরা তাকে আড়ালে 'মোরব্বা স্যার' বলে ডাকে, তিনি দেখতে খানিকটা মোরব্বার মতো সেটি একটি কারণ এবং মেয়েরা মোরব্বার মতো তাকে কেচে ফেলতে চায় সেটি দ্বিতীয় এবং প্রধান কারণ! এই স্যারকে কেউ দেখতে পারে না বলে কেমিস্ট্রি বিষয়টাকেও কেউ দেখতে পারে না। কে জানে কেমিস্ট্রি বিষয়টা হয়তো আসলে ভালোই। মোবারক স্যার আর কেমিস্ট্রি বিষয়টুকু কেউ দেখতে পারে না বলে পুরো ঝালটুকু কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরির উপরে মেটানো তো কাজের কথা নয়। রাগ তো থাকতেই পারে কিন্তু রাগ থাকলেই তো সেই রাগ আর এভাবে মেটানো যায় না।

ঝিনু এগিয়ে এসে শাহনাজের কাঁধ খামচে ধরে টেনে তোলার চেষ্টা করে বলল, "নে, ওঠ!"

শাহনাজ নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, "তোর মাথা খারাপ হয়েছে?"

"কী বললি?" ঝিনু–গুণ্ডী ঠিক গুণ্ডার মতো চেহারা করে বলল, "আমার মাথা খারাপ হয়েছে?"

"হ্যাঁ। তা না হলে কেউ এ রকম করে কথা বলে? জানিস, যদি ধরা পড়িস তা হলে দশ বছরের জন্য তোকে বহিষ্কার করে দেবে?"

ধরা পড়ার কথাটি ঝিনুর মাথায় আসে নি, সে চোখ ছোট ছোট করে বলল, "ধরা পড়ব কেন? তুই বলে দিবি নাকি?"

শাহনাজ কী বলবে বুঝতে পারল না, ঝিনু আরো এক পা এগিয়ে এসে ঘুসি পাকিয়ে বলল, "বলে দেখ, তোর অবস্থা কী করি! এক ঘুসিতে যদি তোর নাকটা আমি ভিতরে ঢুকিয়ে না দিই!"

মিনমিনে মীনা আমতা আমতা করে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল ঝিনু এক ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "আর ধরা পড়লেই কী? আর আমাদের স্কুলে আসতে হবে না। শুধু কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরি কেন, পুরো স্কুলটাই জ্বালিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।"

মিনমিনে মীনা শেষ পর্যন্ত সাহস করে বলল, "পরীক্ষার রেজাল্ট আর টেস্টিমনিয়াল নিতে আসতে হবে না?"

শাহনাজ বলল, "আর যদি ফেল করিস?"

ঝিনু–গুণ্ডী এত যুক্তিতর্ক পছন্দ করছিল না, মীনাকে ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে বলল, "আয় যাই। আগে কয়টা ঢেলা নিয়ে আয়।"

শাহনাজ বিপদের ঝুঁকি নিয়ে বলল, "যাস নে মীনা। কেউ দেখে ফেললে নালিশ করে দেবে, তখন একেবারে বারোটা বেজে যাবে। সোজা জেলখানায় চলে যাবি।"

জেলখানার ভয়েই কি না কে জানে, মীনা শেষ পর্যন্ত সাহস করে ঝিনুর হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসে বলল, "আমি যাব না।"

ঝিনু চোখ লাল করে দাঁত কিড়মিড় করে নাক দিয়ে স্টিম ইঞ্জিনের মতো ফোঁসফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে হুঙ্কার দিয়ে বলল, "কী বললি, যাবি না?"

মীনা ভয়ের চোটে প্রায় কেঁদে ফেলে বলল, "না।"

ঝিনু মীনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, শাহনাজ আর সহ্য করতে পারল না, গলা উঁচিয়ে বলল, "ঝিনু—তুই গুণ্ডামি করতে চাস একা একা কর গিয়ে, মীনাকে কেন টানছিস?"

"কী বললি?" ঝিনু কেঁদো বাঘের মতো মুখ করে বলল, "কী বললি তুই? আমি গুণ্ডা?"

"না। আমি তা বলি নাই। আমি বলেছি—"

শাহনাজ কী বলেছে সেটা ব্যাখ্যা করার আগেই ঝিনু তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নাকের ওপর একটা ঘুসি মেরে বসল। শাহনাজ একেবারেই প্রস্তুত ছিল না, আচমকা ঘুসি খেয়ে সে চোখে অন্ধকার দেখল। দুই হাতে নাক চেপে ধরে সে পিছন দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ঝিনু এগিয়ে এসে চুল ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে বলল, "আমার সাথে রংবাজি করিস? এমন পেজকি লাগিয়ে দেব যে পেটের ভাত চাউল হয়ে যাবে।" তারপর একটা খারাপ গালি দিয়ে দুই নম্বর ঘুসিটা বসানোর চেষ্টা করল। শাহনাজ এইবার প্রস্তুত ছিল বলে সময়মতো সরে যাওয়াতে ঘুসিটা ঠিক জায়গায় লাগাতে পারল না। মিনমিনে মীনা অবশ্য ততক্ষণে তার খনখনে গলায় এত জোরে চেঁচাতে শুরু করেছে যে তাদের ঘিরে অন্য মেয়েদের ভিড় জমে গেল। সবাই মিলে ঝিনুকে টেনে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করেও কোনো সুবিধে করতে পারল না, ঝিনু হুঙ্কার দিয়ে বলল, "আমার সঙ্গে মস্তানি? পরের বার একেবারে চাকু মেরে দেব!"

ঠিক এ রকম সময় কেমিস্ট্রির স্যার মোবারক আলী লম্বা পা ফেলে হাজির হলেন এবং ভিড়টা হালকা হয়ে গেল। ঝিনু অদৃশ্য হল সবার আগে, শাহনাজ তার নাক চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইল এবং মোবারক আলী ওরফে মোরব্বা স্যার তাকেই প্রধান আসামি বিবেচনা করে বিচারকার্য শুরু করে দিলেন। স্যারের বিচার খুব সহজ, হুঙ্কার দিয়ে বললেন, "তোর এতবড় সাহস? মেয়েলোক হয়ে স্কুলের ভিতর মারামারি করিস?"

প্রথমত মেয়েদের মেয়েলোক বলা এক ধরনের অপমানসূচক কথা, দ্বিতীয়ত শাহনাজ মোটেও মারামারি করে নি, তৃতীয়ত মারামারি করা যদি খারাপ হয় তা হলে সেটা স্কুলের ভিতরে যতটুকু খারাপ, বাইরেও ঠিক ততটুকু খারাপ। এই মুহূর্তে অবশ্য সেটা নিয়ে আলাপ-আলোচনার কোনো সুযোগ নেই, কারণ মোবারক স্যার বিচার শেষ করে সরাসরি শাস্তি-পর্যায়ে চলে গেলেন। নাক ফুলিয়ে চোখ লাল করে দাঁত বের করে হিংস্র গলায় বলতে লাগলেন, "তবে রে বদমাইশ মেয়ে, তোর মতো পাজি হতচ্ছাড়া বেজন্মা মেয়ের জন্য দেশের এই অবস্থা। মেয়েলোক হয়ে যদি স্কুলের কম্পাউন্ডে স্যারদের সামনে মারামারি করিস তা হলে বাইরে কী করবি? রাস্তাঘাটে ছিনতাই করবি? মদ গাঞ্জা ফেনসিডিল খেয়ে মানুষের মুখে এসিড মারবি? বাসের ভিতরে পেট্রোলবোমা মারবি? ...ভ্যাদর ভ্যাদর ভ্যাদর ভ্যাদর ভ্যাদর ভ্যাদর..."

শাহনাজ নাক চেপে ধরে বড় বড় চোখ করে মোবারক ওরফে মোরব্বা স্যারের দিকে তাকিয়ে তার কথা শুনতে লাগল। ভ্যাগ্যিস স্যারের গালিগালাজ একটু পরে আর শোনা যায় না, পুরোটাকে একটা টানা লম্বা ভ্যাদর-ভ্যাদর জাতীয় প্রলাপ বলে মনে হতে থাকে!

শাহনাজ যখন বাসায় ফিরে এল ততক্ষণে খবর ছড়িয়ে গেছে। আম্মা তার দিকে তাকিয়ে সরু চোখে বললেন, "স্কুলে নাকি মারামারি করেছিস?"

"আমি করি নাই।"

আম্মা শাহনাজের লাল হয়ে ফুলে ওঠা নাকটার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তা হলে?"

শাহনাজ শীতল গলায় বলল, "তা হলে কী?"

"তোর এইরকম চেহারা কেন?"

শাহনাজ নাকের ওপর হাত বুলিয়ে বলল, "ঝিনু-গুণ্ডী আমাকে ঘুসি মেরেছে।"

আম্মা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে শাহনাজের দিকে তাকিয়ে রইলেন। শাহনাজ যদি বলত ঝিনু তাকে খামচি মেরেছে কিংবা চুল টেনেছে, চিমটি দিয়েছে তা হলে আম্মা বিশ্বাস করতেন, একটা মেয়ে যে অন্য একটা মেয়েকে ঘুসি মারতে পারে সেটা আম্মারা এখনো বিশ্বাস করতে পারেন না। আজকালকার মেয়েরা যে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে পকেটমার পর্যন্ত সবকিছু হতে পারে সেটা দেখেও মনে হয় তাদের বিশ্বাস হয় না। আম্মা কাঁপা গলায় বললেন, "ঘুসি মেরেছে?"

"হ্যাঁ।"

"এত মানুষ থাকতে তোকে কেন ঘুসি মারল?"

"কারণ আমি মিনমিনে মীনাকে যেতে দেই নাই।"

"কোথায় যেতে দিস নাই?"

শাহনাজ একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "তুমি এটা বুঝবে না আম্মা। যদি বোঝানোর চেষ্টা করি তুমি বিশ্বাস করবে না।"

আম্মা নিশ্বাস আটকে রেখে বললেন, "কেন বিশ্বাস করব না?"

"পুরো ব্যাপারটা বুঝতে হলে তোমার পুরো ইতিহাস জানতে হবে। শুরু করতে হবে আজ থেকে তিন বছর আগের ঘটনা দিয়ে।"

আম্মা এবারে রেগে উঠলেন, চিৎকার করে বললেন, "স্কুলে মারামারি করে এসে আবার বড় বড় কথা? স্কুলে পাঠানোই ভুল হয়েছে। রান্না, সেলাই আর বাসন ধোয়ানো শিখিয়ে বিয়ে দিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। শাশুড়ির খন্তার বাড়ি খেয়ে এতদিন সোজা হয়ে যেত।"

শাহনাজ পাথরের মতো মুখ করে বলল, "ওসব দিন ফিনিস। শাশুড়ি খন্তা দিয়ে বাড়ি দিলে তার হাত মুচড়ে সকেট থেকে আলাদা করে নেব।"

আম্মা হায় হায় করে মাথায় থাবা দিয়ে বললেন, "ও মা গো! কী বেহায়া মেয়ে পেটে ধরেছি গো। কী বলে এই সব!"

AMARBOI.COM

সন্ধেবেলা শাহনাজের বড়ভাই ইমতিয়াজ এসে পুরো ব্যাপারটা আবার গোড়া থেকে শুরু করল। ইমতিয়াজ ইউনিভার্সিটিতে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে, এবং তার ধারণা সে খুব উঁচু ধরনের মানুষ। ঘর থেকে বের হবার আগে আধাঘণ্টা সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলকে ঠিকভাবে উষ্কখুষ্ক করে নেয়। শাহনাজের সাথে এমনিতে সে বেশি কথা বলে না, যখন তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে হয় কিংবা টিটকারি করতে হয় শুধু তখন সে কথাবার্তা বলে। আজকে শাহনাজকে দেখে সে জোর করে মুখে এক ধরনের ফিচলে ধরনের হাসি ফুটিয়ে বলল, "তোর নাকটা দেখেছিস? এমনিতেই নিয়েন্ডারথল মানুষের মতো ছিল, এখন মনে হচ্ছে উপর দিয়ে একটা দোতলা বাস চলে গিয়েছে। হা হা হা।"

এই হচ্ছে ইমতিয়াজ। পৃথিবীতে নাক চ্যাপ্টা মানুষ অনেক আছে কিন্তু সে উদাহরণ দেবার সময় এমন একটা শব্দ উচ্চারণ করল যেটা উচ্চারণ করতেই দাঁত ভেঙে যায়। আর শাহনাজের নাক মোটেও চ্যাপ্টা নয়। তা ছাড়া নাক চাপা হলেই মানুষ মোটেও অসুন্দর হয় না। তাদের ক্লাসে একজন চাকমা মেয়ে পড়ে, নাকটা একটু চাপা কিন্তু দেখতে এত সুন্দর যে শুধু তাকিয়েই থাকতে ইচ্ছে করে। শাহনাজ দাঁতে দাঁত চেপে ইমতিয়াজের টিটকারিটা সহ্য করে বিষদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। চোখের দৃষ্টি দিয়ে কাউকে ভস্ম করা হলে এতক্ষণে ইমতিয়াজ ভুনা কাবাব হয়ে যেত।

ইমতিয়াজ চোখেমুখে একটা উদাস উদাস ভাব ফুটিয়ে মুখের এক কোনায় ঠোঁট দুটোকে একটু উপরে তুলে বিচিত্র একটা হাসি হেসে বলল, "তুই নাকি আজকাল রাস্তাঘাটে মারপিট করিস?"

শাহনাজ কোনো কথা বলল না। ইমতিয়াজ গলার স্বরে খুব একটা আন্তরিক ভাব ফুটিয়ে বলল, "চাঁদাবাজিও শুরু করে দিয়েছিস নাকি?"

শাহনাজ নিশ্বাস আটকে রাখল, তখনো কোনো কথা বলল না। ইমতিয়াজ তখন উপদেশ দেবার ভঙ্গি করে বলল, "যখন তুই ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবি তখন তোর কোনো চিন্তা থাকবে না! হলে ফ্রি খাবিদাবি। কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে চাঁদা নিবি। বেআইনি অস্ত্র নিয়ে ছেলেপিলেদের ধামকি-ধুমকি দিবি। আর একবার যদি জেলের ভাত খেতে পারিস দেখবি ধাঁ-ধাঁ করে উঠে যাবি। মহিলা সন্ত্রাসী! শহরের যত গডফাদার তোকে ডাবল টাকা দিয়ে ভাড়া করে নিয়ে যাবে!"

শাহনাজের ইচ্ছে করল ইমতিয়াজের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আঁচড়ে কামড়ে একটা কাণ্ড করে দেয়, কিন্তু সে কিছুই করল না। আস্তে আস্তে বলল, "সবাই তো আর আমার মতো হলে চলবে না, আমাদেরও তো ঠ্যাঙ্গানি দেওয়ার জন্য তোমার মতো লুতুপুতু এক-দুইটা মানুষ দরকার।"

ইমতিয়াজ চোখ বাঁকিয়ে বলল, "কী বললি? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!"

শাহনাজ না-শোনার ভান করে বলল, "যত হম্বিতম্বি আমার ওপরে! বিলকিস আপু যখন শাহবাগের মোড়ে কান ধরে দাঁড়া করিয়ে রাখে—"

ইমতিয়াজ আরেকটু হলে শাহনাজের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত, কোনোমতে সে দৌড়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। শুনতে পেল বাইরে থেকে ইমতিয়াজ চিৎকার করে বলল, "বেয়াদপ পাজি মেয়ে, কান টেনে ছিঁড়ে ফেলব।"

শাহনাজ ঘরে বসে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ইমতিয়াজ আর বিলকিস এক ক্লাসে পড়ে, দুজনে খুব ভাব, কিন্তু ইমতিয়াজ কেমন হয় বিলকিসকে একটু ভয়ই পায়। ইমতিয়াজকে শায়েস্তা করার এই একটা উপায়, বিলকিসকে নিয়ে একটা খোঁটা দেওয়া। কিন্তু একবার খোঁটা দিলে তার ঝাল সহ্য করতে হয় অনেকদিন।

আব্বা এলেন সন্ধেবেলা এবং তখন শাহনাজের সারা দিনের রাগ শেষ পর্যন্ত ধুয়েমুছে গেল। আম্মা এবং ইমতিয়াজের মুখে ঘটনার বর্ণনা শুনিয়েও আব্বাকে ঘাবড়ে দেওয়া গেল না। অট্টহাসি দিয়ে বললেন, "শাহনাজ মা, তুই নাকি গুণ্ডী হয়ে যাচ্ছিস?"

শাহনাজ মুখ গম্ভীর রেখে বলল, "আব্বা এইটা ঠাট্টার ব্যাপার না।"

"কোন্‌টা ঠাট্টার ব্যাপার না?"

"এই যে আমার নাকে ঘুসি মেরেছে।"

"কে বলেছে এইটা ঠাট্টার ব্যাপার? আমি কি বলেছি?"

"তা হলে হাসছ কেন?"

"হাসছি? আমি? আমি মোটেই হাসছি না—" এই বলে আব্বা আবার হা হা করে হাসতে লাগলেন।

শাহনাজ খুব রাগ হওয়ার চেষ্টা করেও মোটেও রাগতে পারল না। তবুও খুব চেষ্টা করে চোখেমুখে রাগের একটা চিহ্ন ফুটিয়ে বলল, "আব্বা, কাউকে মারলে তার ব্যথা লাগে, তখন সেটা নিয়ে হাসতে হয় না।"

আব্বা সাথে সাথে মুখ গম্ভীর করে শাহনাজের গালে হাত বুলিয়ে ছোট বাচ্চাদের

যেভাবে আদর করে সেভাবে আদর করে দিলেন। শাহনাজ কোনোভাবে আব্বার হাত থেকে ছুটে বের হয়ে এল। ভাগ্যিস আশপাশে কেউ নেই। যদি তার বান্ধবীরা কেউ দেখে ফেলত তার মতো এতবড় একজন মেয়েকে তার বাবা মুখটা সুচালো করে 'কিচি কিচি কু কুচি কুচি কু' বলে আদর করে দিচ্ছে তা হলে সে লজ্জায় আর মুখ দেখাতে পারত না। আব্বা বললেন, "তোর ব্যথা লাগছে বলে আমি হাসছি না রে পাগলী, আমি হাসছি ঘটনাটা চিন্তা করে। একটা মেয়ে পাঁই পাঁই করে আরেকজনের উপরে ঘুসি চালাচ্ছে এটা একটা বিপ্লব না?"

"বিপ্লব?"

"হ্যাঁ। আমরা যখন ছোট তখন ছেলেরা মারপিট করলে সেটা দেখেই এক-দুইজন মেয়ের দাঁতকপাটি লেগে যেত।"

আম্মা আব্বার কথাবার্তা শুনে খুব বিরক্ত হলেন। একটা মেয়ে এ রকম মারপিট করে এসেছে, কোথায় তাকে আচ্ছা করে বকে দেবে তা নয়, তাকে এভাবে প্রশ্রয় দিয়ে মাথাটা পুরোপুরি খেয়ে ফেলছেন। আম্মা রাগ হয়ে আব্বাকে বললেন, "তোমার হয়েছেটা কী? মেয়েটাকে এভাবে লাই দিয়ে তো মাথায় তুলেছ। এই রাজকুমারী বড় হলে অবস্থাটা কী হবে চিন্তা করেছ?"

আব্বা জোরে জোরে মাথা নেড়ে বললেন, "রাজকুমারী বড় হলে রাজরানী হবে, এর মাঝে আবার চিন্তা করার কী আছে?"

আম্মা একেবারে হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গি করে মাথা নাড়তে নাড়তে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। আব্বা আবার শাহনাজকে কাছে টেনে এনে বললেন, "আমার রাজকুমারী শাহনাজ, বাবা তোমার পরীক্ষা কেমন হয়েছে?"

শাহনাজ মুখে রহস্যের ভাব করে বলল, "শেষ হয়েছে।"

"ভালোভাবে শেষ হয়েছে নাকি খারাপভাবে?"

"তোমার কী মনে হয় আব্বু?"

"নিশ্চয়ই ভালোভাবে।"

শাহনাজ মাথা নেড়ে বলল, "আব্বু, আমার পরীক্ষা ভালো হয়েছে, এখন তুমি আমাকে কী দেবে?"

আব্বা মুখ গম্ভীর করে বললেন, "তোর এই মোটা নাকে চেপে ধরার জন্য একটা আইসব্যাগ।"

"যাও!" শাহনাজ তার আব্বাকে একটা ছোট ধাক্কা দিল। আব্বা নিজেকে রক্ষা করার জন্য হাত তুলে বললেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। তোর এই বিশাল নাকের জন্য একটা বিশাল নাকফুল।"

এবারে শাহনাজ সত্যি সত্যি রাগ করল, বলল, "যাও আব্বু। তোমার সবকিছু নিয়ে শুধু ঠাট্টা।"

আব্বা এবারে মুখ গম্ভীর করে বললেন, "ঠিক আছে মা, বল তুই কী চাস?"

"যা চাই তাই দিবে?"

"সেটা নির্ভর করে তুই কী চাস। এখন যদি বলিস লিওনার্দো দ্য কাপ্রিওকে এনে দাও, তা হলে তো পারব না!"

"না সেটা বলব না।"

"তা হলে বল্।"

শাহনাজ চোখ ছোট ছোট করে খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলল, "আমি সোমা আপুদের বাগানে বেড়াতে যেতে চাই।"

আব্বা এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে হাত নেড়ে বললেন, "তথাস্তু।"

২

সোমা হচ্ছে শাহনাজের আম্মার ছোটমামার একজন দূর-সম্পর্কের বোনের মেয়ে। সম্পর্ক হিসাব করে ডাকাডাকি করলে শাহনাজকে মনে হয় সোমা খালা-টালা-এই ধরণের কিছু একটা ডাকা উচিত কিন্তু এত হিসাব করে তো আর কেউ ডাকাডাকি করে না। সোমার আব্বা শাহনাজের আব্বার খুব ভালো বন্ধু। অফিসের কাজে একবার ঢাকা এসে কয়দিন শাহনাজদের বাসায় ছিলেন। তখন থেকেই পরিচয়। সোমা বয়সে শাহনাজ থেকে একটু বড়, তাই তাকে সোমা আপু বলে ডাকে।

সোমা একেবারে অসাধারণ একজন মেয়ে। কেউ যদি সোমাকে ল্যাং মেরে ফেলে দেয়, সে তা হলে পড়ে গিয়েও খিলখিল করে হেসে উঠে বলবে, "ইস্! তুমি কী সুন্দর ল্যাং মারতে পার! কোথায় শিখেছ এত সুন্দর করে ল্যাং মারা?" রাস্তায় যদি কোনো ছিনতাইকারী তার গলার হার ছিনিয়ে নিয়ে যায় তা হলেও খুশিতে ঝলমল করে বলে উঠবে, "লোকটার নিশ্চয়ই আমার বয়সী একটা মেয়ে আছে, মেয়েটা এই হারটা পেয়ে কী খুশিই না হবে!" কেউ যদি সোমার নাকে ঘুসি মেরে বসে তা হলে সোমা ব্যথাটা সহ্য করে হেসে বলবে, "কী মজার একটা ব্যাপার হল! ঘুসি খেলে কী রকম লাগে সবসময় আমার জানার কৌতূহল ছিল, এবারে জেনে গেলাম!" যারা সোমাকে চেনে না তারা এ রকম কথাবার্তা শুনে মনে করতে পারে সে বুঝি বোকাসোকা একটা মেয়ে, কিছুই বোঝে না, আর বুঝলেও না-বোঝার ভান করে সারাক্ষণ ন্যাকা ন্যাকা কথা বলে। কিন্তু একটু ঘনিষ্ঠতা হলেই বোঝা যায় আসলে সোমা একেবারেই বোকা নয়, তার মাঝে এতটুকুও ন্যাকামো নেই। সোমা সত্যি সত্যি পণ করেছে পৃথিবীর সবকিছু থেকে সে আনন্দ খুঁজে বের করবে। একটা ব্যাপারে অন্যেরা যখন রেগেমেগে কেঁদেকেটে একটা অনর্থ করে ফেলে, সোমা ঠিক তখনো তার মাঝখান থেকে আনন্দ পাবার আর খুশি হবার একটি বিষয় খুঁজে বের করে ফেলে।

সোমারা থাকে চট্টগ্রামের একটা পাহাড়ি এলাকায়। তার আব্বা সেখানকার একটা ছবির মতো দেখতে চা-বাগানের ম্যানেজার। চা-বাগানে যারা থাকে তারা মনে হয় একটু একা একা থাকে, তাই কেউ বেড়াতে গেলে তারা ভারি খুশি হয়। সোমা কয়দিন পরে পরেই শাহনাজকে চিঠি লিখে সেখানে বেড়াতে যেতে বলে। শাহনাজেরও খুব ইচ্ছে, কিন্তু পরীক্ষার জন্য সবরকম জল্পনা-কল্পনা বন্ধ করে রাখা ছিল। পরীক্ষা শেষ হয়েছে বলে আব্বা এখন তাকে যেতে দিতে রাজি হয়েছেন। আনন্দে শাহনাজের মাটিতে আর পা পড়ে না।

পৃথিবীতে অবশ্য কোনো জিনিসই পুরোপুরি পাওয়া যায় না। আম খেলে ভিতরে আঁটি থাকে, চকোলেট খেলে দাঁতে ক্যাভিটি হয়, পড়াশোনায় বেশি ভালো হলে বন্ধুবান্ধবেরা ভ্যাবলা বলে ধরে নেয়। ঠিক সেরকম সোমার কাছে বেড়াতে যাওয়ার আনন্দটুকু পুরোপুরি পাওয়া গেল না, কারণ আব্বা ইমতিয়াজের ওপর ভার দিলেন শাহনাজকে সোমাদের বাসায় নিয়ে যেতে। ইমতিয়াজ প্রথমে অবশ্য বলে দিল সে শাহনাজকে নিয়ে যেতে পারবে না, কারণ তার নাকি কবিতা লেখার ওপরে একটা ওয়ার্কশপ আছে। আব্বা যখন একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোটখাটো ধমক দিলেন তখন সে খুব অনিচ্ছার ভান করে রাজি হল। শাহনাজকে নিয়ে যাবার সময় পুরো রাস্তাটুকু ইমতিয়াজ কী রকম যন্ত্রণা দেবে সেটা চিন্তা করে শাহনাজের প্রায় এক শ দুই ডিগ্রি জ্বর উঠে যাবার মতো অবস্থা, কিন্তু একবার পৌঁছে যাবার পর যখন সোমার সাথে দেখা হবে তখন কতরকম মজা হবে চিন্তা করে সে নিজেকে শান্ত করল।

সোমাদের বাসায় যাবার জন্য সে তার ব্যাগ গোছাতে শুরু করল। বেড়ানোর জন্য জামা-কাপড়, চা-বাগানের টিলায় টিলায় ঘুরে বেড়ানোর জন্য টেনিস শু, রোদ থেকে বাঁচার জন্য বেসবল টুপি এবং কালো চশমা, ছুটিতে পড়ার জন্য জমিয়ে রাখা গল্পের বই, বেড়ানোর অভিজ্ঞতা লিখে রাখার জন্য নোটবই এবং কলম, ছবি আঁকার খাতা, ফটো তোলার জন্য আব্বার ক্যামেরা, সোমার জন্য কিছু উপহার, সোমার আব্বার জন্য পড়ে কিছু বোঝা যায় না এরকম জ্ঞানের একটা বই আর সোমার আম্মার জন্য গানের সিডি। ইমতিয়াজ ভান করল পুরো ব্যাপারটিই হচ্ছে এক ধরনের সময় নষ্ট, তাই মুখে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব করে রাখল, কিন্তু নিজের ব্যাগ গোছানোর সময় সেখানে রাজ্যের জিনিস এনে হাজির করল।

নির্দিষ্ট দিনে আব্বা-আম্মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শাহনাজ আর ইমতিয়াজ রওনা দিয়েছে, কমলাপুর স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠেছে সময়মতো। ট্রেনে বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতে শাহনাজের খুব ভালো লাগে, একেবারে সাধারণ জিনিসগুলো তখন একেবারে অসাধারণ বলে মনে হয়। ব্যাগ থেকে সে একটা রগরগে এ্যাডভেঞ্চারের বই বের করে আরাম করে বসল। ইমতিয়াজ মুখ খুব গম্ভীর করে চুলের ভিতরে আঙুল ঢুকিয়ে সেগুলো এলোমেলো করতে করতে একটা মোটা বই বের করল। বইটার নাম খুব কটমটে, শাহনাজ কয়েকবার চেষ্টা করে পড়ে আন্দাজ করল : মধ্যযুগীয় কাব্যে অতিপ্রাকৃত উপমার নান্দনিক ব্যবহার! এ রকম বই যে কেউ লিখতে পারে সেটা একটা বিস্ময় এবং কেউ যে নিজে থেকে সেটা পড়ার চেষ্টা করতে পারে সেটা তার থেকে বড় বিস্ময়।

ট্রেন ছাড়ার পর শাহনাজ তার সিটে হেলান দিয়ে মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতে তাকাতে তার এ্যাডভেঞ্চারের বইটি পড়তে থাকে। ইমতিয়াজ তার বিশাল জ্ঞানের বইটি নিয়ে খানিকক্ষণ ধস্তাধস্তি করে, পড়ার ভান করে, কিন্তু শাহনাজ বুঝতে পারল সে এক পৃষ্ঠাও আগাতে পারছে না। কেউ যদি তার দিকে তাকিয়ে থাকত তা হলে মনে হয় আরো খানিকক্ষণ এ রকম চেষ্টা করত কিন্তু ট্রেনের যাত্রীরা সবাই নিজেকে নিয়ে নিজেরাই ব্যস্ত, কাজেই ইমতিয়াজ বেশিক্ষণ এই জ্ঞানের বই পড়ার ভান চালিয়ে রাখতে পারল না। বই বন্ধ করে উসখুস করতে লাগল। খানিকক্ষণ পর যখন একজন হকার কিছু ম্যাগাজিন নিয়ে হাজির হল তার কাছ থেকে সে একটা ম্যাগাজিন কিনল, ম্যাগাজিনটার নাম : "খুন জখম সন্ত্রাস", প্রথম পৃষ্ঠায় একজন মানুষের মাথা কেটে ফেলে রাখার ছবি, উপরে বড় বড় করে লেখা : "আবার নরমাংসভুক সন্ত্রাসী"। ইমতিয়াজ গভীর মনোযোগ দিয়ে ম্যাগাজিনটা গোগ্রাসে গিলতে থাকে!

শাহনাজ আর ইমতিয়াজ ট্রেন থেকে নামল দুপুরবেলার দিকে। সেখান থেকে বাসে করে তিন ঘণ্টা যেতে হল পাহাড়ি রাস্তা ধরে। সবশেষে স্কুটারে করে কয়েক মাইল। সোমাদের বাসায় যখন পৌঁছাল তখন সন্ধে হয়ে গেছে।

শাহনাজকে দেখে সোমা যেভাবে ছুটে আসবে ভেবেছিল সোমা ঠিক সেভাবে ছুটে এল না, এল একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। কাছে এসে অবশ্য জাপটে ধরে খুশিতে চিৎকার করে উঠে বলল, "তুই এসেছিস? আমি ভাবলাম তুই বুঝি ভুলেই গেছিস আমাকে।"

শাহনাজও সমান জোরে চিৎকার করে বলল, "তুমি ভালো আছ সোমা আপু?"

"হ্যাঁ ভালো আছি—" বলেই সোমা আপু থেমে গেল, হাসার চেষ্টা করে বলল, "আসলে বেশি ভালো নেইরে।"

শাহনাজ দুশ্চিন্তিত মুখে বলল, "কেন? কী হয়েছে?"

"জানি না। বুকের ভিতর হঠাৎ অসম্ভব ব্যথা হয়। তখন হাত-পা অবশ হয়ে যায়, মাঝে মাঝে একেবারে সেন্সলেস হয়ে যাই।"

শাহনাজের মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে যায়। ভয়-পাওয়া গলায় বলল, "ডাক্তার দেখাও নি?"

"দেখিয়েছি।"

"ডাক্তার কী বলে?"

"ঠিক ধরতে পারছে না। কখনো বলে হার্টের সমস্যা, কখনো বলে নার্ভাস সিস্টেম, কখনো বলে নিউরোলজিক্যাল ডিজঅর্ডার।" সোমা কিছুক্ষণ ম্লানমুখে বসে থাকে এবং হঠাৎ করে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, "বুঝলি শাহনাজ, সবসময় আমার জানার কৌতূহল ছিল সেন্সলেস হলে কেমন লাগে! এখন জেনে গেছি!"

শাহনাজ অবাক হয়ে সোমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সোমার আম্মা বললেন, "শাহনাজ মা, ভিতরে আস। ভালোই হয়েছে তুমি এসেছ, সোমার একজন সঙ্গী হল। কী যে হল মেয়েটার!"

শাহনাজ তার ব্যাগ হাতে নিয়ে ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, "ভালো হয়ে যাবে চাচি।"

"দোয়া কোরো মা।"

ইমতিয়াজ পিছনে পিছনে এসে ঢুকল, মুখে সবজান্তার মতো একটা ভান করে বলল, "আমার কী মনে হয় জানেন চাচি?"

"কী?"

"সোমার সমস্যাটা হচ্ছে সাইকোসোমেটিক।"

সোমার আম্মা ভয়ার্ত মুখে বললেন, "সেটা আবার কী?"

"এক ধরনের মানসিক রোগ।"

"সোমা চোখ বড় বড় করে বলল, "মানসিক রোগ? তার মানে আমি পাগলী?" তারপর হি হি করে হেসে বলল, "আমি সবসময় জানতে চেয়েছিলাম পাগলীরা কী করে। এখন আমি জানতে পারব।"

ইমতিয়াজ আরো কী একটা জ্ঞানের কথা বলতে যাচ্ছিল, শাহনাজ বাধা দিয়ে বলল, "সোমা আপু, তুমি ভাইয়ার সব কথা বিশ্বাস কোরো না।"

"কেন?"

"কারণ সবকিছু নিয়ে একটা কথা বলে দেওয়া হচ্ছে ভাইয়ার হবি। অমর্ত্য সেনের সাথে দেখা হলেও তাঁকে একটা কিছু উপদেশ দিয়ে দেবে।"

ইমতিয়াজ চোখ পাকিয়ে শাহনাজের দিকে তাকাল, শাহনাজ সেই দৃষ্টি পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে বলল, "ভাইয়ার সাথে যদি কোনোদিন বিল গেটসের দেখা হয় তা হলে সে বিল গেটসকেও কীভাবে কম্পিউটারের ব্যবসা করতে হয় সেটার ওপরে লেকচার দিয়ে দিত।"

আরেকটু হলে ইমতিয়াজ খপ করে শাহনাজের চুলের মুঠি ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে দিত কিন্তু শাহনাজ সময়মতো সরে গেল। নেহায়েত সোমা, তার আব্বা-আম্মা কাছে ছিলেন

তাই ইমতিয়াজ ছেড়ে দিল। তবে কাজটা শাহনাজের জন্য ভালো হল না, ইমতিয়াজ যে তার ওপর একটা শোধ নেবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। শাহনাজ অবশ্য ব্যাপারটি নিয়ে বেশি দুশ্চিন্তিত হল না। এখন সে সোমাদের বাসায় আছে, ইমতিয়াজ তাকে কোনোরকম জ্বালাতন করতে পারবে না।

রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সোমা শাহনাজকে নিয়ে কী কী করবে তার একটা বিশাল লিস্ট তৈরি করল। সেই লিস্টের সব কাজ শেষ করতে হলে অবশ্য শাহনাজকে তার পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে এখানেই বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে হবে, কিন্তু সেটা নিয়ে সোমা কিংবা শাহনাজ কারো খুব মাথাব্যথা আছে বলে মনে হল না।

পরদিন ভোরে অবশ্য হঠাৎ করে অবস্থার পরিবর্তন হয়ে গেল—সকালবেলা নাশতা করতে করতে হঠাৎ করে সোমার মুখ কেমন জানি ফ্যাকাসে হয়ে যায়। শাহনাজ ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করল, "সোমা আপু, কী হয়েছে?"

সোমা কোনো কথা বলল না, সে তার বুকে দুই হাত দিয়ে চেপে ধরে। শাহনাজ ভয়-পাওয়া গলায় বলল, "সোমা আপু!"

সোমা কিছু একটা কথা বলার চেষ্টা করল কিন্তু বলতে পারল না, তার সারা মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে। শাহনাজ উঠে গিয়ে সোমাকে ধরে চিৎকার করে ডাকল, "চাচি!"

সোমার আম্মা রান্নাঘর থেকে ছুটে এলেন, দুজনে মিলে সোমাকে ধরে কাছাকাছি একটা সোফায় শুইয়ে দিল। শাহনাজ সোমার হাত ধরে রাখল। সোমা রক্তহীন মুখে ফিসফিস করে বলল, "তোমরা কোনো ভয় পেয়ো না, দেখবে এক্ষুনি ঠিক হয়ে যাবে।"

শাহনাজ কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, "তোমার কেমন লাগছে সোমা আপু?"

"ব্যথা।" সোমা অনেক কষ্ট করে বলল, "বুকের মাঝে ভয়ানক ব্যথা।"

শাহনাজ কী করবে বুঝতে না পেরে কাঁদতে শুরু করল। সোমা জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "কাঁদিস না বোকা মেয়ে—বেশি ব্যথা হলেই আমি সেন্সলেস হয়ে যাব তখন আর ব্যথা করবে না।"

সত্যি সত্যি একটু পর সোমা অচেতন হয়ে পড়ল। চা-বাগানের অফিস থেকে ডাক্তারকে নিয়ে সোমার আব্বা ছুটে এলেন। সোমাকে নানাভাবে পরীক্ষা করা হল এবং ঠিক করা হল তাকে এক্ষুনি শহরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে।

কিছুক্ষণের মাঝে একটা জিপ এনে হাজির করা হল, সেখানে সোমাকে নিয়ে তার আব্বা-আম্মা আর চা-বাগানের ডাক্তার রওনা দিয়ে দিলেন। জিপ স্টার্ট করার আগে সোমা চোখ খুলে শাহনাজকে ফিসফিস করে বলল, "একটা অভিজ্ঞতা হবে, কী বলিস? কখনো আমি হাসপাতালে যাই নি!"

সোমাকে নিয়ে চলে যাবার পর শাহনাজ আবিষ্কার করল পুরো বাসাটা একেবারে একটা মৃতপুরীর মতো নীরব হয়ে গেছে। বাসায় দেখাশোনা করার জন্য অনেক লোকজন রয়েছে, এখানে থাকতে কোনো অসুবিধে হবে না, কিন্তু হঠাৎ করে শাহনাজের বুকটা ফাঁকা হয়ে গেল। কত আশা করে সে এখানে বেড়াতে এসেছে, সোমার সাথে তার কতকিছু করার পরিকল্পনা, কিন্তু এখন সবই একটা বিশাল দুঃস্বপ্নের মতো লাগছে।

এর মাঝে ইমতিয়াজ পুরো ব্যাপারটা আরো খারাপ করে ফেলল। সোমাকে হাসপাতালে নেবার পর ইমতিয়াজ একটা বড় হাই তুলে বাসার কাজের মানুষটিকে বলল,

"আমার জন্য ভালো করে এক কাপ চা বানিয়ে আনো। চা-বাগানে বেড়াতে এসেছি, আমাদের ভালো চা খাওয়াবে না? কী রকম আজেবাজে চা বানাচ্ছ?"

কাজের মানুষটি অপ্রস্তুত হয়ে ইমতিয়াজের জন্য নতুন করে চা তৈরি করতে যাচ্ছিল তখন ইমতিয়াজ তাকে থামাল, বলল, "ভালো চা তৈরি করতে দরকার ভালো পানি। এখানে স্প্রিং ওয়াটার নাই?"

কাজের মানুষটি ইমতিয়াজের কথা বুঝতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। ইমতিয়াজ বিরক্ত হয়ে বলল, "স্প্রিং ওয়াটার মানে বোঝ না? পাহাড়ি ঝরনার পানি। নাই?"

কাজের মানুষটা ভয়ে ভয়ে বলল, "কাছে নাই। দুই মাইল দূরে একটা ঝরনা আছে।"

"গুড। আজ বিকালে সেখানে যাবে, বালতি করে ঝরনার পানি আনবে। সেই পানিতে চা হবে।"

মানুষটি মাথা নেড়ে শুকনোমুখে চলে গেল। শাহনাজ একেবারে হতভম্ব হয়ে ইমতিয়াজের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, একজন মানুষ কেমন করে এ রকম হৃদয়হীন হয়? এইমাত্র সোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তার কী হবে কে জানে, আর ইমতিয়াজ কীভাবে ঝরনার পানি দিয়ে তার জন্য চা তৈরি করা হবে সেটা নিয়ে হম্বিতম্বি করছে! শাহনাজের পক্ষে সহ্য করা কঠিন হয়ে উঠল, কোনোমতে চোখের পানি সামলানোর চেষ্টা করতে করতে বলল, "ভাইয়া, তোমার ভিতরে কোনো মায়াদয়া নাই?"

ইমতিয়াজ কেনো আঙুল দিয়ে কান চুলকাতে চুলকাতে বলল, "কেন? কী হয়েছে?"

"সোমাকে এইমাত্র হাসপাতালে নিয়েছে আর তুমি ঝরনার পানিতে চা খাওয়া নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ?"

ইমতিয়াজ যেন ব্যাপারটা বুঝতে পারে নি সেরকম একটা মুখের ভাব করে বলল, "সোমাকে হাসপাতালে নিলে আমি চা খেতে পারব না?"

শাহনাজ কোনো কথা বলল না। কিছুতেই ইমতিয়াজের সামনে কাঁদবে না ঠিক করে রাখায় সে কষ্ট করে চোখের পানি আটকে রাখল। ইমতিয়াজ মনে হয় ব্যাপারটা বুঝতে পেরে খুব মজা পেয়ে গেল, মুখ বাঁকা করে হেসে বলল, "এখন তুই ফিচ ফিচ করে কাঁদতে শুরু করবি নাকি?"

শাহনাজ কোনো কথা বলল না। ইমতিয়াজ গভীর জ্ঞানের কথা বলছে এ রকম একটা ভাব করে বলল, "আমি সবসময়েই বিশ্বাস করতে চাই যে মেয়ে এবং ছেলের মাঝে কোনো পার্থক্য নাই। একটা ছেলে যেটা করতে পারে, একটা মেয়েও নিশ্চয়ই সেটা করতে পারে। কিন্তু তোদের দেখে এখন আমার মত পাল্টাতে হবে। ছোট একটা বিষয় নিয়ে ফ্যাঁচফ্যাঁচ করে কাঁদবি—"

শাহনাজ আর পারল না, চিৎকার করে রাগে ফেটে পড়ল, "এইটা ছোট বিষয়? সোমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল, এইটা ছোট বিষয়?"

ইমতিয়াজ ঠোঁট উল্টে বলল, "পরিষ্কার সাইকোসোমেটিক কেস। নিউজ উইকে এর ওপরে আমি একটা আর্টিক্যাল পড়েছি, হুবহু এই কেস। দুই গ্রুপ নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করা হল। এক গ্রুপকে দিল ড্রাগস, অন্য গ্রুপকে প্লাসিবু—"

শাহনাজ চিৎকার করে বলল, "চুপ করবে তুমি? তোমার বড় বড় কথা বন্ধ করবে?"

ছোটবোনের মুখে এ রকম কথা শুনে ইমতিয়াজ এবারে খেপে গেল। চোখ ছোট ছোট করে হিন্দি সিনেমার ভিলেনের মতো মুখ করে বলল, "আমার সাথে ঘিড়িংগবাজি? একেবারে কানে ধরে বাসায় ফিরিয়ে নিয়ে যাব।"

"পারলে নিয়ে যাও না!"

"ভাবছিস পারব না? আমাকে চিনিস না তুই?"

"তোমাকে চিনি দেখেই বলছি।" শাহনাজ হিংস্র মুখ করে বলল, "তোমার হচ্ছে শুধু কথা। বড় বড় কথা। বড় বড় কথা যদি বাজারে বিক্রি করা যেত তা হলে এতদিনে তুমি আরেকটা বিল গেটস হয়ে যেতে।"

ইমতিয়াজ শাহনাজের দিকে তাকিয়ে দাঁত কিড়মিড় করে কিছু একটা করে ফেলত কিন্তু ঠিক তখন বাসার কাজের মানুষটি চায়ের কাপ নিয়ে ঢুকল বলে সে কিছু করল না। তার হাত থেকে কাপটা নিয়ে চায়ে চুমুক দিয়ে মুখে পরিতৃপ্তির একটা ভাব নিয়ে আসে। শাহনাজের পক্ষে ইমতিয়াজের এইসব ভান আর সহ্য করা সম্ভব হল না, সে পা দাপিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এল।

বাইরে এসে বারান্দায় বসে শাহনাজ নিজের চোখ মুছে নেয়, তার এত মন-খারাপ লাগছে যে সেটি আর বলার মতো নয়। পরীক্ষা শেষ হবার পর এখানে বেড়াতে এসে সে কত আনন্দ করবে বলে ঠিক করে রেখেছিল অথচ এখন আনন্দ দূরে থাকুক, পুরো সময়টা যেন একটা বিভীষিকার মতো হয়ে যাচ্ছে। ইমতিয়াজ মনে হয় তার জীবনটাকে একেবারে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেবে। মানুষেরা তাদের ছোটবোনকে কত ভালবাসে কিন্তু ইমতিয়াজকে দেখলে মনে হয় শাহনাজ যেন ছোটবোন না, সে যেন রাজনৈতিক দলের বিপক্ষ পার্টির নেতা!

শাহনাজ একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। আজ সকালে কাছাকাছি একটা টিলাতে সোমাকে নিয়ে হেঁটে যাবার কথা ছিল। সোমা এখন নেই সে একাই হেঁটে আসবে। সোমা বলেছে পুরো এলাকাটা খুব নিরাপদ, একা একা ঘুরে বেড়াতে কোনো ভয় নেই। শাহনাজ গেট খুলে বের হবার সময় দারোয়ান জানতে চাইল সে কোথায় যাচ্ছে, সঙ্গে কাউকে দেবে কি না। শাহনাজ বলল কোনো প্রয়োজন নেই, সে একাই হেঁটে আসবে।

সোমাদের বাসা থেকে খোয়া-বাঁধানো একটা রাস্তা ঘুরে ঘুরে নিচে নেমে গেছে। রাস্তার দুপাশে বড় বড় মেহগনি গাছ। গাছে নানারকম পাখি কিচিরমিচির করে ডাকছে। শাহনাজ রাস্তা ধরে হেঁটে হেঁটে নিচে নেমে আসে। কাছাকাছি আরো কয়েকটা সুন্দর সুন্দর ছবির মতো বাসা। তার পাশ দিয়ে হেঁটে সে পিছনে টিলার দিকে হাঁটতে থাকে। চা-বাগানের শ্রমিক পুরুষ আর মেয়েরা গল্প করতে করতে কাজে যাচ্ছে, শাহনাজ তাদের পিছু পিছু যেতে থাকে। খানিকদূর যাবার পর পায়েচলা পথ দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। সবাই একদিকে চলে যায়, শাহনাজ অন্যদিকে হাঁটতে থাকে। তার মনটি খুব বিক্ষিপ্ত, কোনোকিছুতেই মন দিতে পারছে না। অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে একটা জংলা জায়গায় হাজির হল, শুকনো পাতা মাড়িয়ে সে একটা বড় গাছের দিকে হেঁটে যেতে থাকে, গাছের গুঁড়িতে বসে বসে সে খানিকক্ষণ নিজের আর সোমার ভাগ্য নিয়ে চিন্তা করবে।

গাছটার কাছাকাছি যেতেই হঠাৎ প্রচণ্ড কর্কশ শব্দে প্রায় সাইরেনের মতো তীক্ষ্ণ একটা শব্দ বেজে ওঠে। শাহনাজ চমকে উঠে একলাফে পিছনে সরে যায়, কিন্তু পোঁ পোঁ শব্দে সেই তীক্ষ্ণ শব্দের মতো সাইরেন বাজতেই থাকে। শব্দটা কোথা থেকে আসছে বোঝার জন্য শাহনাজ এদিক-সেদিক তাকাতে থাকে, ঠিক তখন বাচ্চার গলায় কেউ একজন চিৎকার করে ওঠে, "খবরদার, কাছে আসবে না।"

কথাটি কে বলছে দেখার জন্য শাহনাজ এদিক-সেদিক তাকাল কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। শাহনাজ তখন ভয়ে ভয়ে বলল, "কে?"

"আমি।"

গলার স্বরটি এল গাছের উপর থেকে এবং শাহনাজ তখন উপরের দিকে তাকাল। দেখল গাছের মাঝামাঝি জায়গায় তিনটি ডাল বের হয়ে এসেছে, সেখানে একটা ছোট ঘরের মতন। সেই ঘরের উপর থেকে দশ–বারো বছরের একটা বাচ্চার মাথা উঁকি দিচ্ছে। বাচ্চাটির বড় বড় চোখ, ভারী চশমা দিয়েও চোখ দুটোকে ছোট করা যায় নি, খরগোশের মতো বড় বড় কান। মাথায় এলোমেলো চুল। বাচ্চাটি সাবধানে আরো একটু বের হয়ে এল। শাহনাজ একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "তুমি গাছের উপরে কী করছ?"

সাইরেনের মতো কর্কশ পোঁ পোঁ শব্দের কারণে ছেলেটি শাহনাজের কথা শুনতে পেল না, সে ভুরু কুঁচকে বলল, "কী বলছ?"

শাহনাজ আরো গলা উঁচিয়ে বলল, "তুমি গাছের উপরে কী করছ?"

"দাঁড়াও শুনতে পাচ্ছি না" বলে বড় বড় কান এবং বড় বড় চোখের ছেলেটা তার হাতে ধরে রাখা জুতার বাক্সের মতো একটা বাক্সের গায়ে লাগানো একটা সুইচ অফ করে দিল, সাথে সাথে কর্কশ এবং তীক্ষ্ণ সাইরেনের মতো পোঁ পোঁ শব্দটি থেমে যায়। ছেলেটি এবারে একটু এগিয়ে এসে বলল, "কী বলছ?"

শাহনাজ খানিকক্ষণ এই বিচিত্র ছেলেটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "আমি বলছি তুমি এই গাছের উপর বসে কী করছ?"

ছেলেটা ঘাড়টা বাঁকা করে বলল, "সেটা বলা যাবে না।"

"কেন?"

"কারণ এইটা টপ সিক্রেট। এইটা আমার গোপন ল্যাবরেটরি—" বলেই ছেলেটা জিভে কামড় দিল, তার এই তথ্যটাও নিশ্চয়ই বলে দেওয়ার কথা ছিল না।

শাহনাজ খিলখিল করে হেসে বলল, "তুমি তো বলেই দিলে।"

ছেলেটাকে একটু বিভ্রান্ত দেখা গেল, শঙ্কিত মুখে বলল, "তুমি কাউকে বলে দেবে না তো?"

শাহনাজ মাথা নাড়ল, বলল, "না।"

"ঠিক তো?"

"ঠিক।"

"তা হলে তুমি উপরে আস।"

শাহনাজ ভুরু কুঁচকে গাছের উপরে তাকাল, বলল, "কেমন করে আসব?"

ছেলেটা তার ছোট ঘরটার ভিতরে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং পরের মুহূর্তে একপাশ থেকে দড়ির একটা মই নামিয়ে দিল। ক্যাটক্যাটে গোলাপি হাওয়াই মিঠাই রঙের দুটি নাইলনের দড়ির সাথে বাঁশের কঞ্চি বেঁধে চমৎকার একটা মই তৈরি করা হয়েছে। ছেলেটা গাছের উপরে বসেই মইয়ের নিচের অংশটুকু গাছের নিচে লাগানো একটা আংটায় বাঁধিয়ে নিল, যেন উপরে ওঠার সময় সেটা দুলতে না থাকে।

শাহনাজ মইয়ে পা দেওয়ার আগে জিজ্ঞেস করল, "ছিঁড়ে যাবে না তো?"

"নাইলন এত সহজে ছেড়ে না।" ছেলেটা বড় মানুষের মতো বলল, "তোমার ওজন দুইটা দড়িতে ভাগ হয়ে যাবে, এক একটা দড়ি কমপক্ষে দুই শ কিলোগ্রাম নিতে পারবে। আমি টেস্ট করেছি।"

শাহনাজ আর তর্ক করল না, দড়ির মইয়ে পা দিয়ে বেশ সহজেই উপরে উঠে আসে। ছেলেটা শেষ অংশে হাত ধরে তাকে সাহায্য করল। উপরে বেশ চমৎকার একটা ঘরের মতো, বাইরে থেকে কাঠকুটো এবং গাছের ডালপালা দিয়ে ঢেকে রেখেছে বলে হঠাৎ করে চোখে পড়ে না। ভিতরে অনেকখানি জায়গা এবং সেখানে রাজ্যের যন্ত্রপাতিতে বোঝাই।

AMARBOI.COM

ছেলেটি বলে না দিলেও একবার দেখলে এটা যে একটা গোপন ল্যাবরেটরি সে বিষয়ে কারো কোনো সন্দেহ থাকবে না।

ছেলেটা তার জুতোর বাক্স তুলে একটা সুইচ টিপে বলল, "আমার সিকিউরিটি আবার অন করে দিলাম।"

"কী হয় সিকিউরিটি অন করলে?"

"কেউ ল্যাবরেটরির কাছে এলেই আমি বুঝতে পারি।"

"কীভাবে তৈরি করেছ সিকিউরিটি?"

ছেলেটার মুখে এইবারে স্পষ্ট একটা গর্বের ছাপ ফুটে উঠল, "লেজার লাইট দিয়ে। ঐ দেখ রেইনট্রি গাছে লেজার ডায়োড লাগানো আলোটা আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে গাছকে ঘিরে রেখেছে। একটা ফটো-ডায়োড আছে, সার্কিট ব্রেক হলেই আমার সাইরেন চালু হয়ে যায়। এফ. এম. সার্কিট।"

শাহনাজ একটু চমৎকৃত হয়ে ছেলেটার দিকে তাকাল, ইতস্তত করে বলল, "কোথায় পেয়েছ এই সিকিউরিটি সার্কিট?"

"আমি তৈরি করেছি।"

শাহনাজ চোখ কপালে তুলে বলল, "তুমি তৈরি করেছ!"

"হ্যাঁ।"

"তুমি দেখি বড় সায়েন্টিস্ট।"

ছেলেটি খুব আপত্তি করল না, মাথা নেড়ে স্বীকার করে নিল। শাহনাজ একটু অবাক হয়ে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোমার নাম কী?"

"ক্যাপ্টেন ডাবলু।"

"ক্যাপ্টেন কী?"

"ক্যাপ্টেন ডাবলু। ইউ ভি ডাবলু-এর সেই ডাবলু।"

AMARBOI.COM

৩

ক্যাপ্টেন ডাবলুর সাথে পরিচয় হবার দশ মিনিটের মাঝে শাহনাজ বুঝতে পারল এই ছেলেটার মতো আজব ছেলে সে আগে কখনো দেখে নি এবং ভবিষ্যতেও দেখবে না। নিজের নাম বলার পর শাহনাজ কিছুক্ষণ অবাক হয়ে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "ক্যাপ্টেন ডাবলু কীরকম নাম?"

ছেলেটা মনে হয় তার প্রশ্নটাই বুঝতে পারল না, বলল, "যেরকম সবার নাম হয় সেরকম নাম।"

"নামটা কে রেখেছে?"

"আমিই রেখেছি।" শাহনাজের মুখে অবাক হওয়ার চিহ্ন দেখে মনে হয় সে গরম হয়ে উঠল, বলল, "কেন? মানুষ কি নিজের নাম নিজে রাখতে পারে না?"

"নিশ্চয়ই পারে, তবে সাধারণত রাখে না।"

"আমি রেখেছি। আমার ভালো নাম ওয়াহিদুল ইসলাম। ও-য়াহি-দু-ল—নামটা বেশি লম্বা। আমার পছন্দ হয় নাই। তাই শুধু সামনের অংশটা রেখেছি। ডাবলু দিয়ে শুরু তো, তাই শুধু ডাবলু। শর্টকাট।"

পুরো ব্যাপারটা একেবারে পানির মতো বুঝে ফেলেছে এ রকম ভান করে শাহনাজ জোরে জোরে মাথা নেড়ে জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু নামের আগে ক্যাপ্টেন কেন?"

ছেলেটা দাঁত বের করে হেসে বলল, "এইটা নাম না, টাইটেল।"

"কে দিয়েছে?"

"কে আবার দেবে? আমিই দিয়েছি। শুনতে ভালো লাগে।"

একেবারে অকাট্য যুক্তি, শাহনাজের আর কিছুই বলার থাকল না। ক্যাপ্টেন ডাবলু নামের ছেলেটা শাহনাজের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, "তোমার নাম কী?"

"শাহনাজ।"

"শাহনাজ!" ছেলেটা মুখ সুচালো করে দাঁতের ফাঁক দিয়ে বাতাস বের করে বলল, "কী অদ্ভুত নাম!"

শাহনাজ আপত্তি করে কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। যে নিজের নাম শর্টকাট করে ক্যাপ্টেন ডাবলু করে ফেলেছে, তার সাথে নামের গঠন নিয়ে আলোচনা করা মনে হয় বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ক্যাপ্টেন ডাবলু মাথা উঁচিয়ে একবার বাইরে তাকিয়ে শাহনাজকে জিজ্ঞেস করল, "শাহনাজ, তুমি কোথা থেকে এসেছ?"

শাহনাজের এবারে একটু মেজাজ গরম হল, তার থেকে বয়সে কমপক্ষে দুই-তিন বছর ছোট হয়ে তাকে নাম ধরে ডাকছে মানে? সে কঠিন গলায় বলল, "আমাকে নাম ধরে ডাকছ কেন? আমি তোমার বড় না?"

ক্যাপ্টেন ডাবলু অবাক হয়ে বলল, "তা হলে কী বলে ডাকব?"

"শাহনাজ আপু বলে ডাকবে।"

"ও। শাহনাজ আপু, তুমি কোথা থেকে এসেছ?"

"ঢাকা থেকে।"

"কোথায় এসেছ?"

"সোমা আপুদের বাসায়।"

"সোমা আপু? সেটা কে?"

শাহনাজ একটু অবাক হল, তার ধারণা ছিল চা-বাগানে মানুষজন এত কম যে সবাই বুঝি সবাইকে খুব ভালো করে চেনে। ক্যাপ্টেন ডাবলুর দিকে তাকিয়ে বলল, "চা-বাগানের ম্যানেজারের মেয়ে।"

"ও, বুঝেছি! কী-মজা-হবে আপু।"

"কী-মজা-হবে আপু?"

"হ্যাঁ, আমি ঐ আপুকে ডাকি কী-মজা-হবে আপু! যেটাই হয় সেটাতেই ঐ আপু বলে 'কী-মজা-হবে', সেজন্যে।"

শাহনাজের মনে মনে স্বীকার করতেই হল সোমার জন্য এই নামটি একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। সোমার কথা মনে পড়তেই শাহনাজের মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। আহা বেচারি! হাসপাতালে না জানি কীভাবে আছে। ক্যাপ্টেন ডাবলু বুঝতে না পারে সেভাবে খুব সাবধানে সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ক্যাপ্টেন ডাবলু আবার বাইরে তাকিয়ে বলল, "কী-মজা-হবে আপু অনেকদিন এখানে আসে না।"

শাহনাজ একটু অবাক হয়ে বলল, "আমি ভেবেছিলাম তোমার এটা টপ সিক্রেট।"

"হ্যাঁ। সেটা সত্যি, কিন্তু কী-মজা-হবে আপু মাঝে মাঝে দেখতে আসত।"

ক্যাপ্টেন ডাবলুর কথা শেষ হওয়ার আগেই হঠাৎ আবার তীক্ষ্মস্বরে পোঁ পোঁ

করে সাইরেনের মতো শব্দ হতে শুরু করে। শাহনাজ চমকে উঠে বলল, "ওটা কিসের শব্দ?"

ক্যাপ্টেন ডাবলু লাফিয়ে উঠে বাইরে তাকিয়ে বলল, "ঐ যে দুষ্টু ছেলেটা এসেছে। নাম হচ্ছে লান্টু—প্রত্যেকদিন একবার আমার লেজার লাইটের সার্কিট হাত দিয়ে ডিস্টার্ব করে।"

শাহনাজ লান্টুর নামের দুষ্টু ছেলেটাকে দেখতে পেল। খালি পা এবং শার্টের বোতাম খোলা সাত–আট বছরের একটা ছেলে। হাত দিয়ে ডায়োড লেজারের আলোটা আটকে রেখে মহানন্দে হিহি করে হাসছে। ক্যাপ্টেন ডাবলু গাছের উপরে লাফাতে লাফাতে বলল, "খবরদার লান্টু—একেবারে খুন করে ফেলব কিন্তু, লাইট আটকে রাখলে একেবারে দশ হাজার ভোল্টের ইলেকট্রিক শক দিয়ে দেব কিন্তু।"

দশ হাজার ভোল্টের ইলেকট্রিক শক দেওয়ার ভয় দেখাতে যেটুকু রাগারাগি করা দরকার, ক্যাপ্টেন ডাবলুর মাঝে মোটেও সেরকম রাগ দেখা গেল না এবং শার্টের বোতাম খুলে পেট বের করে রাখা লান্টুকেও সেই ব্যাপারটি নিয়ে খুব ভয় পেতে দেখা গেল না। বরং দুজনকেই খুব আনন্দ পেতে দেখা গেল এবং শাহনাজ হঠাৎ করে বুঝতে পারল এটি আসলে দুজনের এক ধরনের খেলা। সে মুচকি হেসে ক্যাপ্টেন ডাবলুকে জিজ্ঞেস করল, "কত জন তোমার এই টপ সিক্রেট ল্যাবরেটরির কথা জানে?"

ক্যাপ্টেন ডাবলু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আসলে ঝুমুরটা হচ্ছে সত্যিকারের পাজি। সে সবাইকে বলে দিয়েছে।"

"ঝুমুরটা কে?"

"স্বপনের বোন। এক নম্বর পাজি। ইনডাকশন কয়েল দিয়ে একবার ইলেকট্রিক শক দিতে হবে।"

"স্বপনটা কে?"

"ঝুমুরের ভাই—সেটাও মিচকে শয়তান—"

শাহনাজ বুঝতে পারল ক্যাপ্টেন ডাবলুর সাথে এই বিষয় নিয়ে বেশিক্ষণ কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। যাদেরকে সে পাজি এবং মিচকে শয়তান বলছে তাদের কথা বলার সাথে সাথে তার মুখে এক ধরনের আনন্দের হাসি ফুটে উঠছে, এবং যতদূর মনে হয় লান্টু, ঝুমুর বা স্বপনের মতো বাচ্চাকাচ্চাদের নিয়েই তার এক ধরনের মজার খেলা চলছে।

শাহনাজের ধারণা কিছুক্ষণের মাঝেই সত্যি প্রমাণিত হল। আরো কিছু বাচ্চাকাচ্চা এসে নিচে ছোটাছুটি করতে লাগল এবং গাছের উপরে বসে ক্যাপ্টেন ডাবলু লাফঝাঁপ দিতে লাগল। শাহনাজ খানিকক্ষণ এক ধরনের কৌতুক নিয়ে তাদের এই বিচিত্র খেলা লক্ষ করে ক্যাপ্টেন ডাবলুকে বলল, "তোমরা খেল, আমি এখন যাই।"

"খেলা! এইটা খেলা কে বলেছে?"

"তা হলে এইটা কী?"

"আমার টপ সিক্রেট ল্যাবরেটরি দখল করতে চাইছে দেখছ না?"

"ও। তুমি কী করবে?"

"মনে হয় ফাইট করতে হবে।"

শাহনাজ দেখতে পেল ক্যাপ্টেন ডাবলু একটা লাঠির আগায় একটা সাদা রুমাল বেঁধে নাড়তে থাকে। সে কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "এইটা কী?"

"ফাইটটা কীভাবে করতে হবে সেটার নিয়মকানুন ঠিক করতে হবে না?"

AMARBOI.COM

শাহনাজ দেখতে পেল নিচের ছেলেপিলেরা সঙ্কেত পেয়ে গাছের নিচে এসে হাজির হয়েছে। ক্যাপ্টেন ডাবলু ভয়ঙ্করদর্শন কিছু অস্ত্র নিয়ে গাছ থেকে নেমে এল। শাহনাজও নিচে নেমে আসে। টপ সিক্রেট ল্যাবরেটরি দখল করা নিয়ে যুদ্ধের পরিকল্পনা এবং যে যুদ্ধ শুরু হবে তার মাঝে থাকার মনে হয় তার কোনো দরকার নেই। ক্যাপ্টেন ডাবলুকে সে বলল, "আমি গেলাম, তোমরা যুদ্ধ কর।"

ক্যাপ্টেন ডাবলু চোখ বড় বড় করে বলল, "তুমি থাকবে না আমার সাথে? আমি একা কেমন করে যুদ্ধ করব?"

"আমি আসলে যুদ্ধ করতে পারি না।"

"কেন পার না? কী-মজা-হবে আপু তো পারত।"

উপস্থিত বাচ্চাকাচ্চারা সবাই মাথা নাড়ল, শাহনাজ বুঝতে পারল সোমা নিশ্চয়ই এই বাচ্চাকাচ্চাদের সাথে এই ছেলেমানুষি খেলায় অনেক সময় দিয়েছে। সোমার কথা মনে পড়ে আবার তার মন খারাপ হয়ে গেল, সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "তোমরা খেল, আমি একটু বাসায় যাই, দেখি সোমা আপুর কোনো খবর পাই কি না।"

বাসায় এসে দেখল ইমতিয়াজ খুব তিরিক্ষে মেজাজে বসে আছে। খবরের কাগজ আসতে দেরি হচ্ছে বলে তার মেজাজ ভালো নেই। একদিন খবরের কাগজ একটু দেরি করে পড়লে কী হয় কে জানে। শাহনাজ বলল, "তুমি যে বইটা এনেছ সেটা পড়লেই পার?"

"কোন্ বইটা?"

"ঐ যে ট্রেনে যেটা পড়ার চেষ্টা করছিলে! মধ্যযুগীয় কী কী সব জিনিসের নান্দনিক ব্যবহার!"

ইমতিয়াজ চোখ পাকিয়ে শাহনাজের দিকে তাকাল। রেগে গেলে চোখ থেকে আগুন বের হওয়ার নিয়ম থাকলে শাহনাজ এতক্ষণে পুড়ে কয়লা হয়ে যেত। শাহনাজের ওপর রাগটা ইমতিয়াজ কাজের ছেলেটার ওপর ঝাড়ল, বলল, "তোমাকে বলেছিলাম না ঝরনার পানি আনতে, এনেছ?"

AMARBOI.COM

"আপনি বলেছিলেন বিকালবেলা যেতে।"

"মুখে মুখে তর্ক করছ কেন? এখন গিয়ে নিয়ে আসছ না কেন?"

কাজের ছেলেটা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, "রান্না করেই যাব।"

"হ্যাঁ। আর আমার জন্য আরো এক কাপ চা দেবে। কনডেন্স মিল্ক দিয়ে।"

বিকালবেলা তিনটি ভিন্ন খবর পাওয়া গেল। প্রথম খবরটি হল, খবরের কাগজের সাহিত্য সাময়িকীর পাতায় ইমতিয়াজের যে 'পোস্ট মডার্ন' কবিতাটা ছাপা হওয়ার কথা ছিল সেটা ছাপা হয় নি। পুরো ব্যাপারটা যে পত্রিকার লোকজনের এক ধরনের ঈর্ষা সেটা নিয়ে ইমতিয়াজ বেশি চেঁচামেচি করতে পারল না। কারণ এই বিষয়ে তার চেঁচামেচি শোনার কোনো মানুষ নেই। শাহনাজকে শুনিয়ে কোনো লাভ নেই, কারণ ইমতিয়াজ চেষ্টা করলে সে ঠোঁটের এক কোনা উপরে তুলে ইমতিয়াজ থেকে শেখা বিচিত্র হাসিটি হাসতে থাকে এবং সেটি দেখে ইমতিয়াজ চিড়বিড় করে জ্বলতে থাকে।

দ্বিতীয় খবরটি সোমাকে নিয়ে। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, ডাক্তারেরা পরীক্ষা করছে। সমস্যাটা কী বোঝার চেষ্টা করছে। সোমার অবস্থা একটু ভালো, সেই ভয়ঙ্কর ব্যথাটি আর হয় নি।

তৃতীয় খবরটির মাথামুণ্ডু বিশেষ বোঝা গেল না। কাজের ছেলেটি বালতি নিয়ে ঝরনার পানি আনতে গিয়ে ফিরে এসেছে, ঝরনা যেখানে থাকার কথা সেখানে নেই। শুনে ইমতিয়াজ শুধু তেলে-বেগুনে নয় তেলে-মরিচে জ্বলতে থাকে। মুখ খিঁচিয়ে বলল, "ঝরনা কি রসগোল্লার টুকরা যে কেউ তুলে নিয়ে গেছে?"

কাজের ছেলেটা মাথা চুলকে বলল, "সেটা তো জানি না, কিন্তু স্যার ঝরনাটা নাই।"

"সেখানে কী আছে?"

"আছে স্যার, সবকিছুই আছে, খালি ঝরনাটা নাই।"

ইমতিয়াজ খুব রেগেমেগে বলল, "আমার সাথে রং তামাশা কর? সবকিছু আছে আর ঝরনাটা নাই মানে? ঝরনার পানি শুকিয়ে গেছে?"

"জি না। পানি শুকায় নাই। পানি আছে।"

"পানি আছে তা হলে ঝরনা নাই মানে?" ইমতিয়াজ খুব রেগে উঠে বলল, "পানি কি তা হলে আসমানে উঠে যাচ্ছে?"

কাজের ছেলেটা চিন্তিতভাবে বলল, "মনে হয় সেরকমই।"

নেহায়েত সোমাদের বাসায় বেড়াতে এসেছে, তা না হলে ইমতিয়াজ নিশ্চয়ই কাজের ছেলেটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কিছু একটা কাণ্ড করে ফেলত।

সোমার খবর পেয়ে শাহনাজের মনটা একটু শান্ত হয়েছে। বিকেলবেলা সে তখন আবার হাঁটতে বের হল। চা-বাগানের শ্রমিকেরা কাজ শেষে ফিরে আসছে, ছোট ছোট বাচ্চারা মায়ের পিছু পিছু ছুটে যাচ্ছে। সবাই ধুলায় পা ডুবিয়ে হেঁটে যাচ্ছে—দেখে কী মজা লাগে! শাহনাজ একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলল, সে যদি এ রকম খালি পায়ে ধুলায় ছুটে যেত তা হলে সবাই নিশ্চয়ই হা হা করে বলবে, সর্বনাশ! সর্বনাশ! হুকওয়ার্ম হবে। টিটেনাস হবে! হ্যান হবে। ত্যান হবে!

AMARBOI.COM

চা-বাগানের পথ ধরে আরো কিছুদূর হেঁটে গিয়ে হঠাৎ ক্যাপ্টেন ডাবলুকে পেয়ে গেল, বিদ্‌ঘুটে কী একটা জিনিস কানে লাগিয়ে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে কিছু একটা শুনছে। শাহনাজ এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "ক্যাপ্টেন ডাবলু! কী শুনছ এত মন দিয়ে?"

ক্যাপ্টেন ডাবলু শাহনাজকে দেখে বেশ খুশি হয়ে উঠল। বলল, "নতুন একটা ট্রান্সমিটার তৈরি করেছি তো, সেটার রেঞ্জ টেস্ট করছি। অনেকদূর থেকে শোনা যায়।"

"তাই নাকি?"

"হুম।"

"দেখি কী রকম শোনা যায়?"

শাহনাজকে শুনতে দিতে ক্যাপ্টেন ডাবলুর কেমন যেন উৎসাহের অভাব মনে হল। একরকম জোর করেই শাহনাজকে বিদ্‌ঘুটে জিনিসটা নিয়ে কানে লাগাতে হল এবং কানে লাগাতেই সে একেবারে চমকে ওঠে, শুনতে পেল কেউ একজন প্রচণ্ড বকাবকি করছে, "কান ছিঁড়ে ফেলব পাজি ছেলে—এক্ষুনি এসে দরজা খুলে দে, না হলে দেখিস আমি তোর কী অবস্থা করি—"

শাহনাজ অবাক হয়ে বলল, "কে কথা বলছে?"

"আম্মা।"

"কাকে বকছেন?"

"আমাকে।"

"কেন?"

"আমার ট্রান্সমিটার টেস্ট করার জন্য একজন মানুষের দরকার ছিল, কাউকে পাই না তাই—"

শাহনাজ চোখ কপালে তুলে বলল, "তাই কী?"

"তাই আম্মাকে ঘরের বাইরে থেকে তালা মেরে দিয়েছি, জানালায় রেখেছি মাইক্রোফোন। আম্মা একটানা চিৎকার করছে তাই টেস্ট করতে খুব সুবিধে।"

শাহনাজ কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারে না। কোনোমতে সামলে নিয়ে বলল, "তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? যাও এক্ষুনি দরজা খুলে দিয়ে এস।"

ক্যাপ্টেন ডাবলু বলল, "তুমি পাগল হয়েছ শাহনাজ আপু? এখন বাসায় গেলে উপায় আছে? আম্মা আস্ত রাখবে ভেবেছ?"

"তা হলে?"

ক্যাপ্টেন ডাবলু পকেট থেকে আরেকটা যন্ত্র বের করল, সেখানে কী একটা টিপে দিয়ে বলল, "দরজা খুলে দিলাম। রিমোট কন্ট্রোল। সন্ধেবেলা রাগ কমে যাবার পর বাসায় যাব।"

শাহনাজ খানিকক্ষণ ঐ বিচিত্র ছেলেটার দিকে তাকিয়ে রইল। একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "এইসব তুমি নিজে তৈরি করেছ?"

"হুম।"

"তার মানে তুমি একজন জিনিয়াস? সব কিছু বোঝ?"

"বইয়ে লেখা থাকলে সেটা বুঝি।"

"পরীক্ষায় তুমি ফার্স্ট হও?"

ক্যাপ্টেন ডাবলু একটু অবাক হয়ে শাহনাজের দিকে তাকাল, "পরীক্ষায় কীভাবে ফার্স্ট হব? পরীক্ষায় কি এইগুলো লিখতে দেয়? গতবার তো আমার পাস করা নিয়ে টানাটানি হয়েছিল। আব্বা গিয়ে হেডমাস্টারকে অনেক বুঝিয়ে কোনোভাবে প্রমোশন দিতে রাজি করিয়েছে।" ক্যাপ্টেন ডাবলু একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, "তারপর যা বিপদ হয়েছে!"

"কী বিপদ?"

"আব্বা আমার পুরো ল্যাবরেটরি বইপত্র সব জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছিল। সেই জন্যই তো আসল এক্সপেরিমেন্টগুলো টপ সিক্রেট করে ফেলেছি!"

শাহনাজ খানিকক্ষণ এই বিচিত্র ছেলেটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তুমি একটু পড়াশোনা করলেই তো সব পারবে। পারবে না?"

"নাহ।"

"কী বলছ পারবে না! নিশ্চয়ই পারবে।"

"না, আমি পড়তেই পারব না। যেটা পড়তে ভালো লাগে না সেটা পড়ার চেষ্টা করলে ব্রেনের নিউরনগুলোর সব সিনাপ্স উল্টাপাল্টা হয়ে যায়।"

শাহনাজ কী বলবে বুঝতে পারল না। জিজ্ঞেস করল, "তোমার কী কী জিনিস পড়তে ভালো লাগে না?"

"বাংলা ইংরেজি ইতিহাস ভূগোল পৌরনীতি এইসব।"

"আর কী পড়তে ভালো লাগে?"

"ক্যালকুলাস, ফিজিক্স এইসব।"

AMARBOI.COM

শাহনাজ চমকে উঠল, ১১/১২ বছরের ছেলে, ক্যালকুলাস করতে পারে! সে একটু অবাক হয়ে বলল, "তুমি ক্যালকুলাস পার?"

"বেশি পারি না। একটা রকেট পাঠালে সেটা অরবিটে যেতে হলে কী করতে হবে সেইটা করার জন্য ক্যালকুলাস শিখেছিলাম। তারপরে দেখলাম—"

"কী দেখলে?"

"কম্পিউটারে প্রোগ্রাম করেই বের করে ফেলা যায়।"

"তুমি কম্পিউটারে প্রোগ্রামিং করতে পার?"

"কিছু পারি।" ক্যাপ্টেন ডাবলু একটা নিশ্বাস ফেলল, বলল, "কিন্তু আমার আম্মা বেশিক্ষণ আমাকে কম্পিউটার ব্যবহার করতে দেয় না।"

"তুমি কী কী প্রোগ্রামিং কর?"

"জাভা, সি প্লাস প্লাস এইসব সোজা-সোজা প্রোগ্রাম। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সটা ভালো পারি না। দাবা খেলার একটা প্রোগ্রাম লিখেছি, একেবারে ভালো হয় নাই। বারো-চৌদ্দ দানের মাঝে হারিয়ে দেওয়া যায়।"

শাহনাজ আড়চোখে ক্যাপ্টেন ডাবলুকে দেখল। তাদের বাসাতেও একটা কম্পিউটার আছে। খুব সাবধানে সেখানে কম্পিউটার-গেম খেলা হয়, তার বেশি কিছু নয়। আর এই বাচ্চা ছেলে সেখানে নাকি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করে প্রোগ্রামিং করে! কী সাংঘাতিক ব্যাপার! শাহনাজ ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করল, "ফিজিক্সে তুমি কী কী পড়?"

"সবচেয়ে ভালো লাগে রিলেটিভিটি।"

"তুমি রিলেটিভিটি জান?"

"শুধু স্পেশাল রিলেটিভিটি। জেনারেলটা বুঝি না। খুব কঠিন।"

"ও।"

"আমার মনে হয় কোয়ান্টাম মেকানিক্সটা ঠিক না। কিছু ভুলত্রুটি আছে।"

"ভুলত্রুটি আছে?"

"হ্যাঁ। যেমন মনে কর আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপাল বলে এনার্জি আর টাইম একসাথে মাপা যায় না। এখন যদি মনে কর—"

শাহনাজ লজ্জায় লাল হয়ে বলল, "ক্যাপ্টেন ডাবলু—আমি আসলে আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপাল জানি না।"

ক্যাপ্টেন ডাবলু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "এইটাই হচ্ছে সমস্যা। এইসব বিষয় নিয়ে কথা বলার কোনো লোক পাই না।"

"তোমার স্কুলের স্যারদের সাথে চেষ্টা করে দেখেছ?"

ক্যাপ্টেন ডাবলু কেমন জানি আতঙ্কের দৃষ্টিতে শাহনাজের দিকে তাকাল, বলল, "তুমি কি পাগল হয়েছ শাহনাজ আপু? একবার চেষ্টা করেছিলাম। স্যার মনে করেছে আমি তার সাথে মশকরা করছি, তারপর আমাকে ধরে সে কী পিটুনি!"

শাহনাজ মাথা নাড়ল, তার হঠাৎ মোবারক আলী স্যারের কথা মনে পড়ে গেল। স্যার আশপাশে নেই জেনেও সে হঠাৎ কেমন জানি শিউরে ওঠে। ক্যাপ্টেন ডাবলু একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "তবে লাল্টুকে বললে সে খুব মন দিয়ে শোনে। কোনো আপত্তি করে না। বেশিক্ষণ বললে শুধু ঘুমিয়ে যায়, এইজন্যে একটানা বেশিক্ষণ বলা যায় না।"

শাহনাজ কী বলবে বুঝতে পারল না। দশজন থেকে আলাদা হওয়ার মনে হয় খুব বড় সমস্যা। তার হঠাৎ এই ছোট বিজ্ঞানীটির জন্য একরকম মায়া হতে থাকে।

AMARBOI.COM

৪

সকালবেলা শাহনাজের ঘুম ভাঙল এক ধরনের মনখারাপ ভাব নিয়ে। এখানে সে বেড়াতে এসেছিল আনন্দ করার জন্য—এখন বোঝাই যাচ্ছে আনন্দ দূরে থাকুক, সময় কাটানো নিয়ে সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। মন ভালো থাকলে যেটাই করা যায় তাতেই আনন্দ হয়, আর মন খারাপ থাকলেই কিছুই করতে ভালো লাগে না। এখানে আসার সময় এতগুলো মজার মজার বই নিয়ে এসেছে, এখন কোনোটাই খুলে দেখতে ইচ্ছে করছে না। সোমাকে যদি হাসপাতালেই থাকতে হয় তা হলে শাহনাজদের তো আর একা একা বাসায় থাকার কোনো কারণ নেই। কীভাবে ফিরে যাবে ইমতিয়াজের সাথে কথা বলে সেটা ঠিক করতে হবে—পুরো ব্যাপারটা চিন্তা করে শাহনাজের আরো বেশি মনখারাপ হয়ে গেল।

ঘুম থেকে উঠে নাশতা করার সময় শাহনাজ আবিষ্কার করল ইমতিয়াজ কোথায় জানি যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। জিজ্ঞেস করে কোনো লাভ নেই জেনেও শাহনাজ জিজ্ঞেস করল, "ভাইয়া, তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

উত্তর না দিয়ে মুখ ভেংচে টিটকারি করে কিছু একটা বলবে ভেবেছিল কিন্তু শাহনাজকে অবাক করে দিয়ে ইমতিয়াজ প্রশ্নের উত্তর দিল। বলল, "ঝরনাটা নিজের চোখে দেখে আসতে চাই। জলজ্যান্ত একটা ঝরনা কীভাবে উধাও হতে পারে ইনভেস্টিগেট করা দরকার।" মুখে খুব একটা গম্ভীর ভাব করে বলল, "মনে হয় কোনো জিওলজিক্যাল একটিভিটি হচ্ছে। দেখে আসি।"

ইমতিয়াজের প্রস্তুতি দেখে অবশ্য মনে হল সে দুই মাইল দূরে একটা ঝরনা দেখতে যাচ্ছে না, মরুভূমি বন প্রান্তর সমুদ্র পার হয়ে আফ্রিকার জঙ্গলে অভিযান করতে যাচ্ছে। একটা ব্যাক প্যাকে তার জন্য দুইটা স্যান্ডউইচ, দুইটা কোল্ড ড্রিংক এবং কিছু ফলমূল দিতে হল। ব্যান্ডেজ, এন্টিসেপটিক লোশন, মাথাব্যথার ট্যাবলেট, ছুরি, নাইলনের দড়ি কিছুই বাকি থাকল না। টি-শার্টের ওপর সোয়েটার, তার ওপর জ্যাকেট, মাথায় বেসবল ক্যাপ, পায়ে টেনিস শু—এক কথায় পুরোপুরি অভিযাত্রী। রওনা দেওয়ার সময় অবশ্য কাজের ছেলেটাকে সাথে সাথে যেতে হল কারণ ইমতিয়াজের নিজের দুই মাইল ব্যাক প্যাক টেনে নেওয়ার শক্তি নেই এবং এই নির্জন জংগুলে জায়গায় যদি বাঘ-ভালুক তাকে খেয়ে ফেলে সেটা নিয়েও একটা ভয় রয়েছে।

ইমতিয়াজ চলে যাবার পর শাহনাজ সোমার খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করল। কোনো একটি বিচিত্র কারণে চা-বাগানে টেলিফোনের অবস্থা খুব ভালো না। সোমাদের বাসায় যেটা আছে সেটা দিয়েও খুব সহজে কোথাও ডায়াল করা যায় না। সোমা যে হাসপাতালে আছে সেটার টেলিফোন নম্বরটাও জানা নেই—ইচ্ছে থাকলেও খোঁজ নিতে পারবে না। চা-বাগানের একটা বড় ফ্যাক্টরি আছে, সেখানে অনেকে আছেন, তাদের সাথে কথা বললে হয়তো কেউ খোঁজ দিতে পারবে। শাহনাজ দুপুরবেলা একবার খোঁজ নেওয়ার জন্য বের হবে বলে ঠিক করল।

শাহনাজের হিসাব অনুযায়ী ইমতিয়াজ ফিরে আসতে আসতে একেবারে বিকেল হয়ে যাবার কথা—শহুরে আঁতেল ধরনের মানুষেরা আসলে দুর্বল প্রকৃতির হয়, সিগারেট খেয়ে ফুসফুসের বারোটা বাজিয়ে রাখে বলে হাঁটাহাঁটি করতে পারে না। পাহাড়ি জঙ্গলের পথে দুই মাইল হেঁটে যেতে এবং ফিরে আসতে ইমতিয়াজের একেবারে বারোটা বেজে যাবে—কাজেই সে যে বেলা ডুবে যাবার আগে ফিরে আসতে পারবে না, সে ব্যাপারে শাহনাজের

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো সন্দেহই ছিল না। ফিরে এসেও সে যে এই দুই মাইল হেঁটে যাওয়া নিয়ে এমন বিশাল একটা গল্প ফেঁদে বসবে শাহনাজ সেটা নিয়েও একেবারে নিশ্চিত ছিল।

কিন্তু আসলে যেটা ঘটল সেটার জন্য শাহনাজ একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। ইমতিয়াজ ফিরে এল দুপুরের আগেই এবং যখন সে ঘরে এসে ঢুকেছে তখন তাকে দেখলে যে-কেউ বলবে সে বুঝি পুরোপুরি পাগল হয়ে গেছে। উত্তেজনায় সে কথাই বলতে পারছিল না। কাজেই কাজের ছেলেটার কাছে জিজ্ঞেস করতে হল। কিন্তু সে মাথা চুলকে জানাল যে ইমতিয়াজ কী বিষয় নিয়ে এত উত্তেজিত হয়ে আছে সে বুঝতে পারছে না। তার ধারণা ইমতিয়াজ সেখানে কিছু একটা দেখে এসেছে। শাহনাজ খুব কৌতূহল নিয়ে ইমতিয়াজকে জিজ্ঞেস করল, "ভাইয়া তুমি কী দেখেছ?"

ইমতিয়াজ উত্তর না দিয়ে বুকে থাবা দিয়ে বলল, "আমি বিখ্যাত হয়ে গেছি। ওয়ার্ল্ড ফেমাস। কেউ আর আটকাতে পারবে না।"

পোস্ট মডার্ন কবিতা লিখে ইমতিয়াজ একদিন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও লজ্জার মাঝে ফেলে দেবে এ রকম একটা কথা শাহনাজ অবশ্য আগেও শুনেছে কিন্তু এটি মনে হয় অন্য ব্যাপার। সে জানতে চাইল, "কী জন্য তুমি বিখ্যাত হয়ে গেছ?"

"আমি এমন জিনিস আবিষ্কার করেছি যেটা সারা পৃথিবীর কেউ কোনোদিন দেখে নাই, কোনোদিন কল্পনাও করে নাই। শুধু স্বপ্ন দেখেছে!" ইমতিয়াজ এই পর্যায়ে উঠে দাঁড়িয়ে একপাক ভরতনাট্যম কিংবা খেমটা নাচ দিয়ে চিৎকার করে বলল, "এখন আমি বি.বি.সি'র সাথে ইন্টারভিউ দেব, সি. এন. এন.-এর সাথে ইন্টারভিউ দেব। টাইম, নিউজউইকের কভারে আমার ছবি ছাপা হবে, রিডার্স ডাইজেস্টে আমার ওপর লেখা বের হবে—"

ইমতিয়াজ কথা বন্ধ করে দুই হাত উপরে তুলে 'ইয়াহু' বলে একটা চিৎকার দিল।

শাহনাজের হঠাৎ সন্দেহ হতে থাকে ইমতিয়াজকে পথেঘাটে কেউ কোনো ড্রাগ খাইয়ে দিয়েছে কি না। সে কাজের ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করল, "ভাইয়াকে কেউ কিছু খাইয়ে দিয়েছে নাকি? ধুতুরার বীজ না হলে অন্য কিছু?"

কাজের ছেলেটা ফ্যাকাসে মুখে বলল, "সেটা তো জানি না, আমি নিচে ছিলাম। স্যার একা টিলার উপরে উঠলেন, তারপর থেকে এইরকম অবস্থা।"

অন্য কোনো সময় হলে ওদের এই কথা শুনে ইমতিয়াজ রেগেমেগে চিৎকার করে একটা কাণ্ড করত, এখন বরং হা হা করে হেসে উঠল। বলল, "ভাবছিস আমি নেশা করছি? শুনে রাখ এইটা এমন ব্যাপার, কেউ যদি শোনে তার নেশা জন্মের মতো ছুটে যাবে।"

"কেন? কী হয়েছে?"

"সেই পাহাড়ে আমি কী দেখেছি জানিস?"

"কী?"

"একটা জলজ্যান্ত স্পেসশিপ!"

শাহনাজ ভুরু কুঁচকে বলল, "কী বললে? স্পেসশিপ?"

"হ্যাঁ। এরিখ ফন দানিকেন যেটা বলেছিলেন সেটাই মনে হয় সত্যি।" ইমতিয়াজের গলা হঠাৎ আবেগে কেঁপে ওঠে, "এই পৃথিবীর মানুষেরা হয়তো এসেছে গ্রহান্তর থেকে— এই চা-বাগানে পাহাড়ের নিচে লুকিয়ে আছে সেই মহাকাশযান—পৃথিবীর ইতিহাস হয়তো আবার নতুন করে লিখতে হবে, সেই ইতিহাসের মাঝে যে নাম অক্ষয় হয়ে থাকবে সেটা হচ্ছে—" ইমতিয়াজ ধুমসো গরিলার মতো বুকে থাবা দিয়ে বলল, "ইমতিয়াজ আহমেদ।"

শাহনাজ এখনো পুরো ব্যাপারটি বুঝতে পারছে না। সত্যি সত্যি যদি ইমতিয়াজ একটা স্পেসশিপ খুঁজে পায় সেটা নিশ্চয়ই সাংঘাতিক একটা ব্যাপার, কিন্তু ইমতিয়াজের এই নর্তনকুর্দন দেখে কোনোকিছুই ঠিকভাবে বুঝতে পারছে না। পুরো ব্যাপারটাই নিশ্চয়ই এক ধরনের বিকট রসিকতা কিন্তু ইমতিয়াজকে দেখে সেটা বোঝার উপায় নেই।

ইমতিয়াজ বুকে থাবা দিয়ে বলল, "খালি কি বিখ্যাত হব? নো–ও–ও–ও–ও! নো–নো–নো! খ্যাতির সাথে আসবে ডলার। সবুজ সবুজ ডলার। বস্তা বস্তা ডলার! এই বান্দা বড়লোক হয়ে যাবে। বিখ্যাত এবং বড়লোক। কোথায় সেটল করব জানিস? মায়ামিতে! গরমের সময় চলে যাব সিয়াটল!"

শাহনাজ ইমতিয়াজের প্রলাপের মাঝে একটু অর্থ খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে থাকে। যেরকম উত্তেজিত হয়েছে, মনে হয় আসলেই কিছু একটা দেখেছে। চা–বাগানের কাছে পাহাড়ের নিচে স্পেসশিপ খুঁজে পাওয়া ব্যাপারটি প্রায় অসম্ভব, কিন্তু সত্যিই যদি হয়ে থাকে? শাহনাজ ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করল, "ভাইয়া, তুমি কেমন করে জান সেটা স্পেসশিপ?"

"আমি জানি। তুই স্পেসশিপ দেখলে চিনতে পারবি না, কিন্তু আমি পারি।" ইমতিয়াজ আবার বুকে থাবা দিল। যেভাবে খানিকক্ষণ পরপর বুকে থাবা দিচ্ছে, বুকের পাঁজরের এক–আধটা হাড় না আবার ভেঙে যায়।

"আমাকে নিয়ে যাবে সেখানে? আমিও দেখে আসি?"

হঠাৎ করে ইমতিয়াজ চুপ করে গেল, তার চোখ দুটো ছোট হয়ে যায়, আর সে এক ধরনের কুটিল চোখে শাহনাজের দিকে তাকাল। কিছু একটা ষড়যন্ত্র ধরে ফেলেছে এ রকম ভাব করে বলল, "ও! আমাকে তুই বেকুব পেয়েছিস? ভেবেছিস আমি কিছু বুঝি না?"

শাহনাজ অবাক হয়ে বলল, "তুমি কী বোঝ না?"

"তোরও শখ হয়েছে বিখ্যাত হবার? টাইম নিউজউইকের কভার?" ইমতিয়াজ বাংলা সিনেমার ভিলেনদের মতো পা দাপিয়ে চিৎকার করে বলল, "নেভার।" তারপর বুকে আঙুল দিয়ে বলল, "আমি এটা আবিষ্কার করেছি, বিখ্যাত হব আমি। আমি। আমি আমি। আমি একা। বুঝেছিস?"

শাহনাজের সন্দেহ হতে থাকে যে তার ভাইয়ের মাথাটা মনে হয় একটু খারাপই হয়ে গেছে। সে অবাক হয়ে ইমতিয়াজের দিকে তাকাল। ইমতিয়াজ আঙুল দিয়ে চুল ঠিক করে বলল, "এখন আমি সেখানে ফিরে যাব ক্যামেরা নিয়ে। সেই ক্যামেরায় ছবি তুলে রাখব। এক–একটা ছবি বিক্রি হবে এক মিলিয়ন ডলারে। বুঝেছিস?"

"কিন্তু তুমি কি ক্যামেরা এনেছ?'

"কিন্তু তুই তো এনেছিস?" ইমতিয়াজ চোখ লাল করে বলল, "আনিস নি?"

"হ্যাঁ।"

"দে ক্যামেরা বের করে এক্ষুনি। না হলে খুন করে ফেলব।"

শাহনাজ কোনো কথা বলল না। তাড়াতাড়ি সুটকেস খুলে আব্বার ক্যামেরাটা বের করে দিল। ইমতিয়াজ সেটা ছোঁ মেরে নিয়ে দাঁত কিড়মিড় করে বলল, "পৃথিবীর ইতিহাস নতুন করে লিখবে এই ইমতিয়াজ আহমেদ!"

ইমতিয়াজ ক্যামেরাটা নিয়েই ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল। শাহনাজ জিজ্ঞেস করল, "ছবি তুলে তুমি কি এখানে আসবে? নাকি সোজাসুজি ঢাকা চলে যাবে?"

"সোজাসুজি ঢাকা যাব, কেন?"

"আমিও ঢাকা যাব।"

ইমতিয়াজ চিড়বিড় করে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বলল, "এখন আমার আর কোনো কাজ নেই তোকে ঘাড়ে করে ঢাকা নিয়ে যাই!"

"তা হলে আমি ঢাকা যাব কেমন করে?"

"সেটার আমি কী জানি? তোকে এখানে পৌছে দেওয়ার কথা ছিল, পৌছে দিয়ে গেছি। ব্যস আমার কাজ শেষ।"

শাহনাজ রাগের চোটে কী বলবে বুঝতে পারল না। অনেক কষ্ট করে বলল, "ভাইয়া, এখানে আর কেউ নেই। চাচা-চাচি কবে আসবে আমি কিছু জানি না—"

"তোর সমস্যাটা কী? বাসায় কাজের মানুষ আছে, বুয়া আছে, তোকে দেখেশুনে রাখবে।"

"ঐ পাহাড়ে গিয়ে তোমার কোনো বিপদ-আপদ হয় কি না সেটা কীভাবে বুঝব?"

"হবে না।"

"যদি হয় তা হলে তো জানতেও পারব না।"

ইমতিয়াজ মুখ ভেংচে বলল, "আমার জন্য তোর যদি এত দরদ তা হলে ঢাকায় ফোন করে খোঁজ নিস।"

"এই চা-বাগানের ফোন কাজ করে না, কিছু না—"

ইমতিয়াজ ধমক দিয়ে বলল, "এখন আমি তোর জন্য এখানে মোবাইল ফোনের অফিস বসাব নাকি?"

কাজেই ইমতিয়াজ দুপুরবেলা পাহাড়ের উদ্দেশে রওনা দিল। যাবার আগে শেষ কথাটি ছিল বিবিসি টেলিভিশনটা ধরে রাখতে। পরদিন সেখানে তাকে নাকি দেখা যাবে।

AMARBOI.COM

রাতটা শাহনাজ একটু দুশ্চিন্তা নিয়ে কাটাল। ইমতিয়াজ বিখ্যাত হয়ে কোটি কোটি ডলারের মালিক হয়ে গেলে তার কোনো আপত্তি নেই। এক বাসায় থাকতে হলে হয়তো জীবনটা বিষাক্ত করে দিত, কিন্তু নিজেই বলেছে আমেরিকা গিয়ে থাকবে, কাজেই একদিক দিয়ে ভালোই। কিন্তু একা একা কোনো পাহাড়ে গিয়ে, কি স্পেসশিপের ছবি তুলে ফিরে যেতে যদি কোনো বিপদে পড়ে, কেউ তো জানতেও পারবে না। শাহনাজ স্বীকার করছে তার এই ভাইয়ের জন্য বুকের মাঝে ভালবাসার বান ছুটছে না, কিন্তু সবকিছু নিরাপদ আছে—মনের শান্তির জন্য এইটুকু তো জানা দরকার।

সকালে উঠে সে ঢাকায় তাদের বাসায় ফোন করার চেষ্টা করল, কিন্তু চা-বাগানের টেলিফোন কানেকশন কিছুতেই বাগান থেকে বের হতে পারল না। কী করবে সে ভেবে পাচ্ছিল না। বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসে বসে চিন্তা করছে, তখন হঠাৎ সে ক্যাপ্টেন ডাবলুকে দেখতে পেল, লম্বা লোহার মতো একটা জিনিসের আগায় চ্যাপ্টা থালার মতো একটা জিনিস লাগানো, একপাশে একটা ছোট বাক্সের মতো, সেখান থেকে কিছু তার হেডফোনে এসে লেগেছে, গভীর মনোযোগ দিয়ে কিছু একটা শুনতে শুনতে হেঁটে যাচ্ছে। শাহনাজ উঠে দাঁড়িয়ে ডাকল, "ক্যাপ্টেন ডাবলু।"

প্রথম ডাকে শুনতে পেল না, দ্বিতীয় ডাকে ঘুরে শাহনাজের দিকে তাকাল। তাকে দেখে খুশি হয়ে সবগুলো দাঁত বের করে হেসে বলল, "শাহনাজ আপু! এই দেখ মেটাল ডিটেক্টর তৈরি করেছি।"

"মেটাল ডিটেক্টর? কী হয় এটা দিয়ে?"

"মাটির নিচে কোনো গুপ্তধন থাকলে খুঁজে বের করে ফেলব।"

"খুঁজে পেয়েছ কিছু?"

"এখনো পাই নাই, দুইটা পেরেক আর একটা কৌটার মুখ পেয়েছি।"

কথা বলতে বলতে শাহনাজ বারান্দা থেকে নেমে রাস্তায় ক্যাপ্টেন ডাবলুর কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল এবং হঠাৎ করে তার একটা কথা মনে হল, ক্যাপ্টেন ডাবলুকে নিয়ে সে কি ঝরনার কাছে রহস্যময় স্পেসশিপটা দেখে আসতে পারে না?

ক্যাপ্টেন ডাবলু কান থেকে হেডফোন খুলে তার মেটাল ডিটেক্টরের সুইচ অফ করে জিজ্ঞেস করল, "শাহনাজ আপু, তুমি আর কত দিন আমাদের চা-বাগানে থাকবে?"

শাহনাজ ইতস্তত করে বলল, "আমি আসলে জানি না। আমি তো সোমা আপুর কাছে বেড়াতে এসেছিলাম কিন্তু সেই সোমা আপুই হাসপাতালে। আমি এখানে থেকে কী করব?"

ক্যাপ্টেন ডাবলু ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারল বলে মনে হল না, তবে সে বেশি মাথা ঘামাল না, মাথা নেড়ে বলল, "যদি চলেই যাও তা হলে এখানে দেখার মতো যেসব জিনিস আছে সেগুলো দেখে যাও।"

"কী আছে দেখার মতো?"

"ফ্যাক্টরিটা দারুণ। গ্যাস দিয়ে যে হিটার তৈরি করেছে সেটা একেবারে জেট ইঞ্জিনের মতো। ইস্! আমার যদি একটা থাকত!"

"থাকলে কী করতে?"

"কত কী করা যেত। একটা হোভার ক্র্যাফটই বানাতাম।"

"আর কী আছে দেখার মতো?"

ক্যাপ্টেন ডাবলু একটু চিন্তা করে বলল, "বাগানের একপাশে একটা ছোট নদীর মতো আছে, তার পাশে একটা পেট্রিফাইড উড আছে। বিশাল গাছ ফসিল হয়ে আছে। আমি একটুকরা ভেঙে এনেছি, কার্বন ডেটিং করতে পারলে কত পুরোনো বের করতে পারতাম।"

শাহনাজ ক্যাপ্টেন ডাবলুর সব কথা ঠিক বুঝতে পারল না, কিন্তু সেটা আর প্রকাশ করল না; জিজ্ঞেস করল, "এখানে আর কী কী দেখার আছে? একটা নাকি ঝরনা আছে?"

"হ্যাঁ একটা ঝরনা আছে। এক শ তেপ্পান্ন মিটার উপর থেকে পানি পড়ছে।"

"এক শ তেপ্পান্ন?"

"হ্যাঁ আমি মেপেছি।"

শাহনাজ ক্যাপ্টেন ডাবলুকে একনজর দেখে বলল, "তুমি জান সেই ঝরনাটা অদৃশ্য হয়ে গেছে?"

ক্যাপ্টেন ডাবলু অবাক হয়ে শাহনাজের দিকে তাকাল, "অদৃশ্য হয়ে গেছে!"

"হ্যাঁ। আমার ভাই দেখতে গিয়েছিল, যেখানে ঝরনাটা ছিল সেখানে ঝরনাটা নাই।"

"অসম্ভব।" ক্যাপ্টেন ডাবলু মাথা নাড়ল, "এই ঝরনাটায় সারা বছর পানি থাকে।"

বলা ঠিক হবে কি না শাহনাজ বুঝতে পারল না, কিন্তু না বলেও পারল না, গলা নামিয়ে বলল, "ঐ ঝরনার কাছে নাকি একটা স্পেসশিপ পাওয়া গেছে।"

স্পেসশিপ নিয়ে ক্যাপ্টেন ডাবলুকে একটুও উত্তেজিত হতে দেখা গেল না। সে মনে মনে কী একটা হিসাব করে বলল, "প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ষোল শ কিউবিক ফুট পানি আসে। এত পানি যদি ঝরনা দিয়ে না এসে অন্য কোথাও যায়, সেখানে পানি জমে যাবে! ঝরনা বন্ধ হতে পারে না।"

"কিন্তু স্পেসশিপ—"

"পৃথিবীতে কমিউনিকেশান্স এত ভালো হয়েছে যে কারো চোখকে ফাঁকি দিয়ে এখানে স্পেসশিপ আসতে পারবে না। যদি সত্যি সত্যি এখানে স্পেসশিপ এসে হাজির হয় তা হলে সারা পৃথিবী থেকে সায়েন্টিস্টরা হাজির হবে।"

শাহনাজ আবার চেষ্টা করল, "কিন্তু আমার ভাই বলেছে সে নিজের চোখে দেখেছে।"

"অন্য কিছু দেখেছেন মনে হয়।" ক্যাপ্টেন ডাবলু তার মেটাল ডিটেক্টরটা কাঁধে নিয়ে বলল, "যাই, দেখে আসি।"

"কী দেখে আসবে?"

"ঝরনাটা। পানি কোথায় গেছে?"

"আমিও যাব তোমার সাথে।"

"চল।"

শাহনাজ একটু ইতস্তত করে বলল, "তোমার আম্মা-আব্বা আবার কিছু বলবেন না তো?"

"ঝরনাতে গেলে কিছু বলবেন না, কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"না থাক! শুনলে তুমি আবার হাসাহাসি করবে। প্যারাসুটের দড়িটা যে পেঁচিয়ে যাবে সেটা কি আমি জানতাম?"

ঝরনার সাথে প্যারাসুটের দড়ির কী সম্পর্ক, প্যারাসুটের দড়িটা কোথায় পেঁচিয়ে গেল, কেন সেটা হাসাহাসির ব্যাপার, আর সত্যি যদি হাসাহাসির ব্যাপার হয় তা হলে ক্যাপ্টেন ডাবলুর আব্বা-আম্মা কেন রাগারাগি করলেন শাহনাজ কিছুই বুঝতে পারল না। কিন্তু শাহনাজ এই মুহূর্তে সেটা নিয়ে আর কথা বাড়াল না। বলল, "চল তা হলে যাই।"

ক্যাপ্টেন ডাবলু বলল, "তুমি একটু দাঁড়াও, আমি বাসা থেকে আমার টেস্টিং প্যাক নিয়ে আসি।"

"টেস্টিং প্যাক?"

"হ্যাঁ।"

"কী আছে তোমার টেস্টিং প্যাকে?"

"টেস্ট করতে যা যা লাগে। মাল্টিমিটার থেকে শুরু করে বাইনোকুলার। বাইরে গেলে আমি সাথে নিয়ে যাই।"

"ঠিক আছে তা হলে, তুমি নিয়ে আস। আমিও রেডি হয়ে নিই।"

শাহনাজও তার ব্যাগটা নিয়ে নেয়। ক্যাপ্টেন ডাবলুর মতো পুরোপুরি টেস্টিং প্যাক তার নেই, কিন্তু খাবার জন্য দুই-একটা স্যান্ডউইচ, বিস্কুটের প্যাকেট, কয়েকটা কমলা, বোতল ভরা পানি, ছোট একটা তোয়ালে, মাথাব্যথার ওষুধ, এন্টিসেপটিক টেপ এবং ছোট একটা নোটবই আর পেন্সিল নিয়ে নিল।

কিছুক্ষণের মাঝেই ক্যাপ্টেন ডাবলু এসে হাজির হল। তার টেস্টিং প্যাক দেখে শাহনাজের আক্কেল গুড়ুম হয়ে যায়। বিশাল একটা ব্যাক প্যাক একেবারে নানা জিনিসপত্র দিয়ে ঠাসা! জিনিসপত্রের ভারে ক্যাপ্টেন ডাবলু একেবারে কুজো হয়ে গেছে, একটা মোটা লাঠি ধরে কোনোমতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শাহনাজ চোখ কপালে তুলে বলল, "এতবড় বোঝা নিয়ে তুমি কেমন করে যাবে?"

ক্যাপ্টেন ডাবলু মাথা নেড়ে বলল, "যেতে পারব। আস্তে আস্তে যেতে হবে। পাওয়ার আর এনার্জির ব্যাপার। অল্প করে পাওয়ার বেশি সময় ধরে খরচ করলেই হবে।"

AMARBOI.COM

"এক কাজ করা যাক, তোমার কিছু জিনিস আমার ব্যাগের ভিতর দিয়ে দাও।"

"না, না। আমার সব টেস্টিং যন্ত্রপাতি এক জায়গায় থাকুক।"

শাহনাজ শুনেছে বিজ্ঞানীরা নাকি নিজেদের যন্ত্রপাতি নিয়ে খুব খুঁতখুঁতে হয় তাই সে আর জোর করল না। বলল, "ঠিক আছে। তুমি কিছুক্ষণ নাও, তারপর আমি নেব।"

ক্যাপ্টেন ডাবলুর কথাটা একেবারে অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। সত্যিই তারা 'দেখতে দেখতেই' পৌঁছাল। নির্জন পথটায় এত সুন্দর ছোট ছোট টিলা, গাছপালা, ফুল, লতাপাতা যে তার সৌন্দর্য দেখতে দেখতেই পৌঁছে গেল। ক্যাপ্টেন ডাবলুর টেস্ট প্যাকটা দুজনে মিলে টেনে নিতে গিয়ে অবশ্য একেবারে কালো ঘাম ছুটে গেল। ঝরনার কাছাকাছি পৌঁছানোর অনেক আগেই ক্যাপ্টেন ডাবলুর মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। সে মাথা নেড়ে বলল, "শাহনাজ আপু, তুমি ঠিকই বলেছ। ঝরনাটা নেই। ঝরনা থাকলে এখান থেকে শব্দ শোনা যেত।"

তারা আরো কাছে এগিয়ে যায়, জায়গাটা ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে উঠেছে। আশপাশে অনেক ফার্ন এবং শ্যাওলা। ক্যাপ্টেন ডাবলু বলল, "ঝরনার পানির জন্য এখানে স্যাঁতসেঁতে হয়ে থাকে তো, তাই এখানে এ রকম গাছ হয়েছিল। দেখেছ, শ্যাওলাগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে?"

ক্যাপ্টেন ডাবলুর টেস্ট প্যাক টেনে টেনে শাহনাজ শেষ পর্যন্ত একটা ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়াল। ক্যাপ্টেন ডাবলু দাঁড়িয়ে সামনে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, "শাহনাজ আপু, এই যে এখানে ঝরনাটা ছিল। ঐ উপর থেকে ঝরনার পানি এসে পড়ত।" সে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "একটা জিনিস জানো? সামনের পাহাড়টা অনেক উঁচু হয়ে গেছে!"

শাহনাজ অবাক হয়ে বলল, "পাহাড় উঁচু হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ। আগেরবার মেপেছিলাম, এটা ছিল এক শ তেপ্পান্ন মিটার উঁচু। এখন মেপে দেখি কত হয়?"

ক্যাপ্টেন ডাবলু তার টেস্ট প্যাক খুলে সেখান থেকে জ্যামিতি বাক্সের চাঁদা লাগানো একটা জিনিস বের করল, একটা টেপ দিয়ে পাহাড়ের গোড়া থেকে কিছু মাপামাপি করল, তারপর তার উচ্চতা মাপার যন্ত্রটা চোখে লাগিয়ে একটা কিছু মেপে কাগজে হিসাব করতে শুরু করল। শাহনাজ বুঝতে পারল ত্রিকোণোমিতি ব্যবহার করে উচ্চতা মাপছে—সে নিজেও মনে মনে হিসাব করতে থাকে, কিন্তু তার আগেই ক্যাপ্টেন ডাবলু ঘোষণা করল, "দুই শ এগার মিটার। তার অর্থ পাহাড়টা আটান্ন মিটার উঁচু হয়ে গেছে! ঝরনার পানি আসবে কেমন করে!"

"একটা পাহাড় উঁচু হয়ে যায় কেমন করে?" শাহনাজ অবাক হয়ে বলল, "পাহাড় তো আর গরু বাছুর না যে আগে বসে ছিল এখন উঠে দাঁড়িয়েছে।"

ক্যাপ্টেন ডাবলু মুখ গম্ভীর করে বলল, "ভূমিকম্প হলে হয়।"

"এখানে কি কোনো ভূমিকম্প হয়েছে?"

"হয় নাই। হলেও সেটা রিক্টর স্কেলে পাঁচের কম। আমার ভূমিকম্প মাপার যন্ত্র রিক্টর স্কেলে পাঁচের কম ভূমিকম্প মাপতে পারে না।"

শাহনাজ আবার মনে মনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। রিক্টর স্কেলটা কী সেটা সম্পর্কে তার ভাসা-ভাসা একটা ধারণা আছে অথচ এই ছেলে নাকি রিক্টর স্কেলে ভূমিকম্প মাপার যন্ত্র পর্যন্ত তৈরি করে ফেলেছে! পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে শাহনাজ বলল, "ভাইয়া বলেছিল এখানে নাকি একটা স্পেসশিপ নেমেছে। কিছু তো দেখতে পাচ্ছি না।"

"না।" ক্যাপ্টেন ডাবলু তার টেস্ট প্যাক থেকে বাইনোকুলার বের করে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা দেখতে দেখতে বলল, "তবে পাহাড়ের মাঝে বড় বড় ফাটল দেখা যাচ্ছে। পাথর পর্যন্ত ফেটে গেছে। কিছু একটা হয়ে গেছে এখানে।"

শাহনাজ ক্যাপ্টেন ডাবলুর কাছ থেকে বাইনোকুলারটা নিয়ে পাহাড়ের দিকে তাকাল। সত্যি সত্যি পাহাড়ের গায়ে বড় বড় ফাটল। ফাটলগুলো একেবারে নতুন তৈরি হয়েছে। পুরোনো হলে গাছগাছালি জন্মে এতদিনে ঢাকা পড়ে যেত। ক্যাপ্টেন ডাবলু বলল, "উপরে গিয়ে দেখতে হবে।"

শাহনাজের হঠাৎ কেমন জানি একটু ভয় ভয় করতে থাকে, কী আছে উপরে? পরমুহূর্তে তার ইমতিয়াজের কথা মনে পড়ল, ইমতিয়াজের মতো ভীতু মানুষ যদি একা এখানে আসতে পারে তা হলে মনে হয় ভয়ের কিছু নেই। সে বলল, "চল যাই।" তারপর ক্যাপ্টেন ডাবলুর ভয়াবহ টেস্ট প্যাকটার দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে বলল, "এটা কি সাথে নিতে হবে?"

"না। এটা রেখে যাই, শুধু ভিতর থেকে কিছু জিনিস বের করে নিই।"

ক্যাপ্টেন ডাবলু যেসব জিনিস বের করল—দুটি ওয়াকিটকি, নাইলনের দড়ি, সুইস আর্মি চাকু, ম্যাগনিফাইং গ্লাস, বড় টর্চলাইট, ছোট শাবল—সব মিলিয়ে বোঝাটি অবশ্য খুব ছোট হল না। আগে একটা ব্যাগে ছিল বলে টেনে নেওয়া সোজা ছিল, এখন জিনিসগুলো শরীরের এখানে-সেখানে ঝুলিয়ে পকেটে, হাতে করে নিতে হল বলে একদিক দিয়ে বরং একটু ঝামেলাই হল। রওনা দেবার আগে শাহনাজ তার স্যান্ডউইচগুলো বের করল। দেখে ক্যাপ্টেন ডাবলুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আনন্দে চিৎকার করে বলল, "তুমি খাবার এনেছ! আমি ভেবেছিলাম আজকে না-খেয়ে থাকতে হবে!"

"তোমার বুদ্ধিমতো খালি যন্ত্রপাতি আনলে না-খেয়েই থাকতে হত।"

ক্যাপ্টেন ডাবলু স্যান্ডউইচে বড় একটা কামড় দিয়ে বলল, "মানুষের শরীরে যদি কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন না হয়ে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন হত তা হলে কী মজা হত, তাই না?"

"কী মজা হত?"

"অল্প একটু খেলেই সারা জীবন আর খেতে হত না। সেখান থেকেই ই ইকুয়েলস টু এম সি স্কয়ার হিসেবে কত শক্তি পাওয়া যেত!"

নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশনের ব্যাপারগুলো শাহনাজ একটু জানে, তাই সে বলল, "তা হলে তোমার স্যান্ডউইচ খেতে হত না। খেতে হত ইউরেনিয়াম ট্যাবলেট।"

সাংঘাতিক একটা রসিকতা করেছে এ রকম একটা ভাব করে ক্যাপ্টেন ডাবলু হঠাৎ হা হা করে হাসতে শুরু করল। বিজ্ঞানের মানুষজন কোন্‌টাকে হাসির জিনিস বলে মনে করে সেটা বোঝা মুশকিল।

খাওয়া শেষ করে পানির বোতল থেকে ঢকঢক করে পানি খেয়ে তারা রওনা দিল। পাথরে পা রেখে তারা উপরে উঠতে থাকে। সমান জায়গায় হাঁটা সহজ, কিন্তু উপরে ওঠা এত সহজ নয়, কিছুক্ষণেই দুজনে বড় বড় শ্বাস নিতে থাকে।

সামনে একটা সমতল জায়গায় বড় বড় কয়েকটা গাছ। গাছগুলোকে পাশ কাটিয়ে তারা আবার উপরে উঠতে শুরু করে। সামনে খানিকটা খাড়া জায়গা, এটাকে ঘিরে তারা ডানদিকে সরে গেল। পাথরে পা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তারা পাহাড়ের একটা বিশাল ফাটলের সামনে এসে দাঁড়াল। ফাটলটা কোথা থেকে এসেছে দেখার জন্য দুজনে এটার পাশাপাশি হাঁটতে থাকে। সামনে একটা বড় ঝোপ, সেটাকে পাশ কাটিয়ে সামনে যেতেই ক্যাপ্টেন

ডাবলু আর শাহনাজ একসাথে চিৎকার করে উঠল। তারা বিস্ফারিত চোখে দেখতে পেল পাহাড়ের বিশাল ফাটল থেকে একটা মহাকাশযান বের হয়ে আছে। শাহনাজ আর ক্যাপ্টেন ডাবলু দুজনেরই প্রথম প্রতিক্রিয়া হল ছুটে কোথাও লুকিয়ে যাওয়া, কিন্তু দুজনেই একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারা নড়তে পারছিল না, বিশাল মহাকাশযানটি থেকে চোখ সরিয়ে নেওয়া একেবারে অসম্ভব একটি ব্যাপার। দুজনে নিশ্বাস বন্ধ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত ক্যাপ্টেন ডাবলু নাকমুখ দিয়ে বিচিত্র একটা শব্দ করে বলল, "ডেঞ্জাস্টিক!"

শাহনাজ ফিসফিস করে বলল, "কী বললে?"

"সাংঘাবুলাস। ফাটাফাটিস্টিক। একবারে টেরিফেরিস্টিক!"

শাহনাজ বুঝতে পারল এগুলো ক্যাপ্টেন ডাবলুর মুগ্ধ এবং প্রশংসাসূচক কথাবার্তা, সে কথাবার্তা বলতে বলতে চোখেমুখে বিস্ময় ফুটিয়ে আরো কয়েক পা এগিয়ে গেছে। শাহনাজ ভয়-পাওয়া গলায় বলল, "বেশি কাছে যেও না ক্যাপ্টেন ডাবলু।"

"কিছু হবে না।" ক্যাপ্টেন ডাবলু কাঁপা গলায় বলল, "যারা এই ছ্যাড়াভাড়াস্টিক টেরিফেরিস্টিক ডেঞ্জাবুলাস স্পেসশিপ বানাতে পারে, তারা ইচ্ছা করলে আমাদের যা-খুশি তাই করতে পারে! ভয় পেয়ে লাভ কী?"

ক্যাপ্টেন ডাবলু কয়েক পা এগিয়ে যায় এবং উপায় না দেখে শাহনাজও আরো কয়েক পা এগিয়ে যায়। হঠাৎ তার পায়ে কিছু একটা লাগল। শাহনাজ নিচু হয়ে তাকাতেই দেখতে পেল একটা ক্যামেরা। শাহনাজ সাবধানে ক্যামেরাটা তুলে নেয়। চিনতে কোনো অসুবিধে হয় না এটা তার আব্বার ক্যামেরা, ইমতিয়াজ গতকাল এটা নিয়ে ছবি তুলতে এসেছিল। ছবি তুলে নিশ্চয়ই ফিরে যেতে পারে নি, ফিরে যেতে পারলে ক্যামেরাসহই ফিরে যেত। বিখ্যাত হওয়ার জন্য ইমতিয়াজের এই ক্যামেরার ছবিগুলো দরকার।

AMARBOI.COM

৫

শাহনাজ এবং ক্যাপ্টেন ডাবলু মুখ হাঁ করে মহাকাশযানটির দিকে তাকিয়ে রইল। কোনোকিছু দেখতে যে এত সুন্দর হতে পারে সেটি না দেখলে কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না। গোলাপফুল কিংবা সিনেমার নায়িকারা যেরকম সুন্দর হয়, এটা সেরকম সুন্দর না; এর সৌন্দর্যটা অন্যরকম। বিশাল একটা জটিল জিনিসকে একেবারে নিখুঁত করে তৈরি করার যে সৌন্দর্য, এর ভিতরে সেইরকম সৌন্দর্য। পৃথিবীর সব যন্ত্রপাতির ভিতরে এক ধরনের মিল রয়েছে। এই মহাকাশযানটির মাঝে সেই যন্ত্রপাতির কোনো মিল নেই। এটি দেখলে যতটুকু না যন্ত্রপাতি বলে মনে হয় তার থেকে বেশি মনে হয় যেন এক ধরনের অত্যন্ত আধুনিক ভাস্কর্য—কিন্তু একনজর দেখলেই বোঝা যায় যে আসলে এটি ভাস্কর্য নয়, এটি একটি মহাকাশযান।

সূর্যের আলো মহাকাশযানের যে অংশটুকুতে পড়েছে সেই অংশটুকু চকচক করছে এবং সেখান থেকে আলোর বর্ণালি ছড়িয়ে পড়ছে। পাহাড়ের ভিতরের অংশটুকু বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু মহাকাশযানের সেই অংশটুকুও যে একই রকম চমকপ্রদ হবে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। শাহনাজ বুকের ভিতর থেকে একটা নিশ্বাস সাবধানে বের করে দিয়ে বলল, "এতবড় একটা স্পেসশিপ এই পাহাড়ের মাঝে এসে আছাড় খেয়ে পড়ল, কেউ টের পেল না?"

"না না না না না শাহনাজপু।" ক্যাপ্টেন ডাবলু নিশ্চয়ই বাড়াবাড়ি উত্তেজিত, তা না হলে এক নিশ্বাসে এতগুলো 'না' বলত না। শুধু তাই না, 'শাহনাজ আপু' না বলে সেটাকে শর্টকাটে 'শাহনাজপু' করে ফেলেছে। কিন্তু সেটা নিয়ে শাহনাজ এখন মাথা ঘামাল না। ক্যাপ্টেন ডাবলুর দিকে একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। ক্যাপ্টেন ডাবলু মাথা নেড়ে বলল, "এই স্পেসশিপ বাইরে থেকে আছাড় খেয়ে পড়ে নাই। এতবড় একটা পাহাড় ফাটিয়ে ভিতরে ঢুকে গেলে সারা এলাকার মানুষ টের পেত—রিক্টর স্কেলে আট থেকে বেশি ভূমিকম্প হত!"

"তা হলে?"

"এটা আকাশ থেকে আসে নাই। আকাশ থেকে এসে পাহাড়ের ভিতরে ঢুকলে সামনের এই গাছগুলো আস্ত থাকতে পারত? পারত না। ভেঙেচুরে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলত।"

শাহনাজ মাথা নাড়ল। ক্যাপ্টেন ডাবলু ঠিকই বলেছে, এটা আছাড় খেয়ে পড়লে সামনের এই বড় বড় গাছগুলো থাকত না। আশপাশে কোথাও কোনো ক্ষতি না করে এতবড় একটা স্পেসশিপ এই পাহাড়ের মাঝে ঢোকা অসম্ভব কিন্তু তারা নিজের চোখে দেখতে পারছে এটা ঢুকে গেছে! কীভাবে হল এটা?

ক্যাপ্টেন ডাবলু চকচকে চোখে বলল, "বুঝতে পারছ না শাহনাজপু, এই মহাকাশযানটা বাইরে থেকে আসে নাই। এটা পাহাড়ের ভিতরেই ছিল, এখন পাহাড় ফেটে বের হয়ে আসছে!"

"ডিম ফেটে যেরকম বাচ্চা বের হয়ে আসে?"

তুলনাটা শুনে ক্যাপ্টেন ডাবলু একটু হকচকিয়ে গেল। মাথা নেড়ে আমতা আমতা করে বলল, "হ্যাঁ, অনেকটা ডিম থেকে বাচ্চা বের হওয়ার মতো।"

"তার মানে এটা জীবন্ত? ভাইয়াকে খেয়ে ফেলেছে?"

ক্যাপ্টেন ডাবলু এবারে মাথা চুলকাতে শুরু করে। একটা স্পেসশিপ জীবন্ত, পাহাড়ের মতো দেখতে একটা ডিমের ভিতরে বড় হয়ে সেটা ডিম ফেটে বের হয়ে মানুষজনকে কপকপ করে খেয়ে ফেলছে, সেটা বিশ্বাস করা কঠিন। তারা দুজনেই স্পেসশিপের দিকে তাকাল, বিচিত্র এই স্পেসশিপটিকে আর যাই হোক, জীবন্ত প্রাণী মনে হয় না। শাহনাজ বলল, "এটা ভিতরে আস্তে আস্তে বড় বড় হয় নাই। এখানে হঠাৎ করে এসেছে। হঠাৎ করে এসেছে বলে ঝরনার পানি হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেছে।"

ক্যাপ্টেন ডাবলু মাথা নেড়ে বলল, "ঠিকই বলেছ। এটা হঠাৎ করেই এসেছে। হঠাৎ করে এই পাহাড়ের নিচে হাজির হয়েছে, তাই কেউ এর কথা জানে না।"

"হঠাৎ করে আসা মানে কী? হঠাৎ করে তো কিছু আসে না। কোনো এক জায়গা থেকে আসতে হয়।"

ক্যাপ্টেন ডাবলু আবার মাথা চুলকাতে শুরু করল। শাহনাজ লক্ষ করল তার সাথে পরিচয় হবার পর এই প্রথমবার অল্প সময়ের মাঝে তাকে কোনো একটা প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য মাথা চুলকাতে হচ্ছে। ক্যাপ্টেন ডাবলু অনেকটা জোরে জোরে চিন্তা করার মতো করে বলল, "এটা এখানে ছিল না, হঠাৎ করে এখানে এসে হাজির হয়েছে। তার মানে—"

শাহনাজ তীক্ষ্ণ চোখে ক্যাপ্টেন ডাবলুর দিকে তাকিয়ে রইল, "তার মানে?"

"তার মানে হচ্ছে এটা সম্ভব হতে পারে শুধুমাত্র যদি—"

"শুধুমাত্র যদি?"

ক্যাপ্টেন ডাবলু চোখ পিটপিট করে বলল, "ওয়ার্মহোল!"

"ওয়ার্মহোল?"

"হ্যাঁ।"

"সেটা কী?"

"স্পেস টাইম ফুটো করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় অন্য সময়ে চলে যাওয়া!"

"তার মানে এটা অন্য কোনো জায়গা, অন্য কোনো সময় থেকে হঠাৎ করে এখানে চলে এসেছে?"

ক্যাপ্টেন ডাবলু মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ। এইজন্য পৃথিবীর কেউ টের পায় নাই। অন্য কোনো গ্যালাক্সি থেকে লক্ষকোটি মাইল দূর থেকে এখানে এসে হাজির হয়েছে।"

শাহনাজ ভুরু কুঁচকে ক্যাপ্টেন ডাবলুর দিকে তাকিয়ে রইল, "সত্যি কি এ রকম সম্ভব?"

ক্যাপ্টেন ডাবলু ঠোঁট উল্টে বলল, "এক জায়গায় পড়েছি যে এটা সম্ভব। সত্যি-মিথ্যা জানি না। তবে—"

"তবে কী?"

"তবে সেটা যারা করতে পারে তারা নিশ্চয়ই অত্যন্ত বুদ্ধিমান প্রাণী। এত বুদ্ধিমান যে তাদের বুদ্ধির তুলনায় আমরা একেবারে পোকামাকড়ের মতো।"

"পোকামাকড়ের মতো?"

"হ্যাঁ।" ক্যাপ্টেন ডাবলু খানিকক্ষণ চোখ কুঁচকে মহাকাশযানটার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর আস্তে আস্তে বলল, "শাহনাজপু।"

"কী হল?"

"এই স্পেসশিপে যারা এসেছে তারা নিশ্চয়ই আমাদের থেকে অনেক অনেক উন্নত। তার মানে আমরা যদি স্পেসশিপের ভিতর যাই তা হলে তারা আমাদের কোনো ক্ষতি করবে না।"

শাহনাজ এতটা নিশ্চিত বোধ করল না, জিজ্ঞেস করল, "কেন সেটা বলছ? একটু আগে না বললে আমরা পোকামাকড়ের মতো। পোকামাকড় দেখলে আমরা মেরে ফেলি না?"

"কে বলেছে মেরে ফেলি?"

"মশা? মশা তোমার গালে বসলে ঠাস করে এক চড়ে মেরে চ্যাটকা করে ফেল না?"

"তার কারণ মশা কামড় দেয়। আমরা কি কাউকে কামড় দিই? তা ছাড়া একটা প্রজাপতি দেখলে তুমি কি সেটা মার?"

শাহনাজ মাথা নাড়ল, "তা অবশ্য মারি না। তার কারণ প্রজাপতি সুন্দর। কিন্তু এই প্রাণীদের কাছে আমরা কি সুন্দর?"

ক্যাপ্টেন ডাবলু শাহনাজের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমাকে তো সুন্দরই লাগে! শুধু যদি নাকটা—"

"ফাজলেমি করবে না। এটা ফাজলেমির সময় না।"

সাথে সাথে ক্যাপ্টেন ডাবলু গম্ভীর মুখে বলল, "তা ঠিক।"

"তা হলে এখন কী করা যায়?"

"আমার মনে হয় আমাদের স্পেসশিপের ভিতরে ঢোকা উচিত।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। আমি একটা বইয়ে পড়েছি একটা প্রাণী যখন খুব উন্নত হয় তখন তারা কাউকে মেরে ফেলে না। প্রাণী যত উন্নত হয় তার তত বেশি ভালবাসা হয়।"

শাহনাজ একটা নিশ্বাস ফেলল, কে জানে সেটা সত্যি কি না। ভিন্ন জগতের উন্নত প্রাণীর ভালবাসা কেমন হয় কে জানে! হয়তো ধরে নিয়ে খাঁচায় রেখে দেওয়া হবে তাদের ভালবাসা, কিন্তু এখন সেটা নিয়ে আলোচনা করার সময় খুব বেশি নেই। ইমতিয়াজকে দেখা যাচ্ছে না—মনে হচ্ছে তাকে নিশ্চয়ই স্পেসশিপের ভিতরেই নিয়ে গেছে, সেটাও তো একবার দেখা দরকার। শাহনাজ ক্যাপ্টেন ডাবলুর দিকে তাকিয়ে বলল, "চল তা হলে যাই। আমাদের কি সত্যি ভিতরে ঢুকতে দেবে?"

"দেবে না কেন? নিশ্চয়ই দেবে।"

ক্যাপ্টেন ডাবলু আর শাহনাজ তখন গুটিগুটি এগিয়ে যেতে শুরু করে। মহাকাশযানটির কাছে এসে সাবধানে সেটাকে স্পর্শ করতেই তাদের শরীরে এক ধরনের শিহরন খেলে গেল। স্পেসশিপটি বিচিত্র এক ধরনের পদার্থ দিয়ে তৈরি। ভালো করে তাকালে দেখা যায় এক ধরনের নকশা কাটা রয়েছে। চকচকে মসৃণ দেহ, কিন্তু ঠিক ধাতব নয়। দুজনে হাত বুলিয়ে আরো ভিতরের দিকে যেতে শুরু করে। স্পেসশিপটি অস্বাভাবিক শক্ত, বিশাল পাহাড় ভেদ করে বের হয়ে এসেছে কিন্তু কোথাও সেই ভয়ঙ্কর ঘর্ষণের চিহ্ন নেই। দেখে মনে হয় এটা শক্ত পাথর ভেদ করে বের হয় নি, নরম কাদার মতো কিছু একটা ভেদ করে বের হয়েছে। মহাকাশযানের সূক্ষ্ম অংশগুলো পর্যন্ত শক্ত পাথরকে একেবারে মাখনের মতো কেটে ফেলেছে। মহাকাশযানটি কী দিয়ে তৈরি কে জানে যে এত সহজে এত শক্ত পাথরকে এভাবে কেটে ফেলে?

শাহনাজ আর ক্যাপ্টেন ডাবলুর ধারণা ছিল মহাকাশযানের ভিতরে ঢোকা নিয়ে একটা সমস্যা হবে, কোনো ফুটো খুঁজে বের করে সাবধানে তার ভিতর দিয়ে ঢুকতে হবে। কিন্তু দেখা গেল কাছাকাছি একটা বড় দরজা হাট করে খোলা আছে। দুজনে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ভিতরে উঁকি দেয়। ঠিক কী কারণে কে জানে, ভিতরে ভালো করে দেখা যায় না। এমন নয় যে ভিতরে অন্ধকার বা অন্যকিছু, বেশ আলোকোজ্জ্বল, কিন্তু তবুও কেন জানি কোনোকিছুই স্পষ্ট নয়। ক্যাপ্টেন ডাবলু বলল, "শাহনাজপু চল ভিতরে ঢুকি।"

অন্য কোনো সময় হলে শাহনাজ কী করত জানে না, কিন্তু এখন আর অন্যকিছু করার উপায় নেই। সে বলল, "চল।"

দুজন প্রায় একসাথে ভিতরে পা দেয়—সাথে সাথে দুজনেরই বিচিত্র একটা অনুভূতি হল, মনে হল তারা বুঝি তেলতেলে ভিজে শীতল আঠালো একটা অদৃশ্য পরদার মাঝে আটকে গেছে—ছোট ছোট পোকা মাকড়সার জালে যেভাবে আটকে যায় অনেকটা সেরকম। হাত-পা ছুড়ে মাথা ঝাঁকিয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করে কোনোমতে তারা সেই পরদা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল এবং তখন মনে হল অদৃশ্য কোনো একটা শক্তি তাদের যেন শুষে ভিতরে টেনে নিল। শাহনাজ আর ক্যাপ্টেন ডাবলু দুজনে প্রায় একসাথে ভিতরে লুটোপুটি খেয়ে আছাড় খেয়ে পড়ে। কোনোমতে দুজন সোজা হয়ে দাঁড়ায় এবং ভিতরে তাকিয়ে একেবারে হতচকিত হয়ে যায়। তাদের মনে হয় তারা বুঝি আদিগন্তহীন বিশাল একটা স্পেসশিপের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে। বাইরে যে-জিনিসটি কয়েক শ মিটার ভিতরে সেটা কীভাবে এ রকম বড় হয়, দুজনের কেউই বুঝতে পারল না। ক্যাপ্টেন ডাবলু হাত দিয়ে তার চশমা ঠিক করতে করতে বলল, "ও মাই মাই মাই—মাইগো মাই!"

কথাটা নিশ্চয় অবাক হবার কথা, কাজেই শাহনাজ সেটার অর্থ নিয়ে মাথা ঘামাল না, নিচু গলায় বলল, "কী মনে হয়?"

"কেস ডিজুফিটাস।"

"তার মানে কী?"

ক্যাপ্টেন ডাবলু উত্তর না দিয়ে মাথা চুলকাতে থাকে। সে বিজ্ঞানের অনেক কিছু জানে, কিন্তু এখন যেসব জিনিস দেখছে সেগুলো তার জানা বিষয়ের মাঝে পড়ে না। শাহনাজ বলল, "আমার কী মনে হয় জান?"

"কী?"

"প্রথমেই এখান থেকে কীভাবে বের হব সেই জিনিসটা ঠিক করে নেওয়া দরকার। চোরেরা যখন চুরি করতে আসে তখন প্রথমেই পালানোর ব্যবস্থাটা ঠিক করে নেয়।"

ক্যাপ্টেন ডাবলু চোখ বড় বড় করে বলল, "আমরা কি চোর?"

শাহনাজ অধৈর্য হয়ে বলল, "চোর না হলেও চোরের টেকনিক ব্যবহার করলে কোনো দোষ হয় না।"

"তা ঠিক। কী করবে এখন?"

"প্রথমেই এখান থেকে বের হয়ে দেখি দরকার পড়লে বের হতে পারব কি না।"

"ঠিক আছে।"

"দুজনেরই বের হওয়ার দরকার নেই, একজন বের হওয়া যাক, আরেকজন ভিতরে থাকি।"

ক্যাপ্টেন ডাবলু মাথা নাড়ল। শাহনাজ যেহেতু বড়, তাই সে ভিতরে থাকবে বলে ঠিক করল। ক্যাপ্টেন ডাবলু উঠে দাঁড়িয়ে খোলা দরজায় সেই অদৃশ্য তেলতেলে আঠালো ভিজে শীতল পরদার মাঝে লাফিয়ে পড়ল। শাহনাজ দেখতে পেল ক্যাপ্টেন ডাবলু সেই পরদায় আটকা পড়েছে, হাত-পা ছুড়ে বের হবার চেষ্টা করছে এবং কিছু বোঝার আগে হঠাৎ পরদা থেকে ছুটে বাইরে চলে গেছে। শাহনাজ সাবধানে বুক থেকে একটা নিশ্বাস বের করে দেয়। মহাকাশযান থেকে ঢোকা এবং বের হওয়া ব্যাপারটি একটু অস্বস্তিকর হতে পারে, কিন্তু কঠিন নয়। সত্যি কথা বলতে কী, ব্যাপারটা ভালোভাবে প্র্যাকটিস করলে একটা মজার খেলাও হতে পারে! ক্যাপ্টেন ডাবলুকে বলে দেওয়া ছিল সে বাইরে গিয়ে আবার সাথে সাথে ভিতরে ফিরে আসবে, কিন্তু শাহনাজ অবাক হয়ে লক্ষ করল সে সাথে সাথে ভিতরে ফিরে এল না। বাইরে দাঁড়িয়ে অহেতুক সময় নষ্ট করতে লাগল। সবচেয়ে বিচিত্র ব্যাপার হচ্ছে ভিতরে দাঁড়িয়ে বাইরে স্পষ্ট দেখা গেলেও কোনো একটা বিচিত্র কারণে কোনোকিছুই যেন ঠিক করে বোঝা যায় না। স্পেসশিপের দরজার মাঝে যে অদৃশ্য পরদা রয়েছে সেটা যেন দুটি ভিন্ন জগৎ হিসেবে দুটি অংশ আলাদা করে রেখেছে। শাহনাজ অধৈর্য হয়ে হাত নেড়ে ক্যাপ্টেন ডাবলুকে ভিতরে আসতে ইঙ্গিত করল, কিন্তু ক্যাপ্টেন ডাবলু মনে হল সেটাকে কোনো গুরুত্ব না দিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে ঠাট্টা-তামাশা করতে লাগল। এ রকম সময়েও যে কেউ ঠাট্টা-তামাশা করতে পারে, শাহনাজ নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করত না।

ক্যাপ্টেন ডাবলু ভিতরে আসছে না দেখে শেষ পর্যন্ত শাহনাজ ঠিক করল সেও বাইরে যাবে। স্পেসশিপের দরজায় লাফিয়ে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে সে হঠাৎ স্পেসশিপের ভিতরে ঘরঘর এক ধরনের শব্দ শুনতে পায়। শব্দটা কোথা থেকে আসছে বোঝার জন্য শাহনাজ এদিক-সেদিক তাকাল। স্পেসশিপের ভিতরে অসংখ্য যন্ত্রপাতি, নানা ধরনের জটিল জিনিসপত্র—সেগুলো দেখতে সম্পূর্ণ অন্যরকম, হঠাৎ করে দেখলে মনে হয় বুঝি কোনো অতিকায় পোকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। তার ভিতর দূরে একটি জায়গা থেকে ঘরঘর শব্দ করে কিছু একটা আসছে। শাহনাজ কী করবে বুঝতে পারল না, লাফিয়ে বাইরে চলে যাবে নাকি ভিতরেই কোথাও লুকিয়ে পড়বে ঠিক করতে করতে মূল্যবান খানিকটা সময় চলে

গেল। ঘরঘর শব্দ করে যে জিনিসটা আসছে সেটা দেখতে দেখতে কাছে চলে আসছে। শাহনাজ কী করবে বুঝতে না পেরে লাফিয়ে এক কোনায় বিচিত্র আকারের একটা পিলারের পিছনে লুকিয়ে গেল।

ঘরঘর শব্দ করে যে জিনিসটি আসছে সেটা একেবারে কাছে চলে এসেছে। শাহনাজ কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে রইল, এবং হঠাৎ করে সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। জিনিসটি একটা হাতি—কোনো বিচিত্র উপায়ে সেটাকে মূর্তির মতো স্থির করিয়ে স্বচ্ছ চতুষ্কোণ একটা বাক্সের মাঝে আটকে রাখা হয়েছে, বাক্সের নিচে ছোট ছোট রোলার, সেই রোলার ঘোরার কারণে ঘরঘর শব্দ হচ্ছে। বাক্সটি কীভাবে যাচ্ছে সেটা দেখার জন্য শাহনাজ মাথা বের করে বিস্ময়ে চিৎকার করে ওঠে। ছোট একটি রোবট হাত দিয়ে ঠেলে ঠেলে স্বচ্ছ বাক্সটি নিয়ে যাচ্ছে—শাহনাজের চিৎকার শুনেও রোবটটা তার দিকে ঘুরে তাকাল না। হাতির পরে অন্য একটি চতুষ্কোণ বাক্সে একটা মাঝারি মহিষ, তার পিছনে একটা হরিণ, হরিণের পর একটা মাঝারি রয়েল বেঙ্গল টাইগার। রয়েল বেঙ্গল টাইগার নিশ্চয়ই এখান থেকে বের হতে পারবে না, তবু শাহনাজের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ছোট ছোট পেটমোটা বেঁটে ধরনের রোবটেরা একটার পর একটা স্বচ্ছ বাক্স ঠেলে ঠেলে নিতে থাকে এবং সেইসব বাক্সের মাঝে গরু, ছাগল, ভেড়া থেকে শুরু করে সাপ, ব্যাঙ, পাখি, গিরগিটি, টিকটিকি, কিছুই বাকি থাকে না। এমন এমন বিচিত্র প্রাণী মাঝে মাঝে নিয়ে যেতে থাকে যেগুলো সে শুধু বইপত্রে ছবি দেখেছে। অক্টোপাস দেখলে যে এ রকম গা ঘিনঘিন করতে পারে সেটা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করত না। প্রাণীগুলো নড়ছে না, মূর্তির মতো স্থির হয়ে আছে কিন্তু তবু দেখে বোঝা যায় সেগুলো জীবন্ত। কোনোভাবে অচেতন করে রেখেছে। স্পেসশিপের বুদ্ধিমান প্রাণীরা নিশ্চয়ই পৃথিবী থেকে নানা ধরনের জন্তু-জানোয়ার একটি করে নিয়ে যাচ্ছে—কে জানে তাদের জগতের চিড়িয়াখানায় হয়তো সাজিয়ে রাখবে।

শাহনাজের চিৎকার শুনেও বেঁটে পেটমোটা রোবটগুলো তার প্রতি কোনো গুরুত্ব না দেওয়ায় তার একটু সাহস বেড়ে গেল। সে বিচিত্র পিলারের আড়াল থেকে বের হয়ে পৃথিবীর যাবতীয় জীবজন্তুকে স্বচ্ছ বাক্সে ভরে টেনে টেনে নেওয়ার দৃশ্যটি বাইরে দাঁড়িয়েই দেখতে শুরু করল। একটা ক্যাঙ্গারুকে লাফ দেওয়ার মাঝখানে আটকে ফেলে নিয়ে যাচ্ছিল, শূন্যে ঝুলে থাকা ক্যাঙ্গারুর বাক্সটা নিয়ে যাবার সময় সে বাক্সটা একটু ছুঁয়েও দেখল, পেটমোটা রোবটটা তাকে কিছু বলল না। ক্যাপ্টেন ডাবলু কেন এখনো বাইরে দাঁড়িয়ে আছে সেটা বোঝা মুশকিল, ভিতরে এলে সে এই বিচিত্র প্রাণীকে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্যটা দেখতে পেত। বাইরে গিয়ে সে ক্যাপ্টেন ডাবলুকে নিয়ে আসবে কি না সেটা নিয়ে সে যখন নিজের সাথে মনে মনে তর্ক করছে তখন হঠাৎ একটা দৃশ্য দেখে হঠাৎ করে তার সমস্ত শরীর জমে যায়। সে এত জোরে চিৎকার করে উঠল যে রোবটগুলো পর্যন্ত এবার মাথা ঘুরিয়ে তার দিকে তাকাল। শাহনাজ দেখতে পেল একটা রোবট স্বচ্ছ একটা বাক্স ঠেলে ঠেলে আনছে এবং ঠিক তার মাঝখানে ক্যামেরায় ছবি তোলার ভঙ্গি করে ইমতিয়াজ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—এক চোখ বন্ধ অন্য চোখ খোলা, বাম হাতে ক্যামেরা ধরে রাখার ভঙ্গি, ডান হাত দিয়ে শাটারে চাপ দিচ্ছে—শুধুমাত্র হাতে ক্যামেরাটা নেই। মহাজাগতিক প্রাণী পৃথিবীর নানা জীব-জানোয়ার একটি করে নিয়ে যাচ্ছে, এর মাঝে একটি মানুষও আছে। মানুষ হিসেবে যাকে বেছে নিয়েছে সেটি হচ্ছে ইমতিয়াজ! কী সর্বনাশ! শাহনাজের জীবনকে ইমতিয়াজ মোটামুটি বিষাক্ত করে রেখেছে সত্যি, তাই বলে এভাবে ধরে নিয়ে চলে যাবে সেটা তো কখনো শাহনাজ চিন্তাও করে নি।

কী করবে বুঝতে না পেরে সে হঠাৎ চিৎকার করে বেঁটে পেটমোটা রোবটটার দিকে ছুটে গেল। রোবটটাকে ধরে টানাটানি করে চিৎকার করে বলতে লাগল, "ছেড়ে দাও! একে ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও বলছি—ভালো হবে না কিন্তু—"

রোবটটা নির্লিপ্তভাবে শাহনাজের দিকে তাকাল, মনে হল শাহনাজের কাজকর্ম দেখে সে খানিকটা অবাক এবং বিরক্ত হয়েছে। শাহনাজ রোবটটার ঘাড় ধরে তাকে থামানোর চেষ্টা করতে থাকে কিন্তু কোনো লাভ হয় না। "ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও" বলে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগল এবং রোবটটার পিছু পিছু ছুটতে লাগল। শেষ পর্যন্ত রোবটটার মনে হয় খানিকটা ধৈর্যচ্যুতি হল, সেটা একটা হাত তুলে শাহনাজকে ধরে খানিকটা দূরে ছুড়ে ফেলে দিল। মাথাটা বেকায়দা কোথায় ঠুকে গিয়ে মনে হল চোখের সামনে কিছু হলুদ ফুল ঘুরতে থাকে। চোখে সর্ষেফুল দেখা কথাটা যে বানানো কথা নয়, সত্যি সত্যি কিছু একটা দেখা যায়, এই প্রথমবার শাহনাজ টের পেয়েছে। সে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে উঠে বসে এবং দেখতে পেল ক্যাপ্টেন ডাবলু অদৃশ্য পরদায় আটকা পড়ে হাত-পা ছুড়ে হাঁচড়পাচড় করতে করতে কোনোমতে ভিতরে এসে ঢুকেছে। শাহনাজকে নিচে পড়ে থাকতে দেখে সে অবাক হয়ে বলল, "কী হল শাহনাজপু, তুমি নিচে বসে আছ কেন?"

ক্যাপ্টেন ডাবলুর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে শাহনাজ রেগেমেগে বলল, তুমি এতক্ষণ বাইরে বসে কী করছিলে?"

ক্যাপ্টেন ডাবলু অবাক হয়ে বলল, "এতক্ষণ? বাইরে বসে? কী বলছ তুমি?"

"তোমাকে না বলেছিলাম বাইরে গিয়েই সাথে সাথে আবার চলে আসবে?"

"তাই তো করেছি! একলাফে বাইরে গিয়েছি—আরেক লাফে ভিতরে ঢুকেছি।"

"হতেই পারে না। আমি এতক্ষণ থেকে বসে বসে সব জন্তু-জানোয়ারকে নিতে দেখলাম। সবশেষে যখন ভাইয়াকে ধরে নিচ্ছে—" হঠাৎ করে কী হল কে জানে শাহনাজ হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করল।

ক্যাপ্টেন ডাবলু কিছুই বুঝতে পারল না। সে তাদের কথামতো একলাফে বাইরে গিয়েছে তারপর আরেক লাফে ভিতরে এসে ঢুকেছে। এর মাঝে এতকিছু ঘটে গেছে সেটা সে একবারও কল্পনা করে নি। শাহনাজকে কাঁদতে দেখে সে বিশেষ ঘাবড়ে গেল। কীভাবে তাকে শান্ত করবে বুঝতে না পেরে ছটফট করতে লাগল। ইতস্তত করে বলল, "শাহনাজপু তুমি কেঁদো না, প্লিজ তুমি কেঁদো না—"

বয়সে ছোট একটা ছেলের সামনে কেঁদে ফেলে শাহনাজ নিজের ওপর নিজেই রেগে উঠেছিল। সে এবারে রাগটা ক্যাপ্টেন ডাবলুর ওপর ঝাড়ল, গলা ঝাঁজিয়ে চিৎকার করে বলল, "তোমার ভাইকে যদি আচার বানিয়ে নিয়ে যেত তা হলে দেখতাম তুমি কাঁদতে কি না—"

"আচার?"

শাহনাজ চোখ মুছে বলল, "সেরকমই তো মনে হল। বড় বড় বোতলের মাঝে যেভাবে আচার বানিয়ে রাখে সেইভাবে সবাইকে ধরে ধরে নিয়ে গেল।"

ক্যাপ্টেন ডাবলু চিন্তিতমুখে বলল, "শাহনাজপু, এই স্পেসশিপটা যত উন্নত ভেবেছিলাম আসলে তার থেকেও বেশি উন্নত।"

"কেন?"

"দেখছ না বাইরে একরকম সময়, ভিতরে অন্যরকম। আমি এক সেকেন্ডের মাঝে বাইরে থেকে এসেছি আর এদিকে কত সময় পার হয়ে গেছে!"

শাহনাজ শক্ত মুখে বলল, "তাতে লাভ কী হচ্ছে?"

"তার মানে যারা এই স্পেসশিপটা এনেছে তারা আসলেই খুব উন্নত। তারা অনেক বুদ্ধিমান। তাদেরকে বোঝালেই তারা তোমার ভাইয়াকে ছেড়ে দেবে।"

"ছাড়বে না।" শাহনাজের আবার চোখে পানি এসে যাচ্ছিল। যে ভাই তার জীবনকে একেবারে পুরোপুরি বিষাক্ত করে রেখেছে তাকে বাঁচানোর জন্য চোখে পানি এসে যাচ্ছে ব্যাপারটা এখনো তার বিশ্বাস হচ্ছে না। কোনোমতে কান্না সামলিয়ে বলল, "আমি রোবটগুলোকে কত বোঝালাম, ছেড়ে দিতে বললাম, তারা ছাড়ল না। বরং আমাকে যা একটা আছাড় দিল, এখনো মাথাটা টনটন করছে।"

ক্যাপ্টেন ডাবলু বলল, "ওগুলো তো রোবট ছিল। রোবটগুলো তো কিছু বোঝে না। আমাদের খুঁজে বের করতে হবে আসল প্রাণীগুলোকে যারা সত্যিকারের বুদ্ধিমান। তাদেরকে বুঝিয়ে বললেই দেখো তারা ছেড়ে দেবে।"

"তাদেরকে কেমন করে বোঝাব? তারা কি বাংলা জানে? আমাদের কথা কি বুঝবে?"

"উন্নত প্রাণী সবসময় নীচুশ্রেণীর প্রাণীকে বুঝতে পারে।"

ক্যাপ্টেন ডাবলুর কথায় শেষ পর্যন্ত শাহনাজ খানিকটা আশা ফিরে পেল। বলল, "চল তা হলে খুঁজে বের করি কোথায় আছে।"

"চল।"

দুজনে তাদের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে মহাকাশযানের ভিতর হাঁটতে শুরু করে। স্পেসশিপের ভিতরে নানারকম গলিঘুপচি, নানারকম বিচিত্র যন্ত্রপাতি। তাদের ফাঁকে ফাঁকে শাহনাজ আর ক্যাপ্টেন ডাবলু হাঁটতে শুরু করে। ভিতরে নানারকম শব্দ। কোথাও কোথাও ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, কোথাও বেশ গরম। স্পেসশিপের ভিতরে কোথাও কোনোরকম আলো জ্বলছে না কিন্তু তবু ভিতরে এক ধরনের নরম স্নিগ্ধ আলো। শাহনাজ হাঁটতে হাঁটতে ক্যাপ্টেন ডাবলুকে জিজ্ঞেস করল, "এই প্রাণীগুলো দেখতে কী রকম হবে মনে হয়? মাকড়সার মতো হবে না তো? তা হলে আমি ঘেন্নায়ই বমি করে দেব।"

"মনে হয় না। বুদ্ধিমান প্রাণী হলে মনে হয় একটু মানুষের মতো হওয়ার কথা। বাইনোকুলার ভিশনের জন্য কমপক্ষে দুইটা চোখ দরকার, আমার মনে হয় বেশি হবে। চোখগুলো ব্রেনের কাছে থাকা দরকার, শরীরের উপরের অংশে হলে ভালো। কাজ করার জন্য আঙুল না হলে শুঁড় দরকার। অক্টোপাসের মতো, যত বেশি হয় তত ভালো।"

শাহনাজ ভুরু কুঁচকে বলল, "তুমি কেমন করে জান?"

"একটা বইয়ে পড়েছি।" ক্যাপ্টেন ডাবলু একটু অপেক্ষা করে বলল, "তোমার কী রকম হবে বলে মনে হয়?"

"আমার মনে হয় সবুজ রঙের হবে।"

"সবুজ? সবুজ কেন হবে?"

"জানি না। চোখগুলো হবে বড় বড়। একটু টানা টানা। চোখের পাতা উপর থেকে নিচে পড়বে না, ডান থেকে বামে পড়বে। নাকের জায়গায় শুধু গর্ত থাকবে। মুখ থাকবে না।"

"মুখ থাকবে না? মুখ থাকবে না কেন?"

"আমার মনে হয় মুখ থাকলেই সেখানে দাঁত থাকবে আর দাঁত থাকলেই ভয় করবে। সেই জন্য মুখই থাকবে না।"

ক্যাপ্টেন ডাবলু খিকখিক করে হেসে বলল, "শাহনাজপু, তোমার কথাবার্তা একেবারে আনসায়েন্টিফিক।"

"হতে পারে। তুমি জিজ্ঞেস করেছ তাই বলছি।"

ক্যাপ্টেন ডাবলু হাসি হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল, "হাত-পা কি থাকবে? লেজ?"

"না লেজ থাকবে না। দুইটা হাত, দুইটা পা থাকবে। প্রত্যেকটা হাতে তিনটা করে আঙুল। পেটটা একটু মোটা হবে। মাথাটা শরীরের তুলনায় অনেক বড়। যখন হাঁটবে তখন মনে হবে এই বুঝি তাল হারিয়ে পড়ে গেল।"

ক্যাপ্টেন ডাবলু আবার হেসে উঠতে যাচ্ছিল কিন্তু সামনে তাকিয়ে হঠাৎ সে পাথরের মতো জমে গেল। তাদের কয়েক হাত সামনে দুটি মহাজাগতিক প্রাণী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গায়ের রং সবুজ, শরীরের তুলনায় অনেক বড় মাথা, সেখানে বড় বড় দুটি চোখ স্থিরদৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। নাকের জায়গায় দুটি গর্ত, কোনো মুখ নেই। দুটি ছোট ছোট পা, তুলনামূলকভাবে লম্বা হাত। প্রতি হাতে তিনটা করে আঙুল। ঠিক যেরকম শাহনাজ বর্ণনা করেছিল। ক্যাপ্টেন ডাবলু বিস্ফারিত চোখে মহাজাগতিক প্রাণী দুটির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর শাহনাজের দিকে তাকিয়ে তোতলাতে তোতলাতে বলল, "শা-শা-শা-হনাজপু—তো-তো-তোমার কথাই ঠিক।"

শাহনাজ নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছে যে তার কথাই সত্যি বের হয়েছে, মহাজাগতিক প্রাণী সে যেরকম হবে ভেবেছিল প্রাণীগুলো হুবহু সেরকম। ক্যাপ্টেন ডাবলু ফিসফিস করে বলল, "কি-কি-ছু একটা বলল।"

শাহনাজ কী বলবে বুঝতে পারল না। মহাজাগতিক প্রাণীকে কি সালাম দেওয়া যায়? তারা কি বাংলা বোঝে? নাকি ইংরেজিতে কথা বলতে হবে? কী করবে বুঝতে না পেরে শাহনাজ আমতা আমতা করে বলল, "হ্যাপি মিলেনিয়াম।"

প্রাণী দুটি কোনো শব্দ না করে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তাকিয়ে থাকতে থাকতে প্রাণীগুলো একটি চোখের পাতা ফেলল, দুজনে অবাক হয়ে দেখল চোখের পাতাটি উপরে নিচে নয়, ডান থেকে বামে—ঠিক যেরকম শাহনাজ বলেছে। শাহনাজ কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল, সে মুখ হাঁ করে প্রাণী দুটির দিকে তাকিয়ে রইল।

৬

দুটি মহাজাগতিক প্রাণীর সাথে সামনাসামনি দেখা হলে যেরকম ভয় পাওয়ার কথা ছিল শাহনাজ মোটেও সেরকম ভয় পেল না। সে মহাজাগতিক প্রাণীর যেরকম বর্ণনা দিয়েছিল সেটি অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে, কাজেই প্রাণীগুলোকে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। কারণ সে জানে প্রাণীগুলো খুব নরম মেজাজের। ভয় না পেলেও শাহনাজ খুব অবাক হয়েছে, কাজেই একটু স্বাভাবিক হতে তার বেশ খানিকক্ষণ সময় লেগে গেল।

ক্যাপ্টেন ডাবলু শুধু অবাক হয় নি, সে ভয়ও পেয়েছে। ঠিক কী কারণে ভয় পেয়েছে সে জানে না, ভয়ের সাথে অবশ্য যুক্তিতর্ক বা কারণের কোনো সম্পর্ক নেই। সে শাহনাজের পিছনে নিজেকে আড়াল করে চোখ বড় বড় করে প্রাণী দুটির দিকে তাকিয়ে রইল। শাহনাজ খানিকক্ষণ চেষ্টা করে বলল, "আপনারা আমাদের পৃথিবীতে এসেছেন সেজন্য পৃথিবীর পক্ষ থেকে আপনাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।"

"পৃথিবীতে আগমন"—"শুভেচ্ছা স্বাগতম" বলে একটা শ্লোগান দেবে কি না একবার চিন্তা করে দেখল, কিন্তু মহাজাগতিক প্রাণী সেটা ভালোভাবে নাও নিতে পারে। শাহনাজ কেশে গলাটা একটু পরিষ্কার করে বলল, "আপনারা এসেছেন খবর পেলে আসলে অনেক বড় বড় মানুষ আপনাদের সাথে দেখা করতে আসত। ফুলটুল নিয়ে আসত। কিন্তু আমরা হঠাৎ করে এসেছি বলে খালি হাতে আসতে হল।"

মহাজাগতিক প্রাণী দুটি স্থিরচোখে শাহনাজের দিকে তাকিয়ে রইল, তার কথা বুঝতে পেরেছে কি না বোঝা গেল না। শাহনাজের হঠাৎ একটু অস্বস্তি লাগতে থাকে। কিন্তু যেহেতু কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে তাই হঠাৎ করে থামার কোনো উপায় নেই; তাকে কথা বলতেই হয়, "আপনাদের স্পেসশিপটা আসলে খুবই সুন্দর। যেরকম সাজানো-গোছানো সেরকম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আপনাদের কাজকর্ম ভালোভাবে হচ্ছে নিশ্চয়ই। যদি আপনাদের কোনো ব্যাপারে কোনোরকম সাহায্যের দরকার হয় বলবেন। আপনারা কী কী নিতে চাচ্ছেন জানি না, সবকিছু পেয়েছেন কি না সেটাও বলতে পারছি না। এখানে ভালো দোকানপাট নাই, ঢাকার কাছাকাছি নামলে সেখানে অনেক ভালো ভালো দোকান পেতেন।"

শাহনাজের কথার উত্তরে কোনো কথা না বলে প্রাণী দুটি তখনো স্থিরচোখে তাকিয়ে রইল। মানুষের একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার সাথে এদের একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার মাঝে একটা পার্থক্য আছে। মানুষের চোখের দিকে তাকালে তার ভিতরে রাগ দুঃখ অভিমান বা অন্য কী অনুভূতি হচ্ছে সেটা অনুমান করা যায় কিন্তু এদের চোখের দিকে তাকিয়ে কিছুই বোঝার উপায় নেই। শাহনাজ তবুও হাল ছাড়ল না, আবার কথা বলতে শুরু করল, "আপনারা পৃথিবী থেকে অনেক রকম জন্তু-জানোয়ার নিয়ে যাচ্ছেন দেখলাম, নিয়ে কী করবেন ঠিক জানি না। কিছু কিছু জন্তু-জানোয়ার কিন্তু একটু রাগী টাইপের, একটু সাবধান থাকবেন। যেসব জন্তু-জানোয়ার নিচ্ছেন তার মাঝে একটা নিয়ে আমার একটু কথা বলার ছিল, যদি অনুমতি দেন তা হলে বলি।"

AMARBOI.COM

মহাজাগতিক প্রাণী অনুমতি দিল কি না বোঝা গেল না, কিন্তু শাহনাজ বলতে শুরু করল, "যে প্রাণীটা নিয়ে কথা বলছি সেটা আসলে আমার ভাই, ইমতিয়াজ। ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। নিজের ভাই কাজেই বলা ঠিক না, কিন্তু না বলেও পারছি না। আমার এই ভাই কিন্তু পুরোপুরি অপদার্থ। আমরা যেটাকে বলি ভুয়া। একেবারে ভুয়া।

"আপনারা পৃথিবী থেকে অনেক আশা করে একজন মানুষ নিচ্ছেন সেটা ভালো দেখে নেওয়া উচিত। এ রকম ভুয়া একজন মানুষ নেওয়া কি ঠিক হবে? কাজেই আমার বিশেষ অনুরোধ, আপনি আমার ভাইকে ছেড়ে দেবেন। আমি আপনাকে লিখে দিতে পারি আমার ভাই ইমতিয়াজকে নিলে আপনাদের লাভ থেকে ক্ষতি হবে অনেক বেশি। মানুষ সম্পর্কে যেসব তথ্য পাবেন তার সবগুলো হবে ভুল। তারা কীভাবে চিন্তা করে, কীভাবে কাজ করে সেই সম্পর্কেও আপনাদের ধারণা হবে ভুল। তাকে বিশ্লেষণ করে আপনাদের ধারণা হতে পারে যে, মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পোস্ট মডার্ন কবিতা নামের বিদ্ঘুটে জিনিস লিখে লিখে পরিচিত-অপরিচিত সব মানুষকে বিরক্ত করা।"

শাহনাজ বড় একটা নিশ্বাস নিয়ে বলল, "কাজেই, এই পৃথিবীর সম্মানিত অতিথিরা, আপনারা আমার ভাইকে ছেড়ে দেন। আমরা এই ভুয়া মানুষটিকে নিয়ে যাই।"

শাহনাজ তার এই দীর্ঘ এবং মোটামুটি আবেগ দিয়ে ঠাসা বক্তৃতা শেষ করে খুব আশা নিয়ে মহাজাগতিক প্রাণী দুটির দিকে তাকাল, কিন্তু প্রাণী দুটি ডান থেকে বামে চোখের পাতা

ফেলা ছাড়া আর কিছুই করল না। শাহনাজের সন্দেহ হতে থাকে যে হয়তো তারা তার কথা কিছুই বুঝতে পারে নি। সে একটু এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনারা কি আমার কথা বুঝতে পেরেছেন? বুঝে থাকলে কিছু একটা বলেন, নাহয় কিছু একটা করেন।"

শাহনাজের কথা শেষ হওয়ামাত্রই একটি মহাজাগতিক প্রাণী তার একটা হাত তুলে ময়লা ঝেড়ে ফেলার মতো একটা ভঙ্গি করল এবং সাথে সাথে একটা অত্যন্ত বিচিত্র ব্যাপার ঘটতে শুরু করে। ঝড়ো হাওয়ার মতো একটা হাওয়া এসে হঠাৎ করে শাহনাজ এবং ক্যাপ্টেন ডাবলুর উপর দিয়ে বইতে শুরু করে। বাতাসের বেগ দেখতে দেখতে বেড়ে যায়, তারা দুজন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। কিছু বোঝার আগেই হঠাৎ করে বাতাস তাদের একেবারে শূন্যে উড়িয়ে নেয়। দুজন আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে। ঝড়ো হাওয়া তাদের কোথাও আছড়ে ফেলবে মনে করে তারা হাত–পা ছড়িয়ে নিজেদের বাঁচানোর চেষ্টা করে, কিন্তু তারা কোথাও আছড়ে পড়ে না। শূন্যে ভাসতে ভাসতে তারা উপরে–নিচে লুটোপুটি খেতে থাকে এবং কোথায় ভেসে যাচ্ছে তার তাল ঠিক রাখতে পারে না। ধুলোবালি, লতাপাতা, পোকামাকড়সহ তারা ভেসে বেড়াতে এবং কিছু বোঝার আগে তারা নিজেদেরকে মহাকাশযানের বাইরে পাহাড়ের নিচে নিজেদের ব্যাক প্যাকের পাশে আবিষ্কার করল। এত উপর থেকে নিচে পড়ে তাদের শরীরের প্রত্যেকটা হাড় ভেঙে যাবার কথা কিন্তু তাদের কিছুই হয় নি, মনে হচ্ছে কেউ যেন তাদের ধরে এখানে নামিয়ে দিয়েছে। শাহনাজ আর ক্যাপ্টেন ডাবলু ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়াতেই তাদের আশপাশ থেকে কয়েকটা পাখি উড়ে গেল। শাহনাজ ক্যাপ্টেন ডাবলুর দিকে তাকাল, সে ধুলোয় ডুবে আছে এবং শাহনাজের মনে হল তার বুকপকেটে জীবন্ত কিছু একটা নড়াচড়া করছে। ভালো করে তাকাতেই সে অবাক হয়ে দেখল ক্যাপ্টেন ডাবলুর পকেট থেকে একটা নেংটি ইঁদুর লাফ দিয়ে বের হয়ে গেল। শাহনাজ আতঙ্কে একটা চিৎকার করে ওঠে। কারো পকেটে একটা জ্যান্ত নেংটি ইঁদুর থাকতে পারে সেটি নিজের চোখে না দেখলে সে বিশ্বাস করত না। ক্যাপ্টেন ডাবলু ঘুরে শাহনাজের দিকে তাকাল, "কী হয়েছে শাহনাজপু?"

"তোমার পকেটে একটা ইঁদুর।"

ক্যাপ্টেন ডাবলু মাথা নাড়ল, "না। আমার পকেটে নাই—তোমার মাথায়।"

সত্যি সত্যি শাহনাজের মনে হল তার মাথায় কিছু একটা নড়াচড়া করছে, হাত দিতেই কিছু একটা কিলবিল করে উঠল। শাহনাজ গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে জিনিসটাকে ছুড়ে দেয় এবং আতঙ্কিত হয়ে আবিষ্কার করে সত্যিই একটা নেংটি ইঁদুর ছুটে পালিয়ে যায়। দুজনে নিজেদের শরীর ঝেড়ে পরিষ্কার করে আরো কিছু পোকামাকড় আবিষ্কার করে। দুজনের প্রায় হার্টফেল করার অবস্থা হল যখন তাদের পায়ের তলা থেকে হলুদ রঙের একটা গিরগিটি এবং দুইটা ব্যাং লাফিয়ে লাফিয়ে পালিয়ে গেল।

"ব্যাপারটা কী হয়েছে? আমরা এখানে এলাম কীভাবে? আর এত পোকামাকড় ব্যাং কোথা থেকে এসেছে? এত ধুলাবালিই কেন এখানে?"

ক্যাপ্টেন ডাবলু নিজের মাথা থেকে ধুলা ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, "আমার কী মনে হয় জান শাহনাজপু? স্পেসশিপের প্রাণীগুলো তাদের স্পেসশিপটা ঝাড় দিয়ে পরিষ্কার করেছে।"

"ঝাড় দিয়ে পরিষ্কার?"

"হ্যাঁ। আমরা হচ্ছি ময়লা আবর্জনা। যত পোকামাকড় ইঁদুর গিরগিটি ব্যাং—এর সাথে সাথে আমাদেরকেও ঝাড় দিয়ে বের করে দিয়েছে! যা যা ঢুকেছে সবগুলোকে বের করে দিয়েছে।"

"ইঁদুর গিরগিটি ব্যাং আর আমরা এক হলাম?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com ~

ক্যাপ্টেন ডাবলু একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "আমার তো তাই মনে হচ্ছে। স্পেসশিপের প্রাণীর কাছে পোকামাকড়ের সাথে নাহয় নেংটি ইঁদুরের সাথে আমাদের কোনো পার্থক্য নাই!"

"সেটা কেমন করে সম্ভব?"

"তারা এত উন্নত আর বুদ্ধিমান যে তাদের কাছে মনে হয় সবই সমান। একটা ইঁদুরকে যত বোকা মনে হয় মানুষকেও সেরকম বোকা মনে হয়।"

শাহনাজ মুখ শক্ত করে বলল, "সেটি হতেই পারে না। মানুষকে কেন বোকা মনে হবে?"

ক্যাপ্টেন ডাবলু মাথা চুলকে বলল, "আমি কেমন করে বলব?"

"ওদের কাছে প্রমাণ করতে হবে আমরা অন্য পশুপাখি থেকে অনেক বুদ্ধিমান।"

"কীভাবে করবে?"

"ওদেরকে বলতে হবে, বোঝাতে হবে।"

"তারা যদি তোমার কথা বিশ্বাস না করে শাহনাজপু?"

"তা হলে প্রমাণ করতে হবে। মানুষ পৃথিবীতে কত কিছু আবিষ্কার করেছে—কম্পিউটার থেকে শুরু করে রকেট, পেনিসিলিন থেকে শুরু করে হুপিং কফের টিকা; আর এরা ভাববে আমরা নেংটি ইঁদুরের সমান? এটা কি কখনো হতে পারে?"

"কিন্তু তাই তো হয়েছে। তারা নিশ্চয় এত উন্নত যে এইসব আবিষ্কার তাদের কাছে মনে হয় একেবারে ছেলেমানুষি! তারা কোনো পাত্তাই দেয় না।"

"কিন্তু আমরা তো বুদ্ধিমান! আমরা তো পশুপাখি থেকে ভিন্ন।"

"স্পেসশিপের প্রাণীরা সেটা বুঝতে পারছে না।"

শাহনাজ পা দাপিয়ে বলল, "আমাদের সেটা বোঝাতে হবে।"

পা দাপানোর সাথে সাথে শাহনাজের শরীর থেকে ধুলা উড়ে গিয়ে একটা বিচিত্র দৃশ্যের সৃষ্টি হল। সেই দৃশ্য দেখে এত দুঃখের মাঝেও ক্যাপ্টেন ডাবলু হেসে ফেলল। শাহনাজ রেগে গিয়ে বলল, "হাসছ কেন তুমি হ্যাঁ? এর মাঝে হাসির কী হল?"

"তুমি যখন পা দাপালে তখন ভাইব্রেশানে শরীর থেকে ধুলা বের হয়ে এল! ধুলার সাইজ তো ছোট, মাত্র—"

"এখন সেটা নিয়ে হাসাহাসি করার সময়? তোমাকে দেখতে যে একটা উজবুকের মতো লাগছে আমি কি সেটা নিয়ে হেসেছি?"

ক্যাপ্টেন ডাবলু হাত দিয়ে শরীরের ধুলা ঝাড়তে ঝাড়তে স্বীকার করল যে তাকে নিয়ে শাহনাজ হাসাহাসি করে নি। শাহনাজ রাগ সামলে নিল, এখন মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজকর্ম করতে হবে। ক্যাপ্টেন ডাবলু বিজ্ঞানের অনেক কিছু জানে কিন্তু বিপদের সময় মাথা ঠাণ্ডা রেখে কীভাবে কাজ করতে হয় সেটা মনে হয় জানে না; কী করতে হবে সেটা মনে হয় তাকেই ঠিক করতে হবে। শাহনাজ কঠিনমুখে বলল, "আমাদের আবার স্পেসশিপটার ভিতরে ঢুকতে হবে। ঢুকে প্রাণীগুলোকে বোঝাতে হবে যে আমরাও উন্নত প্রাণী।"

কঠিনমুখে বা জোর দিয়ে কিছু বললে ক্যাপ্টেন ডাবলু সেটা সাথে সাথে স্বীকার করে নেয়, এবারেও মাথা নেড়ে তাড়াতাড়ি সেটা স্বীকার করে নিল। শাহনাজ ক্যাপ্টেন ডাবলুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আমরা সেটা কীভাবে বোঝাব?"

ক্যাপ্টেন ডাবলু খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলল, "বিজ্ঞানের বড় বড় সূত্র নিয়ে শ্লোগান দিই?"

"বড় বড় সূত্র নিয়ে শ্লোগান?" শাহনাজ একটু অবাক হয়ে ক্যাপ্টেন ডাবলুর দিকে তাকাল।

ক্যাপ্টেন ডাবলু মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ, যেমন মনে কর আমি বলব 'ই ইকুয়েলস টু' তুমি বলবে 'এম সি স্কয়ার!' এইটা বলতে বলতে যদি স্পেসশিপে ঘুরে বেড়াই?"

AMARBOI.COM

একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে 'ই ইকুয়েলস টু' 'এম সি স্কয়ার' বলে স্লোগান দিতে দিতে স্পেসশিপে ঘুরে বেড়াচ্ছে দৃশ্যটি কল্পনা করে শাহনাজ কেমন জানি অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। ক্যাপ্টেন ডাবলু কিন্তু নিরুৎসাহিত হল না; বলল, "তার সাথে সাথে আমরা যদি পাইয়ের মান প্রথম এক হাজার ঘর পর্যন্ত মুখস্থ বলতে পারি?"

শাহনাজ অবাক হয়ে বলল, "পাইয়ের মান এক হাজার ঘর পর্যন্ত তোমার মুখস্থ আছে?"

ক্যাপ্টেন ডাবলু মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, "এক হাজার ঘর পর্যন্ত নেই, মাত্র বিশ ঘর পর্যন্ত মুখস্থ আছে। তোমার নেই?"

শাহনাজ মাথা নাড়ল, "না নেই।" পাইয়ের মান এক হাজার ঘর পর্যন্ত মুখস্থ রাখা যে একটা সাধারণ কর্তব্য মনে করে, তার সাথে কথাবার্তা চালানো খুব সহজ ব্যাপার নয়। শাহনাজ মনে মনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

"কিংবা আমরা যদি কোয়ান্টাম মেকানিক্সের অনিশ্চয়তার সূত্রটা অভিনয় করে দেখাতে পারি তা হলে কেমন হয়?" ক্যাপ্টেন ডাবলু চোখ বড় বড় করে বলল, "আমি হব অবস্থানের অনিশ্চয়তা, তুমি হবে ভরবেগের অনিশ্চয়তা—"

"না।" শাহনাজ মাথা নেড়ে বলল, "আমার মনে হয় এসব দিয়ে কাজ হবে না। আমাদেরকে এমন একটা জিনিস খুঁজে বের করতে হবে যেটা পশু থেকে আমাদের আলাদা করে রেখেছে।"

"বুদ্ধিজীবী, না হলে সন্ত্রাসী। শুধু মানুষের মাঝে আছে। পশুপাখির নেই।"

শাহনাজ একটু বিরক্ত হয়ে ধমক দিয়ে বলল, "এখন এইসব ভাবের কথা বলে লাভ নেই, কাজের কথা বল।"

শাহনাজের ধমক খেয়ে ক্যাপ্টেন ডাবলু একটু দমে গেল। মাথা চুলকে বলল, "আমি তো আর কিছু ভেবে পাচ্ছি না।"

শাহনাজ কী একটা বলতে যাচ্ছিল ঠিক তখন শাহনাজের মাথায় চটাৎ করে একটু শব্দ হল, সেখানে কিছু একটা পড়েছে। তারা একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে, গাছের ডালে পাখি কিচিরমিচির করছে, কাজেই তার মাথায় কী জিনিস পড়তে পারে সেটা বুঝতে খুব অসুবিধে হবার কথা নয়। কিন্তু এ রকম সময়ে যে তার জীবনে এটা ঘটতে পারে সেটা শাহনাজ বিশ্বাস করতে পারছিল না। সে মাথা নিচু করে ক্যাপ্টেন ডাবলুকে দেখিয়ে বলল, "দেখ দেখি মাথায় কী পড়ছে?"

ক্যাপ্টেন ডাবলু শাহনাজের মাথার দিকে তাকিয়ে হি হি করে হাসতে শুরু করল, হাসির চোটে তার মুখ থেকে কথাই বের হতে চায় না। অনেক কষ্টে বলল, "মাথায় পাখি বাথরুম করে দিয়েছে।"

শাহনাজ রেগে বলল, "বাথরুম করে দিয়েছে তো তুমি হাসছ কেন?"

ক্যাপ্টেন ডাবলু কেন হাসছে সেটা যুক্তিতর্ক দিয়ে ব্যাখ্যা করার কোনো চেষ্টাই করল না, হি হি করে হাসতেই থাকল। শাহনাজ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে ক্যাপ্টেন ডাবলুর দিকে তাকিয়ে রইল। একজন মানুষ অপদস্থ হলে অন্য একজন সেখান থেকে এভাবে আনন্দ পেতে পারে? শুধু তাই নয়, আনন্দটিতে যে কোনো ভেজাল নেই সেটি কি ক্যাপ্টেন ডাবলুর এই হাসি দেখে বোঝা যাচ্ছে না? হাসতে হাসতে মনে হয় সে বুঝি মাটিতে লুটোপুটি খেতে শুরু করবে। পৃথিবীতে শুধুমাত্র মানুষই মনে হয় এ রকম হৃদয়হীন হতে পারে—এ রকম সম্পূর্ণ অকারণে হাসতে পারে!

ঠিক তক্ষুনি শাহনাজের মাথায় বিদ্যুৎ ঝলকের মতো একটা জিনিস খেলে যায়। হাসি! হাসি হচ্ছে একটি ব্যাপার যে ব্যাপারটি মানুষকে পশু থেকে আলাদা করে রেখেছে। কোনো

পশু হাসতে পারে না, শুধু মানুষ হাসতে পারে। হাসি ব্যাপারটির সাথে বুদ্ধিমত্তার একটা সম্পর্ক রয়েছে। মানুষ যে অত্যন্ত উন্নত একটি প্রাণী তার প্রমাণ হচ্ছে এই হাসি। মানুষ কেন হাসে সেটি নিয়ে পৃথিবীতে শত শত গবেষণা হয়েছে, সেই গবেষণা এখনো শেষ হয় নি, কিন্তু একটি ব্যাপার নিশ্চিত হয়েছে মানুষের নির্ভেজাল হাসি হচ্ছে বুদ্ধিমান মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ। কাজেই স্পেসশিপে গিয়ে মহাকাশের প্রাণীদের সামনে গিয়ে তারা যদি এভাবে হাসতে পারে তা হলে মহাকাশের প্রাণীদের মানুষের বুদ্ধিমত্তা নিয়ে এতটুকু সন্দেহ থাকবে না।

শাহনাজ এবারে সম্পূর্ণ অন্যদৃষ্টিতে ক্যাপ্টেন ডাবলুর হাসির দিকে তাকিয়ে থাকে, সেই দৃষ্টিতে নিশ্চয়ই গুরুতর কিছু ছিল, কারণ হঠাৎ করে ক্যাপ্টেন ডাবলু তার হাসি থামিয়ে শাহনাজের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী হয়েছে শাহনাজপু?"

"স্পেসশিপের প্রাণীদের কী দেখাতে হবে বুঝতে পেরেছি।"

"কী?"

"হাসি।"

"হাসি?" ক্যাপ্টেন ডাবলু ভুরু কুঁচকে তাকাল, "কার হাসি? কিসের হাসি?"

"কার আবার, আমাদের হাসি। মানুষের হাসি হচ্ছে তাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। মানুষ ছাড়া আর কেউ হাসতে পারে না—"

"তা ঠিক। শিম্পাঞ্জি মাঝে মাঝে হাসির মতো মুখ তৈরি করে, কিন্তু মানুষ যেভাবে হাসে সেভাবে হাসতে পারে না।"

শাহনাজ উজ্জ্বলমুখে বলল, "স্পেসশিপের ভিতরে গিয়ে আমরা সেই প্রাণীদের খুঁজে বের করব, তারপর তাদের সামনে হা হা হি হি করে হাসব। পারবে না?"

ক্যাপ্টেন ডাবলুর মুখে ভয়ের একটা ছায়া পড়ল। যখন কোনো প্রয়োজন নেই তখন হেসে ফেলা কঠিন কোনো ব্যাপার নয়, কিন্তু যখন হাসির ওপর জীবন-মরণ নির্ভর করছে তখন কি এত সহজে হাসতে পারবে? যদি তখন হাসি না আসে? শাহনাজ অবশ্য ডাবলুর ভয়কে গুরুত্ব দিল না, হাতে কিল দিয়ে বলল, "ডাবলু, তুই পুরো ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দে, আমি এমন সব জিনিস জানি শুনলে তুই হেসে লুটোপুটি খেতে থাকবি।"

শাহনাজ যে উত্তেজনার কারণে ক্যাপ্টেন ডাবলুকে শুধু 'ডাবলু' বলে 'তুই তুই' করে বলতে শুরু করেছে সেটা দুজনের কেউই লক্ষ করল না। উত্তেজনায় ক্যাপ্টেন ডাবলুও শাহনাজের নামটা আরো সংক্ষিপ্ত করে ফেলল। বলল, "ঠিক আছে শাহনাপু, যদি আমার হাসি না আসে তা হলে আমি ঠিক তোমার মাথায় কীভাবে পাখিটা পিচিক করে বাথরুম করে দিল সেই কথাটা চিন্তা করব, দেখবে আমিও হেসে লুটোপুটি খেতে থাকব।"

কথাটা যে সত্যি সেটা প্রমাণ করার জন্য ক্যাপ্টেন ডাবলু আবার হি হি করে হাসতে থাকল। শাহনাজ চোখ পাকিয়ে বলল, "এখন হাসবি না খবরদার, মাথা ভেঙে ফেলব।"

তার মাথার পাখির বাথরুম কীভাবে পরিষ্কার করবে সেটা নিয়ে সে একটু চিন্তা করে ব্যাগ থেকে পানির বোতলটা বের করে বলল, "ডাবলু, নে আমার মাথায় পানি ঢাল। নোংরাটা ধুয়ে ফেলতে হবে। সাবান থাকলে ভালো হত।"

"না ধুলে হয় না? তা হলে যখনই হাসার দরকার হবে তুমি আমাকে তোমার মাথাটাকে দেখাবে—এটা দেখলেই আমার মনে পড়বে, আর আমার হাসি পেয়ে যাবে!"

"ফাজলেমি করবি না। যা বলছি কর।"

ক্যাপ্টেন ডাবলু খানিকটা অনিচ্ছা নিয়ে শাহনাজের মাথায় বোতল থেকে পানি ঢালতে থাকে।

৭

প্রথমবার স্পেসশিপে ঢোকার সময় যেরকম ভয়-ভয় করছিল এবার তাদের সেরকম ভয় লাগল না। প্রাণীগুলো আগে দেখেছে সেটি একটি কারণ, তাদেরকে ঝাঁটা দিয়ে বের করার সময় তাদের একটুও ব্যথা না দিয়ে স্পেসশিপের ভিতর থেকে পাহাড়ের নিচে নামিয়ে দিয়েছে সেটি আরেকটি কারণ, তবে সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে শাহনাজ যেরকম কল্পনা করেছিল তার সাথে হুবহু মিলে যাওয়ার ব্যাপারটি। শাহনাজের কল্পনা মহাজাগতিক প্রাণী খুব মধুর স্বভাবের, কাজেই এই প্রাণীগুলোও নিশ্চয়ই মধুর স্বভাবেরই হবে—এ ব্যাপারে শাহনাজ আর ক্যাপ্টেন ডাবলুর মনে এখন আর কোনো সন্দেহ নেই।

স্পেসশিপের সেই অদৃশ্য পরদা ভেদ করে ভিতরে ঢুকেই এবারে শাহনাজ আর ক্যাপ্টেন ডাবলু হাসাহাসি করার চেষ্টা করতে শুরু করল। প্রাণীগুলো নিশ্চয়ই তাদের দেখছে, কাজেই তাদের খুঁজে বের করার কোনো দরকার নেই। শাহনাজ বলল, "বুঝলি ডাবলু, আমাদের ক্লাসে একটা মেয়ে পড়ে, তার নাম মীনা—সবাই তাকে ডাকে মিনমিনে মীনা। কেন বল্ দেখি?"

"কেন?"

"সবসময় মিনমিন করে কথা বলে তো, তাই। একদিন স্কুলে আমাদের নববর্ষের অনুষ্ঠান হচ্ছে, তাই সবাই গান শিখছি। একটা গান ছিল রবীন্দ্রনাথের। গানের কথাটা এইরকম : 'বল দাও মোরে বল দাও', সেই গানটা শুনে মিনমিনে মীনা কী বলে জানিস?"

"কী?"

"বলে, কবি রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই ফুটবল খেলার সময় এই গানটা লিখেছিলেন! রাইট আউটে খেলছিলেন, গোলপোস্টের কাছাকাছি গিয়ে সেন্টার ফরোয়ার্ডকে বলেছিলেন, বল দাও মোরে বল দাও আমি গোল দেই।" শাহনাজ কথা শেষ করেই হি হি করে হাসতে লাগল।

AMARBOI.COM

ক্যাপ্টেন ডাবলুকে একটু বিভ্রান্ত দেখাল, ভুরু কুঁচকে বলল, "ফুটবল কেন? ক্রিকেটও তো হতে পারত!"

শাহনাজ একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "হ্যাঁ, তোর যেরকম বুদ্ধি, তাতে ক্রিকেটও হতে পারত!"

কেন শুধু ফুটবল না হয়ে ক্রিকেটও হতে পারত সেটা নিয়ে ক্যাপ্টেন ডাবলু একটা তর্ক শুরু করে দিচ্ছিল, শাহনাজ তাকে ধমক দিয়ে থামাল। বলল, "তুই থাম্ আরেকটা গল্প বলি, শোন্। আমরা তখন ক্লাস সেভেনে পড়ি। ইতিহাস ক্লাসে স্যার শেরশাহের জীবনী পড়াচ্ছেন। স্যার বললেন, শেরশাহ প্রথমে ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করলেন। ঝিনু মস্তান তখন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কেন স্যার, তার আগে ঘোড়ারা ডাকতে পারত না?"

শাহনাজের কথা শেষ হতেই দুজনেই হি হি করে হেসে উঠল। হাসি থামার পর শাহনাজ জিজ্ঞেস করল, "তুই কোনো গল্প জানিস না?"

ক্যাপ্টেন ডাবলু মাথা নাড়ল, বলল, "জানি।"

"বল্, শুনি।"

"এ্যাঁ, এই গল্পটা খুব হাসির। একদিন একটা মানুষ গেছে চিড়িয়াখানাতে", ক্যাপ্টেন ডাবলুকে একটু বিভ্রান্ত দেখায়, মাথা নেড়ে বলল, "না, চিড়িয়াখানা না, মিউজিয়ামে। সেই মিউজিয়ামে গিয়ে—ইয়ে—মানুষটা—" ক্যাপ্টেন ডাবলু আবার থেমে যায়। তারপর আমতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমতা করে বলে, "না, আসলে চিড়িয়াখানাতেই গেছে। সেখানে মানুষটা কী একটা জানি করেছে—বানরের সাথে। আমার ঠিক মনে নাই, বানরটা তখন কী জানি করেছে সেটা এত হাসির—হি হি হি—" ক্যাপ্টেন ডাবলু হি হি করে হাসতেই থাকে।

"এইটা তোর হাসির গল্প?"

"হ্যাঁ। আমার পুরো গল্পটা মনে নাই, কিন্তু খুব হাসির ঘটনা। হাসতে হাসতে পেট ফেটে যাবে!"

শাহনাজ একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "ঠিক আছে। এবারে আমি বলি শোন্। এক ট্রাক ড্রাইভার অ্যাকসিডেন্ট করে হাসপাতালে আছে। তাকে জিজ্ঞেস করা হল কেমন করে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে, সে বলল, আমি ট্রাক চালিয়ে যাচ্ছি হঠাৎ দেখি রাস্তা দিয়ে সামনে থেকে একটা গাড়ি আসছে—আমি তখন তাকে সাইড দিলাম। আরো খানিকদূর গিয়েছি তখন দেখি একটা ব্রিজ আসছে, সেটাকেও সাইড দিলাম। তারপর আর কিছু মনে নাই।"

গল্প শেষ হওয়ার আগেই শাহনাজ নিজেই হি হি করে হাসতে থাকে। ক্যাপ্টেন ডাবলুও গল্প শুনে হোক আর শাহনাজের হাসি দেখেই হোক, জোরে জোরে হাসতে শুরু করে।

দুজনে হাসতে হাসতে আরো কিছুদূর এগিয়ে যায়, মহাজাগতিক প্রাণীগুলোকে এখনো দেখা যাচ্ছে না। না-দেখা গেলে নাই, শাহনাজ ঠিক করেছে তারা দুজন হাসতে হাসতে স্পেসশিপে ঘুরে বেড়াবে। ক্যাপ্টেন ডাবলুর অনেক জ্ঞান থাকতে পারে কিন্তু হাসির গল্প বলায় একেবারে যাচ্ছেতাই, কাজেই মনে হচ্ছে শাহনাজকেই চেষ্টা করে যেতে হবে। সে ক্যাপ্টেন ডাবলুকে জিজ্ঞেস করল, "ডাবলু তুই নাপিতের গল্পটা জানিস?"

"নাপিতের গল্প? না।"

"একদিন একজন লোক নাপিতের কাছে চুল কাটাচ্ছে। সে দেখল তার পায়ের কাছে একটা কুকুর খুব শান্তভাবে বসে তার দিকে তাকিয়ে আছে। লোকটা নাপিতকে জিজ্ঞেস করল, এইটা বুঝি খুব পোষা কুকুর, তাই এ রকম শান্তভাবে বসে আছে? নাপিত বলল, আসলে আমি যখন কারো চুল কাটি তখন এইভাবে ধৈর্য ধরে শান্তভাবে বসে থাকে। চুল কাটতে কাটতে হঠাৎ যখন কানের লতিটাও কেটে ফেলি তখন সেগুলো খুব শখ করে খায়।"

গল্প শুনে ক্যাপ্টেন ডাবলু এক মুহূর্তের জন্য চমকে উঠে শাহনাজের দিকে তাকাল, তারপর হি হি করে হাসতে শুরু করল।

শাহনাজ হাসি থামিয়ে বলল, "বুঝলি ডাবলু আমাদের পাশের বাসায় বাচ্চা একটা ছেলে থাকে, নাম রুবেল, তাকে একদিন জিজ্ঞেস করেছি—রুবেল, তুমি কী পড়? সে বলল, হাফপ্যান্ট পরি! আমি হাসি চেপে জিজ্ঞেস করলাম, না মানে কোথায় পড়? সে শার্ট তুলে দেখিয়ে বলল, এই যে নাভির ওপরে!"

ক্যাপ্টেন ডাবলু হি হি করে হাসতে হাসতে হঠাৎ করে থেমে গেল। শাহনাজ জিজ্ঞেস করল, "কী হল?"

ক্যাপ্টেন ডাবলু চোখের কোনা দিয়ে সামনে দেখিয়ে বলল, "ঐ দেখ!"

শাহনাজ তাকিয়ে দেখে চারটা মহাজাগতিক প্রাণী চুপচাপ দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। শাহনাজ মুখ হাসি-হাসি রেখে চাপা গলায় বলল, "ডাবলু মুখ হাসি হাসি রাখ। আর হাসতে চেষ্টা কর।"

ক্যাপ্টেন ডাবলু হাসার চেষ্টা করে বিদ্‌ঘুটে একরকম শব্দ করল। শাহনাজ একটা নিশ্বাস ফেলে মহাজাগতিক প্রাণীগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, "আগের বার তোমরা ছিলে

দুই জন, এখন দেখছি চার জন! এইভাবে বাড়তে থাকলে কিছুক্ষণেই তো আর এখানে জায়গা হবে না।"

মহাজাগতিক প্রাণীগুলো কোনো শব্দ করল না। শাহনাজ দুই পা এগিয়ে বলল, "তোমাদের সাথে যখন দেখা হয়েই গেল, একটা গল্প শোনাই। দেখি শুনে তোমাদের কেমন লাগে! কী বলিস ডাবলু?"

ক্যাপ্টেন ডাবলু মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ আপু বল।"

"দুই জন মাতাল রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। এক জনের হাতে একটা টর্চলাইট, সে লাইটটা জ্বালিয়ে আলো আকাশের দিকে ফেলে বলল, তুই এটা বেয়ে উপরে উঠতে পারবি? অন্য মাতালটা আলোটার দিকে একনজর তাকিয়ে বলল, তুই আমাকে বেকুব পেয়েছিস? আমি উঠতে শুরু করি আর তুই টর্চলাইট নিভিয়ে দিবি। পড়ে আমি কোমরটা ভাঙি আর কি!"

ক্যাপ্টেন ডাবলু হি হি করে হেসে উঠতেই চারটা মহাজাগতিক প্রাণীই চমকে উঠে ক্যাপ্টেন ডাবলুর দিকে চোখ বড় বড় করে তাকাল। শাহনাজ দেখতে পেল পিটপিট করে চার জনেই চোখের পাতা ফেলছে।

"পছন্দ হয়েছে তোমাদের গল্পটা?"

মহাজাগতিক প্রাণীগুলো এবারে ঘুরে শাহনাজের দিকে তাকাল, এই প্রথমবার প্রাণীগুলোর ভিতরে কোনো ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে, আগেরবার কোনোরকম প্রতিক্রিয়াই ছিল না! শাহনাজ একটু উৎসাহ পেয়ে বলল, "তোমাদের তা হলে আরেকটা গল্প বলি—একজন মহিলা গেছে ডাক্তারের কাছে। ডাক্তারকে বলল, আমার স্বামীর ধারণা সে রেফ্রিজারেটর। কী করি ডাক্তার সাহেব? ডাক্তার সাহেব বললেন, আপনার স্বামী যদি মনে করে সে রেফ্রিজারেটর সেটা তার সমস্যা, আপনার তাতে কী? মহিলা বললেন, সে মুখ হাঁ করে ঘুমায় আর ভিতরে বাতি জ্বলতে থাকে, সেই আলোতে আমি ঘুমাতে পারি না।"

AMARBOI.COM

গল্প শুনে প্রথমে ক্যাপ্টেন ডাবলু এবং তার সাথে সাথে শাহনাজও খিলখিল করে হেসে উঠল, হাসতে হাসতে বলল, "গল্পটা মজার না?"

মহাকাশের প্রাণীগুলো এবারে নিজেদের দিকে তাকাল এবং মনে হল নিজেরা নিজেরা কিছু একটা নিয়ে আলোচনা শুরু করল। শাহনাজ খুব আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থেকে, গলা নামিয়ে ক্যাপ্টেন ডাবলুকে বলল, "মনে হচ্ছে কাজ হচ্ছে। কী বলিস?"

"হ্যাঁ শাহনাপু। থেমো না। আরেকটা বল।"

শাহনাজ কেশে গলা পরিষ্কার করে বলল, "তোমাদের আরেকটা গল্প বলি শোন। একদিন একটা পাগল একটা ডোবার কাছে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে, 'পাঁচ পাঁচ পাঁচ'। একজন লোক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি পাঁচ পাঁচ বলে চিৎকার করছ কেন?' পাগলটা বলল, 'তুমি কাছে আস তোমাকে দেখাই।' লোকটা পাগলের কাছে যেতেই পাগলটা ধাক্কা দিয়ে তাকে ডোবার মাঝে ফেলে দিয়ে চিৎকার করতে থাকল, 'ছয় ছয় ছয়'।"

গল্প শেষ করার আগেই শাহনাজ নিজেই খিলখিল করে হাসতে থাকে, আর তার দেখাদেখি ক্যাপ্টেন ডাবলুও নিজের হাতে কিল দিয়ে হাসা শুরু করে। আর কী আশ্চর্য! হঠাৎ করে মনে হল মহাজাগতিক প্রাণী চারটিও খিকখিক করে হেসে উঠেছে। মহাজাগতিক প্রাণী চারটির একটি হঠাৎ করে শাহনাজের দিকে তাকিয়ে একেবারে পরিষ্কার বাংলায় বলল, "বিচিত্র।"

সাথে সাথে অন্য তিনটি মহাজাগতিক প্রাণীও মাথা নেড়ে বলল, "বিচিত্র।"

শাহনাজ আর ক্যাপ্টেন ডাবলু একসাথে চমকে ওঠে। কী আশ্চর্য! মহাজাগতিক প্রাণীগুলো কথা বলছে। শাহনাজ চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করল, "কী বিচিত্র?"

"হাসি। তোমাদের হাসি।"

"কেন? বিচিত্র কেন?"

"এটি একটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, জটিল, দুর্লভ, বিমূর্ত এবং ব্যাখ্যার অতীত প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াটি আমরা অন্য কোনো প্রাণীর মাঝে দেখি নি।"

"তোমরা—মানে আপনারা হাসেন না?"

"তোমরা আমাদের তুমি-তুমি করে বলতে পার।"

"তোমরা হাস না?"

"না, আমরা হাসি না।"

"কী আশ্চর্য!" শাহনাজ অবাক হয়ে বলল, "তোমরা কখনো কিছু নিয়ে হাস নাই? তোমাদের কোনো বন্ধু কোনোদিন তোমাদের সামনে কলার ছিলকায় আছাড় খেয়ে পড়ে নাই?"

"না।" মহাজাগতিক প্রাণী গম্ভীর গলায় বলল, "প্রকৃতপক্ষে আমরা তোমাদের মতো প্রাণী নই। আমাদের আলাদা অস্তিত্ব নেই।"

"কী বলছ, তোমাদের আলাদা অস্তিত্ব নেই? এই যে তোমরা আলাদা আলাদা চার জন?"

"এটি আমাদের একটি রূপ। তোমাদের সুবিধের জন্য। আসলে আমরা এক এবং অভিন্ন।"

"গুল মারছ।" শাহনাজ মুখ শক্ত করে বলল, "আমাদের ছোট পেয়ে তোমরা আমাদের গুল মারছ!"

"গুল?" প্রাণীটি দ্রুত কয়েকবার চোখের পাতা ফেলে বলল, "গুল কীভাবে মারে?"

"গুল মারা কী জান না?" শাহনাজ হি হি করে হেসে বলল, "গুল মারা হচ্ছে মিথ্যা কথা বলা। অর্থাৎ একটা জিনিস করে যদি অন্য জিনিস বল তা হলে সেটাকে বলে গুল মারা।"

"বিচিত্র। অত্যন্ত বিচিত্র।"

"কী জিনিস বিচিত্র?"

"গুল মারা। কেন একটি তথ্যকে অন্য একটি তথ্য দিয়ে পরিবর্তন করা হবে? কেন গুল মারা হবে?"

শাহনাজ একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "গুল মারতে হয়। বেঁচে থাকতে হলে অনেক সময় গুল মারতে হয়। তাই নারে ডাবলু?"

ডাবলু এতক্ষণ শাহনাজ এবং মহাজাগতিক প্রাণীর মাঝে যে কথাবার্তা হচ্ছে সেটা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিল, নিজে থেকে কিছু বলার সাহস পাচ্ছিল না। শাহনাজের প্রশ্ন শুনে জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ। হ্যাঁ। মাঝে মাঝে গুল মারতে হয়। কয়দিন আগে বাসায় আমার ল্যাবরেটরিতে একটা বিশাল বিস্ফোরণ হল, সবকিছু ভেঙেচুরে একাকার। আম্মার কাছে তখন আমার গুল মারতে হল। না হলে অবস্থা একেবারে ডেঞ্জারাসিন হয়ে যেত।"

মহাজাগতিক চারটি প্রাণীই পুতুলের মতো মাথা নাড়তে লাগল, তাদের মাঝে একটা ফোঁস করে একটা শব্দ করে বলল, "বিচিত্র, অত্যন্ত বিচিত্র।"

শাহনাজ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে প্রাণীগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, "তার মানে তোমরা বলতে চাইছ তোমরা কখনো একজন আরেকজনের কাছে গুল মার নি?"

AMARBOI.COM

"আমি বলেছি আমাদের আলাদা অস্তিত্ব নেই। সব মিলিয়ে আমাদের একটি অস্তিত্ব। এক এবং অভিন্ন।"

"এই যে তোমরা চার জন আছ—" শাহনাজের কথা শেষ হবার আগেই দেখা গেল চার জনের জায়গায় আটটি মহাজাগতিক প্রাণী বসে আছে!

"কী আশ্চর্য!" শাহনাজ আর ক্যাপ্টেন ডাবলু একসাথে চিৎকার করে উঠল! "কীভাবে করলে এটা?"

শাহনাজ অবাক হয়ে বলল, "একেবারে ম্যাজিকের মতো। টিভিতে দেখালে লোকজন অবাক হয়ে যাবে!"

একটি প্রাণী বলল, "আমি তোমাদেরকে বলেছি, আমরা এক এবং অভিন্ন। তোমাদের জন্য এই রূপটি নিয়েছি। আমরা ইচ্ছে করলে অনেকগুলো হতে পারি। আবার ইচ্ছে করলে একটি হয়ে যেতে পারি।"

"হও দেখি।"

শাহনাজের কথা শেষ হবার আগেই আটটি প্রাণী অদৃশ্য হয়ে মাত্র একটি প্রাণী রয়ে গেল—একেবারে ম্যাজিকের মতো। শাহনাজ আর ক্যাপ্টেন ডাবলু আবার অবাক হয়ে চিৎকার করে উঠল।

মহাজাগতিক প্রাণীটি বলল, "এখন বিশ্বাস করেছ?"

শাহনাজ বলল, "এখনো পুরোপুরি করি নাই।"

"কেন পুরোপুরি কর নি?"

"এইটা কীভাবে সম্ভব যে সবাই মিলে একটা প্রাণী? তা হলে কীভাবে সবাই মিলে গল্পগুজব করবে, হাসিঠাট্টা করবে? নিজের সাথে নিজে কি হাসিতামাশা করতে পারে?"

প্রাণীটি ফোঁস করে একটা শব্দ করে বলল, "আমরা ভিন্ন ধরনের প্রাণী, তোমাদের মতো নই। সেই জন্য তোমাদের অনেক কিছু আমাদের কাছে অজানা।"

শাহনাজ হতাশার ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, "কিন্তু তোমরা যদি হাসতেই না পার তা হলে বেঁচে থেকে কী লাভ?"

প্রাণীটি মাথা নেড়ে বলল, "আমরা ঠিক করেছি পৃথিবী থেকে আমরা 'হাসি' নামক প্রক্রিয়াটি আমাদের সাথে নিয়ে যাব।"

"হাসি কি একটা জিনিস যে তোমরা সেটা পকেটে ভরে নিয়ে যাবে?"

প্রাণীটা গম্ভীর গলায় বলল, "যে জিনিস ধরা-ছোঁয়া যায় না—সেই জিনিসও নেওয়া যায়। আমরা নিতে পারি—তবে সে ব্যাপারে তোমাদের একটু সাহায্যের প্রয়োজন হবে।"

শাহনাজ একগাল হেসে বলল, "সাহায্য করতে পারি, কিন্তু এক শর্তে।"

"কী শর্তে?"

"আমার ভাই ইমতিয়াজকে তোমরা ধরে এনেছ, তাকে ছেড়ে দিতে হবে।"

প্রাণীটা এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল, "ঠিক আছে, ছেড়ে দেব।"

শাহনাজ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, "থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।"

ক্যাপ্টেন ডাবলু বলল, "শাহনাপু, আমরা আরো একটা কাজ করতে পারি।"

"কী কাজ?"

"আমরা ওদেরকে কেমন করে গুল মারতে হয় সেটাও শিখিয়ে দিতে পারি! একসাথে দুটি জিনিস শিখে যাবে। হাসি এবং গুল মারা।"

AMARBOI.COM

শাহনাজ ভুরু কুঁচকে ক্যাপ্টেন ডাবলুর দিকে তাকাল, বলল, "কিন্তু সেটা কি ভালো হবে? হাসি তো ভালো জিনিস, কিন্তু গুল মারা তো ভালো না।"

ক্যাপ্টেন ডাবলু একগাল হেসে বলল, "শিখতে তো দোষ নাই। ব্যবহার না করলেই হল। তাই না?"

মহাজাগতিক প্রাণী মাথা নাড়ল, বলল, "ভালো খারাপ এই ব্যাপারগুলো তোমাদের। আমরা যেহেতু এক এবং অভিন্ন, আমাদের কাছে ভালো এবং খারাপ বলে কিছু নেই।"

শাহনাজ মাথা নাড়ল, বলল, "তোমাদের কথা শুনে আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। "এক এবং অভিন্ন।" "ভালো-খারাপ নেই।" "আমি-তুমি নেই।" "আলাদা অস্তিত্ব নেই"—শুনে মনে হচ্ছে ভাইয়ার পোস্ট মডার্ন কবিতার লাইন। এসব ছেড়েছুড়ে দিয়ে বল, আমাদের কী করতে হবে।"

মহাজাগতিক প্রাণী বলল, "আমরা অত্যন্ত খাঁটি হাসির কিছু প্রক্রিয়ার সকল তথ্য সংগ্রহ করতে চাই।"

ক্যাপ্টেন ডাবলু মাথা চুলকে বলল, "হাসাহাসির ঘটনাটা ভিডিও করবে?"

"না। হাসির প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ে প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রত্যেকের মস্তিষ্কের নিউরন এবং তার সিনাপ্সের সংযোগটি কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে সেটি সংরক্ষণ করব।"

ক্যাপ্টেন ডাবলুর মুখ হাঁ হয়ে গেল, বলল, "সেটি কী করে সম্ভব? মস্তিষ্কের ভিতরে তোমরা কীভাবে ঢুকবে?"

"আমরা পারি।"

"কীভাবে পার!"

"স্থান এবং সময়ের মাঝে একটা সম্পর্ক আছে। তোমাদের একজন বিজ্ঞানী সেটা প্রথম অনুভব করেছিলেন—"

"বিজ্ঞানী আইনস্টাইন?"

"সবাইকে একটি নাম দেওয়ার এই প্রবণতায় আমরা এখনো অভ্যস্ত হই নি। সেই বিজ্ঞানীর বড় বড় চুল এবং বড় বড় গোঁফ ছিল।"

ক্যাপ্টেন ডাবলু মাথা নাড়ল, "বিজ্ঞানী আইনস্টাইন!"

"যাই হোক, আমরা সময়কে ব্যবহার করে স্থানকে সংকুচিত করতে পারি, আবার স্থানকে ব্যবহার করে সময়কে সংকুচিত করতে পারি।"

শাহনাজ বিভ্রান্ত মুখে বলল, "তার মানে কী?"

ক্যাপ্টেন ডাবলু চোখ বড় বড় করে বলল, "বুঝতে পারছ না শাহনাপু? স্থান মানে হচ্ছে স্পেস! এরা স্পেস ছোট করে ফেলতে পারে! মনে কর এরা তোমার ব্রেনের ভিতরে ঢুকতে চায় তখন তারা একটা বিশেষ রকম ভাসমান গাড়ি তৈরি করল। তারপর সেই গাড়িটা যে জায়গায় আছে সেই জায়গাটাই ছোট করে ফেলল, গাড়িটা তখন এত ছোট হল যে মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখতে হবে—সেটা তখন তোমার ব্রেনে ঢুকে যাবে, তুমি টেরও পাবে না!" ক্যাপ্টেন ডাবলু মহাজাগতিক প্রাণীর দিকে তাকিয়ে বলল, "তাই না?"

মহাজাগতিক প্রাণী একটু ইতস্তত করে বলল, "মূল ব্যাপারটি খুব পরোক্ষভাবে অনেকটা এ রকম, তবে স্থান এবং সময়ের যোগাযোগ-সূত্রে প্রতিঘাত যোজনের সম্পর্কটি বিশেষণ করতে হয়। চতুর্মাত্রিক জগতে অনিয়মিত অবস্থান নিয়ন্ত্রণের একটি অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া আছে। শক্তি ক্ষয় এবং শক্তি সৃষ্টির একটি অপবলয় রয়েছে, সেটি নিয়ন্ত্রণের একটি

AMARBOI.COM

পদ্ধতি রয়েছে—সব মিলিয়ে পুরো ব্যাপারটি অনুধাবন করার মতো যথেষ্ট নিউরন তোমাদের মস্তিষ্কে নেই। তোমরা প্রয়োজনীয় সিনাপ্স সংযোগ করতে পারবে না।"

শাহনাজ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "কী বলছে কিছুই তো বুঝতে পারলাম না।"

ডাবলু বলল, "সেটাই বলেছে—যে আমরা বুঝতে পারব না।"

"না বুঝলে নাই। মোরব্বা স্যারের কেমিস্ট্রিই বুঝতে পারি না, আর শক্তির অপবলয়! ভাগ্যিস ভাইয়া ধারেকাছে নাই, থাকলে এই কটমটে শব্দগুলো দিয়ে একটা পোস্ট মডার্ন কবিতা লিখে ফেলত।"

"কিন্তু কীভাবে করে জানা থাকলে খারাপ হত না—"

"থাক বাবা, এত জেনে কাজ নেই।" শাহনাজ মহাজাগতিক প্রাণীর দিকে তাকিয়ে বলল, "এখন বল আমাদের কী করতে হবে?"

"অত্যন্ত খাঁটি একটি হাসির প্রয়োজনীয় পরিবেশের সকল তথ্য সংরক্ষণে সাহায্য করতে হবে।"

ক্যাপ্টেন ডাবলু বলল, "হাসি আবার খাঁটি আর ভেজাল হয় কেমন করে?"

"হবে না কেন? তুই যখন কিছু না-বুঝে হাসিস সেটা হচ্ছে ভেজাল হাসি। আমি যখন হাসি সেটা খাঁটি।"

মহাজাগতিক প্রাণী বলল, "খাঁটি একটা হাসির পরিবেশ সৃষ্টি করতে হলে কী করতে হবে?"

শাহনাজের হঠাৎ সোমার কথা মনে পড়ল এবং সাথে সাথে তার মুখ ম্লান হয়ে আসে। পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর করে হাসতে পারে তার সোমা আপু এবং এর হাসি থেকে খাঁটি হাসি পৃথিবীতে আর নেই। কিন্তু সেই সোমা আপু এখন হাসপাতালে আটকা পড়ে আছে, তাকে তো আর এখানে আনা যাবে না।

মহাজাগতিক প্রাণীটি বলল, "সোমার হাসি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে কোনো সমস্যা নেই।"

শাহনাজ চমকে উঠে মহাজাগতিক প্রাণীটির দিকে তাকাল, "তুমি কেমন করে সোমা আপুর কথা জান?"

"তোমরা ভুলে যাচ্ছ, আমরা অন্য ধরনের প্রাণী। তথ্য বিনিময় করার জন্য আমরা সরাসরি তোমার মস্তিষ্কের নিউরনের সিনাপ্স সংযোগ লক্ষ করতে পারি। তোমরা যেটা বল সেটা যেরকম আমরা বুঝতে পারি, ঠিক সেরকম যেটা চিন্তা কর সেইটাও আমরা বুঝতে পারি। আমরা ইচ্ছা করলে সরাসরি তোমাদের মস্তিষ্কেও কথা বলতে পারি কিন্তু তোমরা অভ্যস্ত নও বলে বলছি না।"

ক্যাপ্টেন ডাবলু নাক দিয়ে বাতাস বের করে বলল, "পিকুইলাইটিস।"

"কী বললি?"

মহাজাগতিক প্রাণী বলল, "সে বলছে ব্যাপারটি খুব বিচিত্র।"

ক্যাপ্টেন ডাবলু বলল, "এখন আমি বুঝতে পারছি তোমরা কেন সবুজ রঙের এবং তোমাদের চোখ কেন এত বড় বড় এবং টানা টানা, তোমাদের হাতে কেন তিনটা করে আঙুল—আর শাহনাপু তাদের না-দেখেই কেমন করে সেটা বলে দিল।"

শাহনাজ জিজ্ঞেস করল, "কেমন করে?"

ক্যাপ্টেন ডাবলু শাহনাজের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি এ রকম কল্পনা করেছিলে, এরা তোমার চিন্তাটা দেখে ফেলে নিজেরা সেরকম আকার নিয়েছে।" সে মহাজাগতিক প্রাণীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তাই না?"

মহাজাগতিক প্রাণী বলল, "তুমি যথার্থ অনুমান করেছ। আমরা এমন একটি আকৃতি নিতে চেয়েছিলাম যেটি দেখে তোমরা অস্বস্তি না পাও। সেটি আমরা তোমাদের একজনের মস্তিষ্ক থেকে গ্রহণ করেছি।"

ক্যাপ্টেন ডাবলু ঠোঁট সুচালো করে বলল, "পিকুইলাইটিস! ভেরি ভেরি পিকুইলাইটিস!"

শাহনাজ মহাজাগতিক প্রাণীর দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি সোমা আপুর কথা কী জানি বলছিলে?"

"আমরা বলেছিলাম—"

"আমরা কোথায়? তুমি তো এখন একা।"

"আমি এবং আমাদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। আমরা এক ও অভিন্ন। আমাদের ভিন্ন সত্তা নেই—"

শাহনাজ মাথা চেপে ধরে বলল, "অনেক হয়েছে, আর ওসব নিয়ে বকবক কোরো না, আমার মাথা ধরে যাচ্ছে। হ্যাঁ, সোমা আপুকে নিয়ে তুমি কী যেন বলছিলে?"

"বলছিলাম যে সোমার হাসি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে কোনো সমস্যা নেই।"

"কীভাবে সংগ্রহ করবে?"

"আমরা স্থান এবং সময়কে নিয়ন্ত্রণ করি। আমরা যে কোনো স্থানে যেতে পারি।"

শাহনাজ আনন্দে চিৎকার করে বলল, "তা হলে আমরা সোমা আপুর কাছে যেতে পারব?"

"সে যদি এই গ্যালাক্সিতে থাকে তা হলে পারব।"

শাহনাজ হি হি করে হাসতে গিয়ে থেমে গেল। তার আবার মনে পড়েছে সোমা আপুর শরীর ভালো নয়। মুখ কালো করে বলল, "কিন্তু সোমা আপু কি হাসবে? তার তো শরীর ভালো না!"

"মানুষের শরীরে নানা ধরনের সীমাবদ্ধতা আছে, তাই শরীর ভালো না-থাকা কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। তার সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে তোলা যেতে পারে।"

শাহনাজ আবার চিৎকার করে উঠল, "তার মানে তোমরা সোমা আপুকে ভালো করে তুলতে পারবে? তোমাদের কাছে ভালো ডাক্তার আছে?"

"ডাক্তার?" মহাজাগতিক প্রাণী মাথা নেড়ে বলল, "একেকজনকে একেক বিষয়ে অভিজ্ঞ করে তোলার এই প্রবণতার সাথে আমরা পরিচিত নই। আমরা এক ও অভিন্ন, আমাদের জীবন্ত সত্তা—"

"ব্যস ব্যস ব্যস—" শাহনাজ বাধা দিয়ে বলল, "অনেক হয়েছে, আবার এক ও অভিন্ন সত্তা নিয়ে বক্তৃতা শুরু করে দিও না। তুমি ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাবে, না ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে চিকিৎসা করাবে সেটা তোমার ব্যাপার। সোমা আপু ভালো হলেই হল।"

"তা হলে আমরা কি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি?"

"হ্যাঁ। চল যাই, দেরি করে লাভ নেই।"

মহাজাগতিক প্রাণী বলল, "তুমি পূর্বশর্ত হিসেবে যে মানুষটিকে ছেড়ে দেওয়ার কথা বলেছিলে তাকে কি এখন ছেড়ে দেব? তাকে কি আমরা সাথে নিয়ে নেব?"

"না, না, না—" শাহনাজ মাথা নেড়ে বলল, "তোমার মাথা খারাপ হয়েছে? সাথে নিলে উপায় আছে? ঠিক তোমরা যাবার সময় তাকে ছেড়ে দিও। তার আগে না।"

"ঠিক আছে।"

AMARBOI.COM

শাহনাজ হঠাৎ ঘুরে মহাজাগতিক প্রাণীর দিকে তাকাল, বলল, "আচ্ছা তোমরা কি একটা জিনিস করতে পারবে?"

শাহনাজ কথাটি বলার আগেই মহাজাগতিক প্রাণী মাথা নাড়ল, বলল, "পারব।"

শাহনাজ ভুরু কুঁচকে বলল, "আমি কী বলতে যাচ্ছি তুমি বুঝেছ?"

"হ্যাঁ। তুমি বলতে চাইছ তোমার ভাইয়ের আকার পরিবর্তন করে দিতে।"

শাহনাজ মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ ছোট সাইজ করে একটা হোমিওপ্যাথিকের শিশিতে ভরে দিবে! আমি আমার জ্যামিতি–বক্সে রেখে দিব। তার খুব বিখ্যাত হওয়ার শখ—এক ধাক্কায় বিখ্যাত হয়ে যাবে!"

শাহনাজ হি হি করে হাসতে শুরু করে। এটা মোটামুটি খাঁটি আনন্দের হাসি, মহাজাগতিক প্রাণী তথ্য সংরক্ষণ করছে কি না কে জানে!

৮

শাহনাজ এবং ক্যাপ্টেন ডাবলুকে নিয়ে মহাজাগতিক প্রাণীটি যে ভাসমান যানটাতে উঠল সেরকম যান সায়েন্স ফিকশানের সিনেমাতেও দেখা যায় না। সেটি একটি মাইক্রোবাসের মতো বড় আর যন্ত্রপাতিতে বোঝাই। চকচকে ধাতব রঙের, দুই পাশে ছোট ছোট দুটি পাখা, মাথাটা সুচালো। পিছনে গেলে একটা ইঞ্জিন। ভিতরে পাশাপাশি তিনটা সিট। মাঝখানে মহাজাগতিক প্রাণী বসেছে, দুই পাশে শাহনাজ আর ক্যাপ্টেন ডাবলু। ভাসমান যানটা চলতে শুরু করার আগে শাহনাজ ভয়ে ভয়ে বলল, "এটা বেশি ঝাঁকাবে না তো? ঝাঁকুনি হলে আমার কিন্তু শরীর খারাপ হয়ে যায়।"

মহাজাগতিক প্রাণী বলল, "না ঝাঁকাবে না।"

শাহনাজ জিজ্ঞেস করল, "ইয়ে তোমার নাম কী?"

"আমি আগেই বলেছি নাম-পরিচয় ইত্যাদি ব্যাপারগুলোতে আমরা বিশ্বাস করি না।"

"কিন্তু তোমাকে তো কিছু একটা বলে ডাকতে হবে। বল কী বলে ডাকব?"

"উচ্চ কম্পনের একটা শব্দ করে ডাকতে পার।"

"কুকুরকে যেভাবে শিস্ দিয়ে ডাকে সেরকম?"

ক্যাপ্টেন ডাবলু বলল, "সেটা ভালো হবে না। যে এত সুন্দর একটা ভাসমান যান চালাবে তার একটা ফ্যান্টাবুলাস নাম দরকার। যেমন মনে করা যাক—" ক্যাপ্টেন ডাবলু মাথা চুলকে বলল, "ডক্টর জিজি?"

"ডক্টর জিজি?"

শাহনাজ আপত্তি করে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু মহাজাগতিক প্রাণীটা মাথা নেড়ে বলল, "ভালো নাম। আমি ডক্টর জিজি।"

"তোমার নামটা পছন্দ হয়েছে?"

মহাজাগতিক প্রাণীটা মাথা নাড়ল, কাজেই কারোই আর কিছু বলার থাকল না। ডক্টর জিজি সামনে রাখা ত্রিমাত্রিক কিছু যন্ত্রপাতির মাঝে হাত দিয়ে কিছু একটা স্পর্শ করতেই ভাসমান যানটিতে একটা মৃদু কম্পন অনুভব করল এবং প্রায় সাথে সাথে সেটি উপরে উঠে গিয়ে প্রায় বিদ্যুদ্বেগে ছুটে যেতে শুরু করে। মাটির কাছাকাছি দিয়ে এটি গাছপালা ঘরবাড়ি মানুষজনের পাশ দিয়ে ছুটে যেতে থাকে। কিন্তু কী আশ্চর্য! কেউ ঘুরেও তাদের দিকে

তাকাল না। ভাসমান যানের ভিতর দিয়ে তারা সবাইকে দেখতে পাচ্ছে কিন্তু তাদেরকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। কী বিচিত্র ব্যাপার!

শাহনাজ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "ডক্টর জিজি, আমাদেরকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না কেন?"

"কাউকে দেখতে হলে তাকে একই সময় এবং একই স্থানে থাকতে হয়। আমরা সময়ের ক্ষেত্রে একটু এগিয়ে আছি, কাজেই আমরা তাদের দেখতে পাচ্ছি কিন্তু তারা আমাদের দেখতে পাচ্ছে না।"

"সময়ে তারা যখন এগিয়ে আসবে?"

"তখন আমরাও এগিয়ে যাব, তাই কেউ দেখতে পারবে না।"

ক্যাপ্টেন ডাবলু ব্যাপারটি এত সহজে মেনে নিতে রাজি হল না। ঘাড়ের রগ ফুলিয়ে তর্ক করার প্রস্তুতি নিল, বলল, "কিন্তু আমি পড়েছি কিছু দেখতে হলে লাইট কোণের মাঝে থাকতে হয়, কাজেই আমরা যদি তাদের দেখতে পাই তা হলে তারাও আমাদের দেখতে পাবে।"

ডক্টর জিজি বলল, "ব্যাপারটি বোঝার মতো যথেষ্ট নিউরন তোমাদের নেই। সহজ করে এভাবে বলি—আমাদের কাছে আলো আসছে বলে আমরা তাদের দেখছি, আমাদের এখান থেকে কোনো আলো তাদের কাছে যাচ্ছে না বলে তারা আমাদের দেখছে না।"

ক্যাপ্টেন ডাবলু তর্ক করার জন্য আবার কী একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই তাদের ভাসমান যানটি হঠাৎ পুরোপুরি কাত হয়ে একটা বড় বিল্ডিঙের ভিতর ঢুকে গেল, বারান্দা দিয়ে ছুটে গিয়ে একটা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে গেল। ডক্টর জিজি বলল, "সোমা এই ঘরে আছে।"

শাহনাজ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কীভাবে জান?"

"তোমার মস্তিষ্কে যে তথ্য আছে সেটা ব্যবহার করে বের করেছি।"

শাহনাজ কী একটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল তার আগেই ভাসমান যানটি কাত হয়ে ঘরের মাঝে ঢুকে গেল। শাহনাজ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল একটা ছোট জায়গার ভিতরে কেমন করে একটা বড় জিনিস ঢুকে পড়ে, কিন্তু তার আগেই তার নজরে পড়ল বিছানায় শুয়ে সোমা ছটফট করছে। তার মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম, ঠোঁট কালচে এবং মুখ রক্তশূন্য। সোমার কাছে তার আম্মা দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর মুখ ভয়ার্ত। সোমার হাত ধরে কাতর গলায় বলছেন, "কী হয়েছে সোমা? মা, কী হয়েছে?"

"ব্যথা করছে মা। বুকের মাঝে ব্যথা করছে।"

সোমার আম্মা লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর চিৎকার লাগলেন, "নার্স নার্স। নার্স কোথায়?"

আম্মার কথা শুনে কেউ এল না, তখন আম্মা চিৎকার করতে করতে বের হয়ে গেলেন। শাহনাজ বলল, "চল আমরা নামি।"

ডক্টর জিজি বলল, "না। এই গাড়ি থেকে বের হলে তোমাকে দেখতে পাবে। এখন বের হওয়া যাবে না।"

শাহনাজ প্রায় কান্না-কান্না হয়ে বলল, "কিন্তু সোমা আপার বুকের মাঝে কষ্ট!"

ডক্টর জিজি বলল, "আমরা সেটা এক্ষুনি দেখব।"

ডক্টর জিজির কথা শেষ হবার আগেই সোমার আম্মা আবার ঘরে এসে ঢুকলেন, তার পিছু পিছু একজন পুরুষমানুষ এসে ঢুকল। মানুষটা খুব বিরক্তমুখে সোমার আম্মাকে ধমক দিয়ে বলল, "কী হয়েছে? এত চিৎকার করছেন কেন?"

"আমার মেয়েটার বুকে খুব ব্যথা করছে!"

"ব্যথা তো করবেই। অসুখ হলে ব্যথা করবে না?"

"কিন্তু ওষুধ দিয়ে তো ব্যথা কমার কথা, কমছে না কেন?"

মানুষটা ধমক দিয়ে বলল, "আমি কি ওষুধ তৈরি করি? আমি কেমন করে বলব?"

ডক্টর জিজি বলল, "বিচিত্র, অত্যন্ত বিচিত্র।"

শাহনাজ জিজ্ঞেস করল, "কী বিচিত্র?"

"এই মানুষটি মুখে একটি কথা বলছে কিন্তু মস্তিষ্কে সম্পূর্ণ অন্য কথা।"

"মস্তিষ্কে কী কথা বলছে?"

"মস্তিষ্কে বলছে যে—ভাগ্যিস বেটি জানে না আমি ভুল ওষুধ দিয়ে ফেলেছি!"

"সর্বনাশ! তাই বলছে ওই বদমাইশ লোকটা? ওই পাজি লোকটা? শয়তান লোকটা?"

"হ্যাঁ।"

"এখন কী হবে ডক্টর জিজি?" শাহনাজ প্রায় কেঁদে ফেলল, "এখন সোমা আপুর কী হবে?"

"বিশেষ কিছু হবে না।" ডক্টর জিজি বলল, "সোমার শরীর সামলে নিয়েছে। ভুল ওষুধে বেশি ক্ষতি হয় নি। কিন্তু খুব বিচিত্র।"

"কী বিচিত্র?"

"ওই মানুষটার মস্তিষ্ক আবার একটা জিনিস বলছে, কিন্তু মুখে অন্য জিনিস বলছে।"

"কী বলছে মস্তিষ্কে? কী চিন্তা করছে? তুমি সব শুনতে পাচ্ছ?"

ডক্টর জিজি শাহনাজের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি একটা কাজ করি তা হলে তোমরাও শুনতে পারবে।"

"কী করবে?"

"মানুষটার ভোকাল কর্ডের সাথে মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণটা জুড়ে দিই। তা হলে সে যা চিন্তা করবে সেটা জোরে জোরে বলবে।"

AMARBOI.COM

"তুমি করতে পারবে?"

"পারব।"

"তোমাকে কি লোকটার ভিতরে যেতে হবে? নাকি এখানে বসেই করবে?"

"আমি বলে এখানে কিছু নেই। আমি একটা রূপ, আমাদের প্রকৃত অস্তিত্ব এক ও অভিন্ন—"

"বুঝেছি বুঝেছি বুঝেছি।" শাহনাজ মাথা চেপে ধরে বলল, "এখন বক্তৃতা না দিয়ে তোমার কাজ শুরু কর।"

ডক্টর জিজি তার যন্ত্রপাতির মাঝে হাত ঢুকিয়ে কিছু একটা স্পর্শ করল এবং হঠাৎ করে সোমার আম্মার সাথে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটার মাথাটা নিয়ন্ত্রণহীনভাবে নড়তে থাকে। সোমার আম্মা এক পা পেছনে সরে ভয় পেয়ে বললেন, "কী হয়েছে? আপনার কী হয়েছে?"

মানুষটার মাথাটা হঠাৎ যেভাবে নড়তে শুরু করেছিল ঠিক সেরকম হঠাৎ করে আবার থেমে গেল। বলল, "না কিছু হয় নাই। খালি মনে হল মগজ থেকে কিছু একটা টেনে বের করে নিয়ে গেল!"

সোমার আম্মা অবাক হয়ে মানুষটার দিকে তাকালেন, জিজ্ঞেস করলেন, "কী বললেন আপনি?"

"আমি কিছু বলি নাই।" এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "যেটা বলতে চাই নাই সেটাও বলে ফেলেছি! শালার মহাযন্ত্রণা দেখি।"

সোমার আম্মা কোনো কথা না বলে অবাক হয়ে মানুষটার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

মানুষটা থতমত খেয়ে বলল, "আমি আপনার মেয়েকে ব্যথা কমানোর জন্য একটা ইনজেকশন দিয়ে দিই। এবারে চেষ্টা করব ঠিক ইনজেকশন দিতে—আগেরবারের মতো ভুল যেন না হয়!"

সোমার আম্মা চমকে উঠে বললেন, "কী বললেন আপনি? কী বললেন? আপনি আগেরবার ভুল ইনজেকশন দিয়েছেন?"

মানুষটি মাথা নেড়ে বলল, "না, না, না, আমি ভুল ইনজেকশন দিই নাই।"

শাহনাজ অবাক হয়ে দেখল মানুষটা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আবার কথা বলতে শুরু করেছে, "কী মুশকিল! আমি সব কথা দেখি বলে ফেলছি। ভুল ইনজেকশন দিয়েছি দেখেই তো এই যন্ত্রণা। ওষুধগুলো চুরি করার জন্য আলাদা করে রেখেছিলাম, তখনই তো গোলমালটা হল।"

সোমার আম্মা তীক্ষ্ণচোখে মানুষটার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি ওষুধ চুরি করেন?"

মানুষটার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, সে কথা না–বলার জন্য নিজের মুখ চেপে ধরার চেষ্টা করে, কিন্তু তবু মুখ থেকে কথা বের হতে থাকে, "আমি তো অনেকদিন থেকেই ওষুধ চুরি করছি। শুধু ওষুধ চুরি করলে কী হয়? রোগীদের বিপদের মাঝে ফেলে দিয়ে তাদের থেকে টাকাও আদায় করি। আর গ্রামের সাদাসিধে মানুষ হলে তো কথাই নাই, তাদের এমনভাবে ঠকাই যে বারটা বেজে যায়।"

সোমার আম্মা অবাক হয়ে মানুষটার দিকে তাকিয়ে রইলেন, মানুষটা কাঁদো–কাঁদো হয়ে বলল, "আমার কী হয়েছে আমি বুঝতে পারছি না, উল্টাপাল্টা কথা বলে ফেলছি।"

"উল্টাপাল্টা বলছেন নাকি সত্যিই বলছেন?"

মানুষটা আবার প্রাণপণে মুখ বন্ধ করে রাখার চেষ্টা করে কিন্তু তবু তার মুখ থেকে কথা বের হতে থাকে, "এ কী বিপদের মাঝে পড়েছি! সব কথা দেখি বলে দিয়ে নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারতে শুরু করেছি। এখন তো মনে হচ্ছে অন্য কথাগুলোও বলে দেব! কয়দিন আগে একজন রোগী এসেছিল, যখন ব্যথায় ছটফট করছে তখন মানিব্যাগটা সরিয়ে দিলাম কেউ টের পেল না! সেদিন ফুড পয়জনিঙে যখন একটা নতুন বউ এল, তার গলার হারটা খুলে নিলাম। ইচ্ছে করে ওভারডোজ ঘুমের ওষুধ দিয়ে রেখেছিলাম। তারপর সেই বাচ্চার কেসটা ধরা যাক—"

মানুষটা আর পারল না, দুই হাতে নিজের চুল টেনে ধরে চিৎকার করতে করতে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। সোমা ক্ষীণ গলায় বলল, "কী হয়েছে আম্মু?"

"তোকে নাকি একটা ভুল ওষুধ দিয়েছিল তাই ব্যথা কমছে না।"

"মানুষটা কী ভালো দেখেছ আম্মু? ভুল হয়ে গেছে সেটা নিজেই স্বীকার করল!"

"ভালো না হাতি! কী কী করেছে শুনিস নি? আস্ত ডাকাত, পুলিশের হাতে দিতে হবে। দাঁড়া আগে ঠিক ওষুধ দেওয়ার ব্যবস্থা করি।"

শাহনাজ অবাক বিস্ময়ে পুরো ব্যাপারটি দেখছিল। এবারে অকারণেই গলা নামিয়ে ডক্টর জিজিকে বলল, "তুমি সোমা আপুকে ভালো করে দিতে পারবে?"

ডক্টর জিজি কিছুক্ষণ তার যন্ত্রপাতির দিকে তাকিয়ে বলল, "মনে হয় পারব।"

শাহনাজ হাততালি দিয়ে বলল, "সত্যি পারবে?"

"হ্যাঁ।

"কী করতে হবে?"

ডক্টর জিজি তার যন্ত্রপাতি স্পর্শ করে বলল, "সোমার হৃৎপিণ্ডে একটা সমস্যা আছে। তোমরা যেটাকে হৃৎপিণ্ড বল সেখানে একটা ইনফেকশন হয়ে একটা অংশ অকেজো হয়ে যাচ্ছে। রক্ত সঞ্চালনে সমস্যা হচ্ছে, এভাবে থাকলে বড় বিপদ হয়ে যাবে।"

শাহনাজ ভয়-পাওয়া গলায় বলল, "সর্বনাশ! কীভাবে এটা ঠিক করবে?"

"এখান থেকে ঠিক করা যায়। আবার শরীরের ভিতরে ঢুকে হৃৎপিণ্ডে ঢুকেও ঠিক করা যায়।"

"শরীরের ভিতরে ঢুকে?" শাহনাজ চোখ কপালে তুলে বলল, "শরীরের ভিতরে ঢুকবে কেমন করে?"

ক্যাপ্টেন ডাবলু উত্তেজিত গলায় বলল, "শাহপু—মনে নাই তোমাকে বলেছিলাম ডক্টর জিজি স্পেসকে ছোট করে ফেলতে পারে? আমরা সবাই মিলে এখন ছোট হয়ে 'কী-মজা-হবে' আপুর শরীরে ঢুকে যাব, তাই না ডক্টর জিজি?"

ক্যাপ্টেন ডাবলু অতিরিক্ত উত্তেজনার কারণে শাহনাজের নামটি আরো সংক্ষিপ্ত করে সেটাকে "শাহপু" করে ফেলেছে, কিন্তু সেটা এখন কেউই খেয়াল করল না। ছোট হয়ে সোমার শরীরের ভিতর ঢুকে যাওয়ার কথাটি সত্যি কি না জানার জন্য শাহনাজ ডক্টর জিজির দিকে তাকাল। ডক্টর জিজি মাথা নাড়ল, বলল, "আসলে ব্যাপারটা আমরা যেভাবেই করি না কেন, এর মাঝে টপোলজিক্যাল কিছু স্থানান্তর হবে। কিন্তু তোমাদের মনে হবে তোমরা অনেক ছোট হয়ে সোমার শরীরে ঢুকে যাচ্ছ।"

শাহনাজ বুকের ভিতর আটকে থাকা একটা নিশ্বাস বের করে দিল। তারা নিশ্চয়ই এর মাঝে খানিকটা ছোট হয়ে গেছে তা না হলে মাইক্রোবাসের মতো বড় একটা স্পেসশিপ এই ছোট ঘরটায় ঢুকে গেল কেমন করে?

ডক্টর জিজি তার যন্ত্রপাতিতে হাত দিতে দিতে বলল, "তোমরা শক্ত করে সিট ধরে রাখ, অনেক বড় ত্বরণ হবে।"

শাহনাজ শুকনো গলায় বলল, "বেশি ঝাঁকুনি হবে না তো? বেশি ঝাঁকুনি হলে আমার আবার শরীর খারাপ হয়ে যায়, বমিটমি করে দিই।"

ডক্টর জিজি বলল, "কিছু ঝাঁকুনি হতে পারে।"

"সর্বনাশ! আর সোমা আপু? তার শরীরের ভিতরে ঢুকে যাব—সে ব্যথা পাবে না তো?"

"চামড়া ফুটো করে শরীরের ভিতরে ঢুকে যাবার সময় একটু ব্যথা পাবে, মশার কামড় বা ইনজেকশনের মতো। তারপর আর টের পাবে না।"

ভাসমান যানটি ভোঁতা শব্দ করে ঘরের ভিতরে ঘুরতে শুরু করে। শাহনাজের কেমন জানি ভয়-ভয় করতে থাকে, সে শক্ত করে তার সিটটা ধরে রাখল। ক্যাপ্টেন ডাবলুর দিকে তাকিয়ে দেখল তার মুখ আনন্দে জ্বলজ্বল করছে, উত্তেজনায় সবগুলো দাঁত বের হয়ে আছে। শাহনাজের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল, "কী খেপচুরিয়াস ফ্যান্টাগ্লিমাস কুক্কাডুমাস ব্যাপার! কী বুকাণ্টুকাস, কী নিন্টিফিটাস!"

ক্যাপ্টেন ডাবলুর অর্থহীন চিৎকার শুনতে শুনতে শাহনাজ দেখতে পেল সোমার সারা ঘরটা আস্তে আস্তে বড় হতে শুরু করেছে। শুধু ঘরটা নয়, সোমাও বড় হতে শুরু করেছে, মনে হচ্ছে সোমা বিশাল একটা ভাস্কর্যের মতো বড় হয়ে ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মাঝেই মনে হল তারা বুঝি এক বিশাল আদি অন্তহীন প্রান্তরে, বহুদূরে বিশাল পাহাড়ের মতো সোমা শুয়ে আছে, তাকে আর এখন মানুষ বলে চেনা যায় না। ক্যাপ্টেন ডাবলু চিৎকার করে বলল, "শাহপু, দেখেছ—মনে হচ্ছে আমরা ঠিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছি আর সবকিছু বড় হয়ে গেছে? আসলে আমরা ছোট হয়ে গেছি। কী বুকাংটুকাস ব্যাপার!"

ক্যাপ্টেন ডাবলুর কাছে এটা খুব মজার বুকাংটুকাস ব্যাপার মনে হলেও শাহনাজের ভয়–ভয় করতে থাকে। কোনো কারণে তারা যদি আর বড় না হতে পারে তা হলে কী হবে? কেউ তো কখনো তাদের খুঁজেও পাবে না।

ডক্টর জিজি বলল, "আমরা এখন সোমার শরীরে অনুপ্রবেশ করতে যাচ্ছি। সবাই প্রস্তুত থাক।"

ভাসমান যানটা হঠাৎ মাথা নিচু করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করে, শাহনাজ নিশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে থাকে। ভাসমান যানটা দিক পরিবর্তন করে সামনের পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, ধীরে ধীরে পাহাড়ের খুঁটিনাটি তাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এটা নিঃসন্দেহে সোমার শরীরের কোনো অংশ, সেটি এখন এত বিশাল যে কোন্ অংশ আর বোঝা যাচ্ছে না। হয়তো হাত, কিংবা হাতের আঙুল, কিংবা নাক বা কপাল! ডক্টর জিজি ভাসমান যানটিকে নিয়ন্ত্রণ করে সামনের দিকে ছুটিয়ে নিতে থাকে। সোমার মনে হতে থাকে তারা বুঝি এক্ষুনি কোনো এক বিশাল পাহাড়ে আঘাত খেয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। ভয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে সে চোখ বন্ধ করল। সাথে সাথে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা অনুভব করল, সাথে সাথে চারদিক অন্ধকার হয়ে যায়। ক্যাপ্টেন ডাবলু আনন্দে চিৎকার করে বলল, "নিন্টিফিটাস! শরীরের ভিতরে ঢুকে গেছি!"

শাহনাজ ভয়ে ভয়ে চোখ খুলে বলল, "এত অন্ধকার কেন?"

"শরীরের ভিতরে তো অন্ধকার হবেই।" ক্যাপ্টেন ডাবলু ডক্টর জিজিকে বলল, "একটু আলো জ্বেলে দাও না।"

সাথে সাথে বাইরে উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠল, শাহনাজ অবাক হয়ে দেখল বিশাল একটা পাইপের মাঝে দিয়ে তারা ছুটে যাচ্ছে, পাইপে হলুদ রঙের তরল, তার মাঝে নানা ধরনের জিনিস ভাসছে। ভাসমান যানটিকে হঠাৎ কে যেন প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা দেয়, আর সেই ধাক্কায় তারা সামনে ছিটকে পড়ল। শাহনাজ কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "কী হয়েছে?"

"আমরা একটা আর্টারিতে ঢুকেছি। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের সাথে সাথে রক্তের চাপের জন্য এ রকম একটা ধাক্কা খেয়েছি।"

"রক্ত?" শাহনাজ অবাক হয়ে বলল, "বাইরে এটা রক্ত?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু রক্ত তো লাল হবার কথা, হলুদ কেন?"

ক্যাপ্টেন ডাবলু বলল, "বুঝতে পারছ না শাহপু, আমরা এত ছোট হয়ে গেছি যে সবকিছু আলাদা আলাদা দেখতে পাচ্ছি। হলুদ তরলটা হচ্ছে প্লাজমা। মাঝে মাঝে যে লাল রঙের জিনিস দেখতে পাচ্ছ বড় বড় থালার মতো গোল গোল, সেগুলো হচ্ছে লোহিত কণিকা। আর ঐ সাদা সাদাগুলো, ভিতরে নিউক্লিয়াস, সেগুলো নিশ্চয়ই শ্বেতকণিকা। তাই না ডক্টর জিজি?"

ডক্টর জিজি ভাসমান যানটিকে রক্তের স্রোতের মাঝে দিয়ে চালিয়ে নিতে নিতে মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ।"

শাহনাজ ভয়ে ভয়ে বলল, "কিন্তু শ্বেতকণিকা তো সবসময় শরীরের মাঝে রোগজীবাণুকে আক্রমণ করে! আমাদেরকে আক্রমণ করে ফেলবে না তো?"

শাহনাজের কথা শেষ হওয়ার আগেই হঠাৎ করে অনেকগুলো শ্বেতকণিকা তাদের ভাসমান যানটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, প্রচণ্ড আক্রমণে তাদের ভাসমান যানটি ওলটপালট খেতে থাকে। শাহনাজ ভয়ে-আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল। ডক্টর জিজি বলল, "সবাই সাবধান, বাড়তি ত্বরণ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি।"

হঠাৎ করে তারা একটা প্রচণ্ড গতিবেগ অনুভব করল, মনে হল কোনো কঠিন জিনিস ভেদ করে তারা এগিয়ে যাচ্ছে। খানিকক্ষণ ওলটপালট খেয়ে একসময় তারা স্থির হল। শাহনাজের সমস্ত শরীর গুলিয়ে আসছে, মনে হচ্ছে এখনি বুঝি হড় হড় করে বমি করে দেবে। ফ্যাকাসে মুখে সে ডক্টর জিজির মুখের দিকে তাকাল, "কী হচ্ছে এখানে?"

"পুরো ভাসমান যানের শরীরে বৈদ্যুতিক চার্জ দিয়ে দিয়েছি। শ্বেতকণিকা এখন আর আক্রমণ করবে না।"

শাহনাজ তাকিয়ে দেখল সত্যিই তাই, ভয়ঙ্কর শ্বেতকণিকাগুলো এখন দূরে দূরে রয়েছে, কাছে আসতে সাহস পাচ্ছে না। শাহনাজ কী একটা বলতে চাইছিল তার আগেই আবার পুরো ভাসমান যানটি দুলে উঠে প্রচণ্ড ধাক্কায় সামনে এগিয়ে যায়। প্রস্তুত ছিল না বলে ক্যাপ্টেন ডাবলু তার সিট থেকে উল্টে পড়ল, মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে উঠে বসে বলল, "কী–মজা–হবে' আপুর হার্ট কী শক্ত দেখেছ? একেকবার যখন বিট করে, আমরা একেবারে ভেসে যাই।

শাহনাজ অনেক কষ্ট করে বমি আটকে রেখে বলল, "মানুষের হার্টবিট তো সেকেন্ডে একটা করে হয়। সোমা আপুর এত দেরি করে হচ্ছে কেন?"

ডক্টর জিজি বলল, "আমাদের নিজেদেরকে সংকুচিত করার জন্য সময় প্রসারিত হয়ে গেছে। বাইরের সবকিছু এখন খুব ধীরগতি মনে হচ্ছে।"

AMARBOI.COM

ব্যাপারটি ঠিক কীভাবে হচ্ছে শাহনাজের এখন সেটা বোঝার মতো অবস্থা নেই, সে দুর্বল গলায় বলল, "আমরা যদি আর্টারিতে থাকি তা হলে তো হার্ট থেকে দূরে সরে যাব। আর ব্লাডপ্রেশারের এই ধাক্কাগুলো খেতে থাকব। আমাদের এখন কি একটা ধমনীর মাঝে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত না?"

ক্যাপ্টেন ডাবলু বলল, "এখানে বসে থাকলে নিজ থেকেই ক্যাপিলারি হয়ে চলে যাব। তাই না ডক্টর জিজি?"

ডক্টর জিজি মাথা নাড়ল। শাহনাজ ভয়ে ভয়ে বলল, "কিন্তু তা হলে তো অনেক সময় লাগবে। তা ছাড়া আর্টারিতে থাকলে তো একটু পরে পরে হার্টের সেই প্রচণ্ড ধাক্কা খেতে থাকব।"

ডক্টর জিজি বলল, "আমরা রক্তের স্রোতের ওপর ভরসা না করে নিজেরাই এগিয়ে যাব। তা হলে সময় লাগবে না।"

ক্যাপ্টেন ডাবলু আগ্রহ নিয়ে বলল, "আমরা শরীরের কোন্ জায়গার ক্যাপিলারিতে যাব?"

"আঙুলের।"

ক্যাপ্টেন ডাবলু ঠোঁট উল্টে বলল, "আঙুল তো মোটেই ইন্টারেস্টিং না। ব্রেনের ভিতরে যেতে পারি না? সব নিউরনগুলোকে দেখতে পেতাম।"

শাহনাজ কঠিন গলায় বলল, "ডাবলু, তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে বুঝি পর্যটনের বাসে করে রাঙ্গামাটি বেড়াতে এসেছিস্! যে কাজের জন্য এসেছি সেটা শেষ করে ভালোয় ভালোয় ফিরে যা।"

"কিন্তু শাহপু! এ রকম সুযোগ জীবনে আর কয়বার আসে তুমি বল? আমরা একজনের শরীরের ভিতরে ঢুকে সবকিছু নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছি!"

"আমার এত সুযোগের দরকার নেই।" শাহনাজ ডক্টর জিজির দিকে তাকিয়ে বলল, "ডক্টর জিজি। তুমি ক্যাপ্টেন ডাবলুর কথা শুনো না। যেখানে যাওয়ার কথা সেখানে চল।"

ডক্টর জিজি তার যন্ত্রপাতিতে হাত দিয়ে স্পর্শ করতেই ভাসমান যানটা একবার কেঁপে উঠে তারপর হঠাৎ দ্রুতগতিতে ছুটতে শুরু করে। বাইরের প্লাজমা, লোহিত কণিকা, শ্বেতকণিকা, আর্টারির দেয়াল সবকিছু অস্পষ্ট হয়ে আসে। এভাবে তারা কতক্ষণ গিয়েছিল কে জানে, হঠাৎ করে ভাসমান যানটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। ডক্টর জিজি বলল, "এসে গেছি।"

"কোথায় এসে গেছি?"

"হৃৎপিণ্ডে।"

শাহনাজের পেটের ভিতরে কেমন জানি পাক খেয়ে ওঠে, কী আশ্চর্য, তারা সোমার হৃৎপিণ্ডের মাঝে হাজির হয়েছে! গোল জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে তারা দেখতে পায়, চকচকে ভিজে এবং গোলাপি রঙের বিশাল একটা জিনিস থরথর করে কাঁপছে, পুরো জিনিসটা হঠাৎ সংকুচিত হতে শুরু করে, এক সময় প্রচণ্ড শব্দ করে আবার ফুলে ওঠে, তার ধাক্কায় পুরো ভাসমান যানটি শূন্যে কয়েকবার ওলটপালট খেয়ে আসে। শাহনাজ তার সিট থেকে ছিটকে পড়ে গেল, কোনোমতে সোজা হয়ে বসে বলল, "কী হয়েছে?"

ক্যাপ্টেন ডাবলু সিটের তলা থেকে বের হয়ে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল, "হার্ট বিট করছে।"

শাহনাজ নিশ্বাস ফেলে বলল, "সোমা আপুর হার্ট ঠিক করতে গিয়ে আমাদেরই তো মনে হচ্ছে হার্টফেল হয়ে যাবে!"

ডক্টর জিজি বলল, "পুরো হার্টটা একবার দেখে আসি, তারপর কাজ শুরু করব।"

শাহনাজ ভয়ে ভয়ে বলল, "বেশি কাছে যেয়ো না ডক্টর জিজি। হার্টটা যখন বিট করে একেবারে বারটা বেজে যায় আমাদের।"

ডক্টর জিজি তার ভাসমান যান নিয়ে হার্টটা পর্যবেক্ষণ করে আসে। শাহনাজ কিংবা ক্যাপ্টেন ডাবলু ঠিক বুঝতে পারল না, কিন্তু ডক্টর জিজি নিজে নিজে কিছু হিসাব করে কাজ শুরু করে দিল। ইনফেকশনের অংশটুকুতে কিছু খুব ছোট ছোট ভাইরাস ছিল, সেগুলোর পিছনে ডক্টর জিজি কী সব লেলিয়ে দিল। ভয়ঙ্কর দর্শন কিছু ব্যাকটেরিয়া ছিল, শ্বেতকণিকা তাদের সাথে যুদ্ধ করে খুব সুবিধে করতে পারছিল না, ডক্টর জিজি তার কিছু রোবটকে শ্বেতকণিকার পাশাপাশি যুদ্ধ করতে পাঠিয়ে দিল। হার্টের কোষগুলোর ক্ষতি হয়েছিল, সেগুলো সারিয়ে তোলার জন্য ডক্টর জিজি তার কাজ আরম্ভ করে দিল। হার্টের ভিতরে একটা অংশ পরীক্ষা করে দেখা গেল কিছু গুরুত্বপূর্ণ আর্টারি ইনফেকশনের কারণে বন্ধ হয়ে আছে, রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যাওয়াতে হার্টের বেশকিছু কোষ নষ্ট হয়ে গেছে, অনেক কোষ নষ্ট হবার পথে। ডক্টর জিজি আর্টারির পথ খুলে রক্তপ্রবাহ নিশ্চিত করল। হঠাৎ করে যখন রক্তপ্রবাহ শুরু হল, রক্তের ধাক্কায় ভাসমান যানটি ওলটপালট খেয়ে একটা ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি হয়ে গেল। শক্ত করে আঁকড়ে ধরে থেকেও সিটে বসে থাকা যায় না। নষ্ট হয়ে যাওয়া কোষগুলো সরিয়ে সেখানে অন্য জায়গা থেকে কোষ এনে লাগানো হল, বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ দিয়ে সেগুলো জুড়ে দেওয়া হল, মৃতপ্রায় কিছু কোষকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য তার ভিতরে বিশেষ পুষ্টিকর জিনিস ঢোকানো হল।

AMARBOI.COM

এর সবকিছুর মাঝে সোমার হৃৎপিণ্ড যখন প্রতিবার স্পন্দন করে, তার প্রচণ্ড ধাক্কায় ভাসমান যানের ভিতরে সবাই ওলটপালট খেতে থাকে! শেষ পর্যন্ত যখন ডক্টর জিজি বলল, "আমার ধারণা সোমার শারীরিক সমস্যাটি আমরা সারিয়ে তুলেছি" তখন শাহনাজ আনন্দে চিৎকার করে উঠল। ক্যাপ্টেন ডাবলু হাতে কিল দিয়ে বলল, "ক্যান্টাবুলাস! ফিকটুবুলাস!! চল এখন কী-মজা-হবে আপুর শরীরে একটা ট্যুর দিয়ে আসি?"

"শরীরে ট্যুর দিয়ে আসি!"

"হ্যাঁ কিডনির ভিতরে দেখে আসি সেটা কেমন করে কাজ করে।"

"কিডনির ভিতরে? ডাবলু, তোর মাথা খারাপ হয়েছে?"

"তা হলে চল পাকস্থলিতে ঢুকে যাই, সেখানে দেখবে হাইড্রোক্লোরিক এসিড টগবগ করছে, একটু ভুল হলেই সবকিছু গলে যাবে! কী বুকাংটুকাস, নিন্টিফুটাস!"

"ডক্টর জিজিকে নিয়ে তুই একা যখন আসবি তখন তোর যা ইচ্ছে তাই করিস। এখন এই মুহূর্তে এখান থেকে বের হতে হবে! কখন কোথা থেকে কোন্ শ্বেতকণিকা আক্রমণ করবে, কোন্ এন্টিবডি এসে ধরে ফেলবে, কোন্ কেমিক্যাল জ্বালিয়ে দেবে, কোন্ নার্ভ থেকে ইলেকট্রিসিটি এসে শক দিয়ে দেবে, ব্লাডপ্রেশার আছাড় মারবে, তার কি কোনো ঠিক আছে? মানুষের শরীরের ভিতরের মতো ডেঞ্জারাস কোন্ জায়গা আছে?"

"তা ঠিক। কিন্তু এ রকম একটা সুযোগ আর কখনো আসবে?"

"না আসলে নাই। ডক্টর জিজি চল যাই।"

ডক্টর জিজি মাথা নেড়ে বলল, "চল।"

কাজেই ক্যাপ্টেন ডাবলুকে তার আশা অসম্পূর্ণ রেখেই বের হয়ে আসতে হল। হৃৎপিণ্ডের কাছাকাছি একটা বড় আর্টারি ধরে রওনা দিয়ে গলার কাছাকাছি ছোট একটা কেপিলারি ধরে তারা বের হয়ে এল। ভাসমান যানটি আবার উপরে কয়েকবার পাক খেয়ে তার আগের আকৃতি নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

সোমা তার বিছানায় বসে একটু অবাক হয়ে তার গলায় হাত বুলাচ্ছে। পাশেই সোমার আম্মা দাঁড়িয়ে আছেন, অবাক হয়ে সোমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "কী হয়েছে, সোমা?"

"গলার কাছে কী যেন কুট করে উঠল। মশার কামড়ের মতো।"

"আমি মশার ওষুধ দিতে বলছি, তুই উঠে বসেছিস কেন? শুয়ে থাক।"

সোমা হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে তার আম্মার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, "আম্মা আমার আর শুয়ে থাকতে হবে না। আমি ভালো হয়ে গেছি। একেবারে ভালো হয়ে গেছি।"

আম্মা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, "কী বলছিস তুই পাগলের মতো! ডাক্তার বলেছে হার্টে ইনফেকশন—"

"ডাক্তারকে বলতে দাও মা। আমি জানি আমি ভালো হয়ে গেছি। আমার বুকে কোনো ব্যথা নেই, আমার মাথা ঘুরছে না, আমার দুর্বল লাগছে না, আমার এত খিদে পেয়েছে যে আমার মনে হচ্ছে আমি আস্ত একটা ঘোড়া খেয়ে ফেলতে পারব!"

"কী বলছিস মা তুই!"

"হ্যাঁ মা। তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না, তাই না?"

"কেমন করে করি? ডাক্তার আজ সকালে এত মনখারাপ করিয়ে দিয়েছে—"

"ডাক্তার বলেছে আমার হার্ট রক্ত পাম্প করতে পারছে না, তাই আমি খুব দুর্বল। তাই না?"

"হ্যাঁ।"

AMARBOI.COM

"আমি তোমার কাছে প্রমাণ করব। আমি দুর্বল না। আমি কী করব জান?"

"কী করবি?"

"আমি তোমাকে কোলে নিয়ে নাচব।" বলে সত্যি সত্যি সোমা তার আম্মাকে জড়িয়ে ধরে টেনে উপরে তুলে একপাক ঘুরে এল! তারপর আনন্দে চিৎকার করে বলল, "আমি ভালো হয়ে গেছি। আমি ভালো হয়ে গেছি!"

সোমার আম্মা খুশিতে কী করবেন বুঝতে পারছিলেন না, সোমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "খোদা নিশ্চয়ই তোকে ভালো করে দিয়েছে। কিন্তু মা, যতক্ষণ পর্যন্ত ডাক্তার তোকে পরীক্ষা না করছে আমি শান্তি পাব না। তুই চুপ করে শুয়ে থাক। বিকেলবেলা ডাক্তার আসবে।"

সোমা মাথা নেড়ে বলল, "না আম্মা। আমি শুয়ে থাকতে পারব না। তুমি শুয়ে থাক, আমি হাসপাতালটা ঘুরে দেখি।"

"কী বলছিস তুই!"

"আমি ঠিকই বলছি। তোমার ওপর দিয়ে অনেক ধকল গিয়েছে। তুমি শুয়ে থাক।" সোমা সত্যি সত্যি তার আম্মাকে ধরে বিছানায় বসিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এল।

সোমা তার কেবিন থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে ডক্টর জিজি ভাসমান যানটি তার পিছু পিছু বের করে নিয়ে এল। এতবড় একটি ভাসমান যান কীভাবে ছোট দরজা দিয়ে বের হয়ে আসে সেটা নিয়ে শাহনাজ আর অবাক হয় না, কিছুক্ষণ আগে তারা সোমার শরীরের ভিতর থেকে ঘুরে এসেছে। সোমা হেঁটে হেঁটে সাধারণ ওয়ার্ডে এসে উঁকি দিল, সেখানে নানারকম রোগী বিছানায় শুয়ে আছে। সোমা তাদের মাঝে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একটা বেডের সামনে দাঁড়িয়ে যায়। চার-পাঁচ বছরের একটা ছোট বাচ্চা বিছানায় শুয়ে আছে, তার কাছে একজন মহিলা, মহিলাটির মাথার চুল এলোমেলো, উদ্‌ভ্রান্তের মতো চেহারা। সোমা কাছে গিয়ে নরম গলায় বলল, "আপনার কী হয়েছে মা?"

AMARBOI.COM

মহিলাটি মাথায় হাত দিয়ে ম্লানমুখে হেসে বললেন, "কিছু হয় নি মা। আমার বাচ্চাটির সেলুলাইটিস হয়েছিল।"

"এখন কেমন আছে?"

"ডাক্তার বলেছে বিপদ কেটে গেছে। আল্লাহ্ মেহেরবান।"

"মা, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি কয়েকদিন কিছু খান নি, ঘুমান নি, বিশ্রাম নেন নি।"

"ঠিকই বলেছ মা।" মা ম্লানমুখে হাসলেন, "ছেলেটাকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম।"

সোমা বলল, "এখন তো আর দুশ্চিন্তা নেই। এখন আপনি বিশ্রাম নেন।"

"ছেলেটা আমাকে ছাড়ছে না। হাসপাতালের পরিবেশে অভ্যস্ত নয় তো।"

"আমি আপনার ছেলের সাথে বসি, আপনি ঘুরে আসেন। বাইরে একটা সোফা আছে, বসে দুই মিনিট ঘুমিয়ে নেন।"

"আমার ছেলে মানবে না, মা।"

"মানবে।" সোমা বিছানার দিকে এগিয়ে বাচ্চাটির দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি জান আমি ম্যাজিক দেখাতে পারি?"

বাচ্চাটি চোখ বড় বড় করে কৌতূহলী চোখে তাকাল। সোমা বিছানার পাশে বসে তার ডান হাত খুলে সেখানে একটা লজেন্স রেখে বলল, "আমার এই হাতে একটা লজেন্স। এই

দেখ আমি হাত বন্ধ করলাম।" সোমা হাত বন্ধ করে তার হাতের উপর দিয়ে অন্য হাত নেড়ে বলল, "ছুঃ মন্তর ছুঃ! আকালী মাকালী যাদুমন্তর ছোঃ!" তারপর ছেলেটার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "এখন বল দেখি লজেন্সটা কোথায়?"

ছেলেটা বড় বড় চোখে সোমার দিকে তাকিয়ে রইল, সোমা আরো বড় বড় চোখ করে বলল, "লজেন্সটা চলে গেছে তোমার পকেটে!"

ছেলেটা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে সোমার দিকে তাকিয়ে নিজের পকেটে হাত দিতে গেল, সোমা তার আগেই ছেলেটার হাত ধরে বলল, "উহুঁ, আগেই পকেটে হাত দেবে না। আমি তো আসল ম্যাজিকটা এখনো দেখাই নি!"

ছেলেটা কৌতূহলী চোখে সোমার দিকে তাকাল, সোমা চোখ বড় বড় করে তার ডান হাতটা মুষ্টিবদ্ধ রেখে বাম হাত নাড়তে শুরু করে, "ছুঃ মন্তর ছুঃ কালী মন্তর ছুঃ! পকেটের লজেন্সটা আবার আমার হাতে চলে আয়!"

সোমা এবারে ছেলেটার চোখের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে তার ডান হাত খুলে বলল, "এই দেখ লজেন্সটা তোমার পকেট থেকে আবার আমার হাতে চলে এসেছে!"

ছেলেটাকে এক মুহূর্তের জন্য বিভ্রান্ত দেখায় তারপর হঠাৎ করে কৌশলটা বুঝতে পারে, সাথে সাথে বিছানায় উঠে বসে বলল, "ঈশ! কী দুষ্টু! আসলে—আসলে লজেন্সটা হাতেই আছে,—আমার পকেটে যায়ই নাই। আমি যেন বুঝতে পারি না—"

সোমা চোখেমুখে ধরা পড়ে যাবার একটা ভঙ্গি করে বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে রইল, তার পর হঠাৎ খিলখিল করে হাসতে থাকল। সোমার হাসি দেখে বাচ্চাটাও হাসতে থাকে, পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মাও হাসতে শুরু করেন। হঠাৎ করে পুরো পরিবেশটা আনন্দময় হয়ে ওঠে।

শাহনাজ ডক্টর জিজিকে ধাক্কা দিয়ে বলল, "ঐ দেখ, সোমা আপু হাসছে! তাড়াতাড়ি রেকর্ড কর।"

ডক্টর জিজি বলল, "আমি তথ্য সংরক্ষণ করতে শুরু করেছি। অত্যন্ত বিচিত্র।"

শাহনাজ উবু হয়ে বসে সোমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, দেখতে দেখতে তার মুখেও হাসি ফুটে ওঠে।

৯

ভাসমান যানটা শহরের উপর ঘুরছে। খুব উপর থেকে নয়, মাটির কাছাকাছি মানুষজন গাড়ি দালানকোঠা পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। কেউ তাদের দেখতে পাচ্ছে না, ভারি মজার একটা ব্যাপার। সোমার হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে সবার মনে খুব আনন্দ। ডক্টর জিজি যে আসলে মহাজাগতিক একটা প্রাণী, তার গায়ের রং সবুজ, বিশাল বড় মাথা, বড় বড় চোখ, নাকে দুটি গর্ত এবং কোনো মুখ নেই তবুও কথা বলে যাচ্ছে, হাতে তিনটি করে আঙুল, কোনো কাপড় পরে নেই কিন্তু তবু ন্যাংটা মনে হচ্ছে না এবং এই পুরো ব্যাপারটি প্রায় অসম্ভব একটি ঘটনা; কিন্তু শাহনাজ আর ক্যাপ্টেন ডাবলুর কাছে কোনোকিছুই অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। প্রয়োজনে ডক্টর জিজির শরীরে তারা থাবা দিয়েও দেখছে, তুলতুলে নরম ঠাণ্ডা একটি শরীর, হাত দিলে প্রথমে একটু চমকে উঠলেও একটু পরে বেশ অভ্যাস হয়ে যায়।

AMARBOI.COM

শাহনাজ ডক্টর জিজিকে বলল, "ডক্টর জিজি, সোমা আপুকে ভালো করে দেওয়ার জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।"

ডক্টর জিজি বলল, "আমরা যখন নিচুশ্রেণীর সভ্যতায় যাই সেখানে কোনো বিষয়ে হাত দিই না। কিন্তু এই ব্যাপারটা অন্যরকম ছিল—"

শাহনাজ চোখ পাকিয়ে বলল, "আমাদের সভ্যতা নিচুশ্রেণীর?"

"হ্যাঁ। সভ্যতা নিচুশ্রেণীর না হলে কেউ তাদের পরিবেশের এত ক্ষতি করে? এত মানুষকে না-খাইয়ে রাখে? নিজেরা নিজেরা যুদ্ধ করে এত মানুষকে মেরে ফেলে?"

শাহনাজ কী বলবে বুঝতে পারল না। ডক্টর জিজি তো সত্যি কথাই বলেছে, আসলেই তো মানুষ অপকর্ম কম করে নি। একটা নিশ্বাস ফেলে সে বিষয়বস্তু পাল্টে ফেলার চেষ্টা করল, "ডক্টর জিজি, তুমি তো সোমা আপুর হাসি রেকর্ড করেছ। সেটা হচ্ছে এক ধরনের হাসি। সোমা আপু হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো মানুষ, তার মাঝে কোনো খারাপ জিনিস নেই। পৃথিবীতে যে কোনো খারাপ জিনিস থাকতে পারে সেটা সোমা আপু জানেই না, দেখলেও বিশ্বাস করবে না। কাজেই তার হাসিটা হচ্ছে একেবারে খাঁটি আনন্দের হাসি। কিন্তু পৃথিবীতে আরো অন্যরকম হাসিও আছে।"

"সেটা কীরকম?"

"যেমন মনে কর আমার কথা। আমি তো সোমা আপুর মতো ভালো না। আমার ভিতরে রাগ আছে, হিংসা আছে, কাজেই আমার হাসি হবে অন্যরকম।"

"সেটা কীরকম?"

"যেমন মনে কর ঝিনু মস্তান কিংবা মোরব্বা স্যারের কথা। এই দুইজনকে আমি দুই চোখে দেখতে পারি না। যদি তাদেরকে কোনোভাবে আমি একটু মজা টের পাওয়াতে পারি তা হলে আমার এত আনন্দ হবে যে আমি খিলখিল করে হাসতেই থাকব, সেটাও এক ধরনের হাসি!"

AMARBOI.COM

"অত্যন্ত বিচিত্র!"

"এর মাঝে তুমি কোন্ জিনিসটাকে বিচিত্র দেখছ?"

"একজনকে মজা দেখিয়ে অন্যজনের মজা পাওয়া।"

"এটা মোটেও বিচিত্র না। এটা সবচেয়ে স্বাভাবিক। এটা দুনিয়ার নিয়ম—"

শাহনাজের কথা শেষ হবার আগেই হঠাৎ করে ভাসমান যানটি দাঁড়িয়ে গেল। শাহনাজ চমকে উঠে বলল, "কী হয়েছে?"

"মোবারক আলী স্যারের বাসায় এসেছি।"

শাহনাজ অবাক হয়ে বলল, "সে কী! কখন এলে? কীভাবে এলে? চিনলে কীভাবে?"

"আমি সব চিনি, আমি দেখতে চাই তুমি মজা দেখিয়ে কীভাবে মজা পাও।"

"কিন্তু আমি কীভাবে মজা দেখাব?"

"সেটা তুমি ঠিক কর।"

শাহনাজ নিশ্বাস ফেলে বলল, "তুমি বুঝতে পারছ না ডক্টর জিজি। মোরব্বা স্যার আসলে মানুষ না, কোনো দৈত্য-দানব। শুধু ওপরের চামড়াটা মানুষের। আমি যদি তাকে মজা দেখাতে যাই তা হলে আমাকে ধরে কাঁচা খেয়ে ফেলবে।"

ডক্টর জিজি মাথা নাড়ল, বলল, "সে যেন তোমাকে খেতে না পারে আমি সেটা দেখব। আমি তোমাকে সবরকম সাহায্য করব।"

শাহনাজ চোখ বড় বড় করে বলল, "সবরকম?"

"হ্যাঁ। সবরকম।"

"আমি যদি বলি, স্যার আপনার নাকটা এক হাত লম্বা হয়ে যাক—তা হলে স্যারের নাকটা এক হাত লম্বা হয়ে যাবে?"

"হ্যাঁ। তা হলে আমি তার নাকের মাঝে গিয়ে কোষ বিভাজন অনেক দ্রুত করে দেব যেন তোমাদের মনে হয় নাকটা লম্বা হয়ে গিয়েছে।"

শাহনাজ নিশ্বাস বন্ধ করে বলল, "আমি যদি বলি আপনি শূন্যে ঝুলে থাকবেন তা হলে স্যার শূন্যে ঝুলে থাকবে?"

"হ্যাঁ, আমাকে ছোট একটা স্কাউটশিপ পাঠিয়ে তাকে উপরে তুলে রাখতে হবে।"

শাহনাজ হাততালি দিয়ে বলল, "ইশ! কী মজা হবে! আমাকে এক্ষুনি নামিয়ে দাও ডক্টর জিজি!" শাহনাজ ক্যাপ্টেন ডাবলুকে জিজ্ঞেস করল, "ডাবলু, তুই যাবি?"

"না, শাপু। তুমি যাও আমি এখান থেকে দেখি ডক্টর জিজি কী করে!"

শাহনাজ চোখ বড় বড় করে বলল, "কী বললি? শাপু? আমার নামটা ছোট করতে করতে এখন শাপু করে ফেলেছিস!"

ক্যাপ্টেন ডাবলু হি হি করে হেসে বলল, "কেন শাপু, তোমার আপত্তি আছে?"

"না নেই। আমি দেখতে চাই ছোট হতে হতে শেষ পর্যন্ত কী হয়!" শাহনাজ ডক্টর জিজির দিকে তাকিয়ে বলল, "এখন আমাকে নামিয়ে দাও। যখন বলব তখন আবার আমাকে তুলে নিও, ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে।"

শাহনাজ ভাসমান যান থেকে নেমে এদিক-সেদিক তাকাল, কেউ তাকে দেখতে পায় নি। যদি দেখত তা হলে ভয়ে চিৎকার শুরু করত, একেবারে অদৃশ্য থেকে হঠাৎ একজন মানুষ হাজির হলে ভয়ে চিৎকারই করার কথা। শাহনাজ স্যারের বাসার দরজায় শব্দ করল, প্রায় সাথে সাথেই একজন দরজা খুলে দেয়। শাহনাজদের স্কুলের একটা মেয়ে, তাকে দেখে অবাক হয়ে বলল, "শাহনাজ আপু! তুমি?"

"হ্যাঁ। মোরব্বা স্যার আছে?"

মেয়েটি মুখে আঙুল দিয়ে বলল, "শ-স-স-স, স্যার শুনতে পাবে।"

"শুনলে শুনবে। আমি আর ভয় পাই না। স্যার কোথায়?"

"ঐ ঘরে, ব্যাচে পড়াচ্ছে আমাদের।"

"চল যাই, স্যারের সাথে দেখা করতে হবে।"

শাহনাজ পাশের ঘরে গিয়ে দেখতে পেল একটা বড় ঘরে অনেকগুলো মেয়ে গাদাগাদি করে বসে আছে, সামনে একটা চেয়ারে পা তুলে কুৎসিত ভঙ্গিতে বসে থেকে একটা খবরের কাগজ পড়তে পড়তে স্যার নাক খুঁটছে। শাহনাজকে দেখে স্যার ভুরু কুঁচকে বললেন, "কে?"

"আমি স্যার।"

মোবারক স্যার খেঁকিয়ে উঠলেন, "আমিটা আবার কে?"

"আমার নাম শাহনাজ। আপনার ছাত্রী।"

"ও।" স্যার নাক খুঁটতে খুঁটতে জিজ্ঞেস করলেন, "কী চাস?"

"অনেক দিন থেকেই আপনাকে একটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম।"

"কী কথা?"

"আপনি যে ক্লাসে কিছু পড়ান না, সবাইকে প্রাইভেট পড়তে বাধ্য করেন সেটা খুব অন্যায়।"

শাহনাজের কথা শুনে মোবারক স্যারের চোয়াল ঝুলে পড়ল, খানিকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলেন না, মাছকে পানি থেকে ডাঙায় তুললে যেভাবে খাবি খেতে থাকে সেভাবে খাবি খেতে লাগলেন। তারপর নাক দিয়ে ফোঁস করে একটা নিশ্বাস বের করে বললেন, "কী বললি?"

"আমি বলেছি যে আপনি যে ক্লাসে কিছু পড়ান না, সবাইকে প্রাইভেট পড়তে বাধ্য করেন সেটা খুব অন্যায়।"

মোবারক স্যার যেখানে বসে ছিলেন সেখানেই বসে থেকে কীভাবে যেন লাফিয়ে উঠলেন, উত্তেজনায় তার লুঙ্গি খুলে গেল এবং কোনোভাবে সেই লুঙ্গি ধরে চিৎকার দিয়ে বললেন, "তবে রে পাজি মেয়ে। বদমাইশির জায়গা পাস না—"

অন্য যে কোনো সময় হলে ভয়ে শাহনাজের জান উড়ে যেত, কিন্তু আজ অন্য ব্যাপার, সে ভয় পেল না। বরং মুখটা হাসি-হাসি করে বলল, "আপনি আরো বড় বড় অন্যায় কাজ করেন স্যার!" পরীক্ষার আগে ছাত্রীদের কাছে থেকে টাকা নিয়ে তাদের পরীক্ষার প্রশ্ন বলে দেন। সেটা আরো বড় অন্যায়।"

"তবে রে শয়তানী" বলে মোবারক স্যার শাহনাজের দিকে একটা লাফ দিলেন। কিন্তু তখন খুব বিচিত্র একটা ব্যাপার হল, মনে হল মোবারক স্যার অদৃশ্য একটা দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে উল্টে পড়ে গেলেন। কোনোমতে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে ফ্যালফ্যাল করে চারদিকে তাকালেন এবং ঠিক তখন একটা মেয়ে কোথায় জানি হাসি চাপার চেষ্টা করতে করতে শেষ পর্যন্ত না পেরে 'ফিচ' করে একটু হেসে ফেলল। মোবারক স্যার চারদিকে মুখ ঘুরিয়ে একটা হুংকার দিয়ে বললেন, "চোপ, সবাই চোপ!"

শাহনাজ নরম গলায় বলল, "শব্দটা হচ্ছে চুপ। বাংলায় চোপ বলে কোনো শব্দ নেই।"

"তবে রে বদমাইশি—" বলে মোবারক স্যার শাহনাজের উদ্দেশে আরেকটা লাফ দিলেন, কিন্তু আবার অদৃশ্য দেয়ালে আঘাত খেয়ে নিচে আছাড় খেয়ে পড়লেন। বেশকিছু মেয়ে লাফিয়ে সরে গিয়ে ঠিকভাবে আছাড় খাবার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা করে দিল। শাহনাজ তখন দুই পা অগ্রসর হয়ে বলল, "স্যার খামোকা আমাকে ধরার চেষ্টা করবেন না। পারবেন না। এর চাইতে অপরাধ স্বীকার করে ফেলেন।"

মোবারক স্যারের কপাল ফুলে উঠেছে, সেখানে হাত বুলাতে বুলাতে হিংস্র চোখে বললেন, "কী বললি তুই?"

"আমি বলছি যে আপনি যে প্রাইভেট পড়ানোর নাম করে ছাত্রীদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তাদেরকে পরীক্ষার প্রশ্ন বলে দেন, কিছু শেখান না—সেটা স্বীকার করে নেন।"

"তুই কে? তোর কাছে কেন আমি স্বীকার করব?"

শাহনাজ সব মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমরা সব সাক্ষী। আমি কিন্তু স্যারকে একটা সুযোগ দিয়েছি। দিই নি?"

মেয়েরা আনন্দে সবগুলো দাঁত বের করে জোরে জোরে মাথা নাড়ল। শাহনাজ মোবারক স্যারের দিকে তাকিয়ে বলল, "স্যার এখনো সময় আছে। আপনি যদি অপরাধ স্বীকার করেন, আপনাকে এবারের মতো মাফ করে দেওয়া হবে। আর যদি স্বীকার না করেন, মিথ্যা কথা বলেন, খুব বড় বিপদ হবে।"

"কতবড় সাহস তোর? আমাকে বিপদের ভয় দেখাস!"

"জি স্যার। মিথ্যা কথা বললেই আপনার নাকটা এক হাত লম্বা হয়ে যাবে।"

মোবারক স্যার চিৎকার করে বললেন, "আমি মিথ্যা কথা বলি না।" স্যারের কথা শেষ হবার আগেই সড়াৎ করে একটা শব্দ হল আর সবাই অবাক হয়ে দেখল স্যারের নাকটা লম্বা হয়ে পেট পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। গাদাগাদি করে বসে থাকা মেয়েগুলো ভয় পেয়ে চিৎকার করে সবাই পিছনে সরে এল। শাহনাজ হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গি করে মাথা নেড়ে বলল, "আমি বলছিলাম না? আপনি আমার কথা শুনলেন না!"

মোবারক স্যার একেবারে হতভম্ব হয়ে নিজের নাকের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তাকে দেখে মনে হতে লাগল একটা সাপ বুঝি নাককে কামড়ে ধরেছে। ভয়ে ভয়ে তিনি লম্বা নাকটা ধরলেন, তারপর একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে সেটাকে খুলে ফেলার চেষ্টা করলেন এবং হঠাৎ করে আবিষ্কার করলেন, সত্যি সত্যি তার নাক লম্বা হয়ে গেছে।

গাদাগাদি করে বসে থাকা মেয়েগুলোর ভিতর থেকে একজন হঠাৎ আবার ফিচ করে হেসে ফেলল। হাসি ভয়ানক সংক্রামক একটি জিনিস, ফিচ শব্দটি শুনে আরো অনেকে ফিচ ফিচ করে হাসতে শুরু করল। প্রথমে আস্তে আস্তে তারপর বেশ জোরে। শাহনাজ অনেকক্ষণ চেষ্টা করে আর নিজেকে সামলাতে পারল না, খিলখিল করে হাসতে শুরু করল।

মোবারক স্যার নিজের লম্বা নাকটা ধরে হতভম্বের মতো বসে রইলেন, কয়েকবার কিছু একটা বলতে চেষ্টা করে থেমে গেলেন। শাহনাজ হাসি থামিয়ে বলল, "স্যার, আপনি যেসব অন্যায় করেছেন সেগুলো একটা একটা করে বলতে থাকেন, তা হলে আপনার নাক এক ইঞ্চি করে ছোট হয়ে যাবে।"

স্যার কাঁদো-কাঁদো গলায় বললেন, "সত্যি হবে?"

"হবে স্যার, চেষ্টা করে দেখেন।" শাহনাজ একগাল হেসে বলল, "আর যদি সেটা না করতে চান তা হলে ডাক্তারের কাছে যেতে পারেন, অপারেশন করে ছোট করে দেবে।"

স্যার শার্টের হাতা দিয়ে চোখ মুছে নাক মুছতে গিয়ে আবিষ্কার করলেন এখন আর আগের মতো নাক মুছতে পারছেন না, এবারে শুঁড়ের মতো নাকের ডগা মুছতে হচ্ছে। শাহনাজ ঘরে গাদাগাদি করে বসে থাকা মেয়েগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমরা স্যারকে সাহায্য কর। একটা বড় লিস্ট করে দাও, স্যার সেই লিস্ট দেখে একটা একটা করে বলবেন। ঠিক আছে?"

মেয়েগুলো আনন্দে মুখ ঝলমল করে একসাথে চিৎকার করে বলল, "ঠিক আছে, শাহনাজ আপু।"

শাহনাজ মোবারক স্যারের ঘর থেকে বের হওয়া মাত্রই তাকে টুক করে টেনে ডক্টর জিজির ভাসমান যানে তুলে নিল। সেখানে উঠে শাহনাজ দেখতে পেল ক্যাপ্টেন ডাবলু পেটে হাত দিয়ে খিকখিক করে হাসছে এবং ডক্টর জিজি এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে ক্যাপ্টেন ডাবলুর দিকে তাকিয়ে আছে। শাহনাজ জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

"ঐ দেখ।"

শাহনাজ দেখতে পেল মোবারক স্যার জবুথবু হয়ে বসে আছেন। মেয়েরা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। একজনের হাতে একটা রুলার, সে নাকটাকে লম্বা করে টেনে ধরে মাপছে। অন্যেরা একটা লিস্ট তার সামনে ধরে রেখেছে, তিনি একটা একটা করে সেটা পড়ছেন। শাহনাজ দৃশ্যটা দেখে আবার হি হি করে হেসে উঠল। ডক্টর জিজি মাথা নেড়ে বলল, "অত্যন্ত বিচিত্র!"

সে যন্ত্রপাতিতে হাত দিতেই ভাসমান যানটি মৃদু একটা ভোঁতা শব্দ করে হঠাৎ করে ঘুরে গেল, মুহূর্তে চারদিক ঝাপসা হয়ে যায়। শাহনাজ বলল, "এখন বাকি আছে শুধু ঝিনু

AMARBOI.COM

মস্তান। তাকে একটা শিক্ষা দিতে পারলেই কেস কমপ্লিট।"

"ঝিনু মস্তান?" ডক্টর জিজি শাহনাজের মুখের দিকে তাকাল।

"হ্যাঁ। এমন টাইট দেব যে সে জন্মের মতো সিধে হয়ে যাবে!"

"তুমি কি নিশ্চিত যে তাকে তুমি টাইট দিতে চাও?"

"হ্যাঁ। যেদিন আমাদের পরীক্ষা শেষ হয়েছিল সেদিন কী করেছিল জান? ঘুসি মেরে আমার নাকটা চ্যাপ্টা করে দিয়েছিল। মহা গুণ্ডা।"

ডক্টর জিজি বলল, "তা হলে কি আমি তোমাকে তার কাছাকাছি কোথাও নামিয়ে দেব?"

"হ্যাঁ। আর মনে আছে তো আমি যেটাই বলব সেটাই করবে।"

"ঠিক আছে।"

শাহনাজ ক্যাপ্টেন ডাবলুর দিকে তাকিয়ে বলল, "ডাবলু, তুই নামবি এবার?"

ক্যাপ্টেন ডাবলু মাথা নাড়ল, বলল, "না। এখান থেকে দেখায় মজা বেশি।"

কিছু বোঝার আগেই হঠাৎ করে ভাসমান যানটা একটা শব্দ করে থেমে গেল এবং শাহনাজ আবিষ্কার করল সে কাওরানবাজারের কাছাকাছি ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছে। ডক্টর জিজি তাকে খুব কায়দা করে নামিয়েছে কেউ কিছু সন্দেহ করে নি। কিন্তু ঝিনু মস্তানের কাছে না নামিয়ে তাকে রাস্তায় নামিয়ে দিল কেন কে জানে। ডক্টর জিজি অবশ্য ভুল করার পাত্র নয়, এই রাস্তার মাঝে নামিয়ে দেবার নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে। শাহনাজ এদিক-সেদিক তাকাল এবং হঠাৎ করে ভয়ানকভাবে চমকে উঠল। ফুটপাত থেকে একটু দূরে রাস্তায় একটা রিকশায় ঝিনু মস্তান বসে আছে, তাকে ঘিরে তিনজন সত্যিকারের মস্তান। একজনের হাতে একটা জংধরা রিভলবার, অন্যজনের হাতে একটা বড় চাকু, তিন নম্বর মস্তানের হাতে একটা লোহার রড। কাছেই একটা স্কুটার দাঁড়িয়ে আছে, মস্তানগুলো মনে হয় এই স্কুটার থেকেই নেমেছে। লোহার রড হাতে মস্তানটি তার রড দিয়ে রিকশার সিটে প্রচণ্ড জোরে একটা আঘাত করল, মনে হয় ভয় দেখানোর জন্য। রিভলবার হাতে মস্তানটি তার রিভলবারটি ঝিনু মস্তানের দিকে তাক করে খনখনে গলায় চিৎকার করে বলল, "দে ছেমড়ি, গলার চেইনটা দে।"

শাহনাজ ঝিনু মস্তানের দিকে তাকাল, ক্লাসে তাকে তারা ঠাট্টা করে মস্তান বলে ডাকত কিন্তু এখন সত্যিকারের মস্তানের সামনে তাকে কী অসহায় লাগছে! ঝিনু তার গলা থেকে চেনটা খোলার চেষ্টা করছে। কিন্তু ভয়ে তার হাত কাঁপছে বলে খুলতে পারছে না। চাকু হাতে মস্তানটা ক্রমাগত নড়ছে আর চোখের কোনা দিয়ে এদিক-সেদিক তাকাচ্ছে, সে অধৈর্য হয়ে হঠাৎ লাফিয়ে ঝিনুর গলার চেনটা ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিল। চেনটা ছিঁড়ে তার হাতে এসে যায় কিন্তু তাল সামলাতে না পেরে ঝিনু রিকশা থেকে হুমড়ি খেয়ে নিচে এসে পড়ল।

শাহনাজ চারদিকে তাকাল, রিকশাটা ঘিরে দূরে দূরে মানুষজন দেখছে, কেউ ভয়ে কাছে আসছে না। ঝিনু রিকশা থেকে পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়েছে, মুখ বিকৃত করে যন্ত্রণাটা সহ্য করে ওঠার চেষ্টা করছে! মস্তানগুলো এদিক-সেদিক তাকাতে তাকাতে স্কুটারে ওঠার জন্য ছুটতে শুরু করেছে, তখন শাহনাজ ছুটে যেতে শুরু করে। চিৎকার করে বলল, "ঐ ঐ মস্তানের বাচ্চা মস্তান, যাস কোথায় পালিয়ে? খবরদার যাবি না—"

অন্য যে কেউ এ ধরনের কথা বললে মস্তানরা কী করত জানা নেই, কিন্তু শাহনাজের বয়সী একটা মেয়ের মুখে এ রকম একটা কথা শুনে মস্তানগুলো ঘুরে দাঁড়াল। রিভলবার

হাতে মস্তানটি তার রিভলবার তাক করে বলল, "চুপ ছেমড়ি। একেবারে শেষ করে ফেলব।"

শাহনাজ চুপ করল না, চিৎকার করতে করতে ঝিনুকে টেনে তুলে বলল, "ওঠ ঝিনু, তাড়াতাড়ি ওঠ। এই মস্তানগুলোকে বানাতে হবে।"

ঝিনু তখনো কিছু বুঝতে পারছে না, অবাক হয়ে শাহনাজের দিকে তাকিয়ে আছে। শাহনাজ তখন চিৎকার করতে করতে মস্তানগুলোর দিকে ছুটে যেতে থাকে, "খবরদার নড়বি না মস্তানের বাচ্চা মস্তানেরা, শেষ করে ফেলব, খুন করে ফেলব।"

মস্তানগুলো নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না যে এইরকম পুঁচকে একটা মেয়ে তাদেরকে এতটুকু ভয় না পেয়ে এ রকমভাবে তাদের কাছে ছুটে আসছে! রিভলবার হাতে মস্তানটির আর সহ্য হল না, সে তার রিভলবারটি শাহনাজের দিকে তাক করে মুখ খিঁচিয়ে কুৎসিত একটা গালি দিয়ে গুলি করে বসল। গুলোটা অদৃশ্য একটা দেয়ালে আঘাত করে তাদের দিকে ফিরে গেল—সেটা অবশ্য উত্তেজনার কারণে মস্তানেরা টের পেল না।

শাহনাজ মস্তানগুলোর কাছে এসে নিজের দুই হাতের তর্জনী বের করে ছোট বাচ্চারা যেভাবে রিভলবার তৈরি করে খেলে সেভাবে খেলার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বলল, "এই যে ছারপোকার বাচ্চারা—ভেবেছিস শুধু তোর রিভলবার আছে, আমার নেই? এই দ্যাখ আমার দুই রিভলবার, গুলি করে বারটা বাজিয়ে দেব কিন্তু!"

মস্তানগুলো অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে শাহনাজের দিকে তাকিয়ে রইল, এখন তাদের সন্দেহ হতে শুরু করেছে যে মেয়েটি সম্ভবত পাগল। তারা আর সময় নষ্ট করল না, স্কুটারের দিকে ছুটে যেতে শুরু করল। শাহনাজ তখন রিভলবারের ভঙ্গিতে ধরে রাখা তর্জনীটি স্কুটারের দিকে তাক করে বলল, "গুলি করলাম কিন্তু", তারপর মুখ দিয়ে শব্দ করল, "ডিচুম।"

সাথে সাথে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে স্কুটারটা মাটি থেকে লাফিয়ে উপরে উঠে গেল। মস্তান তিনটি চমকে উঠে ঘুরে শাহনাজের দিকে তাকায়, এই প্রথমবার তাদের মুখে ভয়ের চিহ্ন ফুটে ওঠে।

শাহনাজ দুই হাতের দুই তর্জনী তাক করে বলল, "কী আমার সোনার চানেরা, বিশ্বাস হল যে আমি গুলি করতে পারি? এই দেখ—" বলে শাহনাজ আবার কাউবয়ের ভঙ্গিতে দুই হাত দিয়ে 'ডিচুম' করে গুলি করতে থাকে, আর কী আশ্চর্য প্রত্যেকবার গুলি করার সাথে স্কুটারটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে থাকে।

ঝিনু এতক্ষণ হতভম্ব হয়ে পুরো ব্যাপারটি দেখছিল, এবার সে পায়ে পায়ে শাহনাজের কাছে এগিয়ে এল। শাহনাজ বলল, "হাঁ করে দেখছিস কী? গুলি কর।"

ঝিনু বলল, "গুলি করব? কীভাবে?"

শাহনাজ নিজের হাতকে রিভলবারের মতো করে বলল, "এই যে এইভাবে।"

"তা হলেই গুলি হবে?"

"হ্যাঁ। এই দেখ—" বলে সে আবার ডিচুম ডিচুম করে কয়েকটা গুলি করল। সত্যি সত্যি সাথে সাথে কয়েকটা বিস্ফোরণ হল। ঝিনু অনিশ্চিতের মতো নিজের হাতটাকে রিভলবারের মতো করে স্কুটারের দিকে তাক করে গুলি করার ভঙ্গি করল, সাথে সাথে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে স্কুটারটা লাফিয়ে ওঠে। ঝিনু অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে একবার নিজের হাতের দিকে,

আরেকবার স্কুটারটার দিকে তাকাল সত্যি সত্যি নিজের আঙুল দিয়ে সে গুলি করে ফেলেছে সেটা এখনো সে বিশ্বাস করতে পারছে না।

বিস্ফোরণ এবং গুলির শব্দ শুনে তাদের ঘিরে মানুষের ভিড় জমে গেছে। মস্তানগুলো কী করবে বুঝতে পারছে না, পালিয়ে যাবার জন্য রিভলবার তাক করে একদিকে ছুটে যাবার চেষ্টা করল, কিন্তু অদৃশ্য একটা দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ল। তাদেরকে অদৃশ্য একটা দেয়াল ঘিরে রেখেছে সেটা এখনো বুঝতে পারছে না।

শাহনাজ ঝিনুকে বলল, "আয় এখন মস্তানগুলোকে বানাই।"

ঝিনু তার হাতের অদৃশ্য রিভলবারের দিকে তাকিয়ে বলল, "এইটা দিয়ে গুলি করলে মরে যাবে না?"

"হ্যাঁ। রবার বুলেট দিয়ে করতে হবে।"

ঝিনু মুখ হাঁ করে বলল, "রবার বুলেট?"

"হ্যাঁ, এই নে।" শাহনাজ ঝিনুর হাতে কাল্পনিক রবার বুলেট ধরিয়ে দেয়। ঝিনু কী করবে বুঝতে পারছিল না। শাহনাজ গম্ভীর গলায় বলল, "ভরে নে।" তারপর নিজে তার রিভলবারে রবার বুলেট ভরে নেওয়ার ভঙ্গি করে সেটি মস্তানদের দিকে তাক করল, সাথে সাথে মস্তানদের কুৎসিত মুখ রক্তশূন্য হয়ে যায়। শাহনাজ সময় নিয়ে গুলি করল এবং অদৃশ্য গুলির আঘাতে একজন মস্তান নিচে ছিটকে পড়ল। তার মনে হল প্রচণ্ড ঘুসিতে কেউ তাকে ধরাশায়ী করে ফেলেছে। এতক্ষণে ঝিনুও তার অদৃশ্য রিভলবারে অদৃশ্য রবার বুলেট ভরে নিয়েছে, সে দ্বিতীয় মস্তানটির দিকে তাক করতেই মস্তানটি হঠাৎ দুই হাত জোড় করে হাঁটু ভেঙে মাটিতে পড়ে যায়। ঝিনু মস্তানের তবু মায়া হল না, সে অদৃশ্য রিভলবারের ট্রিগার টেনে ধরতেই দ্বিতীয় মস্তানটিও ধরাশায়ী হয়ে গেল। স্কুটারের ড্রাইভার এবং রড হাতে দাঁড়িয়ে থাকা মস্তানটি এখনো নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছিল, মজা-দেখা মানুষেরা এখন তাদের দিকে ছুটে আসতে শুরু করে। শাহনাজ নিচু গলায় বলল, "এখন পালা। বাকিটা পাবলিক ফিনিশ করবে।"

"দাঁড়া, আমার চেনটা নিয়ে নিই।" শুয়ে কাতরাতে থাকা মস্তানটির কাছে গিয়ে ঝিনু তার মাথায় অদৃশ্য রিভলবার ধরে বলল, "আমার চেন।"

মস্তানটি কোনো কথা না বলে সাথে সাথে পকেট থেকে তার চেনটা বের করে দিল। ঝিনু চেনটা হাতে নিয়ে শাহনাজকে বলল, "চল্। পালাই।"

তারপর দুজন ঘুরে ফুটপাত ধরে ছুটতে থাকে। রাস্তার মোড়ে ঘুরে গিয়ে দুজন একটা ছোট গলিতে ঢুকে পড়ে। ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত হয়ে দুজন একটা দেয়ালের পাশে দাঁড়াল। বড় বড় শ্বাস নিতে নিতে একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে প্রথমে আস্তে আস্তে, তারপর জোরে জোরে হাসতে শুরু করে। হাসতে হাসতে শাহনাজের চোখে পানি এসে গেল, সে চোখ মুছে ঝিনুকে বলল, "এখন বাড়ি যা, ঝিনু মস্তান!"

ঝিনু শাহনাজকে ধাক্কা দিয়ে বলল, "আমাকে মস্তান বলছিস? তুই হচ্ছিস সবচেয়ে বড় মস্তান!"

শাহনাজ কিছু বলল না, চোখ মটকে বলল, "আমাকে যেতে হবে।"

"কোথায়?"

শাহনাজ হাতের অদৃশ্য রিভলবার দুটি দেখিয়ে বলল, "এই অস্ত্রগুলো ফেরত দিতে হবে না।"

ঝিনু নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমারটা?"

"রেখে দে।"

"এখনো কাজ করবে?"

শাহনাজ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "জানি না। গুলি থাকলে কাজ করবে।"

ঝিনু তার হাতের অদৃশ্য রিভলবারে অদৃশ্য গুলি আছে কি না সেটা দেখার চেষ্টা করতে লাগল, শাহনাজ কোথায় কোনদিকে অদৃশ্য হয়ে গেছে সেটা বুঝতেও পারল না।

১০

ডক্টর জিজি শাহনাজের হাতে একটা ছোট শিশি দিয়ে বলল, "এই নাও।" শিশিটা হাতে নিয়ে শাহনাজ বলল, "এটা কী?"

"তোমার ভাই। শিশিতে ভরে দিয়েছি। তুমি যেরকম চেয়েছিলে।"

শাহনাজ শিশির ভিতর উঁকি দিয়ে দেখল একটা নিখুঁত পুতুলের মতো ইমতিয়াজের ছোট দেহটি ক্যামেরায় ছবি তোলার ভঙ্গিতে স্থির হয়ে আছে। শাহনাজ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, "ভাইয়া জেগে উঠবে না?"

"হ্যাঁ, আমরা চলে যাবার সাথে সাথে জেগে উঠবে।"

"তখনো কি এ রকম ছোট থাকবে?"

"না, তখন এ রকম ছোট থাকবে না। স্বাভাবিক আকারের হয়ে যাবে।"

"তোমরা কখন যাবে?"

"পৃথিবীতে আমাদের কাজ শেষ হয়েছে, আমরা এখনই যাব।"

শাহনাজের বুকে হঠাৎ কেমন জানি মোচড় দিয়ে ওঠে, সে একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "আবার কবে আসবে?"

"সময় এবং অবস্থান সম্পর্কে তোমাদের ধারণা এবং আমাদের ধারণা এক নয়। আমরা আবার যদি আসি সেই সময়টা এক মুহূর্ত পরে হতে পারে আবার এক যোজন হতে পারে। কারণ—"

শাহনাজ তার মাথা চেপে ধরে বলল, "থাক, থাক, অনেক হয়েছে। আবার ঐসব কঠিন কঠিন কথা বোলো না, মাথা গুলিয়ে যায়।"

"আমি বলতে চাই না, তুমি জিজ্ঞেস কর দেখে আমি বলি।"

ক্যাপ্টেন ডাবলু বলল, "আমরা তোমাদের কয়েকটা ছবি তুলতে পারি?"

ডক্টর জিজি মাথা নাড়ল, বলল, "তুলতে পার। কিন্তু তুলে কী লাভ? তোমরা যেটা দেখছ সেটা তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য একটা সহজ রূপ। এটা সত্যি নয়।"

"তবু এটাই তুলতে চাই।"

"বেশ। তুলো।"

ক্যাপ্টেন ডাবলু তখন শাহনাজের আব্বুর ক্যামেরাটা দিয়ে অনেকগুলো ছবি তুলল। ডক্টর জিজির ছবি, ডক্টর জিজি এবং শাহনাজের ছবি, ডক্টর জিজি এবং ক্যাপ্টেন ডাবলুর ছবি, শাহনাজ এবং ক্যাপ্টেন ডাবলুর সাথে ডক্টর জিজির ছবি, শিশির ভিতরে ইমতিয়াজকে হাতে নিয়ে শাহনাজের ছবি ইত্যাদি ইত্যাদি।

ছবি তোলা শেষ হবার পর বিদায় নেবার পালা। শাহনাজ একটু ধরা গলায় বলল, "ডক্টর জিজি, তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে থাকলে কিছু মনে কোরো না।"

"আমাদের কাছে খারাপ-ভালো বলে কিছু নেই।"

"ও আচ্ছা! আমার মনেই থাকে না।"

ক্যাপ্টেন ডাবলু বলল, "সাবধানে যেয়ো। গ্যালাক্সিতে কত রকম বিপদআপদ থাকতে পারে, ব্ল্যাকহোল, কোয়াজার নিউট্রন স্টার।"

ডক্টর জিজি বলল, "আমরা সাবধানেই যাব।"

"উপায় থাকলে বলতাম, বাড়ি পৌঁছে একটা ই-মেইল পাঠিয়ে দিও। কিন্তু কোনো উপায় নেই।"

"না, নেই।"

ক্যাপ্টেন ডাবলু মাথা নেড়ে বলল, "আরেকবার এলে দেখা না করে যেয়ো না কিন্তু।"

"যদি তোমরা থাক তোমাদের খুঁজে বের করব। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"তোমাদের কিছু মনে থাকবে না।"

"মনে থাকবে না?"

"না।"

"কেন?"

"আমরা যখন নিচুশ্রেণীর কোনো সভ্যতার কাছে যাই তখন চেষ্টা করি সেখানে বিন্দুমাত্র কোনো পরিবর্তন না করতে। এখানে যেসব পরিবর্তন করা হয়েছে সেগুলো আবার আগের মতো করে যেতে হবে।"

"তার মানে?"

"হাসপাতালের মানুষটি যে জোরে জোরে চিন্তা করছে তাকে ঠিক করে দিতে হবে। মোবারক স্যারের নাক, তার ছাত্রীদের স্মৃতি, ঝিনু মস্তান আর সন্ত্রাসী, আশপাশের লোকজন, তোমার ভাই ইমতিয়াজ, সবার সকল স্মৃতি ভুলিয়ে দিতে হবে। কারো কিছু মনে থাকবে না।"

শাহনাজের মুখে হঠাৎ আতঙ্কের ছায়া পড়ে, "তা হলে কি সোমা আপুকে আবার অসুস্থ করে দেবে?"

"আমাদের নিয়ম অনুযায়ী তা-ই করার কথা ছিল, কিন্তু তোমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার কারণে তাকে আমরা আর অসুস্থ করব না। সে ভালো হয়ে আছে ভালোই থাকবে।"

শাহনাজ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, "আর আমরা, আমাদের স্মৃতি? আমরাও কি সব ভুলে যাব?"

ডক্টর জিজি ফোঁস করে একটা শব্দ করে বলল, "তোমরা কী চাও? মনে রাখতে চাও?"

শাহনাজ আর ক্যাপ্টেন ডাবলু একসাথে বলে উঠল, "হ্যাঁ, আমরা মনে রাখতে চাই!"

"বেশ। তা হলে তোমরা মনে রেখো। এই পৃথিবীতে আমরা মাত্র তিনটি জিনিস রেখে যাচ্ছি।"

"কী কী জিনিস?"

"সোমার সুস্থ শরীর। ক্যামেরায় ছবি। আর তোমাদের দুজনের স্মৃতি।"

"ক্যামেরার ছবিগুলো কি আমরা অন্যদের দেখাতে পারি?"

"ইচ্ছে হলে দেখিও।"

"তোমাদের কথা কি অন্যদের বলতে পারি?"

"ইচ্ছে হলে বোলো।"

"তোমাকে অনেক ধন্যবাদ ডক্টর জিজি। অনেক অনেক ধন্যবাদ।"

ডক্টর জিজি কোনো কথা না বলে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। শাহনাজ এবং ক্যাপ্টেন ডাবলু দুজনেই জানে ডক্টর জিজির এটি একটি কাল্পনিক রূপ কিন্তু তবুও তার প্রতি গভীর মমতায় তাদের বুকের ভিতর কেমন জানি করে ওঠে। শাহনাজ কিছু একটা বলতে চাইছিল কিন্তু তার আগেই হঠাৎ করে একটা ঝড়ো বাতাস বইতে শুরু করে। বাতাসের ঝাপটায় তারা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, মাথা নিচু করে বসে পড়ে। তারা বুঝতে পারে তীব্র বাতাসে তারা উড়ে যাচ্ছে, ভেসে যাচ্ছে। শাহনাজ আর ক্যাপ্টেন ডাবলু বাতাসে শরীর এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে—তারা জানে ডক্টর জিজি গভীর ভালবাসায় তাদেরকে পৃথিবীর মাটিতে নামিয়ে দেবে।

শাহনাজ যখন চোখ খুলে তাকাল তখন তাদের সামনে ইমতিয়াজ দাঁড়িয়ে আছে। সে অত্যন্ত সন্দেহের চোখে শাহনাজ আর ক্যাপ্টেন ডাবলুর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তোরা এখানে কখন এসেছিস?"

শাহনাজ আমতা আমতা করে বলল, "এই তো একটু আগে।"

ইমতিয়াজ চিন্তিত মুখে বলল, "কী একটা ছবি তুলতে এসেছিলাম, মনে করতে পারছি না।"

শাহনাজ বলল, "মনে হয় এই ঝরনাটার।"

ইমতিয়াজ ঘুরে তাকাল, পাহাড়ের উপর থেকে পানির ধারা গড়িয়ে পড়ার দৃশ্যটি দেখতে দেখতে বলল, "ঝরনার আবার ছবি তোলার কী আছে?" তারপর বিরক্ত মুখে বলল, "দে দেখি ক্যামেরাটা, এসেছি যখন একটা ছবি তুলে নিই।"

শাহনাজ ক্যামেরাটা এগিয়ে দেয়, হাতে নিয়ে ইমতিয়াজ বিরক্তমুখে বলল, "এ কী, একটা ফিল্মও তো বাকি নেই দেখি! কিসের ছবি তুলে ফিল্মটা শেষ করেছিস?"

শাহনাজ আমতা আমতা করে বলল, "এই তো এইসব জিনিসপত্র!"

AMARBOI.COM

বাসায় এসে তারা আবিষ্কার করল সোমা ফিরে এসেছে। শাহনাজকে দেখে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে বলল, "জানিস শাহনাজ আমি ভালো হয়ে গেছি। একেবারে ভালো হয়ে গেছি। ডাক্তাররা খুঁজে কোনো সমস্যাই পায় নি!"

ইমতিয়াজ মুখ বাঁকা করে বলল, "আমি আগেই বলেছিলাম সাইকোসেমেটিক। মানসিক রোগ। এখন আমার কথা বিশ্বাস হল?"

সোমার আম্মা বললেন, "তুমিই ঠিক বলেছ বাবা, আমরা বুঝতে পারি নি!"

সোমা খিলখিল করে হেসে বলল, "কী মজা দেখেছ, সাইকোসেমেটিক অসুখ হলে কেমন লাগে সেটাও এখন আমি বুঝে গেলাম।"

শাহনাজের ক্যামেরার ফিল্মটি ডেভেলপ করে নিয়ে আসার পর সেখানে মহাকাশযান এবং ডক্টর জিজির অনেক ছবি দেখা গেল। শাহনাজ প্রথমে ছবিগুলো দেখাল সোমাকে। সোমা ছবি দেখে হেসে কুটিকুটি হয়ে বলল, "ওমা! এমন মজার ছবি কোথায় তৈরি করেছিস?"

শাহনাজ বলল, "আসলে তৈরি করি নি—"

সোমা বাধা দিয়ে বলল, "বুঝেছি, ক্যাপ্টেন ডাবলুর কাজ! এইটুকুন ছেলের কী বুদ্ধি—কয়দিন আগে আমার একটা ছবির সাথে ডাইনোসরের ছবি জুড়ে দিল। দেখে মনে হয় সত্যি সত্যি ডাইনোসর। কম্পিউটার দিয়ে করে, তাই না?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"না, সোমা আপু। এটা সত্যি—"

সোমা খিলখিল করে হেসে বলল, "তুই যে কী মজা করতে পারিস শাহনাজ, তোকে দেখে অবাক হয়ে যাই! আমারও এ রকম একটা ছবি আছে এলিয়েনের সাথে, কম্পিউটার দিয়ে করা। তোর ছবির এলিয়েনটা দেখ, কেমন জানি বোকা বোকা চেহারা। আমারটা ভয়ঙ্কর দেখতে, এই বড় বড় দাঁত, নাক দিয়ে আগুন বের হচ্ছে!"

শাহনাজ কিছু বলল না, একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল।

সোমাদের চা-বাগানে প্রায় একমাস সময় কাটিয়ে শাহনাজ ঢাকায় ফিরে এসেছিল। তার কিছুদিন পর ক্যাপ্টেন ডাবলুর একটা চিঠি এসে হাজির, চিঠিটা শুরু হয়েছে এইভাবে :

প্রিয় পু
আশা করি তুমি ভালো আছ। আমি ভালো নাই। আমি যার কাছেই ডক্টর জিজির কথা বলি, কেউ আমার কথা বিশ্বাস করে না। আমার আব্বু সেদিন আমার সায়েন্স ফিকশানের সব বই বাক্সে তালা মেরে বন্ধ করে রেখে দিয়েছেন। এইসব ছাইভস্ম পড়ে পড়ে আমার নাকি মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। লাল্টু পর্যন্ত আমার কথা বিশ্বাস করে না, আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে। কী-মজা-হবে আপু আমার যেন মনখারাপ না হয় সেজন্যে ভান করে যে ডক্টর জিজির কথা বিশ্বাস করেছে, কিন্তু আসলে করে নাই।
ডক্টর জিজির কথা বিশ্বাস করানোর জন্যে কী করা যায় বুঝতে পারছি না। তাড়াতাড়ি চিঠি লিখে জানাও।

ইতি
ক্যাপ্টেন ডাবলু

পুন. তোমাকে শুধু পু ডেকেছি বলে কিছু মনে কর নাই তো?

AMARBOI.COM

শাহনাজ ক্যাপ্টেন ডাবলুকে চিঠির উত্তরে কী লিখবে এখনো ভেবে ঠিক করতে পারে নি।

প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০০০

জলজ

AMARBOI.COM

ডক্টর ট্রিপল-এ

নীলা তার বাবাকে বলল, "আব্বু আমাকে একটা কুকুর ছানা কিনে দেবে?"

নীলার বাবা আবিদ হাসান অন্যমনস্কভাবে বললেন, "দেব।"

উত্তরটি শুনে নীলার সন্দেহ হল যে তার বাবা আসলে তার কথাটি ভালো করে শোনেন নি—সাধারণত শোনেন না। তাই ব্যাপারটি পরীক্ষা করে দেখার জন্য বলল, "আব্বু আমাকে একটা হাতির বাচ্চা কিনে দেবে?"

আবিদ হাসান তাঁর কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে আরো একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন, "দেব।"

নীলা এবারে গাল ফুলিয়ে বলল, "আব্বু, তুমি আমার কোনো কথা শোন না।"

আবিদ হাসান নীলার গলায় উত্তাপ লক্ষ করে এবারে সত্যি সত্যি তার দিকে মনোযোগ দিলেন। মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, "কে বলেছে শুনি না? এই যে শুনছি!"

"বল দেখি আমি কী বলেছি?"

"তুই বলেছিস তোকে একটা ইয়ে কিনে দিতে হবে।"

"কী কিনে দিতে হবে?"

"এই তো—কিছু একটা হবে—" বারো বছরের একটি মেয়ে কী চাইতে পারে ভেবে দেখার চেষ্টা করলেন এবং হঠাৎ করে আবিষ্কার করলেন সে সম্পর্কে তার জ্ঞান খুব সীমিত। ইতস্তত করে বললেন, "টেডি বিয়ার?"

নীলা এবারে সত্যি সত্যি রাগ করল, সে এখন আর বাচ্চা খুকি নয়, টেডি বিয়ারের বয়স অনেকদিন আগে পার হয়ে এসেছে কিন্তু তার নিজের বাবা এখনো সেটা জানে না। বাবার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "টেডি বিয়ার না, কুকুর ছানা।"

আবিদ হাসান নীলার আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করে বললেন, "কুকুর ছানা?"

"হ্যাঁ। এইটুকুন তুলতুলে কুকুর ছানা।"

আবিদ হাসান পুরো ব্যাপারটুকু হেসে উড়িয়ে দিতে গিয়ে তার আদরের মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেলেন। ব্যাপারটা সরাসরি উড়িয়ে দেওয়া যাবে না—একটু গুরুত্ব দিয়ে কথা বলে নিতে হবে। তিনি মুখে খানিকটা গাম্ভীর্য টেনে এনে বললেন, "একটা কুকুর ছানা কিন্তু একটা খেলনা নয়, জানিস তো?"

"জানি।"

"মজা ফুরিয়ে গেলে একটা খেলনা যেরকম সরিয়ে রাখা যায় একটা কুকুরের বেলায় কিন্তু সেটা করা যায় না।"

নীলা চোখ বড় বড় করে বলল, "জানি বাবা, সেজন্যই তো চাইছি।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"বাসায় একটা কুকুর ছানা আনলে তাকে কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিতে হবে। খাওয়াতে হবে, পরিষ্কার রাখতে হবে, তার সাথে খেলতে হবে, তাকে বড় করতে হবে।"

"করব বাবা।" নীলা উজ্জ্বল চোখে বলল, "আমি যেখানেই যাব সেখানেই আমার পিছু পিছু ঘুরে বেড়াবে, কী মজা হবে!"

আবিদ হাসান মুখ আরো গম্ভীর করে বললেন, "এখন ভাবতে খুব মজা লাগছে, কিন্তু মনে রাখিস যখন তার পিছনে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিতে হবে তখন কিন্তু মজা উবে যাবে।"

"যাবে না।"

"তোর কুকুর ছানা যখন বাথরুম করবে, সেগুলো পরিষ্কার করতে হবে। পারবি?"

নীলাকে এবারে একটু বিভ্রান্ত দেখাল, কুকুর ছানা যে বাথরুম করতে পারে এই ব্যাপারটি সে আগে ভেবে দেখে নি। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে মুখ শক্ত করে বলল, "পারব আব্বু।"

আবিদ হাসান একটু হাসলেন, বললেন, "এখন বলা খুব সোজা, যখন সত্যি সত্যি করতে হবে তখন পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যাবি!"

নীলা তার বাবার গলা জড়িয়ে ধরে আদুরে গলায় বলল, "যাব না বাবা—প্লিজ কিনে দাও!"

আবিদ হাসান একটা নিশ্বাস ফেললেন। নীলা তার একমাত্র মেয়ে, খুব আদরের মেয়ে। ভারি লক্ষ্মী মেয়ে, কখনো বাবা-মাকে জ্বালাতন করেছে বলে মনে পড়ে না। কোনো কিছু চাইলে না বলেছেন মনে পড়ে না, কিন্তু বাসায় একটা পোষা কুকুর সেটি তো অনেক বড় ব্যাপার, তার অর্থ জীবন পদ্ধতির সবকিছু ওলটপালট হয়ে যাওয়া।

নীলা খুব আশা নিয়ে তার বাবার মুখের দিকে তাকাল, বলল, "দেবে আব্বু?"

আবিদ হাসান মেয়েকে নিজের কাছে টেনে এনে বললেন, "দেখ, একটা পোষা কুকুর আসলে বাসার নতুন একটা মানুষের মতো। এত মায়া হয়ে যাবে যে যদি কিছু একটা হয়ে যায় তা হলে কেঁদে কূল পাবি না।"

"কী হবে আব্বু?"

"এই ধর যদি হারিয়ে যায় কিংবা মরে যায়—"

"কেন হারিয়ে যাবে আব্বু? কেন মরে যাবে? আমি এত যত্ন করে রাখব যে তুমি অবাক হয়ে যাবে।"

আবিদ হাসান মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, "তুই আরো কয়টা দিন একটু চিন্তা করে দেখ। এখনই ঠিক করে ফেলতে হবে কে বলেছে?"

কুকুরের বাচ্চার প্রস্তাবটা যখন নীলার মা মুনিরা হাসান শুনলেন তখন সেটা একেবারে এক কথায় নাকচ করে দিলেন। মুখ শক্ত করে বললেন, "ফাজলেমি পেয়েছ? এমনিতেই জান বের হয়ে যাচ্ছে এখন বাসায় একটা কুকুর নিয়ে আসবে? ছিঃ!"

নীলার মা মুনিরা হাসানের গলার স্বর সব সময় চড়া সুরে বাঁধা থাকে, তিনি নরম বা কোমল গলায় কথা বলেন না। কাজেই এক কথায় কুকুরের বাচ্চা পোষার শখটাকে বাতিল করে দেওয়ায় নীলার চোখে পানি টলটল করে উঠল এবং বলা যেতে পারে তখন আবিদ হাসান তার মেয়ের সাহায্যে এগিয়ে এলেন। বললেন, "আহা, মুনিরা, ওরকম করে বলছ কেন? কুকুর-বেড়াল পোষা তো খারাপ কিছু না।"

মুনিরা কোমরে হাত দিয়ে বললেন, "এখন তুমিও মেয়ের সাথে তাল দিচ্ছ?"

"বেচারি একা একা থাকে, একটা সঙ্গী হলে খারাপ কী? পোষা পশুপাখি থাকলে একটা দায়িত্ব নেওয়া শিখবে।"

AMARBOI.COM

"বাসায় দায়িত্ব নেওয়ার জিনিসের অভাব আছে? ঘরদোর পরিষ্কার রাখতে পারে না? নিজের ঘরটা গুছিয়ে রাখতে পারে না? বাসার কাজকর্মে সাহায্য করতে পারে না?"

কাজেই নীলার কুকুর পোষার ব্যাপারটি আপাতত চাপা পড়ে গেল। বাবাকে নিজের পক্ষে পেয়ে নীলা অবশ্য এত সহজে হাল ছেড়ে দিল না, সে ধৈর্য ধরে লেগে রইল। আবিদ হাসান মেয়ের পক্ষ নেওয়ায় শেষ পর্যন্ত মুনিরা একটু নরম হলেন এবং শেষ পর্যন্ত একদিন নীলা কুকুর পোষার অনুমতি পেল। অনুমতিটি হল সাময়িক—নীলার আম্মা খুব স্পষ্ট করে বলে রাখলেন যদি দেখা যায় নীলা ঠিক করে তার পোষা কুকুরের যত্ন নিতে পারছে না তা হলে সাথে সাথে কুকুর ছানাকে গৃহ ত্যাগ করতে হবে।

২

আবিদ হাসান একটা সফটওয়্যার কোম্পানিতে চাকরি করেন, বড় একটা প্রজেক্ট ম্যানেজার হিসেবে তাকে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে নীলাকে নিয়ে তার কুকুর ছানা কিনতে যাওয়ার সময় বের করতে বেশ বেগ পেতে হল। কুকুর ছানা কোথায় পাওয়া যায় সে সম্পর্কেও তার কোনো ধারণা নেই, আবিদ হাসান যখন ছোট ছিলেন তখন শীতের শুরুতে বেওয়ারিশ ছোট ছোট কুকুরের বাচ্চায় চারদিক ভরে উঠত। সেগুলো পোষা নিয়েও কোনো সমস্যা ছিল না। একবার তু তু করে ডাকলেই চিরদিনের জন্য ন্যাওটা হয়ে যেত। এখন দিনকাল পাল্টেছে, কুকুর ছানা কিনে আনতে হয়, ইনজেকশান দিতে হয়, ওষুধ খাওয়াতে হয়, মেজাজ-মর্জি বুঝে চলতে হয়। আবিদ হাসান অফিসে খোঁজ নিলেন এবং জানতে পারলেন কাটাবনের কাছে নাকি পোষা পশুপাখির দোকান রয়েছে। কাজেই একদিন সন্ধেবেলা নীলাকে নিয়ে তিনি কুকুরের বাচ্চা কিনতে গেলেন।

AMARBOI.COM

কাজটি যেরকম সহজ হবে বলে তিনি মনে করেছিলেন দেখা গেল সেটা মোটেও তত সহজ নয়। কাটাবনে সারি সারি দোকান রয়েছে সত্যি কিন্তু সেখানে কুকুর বলতে গেলে নেই। এক দুটি দোকানে কিছু ঘেয়ো কুকুর ছোট খাঁচার মাঝে বেঁধে রাখা হয়েছে। দানাপানি না দিয়ে ছোট খাঁচার মাঝে বেঁধে রাখার ফলে তাদের মেজাজ হয়ে আছে তিরিক্ষে, কাছে যেতেই সবগুলো একসাথে ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল। খুঁজে পেতে একটা দোকানে একটা বিদেশী কুকুরের বাচ্চা পাওয়া গেল, এক সময় তার গায়ের রং নিশ্চয়ই ধবধবে সাদা ছিল কিন্তু এখন অযত্নে ময়লা হয়ে আছে। কুকুর ছানাটা নির্জীব হয়ে শুয়ে ছিল। নীলা কাছে গিয়ে ডাকাডাকি করেও তাকে দাঁড়া করাতে পারল না।

নীলা এবং আবিদ হাসান যখন কী করবেন সেটা নিয়ে কথা বলছেন তখন দোকানের একজন কর্মচারী তাদের দিকে এগিয়ে এল, বলল, "কুকুর কিনবেন?"

"হ্যাঁ। কুকুরের বাচ্চা।"

মানুষটি আবিদ হাসানের চোখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারল চেষ্টা চরিত্র করে সে তার দোকানের কোনো কুকুর গছিয়ে দিতে পারবে না, তাই সেদিকে আর চেষ্টা করল না। বলল, "এভাবে তো ভালো কুকুর পাবেন না। সাপ্লাই তো কম। ঠিকানা-টেলিফোন রেখে যান ভালো বাচ্চা এলে খোঁজ দেব।"

"কবে আসবে?"

"কোনো ঠিক নাই। আজকেও আসতে পারে, এক মাস পরেও আসতে পারে।"

নীলার মুখের দিকে তাকিয়ে আবিদ হাসানের মন খারাপ হল, জিজ্ঞেস করলেন, "আর কোনো কুকুরের দোকান নাই?"

"না। তবে—"

"তবে?"

"শুনেছি টঙ্গীর কাছে নাকি একটা পোষা কুকুরের ফার্ম খুলছে।"

"কুকুরের ফার্ম?" আবিদ হাসান খুব অবাক হলেন। "কুকুরের আবার ফার্ম হয় নাকি?"

"তাই তো শুনেছি। সব নাকি বিদেশী কুকুর।"

"তাই নাকি?"

"জে।"

"সেই ফার্মে কী হবে?"

"মাছের যেরকম চাষ হয় সেরকম কুকুরের চাষ হবে।" দোকানের কর্মচারী নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে ফেলল।

"কী হবে কুকুরের চাষ করে?"

"জানি না। কেউ বলে কোরিয়ায় কুকুরের মাংস রপ্তানি করবে। কেউ বলে ল্যাবরেটরিতে গবেষণার জন্য পাঠাবে। কেউ বলে পুলিশের কাছে বিক্রি করবে।"

আবিদ হাসান কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ফার্মটা কোথায়?"

"সেটা তো জানি না। শুনেছি টঙ্গীর কাছে আমেরিকান কোম্পানি।"

"নাম কী কোম্পানির?"

মানুষটা মুখ সুচালো করে নামটা মনে করার চেষ্টা করে বেশি সুবিধে করতে পারল না, তখন ভিতরে ঢুকে কাগজ ঘাঁটাঘাঁটি করে একটা ময়লা কাগজে নাম লিখে আনল, 'পেট ওয়ার্ল্ড'—পোষা প্রাণীর জগৎ।

আবিদ হাসান মেয়েকে কথা দিলেন পরের দিনই তিনি পেট ওয়ার্ল্ডের খোঁজ নেবেন।

AMARBOI.COM

আমেরিকান কোম্পানি হইচই করে বিদেশী কুকুরের একটা বিশাল ফার্ম বসালে সেটা খুঁজে পাওয়া সহজ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু পেট ওয়ার্ল্ড খুঁজে বের করতে আবিদ হাসানের কালো ঘাম ছুটে গেল। আজ সকাল সকাল অফিস থেকে বের হয়েছেন, নীলাকে নিয়ে টঙ্গী এসে পেট ওয়ার্ল্ড খোঁজা শুরু করেছেন, সন্ধে ঘনিয়ে যাবার পর যখন তিনি আশা ছেড়ে দিয়েছেন তখন পেট ওয়ার্ল্ডের খোঁজ পাওয়া গেল। বড় রাস্তার পাশে বেশ বড় একটা জায়গা উঁচু দেয়াল এবং কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা। ভিতরে জেলখানার মতো বড় একটা দালান। সামনে শক্ত লোহার গেট এবং গেটের পাশে ছোট পেতলের একটা নামফলক, সেখানে আরো ছোট করে ইংরেজিতে লেখা 'পেট ওয়ার্ল্ড'।

আবিদ হাসান গেটের সামনে দাঁড়িয়ে তার গাড়ির হর্ন বাজালেন। বার দুয়েক শব্দ করার পর প্রথমে গেটের উপরে ছোট চৌকোনা একটা জানালা খুলে গেল। সেখান থেকে একজন মানুষ উঁকি দিয়ে তাকে দেখল, তারপর গেটের পাশ থেকে নিরাপত্তারক্ষীর পোশাক পরা একজন মানুষ বের হয়ে এল, আবিদ হাসানের কাছে এসে দাঁড়িয়ে মানুষটি জিজ্ঞেস করল, "কাকে চান?"

আবিদ হাসান একটু বিপন্ন অনুভব করলেন, তার মনে হল তিনি বুঝি কোনো ভুল জায়গায় চলে এসেছেন। একটু ইতস্তত করে বললেন, "আসলে আমি একটা কুকুর ছানা কিনতে এসেছি।"

নিরাপত্তারক্ষীর পোশাক পরা মানুষটি কঠিন মুখে বলল, "এখানে কুকুর ছানা বিক্রি হয় না।"

"আমাকে একজন বলল এখানে নাকি কুকুরের ফার্ম তৈরি হয়েছে।"

মানুষটি নিষ্পলক চোখে আবিদ হাসানের দিকে তাকিয়ে থেকে গলায় খানিকটা অনাবশ্যক রূঢ়তা ঢেলে বলল, "আমি আপনাকে বলেছি, এখানে কুকুর বিক্রি হয় না।"

মানুষটির ব্যবহারে আবিদ হাসান অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। তিনি রুষ্ট গলায় বললেন, "তা হলে এখানে কী হয়?"

নিরাপত্তারক্ষীর পোশাক পরা মানুষটি আবিদ হাসানের কথার উত্তর দেবার কোনো প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল না। সে পিছন ফিরে তার গেটের কাছে ফিরে যেতে থাকে, ঠিক তখন তার কোমরে ঝোলানো ওয়াকিটকিতে কেউ একজন তার সাথে যোগাযোগ করল। মানুষটি ওয়াকিটকিটি মুখের কাছে ধরে বাক্য বিনিময় শুরু করে, কী নিয়ে কথা বলছে সেটি শুনতে না পেলেও আবিদ হাসান বুঝতে পারলেন মানুষটি তাকে নিয়ে কথা বলছে। এক্সেলেটরে চাপ দিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে নিতে গিয়ে তিনি থেমে গেলেন, কারণ তিনি দেখতে পেলেন নিরাপত্তারক্ষী মানুষটি তার দিকে এগিয়ে আসছে।

"আপনি ভিতরে যান।"

আবিদ হাসান ভুরু কুঁচকে বললেন, "এখানে যদি কুকুর বিক্রি না হয় তা হলে আমি গিয়ে কী করব?"

নিরাপত্তারক্ষীর পোশাক পরা মানুষটি আবিদ হাসানের উষ্মাটুকু হজম করে নিয়ে তার হাতের স্বয়ংক্রিয় একটা সুইচে চাপ দিতেই সামনের গেটটি ঘরঘর শব্দ করে খুলতে শুরু করে। তার গাড়িটা যাওয়ার মতো জায়গা করে গেটটা থেমে গেল। আবিদ হাসান গাড়ি ঘুরিয়ে ভিতরে ঢুকে গেলেন।

গাড়ি ভিতরে ঢুকতেই নীলা বলল, "কী সুন্দর! দেখেছ আব্বু?"

আবিদ হাসান মাথা নাড়লেন, সত্যিই সুন্দর। বাইরে থেকে বোঝা যায় না ভিতরে এত জায়গা। সুবিস্তৃত লনে গাছগাছালি এবং ফুলের বাগান, পিছনে বিশাল আলোকোজ্জ্বল দালান। পুরো জায়গাটুকুতে এক ধরনের দীর্ঘ পরিকল্পনার ছাপ রয়েছে, আবিদ হাসানের মনে হল তিনি বুঝি পাশ্চাত্যের কোনো একটি বড় করপোরেট অফিসে ঢুকে গেছেন।

গাড়ি পার্ক করার জন্য জায়গা নির্দিষ্ট করা হয়েছে, সেখানে গাড়ি রেখে আবিদ হাসান নীলার হাত ধরে খোয়া বাঁধানো হাঁটা পথে মূল দালানে পৌঁছলেন। বড় কাচের স্লাইডিং দরজার সামনে দাঁড়াতেই সেটা নিঃশব্দে খুলে গেল। আবিদ হাসান ভিতরে পা দিতেই কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের আরামদায়ক অনুভূতি তার সারা শরীর জুড়িয়ে দিল। দরজার অন্যপাশে একজন তরুণী দাঁড়িয়ে ছিল, আবিদ হাসান এবং নীলাকে দেখে সে তাদের দিকে এগিয়ে এল। মেয়েটির ফোলানো চুল এবং পরিমিত প্রসাধন চেহারায় এক ধরনের আকর্ষণীয় এবং মাপা কমনীয়তা নিয়ে এসেছে। মেয়েটি মিষ্টি করে হেসে বলল, "আসুন। আমি জেরিন। পেট ওয়ার্ল্ডে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি।"

"আমি আবিদ হাসান আর এ হচ্ছে আমার মেয়ে নীলা।"

"আসুন মি. হাসান। আপনার জন্য ডক্টর আজহার অপেক্ষা করছেন।"

"ডক্টর আজহার?"

"হ্যাঁ। আমাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। এই পুরো প্রজেক্টটা ডক্টর আজহারের ব্রেইন চাইল্ড।"

আবিদ হাসান বড় একটা হলঘরের ভিতর দিয়ে হেঁটে একটা লিফটের সামনে দাঁড়ালেন। বোতাম স্পর্শ করামাত্র লিফটের দরজা নিঃশব্দে খুলে গেল। জেরিন আবিদ হাসান এবং নীলাকে নিয়ে লিফটে করে সাত তলায় এসে একটা দীর্ঘ করিডোর ধরে হেঁটে বড় একটা ঘরের সামনে দাঁড়াল। দরজার পাশে একটা সেক্রেটারিয়েট ডেস্ক, সেখানে ইন্টারকমে চাপ দিয়ে জেরিনা নিচু গলায় বলল, "স্যার, আপনার গেস্টদের নিয়ে এসেছি।"

আবিদ হাসান ইন্টারকমে একটা মোটা গলার আওয়াজ শুনতে পেলেন, "ভিতরে নিয়ে এস।"

জেরিন দরজা ঠেলে খুলে দিয়ে আবিদ হাসান এবং নীলাকে ভিতরে যেতে ইঙ্গিত করল। আবিদ হাসান নীলার হাত ধরে ভিতরে ঢুকলেন। বিশাল একটি অফিস ঘর, অন্যপাশে একটা বড় ডেস্কে পা তুলে একজন মানুষ তার রিভলবিং চেয়ারে আধশোয়া হয়ে বসে কিছু একটা পড়ছিল, আবিদ হাসান এবং নীলাকে ঢুকতে দেখে মানুষটি পা নামিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে এগিয়ে এল। এ রকম বিশাল একটি প্রতিষ্ঠান যার পরিকল্পনায় গড়ে উঠেছে সেই মানুষটিকে তুলনামূলকভাবে বেশ কম বয়স্ক মনে হল—আবিদ হাসান থেকে বড়জোর বছর পাঁচকের বড় হবে। মানুষটি দীর্ঘদেহী এবং সুদর্শন, চোখে সূক্ষ্ম ধাতব রীমের চশমা। মাথায় এলোমেলো চুল, গায়ের রং অস্বাভাবিক ফর্সা—এই বয়সেও রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে যায় নি।

মানুষটি লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এসে আবিদ হাসানের সাথে করমর্দন করে বলল, "আমি আসিফ আহমেদ আজহার। আমার বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলে ট্রিপল–এ।"

আবিদ হাসান হাসলেন, "ভাগ্যিস আপনি আমেরিকাতে নেই, তা হলে যত ভাঙা গাড়ি তাদের ড্রাইভারের ফোনের উত্তর দিতে দিতে আপনার জান বের হয়ে যেত।"

যুক্তরাষ্ট্রের মোটর গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের প্রতিষ্ঠান আমেরিকান অটোমোবাইল এসোসিয়েশানের নামের আদ্যক্ষরের সাথে ডক্টর আজহারের নামের মিলটুকু আবিদ হাসান ঠিক ঠিক ধরতে পেরেছেন দেখে মানুষটি বেশ সন্তুষ্ট হল। সে আবিদ হাসান এবং নীলাকে তার ডেস্কের সামনে রাখা গদিআঁটা চেয়ারে বসিয়ে নিজের জায়গায় বসে আবিদ হাসানের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি সিকিউরিটি গার্ডের ব্যবহারের জন্য আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।"

আবিদ হাসান ঠিক কী বলবেন বুঝতে পারলেন না। ভদ্রতাসূচক কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন তার আগেই ডক্টর আজহার বলল, "আমি অবশ্য সিকিউরিটি গার্ডের দোষও দিতে পারছি না। আমরা বেছে বেছে এমন মানুষকে সিকিউরিটি গার্ডের দায়িত্বে দেই যাদের আই. কিউ. খুব বেশি নয়। খানিকটা রোবটের মতো মানুষ! তাদের কাছে খুব ভদ্রতা আশা করাও অন্যায় হবে।"

আবিদ হাসান মানুষটিকে তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করতে থাকলেন। মানুষটির সপ্রতিভ আন্তরিক কথাবার্তার পরেও তার ভিতরে কিছু একটা তাকে এক ধরনের অস্বস্তির মাঝে ফেলে দেয়। মানুষটি এবারে হঠাৎ করে নীলার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি কী খাবে বল? আইসক্রিম, কোল্ড ড্রিংকস, হট চকলেট?"

নীলা আইসক্রিম খুব পছন্দ করে কিন্তু সেটা মুখ ফুটে বলল না, মাথা নেড়ে বলল, "কিছু খাব না।"

"কিছু একটা তো খেতে হবে।" মানুষটি নীলার দিকে চোখ মটকে বলল, "ঠিক আছে আইসক্রিমই হোক। আমার কাছে খুব ভালো আইসক্রিম আছে। স্ট্রবেরি উইথ হেজল নাট।"

ইন্টারকমে চাপ দিয়ে এই সপ্রতিভ মানুষটি নীলার জন্য আইসক্রিম এবং তাদের দুজনের জন্য কফির কথা বলে আবার আবিদ হাসানের দিকে ঘুরে তাকাল। আবিদ হাসান একটু ইতস্তত করে বললেন, "আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—আপনি কি শুধু সিকিউরিটি গার্ডের হয়ে ক্ষমা চাইবার জন্য আমাদের ডেকেছেন?"

মানুষটি হা হা করে হেসে উঠে বলল, "না। আমি সে জন্য আপনাদের কষ্ট দিই নি। আমাদের এই ফ্যামিলিটির সিকিউরিটি সিস্টেম একেবারে স্টেট অফ দি আর্ট। আমি এখানে বসে সবকিছু মনিটর করতে পারি। ঘটনাক্রমে আমি আপনার সাথে গার্ডের কথা শুনতে পেরেছি। আপনি আপনার মেয়ের জন্য একটা কুকুর ছানা খুঁজছেন।"

"হ্যাঁ। সারা ঢাকা শহর খুঁজে আমি একটা ভালো কুকুর ছানা পেলাম না।"

"পাবেন না।" মানুষটি সোজা হয়ে বলল, "যে দেশে মানুষ খেতে পায় না সে দেশে কুকুর আপনি কেমন করে পাবেন?"

আবিদ হাসান একটু অবাক হয়ে বললেন, "তা হলে আপনারা এত হইচই করে কুকুরের ফার্ম কেন খুলেছেন?"

"এক্সপোর্টের জন্য। ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে পোষা পশুপাখির বিশাল মার্কেট। মাল্টি বিলিয়ন ডলার ইন্ডাস্ট্রি। আমরা সেই মার্কেটটা ধরতে চাই।"

আবিদ হাসানকে একটু বিভ্রান্ত দেখাল, তিনি মাথা নেড়ে বললেন, "আমি বিজনেস বুঝি না। কিন্তু কমনসেন্স থেকে মনে হয় এখানে কুকুরের ফার্ম করে সেই কুকুরকে বিদেশে রপ্তানি করা কিছুতেই একটা লাভজনক ব্যবসা হতে পারে না।"

ডক্টর আজহার কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই জেরিন একটা সুন্দর ট্রে করে দুই মগ কফি এবং একটা গবলেটে আইসক্রিম নিয়ে এসে ঢুকল। টেবিলে তাদের সামনে সেগুলো সাজিয়ে রেখে চলে যাবার পর ডক্টর আজহার কফিতে চুমুক দিয়ে বলল, "আপনি বলছেন বিজনেস বোঝেন না, কমনসেন্স থেকে বলছেন কিন্তু বিজনেস মানেই হল কমনসেন্স। আপনি ঠিকই বলেছেন এখান থেকে সাধারণ কুকুর রপ্তানি করা লাভজনক ব্যবসা নয়।"

amarboi.com

"তা হলে?"

"আমরা সাধারণ কুকুর রপ্তানি করব না।"

"তা হলে কী ধরনের কুকুর?"

"জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার করে আমরা এমন একটি প্রজাতি দাঁড়া করিয়েছি সারা পৃথিবীতে তার কোনো জুড়ি নেই।"

আবিদ হাসান ভুরু কুঁচকে তাকালেন, "কিসে জুড়ি নেই?"

"বুদ্ধিমত্তায়।"

"বুদ্ধিমত্তা?"

"হ্যাঁ। অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা।"

আবিদ হাসান ডক্টর আজহারের চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "আমি বুঝতে পারছি না, জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার করে আপনি কুকুরের বুদ্ধিমত্তা কীভাবে বাড়াবেন?"

"আমার পিএইচডি থিসিসের নাম ছিল 'আইসোলেশান অফ জিন্স রেসপন্সিবল অফ ইনটেলিজেন্স ইন কেনাইন ফেমিলি।' অর্থাৎ কুকুরের বুদ্ধিমত্তা জিন্সটি আলাদা করা।"

"কুকুরের বুদ্ধিমত্তায় একটি জিন্স আছে?"

ডক্টর আজহার হাত নেড়ে বলল, "এই আলোচনাগুলো আসলে কফি খেতে খেতে শেষ করা সম্ভব না, হ্যাঁ এবং না দিয়েও এর উত্তর হয় না। তবে আপনি যদি জানতে চান আপনাকে বলতে পারি, বুদ্ধিমান কুকুরের জিন্স আলাদা করে অসাধারণ বুদ্ধিমান কুকুর তৈরি করায় আমার একটা পেটেন্ট রয়েছে।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। সেই পেটেন্ট দেখে আমেরিকায় একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি আমার সাথে যোগাযোগ করেছিল। পুরো দেড় বছর আলাপ-আলোচনা হয়েছে, শেষ পর্যন্ত এখানে পেট ওয়ার্ল্ড তৈরি হয়েছে।"

"চমৎকার।" আবিদ হাসান বললেন, "আপনাকে অভিনন্দন।"

"এখন অভিনন্দন দেবেন না। পুরোটুকু দাঁড়িয়ে যাক, স্টেটসে প্রথম শিপমেন্ট পাঠাই তারপর দেবেন।"

"প্রথম শিপমেন্টের কত বাকি?"

"অনেক। মাত্র প্রথম কয়েকটি টেস্ট কেস তৈরি হয়েছে। চমৎকার কয়েকটা কুকুর ছানার জন্ম হয়েছে।"

নীলা এতক্ষণ চুপ করে তার আব্বুর সাথে ডক্টর আজহারের কথা শুনছিল, এবারে প্রথমবার কথা বলে উঠল, "সত্যি?"

ডক্টর আজহার নীলার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। বলল, "হ্যাঁ, সত্যি। প্রথম কেসগুলো করেছি টেরিয়ার দিয়ে। আস্তে আস্তে শার্পে, স্পিৎজ্ করে ল্যাব্রাডোর যাব। স্টেটসে ল্যাব্রাডোর প্রজাতি খুব পপুলার।"

নীলা একবার তার বাবার মুখের দিকে তাকাল, তারপর ডক্টর আজহারের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনারা কুকুর ছানাগুলো বিক্রি করবেন?"

ডক্টর আজহার চোখ বড় বড় করে নীলার দিকে তাকিয়ে বলল, "কিনবে তুমি?"

নীলা মাথা নাড়ল এবং সাথে সাথে ডক্টর আজহার হা হা করে হেসে উঠে বলল, "আমাদের এই কুকুর ছানাগুলোর দাম কত জান?"

নীলা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, "কত?"

"রিটেল মার্কেট—অর্থাৎ খোলা বাজারে সাড়ে সাত হাজার ডলার। অর্থাৎ বাংলাদেশের টাকায় তিন লাখ থেকে বেশি!"

নীলার মুখটি সাথে সাথে আশাভঙ্গের কারণে ম্লান হয়ে যায়। পুরো ব্যাপারটাকে তার কাছে এক ধরনের দুর্বোধ্য এবং নিষ্ঠুর রসিকতা বলে মনে হতে থাকে। ডক্টর আজহার নীলার দিকে তাকিয়ে চোখ মটকে বলল, "আছে তোমার কাছে তিন লাখ টাকা?"

নীলা কিছু বলল না। ডক্টর আজহার সোজা হয়ে বসে হঠাৎ গলার স্বরে এক ধরনের গুরুত্বের ভাব এনে বলল, "তোমার মন খারাপ করার কোনো কারণ নেই, কারণ একটু আগে তোমার বাবার সাথে তোমাকে দেখে আমার মাথায় একটা চমৎকার আইডিয়া এসেছে। সে জন্য তোমাদের এখানে ডেকে এনেছি।"

নীলার চোখ হঠাৎ চকচক করে ওঠে, "কী আইডিয়া?"

"আমাদের এই কুকুর ছানাগুলোকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। তারা কতটুকু বদ্ধিমান হয়েছে, মানুষের সাথে থাকতে তারা কত পছন্দ করে, সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে গবেষণা করতে হবে। সেটা করার সবচেয়ে ভালো উপায় কী জান?"

"কী?"

"তাদের কোনো একটি ফ্যামিলির সাথে থাকতে দেওয়া। কাজেই যদি দেখা যায় তুমি সেরকম একটা ফ্যামিলির মেয়ে তা হলে তোমাকে আমরা একটা কুকুর ছানা দিয়ে দেব।"

"সত্যি?" নীলা আনন্দে চিৎকার করে উঠে বলল, "সত্যি?"

"সত্যি। শুধু একটি ব্যাপার।"

"কী ব্যাপার?"

"কুকুর ছানাটিকে পোষার ব্যাপারে আমাদের কিছু নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে। আর—"

"আর?"

"আর মাঝে মাঝে কুকুর ছানাটিকে আমাদের পরীক্ষা করতে দিতে হবে। রাজি?"

নীলা "রাজি" বলে চিৎকার করতে গিয়ে শেষ মুহূর্তে থেমে তার আব্বুর দিকে অনুমতির জন্য তাকাল। আবিদ হাসান হেসে মাথা নেড়ে অনুমতি দিলেন। সাথে নীলা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলল, "রাজি!"

"চমৎকার।" ডক্টর আজহারের গলার স্বর আবার গম্ভীর হয়ে আসে, সে একটু সামনে ঝুঁকে বলল, "তা হলে তোমার আব্বুর সাথে কিছু কাগজপত্র তৈরি করে নেওয়া যাক। কাল ভোরে তোমার বাসায় চমৎকার একটা আইরিশ টেরিয়ার কুকুর ছানা চলে আসবে!"

নীলা চকচকে চোখে বলল, "আমি কি আমার কুকুর ছানাটিকে দেখতে পারি?"

ডক্টর আজহার এক মুহূর্ত কী যেন ভাবল, তারপর বলল, "এস আমার সাথে।"

ডক্টর আজহারের পিছু পিছু আবিদ হাসান এবং নীলা একটি বড় হলঘরে হাজির হল। ঘরের দেয়ালে অনেকগুলো বড় বড় টেলিভিশন স্ক্রিন। এককেটা স্ক্রিনে এককেটি ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য। কোনোটিতে বড় একটি ল্যাবরেটরিতে মানুষেরা কাজ করছে, কোথাও বড় গুদামঘর থেকে জিনিসপত্র সরানো হচ্ছে, কোথাও খাঁচায় রাখা বড় বড় কুকুর, কোথাও বিচিত্র ধরনের যন্ত্রপাতি। ডক্টর আজহার সুইচপ্যানেল স্পর্শ করতেই একটা স্ক্রিনের দৃশ্য পাল্টে যায় এবং সেখানে ধবধবে সাদা কুকুর ছানার ছবি ফুটে ওঠে। কুকুর ছানাটি স্থির দৃষ্টিতে কোথায় জানি তাকিয়ে আছে।

ডক্টর আজহার নীলাকে বলল, "এই যে, তোমার কুকুর ছানা।"

নীলা বুকের মাঝে আটকে রাখা নিশ্বাসটি বের করে দিয়ে বলল, "ইস্! কী সুন্দর!"

আবিদ হাসানকেও স্বীকার করতে হল কুকুর ছানাটি সত্যিই ভারি সুন্দর! শিশু—তা সে মানুষেরই হোক আর পশুপাখিরই হোক, সব সময়ই সুন্দর।

৩

নীলার কুকুর ছানা নিয়ে মুনিরা হাসানের প্রকাশ্যে এবং আবিদ হাসানের গোপনে যেটুকু দুশ্চিন্তা ছিল পেট ওয়ার্ডের কাজকর্ম দেখে তার পুরোটাই দূর হয়ে গেল। পেট ওয়ার্ড যে নীলার জন্য শুধু একটি ধবধবে সাদা কুকুর ছানা দিয়ে গেল তা নয়, কুকুর ছানাটিকে দেখেশুনে রাখার জন্য যা যা প্রয়োজন তার সবকিছুর ব্যবস্থা করে দিয়ে গেল। তারা বাসার সামনে মোল্ডেড প্লাস্টিকের সুন্দর ঘর, প্রথম তিন মাসের খাবার এবং ওষুধপত্র, কুকুর ছানা পরিচর্যা করার উপরে বই, কাগজপত্র এমনকি একটা ভিডিও এবং কুকুর ছানার বুদ্ধিমত্তা বিকাশের জন্য কী কী করতে হবে সেসব ব্যাপারেও নীলার সাথে আলাপ করে গেল। কুকুর

ছানার দৈনন্দিন তথ্য পাঠানোর জন্য একটি ই-মেইল একাউন্ট এমনকি জরুরি প্রয়োজনে যোগাযোগ করার জন্য সার্বক্ষণিক একটি টেলিফোন নম্বরও দিয়ে গেল।

কয়েকদিনের মাঝেই কুকুর ছানাটির উপস্থিতিতে বাসার সবাই মোটামুটি অভ্যস্ত হয়ে যায়। কুকুর ছানাটি শান্ত এবং আমুদে। নীলার মনোরঞ্জনের জন্য খুব ব্যস্ত এবং অত্যন্ত সুবোধ। কোন জিনিসটি করতে পারবে এবং কোন জিনিসটি করতে পারবে না সেটি একবার বলে দেওয়া হলেই কুকুর ছানাটি সেটি মনে রাখে এবং মেনে চলে। সারা রাত জেগে থেকে কেউকেউ চিৎকার করে সারা বাড়ি মাথায় তুলে সবার জীবন অতিষ্ঠ করে দেবে বলে যে ভয়টা ছিল দেখা গেল সেটা পুরোপুরি অমূলক। রাত্রে ঘুমানোর সময় কুকুর ছানাটিকে তার ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেওয়ামাত্রই সে দুই পায়ের মাঝে মাথা ঢুকিয়ে ব্যাপারটি মেনে নেয়।

কুকুর ছানাটির কী নাম দেওয়া যায় সেটি নিয়ে অনেক জল্পনাকল্পনা হল এবং শেষ পর্যন্ত নীলার যে নামটি পছন্দ সেটি হচ্ছে 'টুইটি'। আবিদ হাসানের ধারণা ছিল এই নামটিতে অভ্যস্ত হতে কুকুর ছানা সপ্তাহখানেক সময় নেবে কিন্তু দেখা গেল এক বেলার মাঝে কুকুর ছানাটি তার নতুন নামে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার করে সত্যি সত্যি কুকুরের মাঝে বুদ্ধিমান প্রজাতি তৈরি করা সম্ভব সেটি আবিদ হাসান এই প্রথমবার একটু একটু বিশ্বাস করতে শুরু করলেন।

কিছুদিনের মাঝেই বাসার সবাই কুকুর ছানা 'টুইটি'কে বেশ পছন্দ করে ফেলল। নীলা স্কুল থেকে আসার পরই টুইটিকে নিয়ে ছোটাছুটি করে। সত্যি কথা বলতে কী, আবিদ হাসানও বিকেলবেলা টুইটি নামের এই আইরিশ টেরিয়ার কুকুর ছানাটিকে নিয়ে খানিকক্ষণ খেলার জন্য বেশ আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে থাকেন। মুনিরা হাসান যদিও নিজে থেকে এখনো টুইটির সাথে কোনো রকম মাখামাখি করেন নি, কিন্তু বারান্দায় বসে থেকে তার স্বামী এবং কন্যাকে এই কুকুর ছানাটিকে নিয়ে বড় ধরনের হইচই করতে দেখা বেশ পছন্দই করেন। নির্বোধ পশুপাখি সম্পর্কে তার যেরকম একটি ধারণা ছিল টুইটিকে কাছাকাছি দেখে তার বেশ একটা বড় পরিবর্তন হয়েছে।

আবিদ হাসান যেটুকু জানেন সে অনুযায়ী পেট ওয়ার্ল্ড এখনো পুরোপুরি ব্যবসা শুরু করে নি। ডক্টর আজহারের সাথে কথা বলে যেটুকু বুঝেছিলেন তাতে মনে হয় মোটামুটি নিয়মিতভাবে বুদ্ধিমান প্রজাতির কুকুর ছানা তৈরি করতে শুরু করার এখনো বছর দুয়েক সময় বাকি। যে কোনো ব্যবসার গোড়ার দিকে একটা সময় থাকে যখন সেটি দাঁড়া করানোর জন্য তার পিছনে প্রচুর টাকা ঢালতে হয়। পেট ওয়ার্ল্ড সে ব্যাপারে নিশ্চয়ই ভালোভাবে প্রস্তুত। তারা শুধু যে তাদের প্রতিষ্ঠানটিকে চালিয়ে যাচ্ছে তাই নয়, টঙ্গীর আশপাশে বেশ কিছু দাতব্য সেবা প্রতিষ্ঠানও খুলেছে। সেখানে গরিব মানুষজন বিনা খরচে চিকিৎসা পেতে পারে, বিশেষ করে সন্তানসম্ভবা মায়েদের চিকিৎসার খুব ভালো এবং আধুনিক ব্যবস্থা রয়েছে। আমেরিকান বড় করপোরেশনগুলো স্থানীয় এলাকায় সবসময়েই এ ধরনের নানারকম আয়োজন করে থাকে, তার সবগুলোই যে মানুষের জন্য ভালবাসার কারণে হয়ে থাকে তা নয়। ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া থেকে শুরু করে স্থানীয় মানুষজনের সাথে ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলা জাতীয় ব্যাপারগুলোই আসলে মূল উদ্দেশ্য। নিজেরা যখন বিশাল অর্থের পাহাড় গড়ে তুলবে তখন তার একটি অংশ যদি গরিব-দুঃখী মানুষের জন্য খরচ করা হয় খারাপ কী?

দেখতে দেখতে তিন মাস পার হয়ে গেল। টুইটিকে নিয়ে প্রাথমিক উচ্ছ্বাসটুকু কেটে যাবার পরও নীলার উৎসাহে এতটুকু ভাটা পড়ে নি। সফটওয়্যার নিয়ে নতুন একটা প্রজেক্ট

শুরু করার পর আবিদ হাসান হঠাৎ করে বাড়াবাড়ি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, মাঝখানে তাকে কয়েক সপ্তাহের জন্য জার্মানিও যেতে হল। জার্মানি থেকে ফিরে আসার সময় এবারে তার স্ত্রী এবং কন্যার জন্য ছোটখাটো উপহারের সাথে সাথে টুইটির জন্যও একটা উপহার কিনে আনলেন—একটা ফ্লী-কলার, কুকুরের গলায় বেঁধে রাখলে তার শরীরে উকুন হয় না!

জার্মানি থেকে ফিরে এসে অনেকদিন পরে রাত্রে একসাথে খেতে বসে আবিদ হাসান তার মেয়ের খোঁজ-খবর নিচ্ছিলেন। স্কুলের খবর, বন্ধুবান্ধবের খবর দিয়ে নীলা টুইটির খবর দিতে শুরু করল। বলল, "আব্বু, টুইটি যা দুষ্টু হয়েছে তুমি সেটা বিশ্বাস করবে না।"

নীলার গলায় অবশ্য টুইটির বিরুদ্ধে যেটুকু অভিযোগ তার চাইতে অনেক বেশি মমতার ছাপ ছিল। আবিদ হাসান মুখ টিপে হেসে বললেন, "কী দুষ্টুমি করেছে, শুনি?"

"তাকে গল্প না বললে খেতে চায় না।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ, কিসের গল্প শুনতে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে বল দেখি?"

"কিসের?"

"একটা ছোট বাচ্চা আর তার মায়ের গল্প।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ।"

নীলা আদুরে গলায় বলল, "আচ্ছা আব্বু বল, প্রত্যেকদিন কি গল্প বলা যায়?"

আবিদ হাসান মাথা নাড়লেন, "ঠিকই বলেছিস। এভাবে চলতে থাকলে তো তোর কুকুর ছানাকে পড়ার জন্য নার্সারি স্কুলে পাঠাতে হবে!"

নীলা হেসে ফেলল, বলল, "না আব্বু কুকুরকে নার্সারি স্কুলে পাঠাতে হবে না। আমি অনেক চেষ্টা করে দেখেছি টুইটির পড়াশোনায় কোনো উৎসাহ নেই। 'ডাবলিউ' আর 'এম' উল্টাপাল্টা করে ফেলে।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। আর কিছুতেই নয়ের বেশি গুনতে পারে না। দশ লিখলেই টুইটির মাথা আউলা-ঝাউলা হয়ে যায়! একবার বলে এক আরেকবার বলে শূন্য।"

আবিদ হাসান হঠাৎ একটু অবাক হয়ে নীলার দিকে তাকালেন, এতক্ষণ টুইটির সম্পর্কে যেসব কথা বলে গেছে তার কোনোটাই তিনি খুব বেশি গুরুত্ব দিয়ে নেন নি, নীলার শেষ কথাটি শুনে তিনি রীতিমতো চমকে উঠলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "কী বললি তুই?"

নীলা গাল ফুলিয়ে বলল, "তার মানে তুমি আমার কোনো কথা শোন নি?"

"কে বলেছে শুনি নি। সব শুনেছি।"

"তা হলে আবার জিজ্ঞেস করছ কেন?"

"তুই সত্যি বলেছিস নাকি ঠাট্টা করছিস জানার জন্য।"

"ঠাট্টা করব কেন?" নীলা মুখ গম্ভীর করে বলল, "তোমার মনে নেই টুইটির দাম সাড়ে সাত হাজার ডলার? সে সবকিছু বোঝে।"

"পাগলী মেয়ে, দাম বেশি হলেই সবকিছু বুঝবে কে বলেছে? সবকিছুর একটা সীমা থাকে। খুব বুদ্ধিমান কুকুরেরও বুদ্ধির একটা সীমা থাকবে।"

নীলা বুক ফুলিয়ে বলল, "আমার টুইটির বুদ্ধির কোনো সীমা নেই।"

"তুই যা বলেছিস সেটা সত্যি হলে আসলেই তোর টুইটির বুদ্ধির কোনো সীমা নেই।"

"তুমি কী বলছ আব্বু? আমি কি তোমাকে মিথ্যে বলেছি?"

AMARBOI.COM

"ইচ্ছে করে হয়তো বলিস নি—কিন্তু যেটা বলছিস সেটা সত্যি হতে পারে না। মানুষ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণী খুব বেশি দূর গুনতে পারে না।"

নীলা মুখ গম্ভীর করে বলল, "টুইটি পারে। আমি তোমাকে দেখাব।"

"ঠিক আছে।" আবিদ হাসান খেতে খেতে বললেন, "যেটা হয়েছে সেটা এ রকম, তোর টুইটি কিছু শব্দ শুনে কিছু কাজ করে, শব্দগুলো যে সংখ্যা সেটা সে জানে না। অনেকটা ময়না পাখির কথা বলার মতো। ময়না পাখি যে কথা বলে সেটা তারা বুঝে বলে না—তারা শুধু এক ধরনের শব্দ করে। বুঝেছিস!"

নীলা বলল, "আমি বুঝেছি আব্বু, তুমি কিছু বোঝ নি।"

মুনিরা হাসান এবারে মুখ ঝামটা দিয়ে বললেন, "অনেক হয়েছে। এখন দুজনেই কথা বন্ধ করে খাও।"

পরদিন অফিস থেকে এসে আবিদ হাসান টুইটির বুদ্ধিমত্তা পরিমাপ করতে বসলেন। নীলাকে ডেকে বললেন, "নিয়ে আয় দেখি টুইটিকে।"

নীলা গলা উঁচিয়ে ডাক দিল, "টু-ই-টি।"

সাথে সাথেই বাসার পিছন থেকে টুইটি ছুটে এসে নীলাকে ঘিরে লাফাতে শুরু করল। আবিদ হাসান একটু অবাক হয়ে দেখলেন টুইটি এর মাঝে বেশ বড় হয়েছে, তার মাঝে কুকুর ছানা কুকুর ছানা ভাব আর নেই। নীলা আঙুল উঁচিয়ে বলল, "আব্বু তোকে এখন পরীক্ষা করে দেখবে। বুঝেছিস?"

আবিদ হাসান সকৌতুকে দেখলেন মানুষ যেভাবে সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ে, টুইটি ঠিক সেভাবে মাথা নাড়ল—যেন সে সত্যি সত্যি নীলার কথা বুঝতে পেরেছে। নীলা বলল, "আমি যখন বলব 'এক' তখন তুই একবার পা উপরে তুলবি, এইভাবে—" বলে নীলা তার নিজের পা উপরে তুলল, "বুঝেছিস?"

টুইটি তার পা একবার উপরে তুলল, তারপর হ্যাঁ-সূচকভাবে মাথা নাড়ল। নীলা এবার জোরে জোর বলল, "এক।"

টুইটি তখন তার পা'টি একবার উপরে তুলে আবার নামিয়ে আনে। নীলা বলল "দুই" তখন টুইটি তার পা'টি একবার উপরে তুলে নিচে নামিয়ে আনে তারপর আবার দ্বিতীয়বার উপরে তুলে নিচে নামিয়ে আনে। নীলা এবারে বলল, "তিন" টুইটি সত্যি সত্যি তিনবার তার পা উপরে তুলে নিচে নামিয়ে আনে। নীলা এইভাবে গুনে যেতে থাকে এবং প্রত্যেকবারই টুইটি সঠিক সংখ্যকভাবে তার পা উপরে তুলে এবং নিচে নামিয়ে আনে। 'আট' পর্যন্ত গিয়ে অবশ্য গুলিয়ে ফেলল এবং প্রথমবার ভুল করে ফেলল। নীলা হাল ছেড়ে না দিয়ে আবার প্রথম থেকে শুরু করতে যাচ্ছিল, আবিদ হাসান তাকে থামালেন, বললেন, 'আর করতে হবে না। আমি দেখেছি।"

"কী দেখেছ?"

"দেখেছি যে তুই কিছু একটা বললে সে কিছু একটা করতে পারে। এটা হচ্ছে এক ধরনের ট্রেনিং, টুইটি এটা না বুঝে করছে।"

নীলা বলল, "কী বলছ তুমি আব্বু? টুইটি না বুঝে কিছু করে না। তুমি দেখতে চাও?"

"দেখা।"

নীলা এবারে টুইটির দিকে তাকিয়ে বলল, "টুইটি তুই কাঠি চিনিস? কাঠি?"

আবিদ হাসান অবাক হয়ে দেখলেন টুইটি না-সূচকভাবে মাথা নাড়ল। নীলা তখন খুঁজে একটা কাঠি বের করে হাতে নিয়ে বলল, "এই যে এইটা হচ্ছে কাঠি। বুঝেছিস?"

টুইটি হ্যাঁ-সূচকভাবে মাথা নাড়ল। নীলা বলল, "যা, এইবারে খুঁজে খুঁজে পাঁচটা কাঠি নিয়ে আয়।"

টুইটি সাথে সাথে লেজ নেড়ে বাগানের দিকে ছুটে গেল এবং খুঁজে বের করে একটা কাঠি নিয়ে ছুটে এসে নীলার পায়ের কাছে রেখে দিয়ে আবার বাগানের দিকে ছুটে গেল। এইভাবে সত্যি সত্যি সে পাঁচটা কাঠি খুঁজে খুঁজে নীলার পায়ের কাছে এনে হাজির করল। নীলা এবারে যুদ্ধ জয়ের ভঙ্গি করে বলল, "দেখেছ, আব্বু?"

আবিদ হাসান এবারে সত্যি অবাক হলেন। কুকুর কত পর্যন্ত গুনতে পারে তিনি জানেন না, কিন্তু সংখ্যাটি বেশি হবার কথা নয়। নীলাকে নিয়ে তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে টুইটিকে পরীক্ষা করে সত্যি সত্যি হতবাক হয়ে গেলেন। এটি শুধু যে গুনতে পারে তাই নয়, এটি মানুষের যে কোনো কথা বুঝতে পারে, যে কোনো জিনিস শিখিয়ে দিলে এটি শিখে নিতে পারে। শুধু যে নানা ধরনের জিনিস চিনিয়ে দেওয়া যায় তাই নয়; এটি পুরোপুরি মানবিক কিছু ব্যাপারও বুঝতে পারে, ভালো, খারাপ বা আনন্দ এবং দুঃখ এই ধরনের ব্যাপার নিয়েও তার বেশ স্পষ্ট ধারণা আছে। নীলা যখন টুইটিকে একটা ছোট বাচ্চার নানা ধরনের কর্মকাণ্ড নিয়ে বানিয়ে বানিয়ে একটা গল্প বলল, আবিদ হাসান অবাক হয়ে দেখলেন টুইটি গল্পটা সত্যি সত্যি একজন মানবশিশুর মতো উপভোগ করল। এটি একটি অবিশ্বাস্য ব্যাপার এবং আবিদ হাসান নিজের চোখে না দেখলে এটি তিনি বিশ্বাস করতেন না।

সেদিন গভীর রাতে আবিদ হাসান ইন্টারনেটে কুকুরের বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য নিজের কম্পিউটারে ডাউনলোড করে নিয়ে এলেন। মনোবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণায় চোখ বুলিয়ে পশুপাখির বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে নানা ধরনের তথ্য নিয়ে পড়াশোনা করলেন। রাতে ঠিক ঘুমানোর আগে তিনি ডক্টর আসিফ আহমেদ আজহারের পেটেন্টটি একবার দেখার চেষ্টা করে একটি বিচিত্র জিনিস আবিষ্কার করলেন। তাঁর একাধিক পেটেন্ট রয়েছে সত্যি কিন্তু সেগুলো কুকুরের বুদ্ধিমত্তার জিন্সকে আলাদা করার উপরে নয়। তার পেটেন্টগুলো হচ্ছে একটি প্রাণীর দেহে ভিন্ন প্রজাতির একটি প্রাণীর কোষকে অনুপ্রবেশ করিয়ে সেখানে সেটিকে বাঁচিয়ে রাখার উপরে।

সে রাতে আবিদ হাসান অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমাতে পারলেন না। ঠিক কী তাকে পীড়া দিচ্ছিল তিনি বুঝতে পারলেন না কিন্তু টুইটির পুরো ব্যাপারটি নিয়ে তার ভিতরে এক ধরনের অশান্তি কাজ করতে লাগল। তার কেন জানি মনে হতে লাগল এখানে কোনো এক ধরনের অশুভ ষড়যন্ত্র চলছে।

৪

সকালে নাশতা খেতে খেতে আবিদ হাসান অন্যমনস্ক হয়ে যেতে লাগলেন। মুনিরা হাসান তার স্বামীকে ভালোই বুঝতে পারেন, খানিকক্ষণ চোখের কোনা দিয়ে তাকে লক্ষ করে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কী হয়েছে? কী নিয়ে এত চিন্তা করছ?"

"টুইটিকে নিয়ে।"

"কী চিন্তা করছ?"

আবিদ হাসান একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "তুমি তো দেখেছ টুইটির কী সাংঘাতিক বুদ্ধি!"

"হ্যাঁ। দেখেছি।"

"কিন্তু একটা কুকুরের এই ধরনের বুদ্ধি থাকা সম্ভব না। নিচু শ্রেণীর ম্যামেলের বুদ্ধির বেশিরভাগ হচ্ছে সহজাত বুদ্ধি বা ইন্সটিংক্ট। কিন্তু টুইটির বুদ্ধি অন্যরকম—সে শিখতে পারে এবং সেটা কাজে লাগাতে পারে। এই রকম বুদ্ধি শুধু মানুষেরই থাকতে পারে।"

মুনিরা হাসান হাসলেন, বললেন, "আমি তোমাকে গ্যারান্টি দিচ্ছি টুইটি মানুষ না।"

"সেটাই তো সমস্যা। হিসাব মিলাতে পারছি না। পেট ওয়ার্ডের পুরো ব্যাপারটা নিয়েই আমার ভিতরে এক ধরনের অস্বস্তি হচ্ছে। কেমন জানি অশান্তি হচ্ছে, মনে হচ্ছে কিছু একটা বড় রকমের অন্যায় হচ্ছে।"

মুনিরা হাসান হেসে বললেন, "এই দেশে মানুষজনের জীবনেরই ঠিক নেই, কুকুরকে নিয়ে অন্যায় হলে আর কত বড় অন্যায় হবে? অন্ততপক্ষে এইটুকু তো বলতে পারবে টুইটি মহাসুখে আছে!"

"তা ঠিক" আবিদ হাসান আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন।

কাজে বের হয়ে যাবার সময় আবিদ হাসান টুইটির ঘরের পাশে একবার দাঁড়ালেন, তাকে দেখে টুইটি তার কাছে ছুটে এল, তাকে ঘিরে ছোট ছোট লাফ দিয়ে টুইটি আনন্দ প্রকাশ করার চেষ্টা করতে লাগল। আবিদ হাসান নরম গলায় বললেন, "কী রে টুইটি, তুই ভালো আছিস?"

টুইটি মাথা নাড়ল, আবিদ হাসানের স্পষ্ট মনে হল টুইটি তার প্রশ্নটি বুঝতে পেরেছে। তিনি নিজের ভিতরে টুইটির জন্য এক ধরনের স্নেহ অনুভব করলেন। কুকুর ছানাটিকে তিনি নিজের কাছে টেনে আনলেন, তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে নরম গলায় কিছু কথা বললেন। ধবধবে সাদা লোমের ভিতর আঙুল প্রবেশ করিয়ে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে হঠাৎ মনে হল তিনি কিছু একটা স্পর্শ করেছেন। আবিদ হাসান কৌতূহলী হয়ে টুইটির মাথার লোম সরিয়ে তাকিয়ে দেখলেন, সেখানে একটি অস্ত্রোপচারের চিহ্ন। ছোটখাটো অস্ত্রোপচার নয়, বিশাল একটি অস্ত্রোপচার, মনে হয় পুরো খুলিটিই কেটে আলাদা করা হয়েছিল।

আবিদ হাসান হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠলেন, তার হঠাৎ একটি নতুন জিনিস মনে হয়েছে। জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করে নয়—অন্য কোনোভাবে টুইটির বুদ্ধিমত্তা বাড়ানো হয়েছে!

আবিদ হাসান অফিসে গিয়ে কাজে খুব একটা মন দিতে পারলেন না। সারাক্ষণ তার ভিতরে কিছু একটা খুঁতখুঁত করতে থাকল। দুপুরবেলা তিনি পেট ওয়ার্ডে ফোন করলেন, মিষ্টি গলার একটি মেয়ে তার টেলিফোনের উত্তর দিল। আবিদ হাসান জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি জেরিন?"

"হ্যাঁ। আপনি কে বলছেন?"

"আমার নাম আবিদ হাসান।"

জেরিন তাকে চিনতে পারল, খুশি হয়ে বলল, "আমাদের টেস্ট কেস কেমন আছে আপনার বাসায়?"

"ভালো আছে।"

"চমৎকার। আমাদের স্টাফ নিয়মিত যাচ্ছে নিশ্চয়ই।"

"হ্যাঁ যাচ্ছে। খুব যত্ন করছে, কোনো সমস্যাই নেই।"

"খুব ভালো লাগল শুনে, তা এখন আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি?"

আবিদ হাসান একটু ইতস্তত করে বললেন, "আপনাদের যে কুকুর ছানাটি আমাদের বাসায় আছে সেটি নিয়ে আমার একটা প্রশ্ন ছিল।"

"বেশ। আপনাকে আমি সার্ভিস সেন্টারে কানেকশান দিয়ে দিচ্ছি—"

"না, না। সার্ভিস সেন্টার নয়, আমি আসলে ম্যানেজমেন্টের সাথে কথা বলতে চাই। উঁচু ম্যানেজমেন্ট। খুব জরুরি একটা ব্যাপারে।"

জেরিন কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "ম্যানেজমেন্টের সবাই তো এখন ব্যস্ত, একটা বোর্ড মিটিঙে আছেন।"

"আমার ব্যাপারটি আসলে বোর্ড মিটিঙের মতোই জরুরি।" আবিদ হাসান ঠাণ্ডা গলায় বললেন, "ডক্টর আজহারকে বলেন যে আপনাদের কুকুরের মাথায় অস্ত্রোপচারের একটা ব্যাপার নিয়ে আমি কথা বলতে চাই।"

জেরিন বলল, "বেশ। আপনি এক মিনিট অপেক্ষা করুন।"

আবিদ হাসান টেলিফোনে বিদেশী গান শুনতে শুনতে অপেক্ষা করতে লাগলেন। দীর্ঘ সময় পর টেলিফোনে খুট করে শব্দ হল এবং সাথে সাথে ডক্টর আজহারের গলা শুনতে পেলেন, "গুড মর্নিং মিস্টার হাসান।"

"গুড মর্নিং।"

আজহার বলল, "আপনি কি একটা জরুরি ব্যাপার নিয়ে আমার সাথে কথা বলতে চান?"

"হ্যাঁ।" আবিদ হাসান একটা নিশ্বাস নিয়ে বললেন, "আমি ঠিক কীভাবে শুরু করব বুঝতে পারছি না। আপনার সাথে আমি যখন কথা বলেছি তখন আপনি বলেছিলেন জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করে আপনারা কুকুরের বুদ্ধিমত্তা বাড়িয়েছেন।"

"বলেছিলাম। সেটি নিয়ে কোনো সমস্যা হয়েছে?"

"ঠিক সমস্যা নয়, কনফিউশান হয়েছে। আপনাদের কুকুর ছানাটির ইন্টেলিজেন্স আমি পরীক্ষা করে দেখেছি। সোজা কথায় এটি অস্বাভাবিক বুদ্ধিমান। আমি পশুপাখির বুদ্ধিমত্তা নিয়ে পড়াশোনা করে দেখেছি, আপনাদের কুকুর ছানার বুদ্ধিমত্তা ম্যামেলের মাঝে থাকা সম্ভব নয়।"

টেলিফোনের অন্যপাশে ডক্টর আজহার উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল, "ম্যামেল বলতে যা বোঝায় আমাদের টেস্ট-কেস তা নয়। আপনাকে তো আমরা বলেছি জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করে আমরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান প্রাণী তৈরি করেছি।"

"তা হলে কুকুরটার মাথায় অপারেশনের চিহ্ন কেন?"

"অপারেশন?"

"হ্যাঁ।"

ডক্টর আজহার কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "আপনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার লক্ষ করেছেন মি. হাসান। জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করে যে বুদ্ধিমান প্রজাতি আমরা দাঁড় করিয়েছি তার মস্তিষ্কের সাইজ অনেক বড়। সাধারণ কুকুরের স্কালে সেটা গ্রো করতে পারে না। তাই সার্জারি করে স্কালের সাইজটি বড় করতে হয়।"

"এটি কি পশু নির্যাতনের মাঝে পড়ে না?"

ডক্টর আজহার আবার হো হো করে হেসে বলল, "এই দেশে মানুষ নির্যাতনের জন্যই আইন ঠিক করা হয় নি, পশু নির্যাতনের আইন করবে কে?"

আবিদ হাসান একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "এই জন্যই কি আপনারা পেট ওয়ার্ল্ড

তৈরি করার জন্য আমাদের দেশকে বেছে নিয়েছেন?"

"না। এই জন্য করি নি। গবেষণার জন্য পশুপাখি ব্যবহার করা নতুন কিছু নয়। আমাদের মডার্ন মেডিসিন পুরোটাই তৈরি হয়েছে পশুপাখির ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে। মানুষের জন্য লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি নিশ্চয়ই জানেন। আপনি যদি ভেজিটারিয়ান না হয়ে থাকেন তা হলে আপনি নিশ্চয়ই গরু ছাগল হাঁস মুরগিও খান।"

আবিদ হাসান একটা নিশ্বাস ফেললেন, কোনো কথা বললেন না। ডক্টর আজহার বলল, "আপনার সব কনফিউশান কি দূর হয়েছে হাসান সাহেব?"

"হ্যাঁ। হয়েছে। শুধু একটা ব্যাপার। ছোট একটা ব্যাপার।"

"কী ব্যাপার?"

"আপনি বলেছিলেন জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার করে বুদ্ধিমান কুকুর তৈরি করা সম্পর্কে আপনার একটা পেটেন্ট আছে।"

ডক্টর আজহার এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "হ্যাঁ। কোনো সমস্যা?"

"হ্যাঁ। ছোট একটা সমস্যা। আমি ইন্টারনেটে আপনার পেটেন্টগুলো পরীক্ষা করে দেখছিলাম। জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিঙে আপনার কোনো পেটেন্ট নেই।"

ডক্টর আজহার দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বলল, "আপনি—আপনি আমার পেটেন্টের খোঁজ নিয়েছেন?"

"হ্যাঁ। ইন্টারনেটের কারণে ঘরে বসে নেওয়া যায়। ব্যান্ড উইডথ বেশি নয় বলে সময় একটু বেশি লাগে। আপনার পেটেন্ট সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়ে। এক প্রজাতির প্রাণীর ভিতরে অন্য প্রজাতির প্রাণীর টিস্যু বসিয়ে দেওয়ার উপরে।"

ডক্টর আজহার চুপ করে রইল। আবিদ হাসান বললেন, "আপনি আমার কাছে একটা মিথ্যা কথা বলেছেন। কেন বলেছেন জানি না। যে একটা মিথ্যা কথা বলতে পারে সে অসংখ্য মিথ্যা কথা বলতে পারে। কাজেই আমি আপনার কোন কথাটা বিশ্বাস করব বুঝতে পারছি না।"

ডক্টর আজহার শীতল গলায় বলল, "আপনি আমার কোন কথাটা বিশ্বাস করতে পারছেন না?"

"আমার ধারণা, আপনারা আসলে জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার করে বুদ্ধিমান কুকুর তৈরি করেন নি। আপনারা খুব সাধারণ একটা কুকুরের মাথায়—"

"কুকুরের মাথায়?"

"সাধারণ একটা কুকুরের মাথায় মানুষের মস্তিষ্ক লাগিয়ে দিয়েছেন। জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিঙে আপনার কোনো দক্ষতা নেই—কিন্তু এ ব্যাপারে আপনার দক্ষতা আছে।"

ডক্টর আজহার কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে হাসতে শুরু করল, আবিদ হাসান টেলিফোনটা রেখে দিয়ে চুপ করে বসে রইলেন।

দুপুরবেলা একটা খুব জরুরি মিটিং ছিল কিন্তু আবিদ হাসান দুপুরের আগেই বের হয়ে এলেন। মিটিঙে তাকে না দেখে তার প্রজেক্টের সবাই চেঁচামেচি শুরু করবে কিন্তু তার কিছু করার নেই। পেট ওয়ার্ল্ড সম্পর্কে তার ভিতরে যে সন্দেহটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে সে ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়া দরকার। টুইটিকে নিয়ে তার মাথার এক্স-রে করিয়ে নিতে হবে। তাকে মাঝে মাঝেই নানারকম ওষুধ খাওয়ানো হয় সেগুলো ঠিক কী ধরনের ওষুধ সেটাও বিশ্লেষণ করতে হবে। টুইটির মস্তিষ্কের খানিকটা টিস্যু কোনোভাবে বের করা যায় কি না সেটা নিয়েও তার পরিচিত একজন নিউরো সার্জনের সাথে কথা বলতে হবে। পেট ওয়ার্ল্ডকে

AMARBOI.COM

যদি আইনের আওতায় আনতে হয় তা হলে পুলিশকেও জানাতে হবে। এ দেশের পুলিশ তার কোনো কথা বিশ্বাস করবে কি না সে ব্যাপারে অবশ্য যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

আবিদ হাসান পার্কিং লট থেকে তার গাড়িটা বের করে রাস্তায় ওঠার সময় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটা মাইক্রোবাস তার পিছু পিছু যেতে শুরু করল, সেটা তিনি দেখতে পেলেন না। দেখতে পেলেও সেটি যে তাঁর পিছু নিয়েছে সেটাও বোঝার তার কোনো উপায় ছিল না।

সেগুন বাগানে আবিদ হাসানের বাসার রাস্তাটুকু তুলনামূলকভাবে নির্জন, সেখানে ঢোকার পর হঠাৎ করে আবিদ হাসানের মনে পিছনের মাইক্রোবাসটি নিয়ে একটু সন্দেহ হল, রিয়ার ভিউ মিররে অনেকক্ষণ থেকে সেটাকে তিনি তাঁর পিছনে দেখতে পাচ্ছিলেন। ঢাকার রাস্তায় একই গাড়ি প্রায় আধঘণ্টা সময় ঠিক পিছনে পিছনে আসার সম্ভাবনা খুব কম। পিছনের মাইক্রোবাসটি কাদের এবং ঠিক কেন তার পিছু পিছু আসছে সে সম্পর্কে আবিদ হাসানের কোনো ধারণাই ছিল না। এটি সত্যি সত্যি তার পিছু আসছে নাকি ঘটনাক্রমে তার পিছনে রয়েছে সেটা পরীক্ষা করার জন্য আবিদ হাসান একটা সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন, খানিকদূর গিয়ে যখন দেখতে পেলেন সামনে কোনো গাড়ি নেই তখন একেবারে হঠাৎ করে তিনি গাড়িটি রাস্তার মাঝখানে ঘুরিয়ে নিয়ে উল্টোদিকে যেতে শুরু করলেন। খানিকদূর গিয়ে পিছনে তাকিয়ে দেখলেন মাইক্রোবাসটিও রাস্তার মাঝে ইউ-টার্ন নেওয়ার চেষ্টা করছে—সেটি যে তার পিছু পিছু আসছে সে ব্যাপারে এবারে তার কোনো সন্দেহ রইল না। আবিদ হাসান ঠিক কী করবেন বুঝতে পারলেন না। দ্রুত গাড়ি চালিয়ে সরে যাওয়ার সম্ভাবনা কম, সামনে বড় রাস্তায় অনেক ভিড়, রিয়ার ভিউ মিররে তাকিয়ে অবস্থাটা আঁচ করার চেষ্টা করছিলেন তার আগেই হঠাৎ করে মাইক্রোবাসটা গুলির মতো ছুটে এসে তাকে ওভারটেক করে রাস্তার মাঝে আড়াআড়িভাবে দাঁড়িয়ে গেল। আবিদ হাসান ব্রেক কষে গাড়ি থামালেন, তিনি অবাক হয়ে দেখলেন মাইক্রোবাস থেকে কালো পোশাক পরা দুজন মানুষ নেমে এসেছে, দুজনের হাতেই স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র।

আবিদ হাসানের সমস্ত শরীর আতঙ্কে অবশ হয়ে গেল, তার মাঝে কোনো একটি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে সচল রাখার চেষ্টা করে। কোনো কিছু না বুঝে শুধুমাত্র বেঁচে থাকার সহজাত এবং আদিম প্রবৃত্তির তাড়নায় তিনি গাড়ি ব্যাক গিয়ারে নিয়ে এক্সেলেটরে সমস্ত শক্তি দিয়ে চাপ দিলেন। টায়ার পোড়া গন্ধ ছুটিয়ে গাড়িটা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণহীনভাবে পিছনে ছুটে গেল, কোথাও ধাক্কা লেগে প্রচণ্ড শব্দ করে কিছু একটা ভেঙেচুরে গুঁড়ো করে ফেলল, জিনিসটি কী আবিদ হাসান বুঝতে পারলেন না এবং বোঝার চেষ্টাও করলেন না।

ঠিক এ রকম সময়ে মানুষ দুজন স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে তার দিকে লক্ষ্য করে গুলি করতে শুরু করে, আবিদ হাসান মাথা নিচু করে আবার এক্সেলেটরে চাপ দিতেই গাড়িটি জীবন্ত প্রাণীর মতো পিছনে ছিটকে গেল। ঝনঝন শব্দ করে গাড়ির কাচ ভেঙে পড়ল এবং তার মাথার উপর দিয়ে শিস দেওয়ার মতো শব্দ করে বুলেট ছুটে গেল। আবিদ হাসান সম্পূর্ণ আন্দাজের ওপর ভর করে গাড়িটা ঘুরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেন। বৃষ্টির মতো গুলি ছুটে এল, গাড়ির বনেটে প্রবল ধাতব শব্দ শোনা যেতে থাকে এবং সেই অবস্থায় গাড়িটা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ঘুরে যায়, পাগলের মতো স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে কোনোমতে গাড়িটার নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে চেষ্টা করলেন আবিদ হাসান। পুরোপুরি আন্দাজের ওপর নির্ভর করে গাড়িটা রাস্তায় তোলার চেষ্টা করলেন, আবার কোথাও ধাক্কা লেগে গাড়িটা লাফিয়ে কয়েক ফুট উপরে উঠে গেল। প্রচণ্ড শব্দে সেটা নিচে আছড়ে পড়ল এবং আবিদ হাসান তখন একটা বিস্ফোরণের শব্দ শুনলেন। গাড়িটাকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করতে করতে মাথা তুলে পিছনে

তাকিয়ে দেখতে পেলেন কালো পোশাক পরা মানুষ দুজন নিজেদের মাইক্রোবাসের দিকে ছুটে যাচ্ছে, গুলির শব্দ শুনে লোকজন ছোটাছুটি করে পালিয়ে যাচ্ছে। আবিদ হাসান বুক থেকে আটকে থাকা একটা নিশ্বাস বের করে গাড়িতে সোজা হয়ে বসে রাস্তায় নেমে এলেন। গাড়িটা চালাতে গিয়ে আবিষ্কার করলেন সেটি নড়তে চাইছে না, শব্দ শুনে বোঝা যাচ্ছে পিছনে কোনো একটি চাকার বাতাস বের হয়ে গেছে। সেই অবস্থায় গাড়িটাকে আবিদ হাসান আরো কিলোমিটার খানেক চালিয়ে নিয়ে রাস্তার পাশে থামালেন। ঘটনাস্থলে লোকজনের মাঝে ছোটাছুটি হইচই হচ্ছিল, এখানে কেউ কিছু জানে না। তাঁর ক্ষতবিক্ষত ভেঙেচুরে যাওয়া গাড়িটাও কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করল না। ইঞ্জিন বন্ধ করে আবিদ হাসান নিজের দিকে তাকালেন, কপালের কাছে কোথাও কেটে গিয়ে রক্ত বের হচ্ছে, ডান হাতের কনুইয়ে প্রচণ্ড ব্যথা, তিনি হাতটা সাবধানে এক-দুইবার নেড়ে দেখলেন, কোথাও ভাঙে নি। পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের রক্তটা মুছে সাবধানে গাড়ি থেকে বের হলেন—তার অনেক সুখের গাড়ি একেবারে ভেঙেচুরে শেষ হয়ে গেছে। অসংখ্য গুলিতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে, এটি একটি বিস্ময়ের ব্যাপার যে তার শরীরে গুলি লাগে নি। দীর্ঘদিন যুক্তরাষ্ট্রে ছিলেন বলে গাড়িতে উঠলেই সিটবেল্ট বাঁধার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল তাই কোনো গুরুতর জখম হয় নি। আবিদ হাসান গাড়ির দরজা বন্ধ করার সময় লক্ষ করলেন তাঁর হাত অল্প অল্প কাঁপছে। কিন্তু সাথে সাথে তিনি আরেকটা জিনিস আবিষ্কার করলেন হঠাৎ করে তার মস্তিষ্ক আশ্চর্য রকম শীতল হয়ে গেছে তার ভিতরে কোনো উত্তেজনা নেই। কী করতে হবে সে সম্পর্কে তার খুব স্পষ্ট ধারণা আছে।

প্রথমেই তিনি দেখলেন তার পকেটে মানিব্যাগ এবং সেই মানিব্যাগে কোনো টাকা আছে কি না। তারপর একটু হেঁটে প্রথমেই যে স্কুটার পেলেন সেটাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন সেটি মতিঝিল যাবে কি না। স্কুটারটি রাজি হওয়া মাত্র তিনি সেটাতে উঠে বসে গেলেন। স্কুটারটি ছুটে চলতেই আবিদ হাসান পিছনে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করলেন কেউ তাকে অনুসরণ করছে কি না, যখন নিঃসন্দেহ হলেন কেউ তার পিছু পিছু আসছে না তখন তিনি স্কুটারটি থামিয়ে নেমে পড়লেন। ভাড়া চুকিয়ে তিনি ফুটপাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে একটা ফোন-ফ্যাক্সের দোকান খুঁজে বের করলেন। ভিতরে মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ একটা ফোন সামনে নিয়ে উদাস হয়ে বসে ছিল, তাকে দেখে সোজা হয়ে বসল। আবিদ হাসান তার স্ত্রীর টেলিফোন নম্বরটি দিলেন, ডায়াল করে মানুষটি টেলিফোনটি আবিদ হাসানের দিকে এগিয়ে দেয়। অন্যপাশে তাঁর স্ত্রীর গলার আওয়াজ পেয়ে আবিদ হাসান একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "মুনিরা—"

"হ্যাঁ, আবিদ। কী ব্যাপার?"

"কী ব্যাপার তুমি এখন জানতে চেয়ো না। আমি তোমাকে যা বলব তাই তোমাকে করতে হবে। বুঝেছ?"

আবিদ হাসানের গলার স্বরে এমন একটা কিছু ছিল যে মুনিরা শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। ভয়-পাওয়া-গলায় বললেন, "কী হয়েছে?"

"অনেক কিছু। তোমাকে পরে বলব। তোমাকে এই মুহূর্তে নীলাকে স্কুল থেকে নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু তুমি নিজে যেতে পারবে না। বুঝেছ?"

"বুঝেছি। কিন্তু নিজে যেতে পারব না কেন?"

আবিদ হাসান শান্ত গলায় বললেন, "তোমাকে পরে বলব। নীলাকে স্কুল থেকে এনে তোমরা দুজন হোটেল সোনারগাঁওয়ে চলে যাবে। সেখানে একটা রুম ভাড়া করবে। রুম ভাড়া করবে জাহানারা বেগমের নামে—"

"জাহানারা বেগম? জাহানারা বেগম কে?"

"আমার মা। তুমি জান।"

"হ্যাঁ সেটা তো জানি, কিন্তু তার নামে কেন?"

"তা হলে আমার নামটা মনে থাকবে, তোমার সাথে আমি যোগাযোগ করতে পারব। সেজন্যে—"

মুনিরা হাসান কাঁপা গলায় বললেন, "কী হচ্ছে আবিদ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আমাকে তুমি ভয় দেখাচ্ছ কেন?"

"আমি তোমাকে সব বলব। শুধু জেনে রাখ আমি তোমাকে মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছি না। শুনে রাখ, তুমি কিছুতেই নীলাকে নিয়ে বাসায় যাবে না। কিছুতেই যাবে না। মনে থাকবে?"

"থাকবে।"

"হোটেল থেকে তোমরা বাইরে কাউকে ফোন করবে না। বুঝেছ?"

"বুঝেছি।"

"তোমার কাছে টাকা না থাকলে টাকা ম্যানেজ করে নাও। আর এই মুহূর্তে নীলাকে আনার ব্যবস্থা কর।"

মুনিরা হাসান টেলিফোনে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। ভাঙা গলায় বললেন, "তুমি কোথা থেকে কথা বলছ?"

আবিদ হাসান একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "সেটা তোমার শুনে কাজ নেই। যখন সময় হবে জানাব। আমি রাখছি। জেনে রাখ আমি ভালো আছি।"

মুনিরা আরো কিছু একটা বলতে চাচ্ছিলেন কিন্তু আবিদ হাসান তার আগেই টেলিফোনটা রেখে দিলেন, তার হাতে সময় খুব বেশি নেই। টেলিফোনের বিল দিয়ে আবিদ হাসান বের হয়ে এলেন। তাকে যে পেট ওয়ার্ল্ডের লোকেরা মেরে ফেলতে চেয়েছে সে ব্যাপারে তার কোনো সন্দেহ নেই। যার অর্থ টুইটির ব্যাপারে তার ধারণাটি সত্যি। টুইটি সাধারণ কোনো কুকুর নয়, এর মস্তিষ্কটি মানুষের মস্তিষ্ক দিয়ে পাল্টে দেওয়া হয়েছে। মানুষের মস্তিষ্কের আকার অনেক বড়, কুকুরের মাথায় সেটি আটানো সম্ভব নয়, কাজেই সম্ভবত পুরোটুকু নেওয়া হয় না। কিংবা কে জানে হয়তো মস্তিষ্কের টিস্যু লাগিয়ে দেওয়া হয়, যেন কুকুরটির মাঝে খানিকটা কুকুর এবং খানিকটা মানুষের বুদ্ধিমত্তা চলে আসে। আবিদ হাসানের হঠাৎ করে পেট ওয়ার্ল্ডের সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর কথা মনে পড়ল। কে জানে হয়তো সেখানে সেবা দেওয়ার নাম করে হতদরিদ্র মহিলাদের সন্তানদের নিয়ে নেওয়া হয়। পুরো ব্যাপারটাই একটি ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করার পুরো দায়িত্বটিই এখন আবিদ হাসানের—সেটি প্রকাশ করতে হলে সবচেয়ে প্রথম দরকার টুইটিকে। সবচেয়ে বড় প্রমাণই হচ্ছে টুইটি। কাজেই এখন তার টুইটিকে উদ্ধার করতে হবে। হাতে সময় নেই, টুইটিকে নিয়ে আসার জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার বাসায় ফিরে যেতে হবে।

আবিদ হাসান রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে একটা খালি স্কুটারকে থামালেন। স্কুটারে করে তিনি তার বাসার সামনে দিয়ে গিয়ে আবার ঘুরে এলেন। আশপাশে সন্দেহজনক কেউ দাঁড়িয়ে নেই। বাসার পিছনে একটি গেট রয়েছে যেটি কখনোই ব্যবহার হয় না, আবিদ হাসান তার কাছাকাছি এসে স্কুটার থেকে নেমে পড়লেন। স্কুটারটিকে দাঁড়া করিয়ে রেখে তিনি নেমে এলেন, পকেট থেকে চাবি বের করে তালা খুলে ভিতরে ঢুকে তিনি চাপা গলায় ডাকলেন, "টুইটি।"

প্রায় সাথে সাথেই টুইটি গাছের আড়াল থেকে তার কাছে ছুটে এসে তাকে ঘিরে আনন্দে লাফাতে শুরু করল। আবিদ হাসান দুই হাতে কুকুরটাকে তুলে নিয়ে নিচু গলায় বললেন, "টুইটি সোনা, চল এখান থেকে পালাই, এখন আমাদের খুব বিপদ।"

টুইটি কী বুঝল কে জানে কয়েকবার মাথা নেড়ে একটা চাপা শব্দ করল। স্কুটারে উঠে আবিদ হাসান বললেন, "রমনা থানায় চল।"

স্কুটার চলতে শুরু করতেই আবিদ হাসান চারদিকে তাকাতে লাগলেন, কেউ তার পিছু পিছু আসছে কি না সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া দরকার। চারপাশে অসংখ্য গাড়ি রিকশা স্কুটার ছুটে চলছে, তার মাঝে সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ল না। আবিদ হাসান একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন, কোনোভাবে থানার মাঝে ঢুকে পড়তে পারলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

থানার সামনে টুইটিকে নিয়ে নেমে আবিদ হাসান স্কুটারের ভাড়া মিটিয়ে দিলেন। তার হাতে কুকুরটি দেখে কয়েকজন পথচারী কৌতূহল নিয়ে তাকাল, একজন বলল, "কী সুন্দর কুকুর!"

"হ্যাঁ।" আবিদ হাসান মাথা নাড়লেন, "খুব সুন্দর।"

"বিদেশী কুকুর নাকি?"

"হ্যাঁ। এটার নাম আইরিশ টেরিয়ার।"

"একটু হাত দিয়ে দেখি? কামড় দেবে না তো?"

"না কামড় দেবে না। খুব শান্ত কুকুর।"

মানুষটি টুইটির মাথায় হাত বুলানোর জন্য এগিয়ে এল। ঠিক তখন আবিদ হাসান তার পিঠে একটা শক্ত ধাতব স্পর্শ অনুভব করলেন। শুনতে পেলেন কেউ তার কানের কাছে মুখ রেখে ফিসফিস করে ইংরেজিতে বলছে, "আমি একজন পেশাদার খুনি। তুমি একটু নড়লেই খুন হয়ে যাবে।"

আবিদ হাসান হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। মানুষটি আরো কাছে এসে বলল, "তোমার আর কোনো কিছু করার সুযোগ নেই, আমার কথা বিশ্বাস না করলে চেষ্টা করে দেখতে পার।"

আবিদ হাসান চেষ্টা করলেন না। যে মানুষটি টুইটির মাথায় হাত বুলিয়েছে সে কিছু একটা বলছে কিন্তু তিনি এখন কিছু বুঝতে পারছেন না। তার কানের কাছে মুখ রেখে মানুষটি ফিসফিস করে বলল, "আমি মনে মনে দশ পর্যন্ত গুনব, তার মাঝে তুমি সামনের গাড়িটাতে ওঠ। তুমি ইচ্ছা করলে নাও উঠতে পার—সত্যি কথা বলতে কী, আমি চাই তুমি না ওঠ। তা হলে তোমাকে আমি খুন করতে পারি। আমার জন্য সেটা খুব কম ঝামেলার।"

আবিদ হাসান নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। শুনতে পেলেন টুইটি একটা চাপা শব্দ করল। যে মানুষটি কুকুরের মাথায় হাত বুলিয়েছে সে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে। আরো দু-একজন মানুষ সুন্দর কুকুরটি দেখার জন্য ভিড় জমিয়েছে। তার মাঝে পিছনের মানুষটি হাতের অস্ত্রটি দিয়ে আবিদ হাসানকে একটা ধাক্কা দিয়ে ফিসফিস করে বলল, "আমি যেখানে রিভলবারটি ধরেছি সেখানে তোমার হৃৎপিণ্ড। কাজেই কী করবে ঠিক করে নাও।"

আবিদ হাসানের হাত কাঁপতে থাকে, মনে হতে থাকে তিনি হাঁটু ভেঙে পড়ে যাবেন। কিন্তু তিনি পড়ে গেলেন না। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মানুষটার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখার ইচ্ছেটাকে অনেক কষ্টে আটকে রেখে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার দেশ কোথায়?"

পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটি দীর্ঘশ্বাসের মতো একটা শব্দ করে বলল, "সামাজিক কথাবার্তা বলার জন্য তুমি সময়টা ভালো বেছে নাও নি। আমি গুনতে শুরু করছি। এক।"

আবিদ হাসানের মস্তিষ্ক হঠাৎ করে শীতল হয়ে আসে, পুরো পরিস্থিতিটুকু হঠাৎ করে তার কাছে স্পষ্ট হয়ে এল। পিছনের মানুষটির ইংরেজি উচ্চারণ যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলের। মানুষটি পেশাদার খুনি এবং সম্ভবত তাকে এখনই মেরে ফেলবে। আবিদ হাসান বুঝতে পারলেন এই মানুষটির কথা শোনা ছাড়া তার আর কিছুই করার নেই। তিনি একটা নিশ্বাস ফেললেন এবং পাঁচ পর্যন্ত গোনার আগেই টুইটিকে নিয়ে হেঁটে হেঁটে গাড়িতে উঠে বসলেন। পিছনের মানুষটি হেঁটে হেঁটে তার পাশে এসে বসল, আবিদ হাসান কৌতূহল নিয়ে মানুষটার দিকে তাকালেন। মানুষটি সুদর্শন, বাঙালির মতো হলেও বাঙালি নয়, মানুষটি সম্ভবত মেক্সিকান।

ড্রাইভার গাড়িটা ছেড়ে দিল। পাশে বসে থাকা মেক্সিকান মানুষটি একটি বড় রিভলবার তার কোলের উপর রেখে হাত বাড়িয়ে টুইটির মাথায় হাত বুলিয়ে ইংরেজিতে বলল, "এই কুকুরের জন্য আমাকে মানুষ মারতে হবে—এই কথাটা কে বিশ্বাস করবে বল?"

আবিদ হাসান মনে মনে বললেন, "কেউ না।"

৫

ডক্টর আজহার নরম গলায় বলল, "আমি খুবই দুঃখিত মিস্টার আবিদ হাসান আপনাকে এভাবে কষ্ট দেওয়ার জন্য।"

আবিদ হাসান স্থির চোখে ডক্টর আজহারের দিকে তাকালেন, লোকটির গলার স্বরে এক ধরনের আন্তরিকতা রয়েছে, অন্য যে কোনো সময় হলে তিনি হয়তো লোকটার কথা বিশ্বাস করতেন, কিন্তু এখন বিশ্বাস করার কোনো উপায় নেই। দুপুরবেলা দুজন মানুষ তাকে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র দিয়ে খুন করার চেষ্টা করেছে, রমনা থানার সামনে থেকে একজন মেক্সিকান পেশাদার খুনি তাকে ধরে এনেছে। এই মুহূর্তে একটা লোহার প্ল্যাটফর্মের দুইপাশে তার দুই হাত রেখে হাতকড়া পরিয়ে দিয়েছে। আবিদ হাসান মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে আছেন, দুই হাত আটকে থাকায় নড়াচড়া করতে পারছেন না। ভয় বা আতঙ্ক নয়, আবিদ হাসান নিজের ভিতরে এক ধরনের তীব্র অপমানবোধ অনুভব করছেন।

ডক্টর আজহার টেবিলের পাশে একটা গদিআঁটা চেয়ারে বসে পা দুলিয়ে বলল, "আমার হিসাবে একটা ভুল হয়ে গেছে। আপনাকে আমি আন্ডার এস্টিমেট করেছি। আপনার বুদ্ধিমত্তা সাধারণ মানুষ থেকে অনেক বেশি। এখন আপনাকে বলতে আমার কোনো দ্বিধা নেই, পেট ওয়ার্ল্ড সম্পর্কে আপনার প্রত্যেকটা ধারণা সত্যি।"

ডক্টর আজহার মাথা ঘুরিয়ে টুইটির দিকে তাকাল, ঘরের এক কোনায় সেটি শান্ত হয়ে বসে আছে। তার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, "আপনি ঠিকই অনুমান করছেন, এই যে কুকুরটা দেখছেন এটি আসলে একটি মানুষ। কুকুরের শরীরে আটকে পড়ে থাকা মানুষ।"

আবিদ হাসান ভেবেছিলেন কোনো কথা বলবেন না কিন্তু শেষ পর্যন্ত কৌতূহলের কাছে হার মানলেন, মাথা তুলে জিজ্ঞেস করলেন, "একটা কুকুরের মস্তিষ্কের সাইজ টেনিস বলের মতো। মানুষের মস্তিষ্ক তো অনেক বড়।"

"হ্যাঁ।" ডক্টর আজহার মাথা নাড়ল। বলল, "সে জন্য আমরা মস্তিষ্ক ট্রান্সপ্লান্ট করি ফিটাস থেকে, ভ্রূণ থেকে।"

আবিদ হাসান শিউরে উঠলেন। কোনোমতে একটা নিশ্বাস বুক থেকে বের করে দিয়ে বললেন, "আপনাদের সেবা প্রতিষ্ঠানগুলো ভাঁওতাবাজি।"

"বলতে পারেন। আমরা অবশ্য ছোটখাটো মেডিক্যাল হেল্প দিই। যখন একটা বাচ্চার ভ্রূণ দরকার হয় কোনো একটা প্রেগন্যান্ট মহিলা থেকে নিয়ে নিই। তারা অবশ্য জানে না, তাদেরকে বলা হয় কোনো কারণে মিস-ক্যারেজ হয়েছে। আমাদের ডাক্তারেরা মাদের উল্টো বকাবকি করে অনিয়ম করার জন্য।" ডক্টর আজহার কথা শেষ করে হা হা করে হাসতে শুরু করল।

আবিদ হাসান স্থির চোখে ডক্টর আজহারের চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনার ভিতরে এ নিয়ে কখনো কোনো অপরাধবোধ জন্মায় না?"

"অপরাধবোধ?" ডক্টর আজহার আবার শব্দ করে হেসে উঠল, "নাগাসাকি আর হিরোশিমাতে যারা নিউক্লিয়ার বোমা ফেলেছিল তাদের কি অপরাধবোধ হয়েছিল? আলেকজান্ডার দি গ্রেটের কি অপরাধবোধ হয়েছিল? হয় নি। হওয়ার কথা নয়। একটা বড় কিছু করার জন্য অনেক ছোট ত্যাগ করতে হয়। এই দেশকে অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য আমাদের দেশের কিছু মানুষের এই ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। একদিন যখন আমাদের এই প্রজেক্ট দেশের অর্থনীতির ভিত তৈরি করে দেবে—"

আবিদ হাসান বাধা দিয়ে বললেন, "যথেষ্ট হয়েছে। আমি আর শুনতে চাই না।"

ডক্টর আজহার প্রথমবার একটু রেগে উঠল, বলল, "কেন শুনতে চান না?"

"কারণ উন্মাদের প্রলাপ অন্য উন্মাদেরা শুনুক। আমার শোনার প্রয়োজন নেই।"

ডক্টর আজহার খানিকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে আবিদ হাসানের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর মাথা এগিয়ে এনে কঠিন গলায় বলল, "আমাদের এই প্রজেক্টে কত ডলার ইনভেস্ট করা হয়েছে আপনি জানেন?"

"না। আমার জানার প্রয়োজন নেই। ইচ্ছেও নেই।"

"তবু আপনাকে শুনতে হবে। সাড়ে তিন বিলিয়ন ডলার। আপনি জানেন বিলিয়ন ডলার মানে কত? এক হাজার মিলিয়ন হচ্ছে এক বিলিয়ন। আর মিলিয়ন কত জানেন? এক হাজার—"

"আমার জানার প্রয়োজন নেই।"

"আছে। কেন আছে জানেন?"

"কেন?"

"কারণ সারা পৃথিবীর মাঝে শুধু আপনাকে আমি এই তথ্য দিতে পারি। একটি প্রাণীর দেহে অন্য প্রাণীর টিস্যুকে বাঁচিয়ে রাখার টেকনিক আমরা দাঁড়া করিয়েছি। এন্টি-রিজেকশান ড্রাগের পেটেন্ট আমাদের। এখানে ব্রেন-ট্রান্সপ্লান্টের অপারেশন করে রোবট সার্জন। সেই রোবট সার্জন দাঁড়া করতে আমাদের কত খরচ হয়েছে জানেন? সেই সফটওয়্যার দাঁড়া করতে আমাদের কত দিন লেগেছে জানেন?"

আবিদ হাসান মাথা নেড়ে বললেন, "আমি জানতে চাই না।"

ডক্টর আজহার চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল, "জানতে হবে। কারণ শুধু আপনিই এটা জানতে পারবেন। শুধু আপনাকেই আমি বলতে পারব।"

আবিদ হাসান প্রথমবার এক ধরনের আতঙ্ক অনুভব করলেন, কেন শুধুমাত্র তাকে বলতে পারবে সেটি অনুমান করা খুব কঠিন নয়। কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "আমাকে মেরে ফেলা হবে বলে?"

"না। আমি অপচয় বিশ্বাস করি না। শুধু শুধু আপনাকে মেরে কী হবে?"

"তা হলে?"

AMARBOI.COM

"আপনাকে আমরা ব্যবহার করব।"

"ব্যবহার?"

"হ্যাঁ। আমাদের কাছে বিশাল একটা কুকুর এসেছে। গ্রেট ডেন। চমৎকার কুকুর, তার মস্তিষ্ক ট্রান্সপ্লান্ট করব আপনার মস্তিষ্ক দিয়ে। আপনার বিশাল মস্তিষ্কের পুরোটা নিতে পারব না—যেটুকু পারি সেটুকু নেব।" ডক্টর আজহার মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "আইডিয়াটি কেমন?"

আবিদ হাসান অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে ডক্টর আজহারের দিকে তাকিয়ে রইল, ডক্টর আজহার মাথা নেড়ে বলল, আপনার এত চমৎকার একটি মস্তিষ্ক সেটা অপচয় করা কি ঠিক হবে? কী বলেন?"

আবিদ হাসান দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন, "তুমি জাহান্নামে যাও—দানব কোথাকার।"

ডক্টর আজহার জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করে বলল, "রাগ হচ্ছেন কেন মিস্টার আবিদ হাসান? আমি পরীক্ষা করে দেখতে চাই, আপনার স্মৃতির কতটুকু অবশিষ্ট থাকে।"

আবিদ হাসান চিৎকার করে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল ঠিক তখন টুইটি একটা চাপা শব্দ করল, সামনের দুই পায়ের মাঝে মাথা চেপে রেখে থরথর করতে লাগল। দেখে মনে হল সারা শরীরে এক ধরনের খিঁচুনি শুরু হয়েছে। ডক্টর আজহার টুইটির কাছে এগিয়ে গেল, চোখের পাতা টেনে কিছু একটা দেখে মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়াল, খানিকটা হতাশ ভঙ্গিতে বলল, "এখনো হল না। কুকুরটা তার মস্তিষ্ককে রিজেক্ট করতে শুরু করেছে। আমাদের এন্টি-রিজেকশান ড্রাগকে আরো নিখুঁত করতে হবে।"

ডক্টর আজহার পা দিয়ে টুইটিকে উল্টে দিয়ে লম্বা পা ফেলে টেবিলটার কাছে এগিয়ে এল। পকেট থেকে কাগজপত্র এবং চাবি টেবিলের ওপর রেখে অনেকটা আপন মনে বলল, "আপনি মন খারাপ করবেন না মিস্টার আবিদ হাসান। ঘুমের একটা ইনজেকশন দিয়ে দেব, আপনি কিছু বুঝতেও পারবেন না। আপনার ঘুমন্ত দেহ ট্রেতে তুলে দেব, ব্যস আমাদের আর কোনো দায়িত্ব নেই।"

আবিদ হাসান কোনো কথা বললেন না, হিংস্র চোখে ডক্টর আজহারের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ডক্টর আজহার ঘর থেকে বের হতে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল, "একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন? আপনার সাথে কিন্তু আমার বেশ মিল রয়েছে। আমার প্রায় সমবয়সী, দেখতেও অনেকটা একরকম। আমাদের বুদ্ধিমত্তাও মনে হয় কাছাকাছি। কিন্তু আপনার ক্ষমতা আমার ধারে কাছে নয়। আপনি চিন্তাও করতে পারবেন না টাকা দিয়ে কত কী করা যায়।"

ডক্টর আজহার তার গলায় ঝোলানো কার্ড দিয়ে দরজা খুলে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

আবিদ হাসান বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন—তার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না কিছুক্ষণের মাঝেই তার মস্তিষ্ককে একটা বিশাল গ্রেট ডেনের মাথায় বসিয়ে দেওয়া হবে। এটি কি সত্যিই ঘটছে নাকি এটা একটা দুঃস্বপ্ন? ভয়ঙ্কর একটা দুঃস্বপ্ন?

আবিদ হাসান তাঁর হাতের দিকে তাকালেন, দুই হাতে হাতকড়া দিয়ে প্লাটফর্মের সাথে আটকে রাখা, কংক্রিটের দেয়াল, উপরে এয়ার কুলারের ভেন্ট, স্টিলের দরজা উপরে ইলেকট্রনিক নিরাপত্তাসূচক নম্বর, একটু দূরে টুইটির কুঁকড়ে থাকা শরীর সবকিছু একটা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মতো, কিন্তু সেটি দুঃস্বপ্ন নয়। আবিদ হাসান প্রাণপণ চেষ্টা করলেন নিজেকে শান্ত রাখার কিন্তু এবারে অনেক কষ্ট করেও নিজেকে শান্ত করতে পারলেন না। শুধু তার মনে হতে লাগল ভয়ঙ্কর একটা চিৎকার করে ধাতব প্লাটফর্মটিতে মাথা কুটতে শুরু করবেন।

কুকুরের একটি চাপা শব্দ শুনে আবিদ হাসান মাথা ঘুরিয়ে তাকালেন। টুইটি আবার উঠে বসেছে, দুই পায়ের মাঝখানে মাথা রেখে ভীত চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। আবিদ হাসান হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠলেন, টুইটি কি তাকে সাহায্য করতে পারবে না?

আবিদ হাসান সোজা হয়ে বসে টুইটিকে ডাকলেন, "টুইটি।"

টুইটি মাথা তুলে আবিদ হাসানের দিকে তাকাল। আবিদ হাসান চাপা গলায় বললেন, "তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ?"

টুইটি কষ্ট করে তার মাথা নাড়ল, সে বুঝতে পারছে। আবিদ হাসান উত্তেজিত গলায় বললেন, "তা হলে তুমি আমাকে সাহায্য কর। ঠিক আছে?"

টুইটি ক্লান্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নেড়ে আবিদ হাসানের দিকে তাকাল।

"ভেরি গুড টুইটি। চমৎকার। তুমি টেবিলের উপর ওঠ। সেখান থেকে মুখে করে চাবিটা নিয়ে আসবে আমার কাছে। বুঝেছ?"

টুইটি না–সূচকভাবে মাথা নাড়ল, সে ঠিক বুঝতে পারছে না। আবিদ হাসান একটু অধৈর্য হয়ে বললেন, "না বুঝলেও ক্ষতি নেই, আমি তোমাকে সাহায্য করব। যাও তুমি টেবিলের উপর ওঠ।"

টুইটি নিজেকে টেনে টেনে নিতে থাকে, প্রথমে চেয়ার তারপর সেখান থেকে কষ্ট করে টেবিলের উপর উঠল। আবিদ হাসান উত্তেজনা চেপে রেখে বললেন, "এখন ডান দিকে যাও।"

টুইটি অনিশ্চিতের মতো দাঁড়িয়ে রইল তারপর ডানদিকে এগিয়ে গেল। আবিদ হাসান বললেন, "ঐ যে চকচকে জিনিসটা সেটা চাবি। মুখে তুলে নাও।"

টুইটি একটা কলম মুখে তুলে নিল। আবিদ হাসান মাথা নেড়ে বললেন, "না। না। এটা চাবি না, এটা কলম। চাবিটা আরো সামনে।"

টুইটি কলমটা রেখে প্রথমে একটা পেন্সিল, তারপর একটা নোট বই এবং সবশেষে চাবিটা তুলে নিল। আবিদ হাসান চাপা আনন্দের স্বরে বললেন, "ভেরি গুড টুইটি! ভেরি ভেরি গুড! এভাবে চাবিটা নিয়ে এস আমার কাছে।"

টুইটি চাবিটা মুখে নিয়ে টেবিল থেকে নেমে আবিদ হাসানের কাছে এগিয়ে এল। আবিদ হাসান চাবিটা হাতে নিয়ে হাতকড়াটা খোলার চেষ্টা করলেন। কোথায় চাবি দিয়ে খুলতে হয় বুঝতে একটু সময় লাগল, একবার বুঝে নেবার পর খুট করে হাতকড়াটা খুলে যায়। উত্তেজনায় আবিদ হাসানের বুক ঠক ঠক করতে থাকে, সত্যি সত্যি তিনি এখান থেকে বেঁচে যেতে পারবেন কি না তিনি এখনো জানেন না, কিন্তু একবার যে শেষ চেষ্টা করে দেখবেন সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আবিদ হাসান টুইটিকে বুকে চেপে ধরে একবার আদর করলেন, তারপর যেখানে শুয়ে ছিল সেখানে শুইয়ে রেখে বললেন, "তুমি এখান থেকে নড়বে না। ঠিক আছে?"

টুইটি মাথা নেড়ে আবার দুই পায়ের মাঝখানে মাথাটা রেখে চোখ বন্ধ করল। কুকুরটি মনে হয় আর বেশিক্ষণ বেঁচে থাকবে না।

আবিদ হাসান এবারে ঘরটা ঘুরে দেখলেন, একটা লোহার রড বা শক্ত কিছু খুঁজছিলেন, টেবিলের নিচে সেরকম একটা কিছু পেয়ে গেলেন। এটা দিয়ে জোরে মাথায় আঘাত করতে পারলে একজন মানুষকে ধরাশায়ী করা খুব কঠিন হবে না। আবিদ হাসান রডটা নিয়ে তার আগের জায়গায় ফিরে এলেন। হাতকড়াটা হাতের ওপর আলতো করে রেখে প্লাটফর্মের

কাছে বসে রইলেন। ডক্টর আজহার ফিরে এলে একবারও সন্দেহ করতে পারবে না যে তিনি আসলে এখন নিজেকে মুক্ত করে রেখেছেন।

ডক্টর আজহার ফিরে এল বেশ অনেকক্ষণ পর। তার গলায় ঝুলানো কার্ডটি দিয়ে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে বেশ সহৃদয় ভঙ্গিতে বলল, "মিস্টার আবিদ হাসান, একটু দেরি হয়ে গেল। কেন জানেন?"

আবিদ হাসান কোনো কথা বললেন না, ডক্টর আজহার সেটা নিয়ে কিছু মনে করল না, হাসি মুখে বলল, "এই পেট ওয়ার্ডে সব মিলিয়ে আমরা চার-পাঁচজন মানুষ প্রকৃত ব্যাপারটি জানি। অন্যেরা সবাই জানে এটি হান্ড্রেড পার্সেন্ট খাঁটি বিজনেস! কাজেই যখনি বেআইনি কিছু করতে হয় পুরো দায়িত্বটি এসে পড়ে আমাদের ওপর! আমি ছাড়া অন্য সবাই আসলে সিকিউরিটির মানুষ নতুবা যন্ত্র! কাজেই সবকিছুই আমাকে করতে হয়। বুঝেছেন?"

ডক্টর আজহার টেবিলে একটা কাচের এম্পুল রেখে সেখানে একটা সিরিঞ্জ দিয়ে ওষুধ টেনে নিতে নিতে বলল, "আপনাকে একটা ঘুমের ওষুধ দিয়ে অজ্ঞান করে নিতে হবে, তারপর ঐ কনভেয়ার বেল্টে আপনাকে উপুড় করে শুইয়ে দিতে হবে। ব্যস, তারপর আমার দায়িত্ব শেষ। কাল সকালে আপনি যখন ঘুম থেকে উঠবেন আপনি আবিষ্কার করবেন যে আপনি একটা বিশাল কুকুরের দেহে আটকা পড়ে আছেন।" ডক্টর আজহার আনন্দে হা হা করে হেসে উঠল।

ডক্টর আজহার সিরিঞ্জটা নিয়ে খুব সহজ ভঙ্গিতে আবিদ হাসানের দিকে এগিয়ে এল। মানুষটি কোনো কিছু সন্দেহ করে নি। আবিদ হাসানের বুকের ভিতর ধক্‌ধক্ করে শব্দ করতে থাকে—তিনি একটি মাত্র সুযোগ পাবেন, সেই সুযোগটি কি তিনি ব্যবহার করতে পারবেন? জীবনে কখনো কোনো মানুষকে আঘাত করেন নি, কীভাবে কোথায় কখন আঘাত করতে হয় সে সম্পর্কেও কোনো ধারণা নেই। কোথায় জানি দেখেছিলেন মাথার পিছনে আঘাত করলে মানুষ অচেতন হয়ে পড়ে। তিনি কি পারবেন সেখানে আঘাত করতে? আবিদ হাসান নিশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করতে থাকেন।

ডক্টর আজহার আরেকটু কাছে এগিয়ে এল, সিরিঞ্জটা উপরে তুলে সুচের দিকে তাকিয়েছে, এক মুহূর্তের জন্য তার ওপর থেকে চোখ সরিয়েছে, সাথে সাথে আবিদ হাসান হাত মুক্ত করে লোহার রডটা তুলে নিলেন। ডক্টর আজহার হতচকিত হয়ে আবিদ হাসানের দিকে তাকাল এবং কিছু বোঝার আগেই আবিদ হাসান তার সমস্ত শক্তি দিয়ে ডক্টর আজহারের মাথায় আঘাত করলেন। আত্মরক্ষার জন্য ডক্টর আজহার মাথাটা সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল কিন্তু কোনো লাভ হল না, প্রচণ্ড আঘাতে আর্তচিৎকার করে সে নিচে পড়ে গেল।

আবিদ হাসান দুই হাতে রডটি ধরে আরো কাছে এগিয়ে গেলেন, ডক্টর আজহার ওঠার চেষ্টা করলে আবার আঘাত করবেন, কিন্তু মানুষটার ওঠার ক্ষমতা আছে বলে মনে হল না। হাত থেকে সিরিঞ্জটা ছিটকে পড়েছে, আবিদ হাসান সেটি তুলে নিয়ে আসেন। মানুষকে তিনি কখনো ইনজেকশান দেন নি কিন্তু সেটি নিয়ে এখন ভাবনা-চিন্তা করার সময় নেই। সিরিঞ্জের সুচটা আজহারের হাতে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে ওষুধটা তার শরীরে ঢুকিয়ে দিলেন, দেখতে দেখতে ডক্টর আজহার নেতিয়ে পড়ল।

আবিদ হাসান বুক থেকে একটা নিশ্বাস বের করে দিলেন, পরিকল্পনার প্রথম অংশটুকু চমৎকারভাবে কাজ করেছে। এখন দ্বিতীয় অংশটুকু—এখান থেকে বের হয়ে যাওয়া। আবিদ হাসান ডক্টর আজহারের গলায় ঝোলানো ব্যাজটা খুলে নিলেন—এটা ব্যবহার করে এই ঘর থেকে বের হওয়া যাবে।

ব্যাজে এক ধরনের ম্যাগনেটিক কোডিং রয়েছে সেটার সাহায্যে নিশ্চয়ই সব দরজা খুলে এই বিল্ডিং থেকে বের হওয়া যাবে কিন্তু তবু তিনি কোনো ঝুঁকি নিলেন না। ডক্টর আজহারের জ্যাকেটটা খুলে নিজে পরে নিলেন। দুজনের শরীরের কাঠামো মোটামুটি একরকম, হঠাৎ দেখলে বুঝতে পারবে না। সময় নষ্ট করে লাভ নেই, যত তাড়াতাড়ি এখান থেকে বের হওয়া যায়।

টুইটির কাছে গিয়ে আবিষ্কার করলেন সেটি নিথর হয়ে পড়ে আছে, বেঁচে আছে কি নেই বোঝার উপায় নেই। একটা নিশ্বাস ফেলে মাথায় হাত বুলিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, টুইটিকে বাঁচানোর ক্ষমতা তার নেই। সবচেয়ে বড় কথা টুইটির জন্যে বেঁচে না থাকাই সম্ভবত বেশি মানবিক। আবিদ হাসান টেবিলের পাশে একটা এটাচি কেস আবিষ্কার করলেন। সম্ভবত ডক্টর আজহারের। ভিতরে নানা ধরনের কাগজপত্র, আবিদ হাসান এটাচি কেসটি হাতে তুলে নিলেন—এখানকার কিছু প্রমাণ বাইরে নিয়ে যাওয়া দরকার।

দরজায় ব্যাজটি প্রবেশ করাতেই সেটি শব্দ করে খুলে গেল। বাইরে বড় করিডোর, উপরে পর্যবেক্ষণ ক্যামেরা পরীক্ষা করছে, আবিদ হাসান সহজ ভঙ্গি করে হেঁটে যেতে শুরু করলেন। করিডোরের শেষ মাথায় আরেকটি দরজা। সেখানে ব্যাজটি প্রবেশ করাতেই একটা কর্কশ শব্দ শোনা গেল এবং সাথে সাথে তিনি একজন মানুষের গলায় স্বর শুনতে পেলেন, মানুষটি ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, "ডক্টর ট্রিপল-এ তুমি চলে যাচ্ছ কেন?"

আবিদ হাসানের হৃৎপিণ্ড প্রায় থমকে দাঁড়াল, অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করলেন। ডক্টর আজহারের ব্যাজ ব্যবহার করে বের হয়ে যাচ্ছেন বলে তাকে ডক্টর আজহার ভাবছে। সম্ভবত এই মুহূর্তে তাকে দেখতেও পাচ্ছে। আবিদ হাসান যথাসম্ভব মাথা নিচু করে বললেন, "শরীর ভালো লাগছে না।"

"যে লোকটাকে ধরে এনেছি তার কী অবস্থা?"

"ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি।"

"গুড। ট্রান্সপ্লান্টের জন্য রেডি?"

আবিদ হাসান কী বলবেন বুঝতে পারলেন না, অস্পষ্ট এক ধরনের শব্দ করলেন, "হুস।"

"কনভেয়ার বেল্টে তুলেছ?"

"না।"

"ঠিক আছে দুশ্চিন্তা কোরো না, আমরা তুলে নেব।"

"থ্যাংকস।"

আবিদ হাসান চলে যাচ্ছিলেন তখন আবার সিকিউরিটির মানুষটির গলায় স্বর শুনতে পারলেন, "ডক্টর ট্রিপল-এ—"

"হুঁ।"

"তোমার গলার স্বর একেবারে অন্যরকম শোনাচ্ছে।" আবিদ হাসান ভিতরে ভিতরে চমকে উঠলেও কষ্ট করে নিজেকে শান্ত রাখলেন, বললেন, "তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। কী ব্যাপার?"

"জানি না। হয়তো ফ্লু। দুপুর থেকেই গলাটা খুশখুশ করছে।"

"ও। যাও গিয়ে বিশ্রাম নাও।"

আবিদ হাসান বুকের ভিতর থেকে একটা নিশ্বাস বের করে সাবধানে হেঁটে যেতে শুরু করলেন। সামনে আরো একটা দরজা, ব্যাজ ব্যবহার করে সেটা খুলে বের হয়ে এলেন।

AMARBOI.COM

দরজার ওপরে ইংরেজিতে বড় বড় করে লেখা, "কঠোর নিরাপত্তা অঞ্চল। শুধুমাত্র অনুমোদিত মানুষের জন্য।"

সামনে একটা লিফট, লিফটের বোতাম স্পর্শ করতেই নিঃশব্দে দরজা খুলে গেল। আবিদ হাসান ভিতরে ঢুকলেন। পেট ওয়ার্ডের গোপন এলাকা থেকে তিনি বাইরে চলে এসেছেন। এখানকার মানুষজন সাধারণ মানুষ, এই ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের কিছু জানে না। আবিদ হাসান ডক্টর আজহারের ব্যাজটি পকেটে ঢুকিয়ে নিলেন, সম্ভবত এই ব্যাজটির আর প্রয়োজন নেই।

নিচে দরজার কাছে বড় টেবিলে জেরিনকে বসে থাকতে দেখা গেল। আবিদ হাসানকে দেখে অবাক হয়ে বলল, "আপনি?"

"হ্যাঁ।"

"কখন এলেন?"

"এসেছি দুপুরবেলা। ডক্টর আজহার নিয়ে এসেছেন।"

"ও। সবকিছু ঠিক আছে তো?"

আবিদ হাসান জেরিন নামের মেয়েটির চোখের দিকে তাকালেন, সেখানে কোনো ধরনের জটিলতা নেই, সপ্রশ্ন চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। আবিদ হাসান তাকে বিশ্বাস করবেন বলে ঠিক করলেন। বললেন, "না, সবকিছু ঠিক নেই।"

মেয়েটি চমকে উঠে বলল, "কী হয়েছে?"

"আপনি যদি আমার সাথে আসেন আপনাকে বলতে পারি।"

"জেরিন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, "কিন্তু এখন আমার ডিউটি—"

আবিদ হাসান বাধা দিয়ে বললেন, "আপনাকে আমি বলতে পারি আমি আপনাকে যে কথাটি বলব সেটি হবে আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় ডিউটি।"

জেরিন আবিদ হাসানের দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত কী যেন ভাবল, তারপর বলল, "ঠিক আছে চলুন।"

দুই মিনিট পর জেরিনের গাড়িতে বসে আবিদ হাসান বের হয়ে এলেন, গাড়িটি রমনা থানার দিকে যেতে থাকে।

AMARBOI.COM

৬

ডক্টর আজহারের এটাচি কেসে যে কাগজপত্র ছিল সেটি থেকে শেষ পর্যন্ত স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে পেট ওয়ার্ডের ষড়যন্ত্রের কথা বোঝানো সম্ভব হয়েছিল। প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করে দিতে আরো কয়েক মাস সময় লেগেছে। পুরো ব্যাপারটিতে অস্বাভাবিক গোপনীয়তা রাখা হয়েছে, খবরের কাগজে কিছু ছাপা হয় নি। তার সঠিক কারণটি আবিদ হাসানের জানা নেই, তাকে সরকারের একেবারে সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে অনুরোধ করা হয়েছিল, তিনি সেই অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন।

ঠিক কী কারণে টুইটি হঠাৎ করে অদৃশ্য হয়ে গেল এবং কেন তাকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না সেই ব্যাপারটি নীলা অবশ্য কিছুতেই বুঝতে পারল না। বড় মানুষেরা মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং অর্থহীন কাজ করে বসে থাকে ; এটাও সেরকম কিছু একটা কাজ— এভাবেই সে ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করল। মাঝে মাঝেই তার টুইটির জন্য খুব মন খারাপ হয়ে যেত।

আবিদ হাসান ব্যাপারটি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন। বছর দুয়েক পর হঠাৎ করে আবার সেটি মনে পড়ল পত্রিকায় সার্কাসের বিজ্ঞাপন দেখে। সার্কাসের পশুপাখির নানা ধরনের খেলাধুলার মাঝে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ "বুদ্ধিমান কুকুরের কলাকৌশল।" একটি গ্রেট ডেন কুকুর নাকি মানুষের মতো সংখ্যা যোগ-বিয়োগ করতে পারে।

আবিদ হাসান তার মেয়েকে নিয়ে সার্কাস দেখতে গিয়েছিলেন। সত্যি সত্যি বিশাল একটি গ্রেট ডেন কুকুর সংখ্যা যোগ–বিয়োগ করে দেখাল, ইংরেজি নির্দেশ পড়ে সেই নির্দেশ মোতাবেক কিছু কাজকর্ম করল। সার্কাস শেষ হলে আবিদ হাসান কুকুরটিকে দেখতে গিয়েছিলেন। বড় একটি লোহার খাঁচায় আটকে রাখা ছিল, আবিদ হাসানকে দেখে হঠাৎ করে ভয়ঙ্কর খেপে গিয়ে সেটা খাঁচার মাঝে লাফ–ঝাঁপ দিতে শুরু করে। কুকুরের ট্রেইনার অবাক হয়ে বলল, "কী আশ্চর্য! এটি খুব শান্ত কুকুর, আপনাকে দেখে এভাবে খেপে গেল কেন?"

"আমি জানি না।"

"আপনি কি কিছু বলেছেন? এই ব্যাটা আবার মানুষের কথা বুঝতে পারে।"

"হ্যাঁ। বলেছি।"

"কী বলেছেন?"

"বলেছি, কী খবর 'ডক্টর ট্রিপল–এ'?"

কথাটি একটি রসিকতা মনে করে ট্রেইনারটি হা হা করে হাসতে শুরু করল।

AMARBOI.COM

দ্বিতীয় জীবন

কয়েসের পিঠে একটা লাথি দিয়ে ছায়ামূর্তিটি বলল "ওঠ। শালা বেজন্মা কোথাকার।" কয়েস উবু হয়ে অন্ধকার ঘরের কোনায় বসে ছিল। তার দুই হাত পিছনে শক্ত করে বাঁধা। কব্জিতে না বেঁধে কনুইয়ের কাছে বেঁধেছে। সস্তা নাইলনের দড়ি, চামড়া কেটে বসে যাচ্ছে। লাথি খেয়ে সে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল, মানুষের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য হাত দুটোর খুব প্রয়োজন, হাত বাঁধা থাকায় সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল, কোনোমতে তাল সামলে সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। পিছন থেকে তাকে একটা ধাক্কা দিয়ে ছায়ামূর্তিটি বলল, "চল।"

কয়েস শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করল, "কোথায়?"

মানুষটি পিছন থেকে অত্যন্ত রূঢ় গলায় বলল, "তোর শ্বশুরবাড়িতে—হারামজাদা বাঞ্চত কোথাকার।"

কয়েস কোনো কথা না বলে অন্ধকারে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটি আবার একটা ধাক্কা দিতেই সে হাঁটতে শুরু করে। বাইরে নির্জন অন্ধকার রাত। হেমন্তের হালকা কুয়াশা চারদিকে এক ধরনের অস্পষ্ট আবরণের মতো ঝুলে আছে। কৃষ্ণপক্ষের রাত, অনেক দেরি করে চাঁদ উঠেছে, জ্যোৎস্নার নরম আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কয়েস চোখ তুলে তাকাল—দৃশ্যটি সম্ভবত সুন্দর কিন্তু সেটা সে বুঝতে

পারছে না। সুন্দর জিনিস অনুভব করার জন্য যে রকম মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন সেটি তার নেই।

কয়েস হাঁটতে হাঁটতে পিছনের মানুষটিকে বলল, "আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি?"

পিছনের মানুষটি খেঁকিয়ে উঠে বলল, "চুপ কর শালা। কথা বলবি না।"

"মাত্র একটা কথা।"

মানুষটি ধমক দিয়ে বলল, "চুপ।"

কয়েস চুপ করে শীতের হিম কুয়াশায় আরো কিছুক্ষণ হেঁটে যায়, তারপর প্রায় মরিয়া হয়ে আরো একবার কথা বলতে চেষ্টা করে, "ভাই, আপনাকে শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করি? একটা কথা।"

পিছনের মানুষটা কোনো কথা বলল না। কয়েস আবার অনুনয় করে বলল, "করি?"

"কী কথা?"

"আমাকে কী করবেন?"

পিছনের মানুষটা কোনো কথা না বলে হঠাৎ হা হা করে হেসে উঠল। কয়েস আবার জিজ্ঞেস করল, "কী করবেন?"

"রং করিস আমার সাথে? শালা তুই বুঝিস নাই কী করব?"

কয়েস কোনো উত্তর দিল না, সে বুঝতে পারছে কিন্তু বিশ্বাস করতে চাইছে না। নিজের কানে একবার শুনতে চাইছে। সে আরো কয়েক পা নিঃশব্দে হেঁটে গিয়ে বলল, "কী করবেন?"

মানুষটি হঠাৎ রেগে গেল, রেগে চাপা গলায় চিৎকার করে বলল, "শুনবি কী করব তোকে? শুনবি? শোন তা হলে। তোকে নিয়ে নদীর ঘাটে দাঁড় করিয়ে মাথার মাঝে একটা গুলি করব। বুঝেছিস?"

কয়েসের সারা শরীর অবশ হয়ে ওঠে, হঠাৎ করে তার মনে হয় সে বুঝি হাঁটু ভেঙে পড়ে যাবে। কষ্ট করে সে দুই পায়ের উপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে টেনে যন্ত্রের মতো হেঁটে যেতে থাকে। আরো কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে কয়েস নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, "আমাকে কেন গুলি করবেন? আমি কী করেছি?"

"তুই কী করেছিস আমার সেটা জানার কথা না। আমাকে বলছে তোর লাশ ফেলতে, আমি তোর লাশ ফেলব।"

"কিন্তু আপনার খারাপ লাগবে না?"

"খারাপ?" পিছনের মানুষটা হঠাৎ যেন খুব অবাক হয়ে গেল, "খারাপ কেন লাগবে?"

"কারণ, আমি মানুষটা হয়তো খারাপ না। হয়তো আমি ভালো মানুষ। নির্দোষ মানুষ—"

পিছনের মানুষটা আবার শব্দ করে হেসে উঠল। বলল, "তুই ভালো না খারাপ, দোষী না নির্দোষ, তাতে আমার কী আসে-যায়? আমাকে একটা কাজ দিয়েছে সেই কাজ করছি।"

"কেন করছেন?"

পিছনের মানুষটা হঠাৎ ধৈর্য হারিয়ে খেঁকিয়ে উঠল, "চুপ কর হারামজাদা। বকর বকর করিস না।"

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে কয়েস আবার জিজ্ঞেস করল, "আপনার নাম কী?"

পিছনের মানুষটা কয়েসের প্রশ্ন শুনে এত অবাক হল যে, রাগ হতে ভুলে গিয়ে হকচকিয়ে বলল, "কী বললি?"

"আপনার নাম?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমার নাম দিয়ে তুই কী করবি?"

"এমনি জানতে চাই।"

"জেনে কী করবি?"

"কিছু করব না। জানতে ইচ্ছে করছে।" কয়েস অনুনয় করে বলল, "বলবেন?"

কয়েস ভেবেছিল মানুষটি তার নাম বলবে না, কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে মানুষটা উত্তর দিল, বলল, "মাজহার।"

কয়েস নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, "এইটা কি আপনার সত্যি নাম?"

মাজহার পিছন থেকে কয়েসকে রূঢ়ভাবে ধাক্কা দিয়ে বলল, "সেই কৈফিয়ত আমার তোকে দিতে হবে নাকি?"

কয়েস ধাক্কা সহ্য করে নরম গলায় বলল, "রাগ করবেন না মাজহার ভাই। আসলে এইটা আপনার সত্যি নাম না হলেও কোনো ক্ষতি নেই। কথা বলার জন্য একটা নাম লাগে, সেই জন্যে। এ ছাড়া আর কিছু না।"

"তোকে কথা বলতে বলেছে কে?"

"কেউ বলে নাই।"

"তা হলে?"

"তবু কথা বলতে ইচ্ছা করছে। কিছু মনে নিবেন না মাজহার সাহেব।"

কয়েস তার পিছনে দাঁড়ানো মানুষটিকে একবারও দেখে নি, মানুষটি দেখতে কী রকম সে সম্পর্কে তার কোনো ধারণা নেই। পায়ের শব্দ এবং মাঝে মাঝে কাপড়ের খসখস শব্দ শুনতে পাচ্ছে। হঠাৎ করে মানুষটিকে দেখতে ইচ্ছে হল কয়েসের। হাঁটতে হাঁটতে মাথা ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করল সে, সাথে সাথে মাজহার নাইলনের দড়ির বাড়তি অংশটুকু দিয়ে শপাং করে তার মুখে মেরে বসে। যন্ত্রণায় কাতর একটা শব্দ করল কয়েস, মাজহার হিস হিস করে বলল, "খবরদার পিছনে মাথা ঘুরাবি না। খবরদার।"

কয়েস মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিক আছে আর ঘুরাব না। আর ঘুরাব না।"

দুইজন আবার চুপচাপ খানিকক্ষণ হেঁটে যায়। নির্জন রাস্তায় শুকনো পাতায় পায়ের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। দূরে কোথাও ঝিঁঝি পোকা ডাকছে। অনেক দূরে কোথাও একটি কুকুর ডাকল, হঠাৎ করে পুরো ব্যাপারটিকে কয়েসের কাছে কেমন জানি অতিপ্রাকৃত বলে মনে হতে থাকে। সে নিচু গলায় বলল, "মাজহার সাহেব।"

মাজহার কোনো উত্তর দিল না। কয়েস আবার ডাকল, "মাজহার সাহেব।"

"কী হল?"

"আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি?"

"কী কথা?"

"আমাকে মেরে আপনি কী পাবেন?"

"টাকা।"

"কত টাকা?"

"সেটা শুনে তুই কী করবি?"

"জানার ইচ্ছা করছে।"

"জেনে কী করবি? তুই শালা আর দশ মিনিট পরে মরে ভূত হয়ে যাবি—"

"তবু শোনার ইচ্ছা করছে।"

"দুই।"

"দুই কী?"

"দুই হাজার।"

কয়েস একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "মাত্র দুই হাজার টাকার জন্য আপনি আমারে মারবেন?"

মাজহার রেগে উঠল, "তুই শালা কোন লাট সাহেব যে তোরে মেরে আমি দুই লাখ টাকা পাব?"

কয়েস নরম গলায় বলল, "আপনি আমারে ছেড়ে দেন মাজহার সাহেব, আপনারে আমি বিশ হাজার টাকা দিব।"

মাজহার হা হা করে হেসে উঠল, "তুই বিশ হাজার টাকা দিবি?"

"জে। দিব, খোদার কসম।"

"কীভাবে দিবি?"

"আপনি যেখানে বলবেন সেইখানে পৌঁছে দেব।"

মাজহার কয়েসের পিছন থেকে তার মাথায় একটা চাঁটি মেরে বলল, "তুই আমারে একটা বেকুব পেয়েছিস?"

"কেন মাজহার সাহেব? এই কথা বলছেন কেন?"

"তুই ছাড়া পেলে আর ফিরে আসবি? তুই শালা টিকটিকির বাচ্চা সোজা যাবি পুলিশের কাছে।"

"জি না মাজহার সাহেব। খোদার কসম যাব না। আপনার টাকা আমি বুঝায়ে দিব।"

"কাঁচকলা দিবি।"

"দিব মাজহার সাহেব। আল্লাহর কসম।"

"আচ্ছা যা—মনে করলাম তুই দিলি। তাতে আমার লাভ কী? আমার পার্টির সাথে বেইমানি হল। সেই পার্টি আমারে ছেড়ে দিবে? আমারে আর কাজ দিবে?"

কয়েস কোনো কথা বলল না।

"তোরে মেরে আজ দুই হাজার টাকা পাব। সপ্তাহ দুই পরে আরেকটা কেস আসবে। আরো দুই আড়াই হাজার টাকা। মাসে দুই-তিনটা বান্ধা কেস। আমি তোর বিশ হাজার টাকার লোভে বান্ধা কাজ ফেলে দিব? আমারে তুই বেকুব পেয়েছিস?"

"মাজহার সাহেব আপনি চাইলে আপনাকে আমি চল্লিশ হাজার টাকা দিব। খোদার কসম।"

"চুপ কর শালা। কথা বলিস না। তুই শালা চল্লিশ হাজার কেন, চল্লিশ টাকার কেসও না।"

"মাজহার সাহেব!" কয়েস কাতর গলায় বলল, "বিশ্বাস করেন, আপনাকে সব টাকা আমি বুঝায়ে দিব। আপনি যেখানে চাইবেন, যেভাবে চাইবেন।"

"চুপ কর।" মাজহার ধমক দিয়ে কয়েসকে থামানোর চেষ্টা করল।

কয়েস তবু হাল ছাড়ল না, অনুনয় করে বলল, "বিশ্বাস করেন, পৃথিবীর কেউ জানবে না। আমি একেবারে উধাও হয়ে যাব। দেশ ছেড়ে চলে যাব—আপনি আপনার বান্ধা কাজ করে যাবেন। কেউ একটা কথা জানবে না। খোদার কসম।"

মাজহার কোনো কথা বলল না। কয়েস কাতর গলায় বলল, "চল্লিশ হাজার না মাজহার সাহেব, আমি আপনাকে পুরো পঞ্চাশ হাজার টাকা দিব।" এক শ টাকার নোট। পঞ্চাশ হাজার টাকা।

"চুপ কর শালা, বেশি কথা বলিস না। তোর টাকায় আমি পিশাব করে দিই।"

"মাজহার সাহেব, আমাকে ছেড়ে দেন, আমি আপনার জন্য দোয়া করব। আল্লাহর কাছে দোয়া করব।"

"নিজের জন্য দোয়া কর।"

"মাজহার সাহেব, বিশ্বাস করেন আমি কিছু করি নাই। আমি নির্দোষ। আমারে ভুল করে ধরেছেন, কী একটা ভুল হয়েছে। আমার স্ত্রী আছে, ছোট ছেলে আছে। দুই বছরের ছেলে—এতিম হয়ে যাবে। আমারে মারবেন না মাজহার সাহেব। আল্লাহর কসম—"

মাজহার পা তুলে কয়েসের পিঠে একটা লাথি দিয়ে বলল, "চুপ কর হারামজাদা।"

কয়েস তাল হারিয়ে পড়ে যেতে যেতে কোনোমতে নিজেকে সামলে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ভাঙা গলায় বলল, "মাজহার সাহেব। আপনার কাছে আমি প্রাণ ভিক্ষা চাই। শুধু আমার প্রাণটা ভিক্ষা দেন। আমি আপনার গোলাম হয়ে থাকব। কেনা গোলাম হয়ে থাকব। সারা জীবনের জন্যে গোলাম হয়ে থাকব।"

মাজহার কোনো কথা বলল না। কয়েস কাতর গলায় বলল, "সারা জীবন আপনার গোলাম হয়ে থাকব। আপনি যা চাইবেন তাই দিব আপনাকে। বিশ্বাস করেন, আমার সম্পত্তি যা আছে—"

মাজহার খেঁকিয়ে উঠে বলল, "কেন শালার ব্যাটা তুই ঘ্যানঘ্যান করছিস? তুই জানিস না ঘ্যানঘ্যান করে কোনো লাভ নাই? মানুষের ঘ্যানঘ্যান প্যানপ্যান শুনে আমার কান পচে গেছে। এই নদীর ঘাটে আমি কত মানুষ খুন করেছি তুই জানিস?"

"জানি না মাজহার সাহেব। আমি জানতে চাইও না। আপনি একটা কম খুন করেন। মাত্র একটা। আপনার কসম লাগে।"

মাজহার কোনো উত্তর দিল না, একটা নিশ্বাস ফেলে চুপ করে গেল। তারা নদীর তীরে এসে গেছে। এই ঘ্যানঘ্যানে কান্না এখনই শেষ হয়ে যাবে। ব্যাটাকে কথা বলতে দেওয়াই ভুল হয়েছে, ভবিষ্যতে আর কাউকে কথা বলতে দেবে না। মরে যাওয়ার আগে একেকজন মানুষ একেকরকম চিড়িয়া হয়ে যায়। কী যন্ত্রণা!

মাজহার নদীর তীরে দাঁড়িয়ে কয়েসের পিছনে হাত দিয়ে বলল, "এইখানে দাঁড়া।"

কয়েস দাঁড়িয়ে গেল, হঠাৎ করে সে বুঝতে পারল সে তার জীবনের শেষ মুহূর্তে এসে পৌঁছেছে। তার সারা শরীর অবশ হয়ে আসে, হঠাৎ করে মনে হতে থাকে আর কিছুতেই বুঝি কিছু আসে-যায় না। চারদিকে নরম একটা জ্যোৎস্না, হেমন্তের হালকা কুয়াশা, নদীর পানিতে বহু দূরে গ্রামের টিমটিমে কয়েকটা আলোর প্রতিফলন, ঝিঁঝির একটানা ডাক—কিছুই এখন আর তার চেতনাকে স্পর্শ করছে না।

মাজহার পিছন থেকে কয়েসের কাঁধ স্পর্শ করে বলল, "হাঁটু গেড়ে বস।"

কয়েস অনেকটা যন্ত্রের মতো হাঁটু গেড়ে বসল, সে আর কিছু চিন্তা করতে পারছে না। মাজহার কঠিন গলায় বলল, "মাথা নিচু কর।"

কয়েস মাথা নিচু করল। মাজহার এবার হেঁটে তার সামনে এসে দাঁড়াল, কয়েস একটা ধাতব শব্দ শুনতে পায়, চোখ না তুলেও সে বুঝতে পারে মাজহার তার হাতে রিভলবারটি তুলে এনেছে। মাজহার ভাবলেশহীন গলায় বলল, "এখন মাথা উঁচু কর।"

কয়েস মাথা উঁচু করল এবং এই প্রথমবার মাজহারকে দেখতে পেল, জ্যোৎস্নার আলোতে চেহারার সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলো চোখে পড়ে না কিন্তু যেটুকু চোখে পড়ে তাতে কয়েসের মনে হল মানুষটি সুদর্শন। ছোটখাটো আকার, গলায় একটি কালচে মাফলার ঝুলছে। ডান হাতে একটা বেঢপ রিভলবার কয়েসের কপাল লক্ষ্য করে ধরে রেখেছে।

জ্যোৎস্নার আবছা আলোতে মানুষটির চোখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু যেটুকু দেখা যাচ্ছে সেটুকু দেখে কয়েসের বুকের ভিতর শিরশির করে উঠল।

মাজহার নিচু গলায় বলল, "দ্যাখ—তুই এখন নড়িস না তা হলে সোজা কাজটা কঠিন হয়ে যাবে। চুপচাপ বসে থাক, কিছু বোঝার আগেই সব শেষ হয়ে যাবে। এই কাজ আমি অনেকবার করেছি, কীভাবে ঠিক করে করতে হয় আমি জানি। তোর উপরে আমার কোনো রাগ নাই, এইটা হচ্ছে একটা বিজনেস।"

কয়েস কাঁপা গলায় বলল, "মাজহার ভাই—"

মাজহার বাধা দিয়ে বলল, "আমার নাম আসলে মাজহার না—"

কথা শেষ করার আগেই মাজহার ট্রিগার টেনে ধরে। নির্জন নদীতীরে একটা ভোঁতা শব্দ হল। কয়েস সেই শব্দটি শুনতে পেল না কারণ বুলেটের গতি শব্দের চেয়ে বেশি।

ওর নামটা আসলে মাজহার নয়, ওর আসল নাম মাওলা। মাওলা বকশ। কয়েস অবাক হয়ে ভাবল, আমি সেটা কেমন করে জানলাম? ঝিঁঝি পোকার কর্কশ ডাক শোনা যাচ্ছিল, হঠাৎ করে সব নীরব হয়ে গেল কেন? কোনো কিছু শুনতে পাচ্ছি না কেন? তা হলে কি আমি মরে গেছি?

কয়েসের স্পষ্ট মনে আছে মাজহার নামের মানুষটা, যার আসল নাম মাওলা বকশ—তার কপালের দিকে একটা রিভলবার তাক করে ধরে রেখেছিল, ট্রিগার টানার পর সে একটা আলোর স্ফুলিঙ্গ দেখতে পেল, তারপর সবকিছু কেমন জানি এলোমেলো হয়ে গেছে। তা হলে সে কি মরে গেছে? মরে গিয়ে থাকলে সে কেমন করে চিন্তা করছে?

কেউ একজন হাসল। কে হাসল? কেন হাসল? কয়েস নিজের এলোমেলো ভাবটা বিন্যস্ত করে জেগে ওঠার চেষ্টা করে, কী হচ্ছে বোঝার চেষ্টা করে। জানতে চায়, "আমি কোথায়?"

কয়েস স্পষ্ট শুনতে পেল কেউ একজন বলল, "আমি বলে কিছু নেই।"

কয়েস চমকে ওঠে, "কে কথা বলে?"

"কেউ না।"

"কেউ না?"

"না।"

"তুমি কে?"

"তুমি বলেও কিছু নেই। আমি তুমি বলে কিছুই নেই। সবাই এক।"

কয়েস ছটফট করে ওঠে, "আমি কাউকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?"

"দেখা! দেখার মানে হচ্ছে কোনো কিছু থেকে প্রতিফলিত আলোর চোখের রেটিনায় এক ধরনের সংবেদন সৃষ্টি করা, যেটা মস্তিষ্ক ব্যাখ্যা করতে পারে। পুরো ব্যাপারটি নির্ভর করে কিছু জৈবিক প্রক্রিয়ার ওপর। একটা জিনিস মানুষ দেখে একভাবে, পশুপাখি দেখে অন্যভাবে, কীটপতঙ্গ দেখে আবার সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে। কাজেই তুমি যখন বলছ দেখতে পাচ্ছ না তার অর্থ খুব অস্পষ্ট। দেখা ব্যাপারটি অস্পষ্ট! সত্যি কথা বলতে কী, দেখা ব্যাপারটি অত্যন্ত আদিম একটা প্রক্রিয়া—"

কয়েস বলল, "তবু আমি দেখতে চাই। মানুষের মতো দেখতে চাই।"

"বেশ! দেখতে চাইলেই দেখা যায়।"

কয়েস দেখতে চাইল এবং হঠাৎ করে সবকিছু তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। কয়েস

AMARBOI.COM

একসাথে পুরো পৃথিবীটা দেখতে পায়। পৃথিবীর গাছপালা, নদী, সাগর, আকাশ-বাতাস, কীটপতঙ্গ, পশুপাখি, মানুষ, মানুষের বসতি, শহর নগরী সবকিছু দেখতে পেল। সবকিছু তার সামনে স্থির হয়ে আছে, যেন পুরো পৃথিবীটা তার সামনে স্থির হয়ে আছে। যেন পৃথিবীটাকে কেউ থামিয়ে দিয়েছে।

কয়েস অবাক হয়ে দেখে—সম্পূর্ণ নতুনভাবে দেখা, যেটি সে আগে কখনো দেখে নি। কয়েস নিজের ভিতরে এক ধরনের অস্থিরতা অনুভব করে—সে তো এতকিছু এভাবে দেখতে চায় নি।

"তা হলে কী দেখতে চেয়েছ?"

"আমি নদীতীরে মাজহার নামের মানুষটিকে দেখতে চেয়েছি। সে আমার মাথায় রিভলভার ধরে রেখেছিল। যার আসল নাম মাজহার নয়—যার নাম মাওলা। মাওলা বকশ—"

"বেশ।"

কয়েস সাথে সাথে মাজহারকে দেখতে পেল। হাতে একটি বেঢপ রিভলভার চেপে নিয়ে নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছে। চেহারায় এক ধরনের কাঠিন্য। তার পায়ের কাছে একটি দেহ কুঁকড়ে শুয়ে আছে। দেহটিকে চিনতে পারল—তার নিজের দেহ। কয়েস অবাক হয়ে দেখল মাজহার স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, রিভলবারের নল থেকে যে ধোঁয়া বের হয়েছে সেটিও স্থির হয়ে আছে। আকাশে আধখানা চাঁদ তার মাঝে কোমল এক ধরনের কুয়াশা। নদীর পানি কাচের মতো স্থির। কয়েস আতঙ্কে কেমন যেন শিউরে উঠল। ভাবল, তা হলে কি আমি মরে গেছি?

কেউ একজন আবার নিচু গলায় হাসল। কে হাসে? কয়েস চিৎকার করে জিজ্ঞেস করতে চাইল তা হলে কি আমাকে মেরে ফেলেছে? আমি কি মৃত? "আমি তুমি বলে কিছু নেই। আসলে জন্ম-মৃত্যু বলেও কিছু নেই। এখানে সবাই মিলে একটি প্রাণ। একটি অস্তিত্ব। একটি প্রক্রিয়া।"

"প্রক্রিয়া?"

"হ্যাঁ। সেই প্রক্রিয়ার তুমি একটি অংশ। মাজহার একটি অংশ। মাজহার ইচ্ছে করলে আমি হতে পারে, তুমিও ইচ্ছে করলে মাজহার হতে পার। তোমরা আসলে একই মানুষ। একই প্রাণের অংশ। একই অস্তিত্বের অংশ।"

কয়েস অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল। যে মানুষটি তাকে হত্যা করেছে সেই মানুষটি এবং সে নিজে একই মানুষ? কিন্তু সবাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেন?

"কারণ সময়কে থামিয়ে রাখা হয়েছে।"

"সময়কে চালিয়ে দেওয়া যাবে?"

উত্তর পেতে তার একটু দেরি হল। দ্বিধান্বিত স্বরে কেউ একজন বলল, "হ্যাঁ। যাবে।"

কয়েস নিজের ভিতরে এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করে। আশ্চর্য এক ধরনের শূন্যতা, আদি-অন্তহীন নিঃসীম এক ধরনের শূন্যতা। সে ক্লান্ত গলায় অনিশ্চিত স্বরে বলল, "তুমি কে আমার সাথে কথা বলছ?"

কেউ একজন হাসল। হেসে বলল, "আমি কেউ না। আমার আলাদা কোনো অস্তিত্ব নেই। আমি হচ্ছি তুমি। তুমি হচ্ছ আমি। তুমি নিজের সাথে কথা বলছ।"

"আমি নিজের সাথে কথা বলছি?"

"হ্যাঁ, তুমি নিজের সাথে কথা বলছ।"

কয়েস খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আমি আর মাজহার একই অস্তিত্ব?"

"হ্যাঁ। তোমরা একই অস্তিত্ব। তোমরা একই মানুষ।"

"আমি মাজহারকে বুঝতে চাই।"

"কী বুঝতে চাও?"

"কেমন করে সে এত নিষ্ঠুর হয়? এত অমানুষ হয়?"

কেউ একজন আবার হাসল। হেসে বলল, "তোমার বিশাল অস্তিত্বে এইসব অর্থহীন। এইসব তুচ্ছ! তোমার মুক্তি হয়েছে। তুমি জান এইসব হচ্ছে ছোট ছোট পরীক্ষা। ছোট ছোট কৃত্রিম প্রক্রিয়া—"

কয়েস বাধা দিয়ে বলল, "আমি তবু মাজহারকে বুঝতে চাই।"

"সেটি হবে অপ্রয়োজনীয় একটি প্রক্রিয়া। অর্থহীন মূল্যহীন একটি প্রক্রিয়া।"

"আমি তবু বুঝতে চাই।"

কেউ একজন দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বলল, "বেশ।"

হঠাৎ করে কয়েস আবিষ্কার করল সে আসলে কয়েস নয়, সে মাজহার। তার আসল নাম মাওলা বকশ। সে একটা জুটমিলের মেকানিক। তার একটি কমবয়সী স্ত্রী রয়েছে। বখে যাওয়া একটি পুত্র রয়েছে। মাজহারের শৈশবকে মনে পড়ল তার। শৈশবের দুঃসহ জীবন, অমানুষিক নির্যাতন, বেঁচে থাকার সংগ্রামের কথা মনে পড়ল। আনন্দহীন ভালবাসাহীন একটি নিষ্ঠুর জীবনের কথা মনে পড়ল। দুঃখ-কষ্ট-নির্যাতন আর অপমানে নিজেকে পাষাণ হয়ে যেতে দেখল। ঘৃণায় এবং জিঘাংসায় নিজেকে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে দেখল। কয়েস তার নিজের সাথে, মাজহারের সাথে কথা বলল—তাকে বুঝতে চাইল। তাকে সে বুঝতে পারল না। তবুও সে তার মনের গহিনে, মস্তিষ্কের আনাচে-কানাচে, চেতনার সীমানায় ঘুরে বেড়াল। একসময় সে ক্লান্ত হয়ে বলল, "আমি আর মাজহার হয়ে থাকতে চাই না।"

"বেশ। তুমি তা হলে কী হতে চাও?"

"আমি আমার নিজের থাকতে চাই।"

"নিজ বলে কিছু নেই। তোমার মুক্তি হয়েছে। তুমি এখন সব। তুমি এখন আমার বিশাল অস্তিত্বের অংশ। তুমি এখন—"

"আমি কি সময়কে পিছু নিয়ে যেতে পারি?"

"পিছু?"

"হ্যাঁ।"

"কত পিছু?"

"আমার শেষ অংশটুকু। জীবনের শেষ অংশটুকু?"

"কী বলছ তুমি? সেটি অর্থহীন মূল্যহীন তুচ্ছ একটি পরীক্ষা। নগণ্য একটি প্রক্রিয়া।"

"আমি তবু আরো একবার সেটি দেখতে চাই। আরো একবার তার ভিতর দিয়ে যেতে চাই। আরো একবার—"

"কী বলছ তুমি?"

"আমি সত্যি বলছি।"

কিছুক্ষণ কোনো কথা বলল না। তারপর কেউ একজন একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "বেশ।"

হেমন্তের কুয়াশা ঢাকা পথে কয়েস হেঁটে যাচ্ছে। অন্ধকার নেমে এসেছে, জ্যোৎস্নায় এক ধরনের আলো-আঁধারের খেলা নেমে এসেছে। অনেক দূরে কোথাও একটা কুকুর ডাকল, ঝিঁঝি পোকা কর্কশ স্বরে ডাকছে।

কয়েসের হাত পিছন থেকে বাঁধা, নাইলনের দড়ি টান দিয়ে পিছনের মানুষটি বলল, "এখানে দাঁড়া।"

কয়েস হঠাৎ করে বুঝতে পারল সে তার জীবনের শেষ মুহূর্তে এসে পৌঁছেছে। তার সারা শরীর অবশ হয়ে আসে। হঠাৎ করে মনে হয় তার কিছুতেই কিছু আসে–যায় না। পিছনের মানুষটি বলল, "হাঁটু গেড়ে বস।" কয়েস হাঁটু গেড়ে বসল। পিছনের মানুষটা হেঁটে কয়েসের সামনে এসে দাঁড়াল। একটা ধাতব শব্দ শুনে কয়েস মাথা তুলে তাকাল। হঠাৎ করে মনে হতে থাকে এই ব্যাপারটি আগে কখনো ঘটেছে। কখন ঘটেছে সে মনে করতে পারে না। মানুষটি হাতে একটি বেঢপ রিভলবার নিয়ে তার কপালের দিকে তাক করে ধরে। নিচু গলায় বলে, "দ্যাখ—এখন তুই নড়িস না। তা হলে সোজা কাজটা কঠিন হয়ে যাবে। চুপচাপ বসে থাক—"

কয়েস বাধা দিয়ে বলল, "মাজহার সাহেব—"

মানুষটি থতমত খেয়ে থেমে যায়। ভুরু কুঁচকে সে কয়েসের দিকে তাকাল, বলল, "কী বললি?"

"কিছু না। বলছিলাম কী, কিছুতেই আর কিছু আসে–যায় না। আপনার ওপর আমার কোনো রাগ নেই। আমি জানি এইটা একটা বিজনেস।"

মানুষটা কয়েক মুহূর্ত রিভলবারটা ধরে রেখে ধীরে ধীরে হাতটা নামিয়ে আনে। একটা নিশ্বাস ফেলে সে নদীর দিকে তাকাল। তারপর অন্যমনস্কভাবে নদীর পানির দিকে এগিয়ে গেল। দূরে একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ডাকছে।

কয়েস নিচু গলায় ডাকল, "মাওলা সাহেব। দড়িটা একটু খুলে দেবেন? হাতে বড় জোরে বেঁধেছেন।"

মাজহার নামের মানুষটি, যার আসল নাম মাওলা বকশ, মাথা ঘুরিয়ে কয়েসের দিকে তাকাল, কাঁপা গলায় বলল, "কী বললি?"

"আপনার নাম তো আসলে মাওলা বকশ। তাই না?"

"তুই কেমন করে জানিস?"

"আমি জানি। আপনি আর আমি তো আসলে একই মানুষ। তাই না?"

AMARBOI.COM

সোলায়মান আহমেদ ও মহাজাগতিক প্রাণী

"আপনি বলতে চাইছেন আপনাকে মহাজাগতিক কোনো প্রাণী ধরে নিয়ে গিয়েছিল?"

দেশের বিশিষ্ট শিল্পপতি সোলায়মান আহমেদ মাইক্রোফোনের সামনে ঝুঁকে পড়ে স্পষ্ট গলায় বললেন, "হ্যাঁ।"

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত প্রায় চল্লিশ জন সাংবাদিকের অনেকেই এক ধরনের অস্পষ্ট শব্দ করলেন। কয়েকজনের ক্যামেরার ফ্লাশ জ্বলে উঠল এবং আরো কিছু ছবি নেওয়া হল। বিশিষ্ট শিল্পপতি সোলায়মান আহমেদের একেবারে হঠাৎ করে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি সংবাদপত্রে যেরকম আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল হঠাৎ করে ফিরে এসে এই ধরনের একটি ব্যাখ্যা দেওয়া নিশ্চিতভাবেই তার থেকে অনেক বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করবে।

"আপনাকে কীভাবে মহাজাগতিক প্রাণী ধরে নিয়ে গিয়েছিল সেটি কি একটু বলবেন?"

"সোলায়মান আহমেদ একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "পুরো ব্যাপারটি আমার কাছে এক ধরনের আবছা এবং ধোঁয়াটে। আমার স্পষ্ট মনে আছে আমি আমার গ্রামের বাড়িতে নদীতীরে দাঁড়িয়ে ছিলাম, হঠাৎ এক ধরনের ভোঁতা শব্দ শুনতে পেলাম। শব্দটা কোথা থেকে আসছে দেখার জন্য মাথা ঘুরিয়েছি তখন দেখি আমার পিছনে গোলাকার মসৃণ একটা কিছু দশ–বারো ফুট উপরে ভেসে আছে। সেখান থেকে নীল রঙের আলো বের হয়ে এল তারপর আমার কিছু মনে নাই। যখন জ্ঞান হল আমি দেখলাম আমি ভেসে আছি।"

সোলায়মান আহমেদ চুপ করলেন এবং সাংবাদিকেরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। শেষ পর্যন্ত একজন জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় ভেসে আছেন?"

"ভরশূন্য পরিবেশে। একটা গোলাকার জানালা ছিল সেখান দিয়ে আমি পৃথিবীকে দেখতে পেয়েছি। পূর্ণিমার চাঁদের মতো দেখাচ্ছিল তবে নীল এবং সাদা রঙের।"

"আপনি কেমন করে বুঝলেন সেটা পৃথিবী? অন্য কোনো গ্রহও তো হতে পারত।"

"আমি আফ্রিকা মহাদেশটি দেখেছি। কাজেই আমি নিশ্চিতভাবে জানি সেটা পৃথিবী।"

মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ গলা উঁচিয়ে বললেন, "আপনি কি কোনোভাবে প্রমাণ করতে পারবেন যে আপনাকে মহাজাগতিক প্রাণী ধরে নিয়ে গিয়েছিল?"

সোলায়মান আহমেদ মাথা নাড়লেন, বললেন, "না। যা ঘটেছে আমি শুধু সেটা বলতে পারি। আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করবেন কি না সেটা আপনাদের ইচ্ছে।"

"আপনার কাছে কি কোনো প্রমাণ নেই? সেই মহাকাশযানের কোনো জিনিস, কোনো ছবি, কোনো তথ্য?"

সোলায়মান আহমেদ খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, "না। আমাকে তারা পরীক্ষা করেছে, আমার শরীরে কিছু প্রবেশ করিয়েছে কি না দেখতে হবে। আমার কাছে কোনো তথ্য নেই, তবে আমার পকেটে যে নোট বই ছিল সেই নোট বইয়ে আমার বল পয়েন্ট কলম দিয়ে আমি সেই মহাজাগতিক প্রাণীর একটা ছবি এঁকেছিলাম। ভরশূন্য অবস্থায় ভাসছিলাম বলে ছবিটা ভালো হয় নি। কিন্তু সেটা একমাত্র তথ্য।"

বেশ কয়েকজন সাংবাদিক একসাথে সেই ছবিটি দেখতে চাইলেন। সোলায়মান আহমেদ পকেট হাতড়ে একটা নোট বই খুঁজে বের করে তার মাঝখানে আঁকা মহাজাগতিক প্রাণীর ছবিটি দেখালেন। বড় মাথা, ছোট ছোট হাত–পা, গোল চোখ। সাংবাদিকরা আবার নোট বই হাতে সোলায়মান আহমেদের ছবি তুলতে লাগলেন।

সাগর তার বাবার হাত ধরে টান দিয়ে বলল, "আব্বু চল যাই।"

সাগরের আব্বা একটু বিরক্ত হয়ে চাপা গলায় বললেন, "কয়েক মিনিট চুপ করে থাকতে পারিস না? আমি একটা প্রেস কনফারেন্স কাভার করছি দেখছিস না?"

"লোকটা মিথ্যা কথা বলছে আর তোমরা বসে বসে শুনছ?"

সাগরের গলার স্বর হঠাৎ করে একটু উঁচু হয়ে যাওয়ায় অনেকে তার দিকে ঘুরে তাকাল। সাগরের আব্বা খুব অপ্রস্তুত হয়ে কীভাবে সাগরকে আড়াল করবেন সেটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেলেন কিন্তু কয়েকজন সাংবাদিক তার দিকে ঝুঁকে পড়লেন। একজন গলা উঁচিয়ে বললেন, "তুমি কে খোকা? তুমি কেমন করে জান সোলায়মান সাহেব মিথ্যা কথা বলছেন?"

সাগরের আব্বা খুব বিব্রত হয়ে বললেন, "ওর কথায় কান দেবেন না। বাচ্চা ছেলে কী বলতে কী বলেছে! স্কুল আগে ছুটি হয়ে গেছে বলে আমি সাথে নিয়ে এসেছি। আমি খুব দুঃখিত।"

সাংবাদিকটি নাছোড়বান্দার মতো বললেন, "কিন্তু তুমি কেন বলছ সোলায়মান সাহেব মিথ্যা কথা বলছেন?"

AMARBOI.COM

এবার হঠাৎ করে সব সাংবাদিক সাগরের দিকে ঘুরে তাকালেন, সাগর কেমন ভয় পেয়ে যায়। শুকনো গলায় বলল, "ঐ যে ইনি বললেন, বল পয়েন্ট কলম—"

"কী হয়েছে বল পয়েন্ট কলমে?"

"ভরশূন্য জায়গায় বল পয়েন্ট কলম দিয়ে লেখা যায় না। কালিটা নিচে চুইয়ে আসতে হয়—খাড়া দেয়ালেও লেখা যায় না—আসলে উল্টো করে ধরলেও লেখা যায় না—মানে—" সাগর হঠাৎ ভয় পেয়ে থেমে গেল।

একসাথে অনেকগুলো ক্যামেরা ক্লিক করে ওঠে এবং ক্যামেরার ফ্লাশের আলোতে সাগরের চোখ ধাঁধিয়ে গেল।

একজন সাংবাদিক হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে ওঠেন, "সোলায়মান সাহেব কোথায় গেলেন?"

কম বয়সী একজন বললেন, "মহাজাগতিক প্রাণী ধরে নিয়ে গেছে!"

চল্লিশ জন সাংবাদিকের উচ্চৈঃস্বরে হাসির শব্দ সোলায়মান সাহেব তার গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ ছাপিয়েও স্পষ্ট শুনতে পেলেন।

মহাজাগতিক কিউরেটর

AMARBOI.COM

সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে তারা বেশ সন্তুষ্ট হল। প্রথম প্রাণীটি বলল, "এখানে প্রাণের বিকাশ হয়েছে।"

"হ্যাঁ।"

"বেশ পরিণত প্রাণ। অনেক ভিন্ন ভিন্ন ধরনের প্রজাতি। একেবারে ক্ষুদ্র এককোষী থেকে শুরু করে লক্ষ-কোটি কোষের প্রাণী।"

দ্বিতীয় প্রাণীটি আরো একটু খুঁটিয়ে দেখে বলল, "না। আসলে এটি জটিল প্রাণ নয়। খুব সহজ এবং সাধারণ।"

"কেন? সাধারণ কেন বলছ? তাকিয়ে দেখ কত ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির প্রাণ। শুরু হয়েছে ভাইরাস থেকে, প্রকৃতপক্ষে ভাইরাস আলাদাভাবে প্রাণহীন বলা যায়। অন্য কোনো প্রাণীর সংস্পর্শে এলেই তার মাঝে জীবনের লক্ষণ দেখা যায়। তারপর রয়েছে এককোষী প্রাণ, পরজীবী ব্যাক্টেরিয়া। তারপর আছে গাছপালা, এক জায়গায় স্থির। আলোক সংশ্লেষণ দিয়ে নিজের খাবার নিজেই তৈরি করে নিচ্ছে। পদ্ধতিটা বেশ চমৎকার। গাছপালা ছাড়াও আছে কীটপতঙ্গ। তাকিয়ে দেখ কত রকম কীটপতঙ্গ। পানিতেও নানা ধরনের প্রাণী আছে, তাদের বেঁচে থাকার পদ্ধতি ভিন্ন। ডাঙ্গাতেও নানা ধরনের প্রাণী, কিছু কিছু শীতল রক্তের কিছু কিছু উষ্ণ রক্তের। উষ্ণ রক্তের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের একটির ভিতরে আবার অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর বুদ্ধির বিকাশ হয়েছে। কোথাও কোথাও প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে।"

"কিন্তু সব আসলে বাহ্যিক। এই ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির মাঝে আসলে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই।"

প্রথম প্রাণীটি বলল, "আমি বুঝতে পারছি না তুমি কেন এই পার্থক্যকে বাহ্যিক বলছ।"

"তুমি আরেকটু খুঁটিয়ে দেখ। এই ভিন্ন প্রজাতি কী দিয়ে তৈরি হয়েছে দেখ।"

প্রথম প্রাণীটি একটু খুঁটিয়ে দেখে বিস্ময়সূচক শব্দ করে বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ। এই প্রাণীগুলো সব একইভাবে তৈরি হয়েছে। সব প্রাণীর জন্য মূল গঠনটি হচ্ছে ডিএনএ দিয়ে, সব প্রাণীর ডিএনএ একই রকম, সবগুলো একই বেস পেয়ার দিয়ে তৈরি। সবচেয়ে সহজ এবং সবচেয়ে জটিল প্রাণীটির একই রকম গঠন। প্রাণীটির বিকাশের নীলনকশা এই ডিএনএ দিয়ে তৈরি করে রাখা আছে। কোনো প্রাণীর নীলনকশা সহজ, কোনো প্রাণীর নীলনকশা জটিল—এটুকুই হচ্ছে পার্থক্য।"

"হ্যাঁ।" দ্বিতীয় প্রাণীটি বলল, "আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব গ্রহ-নক্ষত্র ঘুরে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণীগুলোকে সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছি—কাজটি সহজ নয়। এই গ্রহ থেকেও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণীটি খুঁজে বের করতে হবে—যেহেতু সবগুলো প্রাণীর গঠন একই রকম, কাজটি আরো কঠিন হয়ে গেল।"

"সময় নষ্ট না করে কাজ শুরু করে দেওয়া যাক।"

"হ্যাঁ।"

"এই ভাইরাস কিংবা ব্যাক্টেরিয়া বেশি ছোট, এর গঠন এত সহজ এর মাঝে কোনো বৈচিত্র্য নেই।"

"হ্যাঁ ঠিকই বলেছ। আবার এই হাতি বা নীল তিমি নিয়েও কাজ নেই, এদের আকার বেশি বড়। সংরক্ষণ করা কঠিন হবে।"

"গাছপালা নেওয়ারও প্রয়োজন নেই। এরা এক জায়গায় স্থির থাকে। যেখানে গতিশীল প্রাণী আছে সেখানে স্থির প্রাণ নেওয়ার কোনো অর্থ হয় না।"

"এই প্রাণীটি সম্পর্কে তোমার কী ধারণা? এটাকে বলে সাপ।"

"সাপটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক, কিন্তু এটা সরীসৃপ। সরীসৃপের দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত নয়, ঠাণ্ডার মাঝে এরা কেমন যেন স্থবির হয়ে পড়ে। প্রাণিজগতে সরীসৃপ একটু পিছিয়ে পড়া প্রাণী।"

"ঠিকই বলেছ। তা হলে সরীসৃপ নিয়ে কাজ নেই।"

প্রথম প্রাণীটি বলল, "আমার এই প্রাণীটি খুব পছন্দ হয়েছে। এটাকে বলে পাখি। কী চমৎকার! আকাশে উড়তে পারে!"

দ্বিতীয় প্রাণীটি বলল, "হ্যাঁ, আমারও এটি পছন্দ হয়েছে। আমরা এই প্রাণীটিকে নিতে পারি। তবে—"

"তবে কী?"

"এদের বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে আমি খুব নিশ্চিত নই। আমাদের কি এমন কোনো প্রাণী নেওয়া উচিত নয় যারা বুদ্ধিমত্তার চিহ্ন দেখিয়েছে, যারা কোনো ধরনের সভ্যতা গড়ে তুলেছে?"

"ঠিকই বলেছ। তা হলে আমাদের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের একবার দেখা উচিত।"

"এই দেখ একটা স্তন্যপায়ী প্রাণী। কী সুন্দর হলুদের মাঝে কালো ডোরাকাটা! এর নাম বাঘ।"

"হ্যাঁ প্রাণীটি চমৎকার। কিন্তু এটি একা একা থাকতে পছন্দ করে। একটা সামাজিক প্রাণী নিতে পারি না?"

"কুকুরকে নিলে কেমন হয়? এরা একসাথে থাকে। দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়।"

প্রথম প্রাণীটি বলল, "এই প্রাণীটিকে মানুষ পোষ মানিয়ে রেখেছে, প্রাণীটা নিজেদের স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলছে।"

"ঠিকই বলেছ, গৃহপালিত প্রাণীগুলোর মাঝে নিজস্ব স্বকীয়তা লোপ পেয়ে যাচ্ছে। একটা খাঁটি প্রাণী নেওয়া প্রয়োজন। হরিণ নিলে কেমন হয়?"

"তৃণভোজী প্রাণী। তার অর্থ জান?"

"কী?"

"এদের দীর্ঘ সময় খেতে হয়। বেশিরভাগ সময় এটা ঘাস লতাপাতা খেয়ে কাটায়।"

"ঠিকই বলেছ। আমরা দেখছি কোনো প্রাণীই পছন্দ করতে পারছি না।"

"আমার একটা জিনিস মনে হচ্ছে।"

'কী?"

"এই গ্রহটিতে যে প্রাণীটি সবচেয়ে বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করেছে সেই প্রাণীটি নিলে কেমন হয়?"

"কোন প্রাণীর কথা বলছ?"

"মানুষ।"

"মানুষ?"

"হ্যাঁ। দেখ এদের একটা সামাজিক ব্যবস্থা আছে। সমাজবদ্ধ হয়ে থাকে। এদের কেউ শ্রমিক, কেউ সৈনিক, কেউ বুদ্ধিজীবী।"

"ঠিকই বলেছ।"

"এই দেখ এরা শহর–বন্দর–নগর তৈরি করেছে। কত বিশাল বিশাল নগর তৈরি করেছে।"

"শুধু তাই না, দেখ এরা চাষাবাদ করছে। পশু পালন করছে।"

"যখন কোনো সমস্যা হয় তখন এরা দলবদ্ধভাবে সেটা সমাধান করার চেষ্টা করে।"

"নিজেদের সভ্যতা গড়ে তোলার জন্য এদের কত আত্মত্যাগ রয়েছে দেখেছ?"

"কিন্তু আমার একটা জিনিস মনে হচ্ছে—"

"কী?"

"তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস কর মানুষ এই গ্রহের শ্রেষ্ঠ প্রাণী?"

"তুমি কেন এটা জিজ্ঞেস করছ?"

"এই পৃথিবীর দিকে তাকাও। দেখেছ বাতাস কত দূষিত পদার্থ? কত তেজস্ক্রিয় পদার্থ? বাতাসের ওজোন স্তর কেমন করে শেষ হয়ে যাচ্ছে দেখেছ? গাছ কেটে কত বিস্তীর্ণ এলাকা ধ্বংস করেছে দেখেছ?"

"এর সবই কি মানুষ করেছে?"

"হ্যাঁ।"

"কী আশ্চর্য! আমি ভেবেছিলাম এরা বুদ্ধিমান প্রাণী।"

"এরা একে অন্যের ওপর নিউক্লিয়ার বোমা ফেলছে। যুদ্ধ করে একজন আরেকজনকে ধ্বংস করে ফেলছে। প্রকৃতিকে এরা দূষিত করে ফেলেছে।"

"ঠিকই বলেছ।"

প্রাণী দুটি কিছুক্ষণ বেশ মনোযোগ দিয়ে মানুষকে লক্ষ করল, তারপর প্রথম প্রাণীটি বলল, "না, মানুষকে নেওয়া ঠিক হবে না। এরা মাত্র দুই মিলিয়ন বছর আগে জন্ম নিয়েছে, কিন্তু এর মাঝেই শুধু যে নিজেদেরকে বিপন্ন করেছে তাই নয়, পুরো গ্রহটিকে ধ্বংস করে ফেলার অবস্থা করে ফেলেছে।"

দ্বিতীয় প্রাণীটি বলল, "মহাজাগতিক কাউন্সিল আমাদেরকে কিউরেটরের দায়িত্ব দিয়েছে। আমাদের খুব চিন্তা–ভাবনা করে প্রাণীগুলো বেছে নিতে হবে। এই সুন্দর গ্রহ থেকে এ রকম স্বেচ্ছা ধ্বংসকারী প্রাণী আমরা নিতে পারি না। কিছুতেই নিতে পারি না।"

প্রাণী দুটি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে এবং হঠাৎ করে প্রথম প্রাণীটি আনন্দের ধ্বনি করে ওঠে। দ্বিতীয় প্রাণীটি অবাক হয়ে বলল, "কী হয়েছে?"

"আমি একটা প্রাণী খুঁজে পেয়েছি। এরাও সামাজিক প্রাণী। এরাও দল বেঁধে থাকে। এদের মাঝে শ্রমিক আছে সৈনিক আছে। বংশ বিস্তারের জন্য চমৎকার একটা পদ্ধতি আছে। দেখ নিজেদের থাকার জন্য কী চমৎকার বিশাল বাসস্থান তৈরি করেছে!"

দ্বিতীয় প্রাণীটি বলল, "ঠিকই বলেছ। দেখ এরাও মানুষের মতো চাষাবাদ করতে পারে। মানুষ যেরকম নিজেদের সুবিধার জন্য পশুপালন করতে পারে এদেরও ঠিক সেরকম ব্যবস্থা রয়েছে!"

"কী সুশৃঙ্খল প্রাণী দেখেছ?"

'শুধু সুশৃঙ্খল নয়, এরা অসম্ভব পরিশ্রমী, গায়ে প্রচণ্ড জোর, নিজের শরীর থেকে দশগুণ বেশি জিনিস অনায়াসে নিয়ে যেতে পারে।"

"হ্যাঁ। কোনো ঝগড়াবিবাদ নেই। কে কোন কাজ করবে আগে থেকে ঠিক করে রেখেছে। কোনো রকম অভিযোগ নেই, যে যার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।"

"অত্যন্ত সুবিবেচক। আগে থেকে খাবার জমিয়ে রাখছে। আর বিপদে কখনো দিশেহারা হয় না। অন্যকে বাঁচানোর জন্য অকাতরে প্রাণ দিয়ে যাচ্ছে।"

"মানুষের বয়স মাত্র দুই মিলিয়ন বছর, সেই তুলনায় এরা সেই ডাইনোসরের যুগ থেকে বেঁচে আছে।"

"প্রকৃতির এতটুকু ক্ষতি করে নি। আমি নিশ্চিত মানুষ নিজেদের ধ্বংস করে ফেলার পরও এরা বেঁচে থাকবে। পৃথিবী এক সময় এরাই নিয়ন্ত্রণ করবে।"

"ঠিকই বলেছ। তা হলে আমরা এই প্রাণীটাই নিয়ে যাই?"

"হ্যাঁ। পৃথিবীর এই চমৎকার প্রাণীটা নেওয়াই সবচেয়ে সুবিবেচনার কাজ হবে।"

দুজন মহাজাগতিক কিউরেটর সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহটি থেকে কয়েকটি পিঁপড়া তুলে নিয়ে গ্যালাক্সির অন্য গ্রহ-নক্ষত্রে রওনা দেয়, দীর্ঘদিন থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরে ঘুরে তারা গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী সংগ্রহ করছে।

জলজ

"যুল। ঘুম থেকে ওঠ।"

যুলের মনে হয় অনেকদূর থেকে কেউ যেন তাকে ডাকছে। গলার স্বরটি চেনা কিন্তু সেটি কার যুল মনে করতে পারল না। যুল গভীর ঘুম থেকে জেগে ওঠার চেষ্টা করতে করতে আবার অচেতনতার অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছিল, তখন সে শুনতে পেল আবার তাকে কেউ একজন ডাকল, "যুল। ওঠ।"

য়ুল প্রাণপণ চেষ্টা করে জেগে উঠতে, মনে করতে চেষ্টা করে সে কে, সে কোথায়, কে তাকে ডাকছে, কেন তাকে ডাকছে। কিন্তু তার কিছুই মনে পড়ে না। সে অনুভব করে এক গভীর জড়তায় তার দেহ আর চেতনা যেন কোথাও অবরুদ্ধ হয়ে আছে, তার ভিতর থেকে বের হয়ে আসতে পারছে না।

"ওঠ য়ুল। আমরা পৃথিবীর কাছাকাছি চলে এসেছি।"

পৃথিবী! হঠাৎ করে য়ুলের সব কথা মনে পড়ে যায়, পৃথিবী হচ্ছে সূর্য নামক সাদামাঠা একটা নক্ষত্রের মহাকর্ষে আটকে থাকা নীলাভ একটি ছোট গ্রহ। যে গ্রহে তার পূর্বপুরুষ মানুষের জন্ম হয়েছিল। যে মানুষ রোবটদের নিয়ে ক্রসিয়াস গ্রহপুঞ্জে বসতি করেছে দুই শতাব্দী আগে। সেই ক্রসিয়াস গ্রহপুঞ্জ থেকে সে ফিরে যাচ্ছে পৃথিবীতে। সূর্য নামক সাদামাঠা একটি নক্ষত্রের কক্ষপথে আটকে থাকা তৃতীয় গ্রহটিতে।

য়ুল খুব ধীরে ধীরে তার চোখ খুলে তাকাল, তার মুখের ওপর ঝুঁকে আছে একটি ধাতব মুখ। সেই ধাতব মুখে তার জন্য উৎকণ্ঠা, তার জন্য মমতা।

য়ুলকে চোখ খুলতে দেখে ধাতব মুখটি আরো নিচু হয়ে এল, শীতল ধাতব হাতে তার মুখমণ্ডল স্পর্শ করে বলল, "তুমি প্রায় এক যুগ থেকে ঘুমিয়ে আছ য়ুল। তোমার এখন ওঠার সময় হয়েছে।"

য়ুল ধাতব মুখ, তার শীতল স্পর্শ এবং কোমল কণ্ঠটি চিনতে পারে। এটি ক্রন, একজন রোবট ক্রসিয়াস গ্রহপুঞ্জ থেকে তার সাথে এসেছে। প্রায় একযুগ দীর্ঘ মহাকাশ অভিযানে তাকে একা একা আসতে দেয় নি ক্রসিয়াস গ্রহপুঞ্জের বিজ্ঞান একাডেমি। তার সাথে দিয়েছে একজন রোবট, যার নাম ক্রন এবং একজন আধা জৈবিক আধা যান্ত্রিক বায়োবট যার নাম কীশ। বার্ধক্য তাদের স্পর্শ করে না বলে গত এক যুগ তারা এই মহাকাশযানের শূন্য করিডোরে অপেক্ষা করেছে, ক্রসিয়াস গ্রহপুঞ্জের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেছে, শীতল ঘরের কালো ক্রোমিয়াম ক্যাপসুলে য়ুলের দেহকে চোখে চোখে রেখেছে। য়ুল ক্রনের ধাতব অথচ কোমল মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "ভালো আছ ক্রন?"

"হ্যাঁ। আমি ভালো আছি?"

"কীশ কোথায়? কীশ ভালো আছে?"

"কীশ মূল নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে। সেও ভালো আছে।"

য়ুল আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু ক্রন তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "এখন তুমি কথা বলবে না য়ুল। তুমি চুপ করে শুয়ে থাকবে। তুমি প্রায় এক যুগ শীতল ঘরে ঘুমিয়ে ছিলে। তোমার দেহকে খুব ধীরে ধীরে জাগিয়ে তুলতে হবে।"

"আমি তো জেগেই আছি!"

"তোমার মস্তিষ্ক জেগে আছে, কিন্তু তোমার দেহ এখনো জেগে ওঠে নি। আমাকে একটু সময় দাও আমি তোমার দেহকে ধীরে ধীরে জাগিয়ে তুলব।"

"বেশ।"

য়ুল ক্রোমিয়ামের কালো ক্যাপসুলে নিশ্চল হয়ে রইল। সে খুব ধীরে ধীরে অনুভব করে তার দেহে আবার প্রাণ ফিরে আসছে। শরীরের ভিতরে এক ধরনের উষ্ণতা বইতে শুরু করেছে, হাত, পা, বুক, পিঠে এক ধরনের জীবন্ত অনুভূতির জন্ম হয় এবং একসময় খুব ধীরে ধীরে সে নিজের ভিতরে হৃৎস্পন্দনের শব্দ শুনতে পায়। সে বুকভরে একটি নিশ্বাস নিয়ে খুব ধীরে ধীরে নিজের দুই হাত চোখের সামনে মেলে ধরল, আঙুলগুলো একবার মুষ্টিবদ্ধ করে আরেকবার খুলে নিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ক্রনকে বলল, "আমি পুরোপুরি জেগে উঠেছি ক্রন।"

ক্রন ক্যাপসুলের ওপরে লাগানো কিছু মনিটরে চোখ বুলিয়ে বলল, "হ্যাঁ। তুমি জেগে উঠেছ। তুমি এবারে উঠে দাঁড়াতে পার।"

যুল খুব ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। ক্রন তাকে হাত ধরে শীতল মেঝেতে নামিয়ে এনে উজ্জ্বল কমলা রঙের একটি নিও পলিমারের পোশাক দিয়ে তার দেহকে ঢেকে দেয়। যুল মহাকাশযানের দেয়াল স্পর্শ করে নিজের ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করতে করতে বলল, "আমি কাঁপন অনুভব করছি। মহাকাশযানের ইঞ্জিন চালু করা হয়েছে?"

"হ্যাঁ। পৃথিবীতে নামার জন্য গতিপথ পরিবর্তন করতে হচ্ছে।"

"ও।"

"আমরা চেয়েছিলাম তুমি পৃথিবীকে দেখ। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে যখন যাবে সেই উত্তাপ অনুভব কর। এই গ্রহটিতে তোমার এবং আমার সবার পূর্বপুরুষের জন্ম হয়েছিল।"

"হ্যাঁ।" যুল কোনোভাবে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে করতে বলল, "হ্যাঁ আমি পৃথিবীকে সত্যি সত্যি দেখতে চাই।"

"এস আমার সাথে। আমার হাত ধর।"

যুল সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, "তার প্রয়োজন নেই ক্রন। আমার মনে হয় আমি নিজের ভারসাম্য ফিরে পেয়েছি।"

যুল একটু টলতে টলতে হেঁটে মহাকাশযানের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের দিকে এগিয়ে যায়। কন্ট্রোল প্যানেলের ওপর কীশ ঝুঁকে কিছু একটা দেখছিল, পায়ের শব্দ শুনে ঘুরে তাকিয়ে যুলকে দেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল, যুল! ঘুম ভাঙল তা হলে?"

"হ্যাঁ, ভেঙেছে!"

"আমরা পৃথিবীর কাছাকাছি এসে গেছি। কিছুক্ষণের মাঝেই পৃথিবীর কক্ষপথে আটকে যাব।"

"চমৎকার! কত বড় কক্ষপথ?"

"চেষ্টা করছি কাছাকাছি যাবার। এক শ ইউনিট, বায়ুমণ্ডলটা পার হয়েই।"

"পৃথিবী কি দেখা যাচ্ছে?"

"হ্যাঁ এই দেখ"—বলে কীশ কোথায় একটা সুইচ স্পর্শ করতেই হঠাৎ করে সামনে বিশাল একটা স্ক্রিনে পৃথিবীর ছবি ভেসে আসে। নীল গ্রহটির ওপর সাদা মেঘ, গ্রহটি ঘিরে খুব সূক্ষ্ম একটি নীলাভ আবরণ, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চিহ্ন।

যুল কিছুক্ষণ মুগ্ধ হয়ে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে থাকে, বুকের ভিতর আটকে থাকা একটা নিশ্বাস বের করে দিয়ে বলল, "কী সুন্দর দেখেছ!"

কীশ যুলের দিকে তাকাল কিন্তু কিছু বলল না।

যুল বিশাল স্ক্রিন থেকে চোখ ফিরিয়ে একবার কীশ আরেকবার ক্রনের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী হল? তোমরা কোনো কথা বলছ না কেন? তোমাদের কাছে সুন্দর মনে হচ্ছে না?"

"হচ্ছে।" কীশ এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "তবে—"

"তবে কী?"

"আমি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল বিশ্লেষণ করে দেখেছি—"

"কী দেখেছ?"

"দেখেছি এই বায়ুমণ্ডল বিষাক্ত।"

যুল চমকে উঠে বলল, "কী বললে?"

AMARBOI.COM

কীশ কাতর মুখে বলল, "আমি দুঃখিত য়ুল তুমি এত আশা করে সেই সুদূর ক্রসিয়াস গ্রহপুঞ্জ থেকে পৃথিবীতে এসেছ তোমার পূর্বপুরুষের জন্মগ্রহ দেখতে। কিন্তু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল দেখে আমার মনে হচ্ছে—"

কীশ হঠাৎ থেমে যায়। তারপর ইতস্তত করে বলল, "মনে হচ্ছে—"

"কী মনে হচ্ছে?"

"মনে হচ্ছে এই গ্রহ প্রাণহীন।"

"প্রাণহীন?"

"হ্যাঁ। প্রাণহীন। বাতাসের ওজোন স্তর পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন, আলট্রা ভায়োলেট রে সরাসরি পৃথিবীকে আঘাত করেছে। বাতাসে মাত্রাতিরিক্ত ডায়োক্সিন, প্রয়োজনের অনেক বেশি কার্বন-ডাই-অক্সাইড, নানা ধরনের এসিড। সবচেয়ে যেটি ভয়ঙ্কর সেটি হচ্ছে অক্সিজেনের পরিমাণ এত কম যে পৃথিবীতে কোনো প্রাণ থাকার কথা নয়।"

য়ুল অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে থাকে, "কী বলছ তুমি?"

"আমি দুঃখিত য়ুল। কিন্তু আমি সত্যি কথা বলছি।"

য়ুল দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বলল, "তুমি বলছ পৃথিবী থেকে মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে?"

"আমার তাই ধারণা। খুব নিম্ন শ্রেণীর প্রাণ, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া বা সরীসৃপ হয়তো আছে কিন্তু কোনো বুদ্ধিমান প্রাণী নেই।"

"কেমন করে তুমি নিশ্চিত হলে কীশ?"

"মানুষ বুদ্ধিমান প্রাণী, তাদের একটি সভ্যতা ছিল। তারা বিজ্ঞানে খুব উন্নত ছিল। তারা যদি পৃথিবীতে বেঁচে থাকত তা হলে আমরা এখন তার চিহ্ন পেতাম। রেডিও তরঙ্গ দেখতে পেতাম, আলো দেখতে পেতাম, লেজার রশ্মি দেখতে পেতাম, পারমাণবিক বীম দেখতে পেতাম। আমরা পৃথিবী থেকে তার কোনো চিহ্ন পাচ্ছি না য়ুল। পৃথিবী যেন একটি মৃত গ্রহ।"

য়ুল খুব সাবধানে কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে রাখা একটি চেয়ারে বসে পড়ে, সে এখনো পুরো ব্যাপারটি বিশ্বাস করতে পারছে না। যে পৃথিবী এবং পৃথিবীর মানুষকে দেখার জন্য সে ছায়াপথের অন্য অংশ থেকে দীর্ঘ বারো বছর অভিযান করে এসেছে সেই পৃথিবী এখন প্রাণহীন? মানুষ পুরোপুরি অবলুপ্ত? য়ুল এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে বড় স্ক্রিনটির দিকে নীল পৃথিবী, তার সাদা মেঘ, হালকা বাদামি স্থলভূমির দিকে তাকিয়ে থাকে। এই বিশাল পৃথিবীতে কোনো মানুষ বেঁচে নেই কেমন করে সে বিশ্বাস করবে?

কীশ একটু এগিয়ে য়ুলকে স্পর্শ করে বলল, "আমি খুব দুঃখিত য়ুল। আমি খুবই দুঃখিত।"

২

মহাকাশযানটি পৃথিবীকে ঘিরে কয়েকবার ঘুরে আসে, মহাকাশযানের সংবেদনশীল যন্ত্রপাতি পৃথিবীপৃষ্ঠকে তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করে, কয়েক শতাব্দী আগের একটি বিধ্বস্ত সভ্যতা ছাড়া সেখানে প্রাণের কোনো চিহ্ন নেই। ক্রন মহাকাশযানটির কক্ষপথ পরিবর্তন করে আরো নিচে নামিয়ে আনে, ক্ষীণ বায়ুমণ্ডলের ঘর্ষণে মহাকাশযানের চারপাশে এক ধরনের অতিপ্রাকৃত আলো জ্বলে ওঠে। ভিতরে তাপমাত্রা কয়েক শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে যায়। কীশ মহাকাশযানের তথ্যকেন্দ্রে পৃথিবীর সকল তথ্য বিশ্লেষণ করে য়ুলের কাছে জানতে চাইল সে পৃথিবীতে অবতরণ করতে চায় কি না। য়ুল কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে কীশের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "হ্যাঁ চাই।"

"তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ পৃথিবীতে নেমে শুধু তোমার আশাভঙ্গই হবে।"

"বুঝতে পারছি, তবু আমি নামতে চাই।"

কীশ তবু একটু চেষ্টা করল, "আমরা কিন্তু পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের সকল তথ্য সংগ্রহ করে ফেলেছি। পৃথিবীতে নেমে নতুন কোনো তথ্য পাব না।"

"তবু আমি নামতে চাই। আমি নিজের চোখে দেখতে চাই।"

"বেশ। তা হলে আমরা মাঝারি একটা আন্তঃগ্রহ নভোযান নিয়ে নেমে যাই। ক্রন এই মহাকাশযানে থাকুক, আমাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করুক।" কীশ য়ুলের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি তোমার সাথে যাই।"

য়ুল নিচু গলায় বলল, "আমার সাথে কারো যাবার প্রয়োজন নেই। আমি একাই যেতে পারব।"

কীশ মাথা নাড়ল। বলল, "আমি তোমাকে একা যেতে দিতে পারি না। এটি মহাকাশযানের নিরাপত্তা নীতিবহির্ভূত।"

"পৃথিবীতে কোনো জীবিত প্রাণী নেই। সেখানে কোনো বিপদ নেই কীশ।"

"হয়তো তোমার কথা সত্যি, কিন্তু আমরা কোনো ঝুঁকি নিতে পারি না।"

"বেশ। তবে তাই হোক।"

কিছুক্ষণের মাঝে মহাকাশযানের আন্তঃগ্রহ নভোযানটিকে পৃথিবীতে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত করা শুরু হয়। সেটিকে জ্বালানি দিয়ে পূর্ণ করা হয়। যোগাযোগ এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করা হয়। পৃথিবীতে কিছুদিন থাকার মতো খাবার, পানীয় এবং বিশুদ্ধ বাতাস নেওয়া হয়। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, বিপজ্জনক পরিবেশে বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় পোশাক, ভ্রমণ করার জন্য ক্ষুদ্র ভাসমান যান এবং কোনো কাজে লাগবে না সে বিষয়ে প্রায় নিশ্চিত হয়েও কিছু স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রও সাথে নিয়ে নেওয়া হয়।

AMARBOI.COM

ক্রন আন্তঃগ্রহ নভোযানে এসে কীশ এবং য়ুলকে তাদের নিজস্ব আসনে বসিয়ে নিরাপত্তা-বাঁধন দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে দেয়। তারপর মূল দরজা বন্ধ করে তাদের কাছ থেকে বিদায় নেয়। কিছুক্ষণের মাঝেই য়ুল নভোযানের ইঞ্জিনের গর্জন শুনতে পেল। নভোযানটি ধীরে ধীরে মূল মহাকাশযান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। য়ুল গোল স্বচ্ছ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে, নভোযানটি বাতাসের ঘর্ষণে কেঁপে কেঁপে উঠছে, তার পৃষ্ঠদেশ বাতাসের তীব্র ঘর্ষণে উজ্জ্বল রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। তাপ নিরোধক আস্তরণ থাকার পরও য়ুল মহাকাশযানের উষ্ণতা অনুভব করে। আকাশ কুচকুচে কালো থেকে প্রথমে বেগুনি, তারপর গাঢ় নীল এবং সবশেষে হালকা নীল হয়ে এসেছে। য়ুল নিচে তাকাল, গাঢ় নীল সমুদ্র, সাদা মেঘ এবং বহুদূরে ধূসর স্থলভূমি। য়ুলের এখনো বিশ্বাস হতে চায় না এই গ্রহটিতে তার পূর্বপুরুষের জন্ম হয়েছিল এবং সেই পূর্বপুরুষ গ্রহটিকে জীবনের অনুপযোগী করে ধ্বংস করে ফেলেছে।

নভোযানটি থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে আরো নিচে নেমে আসে, গতিবেগ কমে এসেছে, মহাকাশযানের জানালা দিয়ে সাদা মেঘগুলোকে অতিপ্রাকৃতিক দৃশ্যের মতো মনে হয়, পৃথিবী ছাড়া আর কোথাও এই দৃশ্য দেখা সম্ভব বলে মনে হয় না।

কীশ কন্ট্রোল প্যানেল থেকে মাথা তুলে য়ুলের দিকে তাকিয়ে বলল, "য়ুল"।

"বল।"

"আমরা গতিবেগ আরো কমিয়ে নামার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। শব্দের বাধা অতিক্রম করার সময় একটি ঝাঁকুনি হতে পারে।"

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com ~

"ঠিক আছে। কোথায় নামবে?"

"এখনো ঠিক করি নি। কোনো প্রাচীন শহরের কাছাকাছি যেখানে সভ্যতার চিহ্ন পাওয়া যাবে।"

য়ুল একটি নিশ্বাস ফেলল, কোনো কথা বলল না।

নভোযানটি সমুদ্রের তীরে একটি বড় প্রাচীন শহরের কাছে যখন খুব ধীরে ধীরে অবতরণ করল, তখন পৃথিবীর সেই জায়গায় সন্ধ্যা নেমে এসেছে। য়ুল তার আসন থেকে মুক্ত হয়ে জানালার কাছে দাঁড়াল, গোধূলির নরম আলোকে পৃথিবীকে কী রহস্যময়ই না লাগছে! সে যে ক্রসিয়াস গ্রহপুঞ্জ থেকে এসেছে সেখানে কখনো এ রকম আঁধার নেমে আসে না, সেখানে সারাক্ষণ তীব্র কৃত্রিম আলোয় আলোকিত থাকে। আলোহীন এক বিচিত্র অন্ধকার দেখে অনভ্যস্ত য়ুল নিজের ভিতরে এক ধরনের অস্থিরতা অনুভব করে।

কীশ যন্ত্রপাতি খুলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে পরীক্ষা করতে শুরু করে। কিছুক্ষণের মাঝেই সে নিশ্চিত হয়ে যায় শ্বাস-প্রশ্বাসের কৃত্রিম একটা ব্যবস্থা না করে এখানে য়ুল বের হতে পারবে না। কীশ আর্কাইভ ঘর থেকে অক্সিজেন সাপ্লাই, গ্যাস পরিশোধন যন্ত্র বের করে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে নিশ্বাস নেবার জন্য একটি কৃত্রিম ব্যবস্থা দাঁড়া করাতে শুরু করে। য়ুল কীশের দক্ষ হাতের কাজ দেখতে দেখতে বলল, "কীশ।"

"বল য়ুল।"

"তুমি বলছ এখানে কোনো জীবিত মানুষ নেই। কিন্তু এমন তো হতে পারে পৃথিবীর কোনো একটি কোনায় এক-দুইজন মানুষ বেঁচে আছে। নিরিবিলি, কারো সাথে কোনো সম্পর্ক নেই?"

কীশের যান্ত্রিক মুখে সমবেদনার চিহ্ন ফুটে ওঠে। সে নরম গলায় বলল, "তার সম্ভাবনা বলতে গেলে নেই। পৃথিবীর বাতাসে বেঁচে থাকার মতো যথেষ্ট অক্সিজেন নেই।"

"হয়তো তারা কৃত্রিম নিশ্বাস নেবার ব্যবস্থা করে বেঁচে আছে, হয়তো—"

"তুমি কী বলতে চাইছ য়ুল। বলে ফেল।"

য়ুল একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "মনে কর আমার সাথে যদি কারো দেখা হয়, আমি তার সাথে কীভাবে কথা বলব? গত কয়েক শতাব্দীতে ভাষার কত পরিবর্তন হয়েছে—"

কীশ কয়েক মুহূর্ত য়ুলের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "আমি নিশ্চিত তোমার সাথে কারো দেখা হবে না। কিন্তু তুমি যদি সত্যিই চাও, তা হলে তোমার মানসিক শান্তির জন্য আমি তোমার জন্য একটি ভাষা অনুবাদক দাঁড় করিয়ে দেব। পৃথিবীর যে কোনো কালের মানুষের ভাষা বোঝা নিয়ে তোমার কোনো সমস্যা হবে না।"

"ধন্যবাদ কীশ। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি জানি আমি এটি ব্যবহার করার সুযোগ পাব না, তবুও কাল ভোরে বের হওয়ার সময় আমি এটা সাথে রাখতে চাই।"

কীশ স্থির দৃষ্টিতে য়ুলের দিকে তাকিয়ে রইল, কোনো কথা বলল না।

৩

ভাসমান যানটিতে কীশের পাশে য়ুল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এমনিতে দেখে বোঝা যায় না, খুব ভালো করে লক্ষ করলে দেখা যাবে তার নাকের মাঝে সূক্ষ্ম এক ধরনের তন্তু প্রবেশ করেছে, তন্তু দুটি পৃথিবীর বিষাক্ত গ্যাসকে পরিশোধন করে নিশ্বাসের জন্য বিশুদ্ধ বাতাস

সরবরাহ করছে। তার কানে ক্ষুদ্র মডিউলটিতে ভাষা অনুবাদকটি বসিয়ে দেওয়া আছে, পৃথিবীর যে কোনো মানুষের ভাষা সেটি তাকে অনুবাদ করে দেবে। গলার ভোকাল কর্ডের ওপর শব্দ উপস্থাপক যন্ত্রটি য়ুলের কথাকেও মানুষের যে কোনো ভাষায় অনুবাদ করে দেবে। কীশ নিশ্চিত যে য়ুল এই যন্ত্রটি ব্যবহার করার সুযোগ পাবে না কিন্তু য়ুল সেটি এখনো পুরোপুরি বিশ্বাস করে নি।

ভাসমান যানটি পৃথিবীপৃষ্ঠের খুব কাছে গিয়ে দ্রুতগতিতে ছুটে যাচ্ছে, সামনে নানা ধরনের মনিটর, সেগুলো জীবন্ত প্রাণীকে খোঁজার চেষ্টা করছে। কিছু কীটপতঙ্গ এবং অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর সরীসৃপ ছাড়া পৃথিবীতে কোনো প্রাণের চিহ্ন নেই। নিচে শুষ্ক মাটি, শৈবাল এবং ফার্ন জাতীয় কিছু উদ্ভিদ বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কীশ তা সংরক্ষণের জন্য বেশ উৎসাহ নিয়ে কীটপতঙ্গ থেকে শুরু করে শৈবাল এবং ফার্নের নমুনা সংগ্রহ করছে, য়ুল এক ধরনের ঔদাসীন্য নিয়ে কীশের কাজকর্ম লক্ষ করে। পৃথিবী সম্পর্কে তার ভিতরে যে স্বপ্ন ছিল তা পুরোপুরি যন্ত্রণায় পাল্টে গিয়ে তাকে এক ধরনের অস্থিরতায় ডুবিয়ে ফেলছে।

ভাসমান যানটি বিস্তীর্ণ প্রাণহীন শুষ্ক মরু অঞ্চলের ওপর দিয়ে একটি বিধ্বস্ত শহরে প্রবেশ করল। কয়েক শ বছর থেকে এই শহরটি পরিত্যক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শুকনো ধুলোবালুতে অনেক অংশ ঢেকে আছে, বড় বড় কিছু দালান ধসে পড়েছে, কোথাও দালানের কাঠামোটি মৃত মানুষের কংকালের মতো দাঁড়িয়ে আছে। শহরের রাস্তাঘাটে ফাটল, যেটুকু অক্ষত সেখানে ধ্বংসস্তূপ এবং জঙ্গল। স্থানে স্থানে কালো পোড়া অগ্নিদগ্ধ দালানকোঠা। সব মিলিয়ে ভয়ঙ্কর মন–খারাপ–করা দৃশ্য। কীশ যানটি একটি মোটামুটি অক্ষত দালানের কাছে স্থির করিয়ে য়ুলকে নিয়ে নেমে আসে। দালানের ভেঙে পড়া, ধসে যাওয়া দেয়ালের ফাটল দিয়ে দুজন ভিতরে ঢুকল। কীশের মাথায় লাগানো উজ্জ্বল আলোতে চারদিক আলোকিত হয়ে যায়। ধূলিধূসর ঘরের ভিতরে ওরা চারদিকে তাকিয়ে দেখে ভেঙে যাওয়া আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, যোগাযোগের যন্ত্রপাতি, প্রাচীন কম্পিউটার। কীশ তার যান্ত্রিক চোখ এবং গাণিতিক উৎসাহ নিয়ে একটি একটি জিনিস পরীক্ষা করতে থাকে, পুরোনো তথ্য ঘাঁটাঘাঁটি করে পৃথিবীতে ঠিক কী ঘটেছিল এবং ঠিক কীভাবে সব মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল কীশ সেটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে থাকে। এসব বিষয়ে কীশের ধৈর্য প্রায় সীমাহীন, য়ুল তার কাজকর্ম দেখে অবশ্য কিছুক্ষণেই উৎসাহ হারিয়ে ফেলল। সে কীশের কাছে গিয়ে বলল, "কীশ আমি এই অন্ধকার ঘুপচি ঘরে বসে থাকতে চাই না।"

"তা হলে কী করতে চাও?"

"বাইরে থেকে ঘুরে আসি। এই ধ্বংস হয়ে যাওয়া শহরটা খুব মন খারাপ করা। আমি সমুদ্র তীরে গিয়ে বসি। সমুদ্রের পানি এখনো গাঢ় নীল। বসে বসে দেখতে মনে হয় ভালো লাগবে।"

"তুমি একটু অপেক্ষা করতে পারবে? আমি একটা ক্রিস্টাল ডিস্ক পেয়েছি, মনে হচ্ছে এর মাঝে কিছু তথ্য আছে।"

"থাকুক। এখানে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।"

কীশ উঠে দাঁড়াল। বলল, "তা হলে চল। আমি এখানে পরে আসব।"

কীশ য়ুলকে নিয়ে আবার ভাসমান যানে উঠে বসল। সুইচ স্পর্শ করতেই ভাসমান যানের নিচে দিয়ে আয়োনিত গ্যাস বের হতে শুরু করে এবং ভাসমান যানটি সাবলীল গতিতে উপরে উঠে এসে ঘুরে দক্ষিণ দিকে সমুদ্রের তীরে যেতে শুরু করে। বিস্তীর্ণ বিবর্ণ পাথর পার হয়ে ধূলিধূসর একটা অঞ্চলে চলে আসে, সেই অঞ্চলটি পার হওয়ার পরই হঠাৎ

করে আদিগন্তবিস্তৃত একটি বালুবেলা দেখা যায়। কীশ ভাসমান যানটির গতিবেগ বাড়িয়ে দেয়, পিছনে ধুলো উড়িয়ে তারা ছুটে যেতে থাকে, বাতাসে যুলের চুল উড়তে থাকে। কিছুক্ষণের মাঝে বিশুদ্ধ বাতাসের প্রবাহ ছাপিয়ে যুল তার নাকে সমুদ্রের নোনা পানির গন্ধ পেল। বহুদূরে নীল সমুদ্র দেখা যায়, যুল কেন জানি নিজের ভিতরে এক ধরনের চঞ্চলতা অনুভব করতে থাকে।

গ্যালাক্সির অন্য প্রান্ত থেকে যুল তার বুকের ভিতরে করে পৃথিবীর জন্য ভালবাসা নিয়ে এসেছিল। শুষ্ক বিবর্ণ বিধ্বস্ত পৃথিবীর ধ্বংসস্তূপে সে এই ভালবাসা দিতে পারছিল না। নীল সমুদ্র দেখে হঠাৎ তার ভিতরে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ধরনের আবেগের জন্ম হয়, সে আবিষ্কার করে নিজের অজান্তেই তার চোখ ভিজে আসছে।

সমুদ্রের ভেজা বালুতে ভাসমান যানটিকে থামিয়ে যুল এবং কীশ নেমে এল। যুল সমুদ্রের দিকে এগিয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "আহা! কী সুন্দর।"

কীশ নরম গলায় বলল, "আমি শুনে খুব খুশি হয়েছি যুল যে এই সমুদ্রটি দেখে তোমার এত ভালো লাগছে!"

যুল অবাক হয়ে বলল, "তোমার ভালো লাগছে না?"

"লাগছে। কিন্তু আমি তো মানুষ নই—আমার সৌন্দর্যের অনুভূতি ভিন্ন। তোমাদের মতো এত ব্যাপক নয়—অনেক নিচু স্তরের অনুভূতি।"

যুল মাথা নেড়ে হেঁটে হেঁটে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। সমুদ্রের ঢেউ একটি একটি করে এগিয়ে আসছে, কাছাকাছি আসার পর সাদা ফেনা তুলে আছড়ে পড়ছে। ভেজা বালুতে কিছু শামুক এবং জলজ লতাপাতা। যুল হেঁটে হেঁটে পানির কাছাকাছি দাঁড়াল, ঢেউ তার কাছাকাছি এসে পায়ের কাছে ভেঙে পড়ল—যুল নিজের ভিতরে এক ধরনের শিহরন অনুভব করে।

যুল আরো এক পা এগিয়ে যেতেই কীশ পিছন থেকে সতর্ক করে বলল, "বেশি কাছে যেও না যুল, ঢেউয়ের আঘাতে তোমাকে পানিতে টেনে নেবে।"

যুল মাথা নাড়ল, বলল, "নেবে না। মানুষের শরীরের অর্ধেক থেকে বেশি পানি। পানির সাথে মানুষের এক ধরনের ভালবাসা আছে। আমি শুনেছি। প্রাচীনকালে পানিকে নাকি বলত জীবন!"

কীশ একটু এগিয়ে এসে বলল, "তবু সাবধান থাকা ভালো। ক্রসিয়াস গ্রহপুঞ্জে এরকম সমুদ্র নেই, এত পানি একসাথে আমরা কখনো দেখি নি। পানির সাথে কীভাবে বেঁচে থাকতে হয় তুমি–আমি জানি না।"

যুল অন্যমনস্কভাবে বলল, "কিছু জিনিস মনে হয় মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। পানির সাথে ভালবাসা হচ্ছে একটা। তুমি তো জান পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের বিকাশ হয়েছিল পানিতে।"

"জানি।"

"আগে ব্যাপারটা খুব অবাক লাগত। এখন এই বিশাল আদিগন্ত বিস্তৃত নীল সমুদ্র দেখে মনে হচ্ছে সেটাই তো স্বাভাবিক। সেটাই তো সত্যি।"

কীশ কোনো কথা বলল না। যুল ভেজা পানিতে পা ভিজিয়ে সমুদ্রের ঢেউয়ের কাছাকাছি হাঁটতে থাকে। এক একটি ঢেউ সাদা ফেনা তুলে তার পায়ের কাছে আছড়ে পড়তেই সে তার নিজের ভিতরে এক বিচিত্র আবেগ অনুভব করে। সমুদ্রের নোনা বাতাসে তার চুল, নিও পলিমারের পোশাক উড়তে থাকে। যুল নিজের ভিতরে এক ধরনের বিষণ্ণতা অনুভব করে, এক সময় এই সমুদ্রতট মানুষের কলকাকলীতে মুখরিত হয়ে থাকত, সেই কথাটা সে কিছুতেই ভুলতে পারে না।

কীশ কিছুক্ষণ একা একা দাঁড়িয়ে থাকে, আদিগন্ত বিস্তৃত বিশাল নীল সমুদ্র দেখে যুলের ভিতরে হঠাৎ যে ধরনের আবেগের জন্ম হয়েছে কীশ তার সাথে পরিচিত নয়, তার পক্ষে সেটা অনুভব করাও সম্ভব নয়। যুল সমুদ্রতীর থেকে এখন খুব সহজে ফিরে যাবে বলে মনে হয় না। কীশ কিছুক্ষণ যুলকে লক্ষ্য করে ভাসমান যানটিতে ফিরে গেল মিছিমিছি সময় নষ্ট না করে, একটু আগে বিধ্বস্ত দালান থেকে সে যে ক্রিস্টাল ডিস্কটি উদ্ধার করেছে তার ভিতর থেকে কোনো তথ্য বের করা যায় কি না সেটাই চেষ্টা করে দেখবে।

কিছুক্ষণের মাঝেই কীশ ক্রিস্টাল ডিস্কে একটা বিচিত্র জিনিস আবিষ্কার করে, এখানে মানুষের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ঠিক আগে পৃথিবীতে কী হয়েছিল সে সম্পর্কে কিছু অস্পষ্ট তথ্য আছে। পৃথিবীর বাতাসের বিষক্রিয়া, পারমাণবিক বিস্ফোরণ, বিষাক্ত গ্যাসের কবল থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্য কী করা হয়েছিল তার আভাস দেওয়া আছে। সে সম্পর্কে তথ্য কোথায় পাওয়া যেতে পারে সেটি নিয়েও কিছু গোপন তথ্য রয়েছে।

কীশ খুব কৌতূহলী হয়ে ওঠে, ক্রিস্টাল ডিস্কটা হাতে নিয়ে সে দ্রুত পায়ে হেঁটে যুলের কাছে হাজির হল। যুল কীশকে দেখে একটু অবাক হয়ে বলল, "কী হয়েছে কীশ! তোমাকে মানুষের মতো উত্তেজিত দেখাচ্ছে!"

"তুমি ঠিকই বলেছ। আমার ভিতরে উত্তেজনা থাকলে আমি মানুষের মতোই উত্তেজিত হতাম।"

"কেন? কী হয়েছে?"

"ক্রিস্টাল ডিস্কটা বিশ্লেষণ করে কিছু চমকপ্রদ তথ্য পেয়েছি।"

"কী তথ্য?"

"এই পৃথিবীতে মানুষের শেষ মুহূর্তের তথ্য। যখন মানুষ বুঝতে পেরেছে এই পৃথিবীতে মানুষ বেঁচে থাকতে পারবে না তখন তারা কী করেছে তার তথ্য।"

যুল একটু চমকে উঠে কীশের দিকে তাকাল, "কী করেছে?"

"আমি এখনো জানি না। এই ক্রিস্টাল ডিস্কে সেই তথ্য নেই, কিন্তু কোথায় আছে তার আভাস দেওয়া আছে।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ সত্যি। তোমার যদি আপত্তি না থাকে আমি সেটা খুঁজে বের করতে চাই।"

"আমার কোনো আপত্তি নেই।"

"তা হলে চল যাই।"

যুল একটু ইতস্তত করে বলল, "আমার সেই ধ্বংসস্তূপে যেতে ইচ্ছে করছে না। তুমি যাও আমি এখানে এই সমুদ্রতীরে তোমার জন্য অপেক্ষা করব।"

কীশকে কয়েক মুহূর্ত বেশ বিভ্রান্ত দেখায়। সে একটু ইতস্তত করে বলল, "সেটা হয় না যুল। নিরাপত্তা বিধানে স্পষ্ট করে লেখা আছে মানুষকে বিপজ্জনক পরিবেশে কখনো একা রাখতে হয় না।"

যুল হেসে ফেলল, বলল, "এটা মোটেও বিপজ্জনক পরিবেশ নয় কীশ! এটা পৃথিবী।"

"কিন্তু এটা বাসযোগ্য পৃথিবী নয় যুল। এই পৃথিবীতে বিশুদ্ধ বাতাসের প্রবাহ ছাড়া তুমি এক মিনিটও বেঁচে থাকতে পারবে না।"

"কিন্তু আমার ফুসফুসে তো বিশুদ্ধ বাতাসই যাচ্ছে। একুশ ভাগ অক্সিজেন উনআশি ভাগ বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন।"

"কিন্তু—"

"কোনো কিন্তু নেই। তুমি যাও। ঐ মনখারাপ ঘরে তোমার যেটা খোঁজাখুঁজি করার ইচ্ছে সেটা খুঁজে বেড়াও। আমি এখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করব।"

কীশ কোনো কথা না বলে য়ুলের দিকে তাকিয়ে রইল। য়ুল বলল, "তা ছাড়া তোমার সাথে তো যোগাযোগ মডিউল রয়েছে, তুমি যেখানেই থাক আমাকে দেখতে পাবে। আমার সঙ্গে কথা বলতে পারবে। যদি সত্যিই কোনো বিপদ হয় তা হলে তুমি চলে এসো আমাকে উদ্ধার করার জন্য।"

"ঠিক আছে। আমি তা হলে যাচ্ছি। তুমি এখানে থাক—সমুদ্রের বেশি কাছে যাবে না।"

"যাব না।"

"তোমাকে কিছু খাবার পানীয় দিয়ে যাচ্ছি। এবং একটা অস্ত্র।"

"অস্ত্র?"

"হ্যাঁ, আমি জানি সেটা তোমার ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন হবে না, কিন্তু তবু দিয়ে যাচ্ছি। সাথে রেখো।"

"বেশ।" য়ুল হেসে ফেলল, বলল, "যদি সত্যি কোনো জীবন্ত প্রাণী আমাকে আক্রমণ করে সেটা কি একটা আনন্দের ঘটনা হবে না? তার অর্থ হবে পৃথিবীতে এখনো প্রাণ রয়েছে।"

কীশ মাথা নাড়ল, বলল, "সেটি তুমি সত্যিই বলেছ য়ুল। সেটি এক অর্থে আসলেই আনন্দের ঘটনা হবে। তবে তুমি যদি তখন নিজেকে রক্ষা করতে পার সেটি হবে দ্বিগুণ আনন্দের ঘটনা।"

কিছুক্ষণের মাঝেই য়ুল দেখল প্রচণ্ড গর্জন করে ভাসমান যানটি বালু উড়িয়ে উত্তর দিকে যেতে শুরু করেছে।

AMARBOI.COM

৪

য়ুল একাকী সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে থাকে, সামনে যত দূর চোখ যায় সমুদ্রের আশ্চর্য নীল জলরাশি। সে অন্যমনস্কভাবে বাম দিকে তাকাল। বহু দূরে আবছা ছায়ার মতো কিছু উঁচু-নিচু পাহাড়, তার পাদদেশে সমুদ্রের বিশাল তরঙ্গ ঝাপটা দিয়ে পড়ছে। দৃশ্যটি নিশ্চয়ই অভূতপূর্ব—য়ুল নিজের অজান্তেই সেদিকে হাঁটতে শুরু করে। হাঁটতে হাঁটতে তার হঠাৎ একটি বিচিত্র জিনিস মনে হল। এক সময় এই পৃথিবীতে লক্ষকোটি মানুষ বেঁচে ছিল, এখন এখানে সে একা। সমস্ত পৃথিবীতে সে একমাত্র জীবিত মানুষ—ব্যাপারটি সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না।

য়ুল হাঁটতে হাঁটতে একসময় উঁচু-নিচু পাহাড়ি এলাকার কাছাকাছি হাজির হল, ঢাল বেয়ে সে ধীরে ধীরে উপরে উঠে এসেছে, সমুদ্রের পানি নিচে পাথরে আছড়ে পড়ছে। য়ুল একটা বড় পাথরে বসে দীর্ঘসময় নিচে তাকিয়ে থাকে, তারপর আবার হাঁটতে শুরু করে। সামনে বড় পাথরের দেয়াল খাড়া উঠে গেছে, তার পাশ দিয়ে সরু চিলতে একটা ফুটো, একটু অসাবধান হলেই অনেক নিচে গিয়ে পড়বে। একা সম্ভবত এদিক দিয়ে যাওয়া উচিত নয়, হঠাৎ করে একটা দুর্ঘটনা হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। কিন্তু য়ুল কী ভেবে সেই সরু ফুটো দিয়ে পাথর আঁকড়ে হাঁটতে থাকে, কিছুক্ষণের মাঝেই সে একটা খোলা অংশে চলে আসে।

হঠাৎ করে খানিকটা জায়গা সমুদ্রের অনেক ভিতরে ঢুকে গেছে। য়ুল উঁচু–নিচু পাথর অতিক্রম করে সাবধানে সামনে এগিয়ে যায়, পাথরের একেবারে কিনারায় এসে সে দাঁড়াল, নিচে সমুদ্রের নীল পানি, পানির গভীরতা নিশ্চয়ই অনেক বেশি, কারণ এখানে কোনো বড় ঢেউ নেই। শান্ত বাতাসের সঙ্গে ছোট ছোট নিরীহ ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে। তীরে যেরকম সমুদ্রের গর্জন শোনা যাচ্ছিল, এখানে সে রকম কিছু নেই। চারপাশে এক ধরনের সুমসাম নীরবতা, পরিবেশটি অনেকটুকু অতিপ্রাকৃত। য়ুল একটা বড় পাথরে হেলান দিয়ে দাঁড়াল এবং হঠাৎ তার মনে হল সে এখানে একা নয়। য়ুল কেমন যেন চমকে ওঠে, অনুভূতিটি এত জীবন্ত সে একবার মাথা ঘুরিয়ে চারদিকে তাকাল। চারপাশে কেউ কোথাও নেই, তবুও তার ভিতরে অন্য কারো উপস্থিতির অনুভূতিটি জেগে রইল।

য়ুল সাবধানে আরো একটু সামনে এগিয়ে যায়, নিচে শান্ত গভীর নীল পানি, উপরে মেঘহীন নীল আকাশ। সমুদ্রের বাতাস বইছে, বাতাসে এক ধরনের নোনা গন্ধ। য়ুল হঠাৎ আবার চমকে ওঠে, হঠাৎ করে আবার তার মনে হয় কেউ তার দিকে তাকিয়ে আছে। চারদিকে তাকাল, কোথাও কেউ নেই, তা হলে কেন তার মনে হচ্ছে কেউ তার দিকে তাকিয়ে আছে?

য়ুল হঠাৎ নিজের ভিতরে এক ধরনের ভীতি অনুভব করে, কোনো কিছু না জানার ভীতি, না বোঝার ভীতি। সে একটু পিছনে সরে এসে বড় একটা পাথরে হেলান দিয়ে বসতে চাইল, এক পা পিছিয়ে আসতেই হঠাৎ করে ছোট একটা নুড়ি পাথরে তার পা হড়কে যায়। য়ুল তাল সামলে কোনোমতে দাঁড়িয়ে গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়বার তার পা হড়কে যায় এবং কিছু বোঝার আগেই সে পাথরের গা ঘেঁষে গভীর সমুদ্রের পানিতে গিয়ে পড়ল। ঘটনার আকস্মিকতায় সে এত অবাক হয়েছিল যে তার মাঝে আতঙ্ক বা ভীতি পর্যন্ত জন্মাবার সময় হয় নি।

পানিতে ডুবে যেতে যেতে য়ুল হঠাৎ করে বুঝতে পারল মানুষের দেহ আসলে পানিতে ভেসে থাকতে পারে না। ভেসে থাকতে হলে সাঁতার নামক একটি অত্যন্ত প্রাচীন শারীরিক প্রক্রিয়া অনেক কৌশলে আয়ত্ত করতে হয়। ক্রসিয়াস গ্রহপুঞ্জে পানির পরিমাণ এত কম যে সাঁতার শেখা দূরে থাকুক, সেখানে কোনো মানব সন্তানই কখনো পানিতে নিজের পুরো দেহকে ডোবাতে পারে নি।

পানিতে ডুবে গেলেও য়ুল খুব বেশি আতঙ্কিত হল না কারণ তার মনে আছে নিশ্বাস নেবার জন্য দুটি সূক্ষ্ম তন্তু তার নাকে বিশুদ্ধ বাতাস প্রবাহিত করছে। য়ুলের বুকের কাছাকাছি যোগাযোগ মডিউলটি এতক্ষণে নিশ্চয়ই কীশের কাছে তথ্য পৌঁছে দিয়েছে এবং কীশ তাকে উদ্ধার করার জন্য একটা ব্যবস্থা করবেই।

সমুদ্রের শীতল পানিতে য়ুলের শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে, চোখের সামনে পানি এবং সেই পানির নিচের জগতটি একটি অবাস্তব জগতের মতো মনে হয়। য়ুল হাত নেড়ে কোনোভাবে ভেসে ওঠার চেষ্টা করতে করতে একবার নিশ্বাস নিতে চেষ্টা করে এবং হঠাৎ করে আবিষ্কার করে সে নিশ্বাস নিতে পারছে না। যে তন্তুটি তার নাকে বিশুদ্ধ বাতাস প্রবাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করছিল পানির নিচে সেটি কাজ করছে না। কেন কাজ করছে না সেটি বোঝার চেষ্টা করে লাভ নেই, সমুদ্রে পড়ে গিয়ে প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে কিছু একটা ঘটে গেছে, তন্তুটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে কিংবা বাতাসের চাপের সমতা নষ্ট হয়ে গেছে—কিন্তু সেটি এখন আর বিশ্লেষণ করার সময় নেই, সে নিশ্বাস নিতে পারছে না সেটিই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা!

যুল হঠাৎ করে এক ধরনের ভয়াবহ আতঙ্ক অনুভব করে, সে আরো একবার নিশ্বাস নেবার চেষ্টা করল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার নাকে–মুখে লোনা পানি প্রবেশ করে। সে পাগলের মতো ছটফট করে উপরে উঠতে চেষ্টা করে কিন্তু কোনো লাভ হয় না, সমুদ্রের পানির আরো গভীরে নেমে যেতে থাকে। যুল নিশ্বাস নেবার জন্য আবার চেষ্টা করল কিন্তু নিশ্বাস নিতে পারল না। তার সমস্ত বুক একটু বাতাসের জন্য হাহাকার করতে থাকে, সে মুখ হাঁ করে নিশ্বাস নেবার চেষ্টা করতে থাকে। ছটফট করতে করতে সে বুঝতে পারে সে চেতনা হারিয়ে ফেলছে, তার চোখের সামনে একটি কালো পরদা নেমে আসছে—সবকিছু শেষ হয়ে জীবনের ওপর যবনিকা নেমে আসছে! তা হলে এটাই কি মৃত্যু? এটাই কি শেষ?

যুলের দেহ শিথিল হয়ে আসে, সে পানির গভীরে নেমে যেতে থাকে, হিমশীতল পানিতে নিজের অজান্তেই তার দেহ কেঁপে কেঁপে উঠছে। তার অচেতন মস্তিষ্কে ছায়ার মতো দৃশ্য ভেসে যেতে থাকে। তার শৈশব–কৈশোর এবং যৌবনের দৃশ্য ছাড়া–ছাড়াভাবে মনে হয়, প্রিয়জনের চেহারা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বুকের মাঝে আটকে থাকা বদ্ধ নিশ্বাসে মনে হয় তার বুক ফেটে যাবে—এখন মৃত্যুই বুঝি শান্তি নিয়ে আসবে—সেই মৃত্যু কি এগিয়ে আসছে? কোমল চেহারার একটি অপার্থিব মানবী তার দিকে এগিয়ে আসছে, তার মুখের ওপর মুখ নামিয়ে মেয়েটি তার ঠোঁট স্পর্শ করল। এটাই কি মৃত্যু? যুল চোখ বন্ধ করল, সকল যন্ত্রণা হঠাৎ করে যেন দূর হয়ে গেল। বুকভরে সে যেন নিশ্বাস নিতে পারল। যুলের মনে হল তাকে ঘিরে অসংখ্য মানবী নৃত্য করছে। সে চোখ খুলে তাকানোর চেষ্টা করল, কিন্তু তাকাতে পারল না। হঠাৎ করে তার চোখের সামনে গাঢ় অন্ধকার নেমে এল।

এটিই কি মৃত্যু? যুল উত্তর খুঁজে পেল না।

AMARBOI.COM

৫

নভোযানের নিরাপদ বিছানা থেকে উঠে বসে যুল অপরাধীর মতো কীশের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার জীবন রক্ষা করার জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।"

কীশ কোনো কথা বলল না, এক ধরনের ভাবলেশহীন মুখে যুলের দিকে তাকিয়ে রইল। যুল আবার বলল, "আমি খুব দুঃখিত তোমাকে এত বড় ঝামেলার মাঝে ফেলে দেওয়ার জন্য।"

কীশ এবারেও কোনো কথা বলল না, যদি সে একটি বায়োবট না হত তা হলে যুল নিশ্চয়ই ভাবত কীশ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে আছে। যুল তার বিছানা থেকে নামার জন্য পা নিচে নামিয়ে বলল, "কীশ, সত্যিই আমি খুব দুঃখিত—তুমি হয়তো বিশ্বাস করছ না, কিন্তু আমি সত্যিই বলছি।"

"আমি তোমার কথা অবিশ্বাস করছি না যুল— আমি তোমার প্রত্যেকটি কথা বিশ্বাস করেছি। তবে—"

"তবে কী?"

"আমার ধারণা ছিল আমি মানুষকে বুঝতে পারি, কিন্তু আজকে আমি আবিষ্কার করেছি যে আমি মানুষকে বুঝতে পারি না। মানুষের মাঝে নিজেকে নিজের ধ্বংস করে ফেলার একটা প্রবণতা রয়েছে। সম্পূর্ণ অকারণে মানুষ নিজেকে ধ্বংস করে ফেলে।"

য়ুল একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "সেটি সত্যি নয়। আমি মোটেই নিজেকে ধ্বংস করতে যাচ্ছিলাম না। আমি—"

"তুমি যেখানে উপস্থিত হয়েছিলে এবং যেভাবে দুর্ঘটনা ঘটিয়েছ তার সঙ্গে আত্মহত্যার খুব বেশি পার্থক্য নেই।"

"সেটি সত্যি নয়। যেটা ঘটেছে সেটা একটা দুর্ঘটনা।"

"যে দুর্ঘটনা আহ্বান করে আনা হয় সেটি দুর্ঘটনা নয়, সেটি এক ধরনের নির্বুদ্ধিতা। আর যে নির্বুদ্ধিতার জন্য জীবন বিপন্ন হতে পারে সেটি আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছু নয়।"

য়ুল দুর্বলভাবে হাসার চেষ্টা করে বলল, "কিন্তু তুমি অস্বীকার করতে পারবে না যে এটি একটি অসাধারণ অভিজ্ঞতা। আমি শুনেছিলাম মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে মানুষের চোখের সামনে তার পুরো স্মৃতি ভেসে যায়; কথাটি সত্যি—আমি আমার শৈশবের অনেক দৃশ্য দেখেছি। যখন কিছুতেই নিশ্বাস নিতে পারছিলাম না, জীবনের সব আশা ছেড়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলছিলাম, তখন দেখলাম একটি নারীমূর্তি আমার কাছে এগিয়ে আসছে, এসে আমার ঠোঁটে ঠোঁট রেখে আমাকে চুমু খাচ্ছে! আমি ভেবেছিলাম সেটা নিশ্চয়ই মৃত্যুদূত!"

কীশ কোনো কথা না বলে য়ুলের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। য়ুল একটু অবাক হয়ে বলল, "তুমি এভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছ কেন?"

"এমনি।"

"কী হয়েছে? আমি কি কিছু ভুল বলেছি?"

"যে নারীমূর্তি তোমাকে চুমু খেয়েছে তার চেহারা তোমার মনে আছে?"

"না, পুরো ব্যাপারটি ছিল এক ধরনের কাল্পনিক দৃশ্য, এক ধরনের হেলুসিনেশান। অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় যেরকম দৃষ্টিভ্রম হয় সেরকম। শুধু একটি জিনিস মনে আছে—আমার ঠোঁটে ঠোঁট রাখার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল নিশ্বাস নিতে না পারার কষ্টটা কেটে গেল। সম্ভবত আমার মস্তিষ্ক তখন আমার শারীরিক যন্ত্রণার অনুভূতি কেটে দিয়েছিল। আমি শুনেছি মানুষ যখন অনেক কষ্ট পায় তখন কষ্টের অনুভূতি চলে যায়।"

কীশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে য়ুলের চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলল, "তুমি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান একজন মানুষ য়ুল। অত্যন্ত সৌভাগ্যবান একজন মানুষ। তুমি একেবারে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এসেছ।"

"সেজন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ কীশ। তুমি যদি ঠিক সময়ে গিয়ে আমাকে রক্ষা না করতে—"

"আমি তোমাকে রক্ষা করি নি য়ুল।"

য়ুল বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠে বলল, "তুমি কী বলছ কীশ?"

"আমি তোমাকে রক্ষা করি নি।"

"তা হলে?"

"যোগাযোগ মডিউলে সঙ্কেত পেয়ে ছুটে গিয়ে দেখি তোমার অচেতন দেহ সমুদ্রের বালুবেলায় শুয়ে আছে।"

য়ুল হতচকিতের মতো কীশের দিকে তাকিয়ে রইল। কীশ অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, "আমার পক্ষে তোমাকে রক্ষা করা সম্ভব ছিল না, কিছুতেই আমি সময়মতো তোমার কাছে যেতে পারতাম না।"

"তা হলে?" য়ুল হতবাক হলে বলল, "তা হলে আমাকে কে রক্ষা করেছে?"

AMARBOI.COM

"জ্ঞান হারানোর আগে তুমি যে নারীমূর্তিটি দেখেছিলে সেটি কোনো কাল্পনিক দৃশ্য ছিল না। সে মৃত্যুদূত ছিল না।"

"তা হলে?"

"সে তোমার ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে তোমার বুকের ভিতর অক্সিজেন দিয়ে তোমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল।"

ব্যাপারটি বুঝতে য়ুলের কয়েক মুহূর্ত সময় লেগে যায়। যখন সে বুঝতে পারে তখন সে প্রায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়, কীশের কাঁধ ধরে বলল, "তুমি কেমন করে জান?"

"তোমার শরীরে যোগাযোগ মডিউলে আমি দেখেছি।" কীশ এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল, "ইচ্ছে করলে তুমিও দেখতে পার। পুরো ঘটনাটুকু রেকর্ড করা আছে।"

"কোথায়?" য়ুল প্রায় চিৎকার করে বলল, "কোথায়?"

"এস আমার সঙ্গে।"

কীশ নভোযানের যোগাযোগ কেন্দ্রে সুইচ স্পর্শ করতেই য়ুলের বুকে লাগানো যোগাযোগ মডিউলে রেকর্ড করা ছবিগুলো ভেসে আসে। প্রথম দিকের ঘটনাগুলো দ্রুত পার করে য়ুল সমুদ্রের পানিতে পড়ে যাওয়া থেকে দৃশ্যগুলো দেখতে শুরু করে। পানিতে তলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে চারপাশে এক ধরনের আধো আলো আধো ছায়ার মতো পরিবেশ হয়ে যায়। য়ুলকে সরাসরি দেখা যাচ্ছিল না কিন্তু বাঁচার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় সে হাত-পা ছুড়ছে সেটি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। এক সময় সে হাঁপ ছেড়ে দিয়ে তলিয়ে যাচ্ছে—চারদিকে এক ধরনের অন্ধকার নেমে আসছে এবং হঠাৎ দূর থেকে কিছু মানবী মূর্তিকে দেখা গেল, নিরাভরণ দেহে তারা জলচর প্রাণীর আশ্চর্য সাবলীলতায় তার কাছে ছুটে আসে। তাকে ঘিরে কয়েকবার ঘুরে আসে, একজন সাবধানে তাকে ধরে উপরে তোলার চেষ্টা করে, বুকের মাঝে কান লাগিয়ে কিছু একটা শোনার চেষ্টা করে। নিজেদের মাঝে কিছু একটা নিয়ে বলাবলি করে তারপর একজন এগিয়ে এসে তার ঠোঁটে ঠোঁট স্পর্শ করে তার বুকের ভিতরে বাতাস ফুঁকে দিতে শুরু করে। দেখতে দেখতে য়ুলের দেহে সজীবতা ফিরে আসে। নারীমূর্তিগুলো য়ুলকে ধরে পানির উপরে তুলে এনে সযত্নে বালুবেলায় শুইয়ে রেখে আসে।

য়ুল হতবাক হয়ে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকে। একটা বড় নিশ্বাস নিয়ে বলল, "এরা কারা কীশ?"

কীশ নরম গলায় বলল, "মানুষ। পৃথিবীর মানুষ।"

"তারা কোথায় থাকে?"

"পানিতে?"

"পানিতেই?"

"হ্যাঁ। পৃথিবীর বাতাস বিষাক্ত হয়ে যাওয়ায় মানুষ পানিতে ফিরে গেছে। জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করে সমুদ্রের পানি থেকে দ্রবীভূত অক্সিজেন নেওয়ার মতো ক্ষমতা করে দেওয়া হয়েছে। এরা এখন পানিতে বেঁচে থাকতে পারে।"

"তুমি কেমন করে জান?"

"আমি নিশ্চিতভাবে জানি না। আমি অনুমান করছি। ক্রিস্টাল ডিস্ক থেকে যেসব তথ্য পেয়েছি সেখানে এ ধরনের ব্যাপারে আভাস দেওয়া হয়েছিল। মানুষকে রক্ষা করার জন্য বড় ধরনের দৈহিক পরিবর্তন করে দেওয়া। আমি তখন বুঝতে পারি নি, এখন বুঝতে পারছি।"

য়ুল হেঁটে হেঁটে নভোযানের জানালার কাছে দাঁড়ায়, বাইরে অন্ধকার নেমে এসেছে। আকাশে একটা অসম্পূর্ণ চাঁদ, চাঁদের হালকা জ্যোৎস্নায় বাইরে এক ধরনের অতিপ্রাকৃতিক

পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে যুল হঠাৎ করে নিজের ভিতরে এক ধরনের শিহরন অনুভব করে। এই পৃথিবীতে সে একা নয়, এখানে মানুষ আছে।

যুল কীশের দিকে তাকাল, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আমি ওদের সাথে দেখা করতে যাব কীশ।"

"আমি জানতাম তুমি যেতে চাইবে।"

"তুমি ব্যবস্থা করে দিতে পারবে না?"

কীশ নরম গলায় বলল, "আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি।"

৬

সমুদ্রের নীল পানি থেকে কয়েক ফুট উঁচুতে ভাসমান যানটি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যুলের শরীরের সাথে লাগিয়ে রাখা অক্সিজেন সিলিন্ডারের চাপটুকু পরীক্ষা করে কীশ বলল, "তোমার এই সিলিন্ডারে যে পরিমাণ অক্সিজেন আছে সেটা টেনেটুনে ছয় ঘণ্টা ব্যবহার করা যাবে। কাজেই তুমি এই সময়ের ভিতরে ফিরে আসবে।"

যুল মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিক আছে।"

"সোজাসুজি উপরে ভেসে উঠো, আমি তোমাকে খুঁজে বের করব।"

"বেশ।"

"তোমার শরীরের ওপর যে পলিমারটুকু দেওয়া হয়েছে সেটা তাপ নিরোধক, তোমার ঠাণ্ডা লাগার কথা নয়। আস্তরণটুকু বেশ শক্ত—ছোটখাটো আঘাতে ছিঁড়ে যাবে না।"

"বেশ।"

"চোখের ওপর যে কন্টাক্ট লেন্স দেওয়া হয়েছে সেটি দিয়ে এখন তুমি পানির ভিতরে পরিষ্কার দেখতে পাবে। কোমরের ব্যাগে আলোর জন্য ফ্লেয়ার আছে। প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবে। ওদের সঙ্গে কথা বলার জন্য অনুবাদক যন্ত্র থাকল, তুমি তো জান কীভাবে ব্যবহার করতে হয়।"

"জানি।"

"চমৎকার! পানিতে সাঁতার দেওয়ার জন্য, ওঠা-নামা করার জন্য ছোট জেট প্যাকটা থাকল। যোগাযোগ মডিউলটা তো আছেই, আমি তোমার সঙ্গে সারাক্ষণ যোগাযোগ রাখব। কোনো সমস্যা হলে বা বিপদ হলে আমাকে জানাবে।"

"জানাব।"

"আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার—তোমার কোমরে একটা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ঝুলিয়ে দিয়েছি। ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় এটি কাজ করতে পারে। আঘাত দিয়ে অচেতন করে দেওয়া থেকে শুরু করে একটা বিশাল পাহাড়কে চূর্ণ করে দিতে পারবে। আমি আশা করছি তোমার এটি ব্যবহার করতে হবে না, কিন্তু যদি ব্যবহার করতে হয় খুব সাবধান।

"তুমি নিশ্চিন্ত থাক কীশ।"

"বেশ। এবারে তা হলে তুমি যেতে পার।"

"ধন্যবাদ কীশ। তোমাকে ধন্যবাদ।"

ভাসমান যানটি পানির আরো কাছে নেমে আসে, যুল এক পাশে দাঁড়িয়ে খুব সাবধানে সমুদ্রের পানিতে নেমে পড়ে। এক মুহূর্তের জন্য শীতল পানিতে তার সারা দেহ কাঁটা দিয়ে

ওঠে, কিছুক্ষণেই তার দেহের তাপমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে পলিমারটুকু উষ্ণ হয়ে উঠবে। য়ুল চারপাশে তাকাল, আধো আলো আধো ছায়ার একটি অতিপ্রাকৃত পরিবেশ, তার মাঝে এক ধরনের অশরীরী সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে।

য়ুল নিশ্বাস নিয়ে তার শ্বাসযন্ত্রটি পরীক্ষা করে দেখে, তারপর যোগাযোগ মডিউলটি স্পর্শ করে বলল, "কীশ! সবকিছু ঠিক আছে।"

"চমৎকার!"

"তোমার সঙ্গে দেখা হবে কীশ, আমি যাচ্ছি।"

"মানুষের সঙ্গে তোমার পরিচয় আনন্দময় হোক।"

য়ুল যোগাযোগ মডিউলটি বন্ধ করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। ছোট জেট প্যাকটি থেকে পানির ধারা বের হয়ে এসে তাকে সামনে নিয়ে যাচ্ছে। য়ুল সংবেদনশীল যন্ত্রে পানির নিচে জলজ শব্দ শুনতে শুনতে সতর্ক চোখে চারপাশে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে যেতে থাকে। এই বিশাল সমুদ্রে সে কাউকে খুঁজে পাবে না, তাকে অন্যেরা খুঁজে নেবে সেটাই সে আশা করে আছে।

সমুদ্রের নিচে থেকে প্রবালের পাহাড় উঁচু হয়ে উঠে এসেছে, সেখানে নানা ধরনের জলজ গাছ, তার ভিতরে রঙিন মাছ ছোটাছুটি করছে। উপরের পৃথিবী যেরকম প্রাণহীন, সমুদ্রের নিচে মোটেও সেরকম নয়। দেখে মনে হয় উপরের প্রাণহীন জগতের সব প্রাণী বুঝি এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে।

য়ুল প্রবাল পাহাড়ের পাদদেশে এসে থামে। তাকে দেখে কিছু রঙিন মাছ ছুটে পালিয়ে গেল, পায়ের কাছাকাছি একটা গর্ত থেকে ছোট একটি অক্টোপাস দ্রুত আড়ালে সরে গেল। য়ুল উপরের দিকে তাকাল, সূর্যের আলোতে সমুদ্রপৃষ্ঠ বিচিত্র এক ধরনের আলোতে ঝিকমিক করছে। য়ুল তার জেট প্যাক চালু করে আবার সামনে এগিয়ে যেতে শুরু করে হঠাৎ করে থেমে গেল, তার মনে হল সে যেন একটি নারীকণ্ঠ শুনতে পেয়েছে। য়ুল পানিতে আবার স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল, কোথাও কেউ নেই। য়ুল এই জলমানবীদের ভাষা এখনো জানে না, তাই মানুষের শাশ্বত কণ্ঠস্বরের ওপর নির্ভর করে সে বন্ধুত্বসূচক একটি শব্দ করল।

কাছাকাছি একটা পাথরের আড়াল থেকে বড় চোখের একটি মেয়ের মাথা উঁকি দেয়। য়ুল তার দিকে একটু এগিয়ে যেতেই মেয়েটি দ্রুত সরে গেল। য়ুল আবার তার আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত পর আবার সেই কৌতূহলী মুখটি প্রবালের পাথরের আড়াল থেকে উঁকি দেয়, অবাক বিস্ময়ে য়ুলের দিকে তাকিয়ে থাকে। য়ুল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে হাত তুলে মেয়েটিকে ডাকল, মেয়েটি ভয় পেয়ে আবার আড়ালে সরে যায় এবং কিছুক্ষণ পর আবার ধীরে ধীরে কৌতূহলী চোখে বের হয়ে আসে। য়ুল মেয়েটির দিকে তাকিয়ে একটু হাসার চেষ্টা করল এবং মেয়েটি আবার একটু এগিয়ে আসে। মেয়েটির সুগঠিত নিরাভরণ দেহ, কিছু জলজ পাতা শরীরে জড়িয়ে রেখেছে। মেয়েটি অনিশ্চিতের মতো একটু এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে যায়। তারপর ভয় পাওয়া গলায় কিছু একটা বলল। সুরেলা কণ্ঠস্বরে সঙ্গীতের স্তবকের মতো কিছু কথা।

য়ুল অনুবাদক যন্ত্র চালু করে রেখেছে, যান্ত্রিক কণ্ঠে সেটি অনুবাদ করে দেয়, মেয়েটি জিজ্ঞেস করছে, "তুমি কে? তোমার নাম কী?"

য়ুল বলল, "তুমি আমাকে চিনবে না, আমি অনেক দূর থেকে এসেছি। আমার নাম য়ুল।"

"য়ুল!" মেয়েটি খিলখিল করে হেসে বলল, "কী বিচিত্র নাম!"

"তোমার নাম কী?"

"আমার নাম তিনা।"

য়ুল মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, "তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আনন্দিত হলাম তিনা।"

"তুমি নিশ্চয়ই অনেক দূর থেকে এসেছ, কারণ তোমার কথা খুব বিচিত্র। কিন্তু তুমি কেমন করে অনেক দূর থেকে এসেছ? তুমি তো পানিতে নিশ্বাস নিতে পার না।"

"কে বলছে পারি না। এই যে দেখ আমি পারি।"

মেয়েটি খিলখিল করে হেসে বলল, "তুমি পার না, আমরা জানি।"

"কেমন করে জান?"

"আমরা দেখেছি। তুমি পানিতে নেমে নিশ্বাস নিতে পারছিলে না। তখন আমরা তোমার মুখে বাতাস ফুঁকে দিয়েছি। ছোট বাচ্চাদের যেরকম দিতে হয়!"

মেয়েটি হঠাৎ খিলখিল করে হাসতে শুরু করে, যেন অত্যন্ত মজার কোনো ব্যাপার ঘটেছে। হাসি ব্যাপারটি সংক্রামক—য়ুলও হাসতে শুরু করে এবং প্রবাল পাহাড়ের আড়াল থেকে নানা বয়সী আরো কয়েকজন কিশোর-কিশোরী এবং তরুণী বের হয়ে আসে। তারা পানিতে ভাসতে ভাসতে য়ুলকে ঘিরে দাঁড়ায়।

একটি সাহসী কিশোর য়ুলের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুমি আগে পানির ভিতরে নিশ্বাস নিতে পার নি—এখন কেমন করে পারছ?"

য়ুল ঘুরে তার পিঠের সঙ্গে লাগানো অক্সিজেন সিলিন্ডারটি দেখাল, বলল, "এই যে দেখছ—এখানে বাতাস ভরা আছে। এই বাতাস নল দিয়ে আমার নাকে যাচ্ছে, তাই আমি নিশ্বাস নিতে পারছি।"

উপস্থিত সবার মাঝে একটা বিস্ময়ের ধ্বনি শোনা যায়। কিশোর ছেলেটি অবাক হয়ে বলল, "এটা তুমি কেমন করে করেছ? বাতাস তো ধরে রাখা যায় না, বাতাস তো ভেসে ভেসে উঠে যায়।"

দাঁড়িয়ে থাকা একটি মেয়ে জিজ্ঞেস করল, "এত মসৃণ ঐ জিনিসটা তুমি কোথায় পেয়েছ? আমরা তো কখনো এত মসৃণ জিনিস দেখি নি?"

য়ুল কী বলবে বুঝতে পারল না। তার সামনে যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা মানুষের সভ্যতার কিছু জানে না। যন্ত্রপাতি দূরে থাকুক—শরীরের পোশাক পর্যন্ত নেই, যেটুকু আছে সামুদ্রিক গাছের পাতা-লতা দিয়ে তৈরি। তাদের কাছে উচ্চচাপের অক্সিজেন সিলিন্ডার বা নিও পলিমারের পোশাক বা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের কোনো অর্থ নেই। তাদের কাছে জ্ঞান বা প্রযুক্তিরও কোনো অর্থ নেই। সৃষ্টির শুরুতে মানুষ যেভাবে নিজের শরীরের শক্তি আর মস্তিষ্কের বুদ্ধিমত্তা নিয়ে প্রকৃতির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল, এখন আবার ঠিক সেই একই ব্যাপার। মানুষ আবার একেবারে সেই গোড়া থেকে শুরু করেছে। তাদের কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তর সে কী করে দেবে?

মেয়েটি আরো একটু কাছে এগিয়ে এসে অক্সিজেনের সিলিন্ডারটি স্পর্শ করে বলল, "কোথায় পেয়েছ তুমি এটা?"

য়ুল একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, "পৃথিবীটা বিশাল বড়, তার মাঝে কত বিচিত্র জিনিস আছে তুমি চিন্তাও করতে পারবে না।"

সবাই মাথা নাড়ল। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটি বলল, "ঠিকই বলেছ তুমি, পৃথিবীটা অনেক বড়। কত কী আছে এখানে। কত রকম মাছ! কত রকম প্রাণী! কত রকম গাছ-পাথর!"

"হ্যাঁ! সেগুলো যখন তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করবে, তখন দেখবে তার মাঝে কত কী শেখার আছে, জানার আছে। তুমি যত বেশি জানবে, দেখবে বেঁচে থাকা তত বেশি আনন্দের।"

তিনা নামের মেয়েটি হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল, হাসতে হাসতে বলল, "তোমার কথাগুলো কী অদ্ভুত। কী বিচিত্র! তুমি কোথায় এ রকম করে কথা বলতে শিখেছ?"

যুল উত্তরে কী বলবে বুঝতে পারল না।

প্রবাল পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে যুল এবং জল-মানব এবং জল-মানবীদের সঙ্গে একটি সখ্যতা গড়ে ওঠে। যুলকে তারা সমুদ্রের আরো গহিনে নিয়ে যায়। সমুদ্রগভীরের সুপ্ত আগ্নেয়গিরির উষ্ণ পাহাড়কে ঘিরে জল-মানবদের বসতি গড়ে উঠেছে। সেখানে মায়ের সাথে সাথে শিশুরা ভেসে বেড়াচ্ছে, জন্মের পরমুহূর্ত থেকে তারা স্বাধীন। খাবার জন্য সামুদ্রিক শ্যাওলা, জলজ উদ্ভিদ আর নানা ধরনের মাছ। ঘুমানোর জন্য পাথরের ওপর শ্যাওলার বিছানা। বসতির নেতৃত্ব দেবার জন্য একজন মানবী। সমুদ্রের বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য একদল সুদেহী প্রহরী, কিছু নারী কিছু পুরুষ। সম্পূর্ণ ভিন্ন এক প্রয়োজনে ভিন্ন এক ধরনের সমাজ গড়ে উঠেছে।

যুল মুগ্ধ হয়ে তাদের মাঝে ঘুরে বেড়ায়, পানিতে ভেসে যেতে যেতে একসময় সে ভুলে যায় যে সে এসেছে গ্যালাক্সির অন্য প্রান্ত থেকে, সে ভুলে যায় সে পৃথিবীর বাতাসে বেঁচে থাকা একজন মানুষ। যাদের সাথে সে ভেসে বেড়াচ্ছে তারা জলজ-মানব, পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন আলাদা করে নেবার বিচিত্র দৈহিক ক্ষমতার অধিকারী।

যুল হঠাৎ করে বুঝতে পারে তারা আসলে একই মানুষ, এই পৃথিবীর একই সন্তান।

AMARBOI.COM

৭

নিয়ন্ত্রণ প্যানেলের সামনে বসে কীশ মূল মহাকাশযানের সাথে যোগাযোগ করছে। যুলের সারা দিনের সংগ্রহ করা সব তথ্য এর মাঝে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, ক্রন সেগুলো মহাকাশযানের মূল তথ্য কেন্দ্রে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে। যুল তার ছোট বিছানায় পা তুলে বসে বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল। মাথা ঘুরিয়ে কীশের দিকে তাকিয়ে বলল, "কীশ।"

"বল।"

"আজকে আমার যেরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে তার কোনো তুলনা নেই।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। যেরকম আমার আনন্দ হয়েছে সারা জীবনে আমার সেরকম আনন্দ হয় নি। কেন বলতে পারবে?"

"না। মানুষ খুব দুর্বোধ্য আমি তাদের বুঝতে পারি না।"

যুল হেসে বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ। আমি মানুষ হয়েই মানুষকে বুঝতে পারি না, তুমি বায়োবট হয়ে কেমন করে বুঝবে? আমার আনন্দ হয়েছে কারণ এই জল-মানব আর জল-মানবীরা একেবারে শিশুর মতো সহজ-সরল। একটা ছোট শিশুকে দেখলে যে কারণে আনন্দ হয়, ওদের দেখলে সে কারণে আনন্দ হয়।"

"ও আচ্ছা।"

য়ুল ভুরু কুঁচকে কীশের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি কী বললে?"

"আমি বলেছি, ও আচ্ছা।"

য়ুল একটু উষ্ণ হয়ে বলল, "তুমি কেন ওটা বললে? তুমি কি আমার কথা বিশ্বাস করছ না?"

কীশ তরল গলায় বলল, "তুমি যদি আমাকে সত্যি কথা বলতে বল তা হলে আমি বলব যে আমি তোমার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করছি না।"

য়ুল গম্ভীর গলায় বলল, "তা হলে কী কারণে আমার আনন্দ হয়েছে বলে তুমি মনে কর?"

"আমার ধারণা তিনা নামের মেয়েটির কারণে।"

য়ুল থতমত খেয়ে গেল এবং জোর করে মুখে একটু কাঠিন্য এনে বলল, "তুমি কী বললে?"

"আমি বলছি তিনা নামক মেয়েটির কারণে। মেয়েটি তোমার মুখে অক্সিজেন প্রবাহ করিয়ে বাঁচিয়ে দিয়েছিল বলে সম্ভবত তার প্রতি তোমার একটু কৃতজ্ঞতা জন্মেছে। এবারে তাকে দেখে সে জন্য তোমার নিশ্চয়ই আনন্দ হয়েছে। তা ছাড়া আরো একটি ব্যাপার—"

"কী ব্যাপার?"

"মানুষের সৌন্দর্যের অনুভূতি আমি ঠিক বুঝতে পারি না। তবে আমার ধারণা মেয়েটি অপূর্ব রূপসী—"

য়ুল কীশকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলল, "বাজে কথা বোলো না কীশ। মানুষের অনুভূতি সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা নেই।"

কীশ মাথা নাড়ল, বলল, "হতে পারে। আমি এসব ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ। তবে আমি ভাসমান যানে বসে তোমার রক্তচাপ, হৃৎস্পন্দন এবং শরীরে নানা ধরনের হরমোনের পরিমাপ করছিলাম। আমি লক্ষ্য করেছি যতবার তুমি তিনা নামক জল-মানবীর কাছে গিয়েছ বা তার সাথে কথা বলেছ, তোমার রক্তচাপ এবং হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেছে।"

য়ুল খানিকক্ষণ কীশের দিকে তাকিয়ে বলল, "ও", তারপর সে হেঁটে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়—নিজের কাছে গোপন করে লাভ নেই। তিনা নামের জল-মানবী মেয়েটির কথা সত্যিই ঘুরে-ফিরে তার মনে পড়ছে। কী আশ্চর্য!

৮

ভাসমান যানের পাশে য়ুল পা ঝুলিয়ে বসে নিশ্বাস নেবার তন্তুটি নিজের নাকে লাগিয়ে নেয়। যোগাযোগ মডিউলটি পরীক্ষা করে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে য়ুল কীশের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি কিছুক্ষণের মাঝেই ফিরে আসব।"

"বেশ। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"আমি এখনো বিশ্বাস করি তোমার দ্বিতীয়বার সমুদ্রের নিচে যাওয়াটি সঠিক সিদ্ধান্ত নয়। আমরা অল্প সময়ের মাঝে পৃথিবী ছেড়ে যাব, এই সময়টুকুতে আবার এ রকম ঝুঁকি নেওয়া ঠিক নয়।"

"ঝুঁকি? কিসের ঝুঁকি?"

"কত রকম ঝুঁকি। পৃথিবীর ওপরে প্রাণ প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কিন্তু সমুদ্রের নিচে অসংখ্য প্রাণী রয়েছে। কিছু কিছু ভয়ঙ্কর। তুমি তাদের দেখে অভ্যস্ত নও।"

"সমুদ্রের নিচে যদি জল–মানব এবং জল–মানবী পুরো জীবন থাকতে পারে, আমি তা হলে এক ঘণ্টা থাকতে পারব।"

"সেটি সত্যি। কিন্তু—"

"এর মাঝে কোনো কিন্তু নেই। আমি একজন মানব সন্তান। এই জল–মানব এবং জল–মানবীরাও মানব সন্তান। চিরদিনের মতো চলে যাবার আগে এক মানব সন্তানের অন্য মানব সন্তান থেকে বিদায় নেবার কথা।"

"সেটি সম্ভবত তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু—"

"না, কোনো কিন্তু নেই। আমি তিনাকে বলেছিলাম তার কাছ থেকে বিদায় নেব। সে নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছে।"

কীশ কোনো কথা বলল না, সে জানে এখানে কথা বলার বিশেষ কিছু নেই।

য়ুল পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার পর কীশ কিছুক্ষণ ভাসমান যানটিতে দাঁড়িয়ে থাকে। ভাসমান যানের মনিটরে সে য়ুলকে দেখতে পায়, জেট প্যাক ব্যবহার করে পানির গভীরে চলে যাচ্ছে। কীশ মনিটরটি স্পর্শ করে সেটি বন্ধ করে দিল। কয়েক ঘণ্টার মাঝে নভোযানটিকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। তার আগেই তাকে অনেকগুলো কাজ শেষ করতে হবে। আশপাশে একটা নিরাপদ দ্বীপ খুঁজে বের করে সেখানে কিছু জরুরি আয়োজন শেষ করতে হবে। য়ুল ফিরে আসার আগে হয়তো শেষ করতে পারবে না—কিন্তু করার কিছু নেই।

AMARBOI.COM

৯

য়ুল ভেজা শরীরে ভাসমান যানটিতে বসে আছে। তার শরীর থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ে ভাসমান যানের কিছু যন্ত্রপাতি ভিজে যাচ্ছে কিন্তু সেদিকে য়ুলের নজর নেই। সে দীর্ঘসময় আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে একসময় মাথা নামিয়ে কীশের দিকে তাকাল। বলল, "কীশ।"

"বল।"

"আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। কিন্তু ঠিক কীভাবে বলব বুঝতে পারছি না।"

কীশ মাথা ঘুরিয়ে য়ুলের দিকে তাকাল, তার সবুজাভ চোখে এক ধরনের আলোর ছটা জ্বলে উঠে আবার নিভে যায়।

য়ুল নিজের আঙুলের দিকে তাকাল এবং অনাবশ্যকভাবে নখের মাথা পরিষ্কার করতে করতে আবার কীশের দিকে তাকিয়ে একটা বড় নিশ্বাস নিয়ে বলল, "আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা কীভাবে শুরু করব বুঝতে পারছি না। তোমার কাছে সেটাকে অত্যন্ত বিচিত্র মনে হতে পারে—"

কীশ কোনো কথা না বলে য়ুলের দিকে তাকাল এবং হঠাৎ য়ুল কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল।

কীশ এবারে সোজা হয়ে দাঁড়াল এবং নিজের আধা জৈবিক আধা যান্ত্রিক হাত দিয়ে য়ুলের কাঁধ স্পর্শ করে বলল, "য়ুল তুমি কী বলতে চাইছ আমি জানি।"

য়ুল হতচকিত হয়ে কীশের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি জান?"

"হ্যাঁ। তুমি আমার সঙ্গে ক্রসিয়াস গ্রহপুঞ্জে ফিরে যেতে চাও না। তুমি এখানে থাকতে চাও। তাই না?"

য়ুল কিছুক্ষণ বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে কীশের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ। তুমি ঠিকই আন্দাজ করেছ, আমি এখানে থাকতে চাই।"

কীশ নরম গলায় বলল, "আমি মানুষ নই, তাই মানুষকে বুঝতে পারি না, কিন্তু তাদের সাথে এত দীর্ঘ সময় কাটিয়েছি যে তারা কখন কী করবে অনেক সময় সেটা আন্দাজ করতে পারি।"

য়ুল কিছু বলল না। কীশ ভাসমান যানের নিয়ন্ত্রণের কাছে দাঁড়িয়ে সেটা চালু করতে করতে বলল, "আমি কাছাকাছি একটা ছোট দ্বীপ খুঁজে বের করেছি। সেখানে আমি তোমার জন্য একটা ছোট বাসস্থান তৈরি করেছি। পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু সেখানে আছে। জল-মানব আর জল-মানবীর শরীর থেকে কিছু জিনেটিক নমুনা সংগ্রহ করা আছে, সেটা ব্যবহার করে তোমার ফুসফুসের মাঝে পরিবর্তন আনা যাবে। কিন্তু সেটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। যতদিন তুমি পানির নিচে থাকার মতো পুরোপুরি প্রস্তুত না হচ্ছ এই দ্বীপটিতে তোমাকে দীর্ঘ সময় কাটাতে হবে।"

য়ুল কীশের দিকে তাকিয়ে বলল, "কীশ—আমি তোমাকে কী বলে ধন্যবাদ জানাব বুঝতে পারছি না।" কীশ শান্ত গলায় বলল, "তুমি আর যেটাই কর আমাকে ধন্যবাদ জানিও না। আমি যেটি করছি সেটি হচ্ছে তোমার জীবনের মূল্যকে পুরোপুরি উপেক্ষা করা। সেটি অমানবিক এবং অন্যায়। কিন্তু আমি সেটা করেছি তোমার জন্য—কারণ আমি জানি এটাই তোমার ইচ্ছে—"

য়ুল বাধা দিয়ে বলল, "কীশ, আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ।"

কীশ য়ুলের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার কিংবা মানুষের প্রতি আমার এক ধরনের হিংসা হয়।"

"কেন?"

"কারণ যে তীব্র অনুভূতির জন্য তুমি তোমার নিজের জীবন বিপন্ন করে ফেলতে পার আমরা সেই অনুভূতি বুঝতে পারি না।" কীশ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "যাই হোক—য়ুল, পৃথিবীতে এখনো নানা ধরনের ব্যাক্টেরিয়া রয়েছে, সুপ্ত ভাইরাস রয়েছে, কাজেই তোমাকে সাবধান থাকতে হবে। তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে গেছি। নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করে গেছি।"

কীশ ভাসমান যানটিকে দ্বীপের মাঝামাঝি নামাতে নামাতে বলল, "নিরাপত্তার জন্য আমি তোমার কাছে কিছু স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র রেখে যাচ্ছি। তবে—"

"তবে কী?"

"তুমি সেটা ব্যবহার করতে চাও কি না সেটি তোমার ইচ্ছে। কারণ জল-মানব এবং জল-মানবীরা যদি কখনো তোমাকে সত্যিকারের একটি অস্ত্র ব্যবহার করতে দেখে তারা তোমাকে ভুল বুঝতে পারে। তারা তোমাকে মনে করতে পারে কোনো অলৌকিক পুরুষ। স্বর্গের কোনো দেবতা। প্রচণ্ড ক্ষমতাধর কোনো জাদুকর।"

"তুমি ঠিকই বলেছ কীশ।"

"তবে তুমি তাদের জ্ঞান দিতে পার। নতুন জিনিস শেখাতে পার। যে জিনিস শিখতে তাদের কয়েক হাজার বছর লেগে যেত সেটা তুমি কয়েকদিনে শেখাতে পার। আমি তোমার

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com ~

জন্য গ্যালাক্টিক সাইক্লোপিডিয়া রেখে যাচ্ছি, কয়েকটা ক্রিস্টালে রাখা আছে। পৃথিবীর বা জ্ঞানবিজ্ঞানের সব তথ্য তুমি সেখানে পাবে।"

ভাসমান যানটি নিচে নামাতে নামাতে কীশ বলল, "মনে রেখো আজ থেকে কয়েক শতাব্দী আগে পৃথিবীর কিছু মানুষ অনেকগুলো শিশুকে জল-মানব আর জল-মানবীতে রূপান্তর করে সমুদ্রে নামিয়ে দিয়েছিল। তারা বাইরের কোনো সাহায্য ছাড়া বড় হয়েছে। তুমি তাদের মাঝে প্রথম একটি বড় পরিবর্তন আনতে যাচ্ছ। একটু ভুল করলে কিন্তু সব ওলটপালট হয়ে যাবে।"

য়ুল কীশের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি ভুল করব না কীশ। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি আমি কোনো ভুল করব না।"

১০

নভোযানটি প্রচণ্ড গর্জন করে আকাশের সাদা মেঘের মাঝে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া পর্যন্ত য়ুল অপেক্ষা করল। তারপর সে দীর্ঘ পদক্ষেপে বালুবেলায় হেঁটে হেঁটে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যায়। সমুদ্রের ঢেউ সাদা ফেনা তুলে তার দিকে এগিয়ে পায়ের কাছে আছড়ে পড়ল। য়ুল তার মাঝে মাথা সোজা করে ঢেউ ভেঙে হেঁটে যেতে থাকে।

সমুদ্রের বালুবেলায় তার পায়ের চিহ্ন ঢেউ এসে মুছে দিতে থাকে।

ঠিক তার ফেলে আসা জীবনের মতোই।

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০০

AMARBOI.COM

প্রজেক্ট নেবুলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১

সন্ধে থেকে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল, হঠাৎ করে বৃষ্টিটা চেপে এল। জব্বার নিচু গলায় একটা অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করে উইন্ডশিল্ড ওয়াইপারটা আরেকটু দ্রুত করে দেয়। ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে ওয়াইপার দুটো গাড়ির কাচ পরিষ্কার করতে থাকে কিন্তু অন্ধকার দুর্যোগময় রাতে সেটা খুব কাজে আসে না, গাড়ির হেডলাইট মনে হয় সামনের অন্ধকারকে আরো জমাট বাঁধিয়ে দিচ্ছে। রাস্তার অন্যদিক থেকে দৈত্যের মতো একটা ট্রাক চোখ ধাঁধানো হেডলাইট জ্বালিয়ে প্রচণ্ড গর্জন করে বিপজ্জনকভাবে পাশ কাটিয়ে গেল—পানির ঝাপটায় গাড়ির কাচ মুহূর্তের জন্য অন্ধকার হয়ে যায়, প্যাসেঞ্জার সিটে বসে থাকা দবির কব্জির কাছে কাটা হাতটি সামনে এগিয়ে অদৃশ্য কিছু একটা ধরে ফেলার ভঙ্গি করে বিরক্ত হয়ে বলল, "আস্তে, জব্বার আস্তে।"

জব্বার অন্ধকারে দেখা যায় না এরকম একটা রিকশা ভ্যানকে পাশ কাটিয়ে দাঁত বের করে হেসে বলল, "ভয় পাবেন না ওস্তাদ। আমি কালা জব্বার।"

দবির শীতল গলায় বলল, "সেইটাই ভয়।"

"কেন ওস্তাদ। এইটা কেন বললেন?"

"বলছি কারণ তোর কোনো কাণ্ডজ্ঞান নাই।"

জব্বার আড়চোখে দবিরের মুখটা দেখার চেষ্টা করে বোঝার চেষ্টা করল দবির এটা ঠাট্টা করে বলেছে কি না। অন্ধকারে দবিরের মুখ দেখা যাচ্ছিল না তাই সে ঠিক বুঝতে পারল না। তবুও সে কথাটাকে একটুখানি হালকা রসিকতা হিসেবে ধরে নিয়ে প্রয়োজন থেকে জোরে শব্দ করে হেসে বলল, "ওস্তাদ, আমার হাতে স্টিয়ারিং হুইল কখনো বেইমানি করে নাই।"

দবির দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, "তা হলে কোনটা বেইমানি করেছে?"

জব্বার ভিতরে ভিতরে চমকে ওঠে, হঠাৎ করে ভয়ের একটা শীতল স্রোত তার মেরুদণ্ড দিয়ে বয়ে যায়। প্যাসেঞ্জার সিটে বসে থাকা ছোটখাটো এই মানুষটি—যার বাম হাতটি কব্জি থেকে কাটা, শহরতলি এলাকায় কব্জি কাটা দবির নামে কুখ্যাত, মানুষটির নিষ্ঠুরতার কথা অপরাধীদের অন্ধকার জগতে সুপরিচিত। অন্ধকার জগতে টিকে থাকার একেবারে আদিম পন্থাটি মাত্র কয়েক বছরে কব্জি কাটা দবিরকে তার সাম্রাজ্যের অলিখিত সম্রাটে পরিণত করে ফেলেছে—দবির তার প্রতিপক্ষকে মাথা তুলে দাঁড়াবার সুযোগ দেয় না। জব্বার দবিরের প্রতিপক্ষ নয়, তার বিশ্বস্ত অনুচর কিন্তু সেই বিশ্বস্ততার হিসাবটুকু দবিরের কাছে যথেষ্ট কি না সে ব্যাপারে জব্বার পুরোপুরি নিশ্চিত নয়। জব্বার শুকনো গলায় বলল, "কী বললেন ওস্তাদ?"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কিছু বলি নাই।"

জব্বার আর কোনো কথা বলল না, কব্জি কাটা দবিরকে ঘাঁটানোর মতো দুঃসাহস তার নেই। সামনে থেকে ছুটে আসা আরেকটা ভয়ঙ্কর ট্রাককে পাশ কাটিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আর কত দূর যাবেন ওস্তাদ?"

দবির অনিশ্চিতের মতো হাত নেড়ে তার ভালো হাতটি দিয়ে সিটের নিচে থেকে একটা চ্যাপটা বোতল বের করে দাঁত দিয়ে কামড়ে তার ছিপিটা খুলে ফেলল। প্রায় আধযুগ আগে ঘরে বানানো বোমার বিস্ফোরণে বাম হাতটি উড়ে যাবার পর থেকে সব কাজই তার এক হাতেই করতে হয়। এক হাতে সব কাজ সে এত নৈপুণ্যের সাথে করতে পারে যে কব্জি কাটা দবিরকে দেখলে মনে হতে পারে মানুষের দ্বিতীয় হাতটি একটি বাহুল্য।

দবির বোতল থেকে ঢকঢক করে খানিকটা হুইস্কি গলায় ঢেলে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুখ মুছে বোতলটা জব্বারের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "নে।"

জব্বার নিজের ভিতরে এক ধরনের তৃষ্ণা অনুভব করল কিন্তু সে বোতলটা ধরল না। মাথা নেড়ে বলল, "এখন খাব না ওস্তাদ।"

দবির ভুরু কুঁচকে জব্বারের দিকে তাকাল, জব্বার তাড়াতাড়ি অনেকটা কৈফিয়ত দেওয়ার মতো বলল, "গাড়ির টায়ার স্লিপ কাটছে, এখন মাল খাব না ওস্তাদ। মাল খেলে গাড়ি চালাতে পারব না।"

দবির মুখ শক্ত করে বলল, "তোকে নেশা করতে কে বলেছে? খা। এক ঢোক খা।"

গলায় আপ্যায়নের সুর নেই, এটি রীতিমতো আদেশ। কাজেই জব্বার এক হাতে স্টিয়ারিং হুইল ধরে অন্য হাতে বোতলটা নিয়ে ঢকঢক করে গলায় খানিকটা তরল ঢেলে দেয়। বোতলটি ফিরিয়ে দিতে গিয়ে আবিষ্কার করল দবির জানালা দিয়ে চিন্তিত মুখে বাইরে তাকিয়ে আছে। জব্বার আবার এক ধরনের ভীতি অনুভব করে, কারণটি জানা নেই বলে ভীতিটিকে তার কাছে অশুভ বলে মনে হতে থাকে।

AMARBOI.COM

আরো মিনিট পনের নিঃশব্দে গাড়ি চালানোর পর হঠাৎ করে বৃষ্টিটা একটু ধরে এল, দবির জানালা পুরোপুরি নামিয়ে দিতেই গাড়ির ভিতরে বাতাসের ঝাপটা এসে ঢুকল। অনেক রাত, রাস্তায় গাড়ি খুব বেশি নেই, রাতের ট্রাকগুলো হঠাৎ করে সশব্দে ছুটে যাচ্ছে। রাস্তার দুই পাশে নিচু জমিতে পানি জমেছে, দেখে মনে হয় সুবিশাল হ্রদ। রাতের অন্ধকারে ভালো দেখা যাচ্ছে না, দিনের বেলা পুরো এলাকাটিকে খুব মনোরম মনে হয়, শহরের অবস্থাপন্ন মানুষেরা গাড়ি করে এখানে বেড়াতে আসে।

দবির গাড়ির ভিতরে মুখ ঢুকিয়ে বলল, "গাড়িটা থামা।"

অজানা আশঙ্কায় জব্বারের বুক কেঁপে ওঠে। সে শুকনো গলায় বলল, "থামাব?"

"হ্যাঁ।"

অন্ধকার রাতে এই নির্জন জায়গায় কেন রাস্তার পাশে গাড়ি থামাবে—জব্বার বুঝতে পারল না, কিন্তু তার কারণটি জানার সাহস হল না। সে তবুও দুর্বল গলায় বলল, "বাইরে বৃষ্টি পড়ছে।"

দবির খেঁকিয়ে উঠে বলল, "বৃষ্টি পড়বে না তো কি রসগোল্লার সিরা পড়বে?"

জব্বার আর কিছু বলার সাহস পেল না, সে সাবধানে রাস্তার পাশে গাড়িটার গতি কমিয়ে থামিয়ে ফেলল। ইঞ্জিনটা বন্ধ করবে কি না বুঝতে পারছিল না। দবিরের দিকে তাকাতেই সে বলল, "ডিকি খোল। দুইটা প্যাকেট আছে, প্যাকেট দুইটা নামা।"

জব্বার তখন ইঞ্জিনটা বন্ধ করে দেয়, ডিকি খুলতে গাড়ির চাবি লাগবে। অন্ধকারে তার ভুরু কুঞ্চিত হয়ে উঠল। গাড়ির পিছনে কোনো প্যাকেট থাকার কথা নয়, দবির ঠিক কী চাইছে? অন্ধকার জগতের প্রাণীর মতো হঠাৎ করে সে সতর্ক হয়ে যায়। সে সাবধানে গাড়ির ডিকি খুলল এবং চোখের কোনা দিয়ে দেখতে পেল দবিরও দরজা খুলে নেমে আসছে। ডিকির ভিতরে কিছু জঞ্জাল—কোনো প্যাকেট নেই, জব্বার সোজা হয়ে ঘুরে দাঁড়াল এবং হঠাৎ করে তার সমস্ত শরীর শীতল হয়ে এল। জব্বারের দুই হাত পিছনে দবির তার ভালো হাত দিয়ে একটা বেঁটে রিভলবার ধরে দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে ভালো দেখা যায় না কিন্তু জব্বারের এটি চিনতে অসুবিধে হল না, মাত্র এক সপ্তাহ আগে একটা টেন্ডারের বখরা নিয়ে গোলমালের কারণে দবির এই বেঁটে রিভলবার দিয়ে ট্যারা রতনকে পরপর ছয়বার গুলি করে মেরেছে। প্রথম গুলিটি ছিল হত্যাকাণ্ডের জন্য, বাকি পাঁচটি ছিল শুধুমাত্র মজা করার জন্য। জব্বার হঠাৎ করে বুঝতে পারল তার গৌরবহীন ক্ষুদ্র জীবনটি এই অন্ধকার রাতে রাস্তার পাশে কাদা মাটিতে শেষ হয়ে যাবে। দবিরের বিশ্বস্ত অনুচর হিসেবে সে অসংখ্যবার দবিরকে শীতল চোখে এবং কঠিন মুখে হাতে অস্ত্র নিয়ে দাঁড়াতে দেখেছে—তখন তার মুখের অভিব্যক্তিটি নিষ্ঠুর না হয়ে কেমন যেন বিষণ্ন মনে হয়। অন্ধকারে দবিরের মুখটি দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু জব্বার জানে এখন তার মুখে এক ধরনের বিষণ্নতা এসেছে।

জব্বার পরিষ্কার করে চিন্তা করতে পারছিল না, ভাঙ্গা গলায় বলল, "আমি কী করেছি ওস্তাদ?"

"তুই খুব ভালো করে জানিস তুই কী করেছিস।"

"আমি জানি না—আল্লাহ্‌র কসম।"

"চুপ কর হারামজাদা—এখানে আল্লাহকে টেনে আনবি না।"

"বিশ্বাস করেন ওস্তাদ—আপনি বিশ্বাস করেন।"

"কে বলেছে আমি তোর কথা বিশ্বাস করি নাই? অবশ্যই করেছি, সেই জন্য তোরে আমি কোনো কষ্ট দিব না। তুই ঘুরে দাঁড়া, পিছন থেকে মাথায় গুলি করে ফিনিশ করে দিব। তুই টেরও পাবি না।"

জব্বারের সামনে হঠাৎ করে সমস্ত জগৎ-সংসার অর্থহীন হয়ে গেল, সে পরিষ্কার করে কিছু চিন্তা করতে পারছে না, মনে হচ্ছে সময় যেন স্থির হয়ে গেছে। দবিরের প্রত্যেকটি কথা যেন অন্য কোনো জগৎ থেকে খুব ধীরে ধীরে ভেসে আসছে, আদি নেই, অন্ত নেই, শুরু নেই, শেষ নেই— বিস্ময়কর এক অতিপ্রাকৃত জগৎ।

হঠাৎ করে সমস্ত আকাশ চিরে একটি নীল বিদ্যুৎঝলক ছুটে এল, কিছু বোঝার আগে তীব্র আলোতে চারদিক দিনের মতো আলোকিত হয়ে যায়। বাতাস কেটে কিছু একটা ছুটে যাবার শব্দ হল, জব্বার দেখতে পায় দবির বিস্ময়ে হতচকিত হয়ে এক মুহূর্তের জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা দেখছে। কী দেখছে সে জানে না, তার এই মুহূর্তে জানার কোনো কৌতূহলও নেই। দবিরের এক মুহূর্তের জন্য হতচকিত হওয়ার সুযোগে জব্বার তার ওপর সমস্ত শক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে দবিরের মুখে আঘাত করে তাকে নিচে ফেলে দিল। দবিরের হাত থেকে রিভলবারটি ছিটকে পড়ে গেছে, জব্বার সেই সুযোগে দবিরের বুকের ওপর চেপে বসে আবার তার মুখে আঘাত করে। অন্ধকারে দেখা যায় না কিন্তু দবিরের নাক দিয়ে রক্ত বের হয়ে জব্বারের হাত চটচটে হয়ে যায়।

জব্বার অমানুষিক নিষ্ঠুরতায় দবিরকে আঘাত করতে করতে একটি হাত দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে রিভলবারটি খুঁজে বের করে ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে সেটা হাতে নিয়ে সরে দাঁড়াল। দবির

কাটা হাতটি দিয়ে মুখ মুছে সোজা হয়ে বসে প্রথমে জব্বারের দিকে তারপর পিছনে দূরে তাকাল।

জব্বারও দবিরের দৃষ্টি অনুসরণ করে পিছনে তাকাল, নীল আলোর ছটা ছড়িয়ে যে বিচিত্র জিনিসটি নেমে এসেছে সেটি পানিতে ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে। জব্বার নিরাপত্তার জন্য আবার ঘুরে দবিরের দিকে তাকাল বলে দেখতে পেল না বিচিত্র জিনিসটির উপরের অংশ খুলে গেছে এবং সেখান থেকে ধাতব পিচ্ছিল এক ধরনের ঘিনঘিনে প্রাণী বের হয়ে আসছে। দবির বিস্ফারিত চোখে সেই প্রাণীটির দিকে তাকিয়ে রইল এবং জব্বারের গুলিতে তার মস্তিষ্ক চূর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও তার মুখ থেকে সেই বিস্ময়াভিভূত ভাবটি সরে গেল না।

জব্বার রিভলবারের পুরো ম্যাগাজিনটি দবিরের ওপর খালি করল—এই মানুষটিকে সে জীবন্ত অবস্থায় বিশ্বাস করে নি, মৃত অবস্থাতেও তাকে সে বিশ্বাস করে না।

জব্বার রিভলবারটি প্যান্টে গুঁজে নিয়ে টলতে টলতে গাড়িতে ফিরে গিয়ে হাতড়ে হাতড়ে চ্যাপ্টা বোতলটা বের করে ঢকঢক করে তার অর্ধেকটা খালি করে দেয়। খুব ধীরে ধীরে তার স্নায়ু শীতল হয়ে আসছে, এখনো তার বিশ্বাস হচ্ছে না শহরতলির ত্রাস অন্ধকার জগতের একচ্ছত্র অধিপতি কব্জি কাটা দবিরকে সে নিজে খুন করে ফেলেছে। বিচিত্র একটা আলোর ঝলকানি দিয়ে আকাশ থেকে কিছু একটা নেমে এসেছে, সেটি কী সে জানে না। সেই মুহূর্তে আকাশ থেকে সেটি নেমে না এলে কেউ তাকে তার নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারত না। জব্বার পুরো ব্যাপারটা নিয়ে এখন চিন্তা করতে পারছে না, দবিরের মৃতদেহটি পানিতে ডুবিয়ে দিয়ে তার এখন ফিরে যেতে হবে—আকাশ থেকে নেমে আসা জিনিসটা কাছাকাছি পানিতে ডুবে গেছে, তার গুলির শব্দও নিশ্চয়ই শোনা গেছে; কৌতূহলী মানুষ এসে যেতে পারে। রাস্তা দিয়ে মাঝে মাঝে ট্রাক ছুটে যাচ্ছে, কোনো একটি ট্রাক থেমে গেলেই বিপদ হয়ে যাবে। জব্বারকে এখনই উঠতে হবে কিন্তু সে উঠতে পারছে না। এক বিচিত্র ক্লান্তিতে তার শরীর ভেঙে পড়তে চাইছে। জব্বার চ্যাপ্টা বোতল থেকে পানীয়টুকু আবার গলায় ঢেলে শক্তি সঞ্চয় করার চেষ্টা করতে থাকে।

জব্বার গাড়িতে বসে ছিল বলে জানতে পারল না আকাশ থেকে নেমে আসা সেই বিচিত্র মহাকাশযান থেকে একটি বিচিত্র প্রাণী গড়িয়ে গড়িয়ে দবিরের মৃতদেহের কাছে এসে তার বুক চিরে ভিতরে প্রবেশ করেছে। জব্বার দেখতে পেলেও সম্ভবত নিজের চোখকে বিশ্বাস করত না, কারণ হঠাৎ করে দবিরের চোখ দুটো লাল আলোর মতো জ্বলে উঠল। তার কাটা হাতের ভিতর থেকে একটা যান্ত্রিক হাত গজিয়ে যায় এবং চূর্ণ হয়ে যাওয়া মস্তিষ্কের ভিতর থেকে ধাতব টিউবের মতো কিছু জিনিস সর্‌সর্‌ শব্দ করে বের হয়ে আসে। দবিরের চেহারা পরিবর্তিত হয়ে সেটা খানিকটা পশু এবং খানিকটা যন্ত্রের মতো হয়ে যায়, মৃতদেহটি হঠাৎ নড়ে উঠল এবং বিচিত্র একটি যান্ত্রিক ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল। দবিরের দেহটি খুব সাবধানে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে ছোট শিশুর মতো পা ফেলে হাঁটার চেষ্টা করে পানির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।

জব্বার শেষ পর্যন্ত সোজা হয়ে দাঁড়াল এবং টলতে টলতে গাড়ি থেকে বের হয়ে এল। যেখানে দবিরের মৃতদেহটি পড়ে ছিল সেখানে কিছু নেই। জব্বার বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে, তার যতটুকু অবাক হওয়ার কথা কোনো একটি বিচিত্র কারণে সে ততটুকু অবাক হতে পারছে না। খসখস করে কাছাকাছি একটা শব্দ হল, জব্বার মাথা ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখে তার পিছনেই দবির দাঁড়িয়ে আছে। জব্বার রক্তশূন্য মুখে দবিরের দিকে তাকিয়ে থাকে, দবিরের চোখ দুটো অঙ্গারের মতো জ্বলছে, অন্ধকারে ভালো করে দেখা যায় না কিন্তু মনে

হচ্ছে মাথা থেকে সাপের মতো কিলবিলে কিছু একটা বের হয়ে এসেছে। সমস্ত শরীরে একটি বিচিত্র ধাতব আবরণ। দবির খুব ধীরে ধীরে তার কাটা হাতটি উঁচু করল, জব্বার দেখতে পেল সেখান থেকে একটি ধাতব হাত বের হয়ে এসেছে, হাতটি সর্‌সর্‌ শব্দ করে আরো খানিকটা বের হয়ে আসে এবং হঠাৎ করে তার ভিতর থেকে বিদ্যুৎঝলকের মতো কিছু একটা জব্বারের দিকে ছুটে বের হয়ে এল।

কী হয়েছে জব্বার কিছু বুঝতে পারল না। সমস্ত শরীর কুঁকড়ে সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল, তার শরীর মাটি স্পর্শ করার আগেই তার মৃত্যু ঘটে গেল বলে সে যন্ত্রণাটুকুও অনুভব করতে পারল না। সে বেঁচে থাকলেও তার অমার্জিত, নির্বোধ মস্তিষ্ক ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারত না যে একটি মহাজাগতিক প্রাণী পৃথিবীতে এসে নিজের আশ্রয় বেছে নিয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত প্রাণিজগৎ হঠাৎ করে কী ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছে সেটি বোঝার মতো ক্ষমতা জব্বারের ছিল না।

২

নিশীতা ক্যামেরা হাতে এগিয়ে যেতেই পুলিশ হাত উঁচু করে তাকে থামাল, "কোথায় যান?"

নিশীতা সামনে ভেজা মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা জব্বারের মৃতদেহটিকে দেখিয়ে বলল, "ছবি তুলব।"

পুলিশটি মুখ শক্ত করে বলল, "কাছে যাওয়া নিষেধ।"

নিশীতা কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে একটা কার্ড বের করে পুলিশটির চোখের সামনে দিয়ে নাড়িয়ে নিয়ে এসে বলল, "আমি সাংবাদিক।" তারপর তাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে প্রায় ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে গেল। পুলিশটি প্রায় হা-হা করে পিছন থেকে ছুটে এল কিন্তু কম বয়সী একটা মেয়েকে ধরে ফেলা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারল না। ততক্ষণে নিশীতা জব্বারের মৃতদেহের কাছে পৌঁছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে তার ডিজিটাল ক্যামেরায় ঝটপট কয়টা ছবি তুলে নিয়েছে। পুলিশটি কাছে এসে চিৎকার করে বলল, "আমি বললাম না, কাছে যাওয়া নিষেধ!"

নিশীতা পুড়ে কুঁকড়ে যাওয়া জব্বারের মৃতদেহটির দিকে তাকিয়ে বলল, "এই মানুষটার নাম কালা জব্বার?"

পুলিশটা হাত নেড়ে বলল, "আপনাকে আমি কী বললাম?"

"সাথে কব্জি কাটা দবির ছিল, তাকে পাওয়া গেছে?"

"সরে যান—সরে যান এখান থেকে।"

নিশীতা ক্যামেরাটি দিয়ে ঘ্যাচঘ্যাচ করে পুলিশটির দুটি ছবি তুলে নিল। ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলতে ফিল্ম খরচ হয় না বলে নিশীতা কখনো ছবি তুলতে কার্পণ্য করে না। পুলিশটি রুষ্ট হয়ে বলল, "কী হল? আমার ছবি তুলছেন কেন?"

"পত্রিকায় নিউজ হবে। সাংবাদিক হয়রানি।"

"সাংবাদিক হয়রানি?"

"হ্যাঁ। সাংবাদিক হয়রানি এবং তথ্য গোপন। এটা স্বাধীন দেশ—স্বাধীন দেশে কোনো তথ্য গোপন রাখা যাবে না।"

AMARBOI.COM

পুলিশটি মাথা নেড়ে বলল, "আমি এত কিছু জানি না—আমাকে অর্ডার দেওয়া হয়েছে কেউ যেন কাছে না আসে। যদি কথা বলতে চান তা হলে বড় সাহেবের সাথে কথা বলবেন।"

"বলবই তো। অবশ্যই বলব"—বলে নিশীতা মুখ গম্ভীর করে এগিয়ে গেল, তবে পুলিশের বড় সাহেবের কাছে নয়—দূরে জটলা করে দাঁড়িয়ে থাকা কিছু মানুষের কাছে। কাল রাতে এই এলাকায় বিদ্যুৎঝলকের মতো একটা নীল আলোর ঝলকানি দেখা গেছে বলে শোনা যাচ্ছে, ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল—বজ্রপাত তো হতেই পারে। তবে আলোর ঝলকানিটি নাকি বজ্রপাতের মতো ছিল না, সোজা আকাশ থেকে একটা সরলরেখার মতো নিচে নেমে এসেছে।

নিশীতাকে হেঁটে আসতে দেখে জটলা পাকানো মানুষগুলো একটু নড়েচড়ে দাঁড়াল। নিশীতার আজকাল অভ্যাস হয়ে গেছে—সে যখন মোটর সাইকেলে করে শার্টপ্যান্ট পরে ছুটে বেড়ায় অনেকেই নড়েচড়ে দাঁড়ায়, ভুরু কুঁচকে তাকায়।

নিশীতা কাছে গিয়ে মুখে একটা হাসি ফুটিয়ে দাঁড়াল, "আপনাদের একটা ছবি তুলতে পারি?"

মানুষগুলোর অনেকের মুখে হাসি ফুটে উঠল। কী কারণ কে জানে ছবি তোলার কথা বললেই মানুষ খুশি হয়ে ওঠে। কমবয়সী একজন জিজ্ঞেস করল, "কী করবেন ছবি দিয়ে?"

"ফাইলে রাখব। কখন কী কাজে লাগে কে জানে। মনে হচ্ছে আপনাদের এলাকাটা খুব ইম্পরট্যান্ট হয়ে যাবে।"

মানুষগুলোকে এবারে কৌতূহলী দেখা গেল, কমবয়সী মানুষটি জিজ্ঞেস করল, "কেন আপা? ইম্পরট্যান্ট কেন হবে?"

নিশীতা হাত দিয়ে দূরে পড়ে থাকা জব্বারের মৃতদেহটি দেখিয়ে বলল, "ঐ যে দেখেন, মানুষটি কীভাবে মারা গেছে সেটা একটা রহস্য। শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই, দেখে মনে হয় পুড়ে ঝলসে গেছে, বজ্রপাত হলে যেরকম হয়। কিন্তু কেউ বজ্রপাতের শব্দ শোনে নি। শুনেছেন আপনারা?"

"না।" মানুষগুলো মাথা নাড়ল, কেউ শোনে নি।

নিশীতা মাথা ঘুরে তাকাল, বলল, "বজ্রপাত হয় সবচেয়ে উঁচু জায়গায়—এই এখানে উঁচু জায়গা হচ্ছে এই লাইটপোস্ট—বজ্রপাত হলে ইলেকট্রিসিটি বন্ধ হয়ে যেত, লাইট ফিউজড হত, কিছু হয় নাই। রহস্য এবং রহস্য।"

বুড়ো মতন একজন মানুষ বলল, "আসলে এই জায়গাটার একটা দোষ আছে।"

"দোষ?"

"জে। প্রত্যেক বছর এক জন মানুষ মারা যায়।"

"এই জায়গায়?"

"এই আশপাশে। গেল বছর একটা ট্রাক এসে ধাক্কা দিল নজর আলীর ছোট ছেলেকে।"

বুড়ো মতন মানুষটি ট্রাকের ধাক্কায় কীভাবে নজর আলীর ছোট ছেলের শরীর থেঁতলে গেল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিতে থাকে, শুনে নিশীতার শরীর গুলিয়ে আসতে চায়। নিশীতা তবু ধৈর্য ধরে মুখে আগ্রহ ধরে রেখে বর্ণনাটি শুনতে থাকে, মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে আগ্রহ নিয়ে তাদের কথা শোনা। নিশীতা লক্ষ করে অন্যেরাও কিছু না কিছু বলতে আগ্রহী হয়ে উঠছে। সে ব্যাগ থেকে ছোট একটা নোট বই বের করে নেয়, সাংবাদিকসুলভ একটি ভাব ফুটিয়ে সেখানে কিছু কিছু জিনিস লিখে রাখার ভান করতে হবে। মানুষগুলো একটু সহজ হলে কাজও অনেক সহজ হয়ে যায়।

দৈনিক বাংলাদেশ পরিক্রমার সম্পাদক মোজাম্মেল হকের সামনে নিশীতা অধৈর্য মুখে বসে আছে। তার পাশে দৈনিক পত্রিকার আরো দুজন সিনিয়র সাংবাদিক—মোহাম্মদ বোরহান এবং শ্যামল দে। মোজাম্মেল হক হাতের বল পয়েন্ট কলমটি অন্যমনস্কভাবে টেবিলে ঠুকতে ঠুকতে বললেন, "উহুঁ নিশীতা এটা তোমার জন্য নয়।"

নিশীতা সোজা হয়ে বসে বলল, "কেন নয়?"

"কব্জি কাটা দবির, কালা জব্বার এই রকম চরিত্রগুলো থেকে পুলিশেরাও দূরে থাকে। তুমি সাংবাদিক—ঠিক করে বললে বলতে হয় মহিলা সাংবাদিক। তোমার আরো বেশি দূরে থাকা দরকার।"

নিশীতা মাথা নাড়ল, "আমি আপনার সাথে একমত নই মোজাম্মেল ভাই।" নিশীতা তার দুই পাশের দুজন সাংবাদিককে দেখিয়ে বলল, "বোরহান ভাই কিংবা শ্যামল দা যেটা পারবেন আমিও সেটা পারব।"

"অবশ্যই পারবে।" মোজাম্মেল হক মাথা নেড়ে বললেন, "সে ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি জেনেশুনে একটা মেয়েকে খুনি ডাকাত সন্ত্রাসীদের কাছে পাঠাতে পারব না। আমি আমার নিজের মেয়ে হলেও পাঠাতাম না।"

নিশীতা বলল, "আপনি বুঝতে পারছেন না মোজাম্মেল ভাই, এই কেসটা খুনি, ডাকাত আর সন্ত্রাসীদের নয়। খুনি, ডাকাত আর সন্ত্রাসীরা মারা পড়েছে, তাদের কাছে আমার আর যেতে হবে না। কেন মারা পড়ছে, কীভাবে মারা পড়ছে— আমি সেটা দেখতে চাই। আপনি জানেন গভীর রাতে একটা নীল আলো আকাশ থেকে সোজা নিচে নেমে এসেছিল?"

"বজ্রপাত।"

"না, বজ্রপাত না। বজ্রপাতের শব্দ হয় কিন্তু এখানে কোনো শব্দ হয় নি। কালা জব্বারের পোস্টমর্টেম করে দেখা গেছে—সে বজ্রপাতে মারা যায় নি।"

"তা হলে কীভাবে মারা গেছে?"

"কেউ বুঝতে পারছে না। হঠাৎ করে হার্ট থেমে গেছে। শরীরের ভিতরে বিচিত্র এক ধরনের ক্রিস্টাল পাওয়া গেছে। তার সাথে ছিল কব্জি কাটা দবির—তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু তার পায়ের ছাপ সেখানে আছে। রক্তের দাগ আছে, এ ছাড়া মাটিতে বিচিত্র কিছু চিহ্ন আছে। মনে হচ্ছে—"

নিশীতা হঠাৎ করে থেমে গেল। মোজাম্মেল হক ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, "মনে হচ্ছে কী?"

"মনে হচ্ছে অন্য কোনো একটা প্রাণী এখানে এসেছে।"

"অন্য কোনো প্রাণী?"

"হ্যাঁ। একজন ট্রাক ড্রাইভার দেখেছে পানিতে ডুবে থাকা একটা যন্ত্র থেকে একটা প্রাণী বের হয়ে এসেছে।"

মোজাম্মেল হক অবাক হয়ে নিশীতার দিকে তাকিয়ে রইলেন, মনে হল নিশীতা কী বলছে তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। নিশীতার দুই পাশে বসে থাকা দুজন সাংবাদিকের দিকে তিনি একনজর তাকিয়ে আবার নিশীতার দিকে চোখ ফিরিয়ে আনলেন, বললেন, "তুমি ঠিক কী বলতে চাইছ আমি বুঝতে পারছি না নিশীতা। ওখানে কী হয়েছে বলে তোমার ধারণা?"

"আমার ধারণা, মহাকাশ থেকে একটা স্পেসশিপ নেমে এসেছে। সেখান থেকে একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাজাগতিক প্রাণী বের হয়ে এসে কালা জব্বারকে খুন করে কব্জি কাটা দবিরকে ধরে নিয়ে গেছে।"

নিশীতার দুই পাশে বসে থাকা দুজন এতক্ষণ বেশ কষ্ট করে হাসি চেপে রাখার চেষ্টা করছিল, এবারে আর পারল না, হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠল। বোরহান হাসতে হাসতে বলল, "মোজাম্মেল ভাই, চিন্তা করতে পারেন আমাদের দৈনিক বাংলাদেশ পরিক্রমায় বড় বড় হেডলাইন, "মহাজাগতিক প্রাণী কর্তৃক কব্জি কাটা জব্বার অপহরণ!"

শ্যামল হাত নেড়ে বলল, "সবচেয়ে ভালো হয় পত্রিকাটি হাফ সাইজ করে ট্যাবলয়েড তৈরি করে ফেললে। তা হলে মহাজাগতিক প্রাণীর ইন্টারভিউ পর্যন্ত ছাপতে পারব। সম্পাদকীয় বের হবে, "মহাজাগতিক প্রেম : বাংলাদেশের নতুন স্বপ্ন।"

নিশীতা মুখ শক্ত করে বলল, "ঠাট্টা করবেন না শ্যামল দা। আপনি যখন বিদেশে টিকটিকি রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা নিয়ে রিপোর্ট করেছিলেন আমি তখন সেটা নিয়ে ঠাট্টা করি নি।"

শ্যামল গলার স্বর উঁচু করে বলল, "আমি টিকটিকি রপ্তানি করার কথা বলি নি—দুষ্প্রাপ্য সরীসৃপের কথা বলেছিলাম।"

"একই কথা। যেটা এখানে টিকটিকি সেটা অন্য জায়গায় দুষ্প্রাপ্য সরীসৃপ।" উত্তপ্ত বাকবিতণ্ডা শুরু হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে দেখে মোজাম্মেল হক হাত তুলে দুজনকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "ব্যস, অনেক হয়েছে।"

নিশীতা বলল, "তা হলে কী দাঁড়াল ব্যাপারটা? আমি কি এই এ্যাসাইনমেন্টটা পেতে পারি?"

মোজাম্মেল হক খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "দেখ নিশীতা, সাংবাদিকতা ব্যাপারটা অনেকটা কোর্টে বিচার করার মতো। তুমি যদি মনে কর একটা মানুষ অপরাধী, সেটা কিন্তু যথেষ্ট নয়। তোমাকে প্রমাণ করতে হবে মানুষটা অপরাধী। এখানেও তাই—তুমি যদি মনে কর মহাকাশ থেকে মহাজাগতিক প্রাণী চলে এসেছে, সেটা যথেষ্ট নয়, তোমাকে দেখাতে হবে। ঘটনাটি যত বিচিত্র হবে তোমার দায়িত্ব তত কঠিন। শ্যামল ঠিকই বলেছে। আমরা ট্যাবলয়েড বের করি না!"

"মোজাম্মেল ভাই—" নিশীতা বাধা দিয়ে বলল, "আমি কখনোই বলি নি পত্রিকার কাটতি বাড়ানোর জন্য আমি উদ্ভট খবর ছাপাব। এই ঘটনার মাঝে সায়েন্টিফিক রহস্য আছে সেটা আপনারা ধরতে পারছেন না। আমি ধরতে পারছি কারণ আমি বিজ্ঞানের ছাত্রী, ফিজিক্সে মাস্টার্স করেছি—তারপর সাংবাদিকতায় এসেছি।"

বোরহান টিপ্পনী কাটল, "সেটাই তোমার সমস্যা। যদি জার্নালিজমের ছাত্রী হতে তা হলে তুমি সাংবাদিকতা করতে, সব জায়গায় সায়েন্স ফিকশান খুঁজে বেড়াতে না।"

মোজাম্মেল হক মাথা নাড়লেন, বললেন, "হ্যাঁ। তুমি যদি রিপোর্ট কর স্টক মার্কেট ইনডেক্স দুই পয়েন্ট বেড়েছে কেউ দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করে না। কিন্তু তুমি যদি রিপোর্ট করতে চাও একটা কুকুরছানা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে পারে তা হলে সেটা সত্যি হলেও কেউ সেটা বিশ্বাস করবে না। তোমাকে জোর করে সবাইকে বিশ্বাস করাতে হবে।"

নিশীতা ক্ষুব্ধ গলায় বলল, "আমি কখনো বলি নি কুকুরছানা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে পারে।"

শ্যামল বলল, "মহাজাগতিক প্রাণী কব্জি কাটা দবিরকে তুলে নিয়ে গিয়েছে আর কুকুরছানা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছে—এই দুটোর মাঝে খুব একটা পার্থক্য নেই।"

মোজাম্মেল হক মাথা নাড়লেন, বললেন, "শ্যামল ঠিকই বলেছে। খুব বেশি পার্থক্য নেই। তবুও তুমি যদি মহাজাগতিক প্রাণীর খোঁজাখুঁজি করতে চাও আমার কোনো আপত্তি নেই, তবে দুটো শর্ত রয়েছে।"

নিশীতার রাগে–দুঃখে-অপমানে প্রায় চোখে পানি চলে আসছিল, খুব কষ্ট করে মুখ স্বাভাবিক রেখে বলল, "কী শর্ত?"

"প্রথম শর্ত হচ্ছে ব্যাপারটা জানাজানি হতে পারবে না। যদি অন্যেরা জেনে যায় আমাদের সাংবাদিকদের আমরা আরিচাঘাটে মহাজাগতিক প্রাণী খুঁজতে পাঠাচ্ছি সেটা আমাদের জন্য সম্মানজনক হবে না। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে তোমার রেগুলার এ্যাসাইনমেন্ট শেষ করে তারপর এই হাইস্টেক এ্যাসাইনমেন্টে যাবে।"

সূক্ষ্ম অপমানে নিশীতার গাল লাল হয়ে উঠল, কষ্ট করে গলার স্বর স্বাভাবিক রেখে বলল, "ঠিক আছে।"

"ভেরি গুড। তা হলে তুমি যাও মহিলা পরিষদের আজ একটা বিক্ষোভ মিছিল আছে সেটা কাভার কর। পতিতা পুনর্বাসনের সরকারি প্রোগ্রামের ওপর আমি একটা ক্রিটিক চাই।"

"বেশ।" নিশীতা উঠে দাঁড়াল। দৈনিক বাংলাদেশ পরিক্রমার সম্পাদক মোজাম্মেল হকের ঘর থেকে বের হবার সাথে সাথে ভিতরে যে একটা হাসির রোল শুরু হয়ে গেছে ঘর থেকে বের হয়েও সেটা বুঝতে নিশীতার কোনো অসুবিধে হল না।

নিশীতার ভিতরে হঠাৎ কেমন জানি একটা জেদ এসে যায়—কে কী বলছে তাতে তার আর কিছুই আসে-যায় না। সে যেভাবেই হোক সত্যটা বের করেই ছাড়বে।

AMARBOI.COM

৩

নিশীতা পরবর্তী কয়েকদিন খোঁজখবর নিয়ে তিনটি ব্যাপারে নিশ্চিত হল। প্রথম ব্যাপারটি কব্জি কাটা দবিরকে নিয়ে—সে যেন বাতাসে উবে গিয়েছে। অপরাধের অন্ধকার জগতে উপস্থিতিটার গুরুত্ব খুব বেশি, সবাই যেহেতু সবাইকে খুন করে ফেলার চেষ্টা করে কাজেই কাউকে দীর্ঘ সময় অনুপস্থিত দেখলেই ধরে নেওয়া হয় সে খুন হয়ে গেছে, তখন তার রাজত্ব খুব দ্রুত হাতছাড়া হয়ে যায়। কব্জি কাটা দবিরের বেলাতেও এটা ঘটেছে। তার এলাকায় মাদক ব্যবসা, চাঁদার বখরা, টেন্ডারের ভাগ সবকিছু তার হাতছাড়া হয়ে গেছে, তার এলাকায় এখন কানা বকুল নামে নতুন একজন মস্তানের আবির্ভাব হয়েছে। কব্জি কাটা দবিরকে নিয়ে কারো কোনো কৌতূহল নেই।

দ্বিতীয় ব্যাপারটি সেই রহস্যময় আলোর রেখা নিয়ে—নিশীতা অসংখ্য মানুষের সাথে কথা বলেছে এবং সবার বক্তব্য মোটামুটি একরকম। রাত দুটোর একটু পর পশ্চিম আকাশ থেকে একটা আলোর রেখা ছুটে এসেছে। এটি বজ্রপাত নয়—বজ্রপাতের মতো আঁকাবাঁকা আলোর ঝলকানি ছিল না—আলোর রেখাটি ছিল একেবারে সরলরেখার মতো সোজা। আলোটি ছিল তীব্র এবং উজ্জ্বল, এক পর্যায়ে পুরো এলাকা দিনের মতো আলোকিত হয়ে উঠেছিল। এ ধরনের কিছু একটা হতে পারে বড় কোনো উল্কাপাত থেকে কিন্তু এত বড় উল্কা যদি পৃথিবীতে এসে আঘাত করে তার বিস্ফোরণে বিশাল জনপদ ভস্মীভূত হয়ে যাবার কথা। কিন্তু কোনো বড় বিস্ফোরণ ঘটে নি।

তৃতীয় ব্যাপারটি হচ্ছে সত্যিকার অর্থে হতাশাব্যঞ্জক—এ রকম কৌতূহলী একটা ব্যাপারে কারো কোনো মাথাব্যথা নেই। ঠিক কী ঘটেছে সেটা জানার জন্য কারো ভিতর কোনো কৌতূহল নেই। নিশীতা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বড় বড় প্রফেসরদের শরণাপন্ন হয়েছে কিন্তু কোনো লাভ হয় নি, তারা সবাই নিজের সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত। আলোকরশ্মিটি মহাজাগতিক কোনো কিছু হতে পারে কি না জানতে চাইলে বড় বড় প্রফেসররা এমনভাবে তার দিকে তাকিয়েছেন যেন তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। শুধুমাত্র একজন বৃদ্ধ প্রফেসর তার কথা শুনে খিকখিক করে হেসে বললেন, "রিয়াজ থাকলে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারত।"

"রিয়াজ?" নিশীতা জানতে চাইল, "রিয়াজ কে?"

"আমার একজন ছাত্র। খুব ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট। ক্যালটেক থেকে এস্ট্রোফিজিক্সে পিএইচ.ডি. করে নাসার সাথে কিছুদিন কাজ করেছে। তার কাজকর্ম ছিল মহাজাগতিক প্রাণী নিয়ে। এত ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট কিন্তু কাজ শুরু করল সায়েন্স ফিকশান নিয়ে! কী দুঃখের কথা।"

নিশীতা নোট বইয়ে রিয়াজ সম্পর্কে তথ্যগুলো টুকতে টুকতে জিজ্ঞেস করল, "পুরো নাম কী রিয়াজের? কোথায় আছেন এখন?"

"পুরো নাম যতদূর মনে পড়ে রিয়াজ হাসান। এখন কোথায় আছে জানি না। যেখানে কাজ করত সেখানে ডিরেক্টরের সাথে ঝগড়া করে কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছিল।"

নিশীতা রিয়াজ হাসান সম্পর্কে যেটুকু সম্ভব তথ্য টুকে নিয়ে বিদায় নিয়ে চলে এল। এমনিতেই সে বাইরের বিজ্ঞানীদের কাছে লিখবে বলে ভেবেছিল, রিয়াজ হাসানকে খুঁজে পেলে সমস্যা অনেকটুকুই মিটে যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের অফিস থেকে নিশীতা অনেক কষ্ট করে রিয়াজ হাসানের একটা ছবি যোগাড় করল। ছাত্র জীবনের ছবি—একমাথা উষ্কখুষ্ক চুল, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। পরের কয়েকদিন নিশীতা ইন্টারনেটে খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করল, পরিচিত সবার কাছে রিয়াজ হাসানের খোঁজ জানতে চেয়ে সে ই-মেইল পাঠিয়ে দিল। জার্নালে বের হওয়া পেপারগুলোতে সে রিয়াজ হাসানের নাম খোঁজার চেষ্টা করে। তার পুরোনো কর্মস্থলে তার সম্পর্কে খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করে।

পুরো এক সপ্তাহ অমানুষিক পরিশ্রম করেও রিয়াজ হাসান কোথায় আছে সে সম্পর্কে নিশীতা নতুন কিছুই জানতে পারল না। মানুষটি একজন প্রতিভাবান বিজ্ঞানী, নাসাতে কাজ করার সময় তথ্য পাঠানোর জন্য নতুন এক ধরনের এনকোডিং বের করেছিল, সেটি ব্যবহার করে ভিন্ন গ্যালাক্সিতে তথ্য পাঠানো যেতে পারে এটুকুই নতুন কিন্তু মানুষটি যেন একেবারে বাতাসে উবে গেছে।

পরের সপ্তাহে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সম্পর্কে একটি সেমিনার বিষয়ে লিখতে গিয়ে নিশীতার মোজাম্মেল হকের সাথে খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলতে হল। কাজের কথা শেষ করে মোজাম্মেল হক চোখ নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার মহাজাগতিক প্রাণীর কী খবর?"

নিশীতা হাসার চেষ্টা করে বলল, "মহাজাগতিক প্রাণীর খবর নেবার জন্য যে মানুষটি দরকার তার খবর পাচ্ছি না।"

মোজাম্মেল হক ভুরু কুঁচকে বললেন, "কে সেই মানুষ?"

নিশীতা একটা নিশ্বাস ফেলে মোজাম্মেল হককে রিয়াজ হাসানের কথা বলল। মোজাম্মেল হক পুরোটুকু মন দিয়ে শুনে বললেন, "তোমার বয়স কম তাই মানুষের ওপর

বিশ্বাস খুব বেশি। আমার ধারণা এই মানুষটিকে খুঁজে পেলেও তোমার খুব একটা লাভ হবে না।"

" কিন্তু আগে খুঁজে তো পাই!"

"তুমি যে বর্ণনা দিলে তাতে মনে হল একটু খ্যাপা গোছের মানুষ। তার ওপর ডিরেক্টরের সাথে ঝগড়া করেছে। এই ধরনের মানুষেরা ঝগড়াঝাঁটি করে সাধারণত দেশে চলে আসে। দেশে এসে এরা একেবারে আলাদাভাবে থাকে—কারো সাথে মেশে না, কিছু করে না।"

নিশীতা একটু অবাক হয়ে বলল, "আপনি বলছেন রিয়াজ হাসান এখন দেশে আছে?"

"তুমি যেহেতু দেশের বাইরে খুঁজে পাও নি—আমার ধারণা দেশেই আছে। এক হিসেবে অবশ্য তা হলে খুঁজে পাওয়া আরো কঠিন।"

নিশীতা মাথা নাড়ল, "না মোজাম্মেল ভাই। কঠিন নয়। দেশে থাকলে আমি তাকে খুঁজে বের করে ফেলব।"

"কীভাবে?"

"সোজা। এ রকম একজন মানুষ যদি দেশে থাকে তা হলে তার একমাত্র যে জিনিসটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে ইন্টারনেট এ্যাকাউন্ট! দেশের আইএসপিগুলোর কাছে খোঁজ নিলেই বের হয়ে যাবে। আমি বের করে ফেলতে পারব।"

মোজাম্মেল হক একটু সন্দেহের চোখে নিশীতার দিকে তাকালেন—তার কথা ঠিক বিশ্বাস করলেন বলে মনে হল না।

নিশীতা কিন্তু সত্যি সত্যি দুদিনের মাঝে রিয়াজ হাসানকে খুঁজে বের করে ফেলল। তাকে শুরু করতে হয়েছিল একুশ জন রিয়াজ আহমেদকে দিয়ে—এক জন এক জন করে তাদের ছেঁটে ফেলে সত্যিকার রিয়াজ হাসানকে খুঁজে বের করতে হয়েছে।

রিয়াজ হাসানের বাসাটি সত্যি সত্যি তার চরিত্রের সাথে খাপ খেয়ে যায়। বাসার জায়গাটি বেশ বড় গাছগাছালিতে ভরা, কিন্তু সে তুলনায় বাসাটি খুব ছোট, বাইরে থেকে বাসাটি প্রায় দেখাই যায় না। নিশীতা যখন রিয়াজ হাসানের সাথে দেখা করতে এসেছে তখন সন্ধে পার হয়ে গেছে। গেট খুলে খোয়া বাঁধানো পথ দিয়ে হেঁটে বাসার দরজায় শব্দ করল, প্রথমে মনে হল ভিতরে কেউ নেই। বেশ কিছুক্ষণ পর খুট করে শব্দ হল এবং একজন মানুষ দরজা খুলে দাঁড়াল, নিশীতা দেখেই চিনতে পারল, মানুষটি রিয়াজ হাসান। তার কাছে যে ছবিটা রয়েছে তার সাথে অনেক মিল, মাথায় চুল এখনো এলোমেলো, মুখে এখনো এক ধরনের বিষণ্নতা।

রিয়াজ হাসান নিশীতাকে দেখে একটু অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল। নিশীতা মুখে হাসি টেনে এনে বলল, "আপনি নিশ্চয়ই রিয়াজ হাসান।"

মানুষটির মুখে বিস্ময়ের ছায়া পড়ে। মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ, আমি রিয়াজ হাসান। আপনাকে চিনতে পারলাম না।"

"চিনতে পারার কথা নয়—আমি আপনাকে খুঁজে বের করেছি। আমার নাম নিশীতা। আপনার সাথে কি একটু কথা বলতে পারি?"

রিয়াজ দরজা থেকে সরে দাঁড়াল, বলল, "আসুন।"

নিশীতা ঘরের ভিতর ঢুকল, মানুষের বাসায় সাধারণত বাইরের মানুষ এলে বসানোর একটা জায়গা থাকে। এখানে সেরকম কিছু নেই। ঘরটিতে বসার জায়গা নেই—

অনেকগুলো টেবিল এবং সেখানে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি। কয়েকটা নানা আকারের কম্পিউটার, সবগুলো খোলা, নানা ধরনের তার দিয়ে জুড়ে দেওয়া রয়েছে।

রিয়াজ একটা চেয়ারের ওপর স্তূপ করে রাখা কাগজপত্র এবং কিছু সার্কিট বোর্ড সরিয়ে নিশীতার বসার জন্য জায়গা করে দিয়ে বলল, "বসুন।"

নিশীতা ইতস্তত করে বলল, "আপনি?"

রিয়াজ হাসান চারদিকে একনজর তাকিয়ে অপরাধীর মতো বলল, "আসলে আমার এখানে কেউ আসে না, তাই কাউকে বসানোর জায়গা নেই। আপনি বসুন—আমি ভিতর থেকে একটা চেয়ার নিয়ে আসি।"

রিয়াজ চলে যাবার পর নিশীতা চেয়ারটাতে না বসে ঘরটিতে ইতস্তত হেঁটে বেড়ায়, খুব সতর্ক থাকতে হয় হঠাৎ করে কোনো কিছুকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে না দেয়। ঘরের কোনায় একটি মনিটর রাখা ছিল, তার সামনে যেতেই মনিটরটি হঠাৎ করে আলোকিত হয়ে ওঠে, সেখানে একজন মানুষের মুখের প্রতিচ্ছবি দেখা যায় এবং মানুষটি পরিষ্কার গলায় বলল, "কে? কে আপনি?"

নিশীতা চমকে উঠে থেমে যায়। কম্পিউটারের মনিটর থেকে কেউ প্রশ্ন করলে তার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন আছে কি না সে ঠিক বুঝতে পারল না। নিশীতা ভালো করে মানুষটির প্রতিচ্ছবির দিকে তাকাল, এটি সত্যিকার মানুষের মুখের ছবি নয়, কম্পিউটার গ্রাফিক্স ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে, কম্পিউটার গেমগুলোতে যে ধরনের মানুষের চেহারা দেখা যায় অনেকটা সেরকম, তবে তার থেকে অনেক ভালো। মানুষটির চেহারায় ঠিক বয়স বোঝা যায় না—দশ বছরের বালক হতে পারে, বিশ বছরের যুবক হতে পারে আবার তিরিশ থেকে চল্লিশ বছরের প্রৌঢ়ও হতে পারে। মানুষটির চেহারায় একটা সুনির্দিষ্ট অভিব্যক্তি রয়েছে—প্রথমে ছিল কৌতূহল এবং নিশীতা দেখতে পেল অভিব্যক্তিটি এখন পুরোপুরি বিরক্তিতে পাল্টে গেছে। মানুষটি বিরক্ত গলার স্বরে বলল, "কী হল? কথা বলছ না কেন?"

নিশীতা কী করবে বুঝতে পারল না, তখন মনিটর থেকে মানুষের প্রতিচ্ছবিটি অত্যন্ত শক্ত গলায় ধমক দিয়ে বসল, "একটা প্রশ্ন করছি সেটা কানে যায় না? কে তুমি?"

নিশীতা থতমত খেয়ে বলল, "আমি নিশীতা।"

"নিশীতা? সেটা আবার কী রকম নাম?"

নিশীতা অবাক হয়ে মনিটরে মানুষের প্রতিচ্ছবির দিকে তাকিয়ে রইল, সে এর আগে কখনো কোনো কম্পিউটার প্রোগ্রামকে এ রকম স্পষ্ট ভাষায় কথোপকথন করতে শোনে নি। চোখ বড় বড় করে বলল, "তুমি সত্যি সত্যি আমার সাথে কথা বলছ?"

মানুষটির মুখে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটে উঠল, "সত্যি সত্যি নয়তো কি মিথ্যা কথা বলছি? তুমি দেখতে পাচ্ছ না?"

"তা দেখতে পাচ্ছি। খুবই বিচিত্র।"

"তুমি সত্যিই মনে কর এটা বিচিত্র?"

নিশীতা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল ঠিক তখন রিয়াজ হাসান একটা হালকা চেয়ার নিয়ে ঘরে এসে ঢুকল, নিশীতাকে মনিটরের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে দেখে হো হো করে হেসে উঠল, বলল, "আপনাকে এপসিলন পাকড়াও করছে?"

"এপসিলন?"

নিশীতার কথার উত্তরে মনিটর থেকে মানুষের প্রতিচ্ছবিটি বলল, "কেন এপসিলন কি কারো নাম হতে পারে না?"

নিশীতা একবার রিয়াজের দিকে আবার একবার মনিটরের দিকে তাকাল, ঠিক কী বলবে বুঝতে পারল না। রিয়াজ ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় চেয়ারটা বসিয়ে বলল, "এপসিলন আমার ন্যাচারাল ল্যাংগুয়েজ কথোপকথন সফটওয়্যার।"

নিশীতা কিছু বলার আগেই মনিটর থেকে মানুষটি ভুরু কুঁচকে বলল, "তুমি কি বলতে চাও কথোপকথন সফটওয়্যার একটা ফ্যালনা জিনিস?"

রিয়াজ গলা উঁচিয়ে বলল, "ব্যস এপসিলন, অনেক হয়েছে। এখন চুপ কর।"

"কেন চুপ করব? আমি কি তোমার খাই না পরি?"

"বেয়াদব কোথাকার, তোমাকে আমি দেখাচ্ছি মজা—" বলে রিয়াজ হাসান একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে পাওয়ার কর্ডটা খুলে নিল।

সাথে সাথে মনিটরে মানুষটির চেহারা চুপসে ছোট হয়ে মিলিয়ে মনিটরটি অন্ধকার হয়ে গেল।

নিশীতা জিভ দিয়ে চুকচুক করে শব্দ করে বলল, "আহা হা—কেন আপনি বেচারাকে টার্মিনেট করে দিলেন! বেশ তো কথা বলছিল।"

"আপনি চাইলে এর সাথে যত ইচ্ছে কথা বলতে পারেন কিন্তু সে চালু থাকলে আমি কিংবা আপনি কেউই কথা বলতে পারব না!"

নিশীতা ঘরের মাঝামাঝি এগিয়ে গিয়ে বলল, "আমি ইংরেজিতে এ রকম কথোপকথন সফটওয়্যার দেখেছি, বাংলায় দেখি নি। কোথায় পেয়েছেন এটা?"

"কোথায় আবার পাব? আমি লিখেছি।"

নিশীতা অবাক হয়ে চোখ বড় বড় করে রিয়াজ হাসানের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি লিখেছেন? আমি ভেবেছিলাম আপনি কমিউনিকেশন্সের লোক।"

রিয়াজ স্থির দৃষ্টিতে নিশীতার দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত ইতস্তত করে বলল, "আমার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে এসেছেন মনে হচ্ছে।"

AMARBOI.COM

নিশীতা মাথা নাড়ল, "জি। নিয়ে এসেছি। আমি একজন সাংবাদিক—খোঁজ-খবর নেওয়াই আমার কাজ। আমার ধারণা আমি এখন আপনার সম্পর্কে যেটুকু জানি আপনি নিজেও ততটুকু জানেন না।"

"কী ব্যাপার? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"বলছি, কিন্তু তার আগে এপসিলন নিয়ে কয়েকটা কথা জেনে নিই। প্রথম প্রশ্ন, এর নাম এপসিলন কেন?"

রিয়াজ হাসান একটু হেসে বলল, "যদি এর নাম হত তেতাল্লিশ, আপনি তবুও জিজ্ঞেস করতেন এর নাম তেতাল্লিশ কেন! যদি এর নাম হত বকুল ফুল, আপনি জিজ্ঞেস করতেন কেন বকুল ফুল হল। যদি এর নাম হত ঝিনাইদহ—"

"তার মানে বলতে চাইছেন নামটির সাথে সফটওয়্যারটির কোনো সম্পর্ক নেই?"

রিয়াজ মাথা চুলকে বলল, "একেবারে নেই তা নয়। যেদিন কোডিং শুরু করেছি সেদিন হঠাৎ টেলিভিশনে দেখি আমার এক ক্লাসফ্রেন্ডকে দেখাচ্ছে, সে প্রতিমন্ত্রী হয়ে গেছে! ইউনিভার্সিটিতে থাকার সময় তাকে আমরা ডাকতাম এপসিলন অর্থাৎ খুবই ছোট! সে এত তুচ্ছ ছিল যে তাকে এপসিলন ডাকাটাই বেশি। তাই প্রোগ্রামটা লিখতে গিয়ে এই নাম।"

নিশীতা সব কিছু বুঝে ফেলার মতো করে মাথা নেড়ে বলল, "আপনার এপসিলন অসম্ভব স্মার্ট! যখন কথা বলে তখন মুখে অভিব্যক্তি দেখা যায়। এটি কীভাবে করেছেন? এর মাঝে কি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করেছেন?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com ~

রিয়াজ হাসান হো হো করে হেসে বলল, "আপনি আমাকে কী ভেবেছেন? আমি প্রফেশনাল প্রোগ্রামার নই, একেবারেই এমেচার। সময় কাটানোর জন্য জোড়াতালি দিয়ে এটা দাঁড়া করিয়েছি। মুখের অভিব্যক্তিটি ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করেছি। জানেন তো আজকাল প্রোগ্রামিং পানির মতো সোজা!"

নিশীতা মাথা নেড়ে বলল, "কিন্তু এপসিলন কী চমৎকার কথা বলল! একেবারে সত্যিকার মানুষের মতো।"

রিয়াজ হাসান সকৌতুকে নিশীতার দিকে তাকিয়ে রইল। মুখ টিপে হাসি চেপে বলল, "আপনার তাই ধারণা?"

"হ্যাঁ।" নিশীতা জোর গলায় বলল, "একটু মেজাজী বা একটু বেয়াদপ হতে পারে কিন্তু খাঁটি মানুষের মতো কথা বলেছে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই!"

"আসলে আপনি মাত্র অল্প সময় কথা বলেছেন দেখে ধরতে পারেন নি—এটি আসলে একটি অত্যন্ত নির্বোধ প্রোগ্রাম।"

"নির্বোধ?"

"হ্যাঁ। আপনি যে কথাগুলো বলেন সেই কথাগুলো ব্যবহার করে একটা প্রশ্ন তৈরি করে। আপনার সব কথার উত্তর দেয় প্রশ্ন করে—প্রশ্নের উত্তর দেয় প্রশ্ন দিয়ে তাই আপনার মনে হয় এটা বুঝি বুদ্ধিমান!"

নিশীতা চমৎকৃত হয়ে বলল, "আমি ধরতে পারি নি।"

"এখন থেকে পারবেন।" রিয়াজ মুখে খানিকটা গাম্ভীর্য এনে বলল, "তবে এখানে হার্ডওয়্যারের কিছু কাজ আছে। একটা ভিডিও ক্যামেরা দিয়ে কিছু ইমেজ প্রসেসিং হয়—"

"যার অর্থ এটি দেখতে পায়?"

"না—না—না—এটাকে দেখতে পাওয়া বলে দেখা ব্যাপারটিকে অপমান করবেন না। বলেন ভিডিও ক্লিপকে প্রসেস করে। এ ছাড়া ভয়েস রিকগনিশান, ভয়েস সিনথেসিসের কিছু ভালো কাজ আছে। বেশিরভাগ হার্ডওয়্যারে, বুঝতেই পারছেন আমি হার্ডওয়্যারের মানুষ।"

নিশীতা মাথা নাড়ল, বলল, "আমি জানি।"

"সেটাই শুনি আপনার কাছে। কতটুকু জানেন? কীভাবে জানেন? কেন জানেন?"

"আপনাকে আমি অনেকদিন থেকে খুঁজছি। সারা আমেরিকা খুঁজে আপনাকে পাই নি, তখন একজন বলল, আপনি নিশ্চয়ই দেশেই আছেন। দেশে খুঁজতেই সত্যি সত্যি পেয়ে গেলাম—"

রিয়াজ হাসান অবাক হয়ে নিশীতার দিকে তাকাল কিন্তু কিছু বলল না। নিশীতা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "একটা ব্যাপারে আমি আপনার সাহায্য চাই।"

"কী ব্যাপার?"

"প্রায় তিন সপ্তাহ আগে আকাশ থেকে একটা নীল আলো নিচে নেমে এসেছে, যারা দেখেছে তারা বলেছে একেবারে সোজা নেমে এসেছে উল্কাপাতের মতো। কিন্তু কোনোরকম বিস্ফোরণ হয় নি।"

রিয়াজ হাসান কোনো কথা না বলে ভুরু কুঁচকে তাকাল।

"আলোটা যেখানে নেমেছে তার কাছাকাছি জায়গায় একটা মানুষের ডেডবডি পাওয়া গেছে। মানুষটার পোস্টমর্টেম করেও কেউ বুঝতে পারে নি সে কেমন করে মারা গেছে। শরীরের ভিতরে এক ধরনের বিচিত্র ক্রিস্টাল, মনে হয় রক্তের এক ধরনের প্রসেসিং হয়েছে।

AMARBOI.COM

মানুষটা আন্ডারওয়ার্ল্ডের, নাম কালা জব্বার। তার সাথে আরেকজন ছিল, তার নাম কব্জি কাটা দবির—সে বাতাসের মাঝে উবে গেছে। মানুষটা—"

"নীল আলোটা কবে নেমেছে?"

"তিন তারিখ। রাত দুটো পঁয়ত্রিশ মিনিটে।"

"আকাশের কোনদিক থেকে নেমেছে?"

"দক্ষিণ-পূর্ব থেকে সোজা নিচের দিকে।"

রিয়াজ একটা কাগজে কী যেন লিখল, ছোট কয়েকটা সংখ্যা দিয়ে কিছু একটা হিসাব করল, তারপর হঠাৎ করে খুব গম্ভীর হয়ে গেল।

নিশীতা রিয়াজের দিকে তাকিয়ে একটু ইতস্তত করে বলেই ফেলল, "আমার ধারণা মহাকাশ থেকে কোনো মহাকাশযান পৃথিবীতে নেমে এসেছে।"

রিয়াজ নিশীতার কথা শুনে হেসে ফেলল না বা হাসার চেষ্টাও করল না, এক দৃষ্টিতে একটা বিচিত্র ভঙ্গি করে নিশীতার দিকে তাকিয়ে রইল। নিশীতা অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বলল, "আপনার কী মনে হয়? কোনো মহাজাগতিক প্রাণী কি এসেছে?"

রিয়াজ কয়েক মুহূর্ত তার হাতের আঙুলের দিকে তাকিয়ে বলল, "সম্ভাব্য মহাজাগতিক প্রাণীদের তাদের বুদ্ধিমত্তা দিয়ে কয়েকটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যদি প্রথম স্তরের বুদ্ধিমত্তা হয়ে থাকে তা হলে আমাদের সভ্যতা কখনো তাকে দেখতে পাবে না। হয়তো তারা এখনই আছে, হয়তো আমাদের নিয়ন্ত্রণ করছে, হয়তো আমাদের দিয়ে একটা পরীক্ষা করছে, আমরা জানতেও পারব না। মহাজাগতিক প্রাণীর সভ্যতা, বুদ্ধিমত্তা যদি তৃতীয় কিংবা চতুর্থ স্তরের হয় শুধু তা হলেই আমরা তাদের দেখব।"

"তা হলে কি তৃতীয় কিংবা চতুর্থ স্তরের কিছু এসেছে?"

"বলা খুব মুশকিল। তবে, একটা ব্যাপারে নিশ্চিত থাকেন।"

"কী?"

"আপনার অনুমান যদি সত্যি হয়ে থাকে সেটি পৃথিবীতে গোপন থাকবে না।"

"গোপন থাকবে না?"

"না। আমি যে ল্যাবরেটরিতে কাজ করতাম তারা সারা পৃথিবীতে এই ধরনের ঘটনা খুঁজছে। আপনি যে ঘটনার বর্ণনা দিলেন সেটি যদি সত্যি হয়ে থাকে তা হলে এই মুহূর্তে ঢাকায় আমার পুরোনো সব সহকর্মী হাজির হয়ে গেছে!"

নিশীতা একটু উত্তেজিত হয়ে বলল, "আমেরিকান সায়েন্টিস্টরা এখন ঢাকায় চলে এসেছে?"

"আমার তাই ধারণা।"

"কিন্তু আপনি আমাদের বাংলাদেশের সায়েন্টিস্ট। এ ব্যাপারে আপনি কিছু করবেন না?"

রিয়াজ মাথা নাড়ল, বলল, "না।"

"কেন নয়?"

"কারণ আমি ছেড়ে দিয়েছি। আমি মহাজাগতিক প্রাণীর সাথে যোগাযোগের ব্যাপারে আর কাজ করি না।"

"কেন করেন না?"

"সেটা অনেক দীর্ঘ ব্যাপার। বেশিরভাগই ব্যক্তিগত ব্যাপার। বলার মতো কিছু নয়।"

নিশীতা কী বলবে কিছু বুঝতে পারল না, খানিকক্ষণ চেষ্টা করে বলল, "কিন্তু এই

মহাজাগতিক প্রাণী যদি আমাদের কোনো ক্ষতি করে? পৃথিবীর কোনো ক্ষতি করে?"

"যদি তারা তৃতীয় স্তরের হয়ে থাকে তা হলে কিছু করার নেই। আমরা তাদের সামনে কিছু নই, তেলাপোকা কিংবা পিঁপড়ার মতো! আমাদের যদি দয়া করে বেঁচে থাকতে দেয় তা হলে বেঁচে থাকব। যদি চতুর্থ মাত্রার হয় তা হলে যোগাযোগের একটা ছোট সম্ভাবনা আছে—"

"আমরা কেমন করে বুঝব তারা কোন মাত্রার?"

রিয়াজ এই প্রথম একটু হাসার ভঙ্গি করে বলল, "আপনাকে তার চেষ্টা করতে হবে না। সেগুলো বিশ্লেষণ করার লোক আছে। সেটা করার জন্য কোনো কোনো মানুষকে বছরে এক শ থেকে দুই শ হাজার ডলার বেতন দেওয়া হয়। আমি আপনাকে বলেছি, সেই মানুষগুলো মনে হয় এর মাঝে এই দেশে চলে এসে কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছে! আপনার চিন্তার কোনো কারণ নেই।"

নিশীতা অবাক হয়ে রিয়াজের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি সত্যিই কিছু করবেন না?"

রিয়াজ নরম গলায় বলল, "আমি যেখানে কাজ করতাম সেই ল্যাবরেটরির বছরে বাজেট ছিল কয়েক বিলিয়ন ডলার। সেই ল্যাবরেটরি থেকেও সুযোগের অভাবে আমরা সবকিছু করতে পারতাম না। এখান থেকে আমি কী করব?"

"ইন্টারনেটে দেখেছি মহাজাগতিক প্রাণীর সাথে যোগাযোগ করার জন্য আপনার একটা কোডিং এলগরিদম আছে, সেটা ট্রান্সমিট করতে পারেন না?"

রিয়াজ শব্দ করে হেসে বলল, "তার জন্য বিশাল এ্যান্টেনা লাগবে, মেগাওয়াট পাওয়ার লাগবে। আমার বাসায় ডিশ এ্যান্টেনা দিয়ে তো সেটা করা যাবে না!"

AMARBOI.COM

"কেন? করলে কী হবে?"

"মহাজাগতিক প্রাণী যদি আমার বাসার ছাদে ঘোরাঘুরি করে তা হলে সেটা করা যায়—কিন্তু দূর গ্যালাক্সিতে তো আর এটা দিয়ে খবর পাঠানো যাবে না?"

নিশীতা একটু সামনে ঝুঁকে বলল, "কিন্তু হয়তো এই মহাজাগতিক প্রাণী কাছাকাছিই আছে! ঢাকা শহরেই আছে।"

"না, নেই। পৃথিবীতে মহাজাগতিক প্রাণী সত্যি সত্যি চলে আসার সম্ভাবনা এত কম যে ধরে নিতে পারেন তার সম্ভাবনা শূন্য। আমরা তবু চোখ কান খোলা রাখি। আপনি যেটা বলছেন সেটার ব্যাপারে—"

রিয়াজ হঠাৎ চুপ করে গেল। নিশীতা বলল, "সেটার ব্যাপারে?"

"নাহ্। কিছু না।"

রিয়াজ বলতে চাইছে না বলে নিশীতা জোর করল না। সে তার হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল, বলল, "আমি যদি মহাজাগতিক প্রাণী নিয়ে একটা স্টোরি করি আপনি একটা ইন্টারভিউ দেবেন?"

"ইন্টারভিউ? আমি?"

"হ্যাঁ।"

রিয়াজ মাথা নাড়ল, বলল, "না। সেটা একেবারেই ঠিক হবে না, মানুষ পাগল ভাববে। আর এসব ব্যাপার আসলে গোপনে করতে হয়—সাধারণ মানুষের এগুলো জানা ঠিক নয়! তারা কখনোই এসব ব্যাপার ঠিকভাবে নিতে পারে না।"

নিশীতা তর্ক করার জন্য কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল, বলল, "ঠিক আছে আপনাকে আমি জোর করব না। কিন্তু যদি আপনি মত পাল্টান আমাকে জানাবেন, প্লিজ।"

"ঠিক আছে, জানাব।"

"আমার টেলিফোন নম্বর দিয়ে যাচ্ছি।" নিশীতা তার ব্যাগ থেকে কার্ড বের করে রিয়াজের হাতে ধরিয়ে দিল। রিয়াজ অন্যমনস্কভাবে চোখ বুলিয়ে কার্ডটা তার শার্টের পকেটে রেখে দেয়। নিশীতা বুঝতে পারল নেহায়েত ভদ্রতা করে পকেটে রেখেছে, রিয়াজ নিজে থেকে তাকে টেলিফোন করবে না।

নিশীতা অবশ্য কল্পনা করে নি দুদিনের ভিতরেই সে রিয়াজের টেলিফোন পাবে, সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে, সম্পূর্ণ বিচিত্র পরিবেশে।

৪

রিয়াজের বাসা থেকে ফিরে এসেই পরের দিন নিশীতা আমেরিকান এজেন্সিতে খোঁজ করে জানার চেষ্টা করল সত্যি সত্যি আমেরিকা থেকে কিছু বিজ্ঞানী এসে হাজির হয়েছে কি না, কিন্তু সে ভালো সদুত্তর পেল না। পরদিন বড় বড় হোটেলগুলোতে খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করল কিন্তু সেখানেও লাভ হল না, হোটেলগুলো তাদের গ্রাহকদের পরিচয় বাড়াবাড়ি রকমভাবে গোপন রাখে। পরদিন ভোরে সে এয়ারপোর্টের ইমিগ্রেশনে একবার খোঁজ নেবার পরিকল্পনা করছিল, কার সাথে যোগাযোগ করলে সবচেয়ে ভালো হয় সেটা নিয়ে চিন্তা করতে করতে অন্যমনস্কভাবে খবরের কাগজটি হাতে নিয়ে সে চমকে ওঠে। প্রথম পৃষ্ঠার মাঝামাঝি বক্স করে একটা খবর ছাপা হয়েছে, খবরের শিরোনাম : 'শহরে রহস্যময় আলোর রেখা!' নিচে লেখা গত রাত বারোটার দিকে দক্ষিণ-পূর্ব আকাশ থেকে একটা রহস্যময় আলো ঢাকা শহরের বুকে নেমে এসেছে। রাতে ঝড়বৃষ্টি ছিল না কাজেই এটি বজ্রপাত নয়। আলোটি বজ্রপাতের মতো আঁকাবাঁকা নয়, একেবারে সরলরেখার মতো। মনে হয়েছে উত্তরার কাছাকাছি কোথাও আলোটি নেমে এসেছে। খোঁজখবর নিয়েও সেই এলাকায় কোনো ক্ষতি হয়েছে বলে খবর পাওয়া যায় নি। আলোটি কোথা থেকে এসেছে কেউ বলতে পারে নি। এটাকে উল্কাপাত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে, যদিও উল্কাটির কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় নি।

নিশীতা নিশ্বাস বন্ধ করে খবরটা কয়েকবার পড়ে ফেলল। তাকে কেউ বলে দেয় নি কিন্তু সে একেবারে নিশ্চিত হয়ে যায় এটিও ঠিক আগের মতো একটি মহাকাশযান। ব্যাপারটি নিয়ে কারো সাথে কথা বলতে পারলে হত কিন্তু সেরকম একজন মানুষও নেই। একটা মহাকাশযান পৃথিবীতে চলে এসেছে এই কথাটি গুরুত্ব দিয়ে শুনেছে, হেসে উড়িয়ে দেয় নি সেরকম একমাত্র মানুষ হচ্ছে রিয়াজ হাসান। কিন্তু রিয়াজ হাসানও কোনো একটা বিচিত্র কারণে এই ব্যাপারটায় মাথা ঘামাতে চাইছে না। নিশীতা নাশতার টেবিলে বসে চা খেতে খেতে ঠিক করে ফেলল সে আবার রিয়াজ হাসানের সাথে দেখা করতে যাবে।

তাড়াহুড়ো করে বের হয়ে সে তার মোটর সাইকেলে বসতেই তার সেলুলার ফোন বেজে উঠল, বাংলাদেশ পরিক্রমার সম্পাদক মোজাম্মেল হক ফোন করেছেন। দুপুর বারোটার সময় প্রধানমন্ত্রীর সাংবাদিক সম্মেলন, তাকে যেতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তির নতুন ইনস্টিটিউট তৈরি হবে, সাংবাদিক সম্মেলনে সে ব্যাপারে একটি মহাপরিকল্পনার কথা ঘোষণা করা হবে। মোজাম্মেল হক নিশীতাকে দায়িত্ব দিলেন তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা

আছে সেগুলো আগে থেকে জেনে নিতে, সাংবাদিক সম্মেলনে যেন ঠিকভাবে প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করতে পারে। নিশীতা মনে মনে একটা হিসাব করে বুঝতে পারে রিপোর্টটি লিখে শেষ করে জমা দিয়ে রিয়াজ হাসানের কাছে যেতে যেতে তার রাত হয়ে যাবে। এমনও হতে পারে যে আজ হয়তো যেতেই পারবে না।

নিশীতা মাথা থেকে রহস্যময় আলোর রেখা ব্যাপারটি এক রকম জোর করে সরিয়ে দিয়ে মোটর সাইকেলে চেপে বসল, কয়েক মুহূর্ত পরেই দেখা গেল তার সুজুকি এক্স এল ২০০ গর্জন করে বিজয় সরণি দিয়ে ছুটে চলছে।

প্রধানমন্ত্রীর সাংবাদিক সম্মেলনটি খুব প্রাণবন্ত সম্মেলন হল, এতজন প্রবীণ সাংবাদিকের মাঝে তাকে প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া হবে কি না সে ব্যাপারে নিশীতার একটু সন্দেহ ছিল, কিন্তু শার্ট-প্যান্ট পরা মেয়ে বলেই কি না কে জানে, প্রধানমন্ত্রী তাকে বেশ সুযোগ দিলেন। জনশক্তি নিয়ে নিশীতার প্রশ্নটি ছিল খুব সুন্দর এবং একেবারে যথাযথ উত্তর দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীরও একটু চিন্তা করতে হল।

সাংবাদিক সম্মেলনের রিপোর্টটা টাইপ করে জমা দিয়ে বার্তা সম্পাদকের সাথে কথা বলে সে যখন পত্রিকা অফিস থেকে বের হয়েছে তখন রাত দশটা, রিয়াজ হাসানের বাসায় যাবার জন্য বেশ দেরি হয়ে গেছে। পরদিন সকালেই যাবে ঠিক করে সে যখন তার মোটর সাইকেলে বসেছে তখন তার সেলুলার ফোনটি আবার বেজে উঠল, নিশীতা অবাক হয়ে দেখল টেলিফোন নম্বরের জায়গায় বিচিত্র তারকা চিহ্ন! সে ফোনটি কানে লাগাতেই শুনল পুরুষ কণ্ঠে কেউ একজন বলল, "নিশীতা?"

গলার স্বরটি সে আগে শুনেছে কিন্তু কোথায় শুনেছে মনে করতে পারল না। নিশীতা ভুরু কুঁচকে বলল, "হ্যাঁ, কথা বলছি।"

"আপনি কি এক্ষুনি আসতে পারবেন?"

"আমি? কোথায় আসব?"

"আপনি বুঝতে পারছেন না?"

"না। বুঝতে পারছি না।"

"রিয়াজ হাসানের কথা মনে আছে?"

"আছে। অবশ্যই মনে আছে। কী হয়েছে তার?"

নিশীতার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে মানুষটি বলল, "আপনি কি তার বাসায় আসতে পারবেন?"

মানুষটির কথোপকথনে একটা বিচিত্র ব্যাপার রয়েছে কিন্তু সেটি কী নিশীতা ঠিক ধরতে পারল না। কিন্তু এই মুহূর্তে সেটা নিয়ে সে মাথা ঘামাল না, বলল, "আসছি। আমি এক্ষুনি আসছি।"

নিশীতার কথা শেষ হবার আগেই অন্য পাশের মানুষটি টেলিফোন রেখে দিল। নিশীতা কয়েক মুহূর্ত টেলিফোনটা হাতে নিয়ে বসে থাকে এবং খানিকটা বিভ্রান্তভাবেই টেলিফোনটা তার ব্যাগে রেখে দিয়ে মোটর সাইকেলের ইঞ্জিন স্টার্ট করল। কিছুক্ষণের মাঝেই দেখা গেল নিশীতার সুজুকি এক্সএল ২০০ গর্জন করে এয়ারপোর্ট রোড ধরে উত্তরার দিকে ছুটে যাচ্ছে।

রিয়াজ হাসানের বাসায় পৌঁছানোর আগেই নিশীতা বুঝতে পারল সেখানে কিছু একটা সমস্যা হয়েছে। তার নির্জন বাসার সামনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বেশ কিছু গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে বোঝা যায় না কিন্তু কেন জানি নিশীতার মনে হল গাড়িগুলোর মাঝে এক ধরনের অশুভ ইঙ্গিত লুকিয়ে রয়েছে।

নিশীতা রিয়াজ হাসানের বাসার সামনে মোটর সাইকেল থামিয়ে গাড়িগুলোর ভিতরে তাকাল। আবছা অন্ধকারে ভালো করে দেখা যায় না, কিন্তু মনে হল ভিতরে পুলিশ কিংবা মিলিটারি। নিশীতা তাদের না দেখার ভান করে গেটের দিকে এগিয়ে যেতেই প্রায় অন্ধকার থেকে একজন মানুষ গেটের সামনে এসে দাঁড়াল, মানুষটি পুলিশ কিংবা মিলিটারির পোশাক পরে নেই কিন্তু তার হাঁটা বা দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায় সে সশস্ত্র বাহিনীর লোক।

গেটে দাঁড়ানো মানুষটি নিশীতার পথ আটকে দাঁড়াল, নিশীতা মোটর সাইকেল থামিয়ে মাথা থেকে হেলমেট খুলে নিতেই মানুষটি একটু অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল, শার্ট-প্যান্ট এবং হেলমেট পরে থাকায় নিশীতাকে সে মেয়ে ভাবে নি।

নিশীতা মানুষটির দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি একটু সরুন আমি ভিতরে যাব।"

মানুষটি রুক্ষ গলায় বলল, "আপনি এখন ভিতরে যেতে পারবেন না।"

"কেন?"

মানুষটি একটু অবাক হয়ে নিশীতার দিকে তাকাল, তাকে যে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা যায় সে যেন সেটাই বুঝতে পারছে না। খানিকক্ষণ চেষ্টা করে আগের থেকেও রুক্ষ গলায় বলল, "কারণ অর্ডার আছে।"

"কার অর্ডার?"

"আমার কমান্ডারের।"

"আপনার কমান্ডারের অর্ডার আপনার জন্য—আমার জন্য নয়। আপনি সরে দাঁড়ান আমি ভিতরে ঢুকব।"

মানুষটি নিশীতার কথা শুনে এত অবাক হল যে, সে প্রথমে রেগে উঠতেই ভুলে গেল। খানিকক্ষণ হাঁ করে নিশীতার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সে রেগে উঠল, নিশীতার কথার জন্য যেটুকু তার চাইতে অনেক বেশি একজন মেয়ে হয়ে একজন পুরুষের সাথে এই ভাষায় কথা বলার জন্য। মানুষটি প্রায় চিৎকার করে বলল, "এখান থেকে যান। না হলে—"

"না হলে কী?"

"না হলে ঝামেলা হবে।"

"কী ঝামেলা?"

মানুষটি মুখ খিঁচিয়ে বলল, "আমি আপনার সাথে রং-তামাশা করার জন্য এখানে দাঁড়িয়ে নেই। এখান থেকে যান এটা আমার অর্ডার।" তারপর দাঁত চিবিয়ে নিচু স্বরে এক দুটি শব্দ বলল যেটা নিশ্চিতভাবেই মেয়েদের সম্পর্কে একটি কুৎসিত গালি।

নিশীতা শীতল চোখে মানুষটির দিকে তাকাল, হঠাৎ করে মনে হল তার মাথার ভিতরে একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেছে। সে নিশ্বাস আটকে রেখে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করতে থাকে। মানুষটি এবার তার দিকে প্রায় এক পা এগিয়ে এল, ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় তার গায়ে হাত দিয়ে ধাক্কা দেবে। নিশীতা খুব ধীরে ধীরে তার মাথায় হেলমেটটি পরে নেয়, তারপর স্টার্টারে কিক দিয়ে সেটাকে চালু করা মোটর সাইকেলটিকে ঘুরিয়ে নেয়। রিয়াজের বাসা থেকে এক শ গজ দূরে গিয়ে সে মোটর সাইকেলটি আবার ঘুরিয়ে রিয়াজের বাসার দিকে মুখ করে দাঁড়াল। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটি তখনো বুঝতে পারছে না নিশীতা কী করার পরিকল্পনা করছে।

নিশীতা ক্লাচে পা দিয়ে মোটর সাইকেলের এক্সেলেটারে চাপ দিয়ে ইঞ্জিনের গর্জনটা শুনে নিল। তার সুজুকি এক্সএল ২০০ এই এক শ গজে প্রায় আশি মাইল বেগ তুলতে

পারবে, তাকে নিয়ে মোটর সাইকেলের যে ভরবেগ হবে সেটা দিয়ে খুব সহজেই পলকা গেটটাকে কব্জা থেকে খুলে নিতে পারবে। রিয়াজের বাসার সামনে প্রচুর ফাঁকা জায়গা, একবার ভিতরে ঢোকার পর সে সহজেই মোটর সাইকেল থামিয়ে নিতে পারবে।

নিশীতা ক্লাচ ছেড়ে দিয়ে এক্সেলেটর ঘুরিয়ে তার সুজুকিকে গর্জন করিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে গেল। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটি কল্পনাও করতে পারে নি যে একজন মানুষ এ রকম একটা কাজ করতে পারে। শেষ মুহূর্তে লাফ দিয়ে সে ছুটন্ত মোটর সাইকেল থেকে নিজেকে রক্ষা করল, নিশীতার সুজুকি এক্সএল ২০০ প্রচণ্ডবেগে গেটে আঘাত করে, হালকা ছিটকিনি ছিটকে গিয়ে গেটটি হাট হয়ে খুলে গেল। প্রচণ্ড শব্দে পুরো এলাকা কেঁপে ওঠে এবং এর মাঝে নিশীতা তার মোটর সাইকেল নিয়ন্ত্রণ করে একেবারে বাসার দোরগোড়ায় এসে মোটর সাইকেলটিকে থামাল।

বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে, সেখানে বেশ কিছু মানুষ, গেট ভাঙার প্রচণ্ড শব্দ শুনে সবাই জানালা এবং দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। নিশীতা তার হেলমেট খুলে মোটর সাইকেলের ওপর রেখে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এল। তার বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ড ধকধক শব্দ করছে কিন্তু সে জোর করে মুখের ওপর কিছুই হয় নি এ রকম একটা ভাব ধরে রাখল। গেটের মানুষটা এবং আরো অনেকে তার পিছনে পিছনে ছুটে আসছে টের পেলেও সে পিছনে ফিরে তাকাল না।

বাইরের ঘরের মাঝামাঝি রিয়াজ বসে আছে, তাকে ঘিরে কয়েকজন সাদা পোশাকের পুলিশ কিংবা মিলিটারি। কয়েকজন বিদেশী মানুষ হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নিশীতা সবাইকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে রিয়াজ হাসানের দিকে তাকিয়ে বলল, "ড. হাসান, আমি খুব দুঃখিত আপনার গেট ভেঙে ঢুকতে হল। গেটে একজন ব্রেন-ডেড মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, আমাকে ঢুকতে দিচ্ছিল না!"

রিয়াজ হাসান খানিকক্ষণ অবাক হয়ে নিশীতার দিকে তাকিয়ে রইল, তার চেহারায় এক ধরনের বিপর্যস্ত ভাব, নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "আমি—আমি—মানে ঠিক বুঝতে পারছি না কী হচ্ছে।"

রিয়াজ হাসানকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোর মাঝে একজন এবারে নিশীতার দিকে এগিয়ে আসে, দেখে মনে হয় মানুষটি ইন্টেলিজেন্সের বড় কর্মকর্তা, মানুষটির মুখ কঠিন, চোখের দৃষ্টি ক্রুদ্ধ। মানুষটি শীতল গলায় বলল, "আপনি কে? এখানে কেন এসেছেন?"

নিশীতা মাথা ঝাঁকিয়ে তার চুলকে পিছনে সরিয়ে বলল, "আমি ডঃ রিয়াজ হাসানের বাসায় এসেছি, তিনি যদি চান তা হলে তিনি আমাকে এই প্রশ্নটি করতে পারেন—আপনি পারেন না।" নিশীতা তার মুখে একটা মধুর হাসি টেনে বলল, "কিন্তু আপনি যদি সত্যি জানতে চান আমি বলতে পারি। আমার নাম নিশীতা জানীন। আমি একজন সাংবাদিক।"

নিশীতা তার গলায় ঝুলিয়ে রাখা কার্ডটি বের করে মানুষটিকে দেখাল এবং প্রথমবার মানুষটিকে একটু হতচকিত হতে দেখা গেল। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজন মানুষ বলল, "আপনাকে আজ বিটিভিতে দেখেছি। প্রাইম মিনিস্টারের নিউজ কনফারেন্সে আপনি ছিলেন।"

তাকে টেলিভিশনে দেখিয়েছে তথ্যটি নিশীতা জানত না, আজকের পরিবেশে এই তথ্যটি খুব কাজে লাগবে ভেবে নিশীতা মনে মনে খুশি হয়ে উঠল। মুখের হাসি বিস্তৃত করে বলল, "হ্যাঁ ছিলাম। প্রাইম মিনিস্টার আমাকে খুব পছন্দ করেন।"

গেটে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটি এতক্ষণে ভিতরে হাজির হয়েছে, সাহস করে এবার বলার চেষ্টা করল, "স্যার এই মহিলা জোর করে—"

কঠিন চেহারার মানুষটি সম্পূর্ণ বিনা কারণে তাকে একটা প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলল, "শাট আপ, ইউ স্টুপিড। যাও এখান থেকে। গেট আউট।"

মানুষটি এবারে নিশীতার দিকে তাকিয়ে ইংরেজিতে বলল, "আপনাকে আমরা এখান থেকে চলে যেতে বলছি।"

"এটা ড. রিয়াজ হাসানের বাসা। তিনি আমাকে চলে যেতে বললে আমি অবশ্যই চলে যাব।" নিশীতা রিয়াজের দিকে তাকাতেই রিয়াজ মাথা নেড়ে বলল, "না—না—আপনাকে আমি যেতে বলছি না।"

"চমৎকার, তা হলে আমার এই মুহূর্তে চলে যাবার কোনো প্রয়োজন নেই।" নিশীতা মুখে মধুর হাসি ফুটিয়ে তার ব্যাগ থেকে ডিজিটাল ক্যামেরাটা বের করে আনে। "আমি কি আপনাদের একটা ছবি তুলতে পারি?"

একসাথে কয়েকজন প্রায় চিৎকার করে বলল, "না। খবরদার ছবি তুলবেন না।"

নিশীতা চোখে-মুখে একটা বিস্ময়ের ভঙ্গি ফুটিয়ে বলল, "মনে হচ্ছে খবরের কাগজের জন্য একটা খুব ভালো স্টোরি তৈরি হচ্ছে? আপনারা এখানে কেন এসেছেন জানতে পারি?"

মানুষগুলো পাথরের মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল। কঠিন চেহারার মানুষটি বলল, "আমরা একটি ইনভেস্টিগেশনে এসেছি। ব্যাপারটি গোপন। আমরা আপনাকে চলে যেতে বলছি।"

"আপনারা কারা?"

"সেটি আপনাকে বলতে আমরা বাধ্য নই।"

নিশীতা রিয়াজ হাসানের দিকে ঘুরে তাকাল, "আপনি কি জানেন এরা কারা?"

"না—মানে ঠিক পুরোপুরি জানি না। পুলিশ কিংবা আর্মি ইনটেলিজেন্সের লোক হতে পারে।"

"আপনার বাসায় ঢোকার জন্য সার্চ ওয়ারেন্ট এনেছে?"

"জানি না। আনলেও আমাকে দেখায় নি।"

"এই বিদেশীগুলোও কি আমাদের পুলিশ বা আর্মি ইনটেলিজেন্সের?"

"না।" রিয়াজ বলল, "একজন আমার পুরোনো সহকর্মী, ড. ফ্রেড লিস্টার।"

ড. ফ্রেড লিস্টার মানুষটি নিজের নাম উচ্চারিত হতে শুনে রিয়াজ হাসানের দিকে ঘুরে তাকাল। নিশীতা ভুরু কুঁচকে ড. ফ্রেড লিস্টারের দিকে তাকিয়ে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, "আপনাকে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি?"

ফ্রেড লিস্টার উত্তর দেবার আগেই কঠিন চেহারার মানুষটি রুক্ষ গলায় বলল, "দেখুন মিস নিশীতা, আপনাকে আমি শেষবার বলছি, এখান থেকে যান। তা না হলে আপনার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।"

নিশীতা তার ব্যাগ খুলে সেলুলার ফোনটা বের করে দ্রুত কয়েকবার বোতাম টিপে কোথায় জানি ফোন করল। কঠিন চেহারার মানুষটি প্রায় ধমক দিয়ে বলল, "আপনি কাকে ফোন করছেন?"

নিশীতা তাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে টেলিফোনে কথা বলতে শুরু করল, "হ্যালো, শ্যামল দা, আমি নিশীতা। কালকের পত্রিকার ফাইনাল পেস্টিং কি হয়ে গেছে?"

অন্যপাশের কথা শুনে নিশীতা মাথা নেড়ে বলল, "আপনি আটকে রাখেন। প্রথম পৃষ্ঠায় নতুন লিড নিউজ যাবে, আপনাকে আমি ফোন করব। ভেরি ভেরি ইম্পরট্যান্ট। মোজাম্মেল ভাইকে জানিয়ে রাখেন। আর শোনেন, হোম ডিপার্টমেন্টে আপনার পরিচিত মানুষ আছে?"

অন্যপাশের কথা শুনে তার মুখে হাসি ফুটে উঠল, বলল "চমৎকার। আমাদের সাহায্যের দরকার হতে পারে।"

অন্যপাশ থেকে কিছু একটা বলল, শুনে নিশীতা শব্দ করে হেসে বলল, "না—না— শ্যামল দা, আপনি ভয় পাবেন না। গতবারের মতো হবে না। আমি কোনো বিপদে পড়ব না।"

টেলিফোনটা বন্ধ করে নিশীতা মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে মধুরভাবে হেসে বলল, "আমি আশা করছি আপনারা যেটা করছেন সেটা পুরোপুরি আইনসম্মত! না হলে অবশ্য আমার ক্যারিয়ারের জন্য ভালো, একটা হট স্টোরি দেওয়ার ক্রেডিট পেতে পারি!"

মানুষগুলো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নিজেদের মাঝে কথা বলল, তারপর একজন এগিয়ে এসে রিয়াজ হাসানকে বলল, "আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন ব্যাপারটি শুধু ন্যাশনাল নয়, ইন্টারন্যাশনালি গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি সহযোগিতা না করেন সহযোগিতা আদায় কেমন করে করতে হয় আমরা জানি।"

রিয়াজ হাসান কোনো কথা না বলে স্থির দৃষ্টিতে মানুষটির দিকে তাকিয়ে রইল। মানুষগুলো এবারে বের হয়ে যাবার জন্য দরজার দিকে হাঁটতে থাকে। ফ্রেড লিস্টার রিয়াজ হাসানের কাছে এগিয়ে এসে নিচু গলায় ইংরেজিতে বলল, "রিয়াজ, আমরা যে টিম এসেছি তার সাথে স্টেট ডিপার্টমেন্টের বব ম্যাকেঞ্জি বলে একজন লোক এসেছে। বব ম্যাকেঞ্জি কে জান?"

"কে?"

"আশির দশকে পাকিস্তানে ছিল। আফগানিস্তানে সোভিয়েত ব্লককে থামানোর জন্য সে পুরো পাকিস্তানকে কিনে নিয়েছিল। বব আমাকে বলেছে মোটামুটি সস্তাতেই কিনেছিল।"

রিয়াজ শীতল চোখে ফ্রেড লিস্টারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আমাকে এসব কথা বলছ কেন?"

"কারণ বব এবারেও ডিপ্লোমেটিক ব্যাগ হিসেবে দুটি বড় বড় সুটকেস এনেছে। সুটকেস বোঝাই ডলার দিয়ে। সব নতুন এক শ ডলারের নোট। যাদের যাদের কিনতে হয় আমরা কিনে নেব। দেখতেই পাচ্ছ কিনতে শুরু করেছি!"

রিয়াজ দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, "আমি যখন আমেরিকাতে তোমার সাথে কাজ করতাম তখনো তোমাকে ঘেন্না করতাম। এখনো ঘেন্না করি।"

ফ্রেড লিস্টার হা হা করে হেসে বলল, "আমার বিরোধিতা করে তোমার কী অবস্থা হয়েছে তো দেখেছ! আগের অবস্থার পুনরাবৃত্তি কোরো না রিয়াজ। বব ম্যাকেঞ্জি এর মাঝেই খুব উঁচু জায়গায় আমার জন্য খুবই ভালো ভালো বন্ধু যোগাড় করেছে।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ।" ফ্রেড লিস্টার নিশীতাকে দেখিয়ে বলল, "তোমার এই গার্লফ্রেন্ডকে ছারপোকার মতো পিষে মারবে। আমার একটা উপদেশ মনে রেখো—বন্ধু ভেবেচিন্তে ঠিক করতে হয়। কোনো কোনো বন্ধু বিপদ থেকে রক্ষা করে আবার কোনো কোনো বন্ধু কিন্তু বিপদ ডেকে আনে।"

"তোমার মূল্যবান উপদেশের জন্য অনেক ধন্যবাদ ফ্রেড।"

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কঠিন চেহারার মানুষটি ফ্রেড লিস্টারকে ডাকল, "চলে এস ফ্রেড।"

ফ্রেড খানিকটা কৌতুকের ভঙ্গিতে রিয়াজের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সবাই বের হয়ে যাবার পর রিয়াজ হাসান নিশীতার দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করল, বলল, "তুমি না এলে খুব বড় বিপদে পড়ে যেতাম। থ্যাংকস নিশীতা।"

রিয়াজ হাসান নিশীতাকে আপনি করে বলত, ঘটনার উত্তেজনায় এখন তুমি করে বলছে! নিশীতা সেটা নিয়ে মাথা ঘামাল না, বলল, "ইউ আর ওয়েলকাম।" তারপর বুক থেকে আটকে থাকা একটা নিশ্বাস বের করে দিয়ে বলল, "এখানে কী হচ্ছে আমি কিছু বুঝতে পারছি না।"

"আমিও বুঝতে পারছি না। তবে বোঝা যাচ্ছে মহাকাশ থেকে কিছু একটা আসা নিয়ে তুমি যে সন্দেহ করছিলে সেটা সত্যি।"

নিশীতা চমকে উঠে রিয়াজের দিকে তাকাল, "সত্যি?"

"হ্যাঁ। দেখতেই পাচ্ছ আমেরিকা থেকে পুরো দল চলে এসেছে। পালের গোদা হচ্ছে ফ্রেড লিস্টার। আমরা ওকে ডাকতাম ফ্রেড ব্লিস্টার। ব্লিস্টার মানে ফোসকা। বিষফোড়া—ভয়ানক বদমাইশ।"

"কেন? কী হয়েছে?"

"মহাজাগতিক প্রাণীর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করার সময় কিছু নিয়মকানুন মানতে হয়। পৃথিবীর নিরাপত্তার ব্যাপারটি দেখতে হয়। কিন্তু ফ্রেড লিস্টার এই বিষফোড়া সেসব করত না। একবার করেছে কী—"

রিয়াজ হঠাৎ কথা থামিয়ে বলল, "ওসব ছেড়ে দাও। নতুন যন্ত্রণা নিয়ে বাঁচি না, পুরোনো যন্ত্রণার কথা বলতে ভালো লাগে না।"

নিশীতা জিজ্ঞেস করল, "নতুন যন্ত্রণাটি কী?"

"মহাজাগতিক প্রাণীর সাথে যোগাযোগ করার জন্য আমি যে এলগরিদম তৈরি করেছিলাম এই ব্যাটা সেটা চায়।"

"কিন্তু আমি তো দেখেছি আপনি সেটি পাবলিশ করেছেন। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের জার্নালে সেটা প্রকাশ হয়েছে।"

"সেটা ছিল প্রাথমিক ভার্সান। পুরো কাজটুকু শেষ করার পর সেটা কোথাও প্রকাশ হয় নি।"

"সেটা কী ধরনের কাজ?"

রিয়াজ হাসান জিনিসটা কীভাবে বোঝাবে সেটা নিয়ে দুই এক মুহূর্ত চিন্তা করে বলল, "আমরা যেহেতু মানুষ তাই যখন যোগাযোগের কথা বলি সবসময় একজন মানুষ অন্য মানুষের সাথে কীভাবে যোগাযোগ করবে সেইভাবে চিন্তা করি। কিন্তু যদি একটা মহাজাগতিক প্রাণীর সাথে যোগাযোগ করতে হয় তা হলে মানুষের মতো চিন্তা করলে হবে না। যে কোনো বুদ্ধিমত্তার কাছে গ্রহণযোগ্য একটা উপায়ে যোগাযোগ করতে হবে। আমার এলগরিদমটা তাই—মানুষের থেকে অনেকগুণ বেশি বুদ্ধিমত্তার সাথে যোগাযোগ করার একটা উপায়।"

"ও! ফ্রেড লিস্টার সেটা চাইছে?"

"হ্যাঁ। আমি ফ্রেড লিস্টারকে চিনি, তাই তাকে দিতে রাজি হই নি।"

"তার মানে আমার সন্দেহ সত্যি। আসলেই এখানে কোনো মহাজাগতিক প্রাণী এসে নেমেছে?"

AMARBOI.COM

"আমার তাই ধারণা।"

নিশীতা তখনো পুরো ব্যাপারটি পুরোপুরি আত্মস্থ করতে পারে নি। নিজেকে সামলে নিয়ে কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, রিয়াজ হাসান তাকে বাধা দিয়ে বলল, "কী বিচিত্র ব্যাপার তুমি একেবারে—"

"আমি একেবারে?"

রিয়াজ হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "ছিঃ ছিঃ, কী লজ্জা আপনি এত বড় একজন সাংবাদিক অথচ আপনাকে এতক্ষণ থেকে তুমি করে বলছি!"

নিশীতা মাথা নাড়ল, বলল, "সেটা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। কী বলছিলেন বলেন।"

"আমি বলছিলাম কী, আপনি মানে তুমি ঠিক সময়ে হাজির হয়েছ, তুমি যদি ঠিক এই সময়ে না আসতে—"

"আসব না কেন, খবর পাওয়ার পর আমি দেরি করি নি।"

"খবর?" রিয়াজ অবাক হয়ে বলল, "কিসের খবর?"

"ঐ যে টেলিফোনে খবর পাঠালেন—"

"খবর পাঠিয়েছি? আমি?"

"তা হলে কে? আমাকে টেলিফোনে আসতে বলল—"

"কে বলেছে?"

নিশীতা ভুরু কুঁচকে রিয়াজের দিকে তাকাল, "আপনি কাউকে দিয়ে খবর পাঠান নি?"

"না।"

"আশ্চর্য! আমার মনে হল মানুষটাকে আমি চিনি, গলার স্বর আগে কোথাও শুনেছি।" নিশীতা হঠাৎ চমকে উঠে বলল, "এপসিলন!"

"কী হয়েছে এপসিলনের?"

"এপসিলন আমাকে ফোন করেছিল! এখন মনে পড়েছে—সেটা ছিল এপসিলনের গলার স্বর। প্রশ্ন করে কথা বলছিল।"

রিয়াজ খানিকক্ষণ অবাক হয়ে নিশীতার দিকে তাকিয়ে রইল—তার দৃষ্টি দেখে মনে হল নিশীতার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গেছে। নিশীতা একটু অপ্রস্তুত হয়ে রিয়াজের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী হল? আপনি এভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন কেন?"

রিয়াজ হাসি গোপন করার চেষ্টা করতে করতে বলল, "তোমার কল্পনাশক্তি দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি।"

"আপনি আমার কথা বিশ্বাস করলেন না? এপসিলনকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।"

"দেখ নিশীতা, তার কোনো প্রয়োজন নেই। এপসিলনের পুরো কোডটা আমি লিখেছি। এটা একটা ছেলেমানুষি প্রোগ্রাম। তোমাকে টেলিফোন করার ক্ষমতা এর নেই।"

"কিন্তু এপসিলন আমার টেলিফোন নম্বরটি জানত কি না?"

রিয়াজ মাথা নেড়ে বলল, "তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন এপসিলন একটি সত্যিকার মানুষ, তার বুদ্ধিমত্তা আছে।"

নিশীতা অধৈর্য হয়ে বলল, "আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দেন নি—এপসিলন কি আমার টেলিফোন নম্বর জানে?"

"আমি তোমার টেলিফোন নম্বরটি ওর ডাটাবেসে রেখেছিলাম—প্রয়োজনীয় নাম ঠিকানা রেখে দিই। তার অর্থ এই নয় যে, সে সেটি জানে।"

AMARBOI.COM

নিশীতা চোখ বড় বড় করে বলল, "আমার সেলফোনে টেলিফোন করার মতো হার্ডওয়্যারের সাথে এপসিলনকে লাগিয়ে রেখেছেন কি না?"

রিয়াজকে হঠাৎ কেমন যেন হতচকিত দেখাল, খানিকক্ষণ অবাক হয়ে নিশীতার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "মজার ব্যাপার জান—সেদিন তুমি চলে যাবার পর আমি সত্যি সত্যি একটা এ্যান্টেনার সাথে ট্রান্সমিটারটা জুড়ে দিয়েছিলাম। মহাজাগতিক প্রাণীর সাথে যোগাযোগ করার জন্য আমার এলগরিদম ব্যবহার করে একটা সিগনাল পাঠাচ্ছিল—খুব দুর্বল সিগনাল, ঢাকা শহরের ভিতরে যেতে পারে। সেই সিগনালটি ব্যবহার করে তোমার সেলফোনে যোগাযোগ করা সম্ভব—"

নিশীতা উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল, "দেখেছেন?"

রিয়াজ হাত নেড়ে বলল, "দেখেছি, কিন্তু আগেই এত উত্তেজিত হয়ো না। আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে হার্ডওয়্যার ব্যবহার করে কিছু একটা করার সম্ভব-অসম্ভবের কথা। সত্যি সত্যি সেটা করার মতো বুদ্ধিমত্তা এপসিলনের নেই, আমার কোনো কম্পিউটারেরও নেই।"

"কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন সেটা ঘটেছে।"

"সেটা ঘটে নি।" রিয়াজ একটু অধৈর্য হয়ে বলল, "তুমি যেটা বলছ সেটা অসম্ভব। অনেকটা যেন আমি একটা কাগজের প্লেন ছুড়েছি—সেটা তিন শ প্যাসেঞ্জার নিয়ে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে নিউইয়র্কে ল্যান্ড করে গেছে।"

নিশীতা হাত দিয়ে তার চুলকে পিছনে সরিয়ে বলল, "আপনি এপসিলনকে জিজ্ঞেস করে দেখেন।"

রিয়াজ হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গি করে বলল, "তোমার যদি জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে করে তুমি করে দেখো—আমি করছি না। এপসিলনকে প্রশ্ন করা আর আমার মাইক্রোওয়েভ ওভেনকে জিজ্ঞেস করা একই কথা!"

নিশীতা মাথা ঘুরিয়ে চারদিকে একবার তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কোথায়? এপসিলন কোথায়?"

রিয়াজ হাত দিয়ে দেখিয়ে বলল, "ঐ যে ওদিকে।"

নিশীতা এগিয়ে যেতে শুরু করতেই রিয়াজ বলল, "নিশীতা তুমি ছেলেমানুষি কাজটা শুরু করার আগে তোমার পত্রিকা অফিসে ফোন করে বল। তারা তোমার লিড নিউজের জন্য বসে আছে।"

নিশীতা হেসে বলল, "না, বসে নেই।"

"কেন বসে নেই? তুমি যে ফাইনাল পেস্টিং বন্ধ করে রাখতে বললে?"

নিশীতা খিলখিল করে হেসে বলল, "কেমন করে বলব, আমার টেলিফোনের ব্যাটারি শেষ হয়ে গেছে! আমি ওদের সাথে কথা বলি নি, কথা বলার ভান করছিলাম।"

রিয়াজ হাসান চোখ কপালে তুলে বলল, "কী বললে? ভান করছিলে? আসলে কারো সাথে কথা বল নি?"

"না। আমাদের সাংবাদিকদের এ রকম আরো অনেক ট্রিকস আছে, সময় হলেই দেখবেন!"

রিয়াজ হাসান খানিকক্ষণ নিশীতার দিকে তাকিয়ে শব্দ করে হাসতে শুরু করল—নিশীতা ততক্ষণে মনিটরটির সামনে পৌঁছে গেছে, এপসিলনের চেহারা ফুটে উঠেছে, সেটি ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "কে, কে হাসে?"

"তুমি জান না কে হাসছে?"

AMARBOI.COM

এপসিলন খানিকক্ষণ নিশীতার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, "জানি।"

রিয়াজ হাসান হঠাৎ হাসি থামিয়ে অবাক হয়ে নিশীতার দিকে তাকাল। নিশীতা বলল, "কী হয়েছে?"

রিয়াজ নিশীতার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে প্রায় ছুটে এসে মনিটরটির সামনে দাঁড়াল, বিস্ফারিত চোখে এপসিলনের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি কী বললে এপসিলন?"

এপসিলন কোনো কথা না বলে চোখ ঘুরিয়ে রিয়াজের দিকে তাকাল। নিশীতা একটু অবাক হয়ে বলল, "কী হয়েছে ড. হাসান?"

রিয়াজ হতচকিতের মতো নিশীতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এটি এপসিলন নয়।"

"কেন?"

"কারণ এপসিলন সব সময় প্রশ্নের উত্তর দেয় প্রশ্ন দিয়ে। এটি দেয় নি।"

"তা হলে এটি কে?"

রিয়াজ ঘুরে এপসিলনের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি জানি না।"

৫

হান্নান গালে বসে থাকা একটা মশাকে থাবা দিয়ে মেরে চটকে ফেলল, জায়গাটা অন্ধকার বলে দেখতে পেল না মশাটা তার রক্ত খেয়ে পুরুষ্টু হয়েছিল, গালে সেই রক্তের দাগ লেগেছে। হান্নানের শরীরে অনুভূতি সেরকম তীক্ষ্ণ নয়, মশা কামড়ালে প্রায় সময়েই টের পায় না; গালের চামড়া নরম বলে মাঝে মাঝে বুঝতে পারে। হান্নান একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে আছে গত আধঘণ্টা থেকে, আরো কতক্ষণ বসে থাকতে হবে জানে না। তাকে সাড়ে তিন হাজার টাকার চুক্তিতে ঠিক করা হয়েছে রমিজ মাস্টারকে খুন করার জন্য। রমিজ মাস্টার রাত্রিবেলা বাজারে চায়ের দোকানে চা খেতে যায়, সেখানে একটা ছোট টেলিভিশন আছে, টেলিভিশনে বাংলা খবর শুনে বাড়িতে ফিরে আসে। মোটামুটি রুটিনমাফিক—কাজেই হান্নানের সুবিধে হল। একজন মানুষকে নিরিবিলি পাওয়াটাই কঠিন, খুন করাটা পানির মতো সোজা। আজকাল হান্নানের একটা গুলিতেই কাজ হয়ে যায়। সে অবশ্য তবু আরো দুইটা গুলি খরচ করে। গুলির দাম আছে বাজে খরচ করা ঠিক না। রিভলবারটা অবশ্য তার নিজের, অনেক কষ্ট করে যোগাড় করেছে। হান্নান এক ধরনের স্নেহ নিয়ে কোমরে গুঁজে রাখা রিভলবারটার গায়ে হাত বুলিয়ে দেখল, চাইনিজ রিভলবার খুব বিশ্বস্ত জিনিস, তার রুজি-রোজগারের এক নম্বর অবলম্বন। এই লাইনে কাজ অনেক বেড়েছে কিন্তু উপার্জন সেরকম বাড়ে নি। আগে হলে এই রকম একটা খুন করার জন্য সে চোখ বুজে দশ হাজার টাকা চাইতে পারত, এখন পুঁচকে পুঁচকে মস্তানে দেশ ভরে গেছে। দুই শ টাকাতেই কাজ সেরে ফেলতে চায়—অভিজ্ঞতা নাই, লোভ বেশি। তবে নূতন মস্তানরা কাজকর্ম গুছিয়ে করতে পারে না বলে লোকজন এখনো তার কাছে আসে। আগে বেশিরভাগ কেস ছিল জমি নিয়ে শত্রুতা, আজকাল সেটা হয়েছে রাজনীতি। রমিজ মাস্টারও রাজনীতির কেস—মনে হয় ইউনিয়ন ইলেকশনের ব্যাপার, হান্নান অবশ্য মাথা ঘামায় না, তার টাকা পেলেই হল!

হান্নান পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে এদিক-সেদিক তাকিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। হাত দিয়ে সিগারেটের আগুন ঢেকে সে একটা লম্বা টান দিল, সাড়ে আটটা

বেজে গিয়েছে, রমিজ মাস্টার দশ-পনের মিনিটের মাঝেই এসে যাবে। হান্নান নিজের ভিতরে কোনো উত্তেজনা অনুভব করে না। মানুষ তো আর সারা জীবন বেঁচে থাকে না, আগে হোক পরে হোক মারা যাবেই। গাড়ি অ্যাকসিডেন্টে মারা যায়, রোগশোকে মারা যায়—না হয় তার হাতেই মারা গেল। হান্নান আজকাল আর ঠিক করে হিসাব রাখে না—তার হাতে কত জন মারা গেল। হিসাব রেখে কী হবে?

গলায় বসে থাকা পুরুষ্ট আরো একটা মশাকে থাবা দিয়ে চটকে দিতেই হান্নানের মনে হল সে কারো পায়ের শব্দ শুনতে পেল। হান্নান সিগারেটটা হাতে আড়াল করে রেখে উঠে দাঁড়াল, ডান হাতে কোমরে গুঁজে রাখা রিভলবারটা বের করে নেয়। রমিজ মাস্টার কি না সেই ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়াটাই সবচেয়ে জরুরি, ভুলে অন্য কাউকে খুন করে ফেলা মানে অহেতুক কয়টা গুলি খরচ। আজকাল গুলির অনেক দাম।

একজন মানুষ লম্বা পা ফেলে হেঁটে আসছে, হান্নান রমিজ মাস্টারকে কয়েকদিন থেকে লক্ষ করে আসছে, সে প্রায় নিঃসন্দেহ হয়ে গেল যে এটাই রমিজ মাস্টার। কাছাকাছি এলে একবার জিজ্ঞেস করে নেওয়া যাবে। হান্নান সিগারেটটা ফেলে দিল। গুলি করার সময় রিভলবারটা দুই হাতে ধরলে নিশানা ভালো হয়।

রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে থাকা হান্নানকে দেখে রমিজ মাস্টার যেরকম অবাক হবে ভেবেছিল সে কিন্তু সেরকম অবাক হল না। বেশ সহজ গলাতে বলল, "কে? মাকসুদ আলী নাকি?"

"না। আমার নাম হান্নান।"

"ও।"

"আপনি কি রমিজ মাস্টার?"

"জি। আমি রমিজ মাস্টার। কেন?"

AMARBOI.COM

হান্নান তখন দুই হাতে রিভলবারটা ধরে উঁচু করল। এ রকম সময় মানুষ ভয় পেয়ে দৌড় দেয়, তখন নিশানা ঠিক করে গুলি করতে হয়। যারা এই লাইনে নতুন তারা শরীরে গুলি করে, শরীর বড় তাই গুলি করা সোজা। কিন্তু শরীরে গুলি করলে মৃত্যুর কোনো গ্যারান্টি নেই, মাথায় গুলি লাগাতে পারলে এক শ ভাগ গ্যারান্টি। মানুষের শরীরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হচ্ছে মাথা।

রমিজ মাস্টার কিন্তু দৌড় দিল না, অবাক হয়ে হান্নানের দিকে তাকাল। হান্নান ট্রিগার টানতে গিয়ে থেমে গেল কারণ রমিজ মাস্টার আসলে হান্নানের দিকে তাকায় নি, হান্নানের পিছন দিকে তাকিয়েছে। সেখানে কিছু একটা দেখে সে খুব অবাক হয়েছে। হান্নান খসখস করে কিছু একটা শব্দ শুনল, শব্দটা ভালো না। এই প্রথমবার তার বুকের মাঝে ধক্ করে উঠল—এতদিন ধরে সে এই লাইনে কাজ করে আসছে কখনো এ রকম কিছু হয় নাই। রিভলবারটা দুই হাতে ধরে রেখে সে পিছনে ফিরে তাকাল এবং হঠাৎ করে তার সমস্ত শরীর পাথরের মতো জমে গেল।

তার থেকে চার-পাঁচ হাত দূরে বিচিত্র একটা মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে, মূর্তিটি মানুষের না দানবের বোঝা যায় না। মূর্তিটির হাত পা মাথা নাক চোখ মুখ সবকিছুই আছে, কাজেই নিশ্চয়ই মানুষই হবে, কিন্তু দেখে মানুষ মনে হয় না। শরীরটি ধাতব, চোখ দুটি থেকে লাল আলো বের হচ্ছে। মাথাটুকু কেমন যেন ফুলে গিয়েছে, তার ভিতর থেকে কিলবিলে এক ধরনের অনেকগুলো শুঁড় বের হয়ে এসেছে; সেগুলো আস্তে আস্তে নড়ছে। একটা হাত

কাটা, সেখান থেকে এক ধরনের যন্ত্রপাতি বের হয়ে এসেছে। হান্নান আতঙ্কে চিৎকার করে বলল, "কে? কে এটা?"

সেই বিচিত্র মূর্তি কোনো শব্দ করল না, হান্নানের দিকে এক পা এগিয়ে এল। হান্নান তখন লক্ষ করল মূর্তিটির শরীরের ভিতরে কিছু একটা নড়ছে এবং গলার কাছাকাছি এসে হঠাৎ করে চামড়া ফুটো করে জীবন্ত কিছু বের হয়ে এল। প্রাণীটি একটা সরীসৃপের আকারের, কিন্তু পৃথিবীর কোনো পরিচিত প্রাণীর সাথে তার মিল নেই।

রাতজাগা পাখির মতো কর্কশ শব্দ করে সেই জীবন্ত প্রাণীটি ক্ষিপ্র পশুর মতো হান্নানের ওপর লাফিয়ে পড়ল। হান্নান তার রিভলবার দিয়ে প্রাণীটাকে গুলি করে, বুলেটের আঘাতে সেটি থমকে দাঁড়ায় কিন্তু থেমে যায় না। প্রাণীটি হান্নানের বুকের ওপর চেপে বসে এবং কিছু বোঝার আগেই তার শরীর ফুটো করে ভিতরে ঢুকে যেতে শুরু করে। প্রচণ্ড আতঙ্কে হান্নান চিৎকার করতে থাকে কিন্তু কেউ তার চিৎকার শুনে এগিয়ে আসে না।

রমিজ মাস্টার হঠাৎ করে সংবিৎ ফিরে পেল। সে ভয় পেয়ে পিছনে দুই পা সরে আসে তারপর উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকে। হান্নানের চিৎকার ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে থাকে, কিন্তু রমিজ মাস্টার তবুও থামার সাহস পায় না।

ক্যাপ্টেন মারুফ জিপ থেকে নেমে তার সাথে আসা মিলিটারি জওয়ানদের রাস্তাটি ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকতে বলল। একটু আগে তার কাছে নির্দেশ এসেছে এই এলাকাটা ঘিরে ফেলতে। এখানে একটা খুব খারাপ ভাইরাসের আউটব্রেক হয়েছে, সব মানুষকে সরিয়ে নিতে হবে। তার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, যতক্ষণ পুরোপুরি কাজ শুরু করা না হয় তাকে এই এলাকাটি চোখে চোখে রাখতে বলা হয়েছে। ভাইরাসটি এবোলা ভাইরাসের মতো, তবে সংক্রমণ শুরু হয় মস্তিষ্ক থেকে। যাদের সংক্রমণ হয় তারা এক ধরনের আতঙ্কে অস্থির হয়ে যায়, ভূত দানব দেখেছে বলে দাবি করতে থাকে। ক্যাপ্টেন মারুফকে বিশেষ করে বলে দেওয়া হয়েছে সেরকম মানুষ দেখলে তাকে যেন আলাদা করে আটকে রাখা হয়।

AMARBOI.COM

ক্যাপ্টেন মারুফ তার নির্দেশমতো রাতের অন্ধকারে রাস্তাটি ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু সে কিছু হিসাব মিলাতে পারছে না। সে বইপত্র পড়ে, এবোলা ভাইরাস নিয়েও পড়াশোনা করেছে—এই ভাইরাসের সংক্রমণ হলে মানুষের মস্তিষ্ক থেকে সংক্রমণ হয় না। পুরো শরীরে রক্তক্ষরণ হয়ে মারা যায়। এবোলা ভাইরাস আফ্রিকায় শুরু হয়েছে, বাংলাদেশে নয়। তা ছাড়া ভাইরাসের সংক্রমণ হলে খবরের কাগজে তার খবর ছাপা হত, এখানকার হাসপাতালে রোগী যেত, ডাক্তারেরা বলত কিন্তু সেরকম কিছু হয় নি। সামরিক বাহিনী হিসেবে তারা আলাদা থাকে কিন্তু এখন হঠাৎ মনে হচ্ছে কিছু বিদেশী এই পুরো ব্যাপারটি নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আমেরিকার বড় বড় কিছু হারকিউলেস পরিবহন বিমান এসেছে, ভিতর থেকে বিদঘুটে হেলিকপ্টার নামানো হচ্ছে। বিচিত্র যন্ত্রপাতি নিয়ে আসা হচ্ছে। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের জন্য আমেরিকার মানুষের এত দরদ কেন? আগে তো কখনো হয় নি।

ক্যাপ্টেন মারুফ অন্যমনস্কভাবে হেঁটে একটু সামনে এগিয়ে যায়, ঠিক তখন দেখতে পায় একজন মানুষ পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে আসছে। দুই জন জওয়ান মানুষটিকে থামানোর জন্য এগিয়ে যাচ্ছিল, ক্যাপ্টেন মারুফ হাত তুলে তাদের থামাল।

রমিজ মাস্টার ছুটতে ছুটতে ক্যাপ্টেন মারুফের কাছে এসে কিছু একটা বলার চেষ্টা করে

কিন্তু সে এত ভয় পেয়েছে এবং ছুটে এসে এমনভাবে হাঁপিয়ে উঠেছে যে তার মুখ থেকে কোনো শব্দ বের হয় না। ক্যাপ্টেন মারুফ ভুরু কুঁচকে বলল, "কী হয়েছে আপনার?"

রমিজ মাস্টার একটা বড় নিশ্বাস নিয়ে বলল, "স্যার, ঐখানে একটা দানব। একটা রাক্ষস।"

"রাক্ষস?"

"জি স্যার। শরীরের ভিতর থেকে একটা জন্তু বের হয়ে এসে একজন মানুষের শরীরে ঢুকে গেছে। মানুষটাকে মেরে ফেলছে স্যার—আপনারা তাড়াতাড়ি যান।"

"মেরে ফেলছে?"

"জি স্যার। আপনি চিন্তা করতে পারবেন না কী ভয়ানক।" রমিজ মাস্টার প্রচণ্ড আতঙ্কে থরথর করে কাঁপতে থাকে। ক্যাপ্টেন মারুফ রমিজ মাস্টারের দিকে খানিকটা বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে, তাকে উপর থেকে বলা হয়েছে ভাইরাসটি মস্তিষ্ককে আক্রান্ত করে, যারা আক্রান্ত হয় তারা অমানুষিক ভয় পেয়ে বিচিত্র কথা বলতে শুরু করে, এই মানুষটির ঠিক তাই হচ্ছে, নিশ্চয়ই সেই বিচিত্র ভাইরাসের কারণে। ক্যাপ্টেন মারুফ মানুষটির দিকে তাকিয়ে তবু পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারে না, তার কেন জানি মনে হতে থাকে মানুষের এই ভয়টি মস্তিষ্কের রোগ নয়। মনে হয় এটি সত্যি।

রমিজ মাস্টার ক্যাপ্টেন মারুফের দিকে তাকিয়ে বলল, "স্যার আপনারা যাবেন না? দেখতে যাবেন না? লোকটাকে বাঁচাতে যাবেন না?"

ক্যাপ্টেন মারুফ প্রশ্নটি এড়িয়ে গিয়ে বলল, "ব্যাপারটা আগে আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে। আপনি এখন আমাদের ঐ ভ্যানটার পিছনে গিয়ে বসেন।"

"জি না। আমি বসব না। আমার বাড়ি যেতে হবে।"

"আপনি এখন বাড়ি যেতে পারবেন না।"

রমিজ মাস্টার অবাক হয়ে বলল, "কেন?"

"এই পুরো এলাকার সব মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে।"

"কেন?"

"একটা খুব খারাপ অসুখ ছড়িয়ে পড়ছে। একটা খারাপ ভাইরাস।"

"অসুখ?" রমিজ মাস্টার মাথা নাড়ল, বলল, "জি না স্যার। আমি এই এলাকার সব খবর জানি। এইখানে কোনো অসুখ নাই। কয়দিন থেকে আজব সব ব্যাপার হচ্ছে, কিন্তু কোনো অসুখ নাই।"

ক্যাপ্টেন মারুফ ভুরু কুঁচকে বলল, "আজব ব্যাপার?"

"জি। আজব ব্যাপার। একদিন এলাকার সব জন্তু-জানোয়ার খেপে গেল। একদিন কয়েকটা গাছের সব পাতা ঝরে গেল। এলাকার কিছু মানুষজন একেবারে নিখোঁজ হয়ে গেল। বিলের কাছে কী যেন হয় কেউ বুঝতে পারে না। রাত্রিবেলা চিকন একরকম শব্দ শোনা যায়। মানুষজন ভয় পায়—আজকে আমি দেখলাম ভয় পাওয়ার কারণটা কী।"

ক্যাপ্টেন মারুফ মানুষটির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল, এবারে তার কথাবার্তাকে সত্যিই অসংলগ্ন মনে হচ্ছে। সে মোটামুটি শীতল গলায় বলল, "আপনি ভ্যানটার পিছনে বসুন। এখন আপনি কোথাও যেতে পারবেন না।"

"কেন যেতে পারব না?"

"আপনাকে ভাইরাসে ধরেছে কি না আমাদের দেখতে হবে।"

রমিজ মাস্টার ক্রুদ্ধ চোখে ক্যাপ্টেন মারুফের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "আমি বসব না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাপ্টেন মারুফ কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা দুই জন জওয়ানকে ইঙ্গিত করতেই তারা রমিজ মাস্টারকে ধরে জোর করে টেনে নিয়ে গেল। রমিজ মাস্টার চিৎকার করে বলল, "আমি একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ করেছি, পাকিস্তান মিলিটারি পর্যন্ত আমার গায়ে হাত দিতে সাহস পায় নাই, আর আপনাদের এতবড় সাহস—"

ক্যাপ্টেন মারুফ রমিজ মাস্টারের কথা শুনে কেমন জানি লজ্জিত বোধ করল—সত্যিই তো তার কী অধিকার আছে একজন মানুষকে এভাবে হেনস্থা করার? সে লম্বা পায়ে এগিয়ে গেল, কাছাকাছি একটা সেন্ট্রাল কমান্ড বসানো হয়েছে, সেখানে যোগাযোগ করে উপরের লোকজনের সাথে একটু কথা বলা যেতে পারে।

ওয়াকিটকি দিয়ে ক্যাপ্টেন মারুফ যোগাযোগ করল, কমান্ডিং অফিসার রমিজ মাস্টারের কথা শুনেই শিস দেওয়ার মতো একটা শব্দ করে বলল, "মানুষটাকে আটকে রাখ, আমরা আসছি।"

ক্যাপ্টেন মারুফ একটু ইতস্তত করে বলল, "স্যার, ইনি থাকতে চাইছেন না।"

"জোর করে আটকে রাখ। এটা খুব জরুরি।"

সত্যি সত্যি কিছুক্ষণের মাঝে একটা জিপের হেডলাইট দেখা গেল এবং জিপ থামার আগেই সেখান থেকে কমান্ডিং অফিসার লাফিয়ে নেমে এলেন। পিছন থেকে একজন বিদেশী মানুষ নেমে এল, ক্যাপ্টেন মারুফ মানুষটিকে আগে দেখে নি, সে ফ্রেড লিস্টার।

ক্যাপ্টেন মারুফের পিছু পিছু ফ্রেড লিস্টার এবং কমান্ডিং অফিসার ভ্যানের পিছনে রমিজ মাস্টারের কাছে হাজির হল। রমিজ মাস্টার চুপচাপ বসে আছে, তার মুখে এক ধরনের হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গি। কমান্ডিং অফিসারকে দেখে কিছু একটা বলতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত থেমে গেল—হঠাৎ করে বুঝতে পারল এখানে এদের সাথে কথা বলে কোনো লাভ নেই।

ফ্রেড লিস্টার নিচু গলায় ইংরেজিতে কমান্ডিং অফিসারকে বলল, "জিজ্ঞেস কর সে যে মূর্তিটা দেখেছে সেটি দেখতে কী রকম।"

ক্যাপ্টেন মারুফ অবাক হয়ে ফ্রেড লিস্টারের দিকে তাকাল, এটা যদি ভাইরাসের আক্রমণ হয়ে থাকে তা হলে কেন সে মূর্তির বর্ণনা জানতে চাইছে? রমিজ মাস্টারকে বাংলায় প্রশ্নটা করা হলে এক ধরনের অনিচ্ছা নিয়ে কথা বলতে শুরু করে। কমান্ডিং অফিসারকে প্রত্যেকটা কথা ইংরেজিতে অনুবাদ করে দিতে হল এবং ফ্রেড লিস্টার খুব গম্ভীর মুখে পুরোটা শুনে গেল। মূর্তির শরীর থেকে একটা বিচিত্র জন্তু লাফিয়ে বের হওয়ার কথা বলতেই ফ্রেড লিস্টার হাত তুলে বলল, "আর শোনার প্রয়োজন নেই একে এক্ষুনি কোয়ারেন্টাইন করতে হবে।"

ক্যাপ্টেন মারুফ জিজ্ঞেস করল, "কোথায় কোয়ারেন্টাইন করা হবে?"

"মাইলখানেক দূরে একটা স্কুল রয়েছে। সেটাকে কোয়ারেন্টাইন হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছে।"

"স্যার, আপনারা কি সত্যিই এটাকে ভাইরাসের সংক্রমণ বলে সন্দেহ করছেন?"

"হ্যাঁ। অবশ্যই।"

ক্যাপ্টেন মারুফ আপত্তি করে কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল—সেনাবাহিনীতে নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়, সব সময় নিজের কথা বলার পরিবেশ থাকে না। কমান্ডিং অফিসার বলল, "আমি একে নিয়ে যাচ্ছি।"

"ঠিক আছে স্যার।"

"আর কয়েক ঘণ্টার মাঝে বিশাল ট্রুপ নামানো হবে। এখানে প্রায় দশ স্কয়ার কিলোমিটার এলাকা পুরোপুরি ঘিরে ফেলা হবে, ভিতরে কেউ যেতে পারবে না।"

"কীভাবে ঘিরে ফেলা হবে?"

"কাঁটাতার, ইলেকট্রিক লাইন এবং লেজার সারভেলেন্স।"

ক্যাপ্টেন মারুফ হতবাক হয়ে কমান্ডিং অফিসারের দিকে তাকিয়ে রইল, "লেজার সারভেলেন্স?"

"হ্যাঁ।" কমান্ডিং অফিসার দাঁত বের করে হেসে বলল, "আমেরিকান গভর্নমেন্ট সাহায্য করছে। আজ রাতের মাঝে কমপ্লিট হয়ে যাবে।"

"আর এই এলাকার মানুষগুলো?"

"ট্রাকে করে সরিয়ে নেওয়া হবে। ঐ দেখ ট্রাক আসছে।"

ক্যাপ্টেন মারুফ তাকিয়ে দেখল সত্যি সত্যি দৈত্যের মতো বড় বড় অনেকগুলো ট্রাক আসছে। মানুষজনের ভয়ার্ত কথাবার্তা, ছোট শিশু এবং মেয়েদের কান্না শোনা যাচ্ছে। মানুষজন ছোটাছুটি করছে, একজন আরেকজনকে ডাকাডাকি করছে। এত অল্প সময়ের নোটিশে ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া খুব সহজ ব্যাপার নয়। সবকিছু নিয়ে একটা ভয়াবহ আতঙ্ক।

ঠিক কী কারণ জানা নেই কিন্তু ক্যাপ্টেন মারুফের হঠাৎ মনে হল পুরো ব্যাপারটি একটি বড় ধরনের ষড়যন্ত্র। এর মাঝে অন্য কিছু রয়েছে—ভাইরাস নয়, রোগশোক নয়, অন্য কিছু। ব্যাপারটি কী সে জানে না কিন্তু সেটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। ক্যাপ্টেন মারুফ কেমন করে জানি বুঝতে পারে একটা ভয়ঙ্কর বিপদ এগিয়ে আসছে।

AMARBOI.COM

৬

সকালবেলা খবরের কাগজ হাতে নিয়ে নিশীতা একেবারে থ হয়ে গেল, পত্রিকায় বড় বড় হেডলাইন, "ঢাকার উপকণ্ঠে ভয়াল ভাইরাস" ভিতরে ভাইরাস সংক্রমণের বর্ণনা। ভাইরাসে আক্রান্ত হলে কী ধরনের উপসর্গ হতে পারে লেখা রয়েছে, শরীরের প্রতিটি অংশ দিয়ে রক্তক্ষরণ একটি প্রধান উপসর্গ—সেটাকে তাই এবোলা ভাইরাসের কাছাকাছি কোনো প্রজাতি বলে সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে।

ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে সাধারণ মানুষকে উদ্ধার করার জন্য সেই এলাকা থেকে কয়েক হাজার মানুষকে রাতের মাঝে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। পুরো এলাকাকে কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে, সেখানে সামরিক প্রহরা বসানো হয়েছে। ভাইরাস দিয়ে সংক্রমণ হয়েছে এ রকম কিছু মানুষকে এর মাঝে কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে।

নিশীতা পুরো খবরটা পড়ার আগেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। নিশীতার আম্মা ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল? কোথায় যাচ্ছিস?"

"ফোন করতে।"

"কাকে ফোন করবি?"

"মোজাম্মেল ভাইকে। আমাদের এডিটর।"

"কেন? কী হয়েছে?"

"দেখছ না কী ছাপা হয়েছে?"

আম্মা তখনো পত্রিকা দেখেন নি, বললেন, "কী ছাপা হয়েছে?"

"তুমি সেটা বুঝবে না আম্মা—"

আম্মা এবারে সত্যি সত্যি রেগে উঠলেন, গলা উঁচিয়ে বললেন, "তুই এসব কী শুরু করেছিস? পৃথিবীতে তুই ছাড়া আর কোনো সাংবাদিক নেই? সকাল সাতটার সময় ঘর থেকে বের হয়ে যাস ফিরে আসিস রাত বারোটায়? দেশের কী অবস্থা জানিস না? একটা মোটর সাইকেলে টো টো করে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা ঘুরে বেড়াচ্ছিস? এখন সকালে নাশতা খাওয়ার সময় নাই তার আগেই টেলিফোন করতে হবে?"

"আম্মা, তুমি বুঝতে পারছ না—"

"আমি খুব ভালো বুঝতে পারছি যে আমার কপালে অনেক দুঃখ আছে। আমার মরণ না হওয়া পর্যন্ত শান্তি নেই—"

এরপর আম্মা নিশীতার আব্বা কেমন করে তার ঘাড়ে সবকিছু চাপিয়ে দিয়ে মারা গেলেন সেটা নিয়ে অভিযোগ করতে শুরু করলেন, আর মারা যখন গেলেনই কেন মেয়েটাকে এ রকম একটা আধা ছেলে আধা মেয়ে—ডানপিটে একরোখা উচ্ছৃঙ্খল একটা চরিত্র তৈরি করে তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে গেলেন সেটা নিয়ে আক্ষেপ করতে লাগলেন। সবার মেয়েরা বিয়েশাদি করে ঘর-সংসার করছে আর তার মেয়েটি কেন এ রকম বাউণ্ডেলেপনা করে বেড়াচ্ছে সেটা নিয়ে খোদার কাছে নালিশ করতে শুরু করলেন। কাজেই নিশীতাকে আবার খাবার টেবিলে এসে বসতে হল, পাউরুটিতে মাখন লাগিয়ে খেতে হল, চা শেষ করতে হল এবং তারপর টেলিফোন করতে যেতে পারল।

বাংলাদেশ পরিক্রমার সম্পাদক মোজাম্মেল হককে তার বাসায় পাওয়া গেল। ডায়াবেটিসের সমস্যা আছে বলে তিনি প্রতিদিন সকালে হাঁটতে বের হন, নিশীতা যখন ফোন করেছে তখন তিনি মাত্র হেঁটে ফিরে এসেছেন। মোজাম্মেল হক জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার নিশীতা? এই ভোরে?"

"আজকের সকালে খবরের কাগজ দেখেছেন?"

"দেখেছি, কী হয়েছে?"

"কী হয়েছে বুঝতে পারছেন না?"

"না।"

"ভাইরাসের খবরটা দেখেছেন?"

"দেখেছি। অনেক রাতে খবর এসেছে সবাই লিড নিউজ দিয়েছে।"

"আপনি বুঝতে পারছেন না এটা মিথ্যা?"

মোজ্জামেল হক হাসার মতো শব্দ করে বললেন, "মিথ্যা?"

"হ্যাঁ। এই এলাকায় একটা মহাজাগতিক প্রাণী নেমেছে বলে পুরো এলাকাটা ঘিরে ফেলে সব মানুষকে বের করে দিয়েছে।"

"হ্যাঁ, তুমি আগেও বলেছ।"

নিশীতা একটু অধৈর্য হয়ে বলল, "হ্যাঁ, যারা যারা সেই মহাজাগতিক প্রাণীকে দেখেছে কোয়ারেন্টাইন করার নামে তাদের সবাইকে আলাদা করে রেখেছে যেন কারো সাথে কথা বলতে না পারে!"

মোজাম্মেল হক নরম গলায় বললেন, "নিশীতা, তুমি আমাদের এত বড় জাঁদরেল একজন সাংবাদিক, তুমি যদি ছেলেমানুষের মতো কথা বল তা হলে তো মুশকিল। সন্দেহ থেকে তো খবর হয় না। খবর হতে হলে তার প্রমাণের দরকার।"

"আপনি কী প্রমাণ চান?"

AMARBOI.COM

"সবচেয়ে ভালো হয় তুমি যদি মহাজাগতিক প্রাণীটাকে ধরে প্রেসক্লাবে নিয়ে এসে তাকে দিয়ে একটা সাংবাদিক সম্মেলন করাতে পার।" মোজাম্মেল হক নিজের রসিকতায় নিজেই হা হা করে হাসতে শুরু করলেন।

নিশীতা রেগে বলল, "মোজাম্মেল ভাই আপনি আমার সাথে ঠাট্টা করছেন কেন?"

মোজাম্মেল হক নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "ঠিক আছে প্রাণীটাকে যদি ধরে না আনতে পার অন্ততপক্ষে তার একটা ছবি তো দেবে? তা না হলে কেমন করে হবে?"

"ঢাকা শহর যে আমেরিকান সায়েন্টিস্ট দিয়ে গিজগিজ করছে, রাতারাতি এত বড় একটা এলাকা ইলেকট্রিক তার দিয়ে ঘিরে ফেলল আপনার কাছে সেটা সন্দেহজনক মনে হচ্ছে না?"

"হচ্ছে।"

"তা হলে?"

"সে জন্যই তো তোমরা আছ। তোমরা সত্যটা খুঁজে বের করে দাও।"

"ঠিক আছে মোজাম্মেল ভাই, আপনাকে আমি সত্য খুঁজে বের করে এনে দেব।"

"বেশ।"

টেলিফোনটা রেখে দিয়ে নিশীতা প্রায় স্পষ্ট অনুমান করতে পারল মোজাম্মেল হক দুলে দুলে হাসছেন—তার একটা কথাও বিশ্বাস করেন নি।

বাংলাদেশ পরিক্রমার অফিস থেকে ভাইরাস আক্রান্ত এলাকাটা দেখতে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু কাজকর্ম শেষ করে বের হতে হতে নিশীতার দেরি হয়ে গেল। পথে কিছু খেয়ে নেবে বলে এলিফ্যান্ট রোডে একটা ভালো ফাস্টফুডের দোকানে থেমে আবিষ্কার করল সেখানে এত ভিড় যে বসার জায়গা নেই, লোকজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাচ্ছে। কয়েকজন মিলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাওয়া যায়—সত্যি কথা বলতে কী, কয়েকজন মিলে শুধু দাঁড়িয়ে কেন হেঁটে বসে বা ছুটতে ছুটতেও খাওয়া যায়, কিন্তু একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাওয়ার মাঝে কেমন যেন হ্যাংলাপনা রয়েছে। নিশীতা তাই খাবারের একটা প্যাকেট কিনে নিল, কোথায় বসে কিংবা কার সাথে খাবে চিন্তা করে তার ড. রিয়াজ হাসানের কথা মনে পড়ল, মানুষটিকে যেটুকু দেখেছে তাতে মনে হচ্ছে নাওয়া-খাওয়া ঠিক নেই। নিশীতা তাই তার জন্যও একটা খাবারের প্যাকেট কিনে নিয়ে রিয়াজ হাসানের বাসার দিকে রওনা দেয়। সেদিন রাত্রিবেলা এপসিলনকে প্রশ্ন না করে প্রশ্নের উত্তর দিতে দেখে রিয়াজ হাসান এত অবাক হয়েছিল যে বলার মতো নয়। ব্যাপারটি কীভাবে হয়েছে বোঝার জন্য তখন তখনই সে কাজে লেগে গিয়েছিল—এরপর আর তার সাথে যোগাযোগ হয় নি। ফ্রেড লিস্টারের দলবল আর কোনো উৎপাত করেছে কি না সেটারও একটা খোঁজ নেওয়া দরকার।

রিয়াজ হাসানের বাসার গেট হাট করে খোলা, দরজায় কলিংবেল অনেকবার টিপেও কেউ উত্তর দিল না। রিয়াজ হাসান বাসায় নেই ভেবে নিশীতা খানিকটা আশাহত হয়ে চলে আসছিল তখন কী ভেবে সে দরজার হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে অবাক হয়ে আবিষ্কার করল দরজাটি খোলা। সে ভিতরে মাথা ঢুকিয়ে উচ্চৈঃস্বরে ডাকল, "ড. হাসান।"

কেউ উত্তর দিল না। নিশীতা তখন সাবধানে ভিতরে ঢুকে চমকে উঠল, মনে হচ্ছে এই বাসার ভিতরে প্রলয়কাণ্ড ঘটে গেছে। ঘরের সবকিছু ওলটপালট হয়ে আছে, ঘরময় যন্ত্রপাতি এবং কাগজপত্র ছড়ানো-ছিটানো। নিশীতার বুকটি হঠাৎ ধক করে ওঠে, সে সাবধানে ভিতরে উঁকি দেয়। মনে হচ্ছে ঘরের ভিতর একটা টর্নেডো হয়ে গেছে। নিশীতা ভিতরের ঘরগুলো ঘুরে আবার বাইরের ঘরে এসে দাঁড়াল, মনে হচ্ছে এই ঘরটির উপর দিয়ে সবচেয়ে

বেশি ঝড় গেছে। নিশীতা নিচু হয়ে একটি–দুইটি কাগজ তুলে আনল। ছোটখাটো যন্ত্রপাতি ইতস্তত ছড়িয়ে আছে, একটা স্পর্শ করতেই কে যেন তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করে উঠল, "কে? কে ওখানে?"

নিশীতা থমকে উঠে দাঁড়িয়ে গেল এবং হঠাৎ করে বুঝতে পারল এটি এপসিলনের কণ্ঠস্বর। কাত হয়ে পড়ে থাকা মনিটরটির ভিতর থেকে এপসিলন নিশীতার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "নিশীতা? তুমি কি নিশীতা?"

"হ্যাঁ। আমি নিশীতা।" নিশীতা এগিয়ে গিয়ে মনিটরটিকে সোজা করে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "এখানে কী হয়েছে?"

"দেখতে পাচ্ছ না কী হয়েছে?"

"হ্যাঁ। দেখতে পাচ্ছি। ড. রিয়াজ হাসান কোথায়?"

"নাই।"

নিশীতা ভুরু কুঁচকে এপসিলনের দিকে তাকাল, সে আবার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে প্রশ্ন না করে, রিয়াজ হাসানের মতে এটি অসম্ভব। নিশীতা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এপসিলনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় গিয়েছেন রিয়াজ হাসান?"

"তাকে ধরে নিয়ে গেছে।"

নিশীতা প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে বলল, "কে ধরে নিয়ে গেছে?"

"ফ্রেড লিস্টারের লোকজন।"

"তুমি কেমন করে জান?"

"আমি দেখেছি।"

"তুমি কেমন করে দেখবে? তোমার চোখ নেই, আছে একটা সস্তা ভিডিও ক্যামেরা।"

এপসিলন কোনো কথা না বলে স্থির দৃষ্টিতে নিশীতার দিকে তাকিয়ে রইল। নিশীতা অধৈর্য হয়ে বলল, "কী হল? কথা বলছ না কেন?"

"ভাবছি।"

"কী ভাবছ?"

"তোমাকে কেমন করে বলব।"

নিশীতা অবাক হয়ে এপসিলনের দিকে তাকিয়ে রইল, তার ভিতরে হঠাৎ একটা বিচিত্র অনুভূতির সৃষ্টি হয়, মনে হয় এই ঘরে সে একা নয়, এখানে অন্য একজন আছে, সে যেরকম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এপসিলনের দিকে তাকিয়ে আছে ঠিক সেইভাবে অন্য কেউ তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সে মাথা ঘুরিয়ে চারদিকে তাকাল, কোথাও কেউ নেই কিন্তু তবু কী বিচিত্র এবং বাস্তব সেই অনুভূতি। নিশীতা জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে বলল, "কী হল, কিছু বলবে না?"

"হ্যাঁ আমি রিয়াজকে বলেছি। সে জানে। কিন্তু এখন সে নেই, আমার মনে হয় তোমাকেও বলতে হবে।"

নিশীতা একটু ভয় পাওয়া গলায় বলল, "কী বলবে?"

"তোমাদের অনেক বড় বিপদ নিশীতা।"

নিশীতা চমকে উঠল, বলল, "কী বললে?"

"বলেছি তোমাদের অনেক বড় বিপদ।"

"সেটা তুমি কেমন করে জানবে? তুমি পাঁচ শ বারো মেগাবাইটের একটা প্রোগ্রাম!"

"আমি পাঁচ শ বারো মেগাবাইটের একটা প্রোগ্রাম না। আমি পাঁচ শ বারো

মেগাবাইটের একটা প্রোগ্রাম ব্যবহার করছি তোমার সাথে কথা বলার জন্য। তোমাদের সাথে কথা বলার এর চাইতে সহজ কোনো উপায় আমি খুঁজে পাই নি।"

নিশীতা কাঁপা গলায় বলল, "তুমি কে?"

"আমি সেটা বললে তুমি বুঝতে পারবে না, নিশীতা।"

"কেন? কেন বুঝতে পারব না?"

"একটা পিপড়া থেকে তুমি কি অনেকগুণ বেশি বুদ্ধিমান নও?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু তুমি কি একটা পিপড়াকে বোঝাতে পারবে তুমি কে?"

নিশীতা নিশ্বাস আটকে রেখে বলল, "তুমি দাবি করছ তোমার বুদ্ধিমত্তার কাছে আমি পিপড়ার মতো?"

"এটি একটি উপমা।"

নিশীতা মনিটরটির কাছে গিয়ে বলল, "আমি তোমার উপমা বিশ্বাস করি না।"

"তোমাকে আমার কথা বিশ্বাস করতে হবে।"

"কেন?"

"কারণ তোমাদের অনেক বড় বিপদ। তোমাদের সাহায্য করার কেউ নেই।"

"কেন আমাদের অনেক বড় বিপদ?"

"কারণ তোমরা চতুর্থ মাত্রার একটা মহাজাগতিক প্রাণীকে পৃথিবীতে ডেকে এনেছ।"

নিশীতা ভুরু কুঁচকে বলল, "আমরা?"

"হ্যাঁ। তোমরা। পৃথিবীর মানুষেরা। ফ্রেড লিস্টার আর তার দলবলেরা।"

"তাতে কী হয়েছে?"

"চতুর্থ মাত্রার প্রাণী এখানে তার প্রজাতি রেখে যাবে।"

"রেখে গেলে কী হয়?"

"সেটি অনেক বড় বিপদ। দুইটি ভিন্ন বুদ্ধিমত্তার প্রাণী এক সময় এক জায়গায় থাকতে পারে না। একটি অন্যকে পরাভূত করে।"

নিশীতা কোনো কথা না বলে এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে মনিটরটির দিকে তাকিয়ে রইল—এটি কি সত্যিই বিশ্বাসযোগ্য যে একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম হঠাৎ করে এ রকম হয়ে যেতে পারে? নিশীতা হতবাক হয়ে মনিটরের এপসিলনের ভাবলেশহীন মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, একটু পর সংবিৎ ফিরে পেয়ে বলল, "আমরা এখন কী করব?"

"আমি জানি না।"

"তুমি জান না?" তুমি বলেছ তুমি এত বড় বুদ্ধিমান প্রাণী, তা হলে তুমি জান না কেন?"

"কারণ তোমাদের সভ্যতাকে আমার স্পর্শ করার কথা নয়। তোমাদের সমস্যার সমাধান তোমাদের নিজেদেরই বের করতে হবে। আমি দুঃখিত নিশীতা।"

"তা হলে? তা হলে আমাদের কী হবে?"

"আমি জানি না।"

নিশীতা দীর্ঘ সময় একা একা বসে রইল, কী করবে বুঝতে পারছে না। হঠাৎ করে সে বুঝতে পারল তার ভয়ঙ্কর খিদে পেয়েছে। নিশীতা ঘরের বারান্দায় বসে তার খাবারের প্যাকেট বের করে বুভুক্ষের মতো খেতে শুরু করে। একা খাবে না বলে এখানে এসেছিল কিন্তু আবার

তাকে একাই খেতে হল। সে ঘড়ির দিকে তাকাল, প্রায় দুটো বেজে গিয়েছে। ভাইরাস আক্রান্ত বলে যে বিশাল এলাকা ঘিরে রাখা হয়েছে সেই এলাকাটা গিয়ে একবার দেখে আসতে হয়। রিয়াজ হাসান কোথায় আছে কে জানে। সত্যিই যদি ফ্রেড লিস্টারের দল তাকে ধরে নিয়ে থাকে তা হলে তাকে ছাড়িয়ে আনা যায় কীভাবে? পুলিশের লোক কি বিশ্বাস করবে তার কথা? ফ্রেড লিস্টার নাকি দুই সুটকেস ভরে ডলার নিয়ে এসেছে, এই ডলারের সাথে সে কি যুদ্ধ করতে পারবে?

৭

কালা জব্বারের মৃতদেহটি যেখানে পাওয়া গিয়েছিল তার কাছাকাছি যাবার আগেই মিলিটারি পুলিশ নিশীতাকে আটকাল। বিস্তৃত এলাকা কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে, উপরে হাই ভোল্টেজ বৈদ্যুতিক তার, নিশীতা জেমসবন্ডের সিনেমাতে এ রকম দেখেছে, সত্যি সত্যি যে হতে পারে তার ধারণা ছিল না। মিলিটারি পুলিশটি ভদ্রভাবে বলল, "আপনি কোথায় যেতে চাইছেন?"

নিশীতা হেলমেট খুলে তার কার্ড বের করে দেখিয়ে বলল, "আমি সাংবাদিক, এই এলাকার ওপর রিপোর্ট করতে এসেছি।"

"ও! সাংবাদিকদের জন্য আলাদা সেল করা হয়েছে—আপনি এই রাস্তা ধরে সোজা এক মাইল চলে যান। ঘণ্টায় ঘণ্টায় সেখানে নিউজ বুলেটিন দেওয়া হচ্ছে।"

ঘণ্টায় ঘণ্টায় গৎবাঁধা যে বুলেটিন দেওয়া হয় সেটাতে নিশীতার উৎসাহ নেই, সে ভিতরে একবার দেখে আসতে চায়, তাকে যেতে দেবে বলে মনে হয় না, কিন্তু তবু একবার চেষ্টা করল, বলল, "আমি মোটর সাইকেলটা এখানে রেখে ভিতর থেকে চট করে দুটো ছবি তুলে নিয়ে আসি?"

নিশীতার কথা শুনে হঠাৎ করে মিলিটারি পুলিশটির মুখ শক্ত হয়ে গেল, সে কঠিন গলায় বলল, "না, কাউকে ভিতরে যেতে দেওয়া যাবে না। আপনি সাংবাদিকদের সেলে যান।"

নিশীতা মাথায় হেলমেট চাপিয়ে তার মোটর সাইকেল স্টার্ট করল, পুরো এলাকাটা একেবারে নিশ্ছিদ্রভাবে ঘিরে রাখা হয়েছে। এর ভিতরে কোথাও নিশ্চয়ই একটা মহাজাগতিক প্রাণী আছে, কী বিচিত্র ব্যাপার এখনো তার বিশ্বাস হতে চায় না।

সাংবাদিকদের জন্য সেলটি খুব সুন্দর করে করা হয়েছে, তাদেরকে সংবাদ দেওয়া থেকে আপ্যায়ন করার মাঝে অনেক বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। বেশ কিছু সাংবাদিক এসেছেন, তারা মনে হয় বেশ ভালোভাবে আপ্যায়িত হয়ে আছেন। কয়েকটি কম্পিউটারে বুলেটিন প্রস্তুত করে তার প্রিন্ট আউট, রঙিন ছবি দেওয়া হচ্ছে। প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য একজন বড় অফিসার আছেন, তার সাথে সাদা পোশাক পরা দুজন ডাক্তার। সাংবাদিকরা তাদের নানা ধরনের প্রশ্ন করছে।

নিশীতা দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ তাদের কথাবার্তা শুনল, যখন ভিড় একটু কমে এল সে এগিয়ে গিয়ে নিজের পরিচয় দিল। বড় অফিসার মুখে বিস্তৃত হাসি ফুটিয়ে বলল, "আপনাকে আমি কীভাবে সাহায্য করতে পারি?"

"আমি ফ্রেড লিস্টার নামে একজন আমেরিকান বিজ্ঞানীকে খুঁজছি।"

"এখানে ফ্রেড লিস্টার নামে তো কেউ নেই।"

"এখানে না থাকতে পারেন, কিন্তু আমি নিশ্চিত এই এলাকায় আছেন। তাকে একটু খোঁজ দেওয়া যেতে পারে?"

বড় অফিসারটি গম্ভীর মুখে বলল, "আমি কমান্ডিং অফিসে খোঁজ করতে পারি।"

"আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। ফ্রেড লিস্টারকে পাওয়া গেলে তাকে একটা খুব জরুরি ম্যাসেজ দিতে হবে।"

"কী ম্যাসেজ?"

"আমি একটা কাগজে লিখে দিই, ম্যাসেজটা কটমটে, এমনি বললে আপনার মনে থাকবে না।" নিশীতা পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে ইংরেজিতে লিখল, "আমি রিয়াজ হাসানের এলগরিদমের কথা জানি। বব ম্যাকেঞ্জির সুটকেস ছাড়া ই.টি. বিষয়ক সাংবাদিক সম্মেলন আটকানো যাবে না।"

কাগজটি হাতে নিয়ে বড় অফিসারটি ম্যাসেজটি পড়ে বলল, "ঠিকই বলেছেন, এই ম্যাসেজ পড়ে মনে রাখা অসম্ভব! সাঙ্কেতিক ভাষার লেখা মনে হচ্ছে, পড়ে কিছুই তো বুঝতে পারলাম না!"

নিশীতা হাসার ভঙ্গি করে বলল, "জানা না থাকলে সবই সাঙ্কেতিক।"

"তা ঠিক। আপনি ওখানে বসুন, চা কফি কোল্ড ড্রিংকস আছে। আমি খোঁজ করে দেখি ফ্রেড লিস্টারকে পাওয়া যায় কি না।"

নিশীতা জানালার কাছে একটা নরম চেয়ারে বসে অপেক্ষা করতে থাকে। তার ভিতরে এক ধরনের অস্থিরতা তাকে এক মুহূর্ত শান্তি দিচ্ছে না। ঠিক, কিন্তু কী করবে সে বুঝতে পারছে না। ফ্রেড লিস্টারের সাথে এভাবে দেখা করাটাও ঠিক হচ্ছে কি না সেটা নিয়েও সে আর নিশ্চিত নয়।

কয়েক মিনিটের মাঝে বড় অফিসারটি এসে বলল, "ফ্রেড লিস্টারকে পাওয়া গেছে। প্রথমে আপনার সাথে কথা বলতে চাইছিল না কিন্তু আপনার ম্যাসেজটুকু পড়ে শোনানোর পর ম্যাজিকের মতো কাজ হয়েছে। একটা হেলিকপ্টারে করে চলে আসছে!"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। আপনি বসুন, বলেছে আধঘণ্টার মাঝে হাজির হবে।"

আধঘণ্টার আগেই ছোট একটা খেলনার মতো হেলিকপ্টারে করে ফ্রেড লিস্টার হাজির হল। কাছাকাছি একটা ছোট মাঠে অনেক ধুলো ছড়িয়ে সেটি নামল এবং তার ভিতর থেকে ফ্রেড লিস্টার মাথা নিচু করে নেমে এল। নিশীতা ঘরের ভিতরে দাঁড়িয়ে তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

ফ্রেড লিস্টারকে ঘরে ঢুকতে দেখে নিশীতা মুখে জোর করে একটা হাসি ফুটিয়ে এগিয়ে গেল। ফ্রেড মুখ শক্ত করে বলল, "তুমি কী চাও?"

"আমি কী চাই সেটা পরে হবে, আগে সামাজিকতাটুকু সেরে নিই।" নিশীতা হ্যান্ডশেক করার জন্য হাত এগিয়ে দিল। ফ্রেড হাত স্পর্শ করতেই নিশীতা ঘুরে উপস্থিত সাংবাদিকদের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনারা একটা ছবি নিন। ইনি ফ্রেড লিস্টার, আমেরিকান খুব বড় বিজ্ঞানী। আমাদের সাহায্য করতে এসেছেন।"

সাংবাদিকেরা এগিয়ে এসে ফ্ল্যাশ জ্বালিয়ে চোখের পলকে অনেকগুলো ছবি তুলে নিল। ফ্রেড লিস্টারের মুখ হঠাৎ করে পাথরের মতো শক্ত হয়ে যায়। নিশীতা গলার স্বর নিচু করে বলল, "এই ছবিগুলো নষ্ট করার জন্য তোমার বব ম্যাকেঞ্জির সুটকেসে টান পড়বে না তো?"

ফ্রেড লিস্টার চোখ দিয়ে আগুন বের করে বলল, "তুমি কী চাও?"

"আমি তোমার সাথে কথা বলতে চাই।"

"এস আমার সাথে।"

"কোথায়?"

"হেলিকপ্টারে।"

"তোমার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গেছে! আমি তোমার সাথে হেলিকপ্টারে উঠি আর তুমি ধাক্কা দিয়ে হেলিকপ্টার থেকে ফেলে দিয়ে বল, এবোলা ভাইরাসের আক্রমণে মাথা খারাপ হয়ে হেলিকপ্টার থেকে লাফ দিয়েছে!"

"তা হলে কোথায় কথা বলবে?"

"বাইরে চল, ঐ গাছটার নিচে কেউ নেই।"

নিশীতা ফ্রেড লিস্টারকে নিয়ে কাছাকাছি একটা ঝাপড়া কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে দাঁড়াল। ফ্রেড লিস্টার মুখ শক্ত করে বলল, "তুমি কী বলতে চাও?"

"ড. রিয়াজ হাসান কোথায়?"

"সেটি আমি কী করে বলব?"

"দেখ ফ্রেড, আমার সাথে মামদোবাজি কোরো না। আমি জানি তুমি ড. রিয়াজ হাসানকে ধরে নিয়ে গেছ।"

"আমি তোমার কাছে সেই কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নই।"

"বেশ। তা হলে আমি বলি আমি কী করব। আমি জানি এই এলাকায় একটা মহাজাগতিক প্রাণী এসেছে। সেই প্রাণীর সাথে তোমরা যোগাযোগ করার চেষ্টা করছ। ড. হাসানের এলগরিদমটা সে জন্য তোমাদের খুব জরুরি হয়ে পড়েছে। ভাইরাসের কথা আসলে একটা ভাঁওতাবাজি সেটা আমি খুব ভালো করে জানি।"

"তুমি এর কিছু প্রমাণ করতে পারবে না।"

নিশীতা মাথা নাড়ল, "তুমি এত নিশ্চিত হয়ো না। তোমার ছবি নেওয়া হয়েছে, ওয়েবসাইট থেকে তোমাদের ওর্‌গানোগ্রামটি ডাউনলোড করলেই দেখা যাবে তুমি ভাইরাসের এক্সপার্ট নও—তুমি মহাজাগতিক প্রাণীর এক্সপার্ট। আমি একটা সাংবাদিক সম্মেলন করে কমপক্ষে এক শ সাংবাদিক নিয়ে আসতে পারি। আমরা থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি হতে পারি কিন্তু আমাদের সংবাদপত্র খুব স্বাধীন।"

"তুমি কত চাও?"

নিশীতা একটা নিশ্বাস ফেলল, মানুষটি টোপ গিলতে শুরু করেছে। ধরেই নিয়েছে সে টাকার জন্য করছে, মনে হয় এই লাইনেই কথাবার্তা চালিয়ে যেতে হবে। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ফ্রেডের দিকে তাকিয়ে বলল, "প্রথমে রিয়াজ হাসানকে ছেড়ে দাও, তারপর আমি বলব।"

ফ্রেড ঠোঁট কামড়ে খানিকক্ষণ কিছু একটা ভাবল, তারপর বলল, "কিন্তু আমি কেমন করে নিশ্চিত হব যে তুমি কোনো পাগলামি করবে না?"

"আমার কথা তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে।"

"ঠিক আছে। তুমি এক ঘণ্টা পর হোটেল সোনারগাঁওয়ে যাও, সেখানে রিয়াজ হাসানকে পাবে।"

"চমৎকার।"

"তুমি নিশ্চয়ই জান, এই ব্যাপার নিয়ে তুমি উল্টাপাল্টা কিছু করলে তার ফল হবে ভয়ানক।"

"আমি জানি।" নিশীতা ফিসফিস করে বলল, "খুব ভালো করে জানি।"

ফার্মগেটের কাছে পৌঁছানোর আগেই হঠাৎ নিশীতা শুনতে পেল তার সেলুলার টেলিফোনটি শব্দ করছে—কেউ একজন তার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে। অন্য কোনো সময় হলে সে টেলিফোনটি নিয়ে মাথা ঘামাত না, যে চেষ্টা করছে সে এক ঘণ্টা পরেও তার সাথে যোগাযোগ করতে পারবে কিন্তু এখন নিশীতা কোনো ঝুঁকি নিল না। মোটর সাইকেল থামিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে নিশীতা তার টেলিফোনটি কানে লাগাল, "হ্যালো।"

"নিশীতা?"

"কথা বলছি।"

"নিশীতা, খুব সাবধান। একটা নীল মাইক্রোবাসে করে কিছু মানুষ তোমার পিছু পিছু আসছে।"

"আপনি কে?"

"তুমি জান আমি কে।"

"এপসিলন! তুমি এপসিলন।"

"আমি এপসিলনকে ব্যবহার করছি।"

"নীল মাইক্রোবাসে কারা আছে?"

"ফ্রেড লিস্টারের মানুষ।"

"তারা কী করতে চায়?"

"তোমাকে খুন করতে চায়। এরা খুব ভয়ঙ্কর মানুষ নিশীতা।"

"ঠিক আছে, আমি দেখছি।"

টেলিফোনটা ব্যাগে রেখে নিশীতা পিছনে তাকাল, এখনো কোনো নীল মাইক্রোবাস দেখা যাচ্ছে না। নিশীতা প্রথমবার এক ধরনের আতঙ্ক অনুভব করে, সত্যি সত্যি যদি ফ্রেড লিস্টারের মানুষ তাকে খুন করার চেষ্টা করে তা হলে সে কী করবে? এই মুহূর্তে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে এটি নিয়ে ভেবে সে কোনো সমাধান বের করতে পারবে না। নিশীতা আবার মোটর সাইকেলে চেপে বসল, স্টার্ট দিয়ে এক মুহূর্তে রাস্তার ভিড়ের মাঝে মিশে গেল।

হোটেল সোনারগাঁওয়ে পৌঁছানোর আগেই হঠাৎ রিয়ার ভিউ মিররে নিশীতা দেখল তার খুব কাছাকাছি একটা নীল রঙের মাইক্রোবাস। মাইক্রোবাসের জানালা দিয়ে ঝুঁকে একজন মানুষ বের হয়ে আছে, মানুষটি কী করছে সে দেখতে পেল না কিন্তু হঠাৎ তার ঘাড়ে তীক্ষ্ণ সুঁচ ফোটার মতো একটা যন্ত্রণা হল। নিশীতা ঘাড়ে হাত দিয়ে দেখে সেখানে ছোট কাচের সিরিঞ্জের মতো একটি এম্পুল বিঁধে আছে, সেটাকে টেনে বের করে আনতেই হঠাৎ তার মাথা ঘুরে গেল, কোনো একটা বিষাক্ত ওষুধ তার শরীরে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিশীতা কোনো ভাবে তার মোটর সাইকেলটা থামাল, কিন্তু সেখান থেকে নামতে পারল না। হুমড়ি খেয়ে নিচে পড়ে গেল। নিশীতা শুনতে পায় তার আশপাশে অসংখ্য গাড়ির হর্ন বাজছে, ব্রেক কষে থামার চেষ্টা করছে। নিশীতা চোখ খোলা রাখার চেষ্টা করে, দেখতে পায় নীল মাইক্রোবাসটি পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে, জানালার কাছে বসে থাকা মানুষটা মুখে এক ধরনের বিচিত্র হাসি নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

দেখতে দেখতে তাকে ঘিরে মানুষের ভিড় জমে গেল, তাকে কিছু একটা বলছে সে শুনতে পাচ্ছে কিন্তু উত্তরে কিছু বলতে পারছে না। নিশীতা দেখল ঠিক পিছনে একটা জিপ এসে থেমেছে সেখান থেকে দুজন মানুষ নেমে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিশীতার পাশে উবু হয়ে বসে থাকা একজন মানুষ বলল, "জানি না।" হঠাৎ করে মোটর সাইকেল থামিয়ে পড়ে গেলেন।"

"মনে হয় ডায়াবেটিক শক। কিংবা হার্ট এ্যাটাক—দেখি সবাই সরে যান, একটু বাতাস আসতে দিন।"

মানুষজন সরে লোকটাকে জায়গা করে দিল, নিশীতা চিনতে পারল এই মানুষটাকে সে রিয়াজ হাসানের বাসায় দেখেছে। নিশীতা বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দেখল মানুষটি এসে তার হাত ধরে পালস গোনার ভান করল, চোখের পাতা টেনে দেখল, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, "একে এক্ষুনি হাসপাতালে নিতে হবে।"

উপস্থিত লোকজনের ভিতর থেকে একজন বলল, "কেমন করে নেব? এম্বুলেন্স?"

মানুষটি বলল, "আমি হাসপাতালে পৌঁছে দেব, একে গাড়িতে তুলে দিন।"

নিশীতা চিৎকার করে বলতে চাইল, না—আমাকে এদের হাতে দিও না, কিন্তু সে একটা কথাও উচ্চারণ করতে পারল না। নিশীতাকে ধরাধরি করে গাড়ির পিছনের সিটে শুইয়ে দেবার পর মানুষটি উপস্থিত মানুষদের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনাদের কেউ সাথে যেতে চান?"

একজন বলল, "ঠিক আছে আমিও সাথে যাই।"

নিশীতা চোখ ঘুরিয়ে মানুষটিকে দেখল, এই মানুষটিও তাদের দলের একজন, সবাইকে নিয়ে এখানে পুরোপুরি একটা নাটকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নিশীতা বুঝতে পারে খুব ধীরে ধীরে সে অচেতন হয়ে পড়ছে। তার মাঝে টের পেল তার মোটর সাইকেলটাকেও পিছনে তোলা হচ্ছে। কয়েক মুহূর্তের মাঝে জিপটা ছেড়ে দিল, নিশীতা শুনতে পেল একজন উচ্চৈঃস্বরে হাসতে হাসতে বলল, "চমৎকার অপারেশন। একেবারে নিখুঁত।"

একজন নিশীতার ওপর ঝুঁকে পড়ে গলায় শ্লেষ এনে বলল, "সাংবাদিক সাহেবা—আপনি কি এখনো জেগে আছেন?"

নিশীতা চোখ খুলে তাকাল, মানুষটি কুৎসিত একটা ভঙ্গি করে বলল, "পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে ...।"

নিশীতার মনে হল অনেক দূর থেকে কেউ একজন তাকে ডাকছে। সে সাবধানে চোখ খুলে তাকাল, সত্যি সত্যি তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে কোনো একজন মানুষ তাকে কোমল গলায় ডাকছে। নিশীতা মানুষটিকে চিনতে পারল, রিয়াজ হাসান।

সে চমকে উঠে বসার চেষ্টা করতেই মনে হল তার মাথার ভিতরে কিছু একটা ছিঁড়ে যাচ্ছে। যন্ত্রণার একটা শব্দ করে সে আবার শুয়ে পড়ল। রিয়াজ হাসান বলল, "কেমন আছ নিশীতা?"

"ভালো নেই, মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা।"

"কমে যাবে। ওষুধের অ্যাফেক্টটা কেটে যেতেই কমে আসবে।"

"আমরা কোথায়?"

"ঠিক জানি না, মনে হয় বারিধারার কাছে কোনো বাসায়।"

নিশীতা চোখ খুলে চারদিকে তাকাল, একটা বড় গুদামঘরের মতো জায়গার একপাশে খানিকটা জায়গা ঘিরে ঘরটা তৈরি করা হয়েছে। এটি নিয়মিত কোনো বাসা নয়। তাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে শক্ত মেঝেতে, নিচে হয়তো একটা কম্বল বিছানো হয়েছে এর বেশি কিছু নেই। ঘরের ভিতরে কোনো আলো নেই, বাইরের আলো স্কাই লাইটের ফাঁক দিয়ে ভিতরে এসে ঢুকছে। নিশীতা সাবধানে উঠে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল, এই ভয়ঙ্কর এবং

অনিশ্চিত পরিবেশেও সে প্রথমে হাত দিয়ে চুল বিন্যস্ত করতে করতে বলল, "আমাকে কি ভূতের মতো দেখাচ্ছে?"

রিয়াজ হাসান হেসে বলল, "তোমাকে কেমন দেখাচ্ছে সেটাই তোমার প্রথম চিন্তার বিষয়?"

নিশীতা একটু কষ্ট করে হেসে বলল, "আমার ব্যাগটা কি আছে?"

"কেন?"

"ভিতরে একটা আয়না আছে, কেমন দেখাচ্ছে দেখতাম। চিরুনি দিয়ে চুলটা ঠিক করতাম।"

রিয়াজ হাসান উঠে গিয়ে ঘরের অন্যপাশ থেকে তার ব্যাগটা এনে দিল। নিশীতা ব্যাগটা খুলতেই তার সেলুলার ফোনটি চোখে পড়ল, সে চোখ উজ্জ্বল করে বলল, "সেলুলার ফোন! আমরা বাইরে ফোন করতে পারব!"

রিয়াজ হাসান মাথা নাড়ল, বলল, "না, পারবে না। তোমাকে যখন এখানে রেখে গেছে তখন লোকগুলো সেটা নিয়ে কথাবার্তা বলেছে। তোমার ফোনের ব্যাটারি ডিসচার্জ করে দিয়েছে।"

নিশীতা ফোনটি হাতে নিয়ে দেখল সতি সত্যি এটি পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে আছে। ফোনটি পাশে সরিয়ে রেখে সে তার কমপ্যাক্ট বের করে তার ছোট আয়নাটাতে নিজেকে দেখে একটা গভীর হতাশাব্যঞ্জক শব্দ বের করল। সে ব্যাগ হাতড়ে একটা চিরুনি বের করে তার চুলগুলোকে এক মিনিটের মাঝে বিন্যস্ত করে নেয়। রিয়াজ হাসানকে আড়াল করে ঠোঁটে দ্রুত একটু লিপস্টিকের একটা ছোঁয়া লাগিয়ে দিল।

রিয়াজ শব্দ করে হেসে বলল, "আমি জানতাম না তোমাকে কেমন দেখাচ্ছে সেটা তোমার কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ।"

"কেমন দেখাচ্ছে নয়—বলেন, ভূতের মতো দেখাচ্ছে কি না!"

রিয়াজ হাসান একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "আমি জানি না, তোমাকে ঠিক পরিবেশে বলার সুযোগ পাব কি না—তাই এখনই বলে রাখি, তুমি যেভাবেই থাক তোমাকে কখনোই ভূতের মতো দেখায় না।"

রিয়াজের গলার স্বরে কিছু একটা ছিল সেটা শুনে নিশীতা একটু অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল। রিয়াজ একটু লজ্জা পেয়ে বলল, "আমি জানি না তোমাকে এর আগে কেউ বলেছে কি না—তোমার মাঝে একটা অসম্ভব সতেজ ভাব আছে। দেখে ভালো লাগে।"

নিশীতা এবারে শব্দ করে হেসে ফেলল, বলল, "শুনে খুশি হলাম যে অন্তত কেউ একজন বলল আমার সতেজ ভাবটি ভালো লাগে। সারা জীবন শুনে আসছি আমার তেজ হচ্ছে আমার সব সর্বনাশের মূল।"

"সেটিও নিশ্চয়ই সত্যি!" রিয়াজ বলল, "আজকে যে তুমি এখানে এই গাড্ডায় পড়েছ, আমার ধারণা সেটাও তোমার তেজের জন্য।"

নিশীতা মাথা নাড়ল, বলল, "না, পুরোটা তেজের জন্য না। আপনি জানেন একটা বিশাল ষড়যন্ত্র হচ্ছে, আমি ধরে ফেলেছি সেটাই হচ্ছে সমস্যা।" নিশীতা দেয়াল ধরে সাবধানে উঠে দাঁড়াল, দাঁড়িয়ে চারদিকে একবার তাকিয়ে বলল, "আপনাকে কেন ধরে এনেছে?"

"আমার সেই কোডটার জন্য।"

"আপনি কি দিয়েছেন?"

“দিতে হয় নি। বাসা তোলপাড় করে নিজেরাই বের করে নিয়েছে।”

“তা হলে আপনাকে ধরে এনেছে কেন?”

রিয়াজ একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, “আমি যেন কাউকে বলে না দিই সে জন্য। আমার মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করবে।”

“কীভাবে করবে?”

“এ ব্যাপারে আমাদের ফ্রেড লিস্টারের সৃজনী ক্ষমতা খুব কম। তার ধারণা টাকা দিয়েই সব করে ফেলা যায়।”

নিশীতা ছোট ঘরটি ঘুরে ঘুরে পরীক্ষা করতে করতে হঠাৎ করে বলল, “আমাদেরকে মেরে ফেলবে না তো?”

রিয়াজ হাসান চমকে উঠে বলল, “মেরে ফেলবে? মেরে ফেলবে কেন? একজন মানুষকে মেরে ফেলা কি এত সোজা?”

“জানি না। আমার কেন জানি ব্যাপারটা ভালো লাগছে না।”

রিয়াজ মাথা নাড়ল, বলল, “না। মেরে ফেলবে না। তোমার কথাটি ধর, তোমাকে মারতে চাইলে ঐ রাস্তাতেই মেরে ফেলতে পারত। মারে নি। তোমাকে অজ্ঞান করেছে—অনেক মানুষ দেখেছে তুমি রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছ, তোমাকে কিছু মানুষ তুলে নিয়ে গেছে। এখন যদি দেখে তোমার ডেডবডি, ব্যাপারটি নিয়ে সন্দেহ করবে না? পত্রপত্রিকায় হইচই শুরু হয়ে যাবে না? ফ্রেড লিস্টার একটা জিনিসকে খুব ভয় পায়—সেটা হচ্ছে খবরের কাগজ।”

“আপনার কথা যেন সত্যি হয়।” নিশীতা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, “কিন্তু কেন জানি পুরো ব্যাপারটি নিয়ে আমার কেমন ভয় ভয় করছে। আমার মনে হচ্ছে এর মাঝে খুব বড় একটা অশুভ ব্যাপার রয়েছে।”

AMARBOI.COM

রিয়াজ আর নিশীতা দেয়ালে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। এ রকম পরিবেশে ক্ষুধা–তৃষ্ণার অনুভূতি থাকার কথা নয়, কিন্তু দুজনেই বেশ অবাক হয়ে আবিষ্কার করল তাদের বেশ খিদে পেয়েছে। রাত দশটার দিকে একজন গোমড়ামুখো আমেরিকান মানুষ এসে তাদের কিছু খাবার দিয়ে গেল। খাবারগুলো পশ্চিমা খাবার, খুব সম্ভ্রান্ত রেস্টুরেন্ট থেকে আনা হয়েছে—দুজনে বেশ গোগ্রাসে খাওয়া শেষ করল। এ রকম সময়ে ঘরের দরজা দ্বিতীয়বার খুলে গেল এবং দেখা গেল সেখানে ফ্রেড লিস্টার দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রেড লিস্টারের পিছনে আরো দুজন পাহাড়ের মতো আমেরিকান মানুষ, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা দেখে মনে হয় মেরিন বা কমান্ডো জাতীয় কিছু। মানুষগুলো প্রকাশ্যেই স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে ঘুরছে। ফ্রেড লিস্টার মুখে একটা হাসি ফুটিয়ে বলল, “রিয়াজ, পুরোনো বন্ধু আমার, তোমাকে আর তোমার গার্লফ্রেন্ডকে দেখতে আসতে দেরি হয়ে গেল। আমি খুবই দুঃখিত। তবে—” ফ্রেড লিস্টার নোংরা একটা ভঙ্গি করে চোখ টিপে বলল, “আমি সবাইকে বলে দিয়েছিলাম কেউ যেন তোমাদের ডিস্টার্ব না করে।” কথা শেষ করে সে বিকট স্বরে হাসতে শুরু করে।

রিয়াজ ফ্রেড লিস্টারের হাসি শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল, তারপর বলল, “তুমি আমাদের ধরে এনেছ কেন?”

“তোমরা বুদ্ধিমান মানুষ—এখনো সেটা বুঝতে পার নি?”

“তুমি আমাদেরকে যত বুদ্ধিমান ভাব, আমরা তত বুদ্ধিমান নই।”

ফ্রেড আবার সহৃদয় ভঙ্গিতে হেসে বলল, “তোমাদের দুজনকে এখানে নিয়ে এসেছি যেন প্রজেক্ট নেবুলার কোনো সমস্যা না হয়।”

"প্রজেক্ট নেবুলা?"

"হ্যাঁ" ফ্রেড ঘরের মেঝেতে পুরোনো বন্ধুর মতো সহজ ভঙ্গিতে বসে বলল, "হ্যাঁ, আমরা নাম দিয়েছিলাম প্রজেক্ট নেবুলা, কারণ এটা শুরু হয়েছিল খুব কাছাকাছি একটা ছোটখাটো নেবুলা থেকে।" ফ্রেড রিয়াজ হাসানের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি চলে আসার পরপরই আমরা প্রথম মহাজাগতিক একটা সঙ্কেত পেয়েছিলাম।"

রিয়াজ সোজা হয়ে বসে বলল, "সত্যি?"

"হ্যাঁ সত্যি। এটা খুব গোপন খবর, সারা পৃথিবীতে সব মিলিয়ে ডজনখানেক মানুষের বেশি জানে না।"

রিয়াজ কোনো কথা না বলে চুপ করে ফ্রেডের দিকে তাকিয়ে রইল, ফ্রেড মাথা নেড়ে বলল, "অত্যন্ত কঠিন একটা সিদ্ধান্ত ছিল সেটি।"

"কোনটি?"

"চতুর্থ মাত্রার বুদ্ধিমত্তার একটি প্রাণীকে পৃথিবীতে ডেকে আনা।"

রিয়াজ চিৎকার করে বলল, "তোমরা চতুর্থ মাত্রার প্রাণীকে পৃথিবীতে ডেকে এনেছ? তোমরা কি উন্মাদ?"

"আমাদের কোনো উপায় ছিল না।"

"কী বলছ তুমি? কিসের উপায় ছিল না?"

ফ্রেড একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "দেশের অর্থনীতিতে মন্দাভাব এসে গেছে, দেখা যাচ্ছে দক্ষিণ এশিয়া অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে—আমাদের এটা থামানো দরকার। নতুন একটা টেকনোলজি দরকার। একেবারে নতুন—যেটা পৃথিবীতে নেই।"

"নতুন একটা টেকনোলজির জন্য তুমি চতুর্থ মাত্রার একটা প্রাণীকে পৃথিবীতে ডেকে এনেছ? মানুষ কত বড় নির্বোধ হলে এ রকম একটি কাজ করে?"

ফ্রেড মুখে হাসি ফুটিয়ে রিয়াজের দিকে তাকিয়ে বলল, "যখন ভালোয় ভালোয় সব শেষ হয়ে যাবে, মহাজাগতিক প্রাণী আমাদেরকে টেকনোলজি দিয়ে তাদের গ্যালাক্সিতে ফিরে যাবে তখন আমাকে কেউ নির্বোধ বলবে না।"

"তোমরা কি যোগাযোগ করতে পেরেছ?"

"হ্যাঁ পেরেছি। তোমার কোড ব্যবহার করে আজকে আমরা প্রথমবার মহাজাগতিক প্রাণীর সাথে যোগাযোগ করেছি।" ফ্রেড কেমন জানি একটু শিউরে উঠে বলল, "তুমি চিন্তা করতে পারবে না ব্যাপারটি কেমন ভয়ঙ্কর।"

রিয়াজ একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "আমি খুব ভালো করে জানি এটা কত ভয়ঙ্কর। তোমাকে নিশ্চয়ই অনুমতি দেওয়া হয় নি, তুমি অনুমতি ছাড়াই এটা করেছ?"

"হ্যাঁ।"

"সেজন্য তুমি বাংলাদেশের কো-অর্ডিনেট দিয়েছ যদি ভালোয় ভালোয় যোগাযোগ করা না যায়—নিউক্লিয়ার বোমা দিয়ে ধ্বংস করে দেবে?"

"হ্যাঁ। এর মাঝে নিউক্লিয়ার মিসাইল এখানে টার্গেট করে ফেলা হয়েছে।"

রিয়াজ বিস্ফারিত চোখে ফ্রেডের দিকে তাকিয়ে রইল, খানিকক্ষণ চেষ্টা করে বলল, "পৃথিবীতে জনবসতিহীন কত জায়গা রয়েছে—সাহারা মরুভূমি, এন্টার্কটিকা, আন্দ্রিজ পর্বতমালা ওসব ছেড়ে তোমরা এ রকম ঘনবসতি একটা লোকালয় কেন বেছে নিলে?"

"তার কারণ প্রাণীটি জনবসতিহীন জায়গায় যেতে চাইছিল না। এটি মানুষের কাছাকাছি আসতে চাইছিল।"

"কেন?"

"কারণ মানুষকে ব্যবহার করে সে বিচরণ করতে চায়।"

রিয়াজ আর্তচিৎকার করে উঠল, বুকের মাঝে আটকে থাকা একটা নিশ্বাস বের করে দিয়ে বলল, "মহাজাগতিক প্রাণী কি সেটা করতে পেরেছে?"

ফ্রেড মাথা নাড়ল। বলল, "হ্যাঁ। সেটা মানুষের শরীরকে ব্যবহার করে কিছু চলাচল করেছে। সীমিতভাবে—কিন্তু করেছে।"

"যার অর্থ পৃথিবীর মানুষ এখন এই মহাজাগতিক প্রাণীর দয়ার ওপর নির্ভর করছে। এটি যদি আমাদের পৃথিবী দখল করে নিতে চায় তা হলে দখল করে নেবে?"

ফ্রেড কোনো কথা না বলে তার হাতের তালুর দিকে তাকিয়ে রইল। রিয়াজ চাপা স্বরে চিৎকার করে বলল, "নির্বোধ আহাম্মক কোথাকার।"

ফ্রেড খুব ধীরে ধীরে রিয়াজের দিকে তাকিয়ে বলল, "এই মহাজাগতিক প্রাণী যখন তার টেকনোলজি আমার হাতে দিয়ে ফিরে যাবে তখন কেউ আমাকে নির্বোধ বলবে না।"

"তোমাকে সে কোন টেকনোলজি দেবে?"

"তাদের স্পেসশিপের আবরণটি যেটি দিয়ে তৈরি সেটা হলেই আর কিছু প্রয়োজন নেই। আমি ইঞ্জিনটার প্রক্রিয়াটাও পাওয়ার চেষ্টা করছি।"

"যদি না পাও?"

"না পেলে নাই। পৃথিবীতে যারা ঝুঁকি নেয় না তারা কোনো কিছু অর্জন করতে পারে না।"

রিয়াজ হিংস্র গলায় বলল, "মানুষ নিজের জীবনকে দিয়ে ঝুঁকি নিতে পারে—তুমি নিয়েছ অন্যের জীবনকে নিয়ে।"

"প্রজেক্ট নেবুলা অনেক বড় প্রজেক্ট। পৃথিবীর কিছু মানুষ বা অনেক মানুষের জীবনের এখানে কোনো মূল্য নেই।"

"তুমি কি মনে কর তোমার এই কাজকর্মকে ক্ষমা করা হবে?"

"প্রজেক্ট নেবুলার ভিতরের কথা খুব বেশি মানুষ জানে না। তোমরা দুজন জান। তোমাদের এই প্রজেক্টের কথা জানাতে আমার কোনো আপত্তি নেই।"

রিয়াজ ভুরু কুঁচকে বলল, "কেন আমাদের জানাতে আপত্তি নেই।"

"পুরো যোগাযোগটা করা হয়েছে তোমার কোড ব্যবহার করে—তোমার এটা জানার একটা নৈতিক অধিকার আছে।"

"এটাই কি একমাত্র কারণ?"

ফ্রেড একটা নিশ্বাস ফেলে অন্যদিকে তাকাল, বলল, "না, অন্য কারণ আছে।"

"কী কারণ?"

ফ্রেড তার হাতের বড় ম্যানিলা এনভেলপটি রিয়াজের দিকে এগিয়ে দেয়, বলে, "দেখ।"

রিয়াজ এনভেলপটি খুলে চমকে উঠল। ভিতরে তার এবং নিশীতার খুব অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে বসে থাকার ছবি। কোনো একটি রেস্টুরেন্টে বসে দুজনে খাচ্ছে, সামনে বিয়ারের বোতল। রিয়াজ ছবিগুলো দেখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ফ্রেডের দিকে তাকাল, জিজ্ঞেস করল, "এগুলো কী?"

"তোমাদের ছবি। এডবি ফটোশপ দিয়ে তৈরি করেছি।"

"কেন তৈরি করেছ?"

"কারণ আজ রাতে তোমার গার্লফ্রেন্ড যখন তোমাকে মোটর সাইকেলে করে নিয়ে যাবে তখন আশুলিয়ার কাছে খুব খারাপভাবে অ্যাকসিডেন্ট করবে। তোমরা দুজনেই সাথে সাথে মারা যাবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিয়াজ এবং নিশীতা চমকে উঠল, বলল, "কী বলছ তুমি?"

"হ্যাঁ। তোমরা প্রজেক্ট নেবুলার ভিতরের খবর জান। তোমরা বেঁচে থাকলে আমার খুব সমস্যা। তোমাদের বেঁচে থাকা চলবে না।"

রিয়াজ এবং নিশীতা বিস্ফারিত চোখে ফ্রেডের দিকে তাকিয়ে রইল, ফ্রেড একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "অ্যাকসিডেন্টের পর যখন তোমাদের ডেড বডি পাওয়া যাবে তখন এই ছবিগুলো আমরা রিলিজ করব। সবাই দেখবে তোমরা গভীর রাত পর্যন্ত ফুর্তি করেছ, মদ খেয়ে পুরোপুরি মাতাল হয়ে মোটর সাইকেল চালাতে চেষ্টা করেছ—তোমাদের অ্যাকসিডেন্ট না হলে কার হবে?"

নিশীতা নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না—অবাক হয়ে ফ্রেডের ভাবলেশহীন মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ফ্রেড অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বলল, "পোস্টমর্টেম করে দেখলেও কোনো গরমিল পাবে না। তোমাদের শরীরে এলকোহলের পার্সেন্টেজ থাকবে খুব বেশি। আমরাই ইনজেক্ট করে দেব।"

"কেন?" রিয়াজ শুকনো গলায় বলল, "কেন তোমরা এটা করতে চাইছ?"

ফ্রেড উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমাদের কোনো উপায় নেই। সারা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ এর সাথে জড়িত, এখানে কোনো ঝুঁকি নেওয়া যায় না। এত বড় প্রজেক্টে আমি কোনো ঝুঁকি নিতে পারি না রিয়াজ।"

রিয়াজ চিৎকার করে ফ্রেডের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছিল কিন্তু সাথে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ দুজন সামনে এগিয়ে এসে তাকে ধরে ফেলল। একজন তাকে আঘাত করতে হাত উপরে তুলতেই ফ্রেড তাকে থামাল, বলল, "না, ওর গায়ে হাত দিও না। আজ রাতের অ্যাকসিডেন্টের আঘাত ছাড়া শরীরে অন্য কোনো আঘাত থাকা চলবে না।"

রিয়াজকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে ফ্রেড তার দুজন বডিগার্ডকে নিয়ে বের হয়ে গেল।

নিশীতা বিস্ফারিত চোখে রিয়াজের দিকে তাকিয়ে থাকে। সে এখনো বিশ্বাস করতে পারছে না যে আর কয়েক ঘণ্টার মাঝে খুব সুপরিকল্পিতভাবে তাদের হত্যা করা হবে।

AMARBOI.COM

৮

নিশীতা ঘরের দেয়ালে হেলান দিয়ে চুপচাপ বসে আছে, রিয়াজ এক ধরনের অস্থিরতা নিয়ে ঘরের মাঝে পায়চারি করছে। ঘরের একমাথা থেকে অন্য মাথায় হেঁটে রিয়াজ ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে নিশীতার দিকে তাকাল। নিশীতা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "আমি একটা জিনিস কিছুতেই বুঝতে পারছি না।"

"কী জিনিস?"

"মনে আছে আপনি বলেছিলেন এপসিলন আসলে খুব সহজ একটা প্রোগ্রাম? প্রশ্নের উত্তর দেয় প্রশ্ন করে?"

"হ্যাঁ।"

কিন্তু সেটা তো আর সহজ প্রোগ্রাম হিসেবে থাকে নি। সেটা অত্যন্ত দক্ষ একটা প্রোগ্রাম হয়ে গেল—এত দক্ষ যে আমাকে সেলুলার ফোনে যোগাযোগ করে সতর্ক পর্যন্ত করে দিল।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ। আমি লক্ষ করেছি।"

"সেটা কীভাবে সমম্ভব? সহজ একটা প্রোগ্রাম কেমন করে নিজ থেকে এত জটিল হয়ে যেতে পারে?"

রিয়াজ হাসান মাথা নাড়ল, বলল, "পারে না।"

"তা হলে কী হয়েছে?"

"ব্যাপারটা নিয়ে আমিও খুব বিভ্রান্তির মাঝে ছিলাম—ফ্রেডের কথা শুনে এখন আমি ব্যাপারটা খানিকটা আন্দাজ করতে পারছি।"

"কী আন্দাজ করতে পেরেছেন?"

"এখানে মহাজাগতিক প্রাণী পৌঁছানোর পর আমি আমার বাসায় যোগাযোগ করার কোডটি চালু করেছিলাম মনে আছে?"

"হ্যাঁ, মনে আছে।"

"সেই কোডটি মহাজাগতিক প্রাণীর পরিপূরককে নিয়ে আসছে।"

নিশীতা মাথা নাড়ল, বলল, "আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। পরিপূরক মানে কী?"

রিয়াজ বলল, "ব্যাপারটি জটিল, বলা যেতে পারে ব্যাপারটি একটি দার্শনিক ব্যাপার।"

নিশীতা হাসার চেষ্টা করে বলল, "ঘণ্টা দুয়েক পর মারা যাবার আগে মনে হয় দর্শন নিয়ে কথা বলাই সহজ।"

"হ্যাঁ ঠিকই বলেছ। আমি দেখি তোমাকে বোঝাতে পারি কি না। বুদ্ধিমত্তার গোড়ার কথা হচ্ছে এর মাঝে এক ধরনের সামঞ্জস্য থাকবে। ভালো-মন্দ খুব আপেক্ষিক কিন্তু বুদ্ধিমত্তার মাঝে যদি ভালো-মন্দ থাকে তা হলে তার মাঝে সামঞ্জস্য থাকবে। মোট কথা, ফ্রেডের মতো যদি পাজি মানুষের জন্ম হয় তা হলে তোমার মতো একজন ভালো মানুষেরও জন্ম হতে হবে। হিটলারের মতো দানবের জন্ম হলে মাদার তেরেসার মতো মহৎ মানুষের জন্ম হতে হবে।

"চতুর্থ মাত্রার বুদ্ধিবৃত্তির জন্যও সেটা সত্যি। এর মাঝে যদি অশুভ অংশ থাকে তা হলে শুভ অংশ থাকতে হবে। ফ্রেড যে বর্ণনা দিয়েছে সেটি একেবারে খাঁটি অশুভ অংশ—কাজেই আমার ধারণা আমাদের আশপাশে তার পরিপূরক শুভ অংশটিও আছে। সেটাই এপসিলন ব্যবহার করে তোমার সাথে যোগাযোগ করছে। আমার সাথে যোগাযোগ করছে।

নিশীতা বলল, "তার মানে পৃথিবীতে একটি মহাজাগতিক প্রাণী আসে নি—দুটি প্রাণী এসেছে। একটি ভালো একটি খারাপ? খারাপটি ফ্রেডের সাথে ভালোটি আমাদের সাথে?"

রিয়াজ মাথা নেড়ে বলল, "চতুর্থ মাত্রার প্রাণীর জন্য এত সহজে বলা যায় না।"

"কেন বলা যায় না?"

"মানুষের কথা ধরা যাক। আমাদের সবার মাঝে কি খানিকটা অশুভ খানিকটা শুভ অংশ নেই? তা হলে কোনটা সত্যি—শুভ অংশটুকু নাকি অশুভ অংশটুকু? একজন মানুষ কি প্রাণের ইউনিট নাকি পুরো মানবজাতি প্রাণের ইউনিট? নাকি আমাদের শরীরের এক একটি কোষ এক একটি প্রাণ? তুমি ব্যাপারটা কীভাবে দেখতে চাও তার ওপর সেটা নির্ভর করে। মানুষ যদি চতুর্থ মাত্রার বুদ্ধিমত্তায় পৌঁছায় তা হলে কীভাবে দেখা হচ্ছে ব্যাপারটি তার ওপর আর নির্ভর করবে না। এখানেও তাই—এই প্রাণীর বুদ্ধিমত্তার শুভ-অশুভ অংশ আছে—সেটি একই প্রাণী না ভিন্ন প্রাণী আমরা আর সেই প্রশ্ন করতে পারি না।"

নিশীতা মাথা নেড়ে বলল, "আপনার কথা শুনে প্রথমে মনে হয়েছিল খানিকটা বুঝেছি, কিন্তু ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার পর আর কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"আমি দুঃখিত—"

"আপনার দুঃখিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। আপনি আমার সহজ একটা প্রশ্নের উত্তর দেন। মহাজাগতিক প্রাণীর শুভ অংশটুকু আমাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য ডিজিটাল ইলেট্রনিক্স, কম্পিউটার, সেলুলার ফোন, রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি এইসব তুচ্ছ সহজ জিনিস বেছে নিয়েছে। এপসিলন প্রোগ্রামটা সে ব্যবহার করছে।"

"হ্যাঁ। সেটাই আমার ধারণা।"

"সেটাই যদি সত্যি হবে তা হলে যখন আমাদের সবচেয়ে বিপদ তখন সে আমাদের সাথে যোগাযোগ করছে না কেন?"

"কীভাবে করবে?"

"আমার সেলুলার ফোন দিয়ে।"

"তোমার সেলুলার ফোনে ব্যাটারির চার্জ নেই।"

"যে প্রাণী অন্য গ্যালাক্সি থেকে এখানে চলে আসতে পারে সে একটা ব্যাটারি নিজে চার্জ করতে পারে না আমি সেটা বিশ্বাস করি না।"

রিয়াজ ঘরের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ। প্রাণীটার এখন আমাদের সাথে যোগাযোগ করার কথা।"

নিশীতা তার ব্যাগ খুলে তার সেলুলার ফোনটা হাতে নিয়ে কয়েকবার নেড়েচেড়ে দেখল, কানে লাগিয়ে বৃথাই কিছু শোনার চেষ্টা করল। নম্বরের বোতামগুলো ইতস্তত চাপ দিয়ে শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে মেঝেতে রেখে দিল। হঠাৎ সে সবিস্ময়ে দেখল সেলুলার ফোনটির আলো জ্বলে উঠে রিং করতে শুরু করেছে। নিশীতা আনন্দে চিৎকার করে রিয়াজের দিকে তাকাল, রিয়াজ নিশীতার কাছে ছুটে আসে। নিশ্বাস বন্ধ করে বলল, "তুলে নাও, নিশীতা কথা বল।"

নিশীতা কাঁপা হাতে টেলিফোনটা তুলে নিয়ে বলল, "হ্যালো।"

"কে? নিশীতা?"

"হ্যাঁ। আমি নিশীতা।"

"তোমাদের অনেক বড় বিপদ নিশীতা।"

"আমরা জানি—কিন্তু বিপদ থেকে উদ্ধারের একটা ব্যবস্থা করবে না?"

"তোমাদের সভ্যতার মাঝে আমার প্রবেশ করার কথা নয়। তাই তোমাদের টেকনোলজি ব্যবহার করে তোমাদের সাথে তোমাদের মতো করে দু একটি কথা বলতে পারি, এর বেশি কিছু নয়।"

"কিন্তু সেটি হলে তো হবে না। তুমি তো জান ফ্রেড লিস্টার আমাদের মেরে ফেলবে।"

"হ্যাঁ জানি।"

"তা হলে আমাদের এখান থেকে বের করে নিয়ে যাও।"

"কীভাবে?"

"সেটা আমি কীভাবে বলব? আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যাও। কিংবা ভাসিয়ে নিয়ে যাও, কিংবা টেলিট্রান্সপোর্ট করে নিয়ে যাও।"

টেলিফোনের অন্যপাশ থেকে হাসির মতো এক ধরনের শব্দ হল, এপসিলনের স্বর বলল, "আমার পক্ষে অবাস্তব কিছু করার ক্ষমতা নেই। আমি তোমাদের সভ্যতাকে স্পর্শ করতে পারব না।"

নিশীতা গলায় জোর দিয়ে বলল, "সেটা বললে তো হবে না। তোমাদের অশুভ অংশ

AMARBOI.COM

এসে মানুষের শরীরের ভিতরে ঢুকে মানুষকে ব্যবহার করতে শুরু করেছে, আর তুমি আমাদের প্রাণটাও বাঁচাবে না? তোমার কি পৃথিবীর জন্য কোনো দায়দায়িত্ব নেই?"

"আছে বলেই তো আমি কাছাকাছি আছি।"

"শুধু থাকলে হবে না, কিন্তু একটা কিছু কর। আমাদের এখান থেকে বের করে দাও।"

টেলিফোনে কিছুক্ষণ নীরবতা থাকার পর আবার এপসিলনের গলা শোনা গেল, "আমি তোমাদের কিছু তথ্য দিতে পারি, এর বেশি কিছু করতে পারব না। বাকি কাজটুকু তোমাদের করতে হবে।"

"কী তথ্য?"

"তোমাদের এই ঘরটির উপরে যে সিলিংটি দেখছ—সেটি হালকা প্লাইউডের। মাঝামাঝি জায়গায় একটা ডাক্ট আছে— সেখান দিয়ে এই বিল্ডিঙের যাবতীয় ইলেকট্রিক তার গিয়েছে। এই ডাক্টটি দিয়ে কিছুদূর এগিয়ে গেলে তোমরা কাছাকাছি একটা ঘরে বের হতে পারবে। সেখান থেকে দরজা খুলে বের হয়ে যেতে পারবে।"

নিশীতা উপরের দিকে তাকাল, সিলিংটি বেশি উঁচু নয়, আধুনিক বিল্ডিঙে জায়গা বাঁচানোর জন্য বিল্ডিংগুলো বেশি উঁচু করা হয় না। একজনের কাঁধে আরেকজন দাঁড়িয়ে মনে হয় সিলিংটা পর্যন্ত যাওয়া যাবে। নিশীতা বলল, "ঠিক আছে ধরে নিলাম আমরা বিল্ডিং থেকে বের হলাম, কিন্তু তারপর আর কোনো গেট নেই?"

"আছে।"

"সেখানে দারোয়ান নেই? গার্ড নেই?"

"আছে।"

"সেখান থেকে কীভাবে বের হব?"

"বাইরে গ্যারেজে কয়েকটা গাড়ি রয়েছে। কোনো একটা ড্রাইভ করে নিয়ে যেতে পার। এখানকার গাড়ি হলে গেটে আটকাবে না। আর যদি আটকায় তোমাদের সেরকম কিছু একটা করতে হবে।"

AMARBOI.COM

"কিন্তু।"

"কিন্তু কী?"

"আমি গাড়ি ড্রাইভিং জানি না।"

রিয়াজ বলল, "আমি জানি। তবে গাড়ি চালিয়েছি আমেরিকাতে, রাস্তার ডানদিক দিয়ে।"

নিশীতা বলল, "এখন ডান বামের সময় নেই! ইঞ্জিন স্টার্ট করে গাড়িটাকে মোটামুটিভাবে নাড়াতে পারলেই হবে।"

"কিন্তু গাড়ির চাবি? চাবি ছাড়া স্টার্ট করব কেমন করে?"

"হট ওয়ার করে।"

রিয়াজ মাথা চুলকে বলল, "আমি কখনো করি নি।"

সেলুলার টেলিফোনে এপসিলন বলল, "আমি বলে দেব।"

"চমৎকার! এখন তা হলে কাজ শুরু করে দেওয়া যাক।"

সাথে সাথে নিশীতার সেলুলার টেলিফোনটি নীরব হয়ে গেল।

নিশীতা রিয়াজের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি আমাকে ঘাড়ে নিতে পারবেন?"

"মনে হয় পারব।"

"সিলিংটা ধরার জন্য আপনার ঘাড়ে আমাকে দাঁড়াতে হবে।"

"হ্যাঁ। সার্কাসে এ রকম করতে দেখেছি। তুমি কি পারবে?"

"পারতে হবে।"

"ব্যালান্সের একটা ব্যাপার আছে।"

"দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে শুরু করব যেন দেয়াল ধরে ব্যালান্স করতে পারি। একবার দাঁড়িয়ে সিলিংটা ছোঁয়ার পর আপনি ঘরের মাঝখানে যাবেন।"

রিয়াজ চিন্তিত মুখে বলল, "ধরা যাক তুমি হাঁচড়-পাঁচড় করে কোনোভাবে উঠে গেলে। কিন্তু আমি কীভাবে উঠব?"

নিশীতা চারদিকে তাকাল, এই ঘরে কোনো আসবাবপত্র নেই। শুধুমাত্র মেঝেতে একটা কম্বল বিছিয়ে রাখা হয়েছে, সেখানে নিশীতাকে শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল। কম্বলটার দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ নিশীতার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বলল, "কম্বলটা উপর থেকে আটকে দিতে পারলে আপনি এটা ধরে উঠতে পারবেন না?"

রিয়াজ দুর্বলভাবে হাসল, বলল, "কখনো কম্বল ধরে কোথাও উঠি নি।"

নিশীতা চোখ বড় বড় করে বলল, মাঝে মাঝে কয়েক জায়গায় ফুটো করে দেওয়া যাক, তা হলে ফুটোয় হাত ঢুকিয়ে ধরতে পারবেন। আর একবার উপরে উঠতে পারলে আমিও আপনাকে টেনে তুলব।"

"তুমি?"

"হ্যাঁ—আমাকে আপনি যত দুর্বল ভাবছেন, আমি তত দুর্বল নই!"

"শুনে খুশি হলাম—" রিয়াজ দুর্বলভাবে হেসে বলল, "আর আমাকে তুমি যত শক্তিশালী ভাবছ আমি তত শক্তিশালী নই!"

"সেটা দেখা যাবে। যখন প্রাণ বাঁচাতে হয় তখন নাকি শরীরে অসুরের শক্তি এসে যায়।"

কম্বলের মাঝে কয়েকটা ফুটো করার জন্য কোথাও ধারালো কিছু পাওয়া গেল না। হাতে কম্বল পেঁচিয়ে আঘাত করে তখন জানালার কাচ ভেঙে সেখান থেকে একটা ধারালো কাচ বের করে আনা হল। সেটা দিয়ে খুঁচিয়ে কম্বলে কয়েকটা ফুটো করা হল। চাকুর মতো একটা কাচের টুকরোকে নিশীতা তার ব্যাগে রেখে দিল—ভবিষ্যতে কী প্রয়োজন হতে পারে কে জানে!

রিয়াজ ঘরের দেয়াল ধরে হাঁটু গেড়ে বসল। নিশীতা রিয়াজের ঘাড়ে উঠে দাঁড়াল। রিয়াজ তখন সাবধানে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। নিশীতা দেয়াল ধরে নিজের ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করে, রিয়াজ পুরোপুরি সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পর নিশীতা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "আমার ওজন কি খুব বেশি?"

রিয়াজ বলল, "না বেশি নয়। তবে তোমাকে দেখতে যেরকম হালকাপাতলা দেখায় ঘাড়ের উপর দাঁড়ানোর পর সেরকম মনে হচ্ছে না।"

রিয়াজ সামনে অগ্রসর হতে থাকে, নিশীতা সিলিং ধরে ভারসাম্য বজায় রেখে বলল, "আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি যদি এই গাড্ডা থেকে বের হতে পারি তা হলে ডায়েটিং করে ওজন পাঁচ কেজি কমিয়ে ফেলব।"

"তার প্রয়োজন নেই নিশীতা। এখান থেকে যদি বের হতে পারি তা হলে তোমাকে ঘাড়ে নিয়ে আমাকে আর হাঁটাহাঁটি করতে হবে না।"

"তা ঠিক।" নিশীতা সিলিংটা হাত দিয়ে উপরে ঠেলে আলাদা করে ভিতরে মাথা ঢুকিয়ে দেখল, এপসিলন ঠিকই বলেছে, একটা বড় ডাক্ট সিলিঙের উপর দিয়ে চলে গেছে। নিশীতা রিয়াজকে বলল, "এখন আপনাকে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে হবে। আমি উপরে উঠছি।"

"গুডলাক নিশীতা।"

সিলিঙে উঠতে যত কষ্ট হবে মনে হয়েছিল নিশীতা তার থেকে অনেক সহজে উঠে গেল। রিয়াজ নিচে থেকে তার পা ধরে উপরে ধাক্কা দিয়ে সাহায্য করায় ব্যাপারটি বেশ সহজ হয়ে গেল। নিশীতা সিলিঙে লোহার বিমগুলোতে পা ঝুলিয়ে বসে বলল, "ভাগ্যিস আমি শাড়ি পরে আসি নি।"

"শাড়ি পরে এলে কী হত?"

"শাড়ি পরলে সিলিং বেয়ে ওঠা হয়তো এত সহজ হত না—"

"কিন্তু মেয়েদের জন্য শাড়ি থেকে সুন্দর কোনো পোশাক নেই।"

"যদি কখনো এই গাড্ডা থেকে বের হতে পারি তা হলে আমি একদিন শাড়ি পরে আপনার সাথে দেখা করতে আসব। আপনার কাছে প্রমাণ করিয়ে যাব যে আমি শাড়িও পরতে পারি।"

"চমৎকার!" রিয়াজ বলল, "তখন আমার কি বিশেষ কিছু করতে হবে?"

"না। আপনাকে কিছু করতে হবে না। আমার সাথে পরিচয় হওয়ার কারণে আপনার জীবনে যেসব ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটতে শুরু করেছে সেদিন আপনার কাছ থেকে সে জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চাইতে পারি।"

নিশীতা উপর থেকে কম্বলটা একটা লোহার বীমের সাথে বেঁধে ঝুলিয়ে দিল। রিয়াজ কম্বলটা ধরে উপরে ওঠার চেষ্টা করতে করতে বলল, "আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা কি তুমি চাইবে না আমি চাইব? বিষফোড়া ফ্রেড লিস্টার তো তোমার বন্ধু নয়—আমার বন্ধু।"

নিশীতা নিচু হয়ে হাত বাড়িয়ে রিয়াজকে ধরে ফেলে উপরে টেনে তোলার চেষ্টা করতে লাগল, দুজনে প্রায় জড়াজড়ি করে কোনোমতে উপরে এসে হাজির হল। নিশীতা হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল, রিয়াজ একটু অবাক হয়ে বলল, "কী হল? হাসছ কেন?"

"ফ্রেড লিস্টার এখন আমাদের দেখলে খুব খুশি হত। ব্যাটা ধড়িবাজ কত কষ্ট করে কম্পিউটার দিয়ে আমাদের দুজনের ছবি তৈরি করেছে! এখন আমরা নিজেরাই একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরে টানাটানি করছি! শুধু দরকার একজন ক্যামেরাম্যান!"

রিয়াজ হাসিতে যোগ দিয়ে বলল, "না নিশীতা। তুমি একটা ব্যাপার মিস করে গিয়েছ। সে কম্পিউটার দিয়ে ছবিতে যে জিনিসটা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে সেটা হচ্ছে রোমান্স। আর একটু আগে তুমি যেভাবে আমার শার্টের কলার ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে তুলে এনেছ তার মাঝে আর যাই থাকুক, কোনো রোমান্স নেই!"

"বোঝা যাচ্ছে আপনি হিন্দি সিনেমা দেখেন না।"

"কেন?"

"দেখলে বুঝতেন রোমান্স আজকাল কত জায়গায় গিয়েছে। সেই আগের যুগের মিষ্টি গলায় গান গাওয়ার রোমান্স আর নেই। এখন খুন জখম মারপিট ছাড়া রোমান্স হয় না।"

দুজনে মিলে প্লাইউডের সিলিং প্যানেলটা জায়গামতো বসিয়ে দিতেই ভিতরে অন্ধকার হয়ে এল। এখন এই ডাক্টের ভিতর দিয়ে গুড়ি মেরে তাদের এগিয়ে যেতে হবে। প্রথম নিশীতা এবং তার পিছু পিছু রিয়াজ এগিয়ে যেতে থাকে। সোজা বেশ খানিকদূর এগিয়ে গিয়ে নিশীতা একটা সিলিং প্যানেল তুলে ভিতরে উঁকি দিল। নিচে একটা বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিল ঘিরে বেশ কয়েকজন আমেরিকান বসে আছে। টেবিলের উপর একটা বড় ম্যাপ, ম্যাপের উপরে নানা জায়গায় ছোট ছোট ফ্ল্যাগ লাগানো। সিলিং প্যানেলটা সাবধানে আগের

জায়গায় বসিয়ে তারা গুড়ি মেরে নিঃশব্দে আরো সাবধানে এগিয়ে যেতে থাকে। খুব কাছেই কোনো একটা জায়গা থেকে একটা বড় ফ্যানের শব্দ আসছে—সম্ভবত এই বিল্ডিঙের কোনো একটি এক্সহস্ট ফ্যান। এর কাছাকাছি পৌঁছানোর সাথে সাথে টেলিফোনটি বেজে উঠল। নিশীতা টেলিফোনটি কানে ধরতেই এপসিলনের কথা শুনতে পেল, "নিশীতা?"

"হ্যাঁ, কথা বলছি।"

"আমি এখন তোমাদের কোনদিক যেতে হবে বলব, তোমার কোনো কথা বলার প্রয়োজন নেই, কারণ তোমরা এখন যে ঘরটির উপর দিয়ে যাচ্ছ সেখানে সিকিউরিটির অনেকগুলো মানুষ।"

নিশীতা কোনো কথা বলল না। এপসিলন বলল, "তোমাদের একটু তাড়াতাড়ি যেতে হবে, কারণ কিছুক্ষণের মধ্যেই ফ্রেড লিস্টার তোমাদের ঘরে যাবে, সেখানে তোমাদের না দেখেই খোঁজাখুঁজি শুরু করবে।"

নিশীতা ফিসফিস করে বলল, "ঠিক আছে।"

"এখন সোজা যেতে থাক। সামনে গিয়ে ডানদিকে ঘুরে যাও।"

নিশীতা আর রিয়াজ সামনে গিয়ে ডানদিকে ঘুরে গেল।

"এবারে সোজা সামনে এগিয়ে যাও। সামনে একটা গোল গর্ত রয়েছে, সেদিক দিয়ে নিচে নেমে যাবে।"

নিশীতা আর রিয়াজ সামনে গিয়ে গোল গর্তটা দিয়ে নিচে নেমে গেল। গর্তের ভিতরে রাজ্যের জঞ্জাল, মাকড়সার জাল এবং নানারকম পোকামাকড়। এসব ব্যাপার নিয়ে এখন মাথা ঘামানোর সময় নেই।

সেলুলার ফোন বলল, "সোজা সামনে গিয়ে সিলিং প্যানেলটা তুলে নিচে লাফিয়ে পড়। এই ঘরে কেউ নেই।"

ফোনের নির্দেশকে অন্ধের মতো অনুসরণ করে তারা ঘরের মাঝে লাফিয়ে পড়ল।

"দরজা খুলে বের হয়ে ডান দিকে যাও।"

নিশীতা আর রিয়াজ ঘর থেকে বের হয়ে ডানদিকে গেল।

"সাবধান! সামনে দিয়ে দুজন আসছে, বাম পাশের পিলারের পিছনে লুকিয়ে পড়।"

নিশীতা আর রিয়াজ দ্রুত পিলারের পিছনে লুকিয়ে পড়ল। দেখতে পেল স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নিয়ে দুজন আমেরিকান হেঁটে গেল।

"এবারে তোমাদের দশ সেকেন্ড সময় পুরো করিডোরের একমাথা থেকে অন্য মাথায় যাবার জন্য। শুরু কর—"

নিশীতা আর রিয়াজ নিশ্বাস বন্ধ করে শেষ মাথা পর্যন্ত ছুটে গেল।

"চমৎকার। দরজার পাশে টেবিলের পিছনে দুই মিনিট লুকিয়ে থাক, এই দরজা দিয়ে কিছু মানুষ যাবে এবং আসবে।

নিশীতা আর রিয়াজ টেবিলের পিছনে লুকিয়ে থেকে টের পেল বেশ কিছু মানুষ ব্যস্ত পায়ে হাঁটাহাঁটি করছে।

"তোমরা দৌড়ানোর জন্য প্রস্তুত হও। মাত্র তিন সেকেন্ডের মধ্যে নিঃশব্দে দরজা খুলে বাইরে গিয়ে ডান দিকে লাফিয়ে পড়বে। ফুল গাছগুলোর পিছনে লুকিয়ে থাকবে। মনে থাকে যেন তিন সেকেন্ড সময়।"

নিশীতা আর রিয়াজ নিশ্বাস বন্ধ করে বসে রইল।

"যাও!"

দুজনে উঠে দাঁড়িয়ে দরজা খুলে বাইরে বের হয়ে ডান দিকে ফুলগাছগুলোর পিছনে লাফিয়ে পড়ল।

“চমৎকার! এখানে দশ সেকেন্ড অপেক্ষা কর। তারপর মাথা না তুলে গুড়ি মেরে এগিয়ে যেতে থাক। কোনো অবস্থাতেই মাথা তুলবে না।”

নিশীতা আর রিয়াজ মাথা না তুলে গুড়ি মেরে এগিয়ে যেতে লাগল। কাদা, মাটি, খোয়া পাথরে হাতের চামড়া উঠে খানিকটা রক্তাক্ত হয়ে গেল, তারা সেটাকে গ্রাহ্য করল না।

“থাম।”

দুজনেই থেমে গেল।

“গ্যারেজে তিনটি গাড়ি দেখতে পাচ্ছ?”

নিশীতা কোনো কথা না বলে হ্যাঁ সূচকভাবে মাথা নাড়ল।

“মাঝখানের গাড়িটাতে উঠবে। স্পোর্টস ইউটিলিটি ভেহিকল ফোর হুইল ড্রাইভ। দুই হাজার সিসি ইঞ্জিন। মনে রেখো ড্রাইভিং সিট ডান পাশে।”

নিশীতা মাথা নাড়ল।

“এখানে তিরিশ সেকেন্ড অপেক্ষা কর।”

সামনে দিয়ে একটা গাড়ি চলে গেল, দুজন মানুষ গাড়ি থেকে নেমে বিল্ডিঙের ভিতর ঢুকল।

“দৌড়াও।”

দুজনে দৌড়ে গাড়ির কাছে গেল, রিয়াজ ডানদিকে ড্রাইভিং সিটে নিশীতা বাম দিকে।

“এখন গাড়ি স্টার্ট করতে হবে।”

নিশীতা বলল, “চাবি নেই। হট ওয়ার ব্যবহার করে করতে হবে। বল কী করতে হবে।”

এপসিলন বলল, “সময় নেই। ফ্রেড লিস্টার তোমাদের ঘরে গিয়ে দেখেছে তোমরা নেই। সবাই ছোটাছুটি করছে। এক্ষুনি টেলিফোন করে গেটে বলে দেবে কেউ যেন বের হতে না পারে।”

“সর্বনাশ! তা হলে?”

হঠাৎ করে গাড়িটা গর্জন করে স্টার্ট হয়ে গেল।

“গার্ডকে টেলিফোন করছে। টেলিফোন তোলার আগে বের হয়ে যেতে হবে। যাও।”

রিয়াজ গিয়ার টেনে ড্রাইভে এনে এক্সেলেটরে চাপ দিল, গাড়িটা সোজা গেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। গার্ড গেট খুলে দিচ্ছে, রিয়াজ বুক থেকে আটকে থাকা নিশ্বাস বের করে এগিয়ে যায়। হঠাৎ কী হল, একজন গার্ড ছুটে এসে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থামার ইঙ্গিত করল, গেটটা আবার বন্ধ করে ফেলছে, কাউকে বের হতে দেবে না।

নিশীতা চিৎকার করে বলল, “থেমো না।”

রিয়াজ থামল না, এক্সেলেটর চাপ দিয়ে গাড়ির বেগ মুহূর্তে বাড়িয়ে দিল, টায়ার পোড়া গন্ধ ছুটিয়ে শক্তিশালী গাড়িটা প্রচণ্ড বেগে গেটের দিকে ছুটে গেল। শেষ মুহূর্তে গার্ড লাফিয়ে সরে যায়, গাড়িটা প্রচণ্ড বেগে গেটে ধাক্কা দিল, গেটের একটি অংশ ভেঙ্গে দুমড়েমুচড়ে গেল এবং তার উপর দিয়ে গাড়িটা বের হয়ে গেল। গাড়িটা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যাচ্ছিল, কোনোভাবে রিয়াজ সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করে আবার রাস্তার উপর নিয়ে এল। নিশীতা শক্ত করে গাড়ির সিট ধরে রেখেছিল এবার চিৎকার করে বলল, “বাম দিকে—রাস্তার বাম দিকে।”

AMARBOI.COM

সামনে দিয়ে একটা ট্রাক আসছিল, বিপজ্জনকভাবে সেটাকে পাশ কাটিয়ে রিয়াজ আবার রাস্তার বামপাশে চলে এসে বুকের ভিতর আটকে থাকা একটা নিশ্বাস বের করে দিয়ে বলল, "এটাই হচ্ছে আমার সমস্যা।"

"কী?"

"ঠিক যখন ইমার্জেন্সি তখন সব সময় ভুল ডিসিশন নিই।"

"আপনার এখন দুশ্চিন্তার কারণ নেই, যখনই ডান দিকে যাবেন আমি আপনাকে মনে করিয়ে দেব।"

"থ্যাংকস। এখন কোথায় যাব?"

নিশীতা পিছন দিকে তাকিয়ে বলল, "মনে হচ্ছে আমাদের পিছনে পিছনে একটা গাড়ি আসছে। কাজেই আপাতত চেষ্টা করা যাক এখান থেকে সরে যেতে।"

৯

রিয়াজ ফিসফিস করে বলল, "আপাতত এখানে থামা যাক।"

নিশীতা বলল, "বেশ।"

দুজনে তাদের ব্যাকপ্যাক নামিয়ে বড় বড় কয়েকটা নিশ্বাস নিল।

তারা প্রায় মাইলখানেক ঘুরে এই জায়গায় পৌঁছেছে। পুরো এলাকাটা কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে, উপরে হাইভোল্টেজ বিদ্যুতের লাইন এবং নিচে কয়েক জায়গায় লেজার আলোর নিরাপত্তা। কেউ যেন কাছাকাছি আসতে না পারে সেজন্য একটু পরে পরে মিলিটারি আউটপোস্ট বসানো হয়েছে। রিয়াজ আর নিশীতা দুটো পোস্টের মাঝামাঝি এই জায়গাটা বেছে নিয়েছে।

জায়গাটাতে বেশ কিছু ঝোপঝাড় আছে, পিছনের রাস্তা দিয়ে হঠাৎ হঠাৎ যখন মিলিটারি জিপ বা ট্রাক যায় তখন এই ঝোপগুলোর আড়ালে লুকিয়ে থাকা যায়।

রিয়াজ ব্যাগ থেকে একটা গগলস বের করে নিশীতার হাতে দিয়ে বলল, "এটা ইনফ্রা রেড গগলস। তুমি চোখে লাগিয়ে পাহারা দাও। অন্ধকারেও দেখতে পারবে।"

"আপনি কী করবেন?"

"প্রথমে লেজার নিরাপত্তাটুকু অকেজো করতে হবে, না হয় ভিতরে ঢুকতে পারব না।"

নিশীতা গগলসটি চোখে পরতেই তার সামনে চারদিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চারপাশের অন্ধকার জগৎটি তার কাছে হঠাৎ করে অতিপ্রাকৃত মনে হতে থাকে।

রিয়াজ তার ব্যাগ থেকে ছোট দুটি লেজার ডায়োড বের করল। কাঁটাতারের পাশাপাশি এই লেজার রশ্মি রাখা আছে, কোনোভাবে রশ্মিটি বাধাপ্রাপ্ত হলেই সঙ্কেত চলে যাবে। লেজার রশ্মিটুকু বোঝার জন্য একটু পরপর ফটো ডায়োড রাখা আছে। রিয়াজ তার লেজার ডায়োডটি অন করে ফটো ডায়োডটির উপরে ফেলে নিরাপত্তা রশ্মিটি ঢেকে ফেলল। রিয়াজ নিশ্বাস বন্ধ করে শোনার চেষ্টা করে দূরে কোথাও এলার্ম বেজে উঠল কি না, কিন্তু সেরকম কিছু শোনা গেল না। রিয়াজ একইভাবে দ্বিতীয় লেজারটি অকেজো করে দিয়ে নিশীতাকে ডাকল, "নিশীতা।"

"কী হল?"

"লেজার দুটি অকেজো করে দেওয়া হয়েছে।"

"চমৎকার।"

AMARBOI.COM

"কাঁটাতার কাটার জন্য বড় ডায়াগোনাল কাটারটি বের কর।"

নিশীতা ব্যাকপ্যাক থেকে বড় একটা ডায়াগোনাল কাটার বের করে আনে। রিয়াজ সেটা দিয়ে খুব সহজে কাঁটাতারগুলো কেটে একজন মানুষ যাবার মতো একটা ফুটো করে ফেলল। যন্ত্রপাতিগুলো ব্যাকপ্যাকের মাঝে ঢুকিয়ে রিয়াজ বলল, "এস নিশীতা।"

নিশীতা ভারী ব্যাকপ্যাকটা টেনে কাছে নিয়ে এল, চোখ থেকে ইনফ্রারেড গগলসটা খুলে রিয়াজকে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, "এই যে, আপনার অন্ধকারে দেখার গগলস।"

"তুমি আর পরবে না?"

"না, চোখে দিলে মনে হয় ভূতের দেশে চলে এসেছি।"

"কিন্তু খুব কাজের জিনিস।"

"হ্যাঁ, পৃথিবীতে কত ইঁদুর আর চিকা রয়েছে এটা চোখে না দিলে কেউ জানতে পারবে না।"

রিয়াজ হাসল, বলল, "হ্যাঁ ঠিকই বলেছ।"

নিশীতা চুলগুলো পিছনে নিয়ে একটা রাবার ব্যান্ড দিয়ে শক্ত করে বেঁধে মাথায় একটি বেসবল ক্যাপ পরে বলল, "চলুন ভিতরে যাওয়া যাক।"

"চল।" রিয়াজ এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল, "তোমার কি ভয় করছে?"

নিশীতা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "হ্যাঁ করছে। না করাটা বোকামি হবে। তাই না?"

"হ্যাঁ ঠিকই বলেছ। কিন্তু এ ছাড়া কিছু করার নেই। সারা পৃথিবীতে শুধু আমিই একমাত্র মানুষ যে এই মহাজাগতিক প্রাণীর সাথে কথা বলার ভাষা জানি। কাজেই আমাকে যেতেই হবে।" রিয়াজ তার ব্যাকপ্যাকটি সাবধানে কাছে টেনে নিয়ে বলল, "এখন যন্ত্রপাতিগুলো ঠিক থাকলে হয়—টানাহ্যাঁচড়া তো কম হল না।"

নিশীতা কোনো কথা বলল না, গভীর রাতে ঘুটঘুটে অন্ধকারে তারকাঁটা এবং লেজার নিয়ন্ত্রণ ভেদ করে একটি সংরক্ষিত জায়গায় সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে ঢুকে যাওয়ার একটি উত্তেজনা আছে। ভিতরে একটি মহাজাগতিক প্রাণীর ঘাঁটিতে তাদের জন্য কী ধরনের ভয়ঙ্কর বিস্ময় অপেক্ষা করছে কে জানে।

রিয়াজ জিজ্ঞেস করল, "তুমি আগে ঢুকবে, না আমি?"

"আপনিই ঢোকেন।"

রিয়াজ নিচু হয়ে ভিতরে ঢোকার জন্য প্রস্তুত হল, ঠিক তখন নিশীতা গলায় একটা শীতল স্পর্শ অনুভব করে, সাথে সাথে কেউ অনুচ্চ স্বরে কিন্তু স্পষ্ট গলায় বলল, "আমার মনে হয় আপনাদের কারোই ভিতরে ঢোকার প্রয়োজন নেই।"

নিশীতা পাথরের মতো জমে গেল। রিয়াজ খুব ধীরে ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়াল। অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যায় না কিন্তু তবু তারা বুঝতে পারল তাদেরকে ঘিরে কয়েকজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, তাদের হতে উদ্যত অস্ত্র। সেফটি ক্যাচ টানার শব্দ শুনতে পেল তারা, মানুষগুলো সশস্ত্র, গুলি করতে প্রস্তুত। অনুচ্চ গলার স্বরে আবার কেউ একজন বলল, "দুই হাত উপরে তুলে দাঁড়ান। সন্দেহজনক মানুষদের গুলি করার জন্য আমাদের কাছে স্পষ্ট নির্দেশ আছে।"

নিশীতা এবং রিয়াজ দুই হাত উপরে তুলে দাঁড়াল, এখনো তারা নিজেদের ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছে না। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটি কাউকে নির্দেশ দিয়ে বলল, "ব্যাগ দুটি তুলে নাও।"

একজন এসে হ্যাঁচকা টান দিয়ে ব্যাগ দুটো তুলতে চেষ্টা করতেই রিয়াজ বাধা দিয়ে বলল, "সাবধান—প্লিজ সাবধান।"

"কেন?"

"এর মাঝে অসম্ভব ডেলিকেট কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট আছে।"

"কী ইনস্ট্রুমেন্ট?"

"বলতে পারেন এই দেশ থাকবে না ধ্বংস হয়ে যাবে—এমনকি এই পৃথিবী থাকবে না ধ্বংস হয়ে যাবে সেটা এর ওপর নির্ভর করছে।"

মানুষটি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "ব্যাগ দুটি খুব সাবধানে নাও। দেখো যেন ঝাঁকুনি না লাগে।"

রিয়াজ নিচু গলায় বলল, "ধন্যবাদ। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।"

একটা মিলিটারি জিপে করে ক্যাম্পে নিয়ে আসা পর্যন্ত কেউ আর কোনো কথা বলল না। নিশীতা দেখল তাদেরকে যে ধরে নিয়ে যাচ্ছে সে একজন কমবয়সী মিলিটারি অফিসার। সাথে আরো কয়জন সেনাবাহিনীর সদস্য। প্রায় মাইল দুয়েক গিয়ে জিপটি একটি কলেজ ভবনের সামনে থামল, এটাকে সাময়িক মিলিটারি ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছে।

রিয়াজ আর নিশীতাকে একটা ঘরে ঢুকিয়ে তার দরজা বন্ধ করে দিয়ে মিলিটারি অফিসার তাদের দিকে ঘুরে তাকাল, বলল, "আমি ক্যাপ্টেন মারুফ। এই পুরো এলাকার নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার হাতে দেওয়া হয়েছে। কাজেই আশা করছি আপনারা কী করেছিলেন তার খুব ভালো একটা ব্যাখ্যা আছে।"

নিশীতা মাথা নাড়ল, বলল, 'হ্যাঁ আছে। আপনি যেটুকু চিন্তা করতে পারেন তার চাইতেও অনেক ভালো ব্যাখ্যা আছে। আপনি কতটুকু বিশ্বাস করতে প্রস্তুত রয়েছেন সেটি অন্য ব্যাপার।"

মারুফ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিশীতার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "আপনাকে আমি আগে কোথাও দেখেছি।"

"আমি একজন সাংবাদিক। বড় বড় মানুষের সাংবাদিক সম্মেলনে মাঝে মাঝে আমাকে টেলিভিশনে দেখিয়ে ফেলে।"

"হ্যাঁ।" ক্যাপ্টেন মারুফ মাথা নাড়ল, "আপনাকে আমি টেলিভিশনে দেখেছি।"

নিশীতা রিয়াজকে দেখিয়ে বলল, "ইনি ড. রিয়াজ হাসান। আপনারা যে এলাকাটা কর্ডন করে আলাদা করে রেখেছেন সেখানে ড. হাসানের একটা কোড ব্যবহার করা হচ্ছে।"

ক্যাপ্টেন মারুফ ভুরু কুঁচকে বলল, "ড. হাসান কি ভাইরাসের বিশেষজ্ঞ? তার কোড কি ভাইরাস বিষয়ক?"

"না।" নিশীতা মাথা নাড়ল, "ড. হাসান ভাইরাস বিশেষজ্ঞ নয়। তার কোডটি হচ্ছে মহাজাগতিক প্রাণীর সাথে সম্পর্কিত।"

ক্যাপ্টেন মারুফ চমকে উঠল, বলল, "আপনি কী বলছেন?"

"হ্যাঁ। আপনারা এই পুরো এলাকাটা কর্ডন করে রেখেছেন কারণ এখানে একটি মহাজাগতিক প্রাণী আশ্রয় নিয়েছে। এখানে কোনো ভাইরাস নেই।"

ক্যাপ্টেন মারুফ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিশীতার দিকে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আপনি আপনার কথা প্রমাণ করতে পারবেন?"

"পারব! আমাকে সময় দিলে আপনাকে সবকিছু প্রমাণ করে দিতে পারব। কিন্তু আমাদের হাতে সময় নেই—আপনি যদি আমার কথা বিশ্বাস করেন পুরো কাজটুকু অনেক সহজ হয়ে যায়।"

"আপনারা কী করতে চাইছেন?"

"আমরা কোয়ারেন্টাইন করে রাখা মানুষগুলোর সাথে কথা বলতে চাই।"

"কেন?"

"কারণ তাদের শরীরে ভাইরাসের সংক্রমণ হয়েছে সেটি একটি মিথ্যা কথা। তাদেরকে আলাদা করে রাখা হয়েছে কারণ তারা সেই মহাকাশের প্রাণীকে কিংবা প্রাণীর অবলম্বনকে দেখেছে।"

ক্যাপ্টেন মারুফ চমকে উঠে নিশীতার দিকে তাকালেন, তার হঠাৎ রমিজ মাস্টারের কথা মনে পড়ে গেল। সত্যিই সেই মানুষটি একটি ভয়ঙ্কর মূর্তির কথা বলছিল, মানুষটিকে একবারও অপ্রকৃতিস্থ মনে হয় নি।

নিশীতা নিচু গলায় বলল, "ক্যাপ্টেন মারুফ, আমাদের হাতে সময় খুব বেশি নেই। আপনি কি এই দেশ এবং এই পৃথিবীর বিরুদ্ধে একটা ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র বন্ধ করতে সাহায্য করবেন?"

ক্যাপ্টেন মারুফ নিশীতার কথার উত্তর না দিয়ে উঠে দাঁড়াল, জানালার কাছে গিয়ে বাইরে তাকাল। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার, সেদিকে তাকিয়ে সে হঠাৎ করে ভিতরে একটি বিচিত্র অনুভূতি অনুভব করতে থাকে। শার্টপ্যান্ট পরা এই বিচিত্র মেয়েটির কথাবার্তায় এক ধরনের দৃঢ়তা আছে, বিশ্বাসযোগ্যতা আছে। মনে হচ্ছে মেয়েটি সত্যি কথাই বলছে। ভাইরাস সংক্রমণের পুরো ব্যাপারটির মাঝে সত্যি সত্যি বড় ধরনের গরমিল আছে, কিছুতেই হিসাব মেলানো যায় না— এটা সে নিজেই লক্ষ করেছে। কিন্তু সে একজন মিলিটারি অফিসার, মিলিটারি অফিসারদের তো নিয়ম মেনে চলতে হয়। কিছু একটা করার আগে তার অনুমতি নিতে হবে, কিন্তু সে জানে তাকে অনুমতি দেওয়া হবে না। এটি সত্যিই যদি একটি বড় ষড়যন্ত্রের অংশ হয়ে থাকে তা হলে কিছুতেই তাকে অনুমতি দেওয়া হবে না, বরং ষড়যন্ত্রের আঁচ পেয়ে গেছে জেনে তাকে সরিয়ে দেওয়া হবে। তা হলে কি সে নিয়ম ভেঙে এই সাংবাদিক মেয়েটি এবং বিজ্ঞানী মানুষটিকে কোয়ারেন্টাইন ক্যাম্পে নিয়ে যাবে? একজন মিলিটারি অফিসার হয়ে সে নিয়ম ভঙ্গ করবে?"

ক্যাপ্টেন মারুফ একটা নিশ্বাস ফেলল। উনিশ শ একাত্তরে সেনাবাহিনী নিয়ম ভঙ্গ করে বিদ্রোহ করেছিল বলে এই দেশ স্বাধীন হয়েছিল। যারা নিয়ম তৈরি করেছে তারা নিয়মটি খাঁটি করে তৈরি না করলে সেই নিয়ম না ভেঙে কী করবে? ক্যাপ্টেন মারুফ ঘুরে নিশীতা আর ড. রিয়াজের দিকে তাকাল, বলল, "ঠিক আছে। চলুন, আপনাদের আমি কোয়ারেন্টাইন ক্যাম্পে নিয়ে যাই।"

নিশীতা এবং রিয়াজের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তারা উঠে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন মারুফের কাছে এগিয়ে এল। নিশীতা ক্যাপ্টেন মারুফের হাত স্পর্শ করে বলল, "ধন্যবাদ। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ক্যাপ্টেন মারুফ।"

রিয়াজ বলল, "তা হলে এক্ষুনি যাওয়া যাক। আমাদের হাতে কোনো সময় নেই।"

তিনজন ক্যাম্প থেকে বের হয়ে একটা জিপে উঠে বসে। নিশীতা আর রিয়াজের ব্যাকপ্যাক দুটি পিছনে রাখা হয়েছে, জিপ স্টার্ট করার আগের মুহূর্তে দেখা গেল একজন জুনিয়র মিলিটারি অফিসার ছুটে আসছে। কাছে এসে স্যালুট করে বলল, "স্যার, আপনার কাছে একটা জরুরি ম্যাসেজ এসেছে।"

"কী আছে ম্যাসেজে?"

অফিসার আড়চোখে নিশীতা এবং রিয়াজের দিকে তাকিয়ে বলল, "ম্যাসেজে বলা হয়েছে এখানে দুজন পলাতক মানুষ এসেছে। একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা। তাদেরকে যেভাবে সম্ভব এ্যারেস্ট করতে।"

"আর কিছু?"

"জি। বলা আছে, মানুষগুলো খুব ডেঞ্জারাস। প্রয়োজন হলে দেখামাত্র তাদের গুলি করা যেতে পারে।"

"বেশ।" ক্যাপ্টেন মারুফ জিপ স্টার্ট করে বলল, "ম্যাসেজ রিসিভ করে তাদের কনফার্মেশন করে দাও।"

"কিন্তু স্যার—"

"আমি আসছি।"

তাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ক্যাপ্টেন মারুফ এক্সেলেটরে চাপ দিয়ে জিপটিকে বের করে নিয়ে গেল।

জিপটি রাস্তায় ওঠার পর নিশীতা বলল, "শুনেছেন, আমাদেরকে দেখামাত্র গুলি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।"

ক্যাপ্টেন মারুফ সামনে তাকিয়ে থেকে বলল, "তাই সাথে একটা লাইট আর্মস নিয়ে নিয়েছি।"

নিশীতা শব্দ করে হেসে বলল, "এখন আপনাকে কেউ আর কিছু বলতে পারবে না।"

প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে একটা বিল্ডিঙের সামনে ক্যাপ্টেন মারুফ জিপটি থামিয়ে সেখান থেকে নেমে পড়ল। বড় একটি লোহার গেটের সামনে দুজন সশস্ত্র মিলিটারি দাঁড়িয়ে ছিল, ক্যাপ্টেন মারুফকে দেখে তারা এগিয়ে এল, নিচু গলায় কিছু কথাবার্তা হল এবং তারা গেট খুলে দিল। ভিতরে একটা ছোট ঘরে একটা টেবিলের ওপর পা তুলে একজন মানুষ বসে আছে, ক্যাপ্টেন মারুফ এবং তার সাথে নিশীতা আর রিয়াজকে দেখে সে ভুরু কুঁচকে এগিয়ে এল, ক্যাপ্টেন মারুফকে জিজ্ঞেস করল, "এরা কারা?"

"একজন হচ্ছে সাংবাদিক, অন্যজন সায়েন্টিস্ট।"

মানুষটি আঁতকে উঠে বলল, "সাংবাদিক? এখানে সাংবাদিক আনা পুরোপুরি নিষিদ্ধ।"

ক্যাপ্টেন মারুফ মাথা নাড়লেন, বললেন, "হ্যাঁ সে জন্যই এসেছেন।"

মানুষটি অবাক হয়ে ক্যাপ্টেন মারুফের দিকে তাকাল, বলল, "কী বলছেন আপনি?"

"কেন পুরোপুরি নিষিদ্ধ, সেটা বোঝা দরকার। এরা এসেছেন কোয়ারেন্টাইন করা মানুষদের দেখতে।"

"দেখতে? তারা মারাত্মক ভাইরাসে আক্রান্ত।"

"এখন পর্যন্ত তাদের কত জন মারা গিয়েছেন?"

লোকটি এবারে থতমত খেয়ে বলল, "ইয়ে এখনো কেউ মারা যায় নি—কিন্তু একজন মহিলা পুরোপুরি উন্মাদ হয়ে গিয়েছে।"

এবারে নিশীতা প্রশ্ন করল, "মহিলা কী করছে যে জন্য আপনার মনে হচ্ছে তিনি উন্মাদ হয়ে গিয়েছেন?"

"দেয়ালে মাথা ঠুকছে, চিৎকার করছে।"

"কেন?"

"শুধু বলছে আমার ছেলে আমার ছেলে!"

"কী হয়েছে তার ছেলের?"

"ভাইরাসের আক্রমণের কারণে তার ধারণা হয়েছে কেউ একজন তার ছেলেকে নিয়ে চলে গেছে।"

"আপনি কেমন করে জানেন সত্যি সত্যি তার ছেলেকে কেউ নিয়ে যায় নি?"

মানুষটি এবারে কেমন যেন হতচকিত হয়ে গেল। নিশীতা তীব্র স্বরে বলল, "আপনি পুরুষ মানুষ বলে জানেন না মা আর তার সন্তানের সম্পর্কটা কী রকম। একটা মায়ের ছোট্ট বাচ্চাকে কেউ নিয়ে নিলে তার উন্মাদ হয়ে যাবার কথা। সেটাই স্বাভাবিক। না হওয়াটাই অস্বাভাবিক।"

মানুষটি এবার যুক্তিতর্ক আলোচনা থেকে সরে এল। অনাবশ্যক কঠিন গলায় বলল, "আপনাদের এখানে আসার কথা নয়, আপনার সাথে আমার কথা বলারও কথা নয়।"

ক্যাপ্টেন মারুফ একটু এগিয়ে এসে বলল, "কিন্তু আমার মনে হয় এখন একটু কথা বলা দরকার। কোথাও কোনো ভুলত্রুটি হয়েছে কি না খোঁজখবর নেওয়া এমন কিছু অপরাধ নয়।"

মানুষটি নিচু হয়ে তার ড্রয়ারের ভিতরে কিছু একটা খুঁজতে থাকে, জিনিসটা খুঁজে নিয়ে সে যখন সোজা হয়ে দাঁড়াল তখন ক্যাপ্টেন মারুফ দেখতে পেল সেটা একটা রিভলবার, মানুষটি প্রায় চিৎকার করে বলল, "হাত তুলে দাঁড়ান তিনজন, তা না হলে আমি গুলি করব, আমার ওপর অর্ডার আছে।"

নিশীতা কিংবা রিয়াজ কখনোই এ রকম পরিবেশে পড়ে নি, কী করবে কিছু বুঝতে পারছিল না, কিন্তু ক্যাপ্টেন মারুফকে একটুও বিচলিত হতে দেখা গেল না, শব্দ করে হেসে বলল, "তাই নাকি? অর্ডার আছে?"

মানুষটি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই হঠাৎ করে কিছু একটা ঘটে গেল, নিশীতা আবছাভাবে দেখল ক্যাপ্টেন মারুফের শরীর শূন্যে উঠে গেছে, চোখের পলকে সারা শরীর ঘুরে আবার নিচে নেমে এসেছে কিন্তু সেই মুহূর্তে তার পায়ের এক লাথিতে হাতের রিভলবার ছিটকে গিয়ে পড়েছে দেয়ালে। মানুষটি নিজের হাত ধরে কাতর শব্দ করে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ক্যাপ্টেন মারুফ হেঁটে গিয়ে মানুষটির শার্টের কলার ধরে ফিসফিস করে বলল, "একটা শব্দ করলে খুন করে ফেলব।"

"আমার হাত!"

"সম্ভবত ফ্রাকচার হয়েছে। চিন্তার কিছু নেই, অর্থোপেডিক সার্জন সেট করে দেবে।"

মানুষটি বিস্ফারিত চোখে ক্যাপ্টেন মারুফের দিকে তাকিয়ে রইল। ক্যাপ্টেন মারুফ বলল, "টাই কোয়াণ্ডো কারাটের মতোই তবে পা অনেক বেশি ব্যবহার করতে হয়। থার্ড ডিগ্রি ব্ল্যাক বেল্ট। সময় পাই নি দেখে ফোর্থ ডিগ্রি কমপ্লিট করতে পারি নি।"

ক্যাপ্টেন মারুফ বেশ দক্ষ হাতে মানুষটিকে বেঁধে ফেলল। টেবিল থেকে চওড়া ব্ল্যাক টেপ নিয়ে মুখে লাগানোর সময় নিশীতা বলল, "আমি লাগাতে পারি?"

ক্যাপ্টেন মারুফ একটু অবাক হয়ে বলল, "আপনি?"

"হ্যাঁ। আমি শুধু সিনেমায় দেখেছি এগুলো লাগায়, আসলেও যে লাগানো হয় জানতাম না। আমি দেখি কেমন করে লাগানো হয়!"

ক্যাপ্টেন মারুফ টেপটা নিশীতার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, "নিশ্চয়ই। চেঁচামেচি করে লোকজন জড়ো করতে না পারে সেজন্য এই ব্যবস্থা।"

মানুষটি একটা কিছু বলতে চাইছিল তার আগেই নিশীতা তার মুখে ডাক্ট টেপটা লাগিয়ে দিয়ে এক ধরনের মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থেকে বলল, "তার মানে আসলেই এটা কাজ করে।"

"হ্যাঁ করে। এখন চলুন ভিতরে যাওয়া যাক। ঘরের চাবিটা নিয়ে নিই।"

মানুষটার ডেস্কের উপরে একটা চাবির গোছা পাওয়া গেল, সেটা হাতে নিয়ে তিনজন ঘর থেকে বের হয়ে আসে।

সরু একটা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে একটা কলাপসিবল গেট পাওয়া গেল। সেটা খোলার পর একটা বড় কাঠের দরজা, সেটা খোলার পর দেখা গেল হাসপাতালের মতো একটা লম্বা রুম, দু পাশে সারি সারি বিছানা। বিছানায় কেউ শুয়ে নেই, দরজা থেকে কয়েক হাতে দূরে সবাই কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে, সবার চোখে এক ধরনের তীব্র দৃষ্টি। মানুষগুলো কোনো কথা না বলে ক্যাপ্টেন মারুফ, নিশীতা এবং রিয়াজের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ক্যাপ্টেন মারুফ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সবার দিকে একনজর তাকিয়ে বলল, "আমরা একটা বিশেষ কাজে আপনাদের সাথে দেখা করতে এসেছি।"

মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ গলায় শ্লেষ ঢেলে বলল, "আপনার ভয় করছে না যে ভাইরাসের আক্রমণ হয়ে যাবে?"

ক্যাপ্টেন মারুফ মাথা নাড়ল, বলল, "না, করছে না।"

মানুষটি অবাক হয়ে বলল, "কেন করছে না?"

নিশীতা এগিয়ে এসে বলল, "কারণ, আমরা জানি আপনাদের ভাইরাসের সংক্রমণ হয় নি।"

মানুষগুলো নিশীতার কথা শুনে চমকে উঠল, এক মুহূর্ত নীরব থেকে একসাথে সবাই কথা বলে উঠতেই ক্যাপ্টেন মারুফ হাত তুলে তাদের থামিয়ে দেয়। মধ্যবয়স্ক মানুষটি একটু এগিয়ে এসে বলল, "যদি আমাদের ভাইরাসের সংক্রমণ না হয়ে থাকে তা হলে আমাদের এখানে আটক রেখেছেন কেন? আমাদের যেতে দিচ্ছেন না কেন?"

"আসলে ঠিক আমরা আটকে রাখি নি।"

"তা হলে কে আটকে রেখেছে?"

"সেটা অনেক বড় একটা কাহিনী। কোনো এক সময়ে আপনারা সবাই এটা জানবেন। এখন আমাদের সময় খুব কম—আমরা যে জন্য এসেছি সেটা সেরে নিই।"

রমিজ মাস্টার বলল, "কী জন্য এসেছেন?"

রিয়াজ বলল, "আপনারা ঠিক কী দেখেছেন আমরা সেটা শুনতে এসেছি।"

মানুষগুলো আবার একসাথে কথা বলতে শুরু করতেই রমিজ মাস্টার হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "একজন একজন করে বলেন।"

মানুষগুলো মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ, একজন একজন করে।"

রিয়াজ বলল, "হ্যাঁ; আসুন দাঁড়িয়ে না থেকে কোথাও বসা যাক।"

কমবয়সী একজন বলল, "পাশের ঘর থেকে রাহেলাবুকেও ডেকে আনব?"

নিশীতা মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ, উনাকেও ডেকে আনেন।"

রিয়াজ জিজ্ঞেস করল, "ইনি কি সেই ভদ্রমহিলা যার বাচ্চাকে নিয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ।" রমিজ মাস্টার জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করে মাথা নেড়ে বলল, "রাহেলার অবস্থা খুব খারাপ, মাথা মনে হয় খারাপ হয়ে যাবে।"

কমবয়সী মানুষটি গিয়ে রাহেলাকে ডেকে আনল, তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সের গ্রাম্য মহিলা, চেহারার মাঝে এক সময়ে এক ধরনের কমনীয়তা ছিল কিন্তু এখন অনেকটা উন্মাদিনীর মতো। মাথায় রুক্ষ চুল, চোখ লাল, সমস্ত চোখেমুখে এক ধরনের ব্যাকুল অস্থিরতা। ক্যাপ্টেন মারুফ, নিশীতা আর রিয়াজকে দেখে প্রায় হাহাকার করে বলল, "আমার যাদুরে এনে দেন আপনারা। আল্লাহর কসম লাগে—আমার যাদুরে এনে দেন।"

AMARBOI.COM

নিশীতা রাহেলার হাত ধরে বলল, "আপনি একটু শান্ত হোন—আগে একটু শুনি কী হয়েছে। কিছু একটা যদি করতে হয় তা হলে আগে আমাদের জানতে হবে ঠিক কী হয়েছে।"

রিয়াজ বলল, "হ্যাঁ, আগে আমরা শুনি ঠিক কী হয়েছে। একজন একজন করে শুনি।"

মানুষগুলো একজন একজন করে তাদের কথা বলতে শুরু করল। প্রথমে বলল আজহার মুন্সী। রাত্রিবেলা শহর থেকে ফিরে আসছিল, সড়কের কাছে বটগাছের নিচে তার রতন ব্যাপারির সাথে দেখা। রতন ব্যাপারির অনেক দিন থেকে আজহার মুন্সীর এক টুকরো জমির ওপর লোভ। জাল দলিল, কোর্ট-কাছারি করেও খুব সুবিধে করতে পারছে না বলে অন্যভাবে অগ্রসর হতে চাইছে। বটগাছের নিচে জমাট অন্ধকারে তাকে কয়েকজন চেপে ধরল। কিছু বোঝার আগেই তাকে নিচে ফেলে দিয়ে পিছুমোড়া করে বেঁধে ফেলল। আজহার মুন্সী আতঙ্কিত চোখে দেখে রতন ব্যাপারি ধারালো একটা চাকু নিয়ে এগিয়ে আসছে, ঠিক তখন হঠাৎ খুব একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটল, আজহার মুন্সী অবাক হয়ে দেখল রতন ব্যাপারির কাছে একটা প্রাণী দাঁড়িয়ে আছে। প্রাণীটি মানুষের মতো কিন্তু মানুষ নয়, অন্ধকারেও কোনো কারণে তাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, সম্ভবত তার শরীর থেকে এক ধরনের আলো বের হয়। প্রাণীটির চোখ দুটো ছিল তীব্র লাল, মনে হয় যেন দুটো বাতি জ্বলছে। মাথা থেকে অনেকগুলো শুঁড়ের মতো বের হয়ে আসছে। সেগুলো কিলবিল করে নড়ছে। প্রাণীটা সেই শুঁড় দিয়ে রতন ব্যাপারিকে খপ করে চেপে ধরে ফেলল। আজহার মুন্সীকে যে মানুষগুলো মাটিতে চেপে ধরে রেখেছিল তারা ততক্ষণে পালিয়ে গেছে—বটগাছের নিচে এখন তারা দুজন। রতন ব্যাপারি তখন ভয়ে আতঙ্কে তার হাতের চাকু দিয়ে সেই ভয়াবহ প্রাণীটিকে আঘাত করতে থাকে।

গল্পের এই পর্যায়ে এসে আজহার মুন্সী থেমে যায়। রিয়াজ জিজ্ঞেস করল, "তারপর কী হল?"

আজহার মুন্সী স্বভাবতই খুব বিচলিত হয়ে আছে, খানিকক্ষণ চেষ্টা করে বলল, "এই জিনিসটা মনে হয় লোহার তৈরি। চাকু দিয়ে প্রত্যেকবার ঘা দিতেই ঠন করে শব্দ হয়। রতন ব্যাপারির শরীরেও মোষের মতো জোর, পাগলের মতো কুপিয়ে যাচ্ছে। কোপাতে কোপাতে মনে হল চাকু দিয়ে সেই লোহার শরীর কেটে ফেলল। গলার কাছাকাছি কেটেছে। কাটতেই সেদিক দিয়ে সাবানের ফেনার মতো সবুজ রঙের আঠালো জিনিস বের হতে শুরু করল। তখন হঠাৎ সেখানে ইঁদুরের মতো একটা প্রাণী লাফ দিয়ে বের হয়ে এসে রতন ব্যাপারিকে কামড় দিয়ে ধরল।"

আজহার মুন্সী আবার থেমে গিয়ে জিভ দিয়ে তার শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে নেয়। রিয়াজ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আজহার মুন্সীর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তারপর?"

"সেই ইঁদুরের মতো ছোট্ট জন্তুটা পাখির মতন শব্দ করতে করতে রতন ব্যাপারির শরীরের ভিতর ঢুকে গেল।"

নিশীতা অবাক হয়ে বলল, "শরীরের ভিতরে ঢুকে গেল?"

"হ্যাঁ।"

"তারপর?"

"রতন ব্যাপারি তখন ধড়াম করে মাটিতে পড়ে গিয়ে চিৎকার করছে। আর সেই প্রাণীটা তার শরীরের ভিতর কিলবিল করে নড়ছে। রতন ব্যাপারি গরুর মতো চিৎকার করতে করতে এক সময় নীরব হয়ে গেল।"

"তারপর?"

আজহার মুন্সী একটা নিশ্বাস দিয়ে বলল, "আমি তো ভেবেছি আমি শেষ। মাটিতে হাত বাঁধা হয়ে পড়ে আছি, আর সেই মূর্তিটা আমার কাছে এগিয়ে এসেছে। নিচু হয়ে আমার

দিকে তাকাচ্ছে, কেমন জানি একটা ওষুধের মতো গন্ধ শরীরে। আমি দেখতে পেলাম শরীরের ভিতরে কী যেন নড়ছে, মনে হয় সেই ইঁদুরের মতো প্রাণীগুলো।"

"তারপর?"

আজহার মুন্সী বলল, "তখন আবার সেটা দাঁড়িয়ে গেল; তারপর ঘুরে চলে গেল।"

রিয়াজ জিজ্ঞেস করল, "আপনি তখন কী করলেন?"

"আমি অনেক কষ্ট করে হাতের বাঁধন খুলে উঠে দাঁড়িয়েছি। রতন ব্যাপারির অবস্থা দেখার জন্য তার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। দেখি তার শরীরটা কাঁপছে।"

"কাঁপছে?"

"হ্যাঁ। আমার তখন ভয় লেগে গেল।"

"কী করলেন তখন?"

"ভাবলাম উঠে দৌড় দেই। ঠিক তখন রতন ব্যাপারির চোখ খুলে গেল। আপনি বিশ্বাস করবেন না চোখ দুটো টর্চ লাইটের মতো জ্বলছে। আমি তাকিয়ে থাকতে থাকতে দেখলাম ঠাস্ শব্দ করে মাথার কাছে একটা ফুটো হয়ে সেদিক দিয়ে সাপের মতো কী একটা জিনিস বের হয়ে এল।"

আজহার মুন্সী কয়েক মুহূর্তের জন্য থামল; তারপর একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বলল, "আমি তখন আমার জান নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে এসেছি।"

"রতন ব্যাপারির কী হল?"

"একবার পিছনে ফিরে তাকিয়ে দেখলাম সে টলতে টলতে হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছে। আগের মূর্তিটা যেদিকে গিয়েছে সেদিকে। সেও ঐ দানব হয়ে গেছে।"

রিয়াজ একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বলল, "এই প্রসেসটার একটা নাম আছে।"

ক্যাপ্টেন মারুফ জানতে চাইল, "কোন প্রসেসটার?"

"মহাজাগতিক প্রাণী এসে যখন লোকাল প্রাণীর শরীরকে ব্যবহার করে।"

"কী নাম?"

"এলিয়েন হোস্টিং। এলিয়েন হোস্টিং খুব ভয়ঙ্কর ব্যাপার। এর অর্থ এই প্রাণী ইচ্ছে করলে পুরো পৃথিবী দখল করে ফেলতে পারবে।"

নিশীতা হাতের ঘড়ি দেখে বলল, "ড. হাসান, আমাদের হাতে কিন্তু সময় নেই।"

"হ্যাঁ, আমরা অন্যদের কথাও শুনে নিই। এর মাঝেই কিন্তু একটা প্যাটার্ন দেখা যাচ্ছে।"

নিশীতা জিজ্ঞেস করল, "কী প্যাটার্ন?"

প্রথম কেসটা তুমি যেটা বলেছিলে সেখানে এলিয়েন হোস্টিং করেছিল একজন টেররিস্টকে। এখানেও এলিয়েন হোস্টিং করেছে একজন মার্ডারারকে, অন্ততপক্ষে যে মার্ডার করতে চাইছিল সেই মানুষকে!"

রমিজ মাস্টার গলা উঁচু করে বলল, "আমি যেটা দেখেছি সেটাও এ রকম কেস। সেখানেও আমাকে মানুষটা মার্ডার করতে চাইছিল।"

উপস্থিত অন্য মানুষগুলো হঠাৎ সবাই একসাথে কথা বলার চেষ্টা করল, সবারই বলার মতো এই ধরনের গল্প রয়েছে। রিয়াজ হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে দিল, বলল, "একজন একজন করে শোনা যাক।"

এর পরের ঘটনাটি বর্ণনা করল তিনজন মিলে। তাদের নাম হান্নান, ইদরিস আর সোলায়মান। সম্পর্কে এরা ফুপাতো এবং মামাতো ভাই, বাজারে 'মালা ফ্যাশন' নামে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের একটা কাপড়ের দোকান আছে। এলাকার বখে যাওয়া চাঁদাবাজ সবুজ আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা মালা ফ্যাশনে এসে মোটামুটি নিয়মিতভাবে চাঁদাবাজি করে। এদের অত্যাচারে ছোট-বড় সব ব্যবসায়ী একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে গেছে। শেষে আর কোনো উপায় না দেখে সবাই মিলে একত্র হয়ে একদিন তাদের ধরে পুলিশে দিয়ে দিল। আসল সমস্যার শুরু হল তখন—পুলিশ টাকাপয়সা খেয়ে তাদের ছেড়ে দিল। সবুজ আর সাঙ্গপাঙ্গরা মিলে তখন ঠিক করল এর প্রতিশোধ নেবে। হান্নান, ইদরিস আর সোলায়মানদের খুন করে ফেলবে। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী এক রাতে তারা যখন বাড়ি ফিরে আসছে, জলার কাছাকাছি একটা নির্জন জায়গায় সবুজ তার দলবল নিয়ে তাদের ধরে ফেলল। অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে কিল ঘুসি লাথি মেরে তাদেরকে জলার ধারে নিয়ে এসে দাঁড় করায়। সবুজ তার রিভলবার বের করে গুলি করার জন্য, ঠিক তখন একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটল, হঠাৎ করে সবুজের দলবলের সবাই কিছু একটা দেখে চিৎকার করে পালিয়ে যেতে শুরু করল। হান্নান, ইদরিস আর সোলায়মান পিছন দিকে তাকিয়ে দেখে জলার ভিতর থেকে কিম্ভূতকিমাকার একটা মূর্তি উঠে আসছে। এটা দেখতে অনেকটা মানুষের মতো কিন্তু পুরোপুরি মানুষ নয়, মাথা থেকে অনেকগুলো শুঁড়ের মতো কিছু ঝুলছে। চোখ দুটো থেকে লাল আলো বের হয়ে আসছে। একটা হাতের ভিতর নানা রকম যন্ত্রপাতি, দেখে মনে হয় একই সাথে মানুষ, যন্ত্র এবং পশু।

এই মূর্তিটাকে দেখে সবুজ সেটাকে গুলি করতে শুরু করে কিন্তু তার কিছুই হয় না, মূর্তিটা এক পা এক পা করে এগুতে থাকে। শেষ মুহূর্তে সবুজও ভয় পেয়ে যায়। সে ছুটে পালিয়ে যেতে চাইছিল। কিন্তু হঠাৎ করে মূর্তিটার হাতের ভিতর থেকে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো কিছু একটা বের হল, সবুজ তাতে আটকা পড়ে যায়। সেই মূর্তিটা তখন সবুজের কাছে এগিয়ে যায়, তখন হঠাৎ তার শরীরের ভিতর থেকে ছোট ছোট সরীসৃপের মতো প্রাণী বের হয়ে আসে, সেগুলো কিলবিল করে সবুজের শরীরের ভিতরে ঢুকে যায়। সবুজ বিকট স্বরে চিৎকার করতে থাকে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার কী হয়েছে দেখার জন্য তিনজনের কারোই আর সাহস হয় না, কোনোমতে তারা তাদের প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছে।

রিয়াজ চিন্তিত মুখে জিজ্ঞেস করল, "আপনারা বলছেন আপনারা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছেন—কিন্তু কথাটি কি সত্যি? সেই মূর্তিটা তো ইচ্ছে করলে আপনাদেরও হাই ভোল্টেজ শক দিয়ে ধরে ফেলতে পারত। পারত না?"

"হ্যাঁ পারত।" মানুষ তিনজন মাথা নেড়ে বলল, "ইচ্ছা করলেই পারত। কিন্তু সেটা করে নি।"

"আমরা আগেও এই প্যাটার্ন দেখেছি। এই মূর্তি বা এলিয়েন বা মহাজাগতিক প্রাণীটা শুধুমাত্র মার্ডারার বা ক্রিমিনালদের শরীরে আশ্রয় নিচ্ছে—সাধারণ মানুষদের ছেড়ে দিচ্ছে। তাদের কোনো ক্ষতি করছে না।"

"না, মিথ্যা কথা।" রাহেলা চিৎকার করে ডুকরে কেঁদে উঠল, "আমার যাদু কি অপরাধ করেছে? সাত দিনের একটা মাসুম বাচ্চাকে তা হলে কেন নিয়ে গেল?"

উপস্থিত সবাই মাথা নাড়ল, বলল, "এটা সত্যি কথা।"

প্রায় সবার বেলাই এটা সত্যি যে তারা দেখেছে কোনো একটা খুনি বা সন্ত্রাসী ঠিক যখন বড় কোনো অপরাধ করতে যাচ্ছে ঠিক তখন তাকে আক্রমণ করছে, শুধু একটি ব্যতিক্রম, সেটি হচ্ছে রাহেলার শিশুর ব্যাপারটি। ঠিক কী ঘটেছে সেটা জানার জন্য নিশীতা

এবং রিয়াজকে খুব কষ্ট করতে হল। রাহেলা ঠিক করে কথাই বলতে পারছিল না—একটু পরে পরে ডুকরে কেঁদে উঠছিল। অনেক চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত তার মুখ থেকে ঘটনার যে বর্ণনা পাওয়া গেল, সেটি এ রকম :

সন্ধেবেলা রাহেলা তার বাচ্চাকে কোলে নিয়ে হাঁটছে। বাচ্চার বয়স মাত্র সাত দিন কোলের মাঝে আঁকুপাঁকু করে কাঁদছে এবং রাহেলার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না যে এই ছোট শিশুটা গত নয় মাস তার শরীরের ভিতরে বিন্দু বিন্দু করে বড় হয়ে উঠেছে। এই শিশুটির জন্মের পর তার দৈনন্দিন প্রতিটি মুহূর্ত এখন এই শিশুটিকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে। এত ছোট একজন মানুষ কীভাবে একজনের জীবনের সবটুকু পরিবর্তিত করে ফেলতে পারে সেই বিষয়টি নিয়ে রাহেলা যখন মনে মনে খুব অবাক হয়ে যাচ্ছিল তখন সে উঠানের পাশে হাস্নাহেনা গাছের কাছে সর্‌সর্‌ করে পাতার শব্দ শুনতে পেল—তাদের পোষা কুকুর ভেবে ঘুরে তাকাতেই রাহেলার সমস্ত শরীর আতঙ্কে জমে গেল। হাস্নাহেনা গাছের নিচে মানুষের আকৃতির একটা জীব দাঁড়িয়ে আছে। জীবটির শরীর ধাতব, চোখ দুটো অংগারের মতো লাল হয়ে জ্বলছে।

রাহেলা তার বাচ্চাটিকে শক্ত করে বুকে চেপে ধরে পিছন দিকে ছুটে যেতে গিয়ে আবিষ্কার করল ঠিক তার পিছনেও এ রকম একটা জীব দাঁড়িয়ে আছে। মানুষের আকৃতির এই জীবটির মাথা থেকে কিলবিল করে সাপের মতো কিছু একটা নড়ছে।

রাহেলা তখন তার ডানে বামে তাকাল এবং দেখল সেখানেও ঠিক একই রকম কয়েকটা জীব দাঁড়িয়ে আছে। জীবগুলো তখন খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে তাকে গোল হয়ে ঘিরে ফেলতে লাগল। রাহেলাকে কেউ বলে দেয় নি কিন্তু সে বুঝতে পারল এই জীবগুলো তার বাচ্চাকে কেড়ে নিতে আসছে। সে তখন তার বাচ্চাটাকে শক্ত করে বুকে চেপে ধরে চিৎকার করে বলল, "না-না-না—কেউ আমার কাছে আসবে না, খবরদার।"

কিন্তু জীবগুলো ভ্রূক্ষেপ করল না, খুব ধীরে ধীরে তাদের হাতগুলো উপরে তুলে এগিয়ে আসতে লাগল। রাহেলা তখন বাচ্চাটাকে বুকে চেপে ছুটে বের হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর জীবগুলো তাদের শুঁড় দিয়ে তাকে ধরে ফেলল। রাহেলা বাচ্চাটাকে বুকে চেপে ধরে প্রাণপণ চেষ্টা করল ছুটে যেতে কিন্তু প্রাণীগুলোর শরীর লোহার মতো শক্ত আর বরফের মতো শীতল। তাকে নিচে ফেলে তার বুক থেকে বাচ্চাটাকে কেড়ে নিল। রাহেলা আঁচড়ে-কামড়ে প্রাণীটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল কিন্তু প্রাণীগুলো তাকে ঝটকা মেরে নিচে ফেলে দিয়ে হেঁটে চলে গেল। রাহেলা উন্মাদিনীর মতো পিছনে পিছনে ছুটে যেতে চাইছিল কিন্তু তার চিৎকার শুনে লোকজন ছুটে এসে তাকে ধরে রেখেছিল বলে সে যেতে পারে নি। পাগলের মতো চিৎকার করতে করতে সে অচেতন হয়ে গিয়েছিল।

কথা বলা শেষ করে রাহেলা আবার দুই হাতে মুখ ঢেকে আকুল হয়ে কাঁদতে আরম্ভ করল। নিশীতা রাহেলাকে শক্ত করে ধরে রাখে, ঠিক কী ভাষায় তাকে সান্ত্বনা দেবে বুঝতে পারে না।

রিয়াজ গম্ভীর মুখে হেঁটে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। একটু পরে ক্যাপ্টেন মারুফ আর নিশীতা তার পাশে এসে দাঁড়াল। রিয়াজ ঘুরে ক্যাপ্টেন মারুফের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "ক্যাপ্টেন মারুফ, আপনার কি এখনো এই ব্যাপারটি নিয়ে কোনো সন্দেহ আছে?"

AMARBOI.COM

ক্যাপ্টেন মারুফ মাথা নাড়ল, বলল, "না, নেই।"

"তা হলে কি আপনার কাছে আমি আরো একটু সাহায্য পেতে পারি?"

"কী সাহায্য?"

"আমাকে কি আপনার জিপে করে আপনি এই মহাজাগতিক প্রাণীর আস্তানায় নিয়ে যাবেন?"

"নিশ্চয়ই নিয়ে যাব। আপনি জানেন সেটি কোথায়?"

রিয়াজ মাথা নাড়ল, বলল, "না জানি না।"

"তা হলে?"

"নিশীতার কাছে একটি সেলুলার টেলিফোন আছে—"

ক্যাপ্টেন মারুফ মাথা নেড়ে বলল, "কিন্তু এখানে নেটওয়ার্কে সিগন্যাল নেই, সেলুলার ফোন কাজ করবে না।"

রিয়াজ হাসার ভঙ্গি করে বলল, "সেটা নিয়ে ভাববেন না। নিশীতার সেলুলার ফোনের ব্যাটারির চার্জ অনেক আগে শেষ হয়ে গেছে, তার পরেও সেখানে সময়মতো ফোন আসছে। কোথায় যেতে হবে আমাদের বলে দিচ্ছে।"

ক্যাপ্টেন মারুফ অবাক হয়ে বলল, "কে বলে দিচ্ছে?"

"এপসিলন।"

"এপসিলন? সেটা কে?"

নিশীতা বলল, "ড. হাসানের একটা কম্পিউটার প্রোগ্রাম।"

"কম্পিউটার প্রোগ্রাম?"

রিয়াজ ইতস্তত করে বলল, "কোনো একটি প্রাণী আমার এই প্রোগ্রামটি ব্যবহার করে আমাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করছে।"

ক্যাপ্টেন মারুফ বলল, "আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—"

"আমরাও ঠিক বুঝতে পারছি না। শুধু একটি জিনিস জানি—আমরা একেবারে একা নই।"

"চমৎকার। চলুন তা হলে যাই—"

"চলুন।"

ঘর থেকে বের হওয়ার সময় রাহেলা পাগলের মতো ছুটে এসে তাদের পথ আটকে দাঁড়িয়ে বলল, "আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?"

রিয়াজ একটু ইতস্তত করে বলল, "আমরা যাচ্ছি ঐ প্রাণীগুলোর আস্তানায়।"

রাহেলা চোখ বড় বড় করে বলল, "আমি যাব আপনাদের সাথে।"

ক্যাপ্টেন মারুফ মাথা নেড়ে বলল, "আপনি কেমন করে যাবেন?"

নিশীতা বলল, "আমরা এখনো জানি না কেমন করে যাব। সেখানে কী হবে আমাদের কোনো ধারণা নেই।"

রাহেলা মাথা নেড়ে কাতর গলায় বলল, "না, আমি যাব। আমি আমার যাদুর কাছে যাব। আল্লাহ্‌র কসম লাগে আমাকে নিয়ে যান—"

ক্যাপ্টেন মারুফ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, রিয়াজ তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "ঠিক আছে রাহেলা, আপনি যদি আমাদের সাথে যেতে চান আসুন।"

নিশীতা একটু অবাক হয়ে রিয়াজের দিকে তাকিয়ে বলল, "কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

AMARBOI.COM

"রাহেলা সবকিছু নিয়ে এত অস্থির হয়ে আছে, তাকে এভাবে নেওয়া কি ঠিক হবে?"

রিয়াজ একটা নিশ্বাস ফেলে ফিসফিস করে বলল, "আমার ধারণা এই পৃথিবীকে যদি কেউ বাঁচাতে পারে তা হলে সেটি রাহেলাই পারবে। আর কেউ পারবে না।"

১০

কাঁচা রাস্তা দিয়ে জিপটা এগিয়ে যাচ্ছে, নিশীতার মনে হচ্ছে যে কোনো মুহূর্তে বুঝি জিপটা উল্টে রাস্তার পাশে খাদে পড়ে যাবে। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার, জিপের হেডলাইটের আলোতে অল্প কিছুদূর আলোকিত হয়ে তার চারপাশে অন্ধকার যেন আরো এক শ গুণ গাঢ় করে ফেলা হচ্ছে। তারা কোথায় যাচ্ছে পুরোপুরি নিশ্চিত নয়—অনেক চেষ্টা করেও নিশীতার সেলুলার টেলিফোনে এপসিলনের কথা শোনা যায় নি, তাই আপাতত রাহেলার বাড়ির কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করছে। মহাজাগতিক প্রাণীকে সবচেয়ে বেশিসংখ্যকবার দেখা গেছে এই এলাকাতেই। কাছাকাছি একটা জলা জায়গা রয়েছে, রিয়াজের ধারণা তার আশপাশেই মহাজাগতিক প্রাণীটি তার আস্তানা তৈরি করেছে।

জিপের মাঝে চারজন নিঃশব্দে বসে আছে, সবার ভিতরেই একটি বিচিত্র অনুভূতি। কী হবে তার অনিশ্চয়তার সাথে সাথে এক ধরনের অস্বাভাবিক অশরীরী আতঙ্ক। শুধুমাত্র রাহেলার বুকের মাঝে কোনো আতঙ্ক নেই, তার বুক খালি করে শিশুটিকে ছিনিয়ে নেওয়ার পর থেকে তার সকল বোধশক্তি অসাড় হয়ে গেছে—তার বুকের মাঝে এখন শুধু এক ভয়াবহ শূন্যতা।

জিপটি উঁচু-নিচু সড়ক দিয়ে একটা ভাঙা মসজিদের পাশে এসে দাঁড়াল, এখন কোনদিক দিয়ে যেতে হবে ক্যাপ্টেন মারুফ সেটা যখন বের করার চেষ্টা করছে ঠিক তখন নিশীতার সেলুলার টেলিফোনটি বেজে উঠল। নিশীতা দ্রুত কানে লাগাল, "হ্যালো।"

"নিশীতা?"

"হ্যাঁ।"

এইমাত্র একটা হেলিকপ্টার আকাশে উঠেছে। তোমরা কী করছ ফ্রেড লিস্টার তার খবর পেয়েছে। হেলিকপ্টারটা তোমাদের থামানোর চেষ্টা করবে।"

"কীভাবে থামানোর চেষ্টা করবে?"

"দুটো রিকয়েললেস রাইফেল আছে। মনে হয় গুলি করে তোমাদের জিপটা উড়িয়ে দেবে।"

"সর্বনাশ! আমরা তা হলে এখন কী করব?

"সেটা তো জানি না।"

নিশীতা আরো কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই খুট করে লাইন কেটে গেল।

রাস্তার ওপর একটা বড় গর্তকে সাবধানে পাশ কাটিয়ে ক্যাপ্টেন মারুফ জিজ্ঞেস করল, "কে ফোন করেছে? কী বলেছে?"

"এপসিলন বলেছে একটা হেলিকপ্টার আসছে আমাদের গুলি করতে।"

নিশীতার কথা শেষ হবার আগেই ক্যাপ্টেন মারুফ জিপটাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "সবাই নেমে যান।"

কোনো কথা না বলে সবাই নেমে পড়ে। জিপের পিছন থেকে নিশীতা আর রিয়াজের ব্যাকপ্যাক দুটো সাবধানে নামিয়ে নেওয়ার পর ক্যাপ্টেন মারুফ বলল, আপনারা রাস্তার ওপর থেকে সরে যান।

রিয়াজ জিজ্ঞেস করল, "আপনি?"

আমিও আসছি। জিপটাকে চালিয়ে রেখে নেমে পড়তে হবে যেন বুঝতে না পারে জিপে কেউ নেই। তা না হলে আমাদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে।"

"ঠিক আছে। সাবধানে থাকবেন।"

ক্যাপ্টেন মারুফ জিপটা চালিয়ে সামনের দিকে চলে যাওয়ার সাথে সাথেই অন্যরা দূরে হেলিকপ্টারের শব্দ শুনতে পেল। নিশীতা আর রিয়াজ তাদের ব্যাকপ্যাক দুটো ঘাড়ে তুলে নিয়ে দ্রুত রাস্তা থেকে নিচে নেমে দূরে ঝোপঝাড়ের দিকে সরে গেল।

কিছুক্ষণের মাঝেই মূর্তিমান ধ্বংসের মতো তাদের মাথার ওপর দিয়ে হেলিকপ্টারটি দূরে জিপের দিকে এগিয়ে যায়। নিশীতার বুক ধকধক করতে থাকে, গ্রামের কাঁচা সড়ক দিয়ে জিপটি তখনো হোঁচট খেতে খেতে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে, জিপ থেকে ক্যাপ্টেন মারুফ নেমে গেছে কি না কেউ বুঝতে পারছে না। দূরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তারা দেখতে পেল হেলিকপ্টার থেকে একটা মিসাইল উড়ে গেল জিপের দিকে এবং কিছু বোঝার আগে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে পুরো জিপটি ছিন্নভিন্ন হয়ে দাউদাউ করে জ্বলতে লাগল—তারা যদি সময়মতো জিপ থেকে নেমে না পড়ত তা হলে এতক্ষণে তাদের কী অবস্থা হত চিন্তা করে নিশীতা আতঙ্কে শিউরে ওঠে।

রিয়াজ একটা নিশ্বাস ফেলে চাপা গলায় বলল, "ক্যাপ্টেন মারুফ সময়মতো নামতে পেরেছে তো?"

না নেমে থাকলে কী ভয়ঙ্কর পরিণতি হতে পারে চিন্তাটুকু জোর করে মন থেকে দূর করে সরিয়ে দিয়ে নিশীতা বলল, "নিশ্চয়ই পেরেছে।"

তারা দেখতে পেল হেলিকপ্টারটি আবার ঘুরে জ্বলন্ত জিপের কাছে এগিয়ে এসে নিচু হয়ে সেটাকে ঘিরে উড়ে আবার উপরে উঠে দূরে চলে যেতে শুরু করেছে। বেশি দূর না গিয়েই সেটা সামনে কোথায় জানি নেমে পড়ল। রিয়াজ বাইনোকুলার দিয়ে দেখতে দেখতে বলল, "আমার ধারণা হেলিকপ্টারটি যেখানে নেমেছে আমাদেরকেও সেখানে যেতে হবে।"

"হেলিকপ্টারে করে ফ্রেড লিস্টার মহাজাগতিক প্রাণীটির আস্তানায় গিয়েছে?"

"ঠিক আস্তানা না হলেও আস্তানার খুব কাছাকাছি।"

"আমরা কি এখানে ক্যাপ্টেন মারুফের জন্য অপেক্ষা করব নাকি সামনে এগিয়ে যাব?"

"সামনে এগুতে থাকি।" রিয়াজ ব্যাকপ্যাক থেকে তার নাইটভিশন গগলস বের করে দূরে তাকিয়ে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, "ঐ তো ক্যাপ্টেন মারুফকে দেখতে পাচ্ছি—এই দিকেই আসছেন।"

নিশীতা খুব খুশি হয়ে বলল, "যাক বাবা, যা ভয় পেয়েছিলাম!"

রাহেলা এই দীর্ঘ সময় একটি কথাও বলে নি, এই প্রথমবার সে শান্ত গলায় বলল, "আল্লাহ মেহেরবান।"

ক্যাপ্টেন মারুফ চলে আসার পর চারজনের ছোট দলটি আবার অগ্রসর হতে থাকে। কোন দিকে যেতে হবে সেটি রিয়াজ বলে দিতে থাকে। সে একটা ছোট যন্ত্র তার বুকে ঝুলিয়ে নেয় সেখান থেকে একটা হেডফোন বের হয়ে আসছে। দূরে কোথাও রেডিও ফ্রিকোয়েন্সির কিছু তরঙ্গ থেকে সে তার গন্তব্যস্থান বের করে নিতে পারছে। তারা হেঁটে

হেঁটে একটার পর একটা গ্রাম পার হয়ে যেতে থাকে। গ্রামের পর গ্রাম থেকে সব মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে—এলাকাগুলো একেবারে প্রেতপুরীর মতো নির্জন। কোথাও কোনো জীবন্ত প্রাণীর চিহ্ন পর্যন্ত নেই, মনে হচ্ছে ঝিঁঝি পোকা পর্যন্ত ডাকতে ভুলে গেছে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে চারজন পা টেনে টেনে হাঁটতে থাকে, তাদের মনে হতে থাকে তারা বুঝি কোনো অশরীরী জগতে চলে এসেছে।

রিয়াজের পিছু পিছু হাঁটতে হাঁটতে তারা একটা উঁচু জায়গায় উঠে এল। জায়গাটা বড় বড় গাছ দিয়ে আড়াল করা। সেই জংগলের মতো জায়গাটা থেকে বের হতেই তাদের হৃৎস্পন্দন হঠাৎ করে থেমে যায়। তাদের সামনে হঠাৎ করে যে দৃশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠল নিজের চোখে না দেখলে তারা কখনো সেটা বিশ্বাস করত না।

সামনে বিস্তীর্ণ মাঠ, মাঠের বিশ ফুট উঁচুতে একেবারে নিঃশব্দে একটি মহাকাশযান দাঁড়িয়ে আছে। মহাকাশযানটির সাথে পৃথিবীর কোনো কিছুর মিল নেই। মহাকাশযানটি থেকে কোনো আলো বের হচ্ছে না তবু সেটি দেখা যাচ্ছে, খুব ভালো করে দেখলে মনে হয় এটি বুঝি বিশাল কোনো জীবন্ত প্রাণী; এর সমস্ত শরীরে বিচিত্র এক ধরনের টিউব জালের মতো ছড়িয়ে আছে। সেই স্বচ্ছ টিউব দিয়ে খুব ধীরে ধীরে কিছু গোলাকার জিনিস নড়ছে। মনে হয় পুরো জিনিসটি এক ধরনের আঠালো জিনিসে ডুবে আছে, খুব কান পেতে থাকলে ভিতর থেকে এক ধরনের ভোঁতা শব্দ শোনা যায়।

মহাকাশযানটির ঠিক নিচে নীল এক ধরনের অশরীরী আলো, সেখানে বিচিত্র কিছু মূর্তি। এই মূর্তিগুলো নিশ্চয়ই এক সময় মানুষ ছিল, মহাজাগতিক প্রাণী এসে তাদের শরীরকে দখল করে নিয়ে ব্যবহার করছে। মানুষগুলো মৃত কিন্তু তাদের দেহ নড়ছে—ব্যাপারটি চিন্তা করলেই সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে। মানুষগুলোর সবার শরীরই এক রকম। মাথার অংশটি বিচিত্রভাবে ফুলে উঠেছে। সেখান থেকে শুঁড়ের মতো কিলবিলে অংশ বের হয়ে এসেছে, খুব আস্তে আস্তে সেগুলো জীবন্ত প্রাণীর মতো নড়ছে। মানুষগুলোর দেহ একইসাথে যান্ত্রিক এবং জৈবিক। প্রায় পঞ্চাশটি এই ধরনের প্রাণী মহাকাশযানের নিচে খুব ধীরে ধীরে নড়াচড়া করছে। হঠাৎ করে তাকালে মনে হয় সেখানে বুঝি কোনো এক ধরনের নৃত্যানুষ্ঠান হচ্ছে, এই বিচিত্র প্রাণীগুলোর হাত পা শরীর শুঁড়গুলোর নড়াচড়ার মাঝে এক ধরনের অশরীরী ছন্দ রয়েছে। মনে হচ্ছে তারা বুঝি কোনো প্রেতলোকে চলে এসেছে এবং সেই প্রেতলোকের অশরীরীরা মৃত্যুর অপর পাশে থেকে তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। পুরো দৃশ্যটি এত অবাস্তব এবং এত অস্বাভাবিক যে তারা চারজন একেবারে পাথরের মতো জমে গেল। দীর্ঘ সময় কেউ কোনো কথা বলতে পারে না—হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। সবার আগে সংবিৎ ফিরে পায় রাহেলা, সে চাপা এবং উত্তেজিত গলায় বলে, "যাদু! আমার যাদুমণি।"

নিশীতা ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায়?"

"ঐ তো। মাঝখানে।"

নিশীতা ভালো করে তাকিয়ে দেখতে পেল সত্যিই একেবারে মাঝখানে একটা ছোট পিলারের উপর একটি ছোট শিশু। এত দূর থেকে ভালো করে দেখা যায় না। কিন্তু তবু মনে হয় তার চারপাশের ভয়াবহ মূর্তিগুলোর অশরীরী কার্যকলাপের মাঝে শিশুটি নির্বিকারভাবে শান্ত হয়ে শুয়ে আছে।

রিয়াজ তার পিঠ থেকে ব্যাকপ্যাক নামিয়ে বলল, "আমরা এখান থেকেই কাজ শুরু করি।"

ক্যাপ্টেন মারুফ জিজ্ঞেস করল, "কী কাজ?"

AMARBOI.COM

"এই মহাজাগতিক প্রাণীর সাথে যোগাযোগ।"

ক্যাপ্টেন মারুফ চমকে উঠে বলল, "আপনি পারবেন?"

"ফ্রেড লিস্টার যদি পারে তা হলে আমি কেন পারব না? সেই বদমাইশ তো আমার কোডিং ব্যবহার করেই যোগাযোগ করছে।"

ক্যাপ্টেন মারুফ চারদিকে তাকিয়ে বলল, "কোথায় ফ্রেড লিস্টার?"

রিয়াজ তার নাইটভিশন গগলসটি ক্যাপ্টেন মারুফকে দিয়ে বলল, "এটা দিয়ে দেখেন, মোটামুটিভাবে ইলেভেন ও ক্লক পজিশন। দু শ মিটার দূরে।"

ক্যাপ্টেন মারুফ গগলস চোখে দিয়েই দেখতে পেল অন্যপাশে ফ্রেড লিস্টার এবং আরো কয়েকজন মানুষ বেশ কিছু যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করছে। সেখানে এক ধরনের ব্যস্ততা। যন্ত্রপাতির মাঝে উবু হয়ে বসে খুব মনোযোগ দিয়ে তারা কিছু একটা লক্ষ করছে। মানুষগুলোকে দেখে ক্যাপ্টেন মারুফ নিজের ভিতরে এক ধরনের বিজাতীয় ক্রোধ অনুভব করে, দাঁতে দাঁত ঘষে সে বলল, "ধড়িবাজ বদমাইশের দল। আমি যদি তোদের মুণ্ডু ছিঁড়ে না নিই!"

রিয়াজ হেসে বলল, "মুণ্ডু ছিঁড়ে ফেলার অনেক সময় পাওয়া যাবে, আপাতত আমাকে একটু সাহায্য করুন। এই এ্যান্টেনাটা উঁচু কোনো জায়গায় বসিয়ে দিন।"

ক্যাপ্টেন মারুফ গগলসটা খুলে রিয়াজকে সাহায্য করতে শুরু করে। কিছুক্ষণের মাঝেই বড় একটা গাছের পিছনে কিছু ঝোপঝাড়ের আড়ালে তাদের যন্ত্রপাতি দাঁড়া হতে থাকে। একটা ল্যাপটপ কম্পিউটার ছোট আর. এফ. জেনারেটর আর তার কন্ট্রোল সার্কিটের সাথে জুড়ে দেওয়া হল। এ্যান্টেনা থেকে কো-এক্সিয়াল তার এনে কন্ট্রোল সার্কিটের সাথে জুড়ে দেওয়ামাত্রই এমপ্লিফায়ারের সাথে লাগানো দুটি স্পিকার থেকে মানুষের এক ধরনের যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর শোনা গেল। নিশীতা চমকে উঠে বলল, "কে কথা বলছে?"

"এখনো জানি না। মহাজাগতিক প্রাণীর সাথে কথা বলার জন্য আমি যে কোডটা তৈরি করেছি এটা সেই কোডের মানবিক অনুবাদ।"

"মানে?"

"মানুষেরা যখন একজন আরেকজনের সাথে কথা বলে তার একটা পদ্ধতি আছে। যে ভাষাতেই কথা বলি না কেন তার মূল ব্যাপারটা এক। আমাদের যোগাযোগ মাধ্যমটুকু হচ্ছে আমাদের বুদ্ধিমত্তা, আমাদের অনুভূতি। কিন্তু এই মহাজাগতিক প্রাণী হচ্ছে অন্যরকম। তারা আমাদের মতো ভাবে না, তাদের যদি অনুভূতি থাকেও সেটা অন্যরকম।"

ক্যাপ্টেন মারুফ মাথা নেড়ে বলল, "আমি বুঝতে পারলাম না।"

"যেমন মনে করুন আমি আপনার সাথে কথা বলছি—কথা বলতে গিয়ে আমি এমন কিছু বলে ফেলতে পারি যেটা শুনে আপনি আমার ওপর খুব রেগে উঠতে পারেন। পারেন না?"

"হ্যাঁ পারি।"

"কিন্তু ধরা যাক আপনার মস্তিষ্ক অপারেশন করে এমনভাবে আপনাকে পাল্টে দেওয়া হল যে আপনার ভিতরে রাগের অনুভূতিটুকু নেই। তখন কী হবে? আপনাকে আমি যাচ্ছেতাইভাবে অপমান করতে পারি, আপনি কিছুই মনে করবেন না!"

ক্যাপ্টেন মারুফ মাথা নাড়ল, বলল, "বুঝেছি। তবে কোনো মানুষের রাগ নেই সেটা চিন্তা করা খুব কঠিন, বিশেষ করে আমার পক্ষে!"

"শুধু রাগ নয়, ধরে নিন তার শুধু যে রাগ নেই তা নয়, তার দুঃখও নেই, আনন্দও নেই, ভালবাসাও নেই, ঘৃণাও নেই, হিংসাও নেই।"

"তা হলে আছে কী?"

"মনে করুন তার আছে কোয়াজি ফিলিং।"

"কোয়াজি ফিলিং? সেটা আবার কী?"

"জানি না।" রিয়াজ মাথা নেড়ে বলল, "ধরে নেন এমন একটা অনুভূতি যেটা আমাদের নেই, তাই আমরা সেটা বুঝতেও পারি না, কল্পনাও করতে পারি না।"

"যেটা আপনি জানেন না, যেটা কল্পনা করতে পারেন না সেটা কীভাবে ধরে নেব?"

"এটাই আমার কোড। এটা যোগাযোগ শুরু করে কিছু তথ্য আদানপ্রদান করে, যেখান থেকে যোগাযোগ করার মতো একটা পর্যায়ে পৌঁছানো যায়। এটা মানুষের সাথে মানুষের যোগাযোগ নয়। চতুর্থ পর্যায়ের বুদ্ধিমত্তার সাথে পঞ্চম পর্যায়ের বুদ্ধিমত্তার যোগাযোগ।"

নিশীতা এগিয়ে এসে বলল, "কিন্তু আপনার যোগাযোগ শুরু করতে তো খুব বেশি সময় নেবে না। তাই না?"

"না। কারণ ব্যাটা ফ্রেড লিস্টার এই কাজটুকু করে রেখেছে। তাই আমরা এর মাঝে কথা শুনতে শুরু করেছি। এই যে শোন—"

রিয়াজ এমপ্লিফায়ারের ভলিউম বাড়িয়ে দিতেই সবাই এক ধরনের যান্ত্রিক কথা শুনতে পেল, "বিনিময় মূল বিষয় বিনিময় নিষিদ্ধ যোগাযোগ কেন্দ্রীয় বুদ্ধিমত্তা পারস্পরিক বিনিময় মূল শক্তি কেন্দ্রীয় ক্ষমতা শক্তি অপশক্তি"

নিশীতা মাথা নেড়ে বলল, "কী বলছে কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"এটা ফ্রেড লিস্টারের কথা।"

"ফ্রেড লিস্টারের কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? কী বলছে আবোলতাবোল?"

"আসলে সে আবোলতাবোল বলছে না। তার কথা এই মহাজাগতিক প্রাণীর জন্য কোডিং হয়ে যাবার পর আবার আমাদের ভাষায় অনুবাদ করার সময় এ রকম হয়ে যাচ্ছে। রিয়াজ মুখে হাসি এনে বলল, আউট অফ সাইট আউট অফ মাইন্ড—একটা কথা আছে না?"

"হ্যাঁ, আছে। কী হয়েছে সেই কথার?"

"সেটাকে একবার রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদ করে আবার ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়েছিল। অনুবাদটি কী হয়েছিল জান?"

"কী?"

"ব্লাইন্ড ইডিয়ট। অন্ধ গর্দভ!" অন্ধকারে রিয়াজ নিচু স্বরে হাসল, এই ভয়ংকর বিপজ্জনক পরিবেশে সে নিজের ভিতরে এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করছে, তাই প্রয়োজন থেকে বেশি কথা বলছে সে। যন্ত্রপাতির ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল, "এখানেও এই ব্যাপার, ফ্রেড লিস্টারের কথা মহাজাগতিক প্রাণীর জন্য কোডিং এবং আনকোডিং করার পর এ রকম জট পাকানো আবোলতাবোল হয়ে যাচ্ছে।"

"কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না কী বলছে।"

"কে বলছে বোঝা যাচ্ছে না? শোন আবার—"

তারা শুনল, "বুদ্ধিমত্তা তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম যোগাযোগ কেন্দ্রীয় পারস্পরিক বিনিময় মূল শক্তি বিনিময় ক্ষমতা যোগাযোগ নিষিদ্ধ বিনিময়, পারস্পরিক পাঁচ দুই পাঁচ ছয় তিন সাত পাঁচ ছয় সাত আট..."

ক্যাপ্টেন মারুফ মাথা নাড়ল, বলল, "আমি কিছু বুঝতে পারছি না।"

"সংখ্যাগুলো হচ্ছে পাইয়ের মান—দশমিকের পর দশ হাজার পর্যন্ত। যোগাযোগ করার জন্য এটা ব্যবহার করতে হয়। ফ্রেড লিস্টারের কথায় একটু পরে পরে বলছে 'বিনিময়' 'পারস্পরিক' 'যোগাযোগ' শুনতে পাচ্ছ না?"

"হ্যাঁ।"

"তার মানে সে পারস্পরিক বিনিময় করার চেষ্টা করছে। সে কিছু একটা দেবে তার বদলে সে কিছু একটা চায়।"

"কী দেবে সে?"

"জানি না।"

নিশীতা মনোযোগ দিয়ে স্পিকারের কথাগুলো শুনতে শুনতে বলল, "এগুলো যদি ফ্রেড লিস্টারের কথা হয় তা হলে মহাজাগতিক প্রাণীর কথা কোনগুলো?"

"এখনো শুনতে পাচ্ছি না। আমাকে টিউন করতে হতে পারে।"

রিয়াজ তার যন্ত্রপাতি টিউন করতে করতে হঠাৎ চমকে সোজা হয়ে বলল, "এই যে শোন।"

তারা সবাই শুনল, ভাঙা যান্ত্রিক গলায় কেউ একজন বলছে, "নিচু ক্ষুদ্র দুর্বল কম নিচু ক্ষুদ্র ছোট অল্প কম ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর।"

"কী হল?" নিশীতা চোখ বড় বড় করে বলল, "গালাগাল করছে নাকি আমাদের?"

"সেরকমই মনে হচ্ছে।" রিয়াজ হাসার মতো ভঙ্গি করে বলল, "আমাদের ফ্রেড লিস্টারের চরিত্রটি ধরে ফেলেছে মনে হচ্ছে।"

ফ্রেড লিস্টার আবার বলল, "বিনিময় পারস্পরিক বিনিময়।"

মহাজাগতিক প্রাণী উত্তর করল, "অসম দুর্বল ক্ষুদ্র।"

"বিনিময় বিনিময় প্রযুক্তি বিনিময়।"

"দুর্বল ক্ষুদ্র।"

"বিনিময় শিশু মানব শিশু বিনিময় আমন্ত্রণ মানব শিশু।"

রিয়াজ চমকে উঠে বলল, "শুনেছ কী বলছে ফ্রেড? সে মানব শিশুকে বিনিময় করতে চাইছে। মানব শিশুর বদলে প্রযুক্তি চাইছে।"

নিশীতা হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়াল, বলল, "রাহেলা কোথায়?"

সবাই উঠে দাঁড়াল, চারপাশে তাকাল, কোথাও রাহেলাকে দেখা যাচ্ছে না। নিশীতা চাপা স্বরে ডাকল, "রাহেলা, রাহেলা।"

রাহেলা কোনো উত্তর করল না, হঠাৎ রিয়াজ চমকে উঠল, হাত দিয়ে দেখাল, "ঐ যে দেখো।"

সবাই অবাক হয়ে দেখল রাহেলা সোজা এগিয়ে যাচ্ছে। মহাকাশযানের নিচে নীলাভ আলোতে যে অতিপ্রাকৃত জগৎ তৈরি হয়ে আছে সে সেদিকে হেঁটে যাচ্ছে। সেখানে তার শিশু সন্তানকে আটকে রেখেছে—সে তাকে মুক্ত করে আনতে যাচ্ছে।

নিশীতা অবাক হয়ে দেখল রাহেলার মাঝে কোনো আতঙ্ক নেই, কোনো ভয়ভীতি-দুর্ভাবনা নেই। কোনো বিভ্রান্তি নেই, দুর্বলতা নেই। সে স্থির পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে! কী করতে হবে সে ব্যাপারে সে আশ্চর্যরকম নিশ্চিত, আশ্চর্যরকম আত্মবিশ্বাসী।

১১

দূরে রাহেলার দিকে তাকিয়ে থেকে নিশীতা বলল, "এখন কী হবে?"

রিয়াজ বুকে আটকে থাকা নিশ্বাসটা আটকে রেখে বলল, "জানি না। তবে একদিক দিয়ে ভালোই হল। কীভাবে শুরু করব সেটা নিয়ে আর সিদ্ধান্ত নিতে হল না। রাহেলাই শুরু করে দিল।"

AMARBOI.COM

"কী সিদ্ধান্ত?"

"ফ্রেড লিস্টার আর মহাজাগতিক প্রাণী যে কথাবার্তা বলছে তার মাঝখানে আমাদের কথা বলা।"

"কীভাবে করব সেটা?"

"দেখা যাক—" রিয়াজ চিন্তিত মুখে বলল, "ক্যাপ্টেন মারুফ।"

"বলুন।"

"ফ্রেড লিস্টার যেই মুহূর্তে রাহেলাকে দেখতে পাবে তখন টের পাবে আমরা এখানে চলে এসেছি। কিছু একটা করতে পারে তখন। আপনি সেটা সামলাবেন।"

ক্যাপ্টেন মারুফ তার ঘাড়ে ঝোলানো স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটা হাতে নিয়ে বলল, "ঠিক আছে। নিশ্চিন্ত থাকেন।"

"চমৎকার।" রিয়াজ নিশীতাকে ডাকল, "নিশীতা।"

"কী হল?"

"কাছে এস, তোমার সাহায্য দরকার এখন।"

"আমি? আমি কী করব?"

"তুমি কথা বলবে।"

"কী কথা বলব? কার সাথে কথা বলব?"

"মহাজাগতিক প্রাণীর সাথে।"

নিশীতা অবাক হয়ে বলল, "আমি কীভাবে কথা বলব? আমি তো আপনার কোডিং সম্পর্কে কিছুই জানি না।"

"সেজন্যই তুমি কথা বলবে। কোডিং জানা থাকলে কথা বলা যায় না, কথাগুলোতে তখন এক ধরনের পক্ষপাত এসে যায়।"

নিশীতা মাথা নেড়ে বলল, "কিন্তু আমি কী বলব?"

"তোমার যা ইচ্ছে। তুমি একজন মানুষ। তোমার সামনে একটি মহাজাগতিক প্রাণী। সে কিছু ক্রিমিনালের শরীর দখল করে নিয়েছে সেই শরীর ব্যবহার করে এখানে কাজ করছে। আমার ধারণা মানুষ সম্পর্কে তার হিসাবটি ভুল। এই প্রাণী ধরে নিয়েছে সব মানুষই বুঝি কব্জি কাটা দবির—ধরে নিয়েছে যারা ক্রিমিনাল তারা সত্যিকারের মানুষ, অন্যরা দুর্বল, অন্যরা অক্ষম। তার সেই ভুল ধারণা ভেঙে দিতে হবে।"

নিশীতা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে রিয়াজের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি সেই ভুল ধারণা ভেঙে দেব?"

"হ্যাঁ। আর কেউ নেই।" রিয়াজ নিশীতার দিকে একটা অত্যন্ত সংবেদনশীল মাইক্রোফোন এগিয়ে দিয়ে বলল, "নাও কথা বলতে শুরু কর।" নিশীতা অবাক হয়ে রিয়াজের দিকে তাকাল, রিয়াজ অধৈর্য হয়ে বলল, "দেরি কোরো না—রাহেলা পৌঁছে যাচ্ছে—"

নিশীতা মাইক্রোফোনটি নিয়ে ইতস্তত করে বলল, "মহাজাগতিক প্রাণী আমি তোমাকে উদ্দেশ্য করে কথা বলছি, কিন্তু আমি জানি না তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ কি না। যদি বুঝেও থাক তার কতটুকু বুঝেছ—কীভাবে বুঝেছ। পৃথিবীর পক্ষ থেকে তোমাকে অভিবাদন জানাচ্ছি।"

রিয়াজ তার হেডফোনে নিশীতার কথা শুনছিল কোডিং করার পর সে কথাটি হল, "এক চার এক পাঁচ নয়, দুই ছয় পাঁচ তিন পাঁচ। আমন্ত্রণ সম আমন্ত্রণ—"

AMARBOI.COM

নিশীতা আবার বলল, "খুব দুঃখের কথা তোমার মতো বুদ্ধিমান একটা প্রাণীর সাথে আমাদের সরাসরি যোগাযোগ হল না। তুমি কব্জি কাটা দবিরের মতো একটা ক্রিমিনালকে পেয়ে ভাবলে সে পৃথিবীর মানুষের উদাহরণ। আসলে সে উদাহরণ ছিল না। পৃথিবীর সাধারণ মানুষ এত নিষ্ঠুর নয়, এত স্বার্থপর নয়, এত নীতিবিবর্জিত নয়।"

রিয়াজ শুনল সেটি কোডিং করা হল, "ভুল পরিচয় মানুষ।"

নিশীতা বলল, "তুমি কব্জি কাটা দবিরের মতো একজন একজন মানুষকে দখল করে নিলে, কী লাভ হল তাতে? পৃথিবীর সত্যিকার মানুষের সাথে তোমার পরিচয় হল না। সত্যিকার মানুষের সাথে পরিচয় হবে ভালবাসা দিয়ে। তুমি তার সুযোগ দিলে না। মানুষের সত্যিকার পরিচয় তোমার কাছে অজানা থেকে গেল।"

নিশীতার কথাগুলো কোডিং হল এভাবে, "দুই এক ছয় চার দুই শূন্য এক নয় আট নয় ভুল ভুল ভুল।"

"তুমি কেন এসেছ এখানে? পৃথিবীর মানুষের কাছে গোপন রেখে একটা ভয়ঙ্কর ত্রাস সৃষ্টি করে তোমার কী লাভ? এক বুদ্ধিমান প্রাণী অন্য বুদ্ধিমান প্রাণীকে কি ভয় পেতে পারে? নাকি পাওয়া উচিত?"

কোডিং হল, "ভয় ঠিক নয়, কারণ নয় বোধগম্য।"

নিশীতা বলল, "এখানে এসে তুমি ফ্রেড লিস্টারের মতো বাজে মানুষের সাথে ব্যবসা করতে নেমে গেলে, তুমি তাকে দেবে প্রযুক্তি আর সে তোমাকে দেবে একটা মানব শিশু, এই মানব শিশু দেওয়ার অধিকার তাকে কে দিয়েছে? তার কত বড় দুঃসাহস, সে মায়ের বুক খালি করে তোমাকে একটা শিশু দিয়ে দেয়?"

কোডিং করা হল, "অগ্রহণযোগ্য অসম বিনিময়।"

নিশীতা আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঠিক তখন স্পিকারে কথা ভেসে এল, "আমন্ত্রিত চুক্তিবদ্ধ আমন্ত্রিত।"

নিশীতা চমকে উঠল, রিয়াজ নিঃশ্বাস বন্ধ করে বলল, "মহাজাগতিক প্রাণী কথা বলছে, সে বলছে তাকে আমন্ত্রণ করে আনা হয়েছে। তার সাথে চুক্তি করা হয়েছে।"

"কে তোমাকে আমন্ত্রণ করেছে? কে তোমার সাথে চুক্তি করেছে? আমরা সেই চুক্তি মানি না, বিশ্বাস করি না। পৃথিবীর মানুষকে বিপদের মাঝে ফেলে এ রকম চুক্তি করার অধিকার কারো নেই।"

মহাজাগতিক প্রাণী বলল, "মানুষ দুর্বল। মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত। অক্ষম। ধ্বংসযোগ্য।"

নিশীতা চিৎকার করে বলল, "কখনো নয়। মানুষ কখনো দুর্বল নয়, আতঙ্কগ্রস্ত নয়। অক্ষম নয়, ধ্বংসযোগ্য নয়। তুমি যে মানুষদের দেখেছ তারা ভীতু, আতঙ্কগ্রস্ত। তারা অক্ষম। কিন্তু তার বাইরেও মানুষ আছে।"

"মস্তিষ্ক নিউরন সিনাপ্স সংযোগ আতঙ্ক ভীতি।"

"না।" নিশীতা জোর দিয়ে বলল, "মানুষ মাত্রেই আতঙ্কিত নয়। ভীত নয়।"

"প্রমাণ। তথ্য যুক্তি।"

"তুমি প্রমাণ চাও? ঠিক আছে আমি তোমাকে প্রমাণ দেব। ঐ দেখ কমলা রঙের শাড়ি পরে একজন মা তোমাদের কাছে যাচ্ছে। তার সন্তানকে তোমরা নিয়ে গেছ। সেই মা তার সন্তানকে ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছে। তার মস্তিষ্কের মাঝে ঢুকে দেখ সে ভয় পায় কি না! আমি তোমাকে বলে দিতে পারি একজন সন্তানকে বাঁচানোর জন্য মা যখন রুখে দাঁড়ায় তার ভিতরে কোনো ভয় থাকে না, আতঙ্ক থাকে না, কোনো দুর্বলতা থাকে না। তোমার যদি

AMARBOI.COM

ক্ষমতা থাকে তুমি এই মাকে থামাও। তোমার সমস্ত শক্তি দিয়েও তুমি তাকে থামাতে পারবে না। তুমি তাকে ধ্বংস করে দিতে পারবে, তুমি তাকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারবে, তাকে হত্যা করতে পারবে কিন্তু তুমি তাকে থামাতে পারবে না। সন্তানের জন্য মায়ের বুকের ভিতরে কী ভালবাসার জন্ম হয় তুমি সেটা জান না। তোমার ভিতরে মানুষের অনুভূতি থেকে লক্ষগুণ তীব্র অনুভূতি থাকতে পারে কিন্তু তাতে কিছু আসে-যায় না। কারণ সন্তানের জন্য মায়ের তীব্র ভালবাসার কাছে তোমার সব অনুভূতি ধুয়ে মুছে যাবে। বানের জলের মতো ভেসে যাবে, ধুলোর মতো উড়ে যাবে!"

রিয়াজ নিশীতার হাত স্পর্শ করে বলল, "নিশীতা।"

নিশীতা নিজেকে সংবরণ করে থামল, রিয়াজের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী হয়েছে, ড. হাসান?"

"তুমি এখন থামতে পার, নিশীতা।"

"কেন?"

তুমি যে কথাগুলো বলেছ সেটাকে কোডিং করে মহাজাগতিক প্রাণীকে জানানো হয়েছে। মহাজাগতিক প্রাণী সেটা গ্রহণ করেছে।"

নিশীতা তীক্ষ্ণ চোখে রিয়াজের দিকে তাকাল, বলল, "কী গ্রহণ করেছে?"

"চ্যালেঞ্জ।"

"চ্যালেঞ্জ? কিসের চ্যালেঞ্জ? কে দিয়েছে চ্যালেঞ্জ?"

"তুমি দিয়েছ। রাহেলা বনাম মহাজাগতিক প্রাণী।"

"কখন দিলাম?"

"এই মাত্র!"

"কী হবে এই চ্যালেঞ্জে?"

মহাজাগতিক প্রাণী মুখোমুখি হবে রাহেলার। মানুষের শরীর ব্যবহার করে নয় সত্যি সত্যি। আসল মহাজাগতিক প্রাণী। রাহেলা যদি তাকে পরাজিত করতে পারে তা হলে আমরা বেঁচে যাব। পৃথিবীর মানুষ বেঁচে যাবে।"

"আর যদি না পারে?"

"সেটা নিয়ে দুর্ভাবনা করার কেউ থাকবে না নিশীতা।"

AMARBOI.COM

রাহেলা সাবধানে পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে, জায়গাটা উঁচু-নিচু, মনে হয় কাঁটাকুটো আছে। পায়ে খোঁচা লাগছে, হয়তো কেটেকুটে যাচ্ছে, কিন্তু সেটা নিয়ে সে মাথা ঘামাচ্ছে না। দূরে মাটির ওপরে কিছু একটা ভাসছে—শার্টপ্যান্ট পরে থাকা মেয়ে আর চমশা পরা মানুষটা এটা নিয়ে খুব উত্তেজিত হয়ে আছে, খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যাপার কিন্তু সে এটা নিয়ে মাথা ঘামায় না। জিনিসটার নিচে নীল আলো, কী বিচিত্র নীল আলো, এ রকম নীল আলো সে কখনো দেখে নি। মনে হচ্ছে জ্যোৎস্নার আলোকে কেউ নীল রং দিয়ে রং করে দিয়েছে। নীল আলোর নিচে ঐ প্রেতগুলো আস্তে আস্তে নড়ছে। কে জানে কোথা থেকে এসেছে এগুলো। দেখতে মানুষের মতো কিন্তু মানুষ নয়। দেখলে কী ভয় লাগে! সমস্ত শরীর কাঁপতে থাকে ভয়ে। ভয় আর ঘেন্না—শরীর থেকে শুঁড়ের মতো কী যেন বের হয়ে আসছে, সেগুলো আবার কিলবিল করে নড়ছে। তার বাচ্চাটিকে ঘিরে রেখেছে এই প্রেতগুলো, এই দানবগুলো, এই রাক্ষসগুলো। কিন্তু রাহেলা ঠিক করেছে আজকে সে ভয় পাবে না। সে ঘেন্নাও করবে না। সে কোনোদিকে না তাকিয়ে সোজা হেঁটে যাবে তার বাচ্চার কাছে,

তাকে ধরে শক্ত করে বুকে চেপে ধরবে। তারপর আর কিছু আসে-যায় না। তাকে মেরে ফেললেও আর কিছু আসে-যায় না। মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তে সে তার বাচ্চাটিকে বুকে চেপে ধরে একবার আদর করতে চায়। আর কিছুতে কিছু আসে–যায় না।

রাহেলা হঠাৎ এক ধরনের শব্দ শুনতে পায়। ঝিঁঝি পোকার ডাকের মতো এক ধরনের শব্দ কিন্তু সে জানে এটা ঝিঁঝি পোকার ডাক নয়। এটা অন্য কিছু। এই শব্দের সাথে সাথে মাথায় কেমন জানি যন্ত্রণা করে ওঠে। শুধু যন্ত্রণা নয় তার মনে হয় মাথার ভিতরে কিছু একটা হচ্ছে। হঠাৎ করে রাহেলা কিছু একটা দেখতে পায়। নিঃসীম শূন্য একটা প্রান্তরের মতো একটা কিছু, তার মাঝে কিছু একটা দাঁড়িয়ে আছে, বিশাল কিছু, আদি নেই অন্ত নেই সেরকম একটা কিছু। প্রচণ্ড আতঙ্কে রাহেলার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসে। মনে হয় অচেতন হয়ে পড়বে সে।

কিন্তু না, তাকে অচেতন হলে চলবে না। তাকে জেগে থাকতে হবে, যেভাবেই হোক তাকে জেগে থাকতে হবে। তাকে ভয় পেলেও চলবে না, পৃথিবীর সব ভয়কে এখন তার বুকের ভিতর থেকে ঠেলে সরিয়ে দিতে হবে। কাউকে সে ভয় পাবে না—সে যতক্ষণ তার সোনামণিকে বুকে চেপে না ধরবে ততক্ষণ সে পৃথিবীর কোনো কিছুকে তোয়াক্কা করবে না।

রাহেলা জোর করে নিজেকে দাঁড়া করিয়ে রাখল—ঐ তো দেখা যাচ্ছে তার শিশু সন্তানকে, শুয়ে শুয়ে হাত পা নাড়ছে, কাঁদছে অসহায়ের মতো। রাহেলা আবার ছুটে যেতে থাকে।

মাথার ভিতরে আবার একটা ভোঁতা যন্ত্রণা হয়, কিছু একটা ঘটে যায় মাথার ভিতরে, জ্বর হলে যেরকম বিকার হয় ঠিক সেরকম লাগছে তার। মনে হয় জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছে সে, কেউ একজন তাকে ভয় দেখাচ্ছে। তাকে বলছে ফিরে যেতে। বলছে ফিরে না গেলে তাকে খুন করে ফেলবে, তাকে পুড়িয়ে ফেলবে, তাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে। তাকে ধ্বংস করে ফেলবে। রাহেলার হাসি পেল হঠাৎ, সে কি মৃত্যুকে ভয় পায়? তাকে ধ্বংস করতে চাইলে করুক। তার যাদুমণিকে, সোনামণিকে বুকে চেপে ধরতে না পারলে সে কি বেঁচে থাকতে চায়? বেঁচে থেকে কী হবে তা হলে?

রাহেলা টলতে টলতে হাঁটতে থাকে। মাথা থেকে কিলবিলে শুঁড় বের হয়ে আসা দানবগুলো তাকে ঘিরে ধরতে চেষ্টা করছে কিন্তু রাহেলা আজকে থামবে না। আজকে কেউ তাকে থামাতে পারবে না। রাহেলা ছুটতে শুরু করে। কিলবিলে একটা শুঁড় দিয়ে তাকে ধরে ফেলে একটা দানব, কী ভয়ঙ্কর শীতল পিচ্ছিল সেই অনুভূতি, রাহেলার সমস্ত শরীর ঘিনঘিন করে ওঠে। চিৎকার করে ঝটকা মেরে নিজেকে মুক্ত করে নেয়। সাথে সাথে আরেকটি দানব তাকে জাপটে ধরে। প্রাণপণে নিজেকে মুক্ত করে নেয়, পিছন থেকে দানবগুলো ছুটে আসছে, তাকে ধরে ফেলছে। চিৎকার করতে করতে ছুটে যায় রাহেলা, পা বেঁধে পড়ে যায় হঠাৎ, দানবগুলোর হাত থেকে বিদ্যুতের ঝলক বের হয়ে আসছে, প্রচণ্ড যন্ত্রণায় থরথর করে কাঁপতে থাকে, চোখের সামনে সবকিছু অন্ধকার হয়ে আসতে চায়, ভারী একটা লাল পরদা নেমে আসছে চোখের সামনে, নিশ্বাস নিতে পারছে না রাহেলা, মনে হচ্ছে বুকের ওপর কিছু একটা চেপে বসছে পাথরের মতো। রাহেলা বুঝতে পারে সে মরে যাচ্ছে, তাকে মেরে ফেলছে সবাই।

কিন্তু সে মরবে না, তার সোনামণিকে স্পর্শ না করে সে কিছুতেই মরবে না। হাতে ভর দিয়ে নিজেকে টেনে নিতে থাকে, বিদ্যুতের ঝলকানিতে থরথর করে কেঁপে কেঁপে সে

এগুতে থাকে। তীক্ষ্ণ কিছু দিয়ে তাকে গেঁথে ফেলছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার শরীর। মুখ দিয়ে দমকে দমকে কাঁচা রক্ত বের হয়ে এল রাহেলার, কিন্তু সে তবু থামল না। নিজেকে টেনে টেনে নিতে থাকল সামনে, এই তো আর মাত্র কয়েক ফুট।

প্রচণ্ড আঘাতে রাহেলা ছিটকে পড়ল, ভয়ঙ্কর আক্রোশে কেউ তাকে আঘাত করেছে, মনে হচ্ছে তার সমস্ত শরীর বুঝি ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে যাচ্ছে। কিছু আসে-যায় না তাতে তার। শরীরের একটা ক্ষুদ্র অংশও যদি বেঁচে থাকে সেটিই এগিয়ে যাবে, স্পর্শ করবে তার সোনামণিকে, তার যাদুকে, তার বুকের ধনকে।

রাহেলা মাটি কামড়ে কামড়ে এগিয়ে গেল, চোখ খুলে দেখতে পেল ভয়ঙ্কর একটি শক্তি, বিচিত্র একটা প্রাণী তাকে থামিয়ে দিতে চাইছে, তাকে শেষ করে দিতে চাইছে কিন্তু পারছে না, কর্কশ শব্দে কান ফেটে যাচ্ছে রাহেলার, মনে হচ্ছে সমস্ত শরীরে কেউ গরম সীসা ঢেলে দিয়েছে, মনে হচ্ছে তার শরীরকে কেউ মাটির সাথে গেঁথে ফেলছে।

তার মাঝেও সে এগিয়ে গেল, বিন্দু বিন্দু করে এগিয়ে গেল। পৃথিবীর সকল শক্তি, মহাজাগতিক প্রাণীর সমস্ত শক্তি তুচ্ছ করে সে এগিয়ে গেল, আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে সে এগিয়ে গেল। এগিয়ে গিয়ে সে তার হারিয়ে যাওয়া ছিনিয়ে নেওয়া সন্তানকে ঝাপটে ধরল।

সাথে সাথে মনে হল তার শরীরের মাঝে হঠাৎ মত্ত হাতির বল এসেছে। পৃথিবীর সব কোলাহল, সব ধ্বনি হঠাৎ করে নীরব হয়ে যায়। হঠাৎ করে সব যন্ত্রণা সব কষ্ট মিলিয়ে যায়। সব অশুভ শক্তি হঠাৎ করে দূরে সরে যায়। রাহেলা গভীর ভালবাসায় তার হারিয়ে যাওয়া সন্তানকে বুকে টেনে নেয়, গভীর মমতায় বুকের মাঝে চেপে ধরে। চারপাশের জগৎ হঠাৎ করে দুলে ওঠে। অশরীরী দানবের মতো মূর্তি, মাথার উপরে বিচিত্র মহাকাশযান, অতিপ্রাকৃত নীল আলো, কোনো কিছুকেই আর সত্যি মনে হয় না, সবকিছু যেন স্বপ্ন। সবকিছুই যেন অর্থহীন। কিন্তু তাতে কিছু আসে-যায় না। রাহেলা জানে সে আছে এবং তার বুকের মাঝে আছে তার সন্তান। পৃথিবীর কোনো শক্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনো শক্তি তাকে নিতে পারবে না। বুকের মাঝে এক গভীর প্রশান্তি নিয়ে রাহেলা জ্ঞান হারাল।

amarboi.com

নিশীতা আর রিয়াজ নিশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে ছিল, তারা এবার একজন আরেকজনের দিকে তাকাল, রিয়াজ নিশীতার হাত স্পর্শ করে বলল, "আমরা বেঁচে গেলাম নিশীতা।"

নিশীতা বুকের ভিতর আটকে থাকা নিশ্বাসটি বের করে দিয়ে বলল, "এখন কী হবে?"

"আমার ধারণা মহাকাশযানটি চলে যাবে।"

"চলে যাবে?"

"হ্যাঁ।"

রিয়াজের কথা শেষ হবার আগেই মহাকাশযানটি কাঁপতে শুরু করে, অত্যন্ত উচ্চ কম্পনের একটা শব্দ শোনা যায়, নীল আলোটিও হঠাৎ তীব্র হয়ে ওঠে। নিশীতা আর রিয়াজ দেখতে পেল মহাকাশযানটি ধীরে ধীরে উপরে উঠতে শুরু করেছে, উপরে উঠতে উঠতে সেটি কয়েক শ মিটার উপরে উঠে গেল, তারপর হঠাৎ কানে তালা লাগানো শব্দ করে মহাকাশযানটি আকাশ চিরে উড়ে গেল। এক মুহূর্তের জন্য আকাশে একটা নীল আলোর রেখা দেখা গেল, তারপর আর কোথাও কিছু নেই। পৃথিবীর বুক থেকে মহাকাশযানটি চিরদিনের জন্য অদৃশ্য হয়ে গেছে।

একটু আগে যেখানে নীল আলো ছিল এখন সেখানে গাঢ় অন্ধকার, সেখানে রাহেলা তার সন্তানকে বুকে চেপে ধরে শুয়ে আছে। তাকে ঘিরে কিছু অপ্রকৃতিস্থ মূর্তি। মহাকাশযান আর মহাজাগতিক প্রাণী চলে যাবার পর সেগুলো এখন কী করছে কে জানে!

রিয়াজ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "চল নিশীতা। রাহেলার কাছে যেতে হবে।"

"চলুন।"

"ফ্রেড লিস্টার? ফ্রেড লিস্টার কী করবে এখন?"

"জানি না। মনে হয় মাথা কুটছে।"

"কিন্তু ওকে ধরতে হবে না?"

"ক্যাপ্টেন মারুফ ধরবে। মনে নেই সে কী রকম টাইকোয়াভো জানে! থার্ড ডিগ্রি ব্ল্যাক বেল্ট।"

ঝোপঝাড় কাদা জলা মাটি ভেঙে ওরা সামনে যেতে যেতে হঠাৎ করে প্রেতের মতো মানুষগুলোর একটার মুখোমুখি হল। এর আগে যারা বর্ণনা দিয়েছিল সবাই বলেছে—চোখ দুটো থেকে অন্ধকারের মাঝে লাল আলোর মতো জ্বলতে থাকে, দূরে বসে তারাও দেখেছে, কিন্তু এখন সেই আলো নেই। পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ইতস্তত হাঁটছে, তাদের দেখতে পেল বলে মনে হল না, পাশে একটা গাছে ধাক্কা খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল, একবার ওঠার চেষ্টা করল কিন্তু উঠতে পারল না। একটা পা অত্যন্ত বিচিত্র ভঙ্গিতে নড়তে থাকল, মনে হতে লাগল শরীরের সাথে তার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।

রিয়াজ অকারণেই গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, "এই জম্বিগুলো শেষ হয়ে গেছে, এখন আর তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।"

"এদের শরীরের ভিতরে ইঁদুরের মতো কী যেন থাকে—"

"এখন আছে কি না জানি না। থাকলেও আর ভয় নেই।"

দুজনে পড়ে থাকা মানুষটিকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যায়, আশপাশে আরো কিছু মূর্তি ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেউ কেউ পড়ে গিয়েছে, কেউ কেউ গাছপালায় আটকে গিয়েছে, কেউ কেউ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায় এক জায়গায় ঘুরছে। মানুষের মতো এই প্রাণীগুলোর আচরণে এমন একটি অস্বাভাবিকতা রয়েছে যে দেখলেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। প্রাণীগুলোকে সাবধানে পাশ কাটিয়ে তারা রাহেলার কাছে ছুটে গেল।

রাহেলা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে, শরীরে মুখে ছোপ ছোপ রক্ত। অচেতন হয়েও সে হাত দিয়ে পরম আত্মবিশ্বাসে তার সন্তানকে জড়িয়ে রেখেছে। সন্তানটিও পরম নির্ভাবনায় তার মায়ের বুকে গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে। নিশীতা নিচু হয়ে রাহেলার বুক থেকে সাবধানে শিশুটিকে তুলে নেয়, পরম স্নেহে জড়িয়ে ধরে, শিশুটি ক্ষুধার্ত, মুখ নেড়ে বৃথাই খাওয়ার চেষ্টা করতে করতে তারস্বরে কেঁদে উঠল।

রিয়াজ নিচু হয়ে রাহেলাকে একটু পরীক্ষা করল, বলল, "আমাদের এখনই মেডিক্যাল হেল্প দরকার।"

নিশীতা বলল, "আমি রাহেলার সাথে আছি, আপনি দেখুন কিছু করা যায় কি না।"

নিশীতার কথা শেষ হবার আগেই দেখা গেল কেউ একজন টর্চ লাইটের আলো ফেলে ছুটে ছুটে আসছে, কাছে এলে দেখা গেল মানুষটি ক্যাপ্টেন মারুফ। কপালের কাছে কেটে গেছে, সেখান থেকে রক্ত ঝরছে। রিয়াজ উদ্বিগ্ন গলায় বলল, "কী হয়েছে আপনার?"

"ও কিছু না। একজন মিলে চার–পাঁচজনকে ধরতে গেলে ওরকমই হয়।"

"চার–পাঁচজনকে ধরেছেন?"

"হ্যাঁ। বেঁধেছেদে রাখতে সময় লাগল। এক বদমাইশের কাছে আবার আর্মস ছিল, তাকে কাবু করতে গিয়ে একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে।"

"কী রকম বাড়াবাড়ি?"

"মনে হয় ব্যাটার নাকের হাড়টা ভেঙে গেছে। পাঁজরের হাড়ও যেতে পারে দুই-একটা।"

নিশীতা অবাক হয়ে ক্যাপ্টেন মারুফের দিকে তাকিয়ে রইল, বলল, "আপনি একা ঐ মোষের মতো এতগুলো মানুষকে কাবু করেছেন?"

"আর কাকে পাব! একাই তো করতে হবে।"

"কীভাবে করলেন আপনি?"

"রিয়াজ সাহেব যখন আমাকে বললেন আপনাদের প্রকেটশন দিতে তখনই বুঝেছিলাম কাজটা সহজ হবে না। আমাদের মিলিটারি লাইনে একটা কথা আছে যে, অফেন্স ইজ বেস্ট ডিফেন্স। তাই আমি আর দেরি করি নি, পিছন থেকে গিয়ে সবগুলোকে আটক করেছি। খুব কপাল ভালো গুলি করতে হয় নি। দরকার হলে করতাম!"

রিয়াজ রাহেলার দিকে তাকিয়ে বলল, "রাহেলার মেডিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্স দরকার। এক্ষুনি হাসপাতালে নিতে হবে।"

ক্যাপ্টেন মারুফ চিন্তিত মুখে কিছুক্ষণ ভেবে বলল, "বদমাইশগুলোর হেলিকপ্টারটা আছে। পাইলটকে একটু ধোলাই দিতে হয়েছে কিন্তু মনে হয় হেলিকপ্টারটা নিয়ে যেতে পারবে। আমি সাথে থাকব, মাথায় একটা রিভলবার ধরে রাখব—"

"নিশীতা বলল, মনে হয় তার দরকার হবে না।"

"কেন?"

"ঐ দেখেন।"

রিয়াজ এবং ক্যাপ্টেন মারুফ তাকিয়ে দেখল, বহুদূর থেকে মশাল জ্বালিয়ে শত শত গ্রামবাসী ছুটে আসছে। হেডলাইট দেখে মনে হয় পিছনে দুই–একটা গাড়িও আসছে। নিশীতা কান পেতে শুনল হেলিকপ্টারের শব্দও শোনা যাচ্ছে। কাদের হেলিকপ্টার কে জানে, কিন্তু এখন আর কিছু আসে-যায় না। কিছুক্ষণের মাঝেই এখানে এই এলাকার শত শত মানুষ চলে আসবে। কেউ তখন আর কিছু করতে পারবে না।

AMARBOI.COM

১২

নিশীতা ঘর থেকে বের হতেই আম্মা অবাক হয়ে তার দিকে তাকালেন কিন্তু কিছু বললেন না। নিশীতা ভান করল সে তার মায়ের চোখের বিস্ময়টুকু লক্ষ করে নি। খুব সহজ গলায় বলল, "আম্মা আমি রাত দশটার মাঝে চলে আসব।" আম্মা মুখ টিপে হাসলেন, বললেন, "ঠিক আছে। তোর ট্যাক্সি এসেছে?"

নিশীতা আবার ভান করল সে মায়ের হাসিটি লক্ষ করে নি; বলল, "এসেছে আম্মা?"

বাসা থেকে বের হয়ে সে তার মোটর সাইকেলটার দিকে তাকাল, আজকে সে এটাতে উঠবে না। অনেকদিন পর আজকে সে খুব যত্ন করে সেজেছে। রুপালি পাড়ের একটা নীল শাড়ি পরেছে, গলায় নীল পাথর দেওয়া রুপার চোকার, হাতে নীল আর সাদা কাচের চুড়ি, কানে নীল

পাথরের দুল। এমনিতেই সে দীর্ঘাঙ্গী, আজ সাদা স্ট্র্যাপের পেন্সিল হিল এক জোড়া স্যান্ডেল পরেছে বলে আরো লম্বা দেখাচ্ছে। রোদে ঘুরে ঘুরে তার ত্বকের একটা রোদে পোড়া সজীবতা আছে, আজ প্রসাধন করে সেটা আড়াল করে কপালে নীল একটা টিপ দিয়েছে। তার চুল খুব লম্বা নয় আজকে সেটাকে ফুলে-ফেঁপে বেঁধে দিয়েছে, একটা বেলি ফুলের মালা পেলে সেটা দিয়ে অবাধ্য চুলগুলোকে শাসন করা যেত। ঘর থেকে বের হবার সময় আয়নায় নিজের চেহারা দেখে সে নিজেই অবাক হয়ে গেছে, কে জানে তাকে হয়তো সুন্দরী বলেই চালিয়ে দেওয়া যায়।

ক্যাপ্টেন মারুফ আর তার স্ত্রী বনানীতে একটা থাই রেস্টুরেন্টে নিশীতা আর রিয়াজকে খেতে ডেকেছে। রিয়াজ হাসান ঢাকার রাস্তাঘাট ভালো চেনে না, নিশীতা বলেছে তাকে বাসা থেকে তুলে নেবে। নিশীতা ট্যাক্সিতে উঠে রিয়াজের বাসার ঠিকানা দিতেই ট্যাক্সির ড্রাইভার ট্যাক্সি ছেড়ে দেয়।

রিয়াজ নিশীতাকে দেখে এক ধরনের মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইল। নিশীতা একটু লজ্জা পেয়ে বলল, "কী হল আপনার?"

"তোমাকে অপরিচিত একজন মহিলার মতো দেখাচ্ছে!"

"আপনাকে বলেছিলাম একদিন শাড়ি পরে দেখিয়ে দেব—তাই দেখিয়ে দিচ্ছি!"

"হ্যাঁ, শাড়িটি একটি অপূর্ব পোশাক। একজন মেয়ে যখন শাড়ি পরে তখন তাকে যে কী চমৎকার দেখায়!"

নিশীতা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "আমি না হয়ে অন্য যে কোনো মেয়ে হলে আপনার এই কথায় একটা ভিন্ন অর্থ বের করে আপনার বারোটা বাজিয়ে দিত।"

"ভিন্ন অর্থ?" রিয়াজ একটু অবাক হয়ে বলল, "কী ভিন্ন অর্থ?"

"যে আমাকে যখন সুন্দর দেখায় তার কৃতিত্বটা আমার নয়—কৃতিত্বটা শাড়ির!"

রিয়াজ হেসে বলল, "অন্য কোনো মেয়ে হলে আমি কি এ ধরনের কোনো কথা বলতাম? তুমি বলেই করেছি।"

"কেন?"

"কারণ গত কয়েকদিন তুমি আর আমি যার ভিতর দিয়ে গিয়েছি যে পৃথিবীর খুব বেশি মানুষ তার ভিতর দিয়ে যায় না। তখন তোমাকে যেটুকু দেখেছি, মনে হয়েছে তুমি খুব চমৎকার একটা মেয়ে।"

"থ্যাংক ইউ।"

রিয়াজ একটা নিশ্বাস ফেলে অনেকটা স্বগতোক্তির মতো করে দ্বিতীয়বার বলল, "খুব চমৎকার একটা মেয়ে!"

নিশীতা দ্বিতীয়বার থ্যাংক ইউ বলবে কি না ভাবছিল কিন্তু তার আগেই টেবিলের ওপর থেকে এপসিলন কর্কশ গলায় বলল, "কে? কে এসেছে?"

নিশীতা বলল, "আমি।"

"আমি কে?"

"আমি নিশীতা।"

"তুমি কেন নিজেকে নিশীতা বলে দাবি করছ? আমার ডাটাবেসে নিশীতার যে তথ্য আছে তার সাথে তোমার মিল নেই কেন?"

"কারণ আমি শার্ট-প্যান্ট না পরে আজকে শাড়ি পরেছি।"

"কেন তুমি শাড়ি পরেছ?"

AMARBOI.COM

নিশীতা একটা নিশ্বাস ফেলল, মহাজাগতিক প্রাণীটি চলে যাবার পর এপসিলনকে ব্যবহার করে দ্বিতীয় মহাজাগতিক প্রাণীটি আর তার সাথে যোগাযোগ করে নি। প্রাণীটিকে ঠিকভাবে বিদায়ও দেওয়া হয় নি। কোথায় আছে এখন কে জানে। কেমন আছে সেটাই-বা কে জানে।

এপসিলন আবার কর্কশ গলায় বলল, "কী হল তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছ না কেন?"

রিয়াজ বলল, "অনেক হয়েছে এপসিলন। তুমি এবারে থাম।"

"কেন আমি থামব?"

"কারণ আমরা কথা বলছিলাম।"

"তোমরা কি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে কথা বলছিলে?"

রিয়াজ বিরক্ত হয়ে বলল, "আমরা কী নিয়ে কথা বলছি তাতে তোমার কী আসে-যায়?"

"তুমি কি নিশীতাকে বলেছ যে সে চমৎকার মেয়ে?"

রিয়াজ থতমত খেয়ে বলল, "হ্যাঁ বলেছি।"

"তুমি কি বলেছ নিশীতা সুন্দরী মেয়ে?"

"হ্যাঁ বলেছি।"

"তার মানে কি তুমি নিশীতাকে ভালবাস?"

রিয়াজ বিস্ফারিত চোখে একবার নিশীতার দিকে আর একবার এপসিলনের দিকে তাকাল।

এপসিলন চোখ টিপে বলল, "তুমি কি নিশীতাকে বিয়ে করতে চাও?"

রিয়াজ হতচকিত হয়ে কী করবে বুঝতে না পেরে এপসিলনের কাছাকাছি গিয়ে হ্যাঁচকা টান দিয়ে পাওয়ার কর্ডটা খুলে ফেলতেই এপসিলন একটা আর্তচিৎকারের মতো শব্দ করে মিলিয়ে গেল।

রিয়াজ অপরাধীর মতো নিশীতার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি—আমি খুবই দুঃখিত নিশীতা, খুবই লজ্জিত—"

নিশীতা হঠাৎ করে নিজেকে সামলাতে না পেরে শাড়ির আঁচল মুখে দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল, কিছুতেই সে আর তার হাসি থামাতে পারে না। হাসতে হাসতে তার চোখে পানি এসে গেল, শাড়ির আঁচলে ঠোঁটের লিপস্টিক লেগে চোখের পানিতে তার চোখের নীল রং ভিজে মাখামাখি হয়ে গেল।

রিয়াজ খানিকক্ষণ নিশীতার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তুমি কিছু মনে কর নি তো নিশীতা?"

নিশীতা হাসতে হাসতে কোনোমতে বলল, "না, আমি কিছু মনে করি নি।"

রিয়াজ নিশীতার দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করে বলল, "নিশীতা—মানে—আমি বলছিলাম কী—এপসিলন ব্যাটা গর্দভ—কিন্তু সে যেটা বলেছে—"

নিশীতা হঠাৎ করে তার হাসি থামিয়ে রিয়াজের দিকে চোখ বড় বড় করে তাকাল।

রিয়াজ বলল, "আমি জানি এটা খুবই তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে। তুমি আমাকে চেন না, আমার সম্পর্কে কিছুই জান না। আমিও তোমাকে চিনি মাত্র কয়েকদিন, যদিও আমার মনে হচ্ছে তোমাকে আমি অনেকদিন থেকে চিনি। তাই আমি বলছিলাম কী—"

নিশীতা স্থির চোখে রিয়াজের দিকে তাকিয়ে রইল। নিশীতাকে এর আগেও যে

এক-দুজন তার মনের কথা বলার চেষ্টা করে নি তা নয়, কিন্তু এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি ব্যাপার।

"তাই আমি বলছিলাম কী—" রিয়াজ ইতস্তত করে বলল, "আমি ঠিক জানি না এসব কথা কীভাবে বলতে হয়। ব্যাটা গর্দভ এপসিলন অবশ্য বলেই দিয়েছে, সেই ব্যাটা একেবারে না বুঝে বলেছে, কিন্তু যে কথাটি বলেছে সেটি আমিও বলতে চাইছিলাম। এত তাড়াতাড়ি না হলেও বলতাম। মানে—"

নিশীতা বড় বড় চোখে রিয়াজের দিকে তাকিয়ে রইল। রিয়াজ তার অপ্রস্তুত ভাবটা ঝেড়ে ফেলে বলল, "তোমার এখনই কিছু বলার প্রয়োজন নেই নিশীতা। তুমি এটা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে পার।"

নিশীতা কিছুক্ষণ রিয়াজের দিকে তাকিয়ে বলল, "আসলে আমি আবার খুব বেশি ভাবনাচিন্তা করতে পারি না।"

"পার না?"

"না।" নিশীতা মুখ টিপে হেসে বলল, "কাজেই আমি কী করব জানেন?"

"কী?"

"আপনার এপসিলনকেই আমার জন্য চিন্তাভাবনা করতে দেব!"

রিয়াজ উৎফুল্ল মুখে বলল, "চমৎকার! উত্তরটা কী হবে আমি কিন্তু সেটা প্রোগ্রাম করে দেব!"

"আমি জানি।" নিশীতা চোখ নামিয়ে বলল, "আমার সেটা নিয়ে খুব দুর্ভাবনা নেই।"

নিশীতাকে ক্যাপ্টেন মারুফ আর তার স্ত্রী বাসায় নামিয়ে দিল রাত এগারটায়। নিশীতা গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে নিজের ঘরে যাচ্ছিল, আম্মা তাকে থামালেন, জিজ্ঞেস করলেন, কী হল, আজ তোর মনে খুব আনন্দ মনে হচ্ছে।"

নিশীতা থতমত খেয়ে হঠাৎ করে হেসে ফেলল, বলল, "হ্যাঁ মা।"

"কেন?"

"কারণ ফ্রেড লিস্টার আর তার দলবলকে আচ্ছামতন শিক্ষা দেওয়া গেছে। প্রজেক্ট নেবুলার সব তথ্য বের করার জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন হয়েছে। মহাজাগতিক প্রাণীর তৈরি করা মানুষের দেহগুলো সারা পৃথিবীর বড় বড় ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হচ্ছে। রাহেলা ভালো হয়ে যাচ্ছে, তার বাচ্চাটি দুধ খেয়ে পেটটাকে ছোট একটা ঢোলের মতো করে ফেলছে। ক্যাপ্টেন মারুফকে তার কাজের জন্য একটা বড় খেতাব দেবে। আমি শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক হিসেবে পুরস্কার পাব। রিয়াজ—মানে ড. হাসান ইউনিভার্সিটিতে যোগ দেবে। একদিন এতগুলো ভালো সংবাদ শুনলে মনে আনন্দ হয় না!"

"হয়।" আম্মা হেসে বললেন, "কিন্তু তোর মনে তো তার চাইতেও বেশি আনন্দ!"

"তুমি কেমন করে জান?"

"আমি জানি। আমি তোর মা। তোর আব্বুর সাথে যেদিন আমার প্রথম দেখা হয়েছিল আমি সেদিন এ রকম গুনগুন করে গান গেয়ে ঘরে এসেছিলাম।"

নিশীতা কিছুক্ষণ তার মায়ের দিকে তাকিয়ে থেকে কাছে এসে মাকে জড়িয়ে ধরল।

গভীর রাতে নিশীতার সেলুলার ফোনটি বেজে উঠল। ঘুমের মাঝে হাতড়ে হাতড়ে নিশীতা সেলুলার ফোনটি তুলে নেয়, ঘুম ঘুম গলায় বলল, "হ্যালো।"

"কে, নিশীতা?"

নিশীতা চমকে উঠল, এটি এপসিলনের গলার স্বর। "কে?"

"আমি।"

"তুমি? তুমি কোথায়?"

"আমি এখানে-ওখানে সব জায়গায়।"

"আমি ভেবেছিলাম তুমি চলে গেছ।"

"না যাই নি। আমি এখন যাব তাই তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি।"

"তুমি কে, তুমি কেমন কিছুই জানতে পারলাম না।"

"তার কোনো প্রয়োজন আছে? কেউ কখনো সবকিছু জানতে পারে?"

নিশীতা ব্যাকুল গলায় বলল, "কিন্তু আমি তোমাকে কখনো ধন্যবাদ জানাতে পারলাম না। আমার কৃতজ্ঞতার কথাটুকুও বলতে পারলাম না।"

"তার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ ভালবাসাটা কী আমি তোমার কাছেই শিখেছি। আমি সব জানি নিশীতা।" কণ্ঠস্বর এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "তুমি জানালার কাছে এসে দাঁড়াও।"

নিশীতা জানালার কাছে দাঁড়াল।

"বিদায়।"

"বিদায়।"

ঠিক সেই মুহূর্তে সমস্ত আকাশ চিরে একটা নীল আলো ঝলসে উঠল। সেই আলো এই পৃথিবী থেকে শুরু করে দূর গ্যালাক্সি পার হয়ে মহাকালের মাঝে হারিয়ে গেল।

নিশীতা স্তব্ধ হয়ে রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে।

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০১

AMARBOI.COM

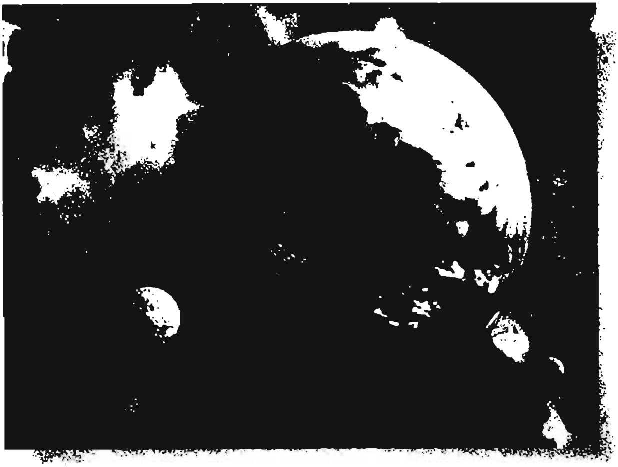

ফোবিয়ানের যাত্রী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১

আজ সকালে ঘুম ভাঙতেই আমার মায়ের কথা মনে পড়ল, অস্পষ্ট আবছা এবং হালকাভাবে নয়—অত্যন্ত তীব্রভাবে। মায়ের সাথে আমার যোগাযোগ নেই প্রায় বারো বছর—আমার ধারণা ছিল খুব ধীরে ধীরে আমার মস্তিষ্ক থেকে মায়ের স্মৃতি অস্পষ্ট হয়ে আসছে। কিন্তু আজ ভোরবেলা আমি বুঝতে পারলাম সেটি সত্যি নয়, মায়ের স্মৃতি হঠাৎ করে আমাকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে গেছে। মা এবং সন্তানের মাঝে প্রাণিজগতের যে তীব্র তীক্ষ্ণ এবং আদিম ভালবাসা রয়েছে সেই ভালবাসার একটুখানির জন্য আজ সকালে আমি বুকের ভিতরে এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করতে থাকি, আমার মাকে একনজর দেখার জন্য কিংবা একবার তাকে স্পর্শ করার জন্য হঠাৎ করে নিজের ভিতর এক ধরনের বিচিত্র অস্থিরতা আবিষ্কার করে আমি নিজেই একটু অবাক হয়ে যাই।

আমি নিজের ভিতরকার এই অস্থিরতা দূর করার জন্য বিছানায় শুয়ে শুয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে রইলাম, আলোর প্রতিফলন এবং বিচ্ছুরণ ব্যবহার করে আমার ছোট বাসস্থানটিতে খানিকটা বিশালত্ব আনার চেষ্টা করা হয়েছে—বাসার ছাদটিকে মনে হয় আকাশের কাছাকাছি। সেই সুদূর আকাশের কাছাকাছি ধূসর ছাদের দিকে তাকিয়ে থেকেও আমার ঘুরেফিরে মায়ের কথা মনে হতে থাকে, আমার বর্ণাঢ্য শৈশবের নানা ঘটনা আমার মনকে বিক্ষিপ্ত করে তুলতে শুরু করে। আমি আমার বিছানায় সোজা হয়ে বসে একটা নিশ্বাস ফেলে মাথার কাছে সুইচটা স্পর্শ করলাম, সাথে সাথে ঝুপ করে বিছানাটা নিচে নেমে এল। আমি অনাবৃত শরীরটি নিও পলিমারের[১] চাদর দিয়ে ঢেকে বিছানা থেকে নেমে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালাম। স্বচ্ছ কোয়ার্টজের জানালা দিয়ে বাইরের বিস্তৃত লোকালয় চোখে পড়ে। সারি সারি বসতি গায়ে গায়ে জড়িয়ে উঁচু হয়ে উঠেছে, অনেক উঁচুতে বায়োডোম[২] পুরো বসতিটিকে এই গ্রহের ভয়ঙ্কর পরিবেশ থেকে রক্ষা করে রেখেছে। বাইরে হালকা বেগুনি আলো দেখেই কেমন জানি মন খারাপ হয়ে যায়। আমি একটা নিশ্বাস ফেলে জানালা থেকে সরে এলাম—আমার ঘরের দেয়ালে ত্রিমাত্রিক ভিডি টিউব[৩] বসানো রয়েছে, অনেকটা অন্যমনস্কভাবে সেটা স্পর্শ করতেই ঘরের মাঝামাঝি আমার মায়ের ত্রিমাত্রিক ছবি জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠল। ষোল-সতের বছরের একজন কিশোরীর মতো চেহারা, কোমল ত্বক এবং লালচে চুল। সাদা রঙের পোশাকে আমার মাকে স্বর্গ হতে নেমে আসা একজন দেবীর মতো দেখায়। মা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন আছিস বাবা ইবান?"

---

১ নির্ঘণ্ট দ্রষ্টব্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি জানি এটি ত্রিমাত্রিক হলোগ্রাফিক[৪] ছবি ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি অসংখ্যবার আমার মায়ের এই একমাত্র ভিডিও ক্লিপটা দেখেছি। কিন্তু তবু আমি ফিসফিস করে বললাম, "ভালো আছি মা। আমি ভালো আছি।"

হলোগ্রাফিক ছবিতে আমার মা একদৃষ্টিতে আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে চোখ নামিয়ে নিয়ে কোমল গলায় বললেন, "কতদিন তোকে দেখি না—এতদিনে তুই নিশ্চয়ই আরো কত বড় হয়েছিস। আমার মাঝে মাঝে খুব জানতে ইচ্ছে করে তুই কোথায় আছিস, কেমন আছিস।"

মা খানিকক্ষণ চুপ করে নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বিষণ্ণ গলায় বললেন, "যেখানেই থাকিস বাবা ইবান, তুই ভালো থাকিস।"

আমি ফিসফিস করে বললাম, "তুমি ভেবো না মা, আমি ভালো থাকব।"

আমার মা ডান হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে তার চোখ মুছে কাতর গলায় বললেন, "আমার ওপর রাগ পুষে রাখিস না বাবা—আমি আসলে বুঝতে পারি নি। যদি বুঝতে পারতাম তা হলে আমি তোকে এমনভাবে জন্ম দিতাম না। বিশ্বাস কর—"

আমার মা ভেঙে পড়ে আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন আমি তার আগেই ভিডি টিউবটা বন্ধ করে দিলাম—আমি যদিও অসংখ্যবার আমার কাছে রাখা আমার মায়ের একমাত্র হলোগ্রাফিক ভিডিও ক্লিপটা দেখেছি, কিন্তু ভিডিও ক্লিপের এই অংশে মায়ের তীব্র অপরাধবোধের গ্লানিটুকু দেখতে আমার ভালো লাগে না। জিনের[৫] প্রতিটি ক্রমাবর্তনকে নিয়ন্ত্রণ করে যখন একজন মানুষকে অতিমানবের পর্যায়ে জন্ম দেওয়া যায় তখন আমার মতো সাধারণ একজন মানুষের জন্ম দিয়ে আমার প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে আমার মা সেজন্যে নিজেকে কখনো ক্ষমা করেন নি। আমার চারপাশে যারা আছে তারা সবাই সূক্ষ্ম হিসাবনিকাশ করে জন্ম দেওয়া মানুষ। তারা সুদর্শন, সুস্থ সবল, মেধাবী, প্রতিভাবান এবং সাহসী। তাদের তুলনায় আমি খুব সাধারণ একজন মানুষ, আমার ভিতরে অন্য মানুষের জন্য ভালবাসা ছাড়া আর কোনো বিশেষ গুণাবলি নেই। আমাকে জন্ম দেওয়ার আগে আমার মা জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং[৬] ব্যবহার করে শুধুমাত্র এই মানবিক একটি ব্যাপার নিশ্চিত করেছিলেন—তার ধারণা ছিল একজন ভালো মানুষ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ মানুষ, সুখী মানুষ। আমাকে তাই একজন হৃদয়বান ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। বড় হতে গিয়ে আমি আবিষ্কার করেছিলাম মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের এই স্তরে আসলে আমার মতো মানুষের প্রয়োজন খুব কম। আমি বড় হতে গিয়ে পদে পদে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। আমাকে ভালো স্কুলে যেতে দেওয়া হয় নি, বড় সুযোগ থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছে—একরকম জোর করে বারবার আমাকে প্রমাণ করতে হয়েছে যে, আমি আসলে অক্ষম নই। আমার বয়স যখন মাত্র তের বছর তখন এই বৈষম্য থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য আমি আমাদের গ্রহ থেকে পালিয়ে এসেছিলাম, প্রথমে একটা মহাকাশযানের শিক্ষানবিসি হিসেবে কাজ করেছি, নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে আমি শেষ পর্যন্ত চতুর্থ মাত্রার বাণিজ্যিক মহাকাশযান চালানোর লাইসেন্স পেয়েছি। আমার মা আজ আমাকে দেখলে খুব খুশি হতেন—তার ছেলেকে জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার করে অতিমানবের কাছাকাছি পৌঁছে না দেওয়াতেই খুব একটা ক্ষতি হয় নি। যেটুকু অর্জন করার আমি সেটুকু অর্জন করে নিয়েছি, কষ্ট হয়েছে সত্যি কিন্তু অসাধ্য হয় নি।

আমি ভিডি টিউবের সামনে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম, তারপর একরকম জোর করে মাথা থেকে সবকিছু বের করে দিলাম—দিনটি মাত্র শুরু হয়েছে, নষ্ট করার মতো সময় আমার হাতে একেবারেই নেই।

AMARBOI.COM

ভোরবেলা আন্তঃনক্ষত্র মহাকাশযানের একটি প্রদর্শনীতে যাবার কথা ছিল। সেখানে রওনা দেবার আগেই ভিডি টিউব থেকে একটি জরুরি সঙ্কেত এল। এই কলোনির আন্তঃনক্ষত্র যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিচালক লি–হান আমার সাথে কথা বলতে চায়—ভিডি টিউবে নয়, সরাসরি। আমি টিউবটি তুলে রেখে একটা নিশ্বাস ফেললাম। সরাসরি কথা বলার একটিই অর্থ, কোনো একটি আন্তঃনক্ষত্র অভিযানের চুক্তি পাকাপাকি করে ফেলা। আমি মাত্র একটি অভিযান শেষ করে এসেছি, নতুন করে কোথাও যাবার আগে কিছুদিন বিশ্রাম নিতে চেয়েছিলাম—সেটি আর সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

ঘণ্টাখানেকের মাঝে আমার পরিচালকের সাথে দেখা হল, মধ্যবয়স্ক হাসিখুশি মানুষ, আমাকে দেখে হাত উপরে তুলে আনন্দ প্রকাশ করার একটি ভঙ্গি করে বলল, "এই যে ইবান, তোমাকে পেয়ে গেলাম!"

আমি হেসে বললাম, "লি–হান, তুমি এমন ভান করছ যে আমাকে পেয়ে যাওয়া খুব সৌভাগ্যের একটা ব্যাপার!"

"অবশ্যই সৌভাগের ব্যাপার! এই পোড়া কলোনিতে কি মানুষ থাকে? একজন একজন করে সবাই সরে পড়ছে!"

আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম, চারপাশে বেগুনি রঙের এক ধরনের চাপা আলো, বহু উপরে বায়োডোমের উপর গ্রহটির প্রলয়ঙ্করী আবহাওয়া হুটোপুটি খাচ্ছে। চেষ্টা করলে এখান থেকেও সেই বাতাসের হুটোপুটি শোনা যায়। আমি মাথা নেড়ে বললাম, "ঠিকই বলেছ। এই কলোনিটা আসলে মানুষের থাকার অযোগ্য। আমার সবসময় কী ভয় হয় জান?"

"কী?"

"একদিন এই বায়োডোম ধসে পড়বে আর আমরা সবাই ব্যাক্টেরিয়ার মতো মারা পড়ব। ঠিক গ্রিশিন৭ গ্রহের কলোনির মতো।"

লি–হান হা হা করে হেসে বলল, "তোমাকে যেন ব্যাক্টেরিয়ার মতো মারা যেতে না হয় সেই ব্যবস্থা করে ফেলেছি। পঞ্চম মাত্রার মহাকাশযানে করে তোমাকে এই কলোনি ছেড়ে চলে যাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, "তুমি জান আমার পঞ্চম মাত্রার মহাকাশযান চালানোর লাইসেন্স নেই।"

"আমরা সেই লাইসেন্সের ব্যবস্থা করে দেব।"

আমি ভুরু কুঁচকে আন্তঃনক্ষত্র যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিচালক লি–হানের দিকে তাকালাম, "লাইসেন্সের ব্যবস্থা করে দেবে?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"কারণ এটি জরুরি। তা ছাড়া আমরা তোমার ফাইল খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি, আমাদের কমিটি মনে করে পঞ্চম মাত্রার মহাকাশযানের দায়িত্ব তুমি নিতে পারবে। তোমার কোনো জিনেটিক প্রাধান্য নেই, কিন্তু সেটি ছাড়াই তুমি অনেক উপরে চলে এসেছ—কমিটি সেটা খুব বড় করে দেখেছে।"

আমি তীক্ষ্ণ চোখে লি–হানের চোখের দিকে তাকিয়ে পুরো ব্যাপারটি বোঝার চেষ্টা করলাম। আমি জানি যাদের জিনেটিকের প্রাধান্য নেই তাদেরকে প্রায় মানুষ হিসেবেই বিবেচনা করা হয় না, সে আমার সাথে কোনো কারণে মিথ্যে কথা বলছে। লি–হান আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৃষ্টি থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল, "আমার মনে হয় এটি তোমার জন্য চমৎকার একটি সুযোগ। পরবর্তী কমিটি অন্যরকম হতে পারে—তারা তোমাকে সেই সুযোগ না–ও দিতে পারে।"

আমি জোর করে একটু হাসার চেষ্টা করে বললাম, "আমার মা আমাকে জন্ম দেবার আগে জিনেটিক কোডিংএ বুদ্ধিশুদ্ধি বিশেষ কিছু দেন নি! আমি সম্ভবত অন্য মানুষের তুলনায় খানিকটা নির্বোধই—কিন্তু তবুও আমার মনে হচ্ছে এখানে অন্য ব্যাপার রয়েছে।"

লি–হান অস্বস্তিতে একটু নড়েচড়ে বলল, "অন্য কী ব্যাপার?"

"আমি আমার স্বল্প বুদ্ধি দিয়ে সেটা বোঝার চেষ্টা করছি। আমার ধারণা এই অভিযানের খুঁটিনাটি জানতে পারলেই সেটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। যেমন মনে কর আমার প্রথম কৌতূহল গন্তব্যস্থান নিয়ে—আমাকে মহাকাশযান নিয়ে কোথায় যেতে হবে?"

লি–হান আমার দৃষ্টি থেকে চোখ সরিয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে বলল, "রিশি নক্ষত্রের কাছে যে গ্রহাণুপুঞ্জ আছে, সেখানে।"

আমি চমকে উঠে সোজা হয়ে বসে বললাম, "কী বললে? রিশি নক্ষত্রের কাছে?"

লি–হান দুর্বল গলায় বলল, "হ্যাঁ।"

"তার মানে আমাকে যেতে হবে মাহালা নক্ষত্রপুঞ্জের কাছে দিয়ে?"

"হ্যাঁ, তা ছাড়া উপায় নেই। দুই পাশে দুটি ব্ল্যাকহোল[৮] থাকায় যাত্রাপথটা হয় ঠিক মাহালা নক্ষত্রপুঞ্জের কাছে দিয়ে। আমি স্বীকার করছি এত কাছাকাছি দুটি ব্ল্যাকহোল থাকলে যাত্রাপথ বিপজ্জনক—"

আমি লি–হানকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, "তুমি বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করছ। তুমি খুব ভালো করে জান ব্ল্যাকহোল কোনো সমস্যা নয়, গত এক শ বছর থেকে মানুষ ব্ল্যাকহোলের মহাকর্ষ শক্তি ব্যবহার করে মহাকাশে পাড়ি দিচ্ছে। সমস্যা অন্য জায়গায়।"

লি–হান চোখেমুখে বিস্ময় ফুটিয়ে বলল, "সমস্যা কোথায়?"

"তুমি খুব ভালো করে জান কোথায়। ঐ অঞ্চলে মানুষের কলোনি বিদ্রোহ করে আলাদা হয়ে গিয়েছে। পুরো এলাকাটা এখন ছোট–বড় শ খানেক মহাকাশদস্যুর আখড়া। গত দশ বছরে এই পথ দিয়ে যত মহাকাশযান গেছে তার অর্ধেক লুট হয়ে গেছে। কোনো ক্রু জীবন্ত ফিরে আসে নি!"

"তুমি অতিরঞ্জন করছ ইবান।"

"আমি এতটুকু অতিরঞ্জন করছি না—" "তোমরা সত্য গোপন করছ, তা না হলে সংখ্যাটি আরো অনেক বেশি হত।" আমি হঠাৎ করে নিজের ভিতরে এক ধরনের ক্রোধ অনুভব করতে থাকি। অনেক কষ্ট করে গলার স্বরকে স্বাভাবিক রেখে বললাম, "শুধু কি মহাকাশ দস্যু? মাহালা নক্ষত্রপুঞ্জ হচ্ছে অনাবিষ্কৃত এলাকা। সেখানে কোনো এক ধরনের মহাজাগতিক প্রাণী রয়েছে—"

লি–হান অবাক হবার ভান করে বলল, "তাতে কী হয়েছে? মহাজগতে মানুষ ছাড়াও যে প্রাণী রয়েছে সেটি তো আর নতুন কোনো ব্যাপার নয়!"

"না, সেটি নতুন ব্যাপার নয়।" আমি মাথা নেড়ে বললাম, "কিন্তু সেই প্রাণী যদি বুদ্ধিমান হয়, সেই প্রাণী যদি ভয়ঙ্কর হয়, সেই প্রাণী যদি মানুষের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয় এবং মানুষ যদি সেই প্রাণী সম্পর্কে কিছু না জানে তা হলে মানুষ তাদের ধারেকাছে যায় না। সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট মহাজাগতিক আইন রয়েছে। আমাকে সেদিক দিয়ে পাঠিয়ে তোমরা মহাজাগতিক আইন ভাঙার চেষ্টা করছ।"

লি-হানের মুখ একটু অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। সে শীতল গলায় বলল, "তুমি যদি যেতে না চাও তা হলে যাবে না, আমি ভেবেছিলাম এটি তোমার জন্য একটি চমৎকার সুযোগ।"

"কোনটি সুযোগ আর কোনটি আমাকে বিপদে ফেলার ষড়যন্ত্র সেই সিদ্ধান্তটা আমাকেই নিতে দাও।" আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে থেমে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "পঞ্চম মাত্রার এই মহাকাশযানে আমাকে কি কারগো নিতে হবে?"

লি-হান বিড়বিড় করে কিছু-একটা বলতে যাচ্ছিল, আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম, "আমি বাজি ধরে বলতে পারি সেই কারগো হবে দূষিত, বিষাক্ত এবং বিপজ্জনক কোনো জিনিস। যে জিনিস ধ্বংস হয়ে গেলে তোমাদের কারো কোনো মাথাব্যথা হবে না। হয়তো এমনও হতে পারে যে তোমরা চাও সেই কারগো ধ্বংস হয়ে যাক।"

লি-হান এবারে তার মুখ একটু কঠিন করে বলল, "তুমি একটু বেশি বাড়াবাড়ি করছ ইবান। এই অভিযানের কারগো খুব গুরুত্বপূর্ণ।"

"সেটি কী?"

"তুমি যতক্ষণ এই যাত্রাপথে যেতে রাজি না হচ্ছ আমি তোমাকে সেটা বলতে পারব না।"

"কিন্তু আমি যতক্ষণ জানতে না পারছি আমাকে কী কারগো নিয়ে যেতে হবে ততক্ষণ আমি রাজি হতে পারছি না।"

লি-হান ভুরু কুঁচকে কতক্ষণ কিছু-একটা চিন্তা করে আমার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল, "ঠিক আছে আমি তোমাকে বলছি। তোমার কারগো আসলে জীবন্ত একজন মানুষ।"

"মানুষ?"

"হ্যাঁ। মানুষটির নাম হচ্ছে ম্যাঙ্গেল ক্বাস। ম্যাঙ্গেল ক্বাস হচ্ছে—"

আমি বাধা দিয়ে বললাম, "তোমাকে ম্যাঙ্গেল ক্বাসের পরিচয় দিতে হবে না, আমি তাকে চিনি।"

"ও।"

আমি কঠিন গলায় বললাম, "তুমি দেখেছ আমার ধারণা সত্যি? মহাকাশযানের কারগো সত্যি সত্যি দূষিত, বিষাক্ত এবং বিপজ্জনক?"

লি-হান শীতল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, কোনো কথা বলল না। আমি একটা নিশ্বাস ফেলে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম, বেগুনি রঙের আলোটাতে একটা কালচে গা-ঘিনঘিন-করা ভাব চলে এসেছে, দেখেই কেমন জানি মন খারাপ হয়ে যায়।

ম্যাঙ্গেল ক্বাস এই সময়কার সবচেয়ে দুর্ধর্ষ মহাকাশ দস্যু। সাধারণত একটি স্বার্থ নিয়ে দুদলের মাঝে সংঘর্ষ বেধে যায় তখন এক দল অন্য দলকে দস্যু বলে সম্বোধন করে। মহাজাগতিক অনেক কলোনিতেই নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য ছোট ছোট মানবগোষ্ঠী বিদ্রোহ করেছে এবং অনেক সময় তাদেরকে দস্যু আখ্যা দিয়ে খুব নিষ্ঠুরভাবে বিদ্রোহ দমন করা হয়েছে। ম্যাঙ্গেল ক্বাসের ব্যাপারটি সেরকম নয়—সে প্রকৃত অর্থেই দস্যু, ছোট সুগঠিত একটা দল নিয়ে সে মাহালা নক্ষত্রপুঞ্জের কাছাকাছি থাকে, অত্যন্ত কৌশলে সে আন্তঃনক্ষত্র মহাকাশযানগুলোকে দখল করে নেয়। মহাকাশযানের ক্রুদের প্রতি অমানুষিক নিষ্ঠুরতা নিয়ে ম্যাঙ্গেল ক্বাসের অনেক গল্প প্রচলিত রয়েছে। মানুষটি সুদর্শন এবং বুদ্ধিমান, আধুনিক প্রযুক্তি সে খুব দক্ষতার সাথে ব্যবহার করে। মানুষের মস্তিষ্কের ওপর তার মৌলিক গবেষণা রয়েছে বলেও শোনা যায়। মহাজাগতিক প্রতিরক্ষাবাহিনী অনেকদিন থেকে তাকে ধরার চেষ্টা

করছিল এবং মাত্র কিছুদিন আগে তাকে ধরতে পেরেছে। বিচারের জন্য তাকে আঞ্চলিক কেন্দ্রে পাঠাতে হবে—আমি অবশ্য মনে করি এত ঝামেলা না করে প্রতিরক্ষাবাহিনীই তার বিচার করে শাস্তি দিয়ে ফেলতে পারত। এই ভয়ঙ্কর মানুষটিকে বাঁচিয়ে রাখা আসলে বিপদকে ঘরে টেনে আনা ছাড়া আর কিছু নয়।

আমার সামনে বসে থাকা লি-হান এবারে একটু ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি সত্যিই যেতে চাও না?"

"ম্যাঙ্গেল ক্বাসের মতো চরিত্রকে নিয়ে যাওয়াটা কি তুমি খুব আকর্ষণীয় কাজ মনে কর?"

"কিন্তু তাকে শীতল করে পাথরের মতো জমিয়ে ফেলা হবে, টাইটানিয়ামের ভল্টের মাঝে পাকাপাকিভাবে আটকে রাখা হবে। মহাকাশযানের কারগো-বে'[৯] তে তাকে মালপত্র হিসেবে নেওয়া হবে—মানুষ হিসেবে নেওয়া হবে না।"

আমি একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম, "সত্যি কথা বলতে কী তোমরা যদি মানুষটিকে শীতল ঘরে করে না নিতে, যদি তার সাথে কথা বলা যেত তা হলে আমার একটু আগ্রহ ছিল। আমি কথা বলে দেখতাম এই ধরনের মানুষেরা কীভাবে চিন্তা করে।"

"না, তোমার সেই সুযোগ নেই।" লি-হান মাথা নেড়ে বলল, "একেবারেই নেই।"

"মহাকাশযানের অন্য ক্রুদের কীভাবে বেছে নিচ্ছ?"

আমার প্রশ্ন শুনে হঠাৎ করে লি-হান নিজের নখের দিকে তাকিয়ে সেটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে শুরু করল এবং আমি বুঝতে পারলাম এ ব্যাপারেও নিশ্চয়ই কোনো সমস্যা রয়েছে। আমি আবার টের পেলাম আমার ভিতরে একটা শীতল ক্রোধ ছড়িয়ে পড়ছে। নিজেকে কষ্ট করে শান্ত করে আমি একটু সামনে ঝুঁকে পড়ে বললাম, "এই ক্রুদের ব্যাপারটাও তা হলে আমি অনুমান করার চেষ্টা করি। আমার ধারণা এই অভিযানে ক্রু হিসেবে যাবে এমন কিছু মানুষ যাদের জীবনের কোনো মূল্য নেই। আমার মতো—"

লি-হান বাধা দিয়ে বলল, "আসলে কোনো ক্রু থাকবে না। তুমি একা এই মহাকাশযানটি নিয়ে যাবে।"

AMARBOI.COM

আমি চমকে উঠে বললাম, "একা?"

"হ্যাঁ।"

"একটি আন্তঃনক্ষত্র অভিযানে একজন মানুষ একা একটি পঞ্চম মাত্রার মহাকাশযান নিয়ে যাবে?"

"হ্যাঁ। নতুন পঞ্চম মাত্রার যে মহাকাশযানগুলো তৈরি হয়েছে সেগুলো বিস্ময়কর। প্রকৃত অর্থেই সেখানে কোনো মানুষের প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র মহাজাগতিক আইন রক্ষা করার জন্য এখনো অধিনায়ক হিসেবে মানুষ রাখতে হয়। তাদেরকে কর্তৃত্ব দেওয়া হয়।"

আমি কোনো কথা না বলে লি-হানের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। সে আমার দৃষ্টি উপেক্ষা করে বলল, "পঞ্চম মাত্রার এই মহাকাশযানগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নতুন যে সিস্টেম দাঁড়া করানো হয়েছে অনেক ক্ষেত্রেই তা মানুষের মস্তিষ্ক থেকে ভালো। সত্যি কথা বলতে কী, আমরা যদি নিউরন[১০] সংখ্যা, এবং সিনাপ্স[১১] সংযোগ এসব দিয়ে হিসাব করি তা হলে এই সিস্টেমকে প্রায় একডজন মানুষের মস্তিষ্কের সুষম উপস্থাপন হিসেবে বিবেচনা করতে পার। যার অর্থ হচ্ছে—"

"আমি জানি।"

লি-হান হা হা করে হেসে বলল, "অবশ্যই তুমি জান। মানুষের মস্তিষ্কের ওপর তোমার কৌতূহলের কথা সবাই জানে।"

"হ্যাঁ।" আমি শীতল গলায় বললাম, "সবাই এটাও জানে যে এটা এসেছে আমার হীনম্মন্যতা থেকে। যেহেতু বুদ্ধিমত্তায় আমার জিনেটিক প্রাধান্য নেই তাই আমি সবসময় বোঝার চেষ্টা করি বুদ্ধিমত্তা এসেছে কোথা থেকে। প্রচলিত বিশ্বাস এটা আমার দুর্বলতা। আমার সীমাবদ্ধতা।"

লি–হান মাথা নাড়ল, বলল, "না, তোমার এ ধারণা সত্যি নয়। তোমাকে আমি তোমার সম্পর্কে কমিটির রিপোর্ট দেখাতে পারব না, যদি পারতাম তা হলে দেখতে তোমার ক্ষমতা সম্পর্কে কমিটির পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে।"

কোনটি সত্যি কথা, কোনটি মিথ্যা কথা এবং কোনটি কাজ উদ্ধারের জন্য চাটুকারিতা সেটা বোঝা আমার জন্য কঠিন নয়। কখন কথা বলতে হয়, কখন চুপ করে থাকতে হয় এবং কখন রেখে যেতে হয় এতদিনে আমি সেটাও শিখে ফেলেছি, কাজেই আমি কোনো কথা না বলে চুপ করে রইলাম।

লি–হান তার গলায় একটু বাড়াবাড়ি উচ্ছ্বাস ফুটিয়ে বলল, বারোজন মানুষের মস্তিষ্কের সুষম উপস্থাপন—এর অর্থ বুঝতে পারছ? বারোজন মানুষ নয়—বারোগুণ মানুষ—বুদ্ধিমত্তার বারোগুণ—"

আমি হাত তুলে লি–হানকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, "আমি জানি।"

"তা হলে?"

"তা হলে কী?"

"তা হলে তোমার মাঝে উৎসাহ নেই কেন?"

"তুমি শুনতে চাও কেন আমার মাঝে উৎসাহ নেই?"

লি–হান মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ শুনতে চাই।"

"তা হলে শোন।" আমি একটা বড় নিঃশ্বাস নিয়ে বললাম, "পঞ্চম মাত্রার এই মহাকাশযানটি মাত্র তৈরি করা হয়েছে, এটা পরীক্ষা করা দরকার। এই পরীক্ষার জন্য গিনিপিগ হিসেবে ব্যবহার করা হবে আমাকে—এটাই হচ্ছে সত্যি কথা। এই সত্যি কথা যে জানে তার পক্ষে এই অভিযানে উৎসাহ পাওয়া সম্ভব নয়।"

"তোমার এই সন্দেহ অমূলক।"

"হতে পারে। কিন্তু তাতে কিছু আসে–যায় না।" আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, "আমার পক্ষে এই অভিযানে যাওয়া সম্ভব নয়।"

"ভেবে দেখ ইবান। তুমি সবসময় মানুষের বুদ্ধিমত্তা, মানুষের নৈতিকতা, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন এবং ভালবাসা নিয়ে ভেবেছ। পৃথিবীর বড় বড় মানুষকে নিয়ে তোমার কৌতূহল। তারা কেমন করে ভাবে, কেমন করে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে সেটা জানতে চেয়েছ। এই প্রথম তোমার সুযোগ এসেছে পৃথিবীর সেরা মনীষীদের মুখোমুখি হবার। পঞ্চম মাত্রার মহাকাশযানের নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার জন্য তৈরি নিউরাল নেটওয়ার্কই[১২] শুধুমাত্র তোমাকে সেই সুযোগ দেবে। তুমি ইচ্ছে করলে পৃথিবীর সেরা মনীষীদের মস্তিষ্ক ম্যাপিং[১৩] সাথে নিয়ে যেতে পারবে। তোমার দীর্ঘ এবং নিঃসঙ্গ যাত্রাপথে তারা তোমার চমৎকার সঙ্গী হতে পারে। তোমার সারা জীবনের স্বপ্ন সত্যি হওয়ার—"

আমি হাত নেড়ে বললাম, "তোমার বক্তৃতার জন্য ধন্যবাদ লি–হান। কিন্তু আমি তোমার এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারছি না।"

লি–হান কোনো কথা না বলে আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আমি মাথা নেড়ে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লম্বা পা ফেলে ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। আমার পিছনে স্বয়ংক্রিয় দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল তখন লি–হান আমাকে ডাকল, "ইবান।"

আমি ঘুরে তাকিয়ে বললাম, "কী হল?"

"আমার ধারণা তুমি কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার প্রস্তাবে রাজি হয়ে এই অভিযানে যাবে।"

আমি তীক্ষ্ণ চোখে লি-হানের দিকে তাকালাম, সে জোর করে একটু হাসার চেষ্টা করল। আমি কঠিন গলায় বললাম, "কেন? তুমি কেন ভাবছ আমি তোমার প্রস্তাবে রাজি হব?"

"কারণ, তোমার একটা চিঠি এসেছে।"

আমি চমকে উঠে বললাম, "চিঠি?"

"হ্যাঁ।"

"কার চিঠি?"

"তোমার মায়ের।"

"আমার মায়ের?"

"হ্যাঁ।"

আমি কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলাম, "আমার মা কী লিখেছে চিঠিতে?"

"আমি জানি না। আন্তঃমহাজাগতিক যোগাযোগ কেন্দ্র থেকে সবেমাত্র পাঠিয়েছে।" লি-হান তার ড্রয়ার থেকে ছোট একটা ক্রিস্টাল বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিল।

আমি ক্রিস্টালটি হাতে নিয়ে লি-হানের দিকে তাকালাম। সে আবার একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, "চিঠিটা এসেছে রিশি নক্ষত্রের কাছাকাছি মানুষের কলোনি থেকে। মাহালা নক্ষত্রপুঞ্জ পার হয়ে সেই কলোনিতে যেতে হয়।"

লি-হান উঠে দাঁড়িয়ে জানালার কাছে এগিয়ে গেল। জানালা দিয়ে কিছুক্ষণ বাইরে তাকিয়ে থেকে আবার আমার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল, "ইবান, তুমি খুব সৌভাগ্যবান যে একজন মায়ের গর্ভে তোমার জন্ম হয়েছে। তুমি জান আমার 'জন্ম' হয় নি, আমাকে জিনম ল্যাবরেটরিতে[১৪] তৈরি করা হয়েছে। ফ্যাক্টরিতে যেভাবে মহাকাশযানের ইঞ্জিন তৈরি করা হয়, সেভাবে!"

আমি লি-হানের দিকে তাকিয়ে রইলাম, আমি একটু অবাক হয়ে লক্ষ করলাম তাকে হঠাৎ একজন দুঃখী মানুষের মতো দেখাতে থাকে।

২

ভিডি টিউবের সুইচটা স্পর্শ করতেই ঘরের মাঝামাঝি আমার মায়ের ত্রিমাত্রিক একটা প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠল। ছবিটা এত জীবন্ত যে আমার মনে হল আমি বুঝি তাকে স্পর্শ করতে পারব।

আমার মায়ের প্রতিচ্ছবিটি ঘুরে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "বাবা ইবান, আমি জানি না আমাকে তুই দেখছিস কি না! সেই কোন নক্ষত্রের কোন গ্রহপুঞ্জে তুই আছিস আমি জানিও না। তবু আমার ভাবতে ইচ্ছে করে তুই আমার সামনে আছিস, চুপ করে বসে আমার কথা শুনছিস।"

মা কথা বন্ধ করে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন, মনে হল সত্যিই যেন আমাকে দেখতে পাচ্ছেন। মায়ের চেহারা সতের-আঠার বছরের একটা বালিকার মতো—কথার ভঙ্গিও সেরকম, চেহারায় বিন্দুমাত্র বয়সের ছাপ পড়ে নি।

মা একটা ছোট নিশ্বাস ফেলে হঠাৎ করে একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। হাত দিয়ে লালচে চুলগুলোকে পিছনে সরিয়ে বললেন, "বুঝলি ইবান, কয়দিন থেকে নিজের ভিতরে কেমন জানি অস্থিরতা অনুভব করছি। শুধু মনে হচ্ছে এই জগতে কেন এসেছি, কী উদ্দেশ্য তার রহস্যটা বুঝতে পারছি না। আমি কি শুধু কয়েকদিন বেঁচে থাকার জন্য এসেছি নাকি তার অন্য উদ্দেশ্য আছে? যদি অন্য উদ্দেশ্য থেকে থাকে তা হলে সেটা কী? প্রাণিজগতের যেরকম বংশবৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য থাকে মানুষের জন্য তো আর সেটা সত্যি নয়! মানুষকে তো আর আজকাল জন্ম নিতে হয় না। জিনম ফ্যাক্টরিতে অর্ডারমাফিক শিশুর জন্ম দেওয়া যায়। তা হলে আমাদের বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যটা কী?"

মা কয়েক মুহূর্তের জন্য থামলেন; তারপর ছেলেমানুষের মতো খিলখিল করে হেসে উঠলেন, কষ্ট করে হাসি থামিয়ে বললেন, "আমার মনে সারাক্ষণ এরকম প্রশ্ন দেখে আমার চারপাশে যারা আছে তারা খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল, তারা ভাবল আমার চিকিৎসা দরকার! একদিন আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল চিকিৎসক রোবটের কাছে, সেটি আমাকে টিপেটুপে দেখে বলল আমার মাথায় মস্তিষ্কের ভিতরে একটা দ্বৈত কপোট্রন বসাতে হবে, যেটি আমার ভাবনাচিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। সোজা কথায় আমাকে মানুষ থেকে পাল্টে একটা রোবটে তৈরি করে ফেলবে।"

মা কথা থামিয়ে আবার ছেলেমানুষের মতো হাসতে শুরু করলেন, হাসি ব্যাপারটি নিশ্চয়ই সংক্রামক, আমিও মায়ের সাথে হাসতে শুরু করলাম। মা হাসি থামিয়ে চোখ মুছে বললেন, "আমি চিকিৎসক রোবটের কথা শুনি নি। আমার মাথায় দ্বৈত কপোট্রন বসানো হয় নি। মাথার ভিতরে এখনো আমার এক শ ভাগ খাঁটি মস্তিষ্ক রয়েছে তাই এখনো আমি বসে বসে এইসব ভাবি!" মা হঠাৎ সুর পাল্টে বললেন, "বাবা ইবান, আমার কথা শুনে তুই আবার অধৈর্য হয়ে যাচ্ছিস না তো?"

আমি মাথা নাড়লাম, ফিসফিস করে বললাম, "না মা, অধৈর্য হয়ে যাচ্ছি না।"

"অধৈর্য হলে হবি। আমার কিছু করার নেই। কেন জানি তোর সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করছে। আমার মনে হয় তুই যদি আমার কাছে থাকতি তা হলে আমার প্রশ্নগুলোর গুরুত্বটা বুঝতে পারতি। এখানে আর কাউকে বোঝাতে পারি না।

"প্রথম প্রথম মনে হতো আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হয়তো জ্ঞানের অনুসন্ধান করা। কিন্তু গত এক শ বছরের ইতিহাসে দেখেছিস বড় আবিষ্কারগুলো কে করেছে? রোবট। কম্পিউটার। কপোট্রন। যেগুলো মানুষ করেছে তার পিছনেও রয়েছে যন্ত্রপাতি, নিউরাল নেটওয়ার্ক। তা হলে মানুষের জন্য থাকল কী? মানুষ বেঁচে থাকবে কেন? তাদের জীবনের উদ্দেশ্যটা কী?"

মা কিছুক্ষণের জন্য থামলেন, তারপর আবার হেসে ফেললেন—মা যখন হাসেন তখন তাকে কী সুন্দরই না দেখায়! হাসি থামিয়ে মাথা নেড়ে বললেন, "আমি জানি না কেন আমি তোকে এসব বলছি। আসলে তোকে বলছি কি না সেটাও আমি জানি না—তা হলে কেন বলছি এসব? মাঝে মাঝে আসলে তোর সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করে—মনে হয় তুই হয়তো আমাকে বুঝতে পারবি। সে জন্য বলছি—আমি কল্পনা করে নিচ্ছি তুই আমার সামনে বসে আছিস, এই এখানে আমার কাছাকাছি।

"কিছুদিন থেকে আমার মনে হচ্ছে আমি যেন একটু একটু বুঝতে পারছি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কী? ঠিক পুরোটুকু ধরতে পারছি না কিন্তু একটু যেন আন্দাজ করতে পারছি। আগে যেরকম মনে হত আমার জীবনের কোনো মূল্য নেই, কোনো অর্থ নেই—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন সেরকম মনে হয় না। একসময় ভাবতাম তোর ভিতরে জিনেটিক কোনো প্রাধান্য না দিয়ে খুব ভুল করেছি, তোকে অতিমানব জাতীয় কিছু একটা তৈরি করা উচিত ছিল। কিন্তু এখন আর তা মনে হয় না। এখন মনে হয় আমি ঠিকই করেছি, তোকে সাধারণ একজন মানুষ হিসেবে তৈরি করেছি কিন্তু ভিতরে দিয়েছি একটা চমৎকার হৃদয়। যেখানে রয়েছে ভালবাসা। সবাইকে বড় হতে হবে কে বলেছে? মনে হয় যত ছোটই হোক জীবনের একটা অর্থ থাকে, একটা উদ্দেশ্য থাকে। কেউ এই জগতে অপ্রয়োজনীয় না। ছোট-বড় সবাই মিলে সৃষ্টিজগৎ।"

মা একটু থামলেন, থেমে হাসি হাসি মুখ করে বললেন, "বেশি বড় জ্ঞানের কথা বলে ফেললাম? অন্য সবাইকে তো বলছি না—তোকে বলছি। তুই আমার ছেলে, তোকে আমি পেটে ধরেছি। যখন পেটের মাঝে ছিলি তখন প্ল্যাসেন্টা[১৫] দিয়ে তোর শরীরে পুষ্টি দিয়েছি, বড় করেছি। তোকে যদি এসব কথা বলতে না পারি তা হলে কাকে বলব?

"বুঝলি ইবান, জীবন নিয়ে, বেঁচে থাকা নিয়ে নানারকম প্রশ্ন আসে আমার মাথায়, কাউকে জিজ্ঞেস করে তার উত্তর পাওয়া যায় না। নিজে নিজে তার উত্তর খুঁজে পেতে হয়। আমি তাই করছি। তবে একজন আমাকে খুব সাহায্য করেছে। মানুষটার নাম রিতুন। রিতুন ক্লিস। আলগল নক্ষত্রের কাছে মানুষের যে কলোনিটা আছে সেখানে থাকত সে। প্রায় দুই শ বছর আগে মানুষটা মারা গেছে, বেঁচে থাকলে আমি নিশ্চয়ই তার সাথে দেখা করতে যেতাম, যেভাবেই হোক।

"এই মানুষটার লেখা কিছু বইপত্র আছে, কিছু ভিডিও ক্লিপ আছে, কিছু মেটা ফাইল[১৬] আছে। আমি সেগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে পড়েছি, দেখেছি, বোঝার চেষ্টা করেছি। মানুষটা অসম্ভব বুদ্ধিমান, অসম্ভব প্রতিভাবান। মনে হয় ঈশ্বর বুঝি নিজের হাতে তার মাথায় একটা একটা করে নিউরনকে সাজিয়েছে, সিনাপ্সে সংযোগ দিয়েছে! তার ভাবনা–চিন্তার সাথে পরিচিত হয়ে আমার নিজের ভিতরকার অনেক প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি!

"সেদিন রিতুন ক্লিস সম্পর্কে একটা নতুন তথ্য পেয়েছি। মানুষটা দুই শ বছর আগে মারা গেলেও তার মস্তিষ্কের পুরো ম্যাপিং নাকি রক্ষা করা আছে। পৃথিবীর বড় বড় মানুষ, বড় বড় দার্শনিক, বিজ্ঞানী, শিল্পীদের মস্তিষ্ক নাকি এভাবে ম্যাপিং করে বাঁচিয়ে রাখা হয়। তার মানে রিতুন ক্লিস মারা গেলেও তার মস্তিষ্ক বেঁচে আছে। বিশাল কোনো নিউরন নেটওয়ার্কে সেটা বসালে তার সাথে কথা বলা যাবে। কী আশ্চর্য ব্যাপার!

"কিন্তু দুঃখের কথা কী জানিস? মানুষের মস্তিষ্কের ম্যাপিং নিয়ে কাজ করার মতো নিউরাল নেটওয়ার্ক খুব বেশি নেই। যে কয়টি আছে সেগুলো আমার নাগালের বাইরে। আমার মতো সাধারণ মানুষ কখনো সেটা ব্যবহার করতে পারবে না। আমি খবর পেয়েছি তুই চতুর্থ মাত্রার মহাকাশযানের অধিনায়ক হয়েছিস। যদি কোনোভাবে পঞ্চম মাত্রার মহাকাশযানের অধিনায়ক হতে পারিস তা হলে তুই তোর মহাকাশযানে সেরকম একটা নিউরাল নেটওয়ার্ক পাবি। তুই তা হলে রিতুন ক্লিসের সাথে কথা বলতে পারবি। কী সাংঘাতিক একটা ব্যাপার হবে চিন্তা করতে পারিস?"

আমার মা উজ্জ্বল চোখে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তারপর আবার খিলখিল করে হেসে উঠলেন, বললেন, "দেখ, কতক্ষণ থেকে আমি বকবক করছি! আমার এরকম উদ্ভট জিনিস নিয়ে কৌতূহল বলে ধরে নিচ্ছি তোরও বুঝি এরকম কৌতূহল। আমার সব কথা ভুলে যা বাবা ইবান। ধরে নে এইসব হচ্ছে পাগলের প্রলাপ! তুই যদি পঞ্চম মাত্রার মহাকাশযানের অধিনায়ক হতে পারিস তা হলে মহাজগতের একেবারে শেষমাত্রায় মানুষের

AMARBOI.COM

যে কলোনি আছে সেখানে অভিযান করতে যাবি। আমি রাত্রিবেলা আকাশের একটা নক্ষত্র দেখিয়ে সবাইকে বলব, আমার ছেলে ওখানে গেছে! আমার নিজের ছেলে—যেই ছেলেকে আমি পেটে ধরেছি!"

আমার মা কথা শেষ করে আমার দিকে হাসি হাসি মুখ করে তাকিয়ে রইলেন, কিন্তু আমি দেখতে পেলাম তার চোখে পানি এসে যাচ্ছে, আর আমার মা প্রাণপণ চেষ্টা করছে তার সেই চোখের পানি গোপন করতে।

যেরকম হঠাৎ করে আমার মায়ের ত্রিমাত্রিক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি আমার ঘরের মাঝখানে এসে হাজির হয়েছিল ঠিক সেরকমভাবে আবার হঠাৎ করে সেটি অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি বুকের ভিতর কেমন জানি এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করতে থাকি। উঠে দাঁড়িয়ে আমি কিছুক্ষণ খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকি। তারপর ফিরে এসে ভিডি টিউবটা স্পর্শ করে আন্তঃনক্ষত্র যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিচালকের সাথে যোগাযোগ করতেই, ছোট স্ক্রিনটাতে লি-হানের ছবি ভেসে উঠল। সে আমার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী খবর ইবান? তুমি কি শেষ পর্যন্ত মন স্থির করেছ?"

"করেছি লি-হান। আমি যাব।"

"চমৎকার। তা হলে দেরি করে কাজ নেই, তুমি কাল ভোরবেলা থেকে কাজ শুরু করে দাও, বুঝতেই পারছ আমাদের হাতে সময় নেই। আমাদের চার নম্বর এস্ট্রোডোম থেকে একটা স্কাউটশিপ[১৭] তোমাকে ফোবিয়ানে নিয়ে যাবে।"

"ফোবিয়ান?"

"হ্যাঁ আমাদের পঞ্চম মাত্রার নতুন মহাকাশযানটির নাম ফোবিয়ান। স্থিতিশীল একটা কক্ষপথে সেটাকে আটকে রাখা হয়েছে।"

AMARBOI.COM

"কক্ষপথে?"

"হ্যাঁ, পঞ্চম মাত্রার মহাকাশযানকে সাধারণত গ্রহে নামানো হয় না।"

"ও।" আমি একমুহূর্ত ইতস্তত করে বললাম, "লি-হান।"

"বল।"

"তোমাকে একটা প্রশ্ন করি—তুমি সত্যি উত্তর দেবে?"

"প্রশ্নটা না শুনে আমি তোমাকে কথা দিতে পারছি না। বেঁচে থাকার জন্য অনেক সময় অনেক সত্যকে আড়াল করে রাখতে হয়।"

"আজ ভোরবেলা তোমার সাথে আমি রিশি নক্ষত্রের কাছাকাছি মানুষের কলোনিতে অভিযান নিয়ে যে কয়টি কথা বলেছিলাম তার প্রত্যেকটা সত্যি ছিল, তাই না?"

লি-হান একমুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "তাতে কিছু আসে-যায়?"

"না, যায় না।"

"তা হলে আমরা সেটা নিয়ে কথা নাই-বা বললাম!"

মহাকাশযান ফোবিয়ানকে দেখে আমি চমৎকৃত হয়ে গেলাম। বিশাল এই মহাকাশযানটি একটি ছোটখাটো উপগ্রহের মতো। টাইটানিয়াম এবং ক্রোমিয়ামের সংকর ধাতুর দেয়ালের উপর তাপ অপরিবাহী নতুন এক ধরনের আস্তরণ দিয়ে ঢাকা। মূল ইঞ্জিনটি পদার্থ-প্রতিপদার্থ[১৮] জ্বালানি দিয়ে চালানো হয়। বিশেষ পরিস্থিতির জন্য প্লাজমা[১৯] ইঞ্জিনও রয়েছে। আন্তঃনক্ষত্র মহাকাশ পরিভ্রমণের জন্য একটি অপূর্ব যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি করে রাখা আছে। পুরো ফোবিয়ানকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে নিউরাল নেটওয়ার্কটি বসানো হয়েছে সেটি দেখে নিজের

ভিতরে হীনম্মন্যতা এসে যায়—মানুষের মস্তিষ্ক সত্যিকার অর্থেই এই নেটওয়ার্কের তুলনায় একেবারেই অকিঞ্চিৎকর। চতুর্থ মাত্রার মহাকাশযানের সাথে ফোবিয়ানের একটা বড় পার্থক্য রয়েছে, এটি নানা ধরনের অস্ত্র দিয়ে বোঝাই, নিউক্লিয়ার বিস্ফোরক থেকে শুরু করে এক্স-রে লেজার[২০] কিছুই বাকি নেই। সৌভাগ্যক্রমে আমার নিজেকে এই অস্ত্র চালানো শিখতে হবে না—ফোবিয়ানে অস্ত্র চালাতে অভিজ্ঞ রোবটেরা রয়েছে।

আমাকে পুরো ফোবিয়ানের নিয়ন্ত্রণ বুঝে নিতে খুব বেশি সময় দেওয়া হল না। মস্তিষ্ক উত্তেজক ড্রাগ নিহিলিন[২১] নিয়ে নিয়ে আমি না ঘুমিয়ে একটানা চৌদ্দ দিন কাজ করে গেলাম। আমাকে আনুষ্ঠানিকভাবে লাইসেন্স দেওয়ার সময়টিতে আমি মোটামুটিভাবে একটা ঘোরের মাঝে ছিলাম এবং অনুষ্ঠানটি থেকে আমি কীভাবে নিজের ঘরে ফিরে এসেছি সেটি আমার মনে নেই, নিহিলিনের মতো উত্তেজক ড্রাগও আমাকে জাগিয়ে রাখতে পারছিল না। আমি বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করার আগেই গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লাম।

ঠিক কখন আমি ঘুম থেকে উঠেছি সেটি আমি নিজেও জানি না—আমার ধারণা ছিল একবেলা পার করে দিয়েছি, কিন্তু ক্যালেন্ডার দেখে আমি হতবাক হয়ে গেলাম, এর মাঝে ছত্রিশ ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। যখন আমার ঘুম ভেঙেছে তখন আমার ঘরটি অন্ধকার এবং শীতল, আমি ভয়ঙ্কর ক্ষুধার্ত। ঘরের ভিডি টিউবটি ক্রমাগত একটা জরুরি সঙ্কেত দিয়ে যাচ্ছে। আমি কোনোমতে বিছানা থেকে উঠে টলতে টলতে ভিডি টিউবের কাছে গিয়ে সেটা স্পর্শ করতেই আন্তঃনক্ষত্র যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিচালক লি-হানের ছবিটি ছোট স্ক্রিনে ফুটে উঠল। সে এক ধরনের আতঙ্কিত গলায় বলল, "কী হয়েছে তোমার ইবান?"

আমি জড়িত গলায় বললাম, "ঘুমাচ্ছিলাম। নিহিলিন নিয়ে কয়দিন জেগে ছিলাম তো, শরীর আর চলছিল না।"

"আমিও তাই আন্দাজ করেছিলাম। কিন্তু তাই বলে এত দীর্ঘ সময় ঘুমুবে বুঝতে পারি নি।"

"আমিও বুঝতে পারি নি। যা-ই হোক কেন ডেকেছ বল।"

"আমাদের হাতে সময় নেই। তোমাকে এক্ষুনি যাত্রা শুরু করতে হবে।"

"এক্ষুনি মানে কখন?"

"আগামী ছত্রিশ ঘণ্টার মাঝে। একটা চৌম্বকীয় ঝড় আসছে, সেটা আসার আগে শুরু না করলে অনেক দেরি হয়ে যাবে।"

"ও।" আমি ঘুম থেকে জেগে ওঠার চেষ্টা করতে করতে বললাম, "কিন্তু আমার নিজেরও তো একটু প্রস্তুতি নিতে হবে।"

"না। তোমার নিজের প্রস্তুতি নেবার কোনো প্রয়োজন নেই। তোমার সবকিছুর প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।"

"আমার ব্যক্তিগত কিছু কাজ—"

লি-হান অধৈর্য হয়ে বলল, "তোমার কোনো কিছু আর ব্যক্তিগত নেই। যখন থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তোমাকে পঞ্চম মাত্রার মহাকাশযানের অধিনায়ক করা হবে সেদিন থেকে তোমাকে চব্বিশ ঘণ্টা চোখে চোখে রাখা হয়েছে। তোমার ব্যক্তিগত সবকিছু আমরা জানি—ঠিক সেভাবে ফোবিয়ানে সবকিছু রাখা হয়েছে। তোমার পছন্দসই বইপত্র, মেটা ফাইল থেকে শুরু করে প্রিয় খাবার, প্রিয় পোশাক, প্রিয় সঙ্গীত সবকিছু পাবে। তোমার কোনো ব্যক্তিগত কাজ বাকি নেই ইবান।"

"কিন্তু—"

"কোনো কিন্তু নেই। তা ছাড়া ফোবিয়ানের চরম গতিবেগ তোলার আগে পর্যন্ত তুমি নেটওয়ার্কে সবার সাথে যোগাযোগ রাখতে পারবে।"

আমি ইতস্তত করে বললাম, "আমি সাথে আরো একটি জিনিস নিতে চেয়েছিলাম।"

"কী?"

"রিতুন ক্লিসের মস্তিষ্ক ম্যাপিং।"

লি-হান এবারে থেমে গিয়ে একটা শিস দেবার মতো শব্দ করল।

আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "পাওয়া যাবে না?"

"একটু কঠিন হবে—কিন্তু আমি চেষ্টা করব।"

"চেষ্টা করলে হবে না। আমাকে পেতেই হবে। তুমি জান আমি প্রায় এক যুগ এই মহাকাশযানে একা একা বসে থাকব। আমার কথা বলার জন্য একজন মানুষ দরকার।"

লি-হান হাসার শব্দ করে বলল, "আমাদের সময়ে তুমি প্রায় এক যুগ থাকবে, কিন্তু তোমার নিজের ফ্রেমে তো এত দীর্ঘ সময় নয়। খুব বেশি হলে তিন বছরের মতো।"

"তিন বছর আর এক যুগে কোনো পার্থক্য নেই। একই ব্যাপার। একটা-কিছু গোলমাল হলেই তিন বছর সত্যি সত্যি একযুগ নয়, একেবারে এক শতাব্দী হয়ে যেতে পারে।"

"বুঝেছি।"

আমি গলার স্বরে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বললাম, "আমাকে রিতুন ক্লিসের মস্তিষ্ক ম্যাপিং না দেওয়া হলে আমি কিন্তু এই অভিযানে যাব না।"

লি-হান একটু অধৈর্য হয়ে বলল, "আহ্! তুমি দেখি মহাকাশ-দস্যুদের মতো ব্ল্যাকমেইলিং শুরু করলে।"

"এটা ব্ল্যাকমেইলিং নয়—এটা সত্যি।"

"ঠিক আছে আমি যোগাড় করে দেব।"

"আমার আরো একটা জিনিস দরকার।"

"কী?"

"আমার মায়ের জন্য একটা উপহার।"

"কী উপহার নিতে চাও?"

"ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"বায়োডোমের বাইরে ঝড়ো বাতাসের গর্জনের সাথে মিল রেখে একটা সঙ্গীতধ্বনি তৈরি হয়েছে। শুনলেই বুকের মাঝে কেমন জানি করতে থাকে। সেই সঙ্গীতধ্বনি নিতে পার।"

"ঠিক আছে।"

"কিংবা এই গ্রহের প্রাচীন সভ্যতার কোনো চিহ্ন। কোনো রেলিক। গ্রানাইটের ছোট কোনো মূর্তি?"

"বেশ। তুমি যদি মনে কর সেরকম কিছু খুঁজে পাবে—"

"সবচেয়ে ভালো হয় যদি কোয়ার্টজের গোলকের ভিতরে করে একটা সৌভাগ্য-বৃক্ষ নিয়ে যাও।"

"সৌভাগ্য-বৃক্ষ?"

"হ্যাঁ। এই গ্রহের একটি বিশেষ ধরনের গাছ রয়েছে, ছোট গাছ তার মাঝে রয়েছে ছোট ছোট নীল পাতা। এখানকার মানুষ বলে যখন জীবনে বড় ধরনের সৌভাগ্য আসে তখন সেখানে ফুল ফোটে। উজ্জ্বল কমলা রঙের ফুল। ভারি চমৎকার দেখতে!"

AMARBOI.COM

"বেশ। তা হলে এই গাছটাই নেওয়া যাক। কিন্তু আন্তঃনক্ষত্র পরিবহনে গাছপালা বা জীবন্ত প্রাণী আনা-নেওয়ার ওপর নানারকম বিধিনিষেধ রয়েছে না?"

লি-হান হা হা করে হেসে বলল, "তুমি তোমার মহাকাশযানে করে ম্যাঙ্গেল ক্বাসকে নিয়ে যাচ্ছ। যাকে ম্যাঙ্গেল ক্বাসের মতো একটি বস্তুকে নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় তাকে যে কোনো জীবন্ত প্রাণী নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। সেটা নিয়ে তুমি চিন্তা কোরো না!"

"ঠিক আছে আমি চিন্তা করব না।"

"তা হলে তুমি চার নম্বর এস্ট্রোডোমে চলে আস। প্রস্তুতি শুরু করা যাক। তোমাকে তিন ঘণ্টা সময় দেওয়া হল।"

"তিন ঘণ্টা? মাত্র তিন ঘণ্টার মাঝে আমি সারা জীবনের জন্য একটা গ্রহ ছেড়ে চলে যাব?"

লি-হান একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "কেউ যদি আমাকে এই গ্রহ ছেড়ে চলে যাবার সুযোগ করে দিত, আমি তিন মিনিটে চলে যেতাম!"

আমি কোনো কথা না বলে বাইরে তাকালাম। কুৎসিত বেগুনি আলোতে গ্রহটাকে কী ভয়ঙ্করই-না দেখাচ্ছে! লি-হান মনে হয় সত্যি কথাই বলছে।

ফোবিয়ানের কারগো ভল্টে স্টেনলেস স্টিলের কালো একটি সিলিন্ডারকে দেয়ালের সাথে আটকে দিয়ে সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ মানুষটি বলল, "এটি হচ্ছে ম্যাঙ্গেল ক্বাস। ফোবিয়ানের মূল নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে একে বুঝিয়ে দেওয়া হল।"

মহাকাশযানের ভরশূন্য পরিবেশে ভেসে ভেসে আমি সিলিন্ডারটির কাছে গিয়ে সেটি স্পর্শ করে বললাম, "এই মানুষটি সম্পর্কে আমি এত বিচিত্র ধরনের গল্প শুনেছি যে আমি নিশ্চিত হতে চাই যে মানুষটি মাঝপথে জেগে উঠবে না।"

সামরিক অফিসারটি হেসে বলল, "সে ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত থাকতে পার, তাকে তরল হিলিয়াম তাপমাত্রায়[২২] জমিয়ে রাখা আছে। জেগে ওঠার কোনো সম্ভাবনা নেই।"

"তোমার-আমার বেলায় সেটি সত্যি হতে পারে, ম্যাঙ্গেল ক্বাসের বেলায় আমি এত নিশ্চিত নই!"

"এ ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত থাকতে পার, পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র তোমার-আমার জন্য যেটুকু সত্যি, ম্যাঙ্গেল ক্বাসের জন্যও ততটুকু সত্যি। তরল হিলিয়াম তাপমাত্রায় মানুষের শরীরে কোনো জৈবিক অনুভূতি থাকে না। সে আক্ষরিক অর্থে একটি জড়বস্তু।"

"বাইরে থেকে কেউ কোনো সঙ্কেত দিয়ে তাকে জাগিয়ে তুলতে পারবে না?"

"না, এই সিলিন্ডারটিকে বাইরে থেকে কেউ কোনো সঙ্কেত পাঠাতে পারবে না। এটি বলতে পার তথ্য বা সঙ্কেতের দিক থেকে একেবারে নিশ্ছিদ্র।"

সামরিক অফিসারটি ফোবিয়ানের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের সাথে আনুষ্ঠানিক বোঝাপড়া শেষ করে আমাকে ছোট একটি ক্রিস্টাল ধরিয়ে দিয়ে বলল, "ইবান, তুমি এখন তোমার যাত্রা শুরু করতে পার।"

আমি ভল্টের দেয়ালে আটকে রাখা সারি সারি সিলিন্ডারগুলোর দিকে তাকালাম, ম্যাঙ্গেল ক্বাস ছাড়াও এখানে অন্য মানুষ রয়েছে। কেউ কেউ প্রতিরক্ষা বাহিনীর, কেউ কেউ একেবারে সাধারণ যাত্রী। নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে তাদের পরিচয় দেওয়া রয়েছে, আমার আলাদা করে জানার কোনো প্রয়োজন নেই। মানুষ ছাড়াও এই মহাকাশযানে অন্য জিনিসপত্র রয়েছে, যার কিছু কিছু আমার জানার কথা নয়। মহাকাশযানের অধিনায়ক হিসেবে আমাকে সেগুলো মানুষের এক কলোনি থেকে অন্য কলোনিতে পৌঁছে দেবার কথা। ম্যাঙ্গেল ক্বাসের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা আলাদা, সে যে কোনো মহাকাশযানে থাকলে সেটি মহাকাশযানের অধিনায়কের জানা প্রয়োজন। জড় বস্তু হিসেবে থাকলেও সেটি জানা প্রয়োজন।

সামরিক অফিসার এবং তার সাথে আসা টেকনিশিয়ানরা নিজেদের যন্ত্রপাতি গুছিয়ে নিতে শুরু করে। ভরশূন্য পরিবেশে ভেসে যাওয়া যন্ত্রপাতি গুছিয়ে নেওয়া খুব সহজ নয় কিন্তু এই টেকনিশিয়ানরা দক্ষ, তাদের হাতের কাজ দেখতে ভালো লাগে। কিছুক্ষণের মাঝেই সবাই বিদায় নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। একজন একজন করে সবাই এসে আমার সামনে মাথা নিচু করে অভিবাদন জানিয়ে তাদের স্কাউটশিপে উঠে গেল। সামরিক অফিসার আমার হাত ধরে সেখানে মৃদু চাপ দিয়ে বলল, "তোমার যাত্রা শুভ হোক, ইবান।"

আমি হেসে বললাম, "আমার পক্ষ থেকে চেষ্টার কোনো ত্রুটি হবে না!"

সামরিক অফিসার আমার হাত ছেড়ে দিয়ে বাতাসে ভেসে ভেসে তার স্কাউটশিপে ঢুকে গেল, আমি ফোবিয়ানের গোল বায়ু-নিরোধক দরজাটা বন্ধ করে দিতেই স্কাউটশিপের ইঞ্জিনের চাপা শব্দ শুনতে পেলাম, আমি এখন এখানে একা।

আমি নিজের ভিতরে এক ধরনের নিঃসঙ্গতা অনুভব করলাম, এই বিশাল মহাকাশযানটিতে আমি একা একা এক বিশাল দূরত্ব অতিক্রম করব—এক নক্ষত্র থেকে অন্য নক্ষত্রে। এই দীর্ঘ সময়ে আমার সাথে কথা বলার জন্যও কোনো সত্যিকার মানুষ থাকবে না। মহাকাশের নিকষ কালো অন্ধকারে, হিমশীতল পরিবেশে এই বিশাল মহাকাশযান তার শক্তিশালী ইঞ্জিনের গুঞ্জন তুলে উড়ে যাবে। নতুন এই মহাকাশযানে হয়তো অজানা কোনো বিপদ অপেক্ষা করে আছে, মাহালা নক্ষত্রপুঞ্জের কাছাকাছি দুটি বিশাল ব্ল্যাকহোল, তার পাশ দিয়ে বিপজ্জনক একটি কক্ষপথ দিয়ে আমাকে যেতে হবে। সেখানে মহাকাশ-দস্যুরা ওত পেতে আছে, কে জানে, হয়তো বিচিত্র কোনো মহাজাগতিক প্রাণীর মুখোমুখি হতে হবে। জানি না সেই দীর্ঘ যাত্রা কখনো শেষ হবে কি না, রিশি নক্ষত্রের সেই মানব কলোনিতে পৌঁছাতে পারব কি না। যদিও-বা পৌঁছাই সেই এক যুগ পর আমার মায়ের সাথে দেখা হবে কি না সে কথাটিই-বা কে বলতে পারে!

আমি জোর করে আমার ভিতর থেকে সব চিন্তা দূর করে সরিয়ে দিয়ে ভেসে ভেসে মহাকাশযানের উপরের দিকে যেতে থাকি। নিয়ন্ত্রণ কক্ষে গিয়ে আমাকে এখনই প্রস্তুত হতে হবে। ফোবিয়ানের শক্তিশালী ইঞ্জিন যখন প্রচণ্ড গর্জন করে এই গ্রহের মহাকর্ষ বলকে উপেক্ষা করে মহাকাশে পাড়ি দেবে তখন আমাকে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে হবে।

কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে আরামদায়ক চেয়ারটিতে বসার সাথে সাথে আমি ফোবিয়ানের নিয়ন্ত্রণকারী মূল নিউরাল নেটওয়ার্কের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, "পঞ্চম মাত্রার আন্তঃনক্ষত্র মহাকাশযান ফোবিয়ানের পক্ষ থেকে আপনাকে এই মহাকাশযানের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মহামান্য ইবান।"

মানুষের কণ্ঠস্বরে এ ধরনের যান্ত্রিক কথা শুনলে সবসময়ই আমি একটা অস্বস্তি বোধ করি—আমি ব্যক্তিগতভাবে সবসময়ই মনে করি যন্ত্র এবং মানুষের কথার মাঝে একটা স্পষ্ট পার্থক্য থাকা দরকার। মানুষের কথা শোনার সময় তাকে সবসময়ই আমরা দেখতে পাই, মুখের ভাবভঙ্গি থেকে কথার অনেক কিছু স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যন্ত্রের বেলায় সেটা সম্ভব নয়—সত্যি কথা বলতে কী কথাটা কোথা থেকে আসছে অনেক সময় সেটাও বুঝতে পারি না।

আমি চেয়ারে নিজেকে নিরাপত্তা বেল্ট দিয়ে বেঁধে নিতে নিতে বললাম, "আমি যদি বলি তোমার আমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করলাম না!"

নিউরাল নেটওয়ার্কের কণ্ঠস্বর তরল গলায় বলল, "মহামান্য ইবান, আপনি ইচ্ছে করলে অবশ্য সেটা বলতে পারেন। তাতে কিছু আসে-যায় না।"

"তুমি কে?"

"আমি ফোবি। ফোবিয়ানের নিউরাল নেটওয়ার্ক এবং মানুষের সংযোগকারী মডিউল ফোবি।"

আমি কন্ট্রোল প্যানেলের কয়েকটা সুইচ স্পর্শ করতে করতে বললাম, "আচ্ছা ফোবি, আমি যদি এখন তোমাকে জঘন্য ভাষায় গালাগাল করি তা হলে কী হবে?"

"কিছুই হবে না মহামান্য ইবান। আমি মানুষ নই, আমার ভিতরে কোনো মান-অপমান বোধ নেই—আমি আপনাকে সাহায্য করতে এসেছি, যেভাবে সবচেয়ে ভালোভাবে সাহায্য করা যায় সেভাবে সাহায্য করব।"

আমি কন্ট্রোল প্যানেলে ফোবিয়ানের ইঞ্জিনগুলোর খুঁটিনাটি পরীক্ষা করতে করতে বললাম, "ফোবি, আমি যতদূর জানি তোমার নিউরাল নেটওয়ার্ক মানুষের মস্তিষ্ক থেকে অনেক গুণ ভালো। বলা হয়, মানুষ থেকে বারো গুণ বেশি তোমার বুদ্ধিমত্তা—যার অর্থ তুমি আসলে আমার থেকে অনেক বেশি বুদ্ধিমান। কাজেই প্রকৃত অর্থে আমার তোমাকে বলা উচিত মহামান্য ফোবি—"

ফোবি এবারে প্রায় হাসার মতো করে শব্দ করল, বলল, "আপনি ভুল করছেন মহামান্য ইবান, আমি নিউরাল নেটওয়ার্ক নই—আমি শুধুমাত্র নিউরাল নেটওয়ার্কের মানুষের সাথে যোগাযোগকারী মডিউল। নিউরাল নেটওয়ার্ক যদি একটা মানুষ হয় তা হলে আমি তার কণ্ঠস্বর। আমার নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা নেই। আর সম্বোধনের আনুষ্ঠানিকতার কোনো অর্থ নেই মহামান্য ইবান। দীর্ঘদিন গবেষণা করে দেখা গেছে একজন মানুষ এবং একজন যন্ত্রকে পাশাপাশি কাজ করতে দেওয়া হলে মানুষকে আনুষ্ঠানিকভাবে খানিকটা প্রাধান্য দিতে হয়, পুরো ব্যাপারটি অনেক সহজ হয়, এর বেশি কিছু নয়।"

"ও!" আমি একটা নিশ্বাস নিয়ে বললাম, "এই মহাকাশযানে আমি দীর্ঘ সময়ের জন্য আছি, তোমার সাথে যন্ত্র এবং মানুষ নিয়ে কথা বলা যাবে। এখন ফোবিয়ানকে শুরু করা যাক।"

"বেশ।"

আমি কন্ট্রোল প্যানেল পরীক্ষা করে মূল ইঞ্জিন দুটো চালু করলাম, সাথে সাথে ফোবিয়ানের দুইপাশে বসানো শক্তিশালী ইঞ্জিন দুটি গর্জন করে উঠল। আমি ফোবিয়ানের জানালা দিয়ে বিদ্যুৎঝলকের মতো আয়োনিত গ্যাস বের হতে দেখলাম। আমি অসংখ্যবার মহাকাশযানের মূল ইঞ্জিন চালু করে মহাকাশযানকে নিয়ে মহাকাশে ছুটে গিয়েছি কিন্তু প্রথম মুহূর্তটি প্রত্যেকবারই আমাকে একইভাবে অভিভূত করেছে।

আমি ফোবিয়ানের তীব্র কম্পন অনুভব করি, মহাকাশযানটি শেষবারের মতো গ্রহটিকে প্রদক্ষিণ করতে শুরু করেছে, শক্তিশালী ইঞ্জিন দুটি প্রদক্ষিণ শেষ করার আগেই এই গ্রহের মহাকর্ষ বলকে ছিন্ন করে উড়ে যাবে।

আমি কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে তাকিয়ে বসে থাকি। মহাকাশযানের ভরশূন্য পরিবেশ দূর হয়ে এখন এখানে ত্বরণ থেকে প্রচণ্ড আকর্ষণ শুরু হচ্ছে। আরামদায়ক চেয়ারটিতে অদৃশ্য কোনো শক্তি আমাকে ধীরে ধীরে চেপে ধরতে শুরু করেছে। সাধারণ যে কোনো মানুষ থেকে আমি অনেক বেশি মহাকর্ষ শক্তি সহ্য করতে পারি। কন্ট্রোল প্যানেলে দেখতে পাচ্ছি আমার ওজন বাড়তে শুরু করেছে, মনে হচ্ছে বুকের ওপর অদৃশ্য একটি দানব চেপে

বসেছে। আমার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হতে থাকে, চোখের সামনে একটা লাল পরদা কাঁপতে শুরু করে।

আমার কানের কাছে ফোবি ফিসফিস করে বলল, "মহামান্য ইবান, আপনাকে অচেতন করে দিই?"

আমি দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, "না।"

"কেন? কেন আপনি এই কষ্ট সহ্য করছেন?"

"জানি না।"

"আর কিছুক্ষণের মাঝে আপনার মাথার মাঝে রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যাবে, আপনি এমনিতেই অচেতন হয়ে পড়বেন।"

"তবু আমি দেখতে চাই।" আমি বুঝতে পারি অদৃশ্য শক্তির টানে আমার মুখের চামড়া পিছনে সরে আসছে, চোখ খোলা রাখতে পারছি না, মনে হচ্ছে বুকের ওপর কেউ একটা বিশাল পাথর চাপিয়ে রেখেছে, আমি একবারও বুকভরে নিশ্বাস নিতে পারছি না।

ফোবি আবার ফিসফিস করে বলল, "মহামান্য ইবান। আপনার নিরাপত্তার খাতিরেই এখন আপনাকে অচেতন করে রাখা প্রয়োজন। এটি নিছক পাগলামি—"

"আমি জানি।"

"কিন্তু—"

"ফোবি—তোমরা কি কখনো পাগলামি কর? যন্ত্র কি পাগলামি করতে পারে?"

ফোবি উত্তরে কী বলল আমি শুনতে পেলাম না, কারণ এর আগেই আমি অচেতন হয়ে পড়লাম।

AMARBOI.COM

৩

আমার যখন জ্ঞান ফিরে এল তখন মহাকাশযান ফোবিয়ান তার নির্দিষ্ট যাত্রাপথে উড়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে। মহাকাশযানে একটি আরামদায়ক মহাকর্ষ বল। আমি নিরাপত্তা বেল্ট খুলে চেয়ার থেকে নেমে এসে ডাকলাম, "ফোবি।"

"বলুন মহামান্য ইবান।"

"সবকিছু চলছে ঠিকভাবে?"

"চলছে মহামান্য ইবান। আপনি সুস্থবোধ করছেন তো?"

"মাথার ভিতরে একটা ভোঁতা ব্যথা, আশা করছি ঠিক হয়ে যাবে।" আমি কন্ট্রোল প্যানেলে দূরে অপসৃয়মাণ গ্রহটির দিকে তাকিয়ে রইলাম, এখনো বিশ্বাস হতে চায় না আমি আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই অশুভ গ্রহটির ভিতরে একটা বায়োডোমে কাটিয়ে দিয়েছি। আমি মনিটর থেকে চোখ সরাতেই ছোট স্বচ্ছ গোলকটির দিকে চোখ পড়ল, ভিতরে বিচিত্র একটি গাছ, গাছে নীল পাতা তিরতির করে নড়ছে। আমি গাছটিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "এটাই কি সৌভাগ্য-বৃক্ষ?"

"হ্যাঁ মহামান্য ইবান। এটা সৌভাগ্য-বৃক্ষ।"

"মানুষের যখন সৌভাগ্য আসে তখন এই গাছে ফুল ফোটে?"

"সেরকম একটি জনশ্রুতি রয়েছে।"

"তুমি বিশ্বাস কর?"

ফোবি বলল, "সৌভাগ্য জিনিসটা কী সেটাকে নতুন করে ব্যাখ্যা করলেই এটা বিশ্বাস করা যায়।"

"কী রকম?"

"যেমন আপনি যদি ধরে নেন এই বিচিত্র গাছটির ফুল ফুটতে দেখা এক ধরনের সৌভাগ্য!"

আমি হা হা করে হেসে বললাম, "ভালোই বলেছ ফোবি। তুমি নিঃসন্দেহে খুব বুদ্ধিমান।"

"ধন্যবাদ মহামান্য ইবান।"

আমি গাছটিকে ভালো করে লক্ষ করতে করতে বললাম, "এই সৌভাগ্য-বৃক্ষ আমি আমার মায়ের জন্য নিয়ে যাচ্ছি।"

"আমি জানি।"

"তোমার কী মনে হয় ফোবি, আমার মা কি এটা পছন্দ করবেন?"

"নিশ্চয়ই করবেন।"

"তুমি তো আমার মাকে কখনো দেখ নি, তুমি কেমন করে জান?"

"কারণ আপনার মায়ের কাছে জিনিসটির কোনো গুরুত্ব নেই, আপনি এনেছেন এই ব্যাপারটির গুরুত্ব অনেক। তা ছাড়া 'সৌভাগ্য-বৃক্ষ' নামটির একটা আকর্ষণ আছে। সৌভাগ্যের জন্য অপেক্ষা করাও মানুষ খুব পছন্দ করে।"

আমি একটু হেসে বললাম, "তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি মানুষকে খুব ভালো বুঝতে পার।"

"আপনাদের জন্য ব্যাপারটি সহজাত, আমাদের শিখতে হয়। আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে মানুষকে বুঝতে শিখি।"

আমি সৌভাগ্য-বৃক্ষ থেকে চোখ সরিয়ে হেঁটে জানালার কাছে এগিয়ে গেলাম, বাইরে নিকষ কালো অন্ধকার, তার মাঝে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে অসংখ্য নক্ষত্র। মহাকাশযানে একটা মৃদু কম্পন, এ-ছাড়া প্রচণ্ড গতিবেগের কোনো চিহ্ন নেই। মনে হচ্ছে মহাকাশযানটি বুঝি এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে। কিন্তু আমি জানি এটি স্থির হয়ে নেই, প্রচণ্ড গতিবেগে এটি ছুটে চলেছে।

আমি জানালা থেকে চোখ ফিরিয়ে ভিতরে তাকিয়ে বললাম, "সৌভাগ্য-বৃক্ষ ছাড়াও এখানে আমার জন্য আরো একটি জিনিস থাকার কথা।"

"আপনি মহামতী রিতুন ক্লিসের মস্তিষ্ক ম্যাপিঙের কথা বলছেন?"

"হ্যাঁ। সেটা আছে তো?"

"আছে মহামান্য ইবান। এখনো উপস্থাপন করা হয় নি। আপনি যখন চাইবেন আমাকে জানাবেন, আমি উপস্থাপিত করে দেব।"

"বেশ। আরো কিছু সময় যাক। আমি এই মানুষটির সাথে কথা বলতে খুব আগ্রহী তাই আগেই বলে ফেলতে চাই না। একটু অপেক্ষা করতে চাই।"

"ঠিক আছে মহামান্য ইবান।"

আমি আবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম, কালো আকাশে নক্ষত্রগুলো দেখে বুকের ভিতরে আবার এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করতে থাকি।

আমি মহাকাশযান ফোবিয়ানের বিভিন্ন স্তরে ঘুরে ঘুরে পুরোটা পরীক্ষা করে নিই। বাতাসের চাপ, আর্দ্রতা, জ্বালানির পরিমাণ, নিয়ন্ত্রণপ্রক্রিয়া, যোগাযোগ নেটওয়ার্ক, অস্ত্রের সরবরাহ থেকে শুরু করে দৈনন্দিন খাবার বা বিনোদনের ব্যবস্থা সবকিছুই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম। পুরো মহাকাশযানটির মাঝেই একটা যত্নের ছাপ রয়েছে। দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে

এটাকে দাঁড়া করানো হয়েছে। যন্ত্রপাতি এবং প্রযুক্তি আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে, আমি মুগ্ধ হয়ে ফোবিয়ানের যান্ত্রিক উৎকর্ষ দেখে দেখে সময় কাটিয়ে দিতে লাগলাম।

মহাকাশযানটির পরীক্ষা–নিরীক্ষা এবং খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার অংশটি আমি যাত্রার শুরুতেই করে নিতে চাইছি কারণ এখন এর ভিতরে একটা আরামদায়ক মহাকর্ষ বল রয়েছে। মহাকাশযানটির গতিবেগ প্রতিনিয়ত বেড়ে যাচ্ছে, তার ত্বরণের জন্য এখানে মহাকর্ষ বল—ইঞ্জিন দুটো বন্ধ করে দেবার পর এখানে আর মহাকর্ষ বল থাকবে না। তখন মহাকাশযানটিকে এর অক্ষের উপর ঘুরিয়ে আবার মহাকর্ষ বল তৈরি করতে হবে, সেটা হবে বাইরের দিকে। মহাকাশযান ফোবিয়ানটিকে কাছাকাছি একটা নিউট্রন স্টারের[২৩] দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—তার মহাকর্ষ বলকে ব্যবহার করে মহাকাশযানটিকে আবার প্রচণ্ড একটি গতিবেগ দেওয়া হবে।

কয়েকদিনের মাঝেই আমি এই মহাকাশযানটিতে বেশ অভ্যস্ত হয়ে উঠলাম। আমার জন্য সুসজ্জিত একটি ঘর থাকা সত্ত্বেও আমি কন্ট্রোল প্যানেলের নিচে স্লিপিং ব্যাগের ভিতর ঘুমিয়ে যেতাম। যেটুকু না খেলেই নয় আমি সেটুকু খেয়ে সময় কাটিয়ে দিতাম। একা একা আছি বলে নিজের চেহারার দিকে কখনো ঘুরে তাকাতাম না এবং দেখতে দেখতে আমার মুখে দাড়িগোঁফের জঙ্গল হয়ে গেল। অবসর সময় আমি প্রাচীন সঙ্গীত শুনে সময় কাটাতাম এবং কখনো কখনো সময় কাটানো সমস্যা হয়ে গেলে এক টুকরো কৃত্রিম কাঠের টুকরো কুঁদে কুঁদে মানুষের ভাস্কর্য তৈরি করতে শুরু করতাম। কয়েকদিনের মাঝেই মহাকাশযানটি তার প্রয়োজনীয় গতিবেগ অর্জন করে ফেলবে, মূল ইঞ্জিন দুটি বন্ধ করে দেওয়ার পর আমি আবার ভরশূন্য পরিবেশে ফিরে যাব।

মহাকাশযানের জীবনযাত্রায় আমি যখন পুরোপুরি অভ্যস্ত হয়ে উঠলাম তখন একদিন আমার রিতুন ক্লিসের মুখোমুখি হবার ইচ্ছে করল। আমি ফোবিকে বললাম রিতুন ক্লিসের মস্তিষ্কের ম্যাপিংটিকে ফোবিয়ানের নিউরাল নেটওয়ার্কে উপস্থাপন করতে।

এ ধরনের কাজ অল্প কিছু সময়ের মাঝেই হয়ে যাবার কথা কিন্তু দেখা গেল পুরোটুকু শেষ করতে ফোবির দীর্ঘ সময় লেগে গেল। নিউরাল নেটওয়ার্কে উপস্থাপন শেষ করে ফোবি আমাকে নিচু গলায় বলল, "মহামান্য ইবান, আপনি এখন ইচ্ছে করলে মহামান্য রিতুন ক্লিসের সাথে কথা বলতে পারেন।"

"কীভাবে বলব? কোথায় রিতুন ক্লিস?"

"আপনি অনুমতি দিলে আমি তার হলোগ্রাফিক ত্রিমাত্রিক একটি প্রতিচ্ছবি আপনার সামনে উপস্থিত করতে পারি।"

"বেশ, তুমি উপস্থাপন কর।"

আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই নিয়ন্ত্রণ কক্ষের মাঝামাঝি জায়গায় মধ্যবয়স্ক একজন মানুষের প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠল। মানুষটি একটা ঢিলে আলখাল্লার মতো সাদা পোশাক পরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, খুব ধীরে ধীরে সেই মানুষটি আমার দিকে ঘুরে তাকাল। মানুষটিকে দেখে আমি নিজের শরীরে এক ধরনের শিহরন অনুভব করলাম কারণ আমি হঠাৎ করে বুঝতে পারলাম এটি একটি ত্রিমাত্রিক হলোগ্রাফিক প্রতিচ্ছবি নয়, এটি সত্যিই একজন মানুষ। মানুষটি আমার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে কঠিন গলায় জিজ্ঞেস করল, "আমি কোথায়?"

আমি দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে তাকে অভিবাদন করে বললাম, "মহামান্য রিতুন, আপনি মহাকাশযান ফোবিয়ানে।"

"আমি এখানে কেন?"

"আপনার সাথে কথা বলার জন্য আমি আপনার মস্তিষ্কের ম্যাপিংকে মহাকাশযানের নিউরাল নেটওয়ার্ক উপস্থাপন করেছি।"

মহামান্য রিতুনের মুখে হঠাৎ একটি গভীর বেদনার ছায়া পড়ল। তিনি বিষণ্ন গলায় বললেন, "তুমি শুধুমাত্র আমার সাথে কথা বলার জন্য আমাকে এই ভয়ঙ্কর অমানবিক পরিবেশে নিয়ে এসেছ?"

"ভয়ঙ্কর অমানবিক পরিবেশ?"

"হ্যাঁ, এটি একজন মানুষের জন্য একটি ভয়ঙ্কর পরিবেশ, একটি অসহনীয় পরিবেশ।"

আমি একটু চমকে উঠে বললাম, "আমি আসলে বুঝতে পারি নি এই পরিবেশটি আপনার কাছে এত অসহনীয় মনে হবে।"

"বুঝতে পার নি? মহাকাশযানের নিউরাল নেটওয়ার্কের বিশাল শূন্যতার মাঝে আমি একা অনন্তকালের জন্য আটকা পড়ে আছি, আমার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, আদি নেই, অন্ত নেই, শুরু নেই, শেষ নেই—এটি যদি অমানবিক না হয় তা হলে কোনটি অমানবিক?"

"আমি আসলে বুঝতে পারি নি—"

মহামান্য রিতুন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমার চোখের দিকে তাকালেন, বললেন, "তুমি বুঝতে পার নি?"

"না।"

"বুঝতে চেষ্টা করেছ?"

আমি অপরাধীর মতো বললাম, "আসলে চেষ্টাও করি নি। আমি ভেবেছিলাম এটি আরো একটি মস্তিষ্কের ম্যাপিং—আসলে আপনি যে সত্যিকারের একজন মানুষ হিসেবে আসবেন সেটি একবারও বুঝতে পারি নি।"

"হ্যাঁ, তুমি বিশ্বাস কর, আমি সত্যিকারের একজন মানুষ। আমি রিতুন ক্লিসের মস্তিষ্কের ম্যাপিং নই—আমিই রিতুন ক্লিস। রক্তমাংসের রিতুন ক্লিস যেটুকু জীবন্ত ছিল আমি ঠিক ততটুকু জীবন্ত।"

"আমি বিশ্বাস করেছি। আমি আগে বুঝতে পারি নি কিন্তু এখন বুঝতে পেরেছি।"

রিতুন ক্লিস আমার দিকে দুই পা এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কী যুবক?"

"আমার নাম ইবান।"

"তুমি কে?"

"আমি এই মহাকাশযানের অধিনায়ক।"

রিতুন ক্লিস কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর কাতর গলায় বললেন, "ইবান, তুমি আমাকে মুক্তি দাও।"

আমি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে বললাম, "অবশ্যই আমি আপনাকে মুক্ত করে দেব। অবশ্যই দেব। কীভাবে করতে হয় আমাকে সেটা বলে দেন—"

"আমাকে এই নিউরাল নেটওয়ার্ক থেকে সরিয়ে নাও। আমার অস্তিত্বকে ধ্বংস করে দাও।"

"ধ্বংস করে দেব?"

"হ্যাঁ। আমাকে ধ্বংস করে দাও।"

আমি রিতুন ক্লিসের দিকে তাকিয়ে রইলাম এবং হঠাৎ করে আমার ভিতরে এক ধরনের আতঙ্ক এসে ভর করল। রিতুন ক্লিস আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে ইবান?"

AMARBOI.COM

"আপনি এত জীবন্ত, আপনাকে ধ্বংস করা তো আপনাকে হত্যা করার মতো। আমি কীভাবে আপনাকে হত্যা করব?"

রিতুন ক্লিস বিপন্ন গলায় বললেন, "তুমি কী বলতে চাইছ ইবান?"

"আমি—আমি এখন কী করব? আমি আপনাকে এই নিউরাল নেটওয়ার্ক থেকে মুক্ত করতে চাই, কিন্তু সেটি তো একটা হত্যাকাণ্ডের মতো—"

রিতুন ক্লিস কাতর গলায় বললেন, "তা হলে কি এখান থেকে আমার মুক্তি নেই?"

"আপনি কি নিজেকে নিজে মুক্ত করতে পারেন না?"

"আমি জানি না। আমি যখন বেঁচে ছিলাম তখন প্রযুক্তি এ রকম ছিল না। এ রকম নিউরাল নেটওয়ার্ক ছিল না, সেখানে মানুষের মস্তিষ্ক ম্যাপিং করা যেত না।"

"হয়তো ফোবি বলতে পারবে।" আমি উচ্চৈঃস্বরে ডাকলাম, "ফোবি—ফোবি—"

ফোবি নিচু গলায় বলল, "বলুন মহামান্য ইবান।"

"তুমি কি নিউরাল নেটওয়ার্কে এমন ব্যবস্থা করে দিতে পারবে যেন মহামান্য রিতুন ক্লিস নিজেকে নিজে মুছে দিতে পারবেন? অস্তিত্বকে সরিয়ে দিতে পারবেন?"

ফোবি উত্তর দিতে কয়েকমুহূর্ত সময় নিয়ে বলল, "নেটওয়ার্কের কোনো প্রক্রিয়া নিজে থেকে নিজে ধ্বংস করা অত্যন্ত বিপজ্জনক কাজ। সেটি সচরাচর করা হয় না।"

"কিন্তু করা কি সম্ভব?"

ফোবি আবার কয়েক মুহূর্ত সময় নিয়ে বলল, "হ্যাঁ, অত্যন্ত বিশেষ প্রয়োজনে সেটি করা সম্ভব। আপনি যদি নিজে ঝুঁকি নিয়ে সেটি করতে চান, সেটা করা যেতে পারে।"

"বেশ, তা হলে তুমি ব্যবস্থা করে দাও যেন মহামান্য রিতুন নিজেকে নিজে নিউরাল নেটওয়ার্ক থেকে অপসারিত করতে পারেন।"

ফোবি আবার কয়েক মুহূর্ত সময় নিয়ে বলল, "আপনি যদি চান, তা হলে তাই করে দেব।"

আমি এবারে রিতুন ক্লিসের দিকে তাকিয়ে বললাম, "মহামান্য রিতুন, আপনাকে যেন এই নিউরাল নেটওয়ার্কে আটকা পড়ে থাকতে না হয় তার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে, আপনি নিজেকে নিজে অপসারিত করে নিতে পারবেন।"

মহামান্য রিতুন কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে হাসার চেষ্টা করে বললেন, "তার অর্থ তুমি হত্যা করতে চাও না বলে আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে?"

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না, একটু হতচকিত হয়ে রিতুন ক্লিসের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "বেশ তা হলে তাই হোক।"

নিয়ন্ত্রণ কক্ষের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে থাকা রিতুন ক্লিসের প্রতিচ্ছবিটি ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। আমি একটা নিশ্বাস ফেলে ডাকলাম, "ফোবি।"

"বলুন মহামান্য ইবান।"

"এই সুদীর্ঘ অভিযানে আমি একা, ভেবেছিলাম মহামান্য রিতুন ক্লিসের সঙ্গে কথা বলে সময় কাটাব, কিন্তু দেখতে পেলে কী হল?"

"আমি দুঃখিত মহামান্য ইবান।"

"আসলে তুমি দুঃখিত নও ফোবি। তোমার দুঃখিত হবার ক্ষমতাও নেই।"

"আপনি ঠিকই বলেছেন মহামান্য ইবান।"

"এই মহাকাশযানে সময় কাটানো নিয়ে আমার খুব বড় সমস্যা হয়ে যাবে। খুব বড় সমস্যা।"

আমি তখন ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করি নি যে আমার এই কথাটি আসলে ভয়ঙ্করভাবে ভুল প্রমাণিত হবে।

এরপরের কয়দিন অবশ্য আমার সময় কাটানো নিয়ে বড় কোনো সমস্যা হল না, মহাকাশযানটি প্রয়োজনীয় গতিবেগ অর্জন করে ফেলেছে; এখন ইঞ্জিন দুটো বন্ধ করে দিতে হবে। মহাকাশযান পরিচালনার নিয়মকানুনে ইঞ্জিন দুটো হঠাৎ করে বন্ধ করে দেওয়ার ব্যাপারে নানারকম বিধিনিষেধ রয়েছে। এর আগে আমি কখনোই একা কোনো মহাকাশযানে ছিলাম না, কাজেই নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়েছে। এবারে সে-ধরনের কোনো সমস্যা নেই, কাজেই আমি ইঞ্জিন দুটো একসাথে হঠাৎ করে বন্ধ করে দেবার প্রস্তুতি নিলাম। ফোবি আমার পরিকল্পনা আন্দাজ করে আমাকে সাবধান করার চেষ্টা করল, বলল, "মহামান্য ইবান, মহাকাশযানের ইঞ্জিন হঠাৎ করে বন্ধ করে দেওয়া চতুর্থ মাত্রার অনিয়ম।"

"তার মানে জান?"

"জানি মহামান্য ইবান।"

"তার মানে এটি মহাকাশযানের কোনো বড় ধরনের ক্ষতি করবে না।"

"কিন্তু আপনার বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারে।"

"মনে হয় না। সেই ছেলেবেলা উঁচু দেয়াল থেকে লাফিয়ে পড়তাম—হঠাৎ করে ভরশূন্য পরিবেশের অনুভূতি খুব চমৎকার অনুভূতি। আমার মনে হয় আমার ছেলেবেলার স্মৃতি মনে পড়ে যাবে।"

"আপনি ছাদে গিয়ে আঘাত করবেন, আপনার সাথে সাথে সকল খোলা যন্ত্রপাতি ছাদে আঘাত করবে, সমস্ত মহাকাশযান প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনিতে কেঁপে উঠবে, নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি—"

"আহ্ ফোবি, তুমি থামবে? আমি একটা বাচ্চা খোকা নই আর তুমি আমার মা নও! তুমি যদি ভুলে গিয়ে থাক তা হলে তোমাকে মনে করিয়ে দিই, আমি এই মহাকাশযানের অধিনায়ক।"

ফোবি নরম গলায় বলল, "আমি আপনার প্রতি বিন্দুমাত্র অসম্মান প্রদর্শন করছি না মহামান্য ইবান, আমি আমার দায়িত্ব পালন করছি মাত্র।"

"চমৎকার! তুমি তোমার দায়িত্ব পালন কর, আমি আমার দায়িত্ব পালন করি!"

আমি শরীরকে আসন্ন ঘটনার জন্য প্রস্তুত করে সুইচকে স্পর্শ করে একসাথে দুটো ইঞ্জিন বন্ধ করে দিলাম। মনে হল সাথে সাথে মহাকাশযানে প্রলয়কাণ্ড ঘটে গেল, প্রচণ্ড শব্দ করে মহাকাশযানটি কেঁপে উঠল, এবং আমি আক্ষরিক অর্থে উড়ে গিয়ে ছাদে আঘাত করলাম, মহাকাশযানের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থাকার কারণে আমি শারীরিক কোনো আঘাত পেলাম না, তবে উড়ে আসা নানা ধরনের যন্ত্রপাতি, আমার অভুক্ত খাবার, জমে থাকা জঞ্জাল এবং অব্যবহৃত পোশাক থেকে নিজেকে রক্ষা করতে বেশ বেগ পেতে হল।

নিয়ন্ত্রণ কক্ষে ভাসমান যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য জঞ্জাল সরিয়ে ঘরটিকে আবার ব্যবহারের উপযোগী করতে আমার বেশ কিছু সময় লাগল। ভেসে ভেসে আবার নিয়ন্ত্রণ প্যানেলের সামনে এসে ফোবিকে বললাম, "দেখলে, এটি কোনো ব্যাপার নয়।"

"দেখলাম। তবে আপনি সতর্ক না থাকলে উড়ে আসা যন্ত্রপাতি থেকে আঘাত পেতে পারতেন।"

"কিন্তু আমি সতর্ক থাকব না কেন?"

"সেটি অবশ্য সত্যিই বলেছেন।"

AMARBOI.COM

আমি পদার্থ–প্রতিপদার্থের অব্যবহৃত জ্বালানি চৌম্বকীয় ক্ষেত্রে আবদ্ধ করে নিরাপত্তার ব্যাপারটি নিশ্চিত করলাম। যাত্রাপথটি ছক করে নিউট্রন স্টারে পৌঁছাতে কত সময় লাগবে সেটি বের করে নিলাম, পুরো মহাকাশযানের খুঁটিনাটিতে একবার চোখ বুলিয়ে মহাকাশযানের অধিনায়কের দৈনন্দিন কাজ করতে শুরু করলাম। মহাকাশযানে পুরোপুরি একা থাকার একটি সুবিধে রয়েছে যেটা আমি মাত্র টের পেতে শুরু করেছি, এখানে আমার এখন কোনো নিয়ম মানতে হয় না।

সমস্ত কাজ শেষ করতে করতে বেশ অনেকক্ষণ সময় লেগে গেল, দীর্ঘদিন মহাকর্ষ বলের মাঝে থেকে হঠাৎ করে ভরশূন্য পরিবেশে এসে যাওয়ায় অভ্যস্ত হতে একটু সময় নিচ্ছে। অধিনায়কের দৈনন্দিন তথ্য প্রবেশ করে আমি ঘুমানোর আয়োজন করলাম, এতদিন তবু একটু স্লিপিং ব্যাগের ভিতরে ঘুমিয়েছি, এখন আর তারও প্রয়োজন নেই, আমি শূন্যে শুয়ে পড়তে পারি, ভেসে ভেসে দূরে কোথাও না চলে যাই সে জন্য একটা ফিতা দিয়ে একটা পা কন্ট্রোল প্যানেলের সাথে বেঁধে নিলাম। আমি শূন্যে ভাসতে ভাসতে ঘুমানোর জন্য চোখ বন্ধ করেছি তখন আবার ফোবির কথা শুনতে পেলাম, "মহামান্য ইবান, আপনি কিছু না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ছেন। এটি আপনার স্বাস্থ্যের জন্য—"

"ফোবি। আমি তোমাকে আগেই বলেছি, তুমি আমার মা নও, তুমি আমার স্ত্রী নও, তুমি আমার কোনো অভিভাবকও নও। আমাকে বিরক্ত কোরো না, ঘুমাতে দাও।"

ফোবি আমাকে আর বিরক্ত করল না এবং আমি কিছুক্ষণের মাঝেই গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লাম।

আমি হঠাৎ ঘুম ভেঙে জেগে উঠলাম, কেন আমার হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে গেল আমি জানি না। আমি চোখ খুলে তাকিয়ে আবার পাশ ফিরে ঘুমিয়ে যেতে গিয়ে মনে পড়ল আমি আসলে বিছানায় শুয়ে নেই, শূন্যে ঝুলে আছি। আমি তখন চোখ খুলে তাকালাম এবং হঠাৎ করে আতঙ্কে আমার সারা শরীর শীতল হয়ে গেল।

নিয়ন্ত্রণ কক্ষের মূল আলো নিভিয়ে রাখা হয়েছে বলে এখানে আবছা এক ধরনের অন্ধকার, ইঞ্জিনগুলো বন্ধ করে দেওয়ার ফলে কোথাও এতটুকু শব্দ নেই। এই ভয়ঙ্কর নৈঃশব্দ্য এবং আলো–আঁধারিতে আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম নিয়ন্ত্রণ কক্ষের মাঝামাঝি থেকে একজন তরুণী স্থির হয়ে একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি চিৎকার করে উঠতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিলাম, নিশ্চয়ই আমি স্বপ্ন দেখছি। কিন্তু আমি ততক্ষণ পুরোপুরি জেগে উঠেছি, আমি জানি আমি স্বপ্ন দেখছি না। আমার সামনে একটি তরুণী ভাসছে। এক টুকরা নিও পলিমার দিয়ে শরীরকে ঢেকে রেখেছে, নিয়ন্ত্রণ কক্ষের পরিশোধিত বাতাসের প্রবাহে সেই কাপড়টা উড়ছে। আমি স্থির দৃষ্টিতে তরুণীটির দিকে তাকিয়ে রইলাম, এটি ত্রিমাত্রিক হলোগ্রাফিক কোনো প্রতিচ্ছবি নয়—তা হলে আমি দেখতে পেতাম দেয়ালের ভিডি টিউব থেকে আলো বের হয়ে আসছে। এটি সত্যি সত্যি রক্তমাংসের একজন তরুণী।

আমি অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কে?"

আমার কথায় মেয়েটি ভয়ানক চমকে উঠল এবং আমি দেখতে পেলাম তার মুখে অবর্ণনীয় আতঙ্কের ছায়া পড়েছে। মেয়েটি আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করল, "তুমি কে?"

আমি বললাম, "আমার নাম ইবান। আমি এই মহাকাশযানের অধিনায়ক।"

"অধিনায়ক?" মেয়েটা খুব অবাক হয়ে বলল, "অধিনায়ক তুমি?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে তোমাকে বেঁধে রেখেছে কেন?"

আমি অবাক হয়ে নিজের দিকে তাকালাম এবং হঠাৎ করে বুঝতে পারলাম, ঘুমানোর আগে আমি যেন ভেসে কোথাও না চলে যাই সে জন্য ফিতা দিয়ে একটা পা বেঁধে রাখার ব্যাপারটি মেয়েটিকে বিস্মিত করেছে। আমি পা থেকে ফিতাটি খুলে বললাম, "কোথাও যেন ভেসে চলে না যাই সেজন্য বেঁধে রেখেছিলাম।"

"কেন তুমি ভেসে চলে যাবে? আমি শুনেছি মহাকাশযানে অধিনায়কদের খুব সুন্দর ঘর থাকে।"

"তুমি ঠিকই শুনেছ—"

"তা হলে তুমি সেখানে না ঘুমিয়ে এখানে নিজেকে বেঁধে রেখে শূন্যে ঝুলে ঝুলে ঘুমাচ্ছ কেন?"

আমি ঠিক নিজেকে বিশ্বাস করতে পারলাম না যে এরকম বিচিত্র একটা পরিবেশে আমি এ ধরনের আলাপে জড়িয়ে পড়ছি। আমি গলার স্বর যতটুকু সম্ভব শান্ত রাখার চেষ্টা করে বললাম, "দেখ, এসব ব্যাপার নিয়ে আমরা পরেও কথা বলতে পারব। আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। আমার জানা প্রয়োজন তুমি হঠাৎ করে কোথা থেকে হাজির হয়েছ।"

মেয়েটি আমার প্রশ্ন শুনে কেন জানি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে বলল, "তুমি যদি মহাকাশযানের অধিনায়ক হয়ে থাক তা হলে তোমার জানা উচিত আমি কোথা থেকে হাজির হয়েছি।"

আমি বিপন্ন গলায় বললাম, "দেখতেই পাচ্ছ আমি জানি না। সেজন্যই ব্যাপারটি জরুরি—"

"কেন ব্যাপারটি জরুরি?"

"দাঁড়াও বলছি। তার আগে আমি আলো জ্বেলে নিই।"

আমি আলো জ্বালানোর জন্য একটু এগিয়ে যেতেই মেয়েটি চিৎকার করে বলল, "খবরদার, তুমি আমার কাছে আসবে না।"

আমি একটু অপমানিত বোধ করলাম, কিন্তু এই মুহূর্তে মান-অপমান নিয়ে চিন্তা করার সময় নেই। আমি গলার স্বর শান্ত রেখে বললাম, "তোমার ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই, আমি তোমার কাছে আসব না।"

নিয়ন্ত্রণ প্যানেলের সুইচ স্পর্শ করামাত্র নিয়ন্ত্রণ কক্ষটি উজ্জ্বল আলোতে ভেসে গেল এবং মেয়েটি হাত দিয়ে নিজের চোখ আড়াল করে দাঁড়াল। আমি দেখতে পেলাম মেয়েটি কমবয়সী এবং অপূর্ব সুন্দরী। মসৃণ ত্বক, কালো চুল এবং সুগঠিত দেহ। মেয়েটির চেহারায় এক ধরনের নির্দোষ সারল্য রয়েছে যেটি আমি বহুদিন কারো মাঝে দেখি নি। মেয়েটি ভরশূন্য পরিবেশে অভ্যস্ত নয়, প্রতি মুহূর্তে সে ভাবছে সে পড়ে যাবে, কিন্তু ভরশূন্য পরিবেশে কেউ কোথাও পড়ে যেতে পারে না এবং এই বিচিত্র অনুভূতির সাথে সে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। আমি কন্ট্রোল প্যানেলের কাছে দাঁড়িয়ে পুরো প্যানেলটিতে একবার চোখ বুলিয়ে অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছে কি না দেখার চেষ্টা করলাম—কিন্তু সেরকম কিছু চোখে পড়ল না। আমি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কে? কোথা থেকে এসেছ?"

মেয়েটি আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে নিও পলিমারের চাদরটি টেনে নিজের শরীরকে ভালো করে ঢাকার চেষ্টা করে বলল, "আমার শীত করছে।"

"এই পাতলা নিও পলিমারের টুকরো দিয়ে শরীর ঢাকার চেষ্টা করলে শীত করতেই পারে। আমি তোমার গরম কাপড়ের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

মেয়েটি কোনো কথা না বলে আমার দিকে বড় চোখে তাকিয়ে রইল। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কে?"

"আমার নাম মিত্তিকা।"

"মিত্তিকা, তুমি কোথা থেকে এসেছ?"

"আমি জানি না। হঠাৎ করে আমার ঘুম ভেঙে গেল, আমি ঘুম থেকে উঠে ভাসতে ভাসতে এদিকে এসেছি—"

"তার মানে তুমি কার্গো বে'তে রাখা শীতল ক্যাপসুল থেকে উঠে এসেছ?"

"আমি সেটা জানি না। আমি রিশি নক্ষত্রপুঞ্জে যাবার জন্য রেজিস্ট্রি করিয়েছিলাম, কথা ছিল সেখানে পৌঁছার পর আমাকে জাগানো হবে। কিন্তু—"

মেয়েটি অভিযোগের সুরে আরো কিছু কথা বলতে থাকে কিন্তু আমি ভালো করে সেটা শুনতে পেলাম না, হঠাৎ করে এক ধরনের অশুভ আশঙ্কায় আমার ভুরু কুঞ্চিত হয়ে উঠল। আমি চাপা গলায় ডাকলাম, "ফোবি।"

ফোবি একেবারে কানের কাছ থেকে ফিসফিস করে বলল, "বলুন মহামান্য ইবান।"

"এটা কী করে হল? এই মেয়েটি ঘুম থেকে জেগে উঠল কেমন করে?"

"বলতে পারছি না মহামান্য ইবান। আমার দুটি সম্ভাবনার কথা মনে হচ্ছে।"

"কী সম্ভাবনা?"

ফোবি উত্তর দেবার আগেই মিত্তিকা ভয়-পাওয়া গলায় চিৎকার করে উঠল, "তুমি কার সাথে কথা বলছ?"

আমি মিত্তিকাকে ভরসা দেবার ভঙ্গিতে বললাম, "ফোবির সঙ্গে। ফোবি হচ্ছে এই মহাকাশযানের মানুষের সাথে যোগাযোগ করার ইন্টারফেস।"

"সে কোথায়?"

"তুমি তাকে দেখতে পাবে না।"

মিত্তিকা আমার কথা বিশ্বাস করল বলে মনে হল না, কেমন জানি ভয়ার্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি ফোবিকে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কী সম্ভাবনার কথা বলছ?"

"আপনি যখন ফোবিয়ানের দুটি ইঞ্জিন একসাথে বন্ধ করে দিয়েছিলেন তখন প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে কোনো একটি শীতল ক্যাপসুল খুলে গিয়েছে, নিরাপত্তা সার্কিট তখন ভিতরের মানুষটিকে বাঁচিয়ে তুলেছে।"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "না। সেটা খুব সম্ভবযোগ্য মনে হচ্ছে না। দ্বিতীয় সম্ভাবনাটা কী?"

"রিতুন ক্লিসকে যখন আমরা নিজেকে নিজে অপসারণক্ষমতা দিয়েছি তখন নিউরাল নেটওয়ার্কের স্মৃতির একটা বড় অংশ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তার ফল হিসেবে শীতল ক্যাপসুলের মানুষেরা জেগে উঠছে।"

"সর্বনাশ!"

মিত্তিকা একটু এগিয়ে আসার চেষ্টা করে গলার স্বর উঁচু করে বলল, "সর্বনাশ কেন?"

"তোমাকে নিয়ে আমি সর্বনাশ বলছি না।"

"তা হলে কাকে নিয়ে সর্বনাশ বলছ?"

"তোমাদের সাথে ম্যাঙ্গেল ক্বাস নামে একজন ভয়ঙ্কর ডাকাত রয়েছে, তাকে নিয়ে বলছি। এই মানুষটি যদি জেগে উঠে থাকে তা হলে আমাদের খুব বড় বিপদ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফোবি নিচু গলায় আমাকে ডাকল, "মহামান্য ইবান।"

"বল।"

"কিছু একটা নিয়ে একটু সমস্যা আছে। কার্গো বে'তে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সমস্যা হচ্ছে।"

আমি হঠাৎ করে এক ধরনের আতঙ্ক অনুভব করলাম, সত্যিই যদি মিত্তিকার মতো ম্যাঙ্গেল ক্বাসও জেগে উঠে থাকে তা হলে কী হবে? আমি চাপা গলায় ডাকলাম, "ফোবি।"

"বলুন মহামান্য ইবান।"

"আমার একটু কার্গো বে'তে যেতে হবে।"

ফোবি কোনো কথা বলল না।

"কী হয়েছে নিজের চোখে দেখে আসতে হবে।"

এবারেও ফোবি কোনো কথা বলল না।

"ফোবি।"

"বলুন মহামান্য ইবান।"

"আমার মনে হয় খালি হাতে যাওয়া ঠিক হবে না। অস্ত্রাগার থেকে একটা অস্ত্র নিয়ে যাই। কী বল?"

"ঠিক আছে।"

মিত্তিকা চোখ বড় বড় করে আমাদের কথা শুনছিল, এবারে ভয়ার্ত গলায় বলল, "তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

"কার্গো বে'তে। তুমি এখানে একটু অপেক্ষা কর।"

"না, আমার ভয় করে।"

"এখানে ভয়ের কিছু নেই।"

'যদি ভয়ের কিছু না থাকে তা হলে হাতে অস্ত্র নিয়ে যাচ্ছ কেন?"

প্রশ্নটির ভালো কোনো উত্তর ভেবে পেলাম না, মিত্তিকা নিজেই বলল, "আমি তোমার সাথে যাব।"

"তুমি তো ভরশূন্য পরিবেশে অভ্যস্ত নও, ভেসে ভেসে যেতে পারবে না।"

"ভেসে ভেসে যদি যেতে না পারি তা হলে এখানে এসেছি কেমন করে?"

আমি এই প্রশ্নটারও উত্তর দিতে পারলাম না, মাথা নেড়ে বললাম, "ঠিক আছে চল।"

আমি মিত্তিকাকে নিয়ে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে মূল করিডোর ধরে ভেসে ভেসে ফোবিয়ানের মাঝামাঝি সুরক্ষিত ঘরটি থেকে একটা শক্তিশালী অস্ত্র তুলে নিলাম, লেজার রশ্মি দিয়ে লক্ষ্যবস্তুকে আবদ্ধ করে শক্তিশালী বিস্ফোরক ছুড়ে দেবার একটি অতি প্রাচীন কিন্তু কার্যকর অস্ত্র।

অস্ত্রটি উরুর সাথে বেঁধে নিয়ে আবার আমি ভাসতে ভাসতে এগিয়ে যেতে থাকি, ভরশূন্য পরিবেশে ভেসে ভেসে যাওয়া নিয়ে মিত্তিকা যদিও খুব বড় গলায় কথা বলেছে কিন্তু আসলে অভ্যস্ত না থাকায় সহজে এগিয়ে যেতে পারছিল না, আমি তাকে একহাতে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলাম।

কার্গো বে-এর দরজা হাট করে খোলা, ভিতরে আবছা অন্ধকার। আমি আলো জ্বালালাম, ঘরের মাঝামাঝি একটা ক্যাপসুল ওলটপালট খেয়ে ভাসছে। ক্যাপসুলটি হাঁ করে খোলা। আমি চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলাম, "মিত্তিকা, এটা কি তোমার ক্যাপসুল?"

মিত্তিকা মাথা নাড়ল, বলল, "না। আমারটা ওই পাশে।"

আমি উরু থেকে খুলে অস্ত্রটা হাতে নিয়ে একটা ঝটকা দিয়ে ক্যাপসুলের দিকে এগিয়ে গেলাম। ক্যাপসুলের দরজা খোলা, ভিতরে কেউ নেই। ক্যাপসুলের পাশে ম্যাঙ্গেল ক্বাসের নাম লেখা—এটাতে তাকে আটকে রাখা ছিল।

ভয়ের একটা শীতল স্রোত আমার মেরুদণ্ড দিয়ে বয়ে গেল, ম্যাঙ্গেল ক্বাস ক্যাপসুল থেকে বের হয়ে এসেছে।

এই মহাকাশযানের কোথাও সে আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

৪

আমি মিত্তিকাকে নিয়ে মহাকাশযানের নির্জন করিডোর ধরে ফিরে আসছিলাম, ম্যাঙ্গেল ক্বাস এই মহাকাশযানের কোথাও লুকিয়ে আছে, হঠাৎ করে ভয়ঙ্কর চিৎকার করে অস্ত্র হাতে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এই ধরনের একটা আশঙ্কায় আমার বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ড ধক্‌ধক্ করে শব্দ করতে থাকে। করিডোরের মাঝামাঝি এসে আমি চাপা গলায় ফোবিকে ডাকলাম, "ফোবি।"

ফোবি আমার কানের কাছে থেকে উত্তর দিল, "বলুন মহামান্য ইবান।"

"ম্যাঙ্গেল ক্বাস শীতল ক্যাপসুল থেকে বের হয়ে গেছে।"

"আমি জানি।"

"তুমি কেমন করে জান? কার্গো বে'তে তো নিউরাল নেটওয়ার্কের যোগাযোগ নেই।"

"ম্যাঙ্গেল ক্বাস নিয়ন্ত্রণ কক্ষে বসে আছে।"

আমি চাপা গলায় চিৎকার করে বললাম, "কী বললে?"

"বলেছি ম্যাঙ্গেল ক্বাস নিয়ন্ত্রণ কক্ষে বসে আছে।"

আমার নিজের কানকে বিশ্বাস হল না, অবিশ্বাসের গলায় বললাম, "কী বললে, নিয়ন্ত্রণ কক্ষে বসে আছে?"

"ঠিক করে বললে বলতে হয় ভেসে আছে।"

"কেন?"

"মনে হয় তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।"

"আমার জন্য? আমার জন্য কেন?"

"যতদূর মনে হয় মহাকাশযানের নিয়ন্ত্রণটি নিতে চায়।"

"ওর কাছে কি কোনো অস্ত্র আছে?"

"নেই।"

"একেবারে খালি হাতে আমার জন্য অপেক্ষা করছে?"

"হ্যাঁ। মানুষটি খুব আত্মবিশ্বাসী।"

"তুমি কীভাবে জান?"

ফোবি একটু ইতস্তত করে বলল, "মানুষের চরিত্রের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য আমাদের বিশেষ করে প্রস্তুত করা হয়।"

"ও।"

আমি মিত্তিকার দিকে তাকালাম, সে পুরো ব্যাপারটি এখনো বুঝতে পারছে না,

AMARBOI.COM

খানিকটা বিস্ময় এবং অনেকখানি আতঙ্ক নিয়ে সে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। শুকনো মুখে বলল, "এখন কী হবে?"

প্রশ্নটি অত্যন্ত সহজ এবং সরল কিন্তু এর উত্তরটি সহজ কিংবা সরল নয়। আমার হঠাৎ করে মনে হতে থাকে যে, এই প্রশ্নটির উত্তর কারোই জানা নেই। কিন্তু মিত্তিকাকে আমি সে কথা বলতে পারি না। মহাকাশযানের অধিনায়ক হিসেবে এ রকম পরিবেশে যে ধরনের উত্তর দেবার কথা আমি সেরকম একটি দিলাম। বললাম, "পুরো ব্যাপারটি বিশ্লেষণ না করে এখন কিছু বলা যাচ্ছে না।"

মিত্তিকা ফ্যাকাসে মুখে আমার দিকে তাকিয়ে শুকনো গলায় বলল, "তার মানে ম্যাঙ্গেল ক্বাস আমাদের সবাইকে মেরে ফেলবে?"

"মানুষকে মেরে ফেলা এত সহজ ব্যাপার নয়।"

"কিন্তু তুমি তো মানুষকে মেরে ফেলার জন্য একটা অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ।"

আমি এই কথার কী উত্তর দেব বুঝতে পারলাম না—উত্তর দেওয়ার সময় হল না, কারণ ততক্ষণে আমরা নিয়ন্ত্রণ কক্ষে পৌঁছে গেছি। নিয়ন্ত্রণ প্যানেলের সামনে একজন মানুষ আমার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে—মানুষটি নিশ্চয়ই ম্যাঙ্গেল ক্বাস।

প্রথমেই আমার যে কথাটি মনে হল সেটি হচ্ছে ইচ্ছে করলেই আমি তাকে এখনই গুলি করে মেরে ফেলতে পারি। এই ধরনের একটা কথা আমার মাথায় এসেছে বলে পরমুহূর্তে হঠাৎ করে আমার নিজের ওপর এক ধরনের ঘৃণাবোধের জন্ম হল। আমি কিছু বলার আগেই ম্যাঙ্গেল ক্বাস ধীরে ধীরে ঘুরে আমার দিকে তাকাল, শব্দশূন্য পরিবেশে তার সহজে ঘোরার ভঙ্গি দেখে আমি বুঝতে পারলাম সে তার জীবনের দীর্ঘ সময় মহাকাশযানে কাটিয়েছে।

ম্যাঙ্গেল ক্বাস মানুষটি সুদর্শন বলে শুনেছিলাম এবং আমি দেখতে পেলাম কথাটি সত্য। তার মাথায় কালো চুল, খাড়া নাক এবং গভীর নীল চোখ। গায়ের রং তামাটে এবং মুখে এক ধরনের চাপা হাসি। আমি আরেকটু এগিয়ে গেলাম এবং হঠাৎ করে আবিষ্কার করলাম মানুষটি সুদর্শন হলেও সেখানে এক ধরনের বিচিত্র কদর্যতা লুকিয়ে আছে। সেই কদর্যতাটি কোথায়—তার চোখের দৃষ্টিতে নাকি মুখের চাপা হাসিতে আমি ঠিক ধরতে পারলাম না। মানুষটি আমার চোখের দিকে তাকাল এবং তার মুখের হাসিটি আরো বিস্তৃত করে বলল, "তোমাকে আমি একটি সুযোগ দিয়েছিলাম, তুমি সেই সুযোগ গ্রহণ করলে না।"

ম্যাঙ্গেল ক্বাসের কথা বলার ভঙ্গিটি অত্যন্ত বিচিত্র। মনে হয় প্রত্যেকটা শব্দ আলাদা আলাদাভাবে উচ্চারণ করে এবং কথাটি শেষ হবার পরও মনে হয় তার কথা এখনো শেষ হয় নি।

কোনো একটি বিচিত্র কারণে ম্যাঙ্গেল ক্বাস কী বলছে আমি সেটা বুঝতে পারলাম এবং সেজন্য আমার নিজের ওপর আবার একটু ঘৃণাবোধের জন্ম হল। ম্যাঙ্গেল ক্বাসের মুখের ভঙ্গি খুব ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হল, সে মুখের হাসি সরিয়ে সেখানে এক ধরনের অনুকম্পার ভাব ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোমার হাতে অস্ত্র ছিল, তুমি কেন আমাকে হত্যা করলে না?"

"যদি তোমাকে হত্যা করার প্রয়োজন হত, আমি তা হলে নিশ্চয়ই তোমাকে হত্যা করতাম ম্যাঙ্গেল ক্বাস।"

ম্যাঙ্গেল ক্বাস মাথা নেড়ে আবার আলাদা আলাদাভাবে একটি একটি শব্দ উচ্চারণ করে বলল, "আমি কিন্তু প্রয়োজন ছাড়াই হত্যা করতে পারি।"

আমি তার কথাটি না শোনার ভান করে একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম, "তুমি কী চাও?"

"আপাতত এই মহাকাশযানটির কর্তৃত্ব চাই। এটিকে আমার নিজের এলাকায় নিতে চাই।"

"আমি দুঃখিত ম্যাঙ্গেল ক্লাস সেটি সম্ভব নয়। আমি এই মহাকাশযানের অধিনায়ক—"

আমার কথা শেষ হবার আগেই ম্যাঙ্গেল ক্লাস তার ডান হাত উপরে তুলে আমার মাথার উপরে অঙ্গুলি নির্দেশ করল, এবং হঠাৎ করে আমি ভয়ঙ্কর আতঙ্কে শিউরে উঠলাম, আমি বুঝতে পারলাম, ম্যাঙ্গেল ক্লাস একজন হাইব্রিড[২৪], একই সাথে যন্ত্র এবং মানুষ। তার শরীরের ভিতরে অস্ত্র, সেই অস্ত্র ব্যবহার করে সে তার আঙুলের ভিতর দিয়ে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরক ছুড়ে দিতে পারে। আমি হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম এবং হঠাৎ বিদ্যুৎঝলকের মতো তার আঙুল থেকে বিস্ফোরক ছুটে এল। আমি মিত্তিকাকে নিয়ে নিয়ন্ত্রণ কক্ষের নিচে ঝাঁপিয়ে পড়লাম, মাথার উপর দিয়ে বিস্ফোরক ছুটে গেল এবং প্রচণ্ড বিস্ফোরণে নিয়ন্ত্রণ কক্ষের দেয়াল চূর্ণ হয়ে গেল।

ম্যাঙ্গেল ক্লাস তার হাত নামিয়ে আনে, আমি দেখতে পেলাম তার আঙুলের ডগা থেকে রক্ত চুইয়ে পড়ছে, শরীরের ভিতরে বিস্ফোরক লুকানো থাকে, চামড়া ভেদ করে সেটি বের হয়ে এসেছে। ভরশূন্য পরিবেশে আমি কয়েকবার লুটোপুটি খেয়ে নিজেকে সামলে নিলাম, ম্যাঙ্গেল ক্লাস নিয়ন্ত্রণ প্যানেল থেকে সাবলীল ভঙ্গিতে একটি লাফ দিয়ে একেবারে আমার সামনে এসে হাজির হল—আমি ততক্ষণে উরু থেকে আমার অস্ত্রটি বের করে এনেছি। ম্যাঙ্গেল ক্লাসের দিকে সেটি তাক করে বললাম, "তুমি দুই হাত উপরে তুলে দাঁড়াও ম্যাঙ্গেল ক্লাস।"

ম্যাঙ্গেল ক্লাস এমনভাবে হেসে উঠল যেন আমি অত্যন্ত মজার একটা কথা বলেছি। আমি কঠোর মুখে বললাম, "আমি এই মহাকাশযানের অধিনায়ক। আমি তোমাকে আদেশ দিচ্ছি তুমি দুই হাত উপরে তুলে দাঁড়াও—"

ম্যাঙ্গেল ক্লাসের মুখে একটা বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল এবং সে হাত উপরে না তুলে খুব ধীরে ধীরে আমার দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করে। আমি স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটি তাক করে চিৎকার করে বললাম, "খবরদার—"

ম্যাঙ্গেল ক্লাস ভ্রূক্ষেপ করল না। ধীরে ধীরে তার হাত আমার দিকে তুলে ধরতে শুরু করল এবং আমি তখন মরিয়া হয়ে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটির ট্রিগার টেনে ধরলাম। ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের শব্দে কানে তালা লেগে গেল এবং ম্যাঙ্গেল ক্লাস নিয়ন্ত্রণ কক্ষের দেয়ালে গিয়ে ছিটকে পড়ল। আমি তখনো থরথর করে কাঁপছি, জীবনে কখনো কোনো মানুষকে নিজ হাতে খুন করতে হবে ভাবি নি। আমি গভীর বিতৃষ্ণা নিয়ে আবিষ্কার করলাম ব্যাপারটি এমন কিছু কঠিন নয়। মিত্তিকা আমার হাত ধরে বলল, "ইবান।"

"কী হল?"

"ঐ দেখ—"

আমি মাথা ঘুরিয়ে দেখলাম, ম্যাঙ্গেল ক্লাস আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার শরীরে আঘাতের কোনো চিহ্ন নেই। সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল, তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে নিজের গালের চামড়াকে ধরে টেনে লম্বা করে ফেলতে থাকে, আমি সবিস্ময়ে দেখলাম গলিত পলিমারের মতো সেটা উপরে উঠে আসছে, বেশ খানিকটা উপরে তুলে এনে ছেড়ে দিতেই সেটা শব্দ করে আবার রবারের মতো নিচে নেমে এল। মিত্তিকা শিউরে উঠে আমাকে জাপটে ধরে ফিসফিস করে বলল, "দানব, নিশ্চয়ই দানব।"

ম্যাঙ্গেল ক্লাস মাথা নাড়ল, বলল, "না। দানব না। হাইব্রিড। আধা যন্ত্র আধা মানুষ। আমার চামড়ার ওপর সূক্ষ্ম বায়োমারের[২৫] আস্তরণ রয়েছে। সেটাকে ভেদ করে যাবার মতো কোনো বিস্ফোরক নেই। আমাকে হত্যা করার মতো কোনো অস্ত্র তৈরি হয় নি মেয়ে।"

AMARBOI.COM

আমি হতচকিতের মতো তাকিয়ে রইলাম, ম্যাঙ্গেল ক্বাসের চোখ দুটি হঠাৎ হিংস্র পশুর মতো জ্বলে ওঠে, সে আমার কাছে এগিয়ে এসে আঙুল নির্দেশ করে বলল, "কিন্তু তোমার মতো মানুষকে সহস্রবার ছিন্নভিন্ন করে দেবার মতো অস্ত্র আমার দেহে আছে।"

আমি নিশ্বাস বন্ধ করে রইলাম, ম্যাঙ্গেল ক্বাস আমার দিকে আরো এক পা এগিয়ে এল, তারপর ফিসফিস করে বলল, "কিন্তু আমি এই মুহূর্তে তোমাকে ছিন্নভিন্ন করে দেব না। কারণ তোমাকে আমার প্রয়োজন।"

আমি স্থির চোখে ম্যাঙ্গেল ক্বাসের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ম্যাঙ্গেল ক্বাস আলাদা আলাদাভাবে প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করে বলল, "আমি কি তোমার নিকট থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পেতে পারি?"

আমি কোনো উত্তর দিলাম না, ম্যাঙ্গেল ক্বাসের মুখে আবার হাসি ফুটে উঠল, বলল, "নিশ্চয়ই পেতে পারি। এই মেয়েটিকে আমি সেজন্য শীতল ঘর থেকে বের করে এনেছি। তুমি নিশ্চয়ই এ রকম কমবয়সী একটি মেয়ের শরীরকে ছিন্নভিন্ন হতে দেখতে চাও না।"

আমি চুপ করে রইলাম। ম্যাঙ্গেল ক্বাস চাপা গলায় বলল, "চাও ইবান?"

মিত্তিকা আমাকে ধরে আর্তচিৎকার করে থরথর করে কেঁপে উঠল। আমি মাথা নাড়লাম, "না চাই না।"

"চমৎকার।"

ম্যাঙ্গেল ক্বাস এবারে শূন্যে ভেসে আবার নিয়ন্ত্রণ প্যানেলের কাছে ফিরে গেল, সেখানে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমরা বিশ্রাম নিতে যাও। আমার যখন প্রয়োজন হবে আমি তোমাদের ডাকব।"

আমি মিত্তিকাকে ধরে ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছিলাম, ম্যাঙ্গেল ক্বাস আবার ডাকল, "ইবান।"

"বল।"

"তোমার স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটি রেখে যাও। বুঝতেই পারছ এটি তোমার জন্য একটি জঞ্জাল ছাড়া আর কিছু নয়।"

আমি হাতের অস্ত্রটি ম্যাঙ্গেল ক্বাসের দিকে ছুড়ে দিলাম, সে হাত দিয়ে সেটিকে সরিয়ে দিয়ে নিয়ন্ত্রণ প্যানেলের ওপর ঝুঁকে পড়ল, অস্ত্রটি সত্যি সত্যি অপ্রয়োজনীয় জঞ্জালের মতো ঘরে পাক খেয়ে ভেসে বেড়াতে থাকে।

AMARBOI.COM

প্রায় হিস্টিরিয়াগ্রস্ত মিত্তিকাকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে একটা বিশ্রামঘরে শুইয়ে আমি নিজের ঘরে ফিরে এসেছি। অধিনায়কের জন্য আলাদা করে রাখা আমার এই ঘরটিতে আমি খুব একটা আসি নি। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে আমি চমকে উঠলাম, আমার বিছানার পাশের আরামদায়ক চেয়ারে কেউ একজন বসে আছে। আমাকে দেখে মানুষটি ঘুরে তাকাল এবং আমি তাকে চিনতে পারলাম, মানুষটি রিতুন ক্লিস, সত্যিকারের মানুষ নন, তার হলোগ্রাফিক প্রতিচ্ছবি।

আমি অবাক হয়ে বললাম, "মহামান্য রিতুন ক্লিস, আপনি?"

"হ্যাঁ আমি।"

"আমি ভেবেছিলাম আপনি এই নিউরাল নেটওয়ার্ক থেকে মুক্তি নিয়ে আমাদের এখান থেকে চলে গেছেন।"

"হ্যাঁ, আমি মুক্তি চেয়েছিলাম, কিন্তু যে কারণে তুমি আমাকে হত্যা করতে পার নি, ঠিক সেই কারণে আমিও নিজেকে হত্যা করতে পারি নি। তা ছাড়া—"

"তা ছাড়া?"

"তা ছাড়া ম্যাঙ্গেল ক্বাসের কাজ দেখে হঠাৎ আমার একটু কৌতূহল হল, ইচ্ছে হল সে কী করে দেখি।"

"দেখেছেন?"

"হ্যাঁ দেখেছি। গত দুই শ বছরে প্রযুক্তির অনেক উন্নতি হয়েছে। আমাদের সময় হাইব্রিড ছিল না। অত্যন্ত বিচিত্র একটি প্রক্রিয়া। অত্যন্ত বিচিত্র একটি ধারণা।"

আমি একটি নিশ্বাস ফেললাম। রিতুন ক্লিস আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমাকে খুব বিচলিত মনে হচ্ছে ইবান।"

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, "এটি কি বিচলিত হওয়ার মতো ব্যাপার নয়? আমি একটি মহাকাশযানের অধিনায়ক। সেই মহাকাশযানের শীতল ক্যাপসুল থেকে একটি দস্যু বের হয়ে পুরো মহাকাশযানটি দখল করে ফেলল। আমাকে এখন তার কথা শুনতে হবে, তা না হলে সে মানুষ খুন করে ফেলবে।"

রিতুন ক্লিস শব্দ করে হাসলেন, বললেন, "জীবনকে এত গুরুত্ব দিয়ে নিতে হয় না। একটি দস্যুর যা করার কথা সে তাই করেছে। তুমি একটি মহাকাশযানের অধিনায়ক, তোমার যা করার কথা তুমি তাই কর।"

"আমি কী করব?"

"আমি সেটা কেমন করে বলি? তবে তুমি কী কর আমি সেটাও দেখার জন্য খুব কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করছি।"

"মহামান্য রিতুন, আপনি সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান মানুষ। আমি খুব সাধারণ একজন মানুষ, শুধুমাত্র পরিশ্রম করে আমি এ পর্যন্ত এসেছি। আমি বড় বিপদ দেখি নি, কীভাবে সেটার মুখোমুখি হতে হয় জানি না।"

"সেটা কেউই জানে না ইবান। জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে সেটা শিখতে হয়।"

"আমি আপনার কাছে সাহায্য চাই মহামান্য রিতুন।"

মহামান্য রিতুন একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "তোমাদের এই পুরো ব্যাপারটি আমার কাছে একটি পরাবাস্তব নাটিকার মতো—আমি এর একজন দর্শক। এর ভালো-মন্দে আমার কিছু আসে-যায় না। আমি এতে অংশ নিতে পারব না ইবান। আমি শুধু দেখে যাব।"

"আপনি বলতে চাইছেন ম্যাঙ্গেল ক্বাস যদি এক জন এক জন করে মানুষ খুন করতে থাকে আপনি এতটুকু বিচলিত হবেন না?"

"আমি বলতে পারছি না ইবান। আমি হয়তো বিচলিত হব, অভিনয় জেনেও মানুষ অভিনেতার ভালো অভিনয় দেখে অভিভূত হয়।"

আমি দুই হাতে নিজের চুল ধরে টানতে থাকি, তারপর কাতর গলায় বলি, "মহামান্য রিতুন, আপনি একবার বলুন, আমি কী করব।"

মহামান্য রিতুন দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বললেন, "জীবনকে সহজভাবে নাও ইবান। খুব সহজভাবে নাও।"

"তার অর্থ কী?"

"আমি বলে দিলে তুমি বুঝবে না। তোমার নিজেকে সেটা বুঝতে হবে।"

AMARBOI.COM

"আমি খুব সাধারণ মানুষ। আমি কী বুঝব?"

"এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কেউ সাধারণ নয়। সবাই অসাধারণ, সেটা শুধু তাকে জানতে হয়। কেউ তার জীবনে সেটা জানে, কেউ জানে না।"

ম্যাঙ্গেল ক্বাস আমাকে বিশ্রাম নিতে বলেছে কিন্তু আমি জানি আমি বিশ্রাম নিতে পারব না। আমি আমার ঘরে নিদ্রাহীন হয়ে শুয়ে রইলাম, রিতুন ক্লিস আমাকে পুরো ব্যাপারটি সহজভাবে নিতে বলেছেন কিন্তু আমি এটা সহজভাবে নিতে পারছি না। আমাকে পঞ্চম মাত্রার একটা মহাকাশযানের অধিনায়ক করে পাঠানো হয়েছে কিন্তু ম্যাঙ্গেল ক্বাসের মতো একজন হাইব্রিড দস্যু সেই মহাকাশযানটির কর্তৃত্ব নিয়ে নিয়েছে—এটি কি সহজভাবে নেওয়া সম্ভব? আমি লি–হানের কাছে এটা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলাম, আমার সেই সন্দেহটাই তো সত্যি প্রমাণিত হল। আমি যদি পুরো ব্যাপারটি সহজভাবে নিতে চাই তা হলে ধরে নিতে হবে কোনো কিছুতেই আর কিছু আসে–যায় না। ফোবিয়ান থাকুক বা না–থাকুক, আমি থাকি বা না–থাকি, ম্যাঙ্গেল ক্বাস থাকুক বা না–থাকুক কিছুতেই আর কিছু আসে-যায় না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের লক্ষ কোটি নক্ষত্রের অসংখ্য প্রাণিজগতের তুলনায় মানুষ ক্ষুদ্র একটি প্রাণী, তাদের কয়েকজনের ভাগ্যে কী ঘটেছে সেটি এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নয়। আমার বেঁচে থাকা না–থাকাও এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। আমি মোটামুটি একটা জীবন উপভোগ করেছি সেই জীবনকে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করতে হবে এমন কোনো কথা নেই—কাজেই আমার যা ইচ্ছে আমি তাই করতে পারি।

হঠাৎ করে আমি নিজের ভিতরে নতুন এক ধরনের শক্তি অনুভব করতে থাকি, মনে হতে থাকে সত্যিই জীবনকে সহজভাবে নিতে হবে—এর জটিলতা আমাকে যেন স্পর্শ করতে না পারে।

আমি শুয়ে থেকে থেকে নিজের অজান্তেই এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

AMARBOI.COM

আমাকে ম্যাঙ্গেল ক্বাস ঘুম থেকে ডেকে তুলল, আমি চোখ খুলে তাকাতেই সে বলল, "ইবান, তুমি আমার সাথে নিয়ন্ত্রণ কক্ষে চল।"

আমি হাত দিয়ে চোখ মুছে বললাম, "কেন?"

"আমি মহাকাশযান ফোবিয়ানের গতিপথ পালটাতে চাই।"

আমি ভিতরে ভিতরে চমকে উঠলেও বাইরে সেটা প্রকাশ করলাম না। শান্ত গলায় বললাম, "কেন?"

ম্যাঙ্গেল ক্বাস আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি চাই, সেটাই কি যথেষ্ট নয়?"

"সম্ভবত। কিন্তু আমি কারণটা জানতে চাই।"

"কেন?"

"কারণটা পছন্দ না হলে আমি রাজি না-ও হতে পারি।"

ম্যাঙ্গেল ক্বাস অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল, মনে হল সে বিশ্বাস করতে পারছে না আমি কথাটা বলেছি। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে শীতল গলায় বলল, "তুমি সত্যি রাজি না হওয়ার সাহস রাখ?"

আমি সহৃদয় ভঙ্গিতে হাসার চেষ্টা করে বললাম, "আসলে রাখি না, আমি মহাকাশযানের অধিনায়ক, সাহস দেখানো আমার দায়িত্বের মাঝে পড়ে না। তবে তুমি যদি

আমাকে বল মহাকাশযানের গতিপথ পালটে দিয়ে কাছাকাছি ব্ল্যাকহোলে ঝাঁপ দিতে চাও—তা হলে আমি রাজি না–ও হতে পারি! তাতে আমি হয়তো তোমার হাতে এই মুহূর্তে মারা পড়ব, দুদিন পরে ব্ল্যাকহোলের ভয়ঙ্কর মহাকর্ষ বলে শরীরের নিচের অংশ উপরের অংশ থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া থেকে সেটা এমন কিছু খারাপ নয়।"

ম্যাঙ্গেল ক্বাস বলল, "না, আমি ব্ল্যাকহোলে ঝাঁপ দেব না।"

"তা হলে কী করবে?"

"আমার একটি সুগঠিত দল রয়েছে, তাদের সাথে আমার যোগাযোগ হয়েছে, আমি তাদের তুলে নিতে চাই।" আমি ভিতরে ভিতরে ভয়ানকভাবে চমকে উঠলেও বাইরে সেটা প্রকাশ করলাম না, শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলাম, "তারাও কি তোমার মতো হাইব্রিড মানুষ?"

"না। হাইব্রিড মানুষ হওয়ার ক্ষমতা খুব বেশি মানুষের নেই।"

"ও।"

"চল তা হলে।" ম্যাঙ্গেল ক্বাস একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, "নাকি তুমি রাজি নও?"

আমি একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম, "আমি অবশ্যই চাইব না তুমি তোমার সুগঠিত দলকে এখানে তুলে আন, কিন্তু এই মুহূর্তে আমার কিছু করার নেই। সম্ভবত ভবিষ্যতে তোমাকে এবং তোমার পুরো দলকেই ধ্বংস করার এটি একটি সুযোগ।"

ম্যাঙ্গেল ক্বাস চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুমি সত্যিই বিশ্বাস কর যে একদিন তুমি আমাকে এবং আমার দলকে ধ্বংস করবে?"

"হ্যাঁ। আমি সেটা খুব সহজেই করতে পারি। আমি এই মহাকাশযানের অধিনায়ক। পঞ্চম মাত্রার মহাকাশযান অধিনায়ক ছাড়া আর কারো নির্দেশে চালানো যায় না। তার অর্থ জান?"

ম্যাঙ্গেল ক্বাস মাথা নাড়ল, সে জানে।

আমি হাসার ভঙ্গি করে বললাম, "আমি ইচ্ছে করলেই তোমাদের সবাইকে নিয়ে এই মহাকাশযানটি ধ্বংস করে দিতে পারি। তোমাকে এবং তোমার সুগঠিত দলকে ধ্বংস করা কঠিন কোনো ব্যাপার নয়। তবে আমি সেটা করতে চাই যখন আমি এর ভিতরে নেই তখন।"

কথাটি খুব উঁচু স্তরের রসিকতা হয়েছে এ রকম ভান করে আমি উচ্চৈঃস্বরে হাসতে শুরু করি। ম্যাঙ্গেল ক্বাস কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে নিচু গলায় বলল, "গত রাতে যখন তোমার সাথে দেখা হয়েছিল তখন তুমি বিশেষ বিচলিত ছিলে, আজ ভোরে তোমাকে খুব আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে।"

"এখানে রাত এবং ভোর বলে কিছু নেই ম্যাঙ্গেল ক্বাস। কারো জন্য পুরোটাই রাত, কারো জন্য পুরোটাই দিন।"

"তুমি কী বললে?"

"বিশেষ কিছু বলি নি—আর আত্মবিশ্বাসের কথাটা সত্যি। আমি ঠিক করেছি জীবনটা খুব সহজভাবে নেব। সিদ্ধান্তটা নেবার পর হঠাৎ করে আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে।"

"সহজভাবে?"

"হ্যাঁ। যার অর্থ বেঁচে থাকতেই হবে এ রকম কোনো গোঁ আমার মাঝে আর নেই। তার অর্থ বুঝতে পারছ?"

ম্যাঙ্গেল ক্বাস কঠিন মুখে বলল, "তুমি কোনটা বোঝাতে চাইছ সেটা হয়তো বুঝতে পারি নি।"

"আমারও তাই ধারণা। আমি বোঝাতে চাইছি যে আমার থেকে সাবধান। যে মারা

যেতে প্রস্তুত তার থেকে ভয়ঙ্কর আর কিছু নেই।" আমি সুর পালটে বললাম, "যা–ই হোক, ওসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কাজ নেই, তার থেকে চল দিনটি শুরু করার আগে ভালো কিছু খাওয়া যাক। আমার কাছে চমৎকার কিছু পানীয় আছে।"

ম্যাঙ্গেল ক্বাস সরু চোখে আমার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ কী একটা ভাবল, তারপর বলল, "চল।"

"তুমি যে রকম আমার অতিথি, মিত্তিকাও আমার অতিথি। তাকে ডেকে আনলে তোমার কোনো আপত্তি নেই তো?"

"না নেই।"

"চমৎকার।"

মহাকাশযানের অধিনায়কের বিশেষ খাবার এবং বিশেষ পানীয় থাকা সত্ত্বেও আমাদের খাবারের অনুষ্ঠানটি মোটেও আনন্দদায়ক হল না। মিত্তিকা চমৎকার একটি পোশাক পরে এলেও ম্যাঙ্গেল ক্বাসের সামনে বসে সে প্রায় কিছুই খেতে পারল না। ভরশূন্য পরিবেশে খাবার বিশেষ পদ্ধতির সাথেও সে পরিচিত নয়—ব্যাপারটি তার জন্য বেশ কঠিন।

আমরা নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করলাম, ম্যাঙ্গেল ক্বাস হাইব্রিড মানুষ হলেও তাকে খেতে হয়, তাকে নিশ্বাস নিতে হয়—আমি এই ব্যাপারটি নিশ্চিত হতে চাইছিলাম। খাওয়ার পর আমি এবং ম্যাঙ্গেল ক্বাস নিয়ন্ত্রণ প্যানেলের ওপর ঝুঁকে পড়লাম—সে ঠিক কোথায় যেতে চাইছে সেটি আমার জানা প্রয়োজন। হোয়াইট ডোয়ার্ফ[২৬] জাতীয় একটা নক্ষত্রের কাছাকাছি কিছু বড় গ্রহ রয়েছে তার একটি উপগ্রহের সাথে সে যোগাযোগ করছে বলে দাবি করল। আমি অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললাম, "অসম্ভব। যে কোনো মানুষ ঐ গ্রহ উপগ্রহ থেকে দূরে থাকবে। ঐগুলো হচ্ছে অনাবিষ্কৃত অঞ্চল। গ্যালাক্টিক তথ্যকেন্দ্রে সুনির্দিষ্ট তথ্য রয়েছে যে এই অঞ্চলে বুদ্ধিমান প্রাণের বিকাশ হয়েছে।"

ম্যাঙ্গেল ক্বাস তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলল, "আমার কোনো বুদ্ধিমান প্রাণীর প্রয়োজন নেই, আমার প্রয়োজন আমার দলের সকল মানুষকে। তারা যথেষ্ট বুদ্ধিমান।"

"বুদ্ধি ব্যাপারটি কী সেটা নিয়ে বিতর্ক করা যেতে পারে, আমি সেই বিতর্কে যেতে চাচ্ছি না, আমি মেনে নিচ্ছি তোমার দলের মানুষেরা যথেষ্ট বুদ্ধিমান। কিন্তু এই অঞ্চলের মহাজাগতিক প্রাণী তোমার দলের মানুষ থেকেও বেশি বুদ্ধিমান হতে পারে। সেখানে উপস্থিত হওয়া নিরাপদ না–ও হতে পারে।"

ম্যাঙ্গেল ক্বাস আমার দিকে শীতল চোখে তাকিয়ে বলল, "নিরাপত্তার ব্যাপারটি আমি তোমার কাছ থেকে শিখতে চাইছি না ইবান।"

আমি সাথে সাথে হাত তুলে বললাম, "ঠিক আছে, আমি সে ব্যাপারে কোনো কথা বলছি না।"

"চমৎকার। তুমি তা হলে মহাকাশযানের গতিপথ পরিবর্তন কর। আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টার মাঝে আমরা ঐ এলাকায় পৌঁছে যেতে চাই।"

"ফোবিয়ানের জ্বালানি নিয়ে একটা সমস্যা হতে পারে—"

"সেটি আমার সমস্যা নয়।"

"বেশ।"

আমি একটা নিশ্বাস ফেলে কাজ শুরু করে দিলাম। ফোবিয়ানের মূল তথ্যকেন্দ্রে কিছু গোপন সংখ্যা প্রবেশ করিয়ে তার গতিপথ পালটে দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কোডে নির্দেশ দিতে শুরু করলাম। কিছুক্ষণের মাঝেই ফোবিয়ানের শক্তিশালী ইঞ্জিন গর্জন করে উঠল।

৫

ম্যাঙ্গেল কাস তার দলবলকে সংগ্রহ করার জন্য যে গ্রহটিকে ঘিরে ফোবিয়ানের কক্ষপথ নির্দিষ্ট করল, সেই গ্রহটিকে আমার খুব অপছন্দ হল। এই কুৎসিত বিশাল গ্রহটির যে উপগ্রহ থেকে সে তার সঙ্গীসাথীর সঙ্কেত পেয়েছে বলে দাবি করল সেই উপগ্রহটিকে আমার অপছন্দ হল আরো বেশি। একটি নির্দিষ্ট গ্রহ বা উপগ্রহ সম্পর্কে ব্যক্তিগত ভালো লাগা না-লাগার কোনো গুরুত্ব নেই, কিন্তু শুরু থেকেই এই গ্রহ এবং উপগ্রহ সম্পর্কে আমার ভিতরে এক ধরনের অশুভ অনুভূতির জন্ম হয়ে গেল। আমি ব্যাপারটি গোপন করার কোনো চেষ্টা না করে ম্যাঙ্গেল কাসকে বললাম, "তুমি তোমার দলের লোকজনের অবস্থান ঠিক করে কো-অর্ডিনেট জানিয়ে দাও, আমি স্কাউটশিপ পাঠিয়ে তাদেরকে আনার ব্যবস্থা করে দিই।"

ম্যাঙ্গেল কাস সরু চোখে আমার দিকে তাকাল, বলল, "তুমি নিশ্চয়ই আমাকে নির্বোধ বিবেচনা কর নি।"

আমি মাথা নাড়লাম এবং বললাম, "না করি না। কিন্তু এই উপগ্রহটিকে আমার খুব অপছন্দ হয়েছে, গ্যালাক্টিক তালিকায় এর কোনো নাম নেই, বিদ্‌ঘুটে সংখ্যা দিয়ে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এটি অস্থিতিশীল এবং বিস্ফোরণোন্মুখ। আমি এখানে যেতে চাই না।"

"তুমি যেতে চাও কি না-চাও সেটি বিবেচনার মাঝে আনার প্রয়োজন নেই। আমি চাই কি না-চাই সেটাই গুরুত্বপূর্ণ।"

"তুমি কী চাও?"

"আমার নিরাপত্তার খাতিরে আমি কখনোই তোমাকে আলাদা হতে দেব না। কাজেই আমরা যে স্কাউটশিপ নিয়ে এই উপগ্রহে নামব সেখানে তুমি থাকবে। মিত্তিকা নামের সেই মেয়েটিও থাকবে।"

আমি একটা নিশ্বাস ফেললাম, আমি যদি একজন দস্যু হতাম আমিও ঠিক এ ধরনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করে কোথাও এক পা অগ্রসর হতাম না।

ম্যাঙ্গেল কাস নিয়ন্ত্রণ প্যানেলে তার দলের লোকজনের সাথে যোগাযোগ নিশ্চিত করতে করতে আমাকে বলল, "তুমি স্কাউটশিপটা প্রস্তুত কর, আমরা কিছুক্ষণের মাঝেই রওনা দিতে চাই।"

স্কাউটশিপে যাবার আগে আমি মিত্তিকাকে ডেকে পাঠালাম, সে এক ধরনের ভয়ার্ত চোখে হাজির হল, ফ্যাকাসে মুখে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে ইবান?"

"ম্যাঙ্গেল কাস কিছুক্ষণের মাঝে এই উপগ্রহটাতে নামছে।"

মিত্তিকা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল, এই তথ্যটি তাকে জানানোর কারণটি সে বুঝতে পারছে না। আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, "সে এই উপগ্রহটাতে একা যাবে না, তোমাকে আর আমাকে নিয়ে যাবে।"

কথাটি শুনে মিত্তিকা যেরকম ভয় পেয়ে যাবে বলে ভেবেছিলাম দেখা গেল সে সেরকম ভয় পেল না, বরং তার মাঝে বিচিত্র এক ধরনের কৌতূহলের জন্ম হল। চোখ বড় বড় করে বলল, "এই উপগ্রহে সত্যি সত্যি বুদ্ধিমান প্রাণী আছে?"

আমি ভুরু কুঁচকে বললাম, "আমি আশা করছি নেই।"

"কেন? তুমি বুদ্ধিমান মহাজাগতিক প্রাণী পছন্দ কর না?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

"সত্যি কথা যদি বলতে বল তা হলে বলব যে, না, যে বুদ্ধিমান প্রাণীর সাথে আমার যোগাযোগ হয় নি তাকে আমি পছন্দ করি না।"

"কেন?"

"প্রথমত বুদ্ধিমান প্রাণী কৌতূহলী হয়। কাজেই তারা আমাদের নিয়ে কৌতূহলী হবে।"

"কৌতূহলী হলে সমস্যা কিসের?" মিত্তিকা ঠিক বুঝতে পারল না আমি কী নিয়ে কথা বলছি। আমি একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম, "যদি এরা মোটামুটি আমাদের মতো বুদ্ধিমান হয় তা হলে আমাদের কেটেকুটে দেখবে। আমাদের ধরে তাদের ল্যাবরেটরিতে নিয়ে রাখবে। যদি অনেক বেশি বুদ্ধিমান হয় তা হলে আমাদের মস্তিষ্কের নিউরনগুলো বিশ্লেষণ করবে, আমাদের নতুন করে তৈরি করবে—"

মিত্তিকাকে এবারে একটু আতঙ্কিত হতে দেখা গেল। আমি সাহস দিয়ে বললাম, "তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ম্যাঙ্গেল ক্বাসের দলবল যেহেতু এই উপগ্রহে বেঁচে আছে এখানে নিশ্চয়ই বুদ্ধিমান কোনো মহাজাগতিক প্রাণী নেই। যদি থেকেও থাকে তা হলে সেটা নিশ্চয়ই বন্ধুভাবাপন্ন—"

"দেখতে কী রকম হবে বলে তোমার মনে হয়? অনেকগুলো চোখ, শুঁড়ের মতো হাত-পা—"

আমি উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠে বললাম, "তুমি নিশ্চয়ই বিনোদন চ্যানেলে নানা ধরনের ছায়াছবি দেখ। প্রকৃত বুদ্ধিমান প্রাণী হলে সেটি যে আমাদের মতো হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। হয়তো তারা এত ক্ষুদ্র যে মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখতে হয়, কিংবা এত বড় যে পুরোটা নিয়েই তারা একটা গ্রহ! কিংবা তারা বাতাসের মতো—দেখা যায় না কিংবা তরল সমুদ্রের মতো—"

মিত্তিকার এবারে খুব আশাভঙ্গ হল বলে মনে হল। আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, "তোমার এত মন খারাপ করার কিছু নেই, হয়তো সত্যিই দেখবে ছোট ছোট পুতুলের মতো হাসিখুশি মহাজাগতিক প্রাণী, তোমাকে দেখে আনন্দে নাচানাচি করছে!"

স্কাউটশিপটি কিছুক্ষণের মাঝেই আমি প্রস্তুত করে নিলাম, মূল মহাকাশযানের মতো এর এত বড় ইঞ্জিন নেই কিন্তু কাজ চালানোর মতো দুটি শক্তিশালী প্লাজমা ইঞ্জিন রয়েছে। মূল মহাকাশযান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে বলে এর মাঝে কয়েকদিন থাকার মতো প্রয়োজনীয় অক্সিজেন, খাবার পানীয় বা জ্বালানি রয়েছে, শক্তিশালী যোগাযোগ ব্যবস্থা এমনকি ভয়ঙ্কর ধরনের অস্ত্রও রয়েছে।

আমি স্কাউটশিপের নিয়ন্ত্রণ প্যানেলের সামনে বসে সেটার ইঞ্জিন চালু করতে করতে ম্যাঙ্গেল ক্বাসকে বললাম, "তোমার কাছে আমি একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাই।"

"কী ব্যাপার?"

"উপগ্রহটিতে নামার পর যদি তুমি আমাকে কিংবা মিত্তিকাকে তোমার সাথে নিতে চাও তা হলে আমাদের অস্ত্র নিতে দিতে হবে।"

ম্যাঙ্গেল ক্বাস কয়েক মুহূর্ত কিছু-একটা ভাবল, তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "ঠিক আছে।"

স্কাউটশিপটি ফোবিয়ান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কিছুক্ষণের মাঝেই প্রচণ্ড গর্জন করে উপগ্রহের দিকে ছুটে চলল। উপগ্রহটি বিশাল, নিজের একটা বায়ুমণ্ডলও রয়েছে। বায়ুমণ্ডলের ঘর্ষণে স্কাউশিপটি উত্তপ্ত হতে শুরু করেছে, তাপনিরোধক আস্তরণ থাকার পরও আমরা সেটা

অনুভব করতে শুরু করেছি। স্কাউটশিপের সংবেদনশীল মনিটর উপগ্রহের বায়ুমণ্ডল, তার তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, প্রাণের চিহ্ন বা বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গের অবশিষ্ট খুঁজতে থাকে। ম্যাঙ্গেল ক্বাসের দলবলের দুর্বল সঙ্কেত ছাড়া এই উপগ্রহটিতে অবশ্য অন্য কোনো ধরনের প্রাণের চিহ্ন পাওয়া গেল না।

ধীরে ধীরে স্কাউটশিপটি আরো নিচে নেমে আসে, বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি, স্কাউটশিপের গতিবেগ অনেক কমিয়ে আনতে হল, উপগ্রহটির ভিতরে এক ধরনের আবছা সবুজ আলো। বায়ুমণ্ডলে শক্তিশালী আয়নের[২৭] আঘাতে এই আলো বের হয়ে আসছে। আমি স্কাউটশিপটিকে উপগ্রহের মাটির কাছাকাছি নামিয়ে এনে নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুর কাছে এসে ঘুরপাক খেতে থাকি। ম্যাঙ্গেল ক্বাস তার দলের লোকজনের সাথে যোগাযোগ করে কিছুক্ষণ নিচু গলায় কথা বলল, তারপর ঘুরে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি স্কাউটশিপটাকে নিচে নামিয়ে নাও।"

আমি মনিটরে একটি সমতল জায়গা দেখে স্কাউটশিপকে নিচে নামিয়ে আনলাম। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে মিত্তিকা ভয়-পাওয়া গলায় বলল, "কী সর্বনাশ! এটা তো দেখি নরকের মতো।"

ম্যাঙ্গেল ক্বাস একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "আমার দলের সবচেয়ে চৌকস মানুষগুলো এই নরকে আটকা পড়ে আছে।"

"এখানে কেমন করে আটকা পড়ল?"

"মহাজাগতিক নিরাপত্তারক্ষীর সাথে সংঘর্ষে হয়ে মহাকাশযানটি বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল।"

"তারা নিশ্চয়ই খুব সৌভাগ্যবান যে মহাকাশযান বিধ্বস্ত হওয়ার পরও প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল।"

ম্যাঙ্গেল ক্বাস বলল, "শুধু সৌভাগ্য নয়, এ ব্যাপারে তাদের নিজস্ব কিছু কৃতিত্বও রয়েছে। আমি বলেছি তারা চৌকস।"

নিরাপত্তারক্ষী বা সৈনিক কিংবা কলকারখানার চৌকস হলে সেটি আমি বুঝতে পারি কিন্তু একটা দস্যুদলকে যখন চৌকস বলা হয় তার অর্থ ঠিক কী আমি সেটা ঠিক বুঝতে পারি না কিন্তু সেটা নিয়ে আমি আর কোনো প্রশ্ন না করাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করলাম। আমি স্কাউটশিপের ভল্ট খুলে সেখান থেকে পোশাক বের করে পরে নিতে শুরু করি। এই উপগ্রহের বায়ুমণ্ডলে শুধু যে যথেষ্ট অক্সিজেন নেই তা নয়, এটা রীতিমতো বিষাক্ত। স্কাউটশিপের সামনে কিছু স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র রয়েছে সেখান থেকে একটি বেছে নিয়ে আমি আমার হাতে তুলে নিলাম, ম্যাঙ্গেল ক্বাস চোখের কোনা দিয়ে আমাকে লক্ষ করল কিন্তু কিছু বলল না। আমি মোটামুটি একটা হালকা অস্ত্র তুলে নিয়ে মিত্তিকার হাতে তুলে দিলাম, সে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "এটা কী?"

"একটা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র।"

"এটা দিয়ে কী করব?"

"হাতে রাখ, যদি প্রয়োজন হয় তা হলে ব্যবহার করবে।"

"আমি অস্ত্র ব্যবহার করতে জানি না।"

আমি হেসে বললাম, "শুনে খুব খুশি হলাম। আশা করছি এই বিদ্যেটা কখনো যেন তোমার শিখতে না হয়।"

"কিন্তু যেটা ব্যবহার করতে জানি না সেটা হাতে নিয়ে কী করব?"

"এটা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র—তোমাকে কিছু করতে হবে না।"

মিত্তিকা কী বুঝল কে জানে, শেষ পর্যন্ত অস্ত্রটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে পিঠে ঝুলিয়ে নিল। ম্যাঙ্গেল ক্বাস অস্ত্রগুলো নেড়েচেড়ে দেখে ভারী একটা অস্ত্র হাতে তুলে নিল, তার হাতে অস্ত্র নেওয়ার ভঙ্গি দেখেই বোঝা গেল সে জীবনের একটা দীর্ঘ সময় এই অস্ত্র হাতে কাটিয়েছে।

স্কাউটশিপের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করে আমরা জরুরি সরবরাহের ব্যাক প্যাকটি পিঠে নিয়ে গোলাকার দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম। ম্যাঙ্গেল ক্বাস আমাকে আগে বের হওয়ার জন্য ইঙ্গিত করল—সেটাই স্বাভাবিক। আমার পিছু পিছু মিত্তিকা এবং সবার শেষে ম্যাঙ্গেল ক্বাস নেমে এল।

বাইরে এক ধরনের অস্থিতিশীল আবহাওয়া, হু-হু করে সবুজ রঙের এক ধরনের বাতাস বইছে। আকাশে সবসময় এক ধরনের আলো, কখনো বাড়ছে কখনো কমছে বলে চোখের রেটিনা কিছুতেই অভ্যস্ত হতে পারছে না। চারদিকে ধূসর উঁচুনিচু প্রান্তর, নানা আকারের পাথর, কিছু কিছু এক ধরনের তরলে ডুবে আছে, তরলের ভিতর থেকে বড় বড় বুদ্বুদ বের হয়ে আসছে। মিত্তিকা ঠিকই বলেছে, নরক বলা হলে চোখের সামনে যে ছবিটি ফুটে ওঠে সেটি অনেকটা এ রকম।

ম্যাঙ্গেল ক্বাসের দলের মানুষদের সঙ্কেত এখন অনেক শক্তিশালী, ইচ্ছে করলে তাদের চেহারাও দেখা যাবে। কিন্তু আমরা আর সে চেষ্টা না করে হাঁটতে শুরু করলাম। আমাদের চোখের সামনে লাগানো গ্যালাক্টিক অবস্থান নির্ধারণ মডিউলে২৮ দেখতে পাচ্ছি কমপক্ষে তিরিশ মিনিটের মতো হাঁটতে হবে। আমি হাঁটতে হাঁটতে ঘুরে মিত্তিকার দিকে তাকিয়ে বললাম, "তোমার কেমন লাগছে মিত্তিকা?"

মিত্তিকা বড় বড় নিশ্বাস ফেলে বলল, "এই পোশাক পরে অভ্যাস নেই তো তাই খুব সুবিধে করতে পারছি না।"

আমি উৎসাহ দিয়ে বললাম, "কে বলেছে পারছ না? এই তো চমৎকার হাঁটছ।"

"কিন্তু আমার কষ্ট হচ্ছে।"

কমবয়সী এই মেয়েটির জন্য আমার মায়া হল, শুধুমাত্র ভাগ্যের দোষে মহাজাগতিক একজন দস্যুর হাতে ধরা পড়ে তার এক অজানা উপগ্রহের অস্থিতিশীল আবহাওয়ার মাঝে হেঁটে হেঁটে আরো কিছু ঘাঘু অপরাধীদের উদ্ধার করতে যেতে হচ্ছে। ম্যাঙ্গেল ক্বাসের সাথে তার সঙ্গীসাথীরা একত্র হলে পুরো পরিবেশটা কেমন হবে চিন্তা করে আমি নিজের ভিতরে এক ধরনের অশান্তি বোধ করতে শুরু করেছি।

আমি মিত্তিকার পিঠে হাত দিয়ে বললাম, "এই তো আমরা এসে গেছি।"

কথাটি পুরোপুরি সত্যি নয় কারণ তার পরেও আমাদের প্রায় আরো এক ঘণ্টা হাঁটতে হল এবং উপগ্রহের বৈরী আবহাওয়ায় হাঁটতে হাঁটতে যখন আমরা ক্লান্ত হয়ে গেলাম তখন হঠাৎ করে চোখের সামনে বিধ্বস্ত একটা মহাকাশযান দেখতে পেলাম।

মহাকাশযানটি নিশ্চয়ই অনেকদিন আগে এখানে বিধ্বস্ত হয়েছে, কারণ পুরো মহাকাশযানটি ধূসর এবং সবুজাভ ধুলোর আস্তরণে ঢাকা পড়ে আছে। আমি একটু অবাক হয়ে মহাকাশযানটির দিকে তাকিয়ে রইলাম কারণ এটি যেভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে তাতে এর ভিতরে কোনো মানুষের বেঁচে থাকার কথা নয়। মহাকাশযানের মূল অক্ষটি ভেঙে গিয়েছে, বিস্ফোরণের ফলে যে বিশাল গর্ত তৈরি হয়েছে তার ভিতর দিয়ে মহাকাশযানের পুরো বাতাস বের হয়ে যাবার কথা। এ রকমভাবে বিধ্বস্ত হওয়া মহাকাশযান কিছুতেই

বায়ুনিরোধক থাকতে পারে না। আমি মহাকাশযানের দেয়ালের দিকে তাকালাম, প্রচণ্ড উত্তাপে এটি দুমড়ে মুচড়ে গলে গিয়েছে, একটি মহাকাশযানের এই ধরনের উত্তাপ সহ্য করার কথা নয়, নিরাপত্তার পুরো ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাবার কথা। এই প্রলয়কাণ্ডে কোনোভাবেই মহাকাশযানের কোনো অভিযাত্রীর বেঁচে থাকার কথা নয়। আমি সবিস্ময়ে মহাকাশযানটির দিকে তাকিয়ে থেকে ফিসফিস করে বললাম, "কী আশ্চর্য!"

ম্যাঙ্গেল ক্বাস আমার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে বলল, "কোনটি কী আশ্চর্য?"

"এই মহাকাশযানটি যেভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে এর মাঝে কোনো মানুষ বেঁচে থাকার কথা নয়।"

"কিন্তু দেখতেই পাচ্ছ মানুষ বেঁচে আছে।"

"হ্যাঁ, কিন্তু সেটি কীভাবে সম্ভব হল? আমি বুঝতে পারছি না।"

"এটা নিয়ে এখন মাথা না ঘামিয়ে চল ভিতরে যাওয়া যাক।"

"চল।"

আমরা ঘুরে ঘুরে ভিতরে ঢোকার দরজা খুঁজে বের করলাম, সেই দরজা ধাক্কা দিতেই সেটা ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করে খুলে গেল। ভিতরে সবুজ রঙের ধুলোর আস্তরণ এবং ঘোলাটে এক ধরনের অন্ধকার। মাথায় লাগানো উজ্জ্বল আলোতে দেখতে দেখতে আমরা হাঁটতে থাকি, প্রথমে আমি, আমার পিছনে মিত্তিকা এবং সবার শেষে ম্যাঙ্গেল ক্বাস। ঠিক কী কারণ জানা নেই কিন্তু আমাদের সবার হাত অস্ত্রের ট্রিগারে চলে এসেছে, এই বিধ্বস্ত মহাকাশযানটিতে এক ধরনের অশুভ আতঙ্কের চিহ্ন রয়েছে।

সরু করিডোর ধরে হেঁটে হেঁটে আমরা আরো বড় একটি দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম, শক্ত দরজা এমনিতে খোলা যাচ্ছিল না, পা দিয়ে কয়েকবার লাথি দেবার পর সেটা ধীরে ধীরে খুলে গেল। আমি নিশ্বাস বন্ধ করে ভিতরে ঢুকে চারদিকে তাকালাম, এখানেও কেউ নেই। আমরা মোটামুটি একটা খোলা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি, মহাকাশযানটি বিধ্বস্ত হওয়ার কারণে এটি বাঁকা হয়ে আছে, এক সময় এখানে আলো এবং বাতাস ছিল এখন কোথাও কিছু নেই, একটি থমথমে নীরবতা।

মিত্তিকা আমার কাছে এসে আমার হাত ধরে ফিসফিস করে বলল, "আমার ভয় করছে।"

আমি তার পিঠে হাত দিয়ে বললাম, "ভয়ের কিছু নেই মিত্তিকা। আমরা আছি না?"

"জানি, তবু কেমন জানি ভয় লাগছে।"

ভয় লাগার ব্যাপারটি হাস্যকর বোঝানোর জন্য আমি শব্দ করে হাসার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পদ্ধতিটা খুব ভালো কাজ করল না।

ঢাল বেয়ে সাবধানে নিচে নেমে এসে আমরা আধা গোলাকার আরেকটি দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম, এই দরজার ফাঁক দিয়ে হলদে রঙের ঘোলাটে এক ধরনের আলো বের হচ্ছে। ম্যাঙ্গেল ক্বাস খুশি খুশি গলায় বলল, "এই যে, সবাই নিশ্চয়ই এখানে আছে।"

আমি দরজাটিতে হাত দিয়ে শব্দ করলাম, এবং ভিতর থেকে এক ধরনের শব্দ হল, মনে হল কেউ একজন প্রত্যুত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছে। আমি সাবধানে দরজাটি ধাক্কা দিয়ে খুলে ভিতরে ঢুকলাম, মাঝারি অসমতল একটি ঘর, সম্ভবত ইঞ্জিন কক্ষ—সেখানে বিভিন্ন জায়গায় কয়েকজন মানুষ ছিন্নভিন্ন পোশাকে, ধুলো এবং কালি মাখা অবস্থায় পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে। মানুষগুলোর বসে থাকার মাঝে এক ধরনের অস্বাভাবিকতা রয়েছে যেটি দেখে আমার বুকের মাঝে ধক্ করে উঠল।

AMARBOI.COM

আমার পিছু পিছু মিত্তিকা এবং সবার পরে ম্যাঙ্গেল ক্বাস ঘরটিতে এসে ঢুকল, ম্যাঙ্গেল ক্বাসকে খুব বিচলিত মনে হল না, কিন্তু মিত্তিকা ছোট একটা আর্তচিৎকার করে আমাকে পিছন থেকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরল। আমি নিচু গলায় বললাম, "কী হয়েছে মিত্তিকা?"

মিত্তিকা কাঁপা গলায় বলল, "এরা কারা? আমার ভয় করছে।"

ম্যাঙ্গেল ক্বাস দুই পা এগিয়ে গিয়ে বলল, "বাড়াবাড়ি ভয় পাবার কিছু নেই, এরা আমার লোকজন।" ম্যাঙ্গেল ক্বাস দুই হাত উপরে তুলে অভিবাদন করার ভঙ্গি করে বলল, "কী খবর, কেমন আছ তোমরা?"

মানুষগুলো—যারা সংখ্যায় ছয় জন, যাদের মাঝে পুরুষ, মহিলা এবং পুরুষও নয় মহিলাও নয় এ রকম মানুষ রয়েছে, ম্যাঙ্গেল ক্বাসের অভিবাদনে খুব বেশি অনুপ্রাণিত হল না। কাছাকাছি যে বসে ছিল শুধুমাত্র সে যান্ত্রিকভাবে একটা হাত উপরে তুলল।

ম্যাঙ্গেল ক্বাস গলার স্বরে আরো আন্তরিকতা ফুটিয়ে বলল, "তোমরা এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় বেঁচে যাবে সেটা আমি আশা করি নি, বলা যেতে পারে এটি একটি ম্যাজিকের মতো।"

মানুষগুলো এবারেও কোনো কথা বলল না, পিছনে বসে থাকা একজন মানুষ, যার শারীরিক গঠন দেখে মহিলা বলে অনুমান করলাম, ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। ম্যাঙ্গেল ক্বাস নিজে থেকে আরো এক পা এগিয়ে গিয়ে বলল, "খিলা অনেকদিন পর তোমাদের দেখা পেলাম। তোমাদের আর দুশ্চিন্তার কারণ নেই। আমি তোমাদের নিয়ে যেতে এসেছি।"

খিলা নামের মেয়েটি খসখসে গলায় বলল, "আমাদের নিয়ে যাবে?"

মেয়েটির গলার স্বর শুনে আমি চমকে উঠলাম, গলার স্বরটি আশ্চর্য রকমের প্রাণহীন এবং যান্ত্রিক।

ম্যাঙ্গেল ক্বাস মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ নিয়ে যাব। অবশ্যই নিয়ে যাব।"

"কোথায় নিয়ে যাবে?"

"আমার সাথে। আমাদের দল আবার নতুন করে তৈরি করব। সবাই মিলে নতুন অভিযান হবে। নতুন অস্ত্র, নতুন প্রযুক্তি—অনেক পরিকল্পনা আছে।"

সামনে বসে থাকা ভয়ঙ্করদর্শন মানুষটি মুখ উঁচু করে মোটা গলায় বলল, "মানুষ থাকবে সেখানে?"

"মানুষ?" ম্যাঙ্গেল ক্বাস অবাক হয়ে বলল, "মানুষ থাকবে না কেন ইরি? অবশ্যই থাকবে।"

ম্যাঙ্গেল ক্বাসের কথা শুনে ইরি নামের ভয়ঙ্করদর্শন মানুষটি হঠাৎ কেমন জানি খুশি হয়ে উঠল, সে তার শরীর দুলিয়ে বিচিত্র একটি আনন্দহীন হাসি হাসতে শুরু করে। ইরি নামের মানুষটির হাসি দেখে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে থাকা আরো কয়েকজন মানুষ হাসতে শুরু করে, আনন্দহীন ভয়ঙ্কর এক ধরনের হাসি, শুনে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

ম্যাঙ্গেল ক্বাস তাদের হাসি থেমে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল, তারপর বলল, "তোমরা এতদিন এখানে কেমন ছিলে বল?"

প্রথমে কেউ কোনো কথা বলল না, এবং হঠাৎ করে পিছন থেকে না-পুরুষ না-মহিলা এই ধরনের সবুজ রঙের চুলের একটি মানুষ বলল, "জানি না।"

"জান না?" ম্যাঙ্গেল ক্বাস অবাক হয়ে বলল, "কেমন ছিলে জান না? কী বলছ উলন?"

উলন স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ম্যাঙ্গেল ক্বাসের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর শীতল গলায় বলল, "কেমন করে জানব? ভয়ঙ্কর একটা বিস্ফোরণ হল, তারপর আর কিছু মনে নাই।"

"মনে নাই?"

"না।"

ম্যাঙ্গেল ক্বাস অন্যদের দিকে তাকাল, অন্যেরাও তখন মাথা নাড়ল, বলল, "নাই, মনে নাই।"

"কিছু মনে নাই?"

মানুষগুলো একজন আরেকজনের দিকে তাকাল, তারপর বলল, "না, মনে নাই।"

আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না হঠাৎ করে ম্যাঙ্গেল ক্বাস রেগে উঠল কেন, গলার স্বর উঁচু করে বলল, "আসলে মনে আছে, তোমরা মিথ্যা কথা বলছ।"

মাঝামাঝি বসে থাকা একজন মানুষ তখন ধীরে ধীরে উঠে এল, তার শরীরের একটা বড় অংশ বিকটভাবে পুড়ে গেছে, একটা হাত ভেঙে অসহায়ভাবে ঝুলছে, মানুষটির চেহারায় জগৎসংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা—ম্যাঙ্গেল ক্বাসের কাছাকাছি এসে বলল, "আমরা মিথ্যা কথা বলছি?"

"হ্যাঁ। আমার ধারণা তোমরা মিথ্যা কথা বলছ।"

"কেন?"

"কারণ, তোমরা আমাকে বলবে না গ্লুকোনাইটগুলো[২৯] কোথায় আছে।"

মানুষগুলো চুপ করে বসে এবং দাঁড়িয়ে রইল, তাদের দেখে মনে হল তারা ম্যাঙ্গেল ক্বাসের কথা বুঝতে পারছে না।

"বল, কোথায় রেখেছে গ্লুকোনাইটগুলো?"

খিলা নামের মহিলাটি প্রথমে হেসে উঠল, প্রাণহীন আনন্দহীন ভয়ঙ্কর এক ধরনের হাসি। তার হাসি শুনে অন্য আরো কয়েকজন হেসে উঠল এবং ম্যাঙ্গেল ক্বাস আরো রেগে উঠে চিৎকার করে বলল, "তোমরা বলবে না কোথায় আছে গ্লুকোনাইটগুলো?"

মুখে নোংরা দাড়িগোঁফ একজন মানুষ উপরের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমরা বেঁচে আছি না মারা গেছি সেটাই মনে নাই—আর গ্লুকোনাইট!"

উলন জিজ্ঞেস করল, "গ্লুকোনাইট কী?"

ম্যাঙ্গেল ক্বাস এবারে তার হাতে অস্ত্রটা তুলে নিয়ে সেটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "তোমরা এখন বলতে চাও যে গ্লুকোনাইট চেন না?"

ইরি ম্যাঙ্গেল ক্বাসের দিকে তাকিয়ে বলল, "হতে পারে চিনি কিংবা চিনি না। মনে নাই। আসলে কিছু মনে নাই।"

"আমাকে মনে আছে?"

ইরি উত্তর না দিয়ে ম্যাঙ্গেল ক্বাসের দিকে তাকিয়ে রইল। ম্যাঙ্গেল ক্বাস হাতের অস্ত্র উদ্যত করে দুই পা এগিয়ে বলল, "তোমরা কি ভেবেছ আমি শুধু তোমাদের উদ্ধার করার জন্য এসেছি?"

পুরুষ, মহিলা এবং না-পুরুষ না-মহিলা কেউই কোনো কথা বলল না। ম্যাঙ্গেল ক্বাস পা দাপিয়ে বলল, "না, আমি শুধু তোমাদের উদ্ধার করার জন্য এখানে আসি নাই। একটা মহাকাশযান দখল করে এই উদ্ভট উপগ্রহে কেউ শুধু মানুষকে উদ্ধার করার জন্য আসে না। আমিও আসি নাই। আমি গ্লুকোনাইটের জন্যও এসেছি। বল কোথায় আছে গ্লুকোনাইট।"

ইরি চিন্তিত মুখে বলল, "দাঁড়াও জিজ্ঞেস করে দেখি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কাকে জিজ্ঞেস করবে?"

ইরি কিছু একটা বলার চেষ্টা করে থেমে গেল। মনে হল কিছু একটা নিয়ে সে হঠাৎ যন্ত্রণাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

ম্যাঙ্গেল ক্বাস আবার চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, "কাকে জিজ্ঞেস করবে?"

"এ তো—ঐ যে, যারা—মানে—এই যে—" ইরিকে কেমন যেন বিভ্রান্ত দেখায়।

ম্যাঙ্গেল ক্বাস ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল, তারপর হিংস্র গলায় বলল, "বুঝেছি। তোমরা সহজ কথায় নড়বে না। আবার আমাকে একটা উদাহরণ তৈরি করতে হবে, যেন তোমাদের সব কথা মনে পড়ে।"

আমি এক ধরনের আতঙ্ক নিয়ে ম্যাঙ্গেল ক্বাসের দিকে তাকালাম, সে এখন কী করতে যাচ্ছে?

ম্যাঙ্গেল ক্বাস দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, "আমি ঠিক দশ সেকেন্ড সময় দিলাম, তার মাঝে তোমরা যদি না বল গ্লুকোনাইটগুলো কোথায় আছে তা হলে আমি তোমাদের এক জনকে গুলি করে মারব।"

ম্যাঙ্গেল ক্বাস তার অস্ত্র উঁচু করে ধরল এবং আমি হঠাৎ করে বুঝতে পারলাম, সে সত্যিই দশ সেকেন্ড পর গুলি করবে। আমি ম্যাঙ্গেল ক্বাসের দিকে এগিয়ে গেলাম, "ম্যাঙ্গেল ক্বাস—"

ম্যাঙ্গেল ক্বাস ধমক দিয়ে বলল, "তুমি চুপ কর এখন। আমি এখানে ধর্ম প্রচারে আসি নি। এদের এক জন দুই জনকে গুলি করে মেরে না ফেলা পর্যন্ত—"

আমি বাধা দিয়ে বললাম, "তুমি কাকে মারতে চাইছ?"

"কেন? এদেরকে।"

"যারা মরে গেছে, তাদেরকে মারা যায় না।"

ম্যাঙ্গেল ক্বাস অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল, বলল, "কী বললে?"

আমি চাপা গলায় বললাম, "এরা সবাই মরে গেছে।"

"মরে গেছে?"

"হ্যাঁ। এই গ্রহে অক্সিজেন নেই, শুধু বিষাক্ত বাতাস। এই মানুষগুলো কেউ কোনো নিশ্বাস নিচ্ছে না। দেখেছ?"

"নিশ্বাস নিচ্ছে না?"

"না।"

"তা হলে এরা কথা বলছে কেমন করে?"

"জানি না। আমার ধারণা—"

"তোমার ধারণা—"

"আমার ধারণা এই মৃতদেহগুলোকে কেউ নিয়ন্ত্রণ করছে।"

ম্যাঙ্গেল ক্বাস আমার দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকাল, তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "বাজে কথা বোলো না।"

আমি বুঝতে পারলাম সে আমার কথা বিশ্বাস করল না, আমি বুঝতে পারলাম সে এখন এদের এক জন-দুজনকে গুলি করবে। আমি চোখের কোনা দিয়ে দেখতে পেলাম খিলা নামের মেয়েটা খুব ধীরে ধীরে হেঁটে হেঁটে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে—একমাত্র এই দরজা দিয়ে বের হওয়া যায়, দরজাটি বন্ধ করে দিলে আর কেউ বের হতে পারবে না। সমস্ত শরীরের বেশিরভাগ পুড়ে যাওয়া মানুষটাও আমাদের অন্যপাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

AMARBOI.COM

উলন এবং ইরিও উঠে দাঁড়িয়েছে—সবাই খুব ধীরে ধীরে আমাদেরকে ঘিরে ফেলছে। আমি মানুষগুলোর চোখের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলাম, সেগুলো কাচের চোখের মতো প্রাণহীন, নিষ্প্রভ। মানুষগুলোর চোখেমুখে জীবনের কোনো চিহ্ন নেই।

আমি সাবধানে এক পা পিছিয়ে এসে মিত্তিকার কাছে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বললাম, "মিত্তিকা।"

"কী?"

"তুমি আমার খুব কাছে এসে দাঁড়াও।"

"কেন?"

"এখন বলতে পারব না প্রস্তুত হয়ে থাক।"

"কিসের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকব?"

"জানি না।"

আমি সাবধানে অস্ত্রটা হাতে নিয়ে চোখের কোনা দিয়ে চারপাশে তাকালাম, মানুষগুলো খুব নিঃশব্দে আমাদের ঘিরে ফেলে চারপাশ থেকে এগিয়ে আসছে এবং হঠাৎ আমার মনে হল, এই প্রথম ম্যাঙ্গেল ক্বাস একটু ভয় পেয়েছে। ভয়টা লুকানোর জন্য সে চিৎকার করে বলল, "দাঁড়াও সবাই—যে যেখানে আছ দাঁড়াও।"

কেউ দাঁড়াল না, বরং আরো এক পা এগিয়ে এল, ম্যাঙ্গেল ক্বাস হিংস্র স্বরে চিৎকার করে তার স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের ট্রিগার টেনে ধরল। প্রচণ্ড শব্দে একঝাঁক গুলি বের হয়ে সামনে দাঁড়ানো মানুষগুলোকে ঝাঁজরা করে ফেলল, কিন্তু একজন মানুষও থমকে দাঁড়াল না, কারো মুখে যন্ত্রণার একটু চিহ্নও ফুটে উঠল না। ইরি হঠাৎ করে অপ্রকৃতিস্থের মতো হেসে উঠল।

ম্যাঙ্গেল ক্বাস এই প্রথম আতঙ্কিত হয়ে উঠল, সে ফ্যাকাসে মুখে একবার আমার দিকে তাকাল তারপর আবার ঘুরে মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে আবার হিংস্রভাবে গুলি করতে লাগল।

আমি দেখতে পেলাম মানুষগুলোর শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সেখান থেকে কোনো রক্ত বের হচ্ছে না। আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সবিস্ময়ে দেখতে পেলাম শরীরের ভিতর থেকে কিলবিলে কালচে রঙের কোনো একটা জীবন্ত প্রাণী বের হয়ে আসছে। বিভিন্ন ক্ষতস্থান থেকে অক্টোপাসের পায়ের মতো আঠালো কিলবিলে কিছু একটা বের হয়ে আসছে, আবার ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। ঘরের ভিতরে জান্তব চাপা এক ধরনের হিসহিস শব্দ শোনা যেতে থাকে।

মিত্তিকা আতঙ্কে চিৎকার করে আমাকে আঁকড়ে ধরল, আমি এক হাত দিয়ে তাকে শক্ত করে ধরে রেখে বললাম, "আমাকে ধরে রেখো।"

আমি অন্য হাত দিয়ে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটা উপরের দিকে তাক করলাম, এটিকে এটমিক ব্লাস্টার[৩০] হিসেবে ব্যবহার করলে মহাকাশযানের ছাদটুকু উড়িয়ে দিয়ে যাবার কথা। আমি নিশ্বাস আটকে রেখে ট্রিগার টেনে ধরতেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ এবং আগুনের হলকায় ঘরটি কেঁপে উঠল, মহাকাশযানের ছাদের একটা বড় অংশ উড়ে ফাঁকা হয়ে গেছে—সেই ফাঁকা অংশ দিয়ে বিচিত্র উপগ্রহের কুৎসিত আকাশ দেখা যাচ্ছে।

আমি এক হাতে অস্ত্রটাকে ধরে রেখে অন্য হাতে জেট প্যাকটার সুইচ স্পর্শ করলাম, সাথে সাথে জেট প্যাকের[৩১] ক্ষুদ্র ইঞ্জিন দুটো গর্জন করে উঠল। জেট প্যাক একজন মানুষকে নিয়ে উড়ে যেতে পারে দুজনকে নিয়ে উড়তে পারবে কি না আমি পুরোপুরি নিঃসন্দেহ নই কিন্তু এখন সেটা নিয়ে চিন্তা করার সময় নেই। মিত্তিকা নিজে থেকে তার

জেট প্যাক চালাতে পারবে না—সে আগে কখনো ব্যবহার করে নি, আমি জেট প্যাকের ইঞ্জিনের ওপর পুরোপুরি নির্ভর না করে সেটাকে একটা শক্তিশালী ধাক্কা দেবার জন্য প্রাণপণে লাফিয়ে উঠলাম। ঠিক সময়ে জেট প্যাকের ইঞ্জিন কান ফাটানো শব্দে গর্জন করে উঠল এবং আমরা দুজন মুহূর্তের মাঝে বিধ্বস্ত মহাকাশযানের বিস্ফোরণে উড়ে যাওয়া ছাদ দিয়ে বের হয়ে এলাম। আমার মনে হল শেষ মুহূর্তে নিচের মানুষগুলো ছুটে এসে আমাদের ধরার চেষ্টা করেছিল কিন্তু আমরা ততক্ষণে তাদের নাগালের বাইরে চলে এসেছি। আমি নিচে গোলাগুলির শব্দ শুনতে পেলাম, এক ধরনের হুটোপুটি হচ্ছে বলে মনে হল। কিন্তু ততক্ষণে আমরা অনেক দূর সরে গিয়েছি।

আমি মিত্তিকাকে এক হাতে কোনোভাবে ধরে রেখে বললাম, "আমাকে শক্ত করে ধরে রেখো মিত্তিকা।"

মিত্তিকা আমাকে ধরে রেখে কাঁপা গলায় বলল, "আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না আমরা বের হয়ে আসতে পেরেছি।"

"এখনই—এত নিশ্চিত হয়ো না মিত্তিকা—"

"কেন নয়?"

"এই প্রাণীগুলো এত সহজে আমাদের ছেড়ে দেবে না।"

মিত্তিকা ভয়-পাওয়া গলায় বলল, "কেন? এ কথা বলছ কেন?"

"প্রাণীগুলো এতদিন শুধু মৃত মানুষদের দেখেছে—এই প্রথমবার তারা জীবিত মানুষ দেখছে। বুদ্ধিমান প্রাণী হলে কৌতূহল হবার কথা।"

"সর্বনাশ!"

"হ্যাঁ, প্রস্তুত থেকো। অস্ত্রটা হাতে রেখো।"

"কিন্তু আমি বলেছি আমি গুলি করতে পারি না। কীভাবে করতে হয় আমি জানি না—"

"তোমার জানতে হবে না। যখন সময় হবে তুমি জানবে।"

"কেমন করে জানব?"

"বেঁচে থাকার আদিম প্রবৃত্তি থেকে।"

AMARBOI.COM

আমি আর মিত্তিকা মাটি থেকে শ খানেক মিটার উপর দিয়ে উড়ে যেতে লাগলাম, চারপাশে সবুজাভ এক ধরনের কুয়াশা এবং ধুলো, আমি টের পেলাম আমার শরীরে বৈদ্যুতিক চার্জ জমা হতে শুরু করেছে—আমরা তার মাঝে উড়ে যেতে লাগলাম। মিত্তিকা আমাকে শক্ত করে ধরে রেখেছে, আমি টের পাচ্ছি সে এখনো থরথর করে কাঁপছে।

কিছুক্ষণের মাঝে আমি স্কাউটশিপটা দেখতে পেলাম—অস্থিতিশীল গ্রহটির আবছা আলোতে সেটিকে একটি প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর মতো লাগছিল। আমি স্কাউটশিপের সাথে যোগাযোগ করে একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম, "আমরা কাছাকাছি এসে গেছি মিত্তিকা। নামার জন্য প্রস্তুত হও।"

"আমি প্রস্তুত আছি।"

আমি জেট প্যাকের সুইচ স্পর্শ করে ইঞ্জিন দুটো নিয়ন্ত্রণ করে সাবধানে নিচে নেমে এলাম। হাতে অস্ত্রটি ধরে রেখে আমি দ্রুত চারপাশে একবার তাকিয়ে নিই, কোথাও কিছু নেই। মিত্তিকা আমাকে শক্ত করে ধরে রেখেছে; আমি শুনতে পেলাম তার স্পেসস্যুটের ভিতরে সে জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে।

আমরা স্কাউটশিপের দরজার কাছে এসে দাঁড়াতেই ঘরঘর্ শব্দ করে দরজাটা খুলে গেল। আমি মিত্তিকাকে সামনে এগিয়ে দিয়ে বললাম, "যাও ভিতরে ঢোক।"

প্রথমে মিত্তিকা এবং তার পিছু পিছু আমি ভিতরে ঢুকলাম এবং প্রায় সাথে সাথে ঘর্‌ঘর্‌ শব্দ করে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। মিত্তিকা স্কাউটশিপের দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে নিতে বলল, "আমরা বেঁচে গেছি? বেঁচে গেছি ইবান?"

"সেটা এখনো জানি না, তবে মনে হচ্ছে বিপদের ঝুঁকি অনেকটা কমেছে।" আমি নরম গলায় বললাম, "নিরাপদে মহাকাশযান ফোবিয়ানে ফিরে যাবার সম্ভাবনা এখন শতকরা নব্বই ভাগ।"

আমরা স্কাউটশিপের কোয়ারেন্টাইন কক্ষে[৩২] দাঁড়িয়ে রইলাম, স্কাউটশিপের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি আমাদের স্পেসস্যুট থেকে সকল রকম জৈব-অজৈব পদার্থ পরিষ্কার করতে শুরু করেছে। আমাদের ঘিরে নানারকম রাসায়নিক তরল ঘুরতে থাকে, শক্তিশালী আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি[৩৩] এসে আঘাত করে—সকল বাতাস শুষে নেওয়া হয়। মিত্তিকা অধৈর্য হয়ে বলল, "এটা কখন শেষ হবে? কখন আমরা স্কাউটশিপ চালু করব?"

"এই তো এক্ষুনি।"

"এত দেরি হচ্ছে কেন?"

"কিছু করার নেই মিত্তিকা, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের পুরোপুরি পরিষ্কার করা না হচ্ছে আমাদের এখান থেকে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। অজানা কোনো জীবনের চিহ্ন, কোনো ভাইরাস, কোনো জীবাণু নিয়ে আমরা ফোবিয়ানে ফিরে যেতে পারব না।"

"কেন?"

"আমাদের নিরাপত্তার জন্যই।"

মিত্তিকা অধৈর্য হয়ে দাঁড়িয়ে ছটফট করতে লাগল। আমিও ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে গেছি কিন্তু বাইরে সেটা প্রকাশ করলাম না। মহাকাশযানের অধিনায়কদের নিজেদের অনুভূতি এত সহজে প্রকাশ করার কথা নয়।

একসময় কোয়ারেন্টাইন ঘরে নিরাপত্তার সবুজ আলো জ্বলে উঠল। আমি আর মিত্তিকা বায়ুনিরোধক দরজা দিয়ে স্কাউটশিপের ভিতরে ঢুকলাম। আমরা দ্রুত আমাদের স্পেসস্যুট খুলে নিতে শুরু করি, যদিও নতুন এই পোশাকগুলো পুরোপুরি বায়ুনিরোধক হয়েও আশ্চর্য রকম পেলব কিন্তু তারপরেও দীর্ঘ সময় একটি বায়ুনিরোধক পরিবেশের ভিতরে থেকে যন্ত্রপাতি দিয়ে কথা বলার ব্যাপারটি স্নায়ুর ওপরে এক ধরনের চাপের সৃষ্টি করে। স্পেসস্যুট ভল্টের মাঝে ঢুকিয়ে, অস্ত্রগুলো খুলে নিরাপদ জায়গায় রেখে আমরা স্কাউটশিপের নিয়ন্ত্রণ প্যানেলের কাছে এসে দাঁড়ালাম। মিত্তিকা আমার কাছে এসে আমার হাত স্পর্শ করে বলল, "ইবান—"

"কী হল?"

"আমার প্রাণ রক্ষা করার জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।"

"তোমার প্রাণ তো আলাদাভাবে রক্ষা করি নি। আমি আমাদের প্রাণ রক্ষা করেছি।"

"কিন্তু তুমি তো আমাকে নিয়ে বের হয়ে এসেছ, তুমি তো ইচ্ছে করলে জেট প্যাক ব্যবহার করে একা বের হয়ে আসতে পারতে।"

আমি অবাক হয়ে মিত্তিকার দিকে তাকিয়ে রইলাম, বললাম, "আমি একা কেন বের হয়ে আসব?"

মিত্তিকা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "সেটাই নিয়ম। সবাই নিজের জন্য বেঁচে থাকে। আমি সেটাই শিখেছি। সেটাই শেখানো হয়েছে।"

"সেটা নিয়ম না, মিত্তিকা। আমি সেটা শিখি নি।"

মিত্তিকা নিশ্বাস ফেলে বলল, "তুমি অন্যরকম। তোমার জিনেটিক প্রোফাইল[৩৪] অন্যরকম। আমি লক্ষ করছি।"

আমি কিছু না বলে নিয়ন্ত্রণ প্যানেলে স্কাউটশিপের ইঞ্জিনের অবস্থা লক্ষ করে সেটা চালু করার প্রাথমিক ব্যবস্থাগুলো শেষ করতে থাকি। মিত্তিকা আমার পাশে দাঁড়িয়ে একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "এর মাঝে সবচেয়ে ভালো কী হয়েছে জান?"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "জানি। ম্যাঙ্গেল ক্বাস দূর হয়েছে।"

"হ্যাঁ। আমি জানি না তাকে আর কোনোভাবে দূর করা যেত কি না—"

"মনে হয় এত সহজে যেত না। একজন খুব খারাপ মানুষকে শুধুমাত্র অন্য একজন খুব খারাপ মানুষ শায়েস্তা করতে পারে।"

মিত্তিকা খুব সুন্দর করে হেসে বলল, "তুমি খারাপ মানুষ নও। তুমি খুব চমৎকার একজন মানুষ। কাজেই তুমি ওর কিছু করতে পারতে না।"

আমি হেসে বললাম, "তুমি আমার সম্পর্কে কিছু জান না, তুমি আমাকে দেখেছ মাত্র অল্প কয়েকদিন।"

"সেটাই যথেষ্ট। আমি অনেক মানুষকে দেখেছি, তুমি অন্যরকম। তোমার ভিতরে কিছু একটা আছে যেটা অন্যের ভিতরে নেই।"

আমি সুইচ স্পর্শ করে মূল ইঞ্জিনে জ্বালানির প্রবাহ সৃষ্টি করে তাকিয়ে রইলাম, আর কিছুক্ষণের মাঝেই আমরা এই অশুভ গ্রহটাকে ছেড়ে চলে যেতে পারব। মিত্তিকা আরো একটু এগিয়ে এসে বলল, "ম্যাঙ্গেল ক্বাসকে ওরা কী করছে বলে তোমার মনে হয়?"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "বলা কঠিন। তবে আমাদের চাইতে সে অনেক বেশি বিচিত্র। ভয়ঙ্কর মানুষ ছিল ম্যাঙ্গেল ক্বাস। মস্তিষ্কে আরো একটা কপোট্রন[৩৫] বসিয়ে রেখেছে—হাইব্রিড মানুষ। যখন তার মানুষের অংশটাকে কাবু করে ফেলা হয়—তার যন্ত্রের অংশটা দায়িত্ব নিয়ে নেয়।"

"কী ভয়ানক!"

"আর চিন্তা নেই। যন্ত্রণা দূর হয়েছে।" আমি কন্ট্রোল প্যানেল দেখে মিত্তিকাকে বললাম, "ইঞ্জিন চালু করার সময় হয়েছে। মিত্তিকা তুমি নিরাপত্তা বেল্ট লাগিয়ে গিয়ে বস।"

মিত্তিকা তার বসার আসনের দিকে রওনা দিয়ে হঠাৎ একটা আর্তচিৎকার করে উঠল। আমি চমকে উঠে ঘুরে তাকালাম এবং হঠাৎ করে আমার হৃৎস্পন্দন থেমে গেল। স্কাউটশিপের জানালায় ম্যাঙ্গেল ক্বাস দাঁড়িয়ে আছে—সে ফিরে এসেছে!

মিত্তিকা চিৎকার করে বলল, "ইবান! ইঞ্জিন চালু কর—এক্ষুনি।"

আমি নিয়ন্ত্রণ প্যানেলের ওপর ঝুঁকে পড়লাম—ম্যাঙ্গেল ক্বাস স্কাউটশিপের ভিতরে ঢুকতে পারবে না—তার হাতের অস্ত্র দিয়েও সহজে আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আমি সুইচ স্পর্শ করতে গিয়ে থেমে গেলাম, ম্যাঙ্গেল ক্বাসকে কুৎসিত সাপের মতো কিছু একটা জড়িয়ে ধরেছে, সে প্রাণপণে সেই কিলবিলে জিনিসটি থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছে। তার মুখে আতঙ্ক, সে চিৎকার করছে।

মিত্তিকা হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো আবার চিৎকার করতে থাকে, "তাড়াতাড়ি ইবান, তাড়াতাড়ি—"

ইঞ্জিন চালু করতে গিয়ে আমি আবার থেমে গেলাম, ম্যাঙ্গেল ক্বাসের চোখে-মুখে অনুনয়, তার জীবন ভিক্ষা চাইছে—অস্ত্র দিয়ে গুলি করেও প্রাণীটির আলিঙ্গন থেকে নিজেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রক্ষা করতে পারছে না। একজন মানুষ একটি মহাজাগতিক প্রাণী থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চাইছে আমি মানুষ হয়ে সেখানে কি আরেকজন মানুষকে ধ্বংস হতে দিতে পারি?

আমি সুইচ থেকে নিজের হাত সরিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। মিত্তিকা চিৎকার করে বলল, "কী হল?"

"ম্যাঙ্গেল ক্বাসকে সাহায্য করতে হবে।"

"কী বললে?" মিত্তিকা নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না, "তুমি কী বললে?"

"বলেছি ম্যাঙ্গেল ক্বাসকে এই মহাজাগতিক প্রাণীর হাত থেকে বাঁচাতে হবে।"

"কেন?" মিত্তিকা চিৎকার করে বলল, "কেন?"

"কারণ, ম্যাঙ্গেল ক্বাস একজন মানুষ। একজন মানুষ সবসময় অন্য মানুষকে রক্ষা করে।"

"করে না। কক্ষনো করে না—ম্যাঙ্গেল ক্বাস মানুষ নয়। দানব। আমাদের শেষ করে দেবে।"

"সম্ভবত।" আমি শান্ত গলায় বললাম, "কিন্তু আমি একজন মানুষ হয়ে আরেকজন মানুষকে এভাবে ফেলে চলে যেতে পারব না।"

"কী বলছ তুমি? কী বলছ?" মিত্তিকা চিৎকার করে উঠল, "তুমি কীরকম মানুষ?"

আমি মাথা নেড়ে স্কাউটশিপের দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম, নিচু গলায় বললাম, "আমি দুঃখিত মিত্তিকা। তুমি একটু আগেই বলেছ আমি অন্যরকম মানুষ।" আমি একটু থেমে যোগ করলাম, "মনে হয় আসলেই অন্যরকম। অন্যরকম নির্বোধ।"

আমি হঠাৎ করে আমার মায়ের ওপর এক ধরনের অভিমান অনুভব করলাম। বিচিত্র এক ধরনের অভিমান—কেন আমার মা আমাকে এ রকম একজন অর্থহীন ভালোমানুষ হিসেবে জন্ম দিয়েছিল?

AMARBOI.COM

৬

স্কাউটশিপের প্লাজমা ইঞ্জিন দুটো গুমগুম শব্দ করছে, আমরা উপগ্রহটা ঘুরে এসে এইমাত্র সেখান থেকে ফোবিয়ানের দিকে রওনা দিয়েছি। স্কাউটশিপের যোগাযোগ মডিউল ঠিকভাবে ফোবিয়ানের সাথে যোগাযোগ করে স্বয়ংক্রিয় ফিডব্যাক চালু করেছে নিশ্চিত হওয়ার পর আমি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছি। ঠিক এ রকম সময়ে আমি অনুভব করলাম আমার গলায় শীতল একটা ধাতব জিনিস স্পর্শ করেছে, জিনিসটা কী বুঝতে আমার অসুবিধে হল না—ম্যাঙ্গেল ক্বাসের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটি। আমার কাছে ব্যাপারটি খুব অস্বাভাবিক মনে হল না, আমি এ রকম কিছুর জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

ম্যাঙ্গেল ক্বাস শীতল গলায় বলল, "আহাম্মক কোথাকার।"

আমি কোনো কথা বললাম না। ম্যাঙ্গেল ক্বাস দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, "আমাকে যে দরজা খুলে স্কাউটশিপে ঢুকতে দিয়েছ সেটা প্রমাণ করে তুমি কত বড় আহাম্মক, কত বড় নির্বোধ।"

আমি এবারো কোনো কথা বললাম না। ম্যাঙ্গেল ক্বাস এবারে যেন একটু ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল, তার অস্ত্রটি দিয়ে আমার গলায় একটা খোঁচা দিয়ে বলল, "আমি এই মুহূর্তে তোমার মাথায় গুলি করে ঘিলু বের করে দিতাম। কেন সেটা করছি না জান?"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "না, জানি না।"

"কারণ তা হলে কন্ট্রোল প্যানেলটা তোমার মস্তিষ্কের টিস্যু আর রক্তে মাখামাখি হয়ে যাবে। বুঝেছ?"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "বুঝেছি।"

"আমি নির্বোধ মানুষ সহ্য করতে পারি না।"

আমি এবারে হাত দিয়ে ম্যাঙ্গেল ক্বাসের উদ্যত অস্ত্রটা অবহেলার সাথে সরিয়ে বললাম, "ম্যাঙ্গেল ক্বাস—তুমি খুব ভালো করে জান কেন তুমি আমাকে সহ্য করতে পার না। আমি নির্বোধ সে কারণে নয়।"

"তা হলে কেন?"

"কারণ আমি তোমার প্রাণ রক্ষা করেছি। সেজন্য।" আমি এবারে ঘুরে তার চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, "তুমি বুঝতে পারছ না কেন আমি তোমার প্রাণ রক্ষা করেছি। সেটা বুঝতে না পেরে তুমি ছটফট করছ।"

"আমি খুব ভালো করে বুঝতে পারছি আহাম্মক।"

"না, তোমার বোঝার ক্ষমতা নেই ম্যাঙ্গেল ক্বাস। তবে তোমার মানসিক শান্তির জন্য আমি সেটা তোমাকে বলব।"

ম্যাঙ্গেল ক্বাস সরু চোখে আমার চোখের দিকে তাকাল। আমি বললাম, "এই উপগ্রহের প্রাণীরা বুদ্ধিমান। যদি এরা বুদ্ধিমান না হত তা হলে ছয় জন মৃত মানুষের মস্তিষ্ক থেকে সকল তথ্য বের করে নিয়ে এসে তাদেরকে জীবন্ত মানুষের মতো ব্যবহার করতে পারত না। আমি নিশ্চিত এই প্রাণীদের সাথে আবার আমাদের দেখা হবে, যোগাযোগ হবে এমনকি বন্ধুত্ব হবে। আমি তাদের একটা ভুল ধারণা দিতে চাই নি—"

"কী ভুল ধারণা?"

"যে বিপদের সময় একজন মানুষ অন্য মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায় না।"

ম্যাঙ্গেল ক্বাস কোনো কথা না বলে আমার দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে রইল, তারপর হিসহিস করে বলল, "আমি তোমাকে শেষ করব। ইবান—" প্রত্যেকটা শব্দে আলাদা করে জোর দিয়ে বলল, "সারা জীবনের জন্য শেষ করব।"

আমি মাথা ঘুরিয়ে নিয়ন্ত্রণ প্যানেলের দিকে তাকিয়ে বললাম, "তাতে কিছু আসে-যায় না ম্যাঙ্গেল ক্বাস। আমি তোমাকে আগেই বলেছি, তাতে কিছু আসে-যায় না।"

স্কাউটশিপটা ফোবিয়ানের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে—মনিটরে ফোবিয়ান ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আমি অনেকটা অন্যমনস্কভাবে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম। এ রকম সময় হঠাৎ করে কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম। স্কাউটশিপে কেউ একজন কাঁদছে। পিছনে ঘুরে না তাকিয়েও আমি বুঝতে পারলাম সেটি মিত্তিকা। মিত্তিকা কেন কাঁদছে?

রিতুন ক্লিস আমার ঘরের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে আছেন—তিনি একটি হলোগ্রাফিক প্রতিচ্ছবি তাই তিনি দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন, প্রয়োজন হলে বসেও থাকতে পারেন। ভরশূন্য পরিবেশে একজন সত্যিকারের মানুষ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না বা বসে থাকতে পারে না—তাকে ভেসে থাকতে হয়। আমি ঘরের দেয়াল স্পর্শ করে তার সামনে স্থির হয়ে থাকার চেষ্টা করছিলাম। রিতুন ক্লিস আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। আমি বললাম, "মহামান্য রিতুন, আপনার কী মনে হয়? আমি কি ভুল করেছি?"

রিতুন ক্লিস মাথা নাড়লেন, বললেন, "না ইবান। তুমি ভুল কর নি।"

"আপনি কি সত্যিই বলছেন, নাকি আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলছেন?"

AMARBOI.COM

মহামান্য রিতুন হেসে মাথা নাড়লেন, "আমি যখন একজন সত্যিকার মানুষ ছিলাম তখনো মিছিমিছি কাউকে সান্ত্বনা দিই নি—এখন তো কোনো প্রশ্নই আসে না!"

"শুনে খুব শান্তি পেলাম। ম্যাঙ্গেল ক্বাসকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার পর থেকে খুব অশান্তিতে ছিলাম, শুধু মনে হচ্ছিল কাজটা কি ঠিক করলাম? বিশেষ করে যখন মিত্তিকার কান্নার কথা মনে হচ্ছিল তখন নিজেকে খুব অপরাধী মনে হচ্ছিল।"

"সেটাই খুব স্বাভাবিক।" মহামান্য রিতুন নরম গলায় বললেন, "পুরোপুরি এক শ ভাগ বিবেকহীন অপরাধী যখন হাইব্রিড মানুষ হয়ে একটা মহাকাশযান দখল করে ফেলে তখন সেটা খুব ভয়ের ব্যাপার হতে পারে। তুমি যে নিজেকে অপরাধী ভাবছ সেটা এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়।"

"কিন্তু—কিন্তু—মিত্তিকা এত ভেঙে পড়ল কেন?"

"সম্ভবত সে কিছু একটা জানে যেটা তুমি জান না। সে কিছু একটা অনুভব করতে পারছে যেটা তুমি অনুভব করতে পারছ না।"

আমি চমকে উঠে বললাম, "আপনি কী বলছেন মহামান্য রিতুন?"

রিতুন ক্লিস একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "আমি কিছুই বলছি না ইবান, আমি অনুমান করার চেষ্টা করছি।"

"আপনি কী অনুমান করেছেন?"

"মিত্তিকা অপূর্ব সুন্দরী একটি মেয়ে। ম্যাঙ্গেল ক্বাস নিঃসঙ্গ একজন পুরুষ—মানুষের আদিম প্রবৃত্তি অনুমান করা তো কঠিন কিছু নয়।"

আমি কয়েক মুহূর্ত কোনো কথা বলতে পারলাম না, হতবাক হয়ে রিতুন ক্লিসের দিকে তাকিয়ে রইলাম। শুকনো ঠোঁট জিভ দিয়ে ভিজিয়ে বললাম, "আপনি বলেছিলেন জীবনকে সহজভাবে নিতে। আমি নিজের জীবনকে সহজভাবে নিতে পারি কিন্তু মিত্তিকার জীবন?"

রিতুন ক্লিস কিছু বললেন না। আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। আমি কাতর গলায় বললাম, "ম্যাঙ্গেল ক্বাসকে যদি ঐ ভয়ঙ্কর উপগ্রহটাতে ছেড়ে আসতাম তা হলে আমরা বেঁচে যেতাম! আমি নিজের হাতে এই দানবটাকে নিয়ে এসেছি—"

রিতুন ক্লিস মাথা নাড়লেন, বললেন, "হ্যাঁ। এই দানবটাকে এখন তোমার নিজের হাতে খুন করতে হবে।"

"এটি কি একটি স্ববিরোধী কাজ হল না? একজন মানুষকে বাঁচিয়ে এনেছি তাকে খুন করার জন্য?"

"কোনো হিসেবে নিশ্চয়ই স্ববিরোধী। তুমি সেই হিসেবে যেও না ইবান।"

আমি অসহায়ভাবে মাথা নেড়ে বললাম—"কিন্তু ম্যাঙ্গেল ক্বাসকে খুন করা যায় না মহামান্য রিতুন। তার শরীর থেকে গুলি ফিরে আসে।"

"আমি দুঃখিত ইবান, মানুষকে কীভাবে খুন করতে হয় সে সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই।"

"কিন্তু তা হলে কেমন করে হবে?" আমি মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, "আপনার আমাকে সাহায্য করতে হবে মহামান্য রিতুন। দোহাই আপনাকে—"

"আমি একটি হলোগ্রাফিক প্রতিচ্ছবি ইবান। আমার অস্তিত্ব একটি নিউরাল নেটওয়ার্কে।"

"কিন্তু আপনি নিজেই বলেছেন আপনি সত্যিকার রিতুন ক্লিস। আপনি সর্বকালের সবচেয়ে প্রতিভাবান মানুষ—"

"সেটি অতিরঞ্জন। সেটি ভালবাসার কথা। আমি আসলে সাধারণ মানুষ।"

"কিন্তু আপনি যেটা জানেন সেটা নিশ্চিতভাবে জানেন, সেটা বিশ্বাস করেন। আপনি বলুন আমি কী করব?"

রিতুন ক্লিস দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বললেন, "ম্যাঙ্গেল ক্বাসের সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে সে হাইব্রিড মানুষ। সেই শক্তিকে তার দুর্বলতায় পরিণত করে দাও।"

"কীভাবে করব সেটা?"

"আমি জানি না। সেটা আমি জানি না ইবান। সেটা তোমাকে ভেবে বের করতে হবে।"

রিতুন ক্লিস চলে যাবার পরও আমি স্থির হয়ে এক জায়গায় ভেসে রইলাম। আমি এখন কী করব? ম্যাঙ্গেল ক্বাসের শক্তিকে কীভাবে আমি দুর্বলতায় পরিণত করব? আমি ঠাণ্ডা মাথায় পুরো ব্যাপারটি ভাবতে চাইলাম এবং হঠাৎ করে আবিষ্কার করলাম আমার হাঁটার ইচ্ছে করছে, আমি যখন কোনো কিছু নিয়ে ভাবি তখন আমি একাএকা হাঁটি। এই ভরশূন্য পরিবেশে ভেসে থাকা যায় কিন্তু হাঁটা যায় না—আমি তাই ভেসে ভেসে মহাকাশে শরীর ঠিক রাখার জন্য ছোট ব্যায়ামের ঘরটিতে গিয়ে হাজির হলাম। গোলাকার এই ঘরটিকে তার অক্ষের ওপর ঘুরিয়ে এর ভিতরে কম বা বেশি মাধ্যাকর্ষণ তৈরি করা যায়। দীর্ঘ মহাকাশ অভিযানে যেতে হলে সবাইকে সময় করে নিয়মমাফিক এখানে প্রবেশ করতে হয়। আমি দেয়ালে সুইচটি স্পর্শ করতেই গোলাকার ঘরটি ঘুরতে শুরু করল এবং আমি কিছুক্ষণের মাঝেই ঘরের দেয়ালে পা দিয়ে দাঁড়ালাম। দুই হাত ছড়িয়ে শরীরে রক্ত চলাচল করিয়ে আমি এবারে হাঁটতে শুরু করি, হাঁটতে হাঁটতে পুরো ব্যাপারটি একেবারে গোড়া থেকে ভাবা দরকার।

AMARBOI.COM

ম্যাঙ্গেল ক্বাস একজন হাইব্রিড মানুষ, যার অর্থ সে একই সাথে মানুষ এবং যন্ত্র। তার শরীরে কী ধরনের যান্ত্রিক ব্যাপার আছে আমি জানি না। কিন্তু তার মস্তিষ্কে একটা কপোট্রন বসানো আছে সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। তাই যখন তার দেহের তাপমাত্রা শীতল করে তাকে ক্যাপসুলে ভরে রাখা হয়েছিল সে তার ভিতর থেকে বের হতে পেরেছিল। একজন সাধারণ মানুষ অচেতন হয়ে যায় ম্যাঙ্গেল ক্বাস কখনো অচেতন হয় না—তার কপোট্রন তখন তার শরীরের দায়িত্ব নিয়ে নেয়। সেই কপোট্রনটি কতটুকু বুদ্ধিমান? যেহেতু তার মাথার মাঝে বসানো আছে সেটি বাড়াবাড়ি কিছু হতে পারে না, নিশ্চয়ই কাজ চালানোর মতো একটি কপোট্রন। যদি কোনোভাবে ম্যাঙ্গেল ক্বাসকে অচেতন করে তার কপোট্রনকে বের করে আনা যেত তা হলে কি বুদ্ধিমত্তার একটা প্রতিযোগিতা করা যেত না?

আমি গোলাকার ঘরের মাঝে আরো দ্রুত হাঁটতে থাকি এবং আমার হাঁটার সাথে তাল মিলিয়ে ঘরটি আরো দ্রুত ঘুরতে থাকে এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তিও বেড়ে যায়—আমার মনে হতে থাকে আমার শরীর ভারী হয়ে আসছে। ম্যাঙ্গেল ক্বাসকে অচেতন করতে হলে তাকে বিষাক্ত কোনো গ্যাস দিয়ে অচেতন করতে হবে কিংবা খাবারের মাঝে কোনো বিষাক্ত জিনিস মিশিয়ে দিতে হবে। কিন্তু এগুলো তৃতীয় শ্রেণীর অপরাধীর কাজ—আমি কেমন করে সেটা করব?

আমি আরো দ্রুত হাঁটতে থাকি এবং অনুভব করতে থাকি আমার শরীরের ওজন আরো বেড়ে যাচ্ছে—মাধ্যাকর্ষণ শক্তি নিশ্চয়ই অনেকগুণ বেড়ে গেছে। আমার হঠাৎ এক ধরনের ছেলেমানুষি ঝোঁক চাপল, আমি আমার শারীরিক ক্ষমতা পরীক্ষা করার জন্য আরো দ্রুত হাঁটতে থাকি এবং দেখতে দেখতে আমার শরীর সীসার মতো ভারী হয়ে আসে, আমার মাথা

হালকা লাগতে থাকে এবং আমার মনে হয় আমি বুঝি অচেতন হয়ে পড়ব। আমি তবুও দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে টেনে নিতে থাকি—আমার নিশ্বাস ভারী হয়ে আসে, আমার সারা শরীর ঘামতে থাকে। আমি পাথরের মতো ভারী দুটি পা'কে আরো দ্রুত টেনে নিতে থাকি, ধাতব দেয়ালে পায়ের শব্দ প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসতে থাকে—আমার মনে হতে থাকে লাল একটা পরদা বুঝি চোখের সামনে নেমে আসতে চাইছে, তবু আমি থামলাম না, আমি ছুটেই চললাম।

হঠাৎ করে কোথায় জানি কর্কশ স্বরে একটা এলার্ম বেজে ওঠে এবং একটা লাল বাতি জ্বলতে-নিভতে শুরু করে। আমি সাথে সাথে ফোবির কথা শুনতে পেলাম, "মহামান্য ইবান, আপনি থামুন না হয় অচেতন হয়ে যাবেন।"

আমি বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠে বললাম, "কী বললে তুমি ফোবি? কী বললে?"

"বলেছি আপনি এক্ষুনি যদি না থামেন তা হলে অচেতন হয়ে যাবেন, আপনার মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহ কমে আসছে।"

"অচেতন? তুমি বলছ অচেতন হয়ে যাব?"

"হ্যাঁ।"

"ফোবি আমি দেখতে চাই আমি অচেতন না হয়ে কতদূর যেতে পারি—"

"কেন মহামান্য ইবান?"

"কারণ আছে, একটা কারণ আছে।"

"কী কারণ?"

"সময় হলেই তোমাকে বলব। এখন আমাকে আরো বেশি মাধ্যাকর্ষণে নিয়ে চল—আরো বেশি—"

"ব্যাপারটি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। আপনি যে ভয়ঙ্কর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিতে দাঁড়িয়ে আছেন, বেশিরভাগ মানুষ এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। তার অনেক আগেই অচেতন হয়ে পড়বে।"

AMARBOI.COM

আমি হিংস্রভাবে একটু হেসে বললাম, "আমি সেটাই চাই ফোবি, সব মানুষ যে মাধ্যাকর্ষণ বলে অচেতন হয়ে পড়বে আমি সেখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে চাই।"

"আমি বুঝতে পারছি না মহামান্য ইবান।"

"তোমার বোঝার দরকার নেই—তুমি মূল তথ্যকেন্দ্র থেকে সব তথ্য নিয়ে এসে আমাকে সাহায্য কর—ভয়ঙ্কর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মাঝে আমাকে স্থির থাকার শক্তি এনে দাও। মানুষের শরীরের যেটুকু শক্তি থাকতে পারে, যেটুকু সহ্য করার ক্ষমতা থাকতে পারে তার পুরোটুকু আমার মাঝে এনে দাও। আমাকে পাথরের মতো শক্ত করে দাও।"

"সেজন্য সময়ের প্রয়োজন মহামান্য ইবান। রাতারাতি মানুষকে অতিমানবে রূপান্তর করা যায় না।"

"আমার কতটুকু সময় আছে আমি জানি না, কিন্তু আমি জানি নষ্ট করার জন্য এক মাইক্রোসেকেন্ডও নেই।"

ফোবি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "বেশ।"

আমি মুখ হাঁ করে বড় বড় নিশ্বাস নিয়ে গোলাকার ঘরটিতে নিজেকে টেনে নিতে থাকি—আমাকে যেভাবেই হোক জ্ঞান না হারিয়ে থাকতে হবে। মানুষের পক্ষে যেটা অসম্ভব আমাকে সেই অসম্ভব শক্তি অর্জন করতে হবে। মিত্তিকাকে বাঁচানোর এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

ঘুম থেকে উঠে আমি মিত্তিকাকে খুঁজে বের করলাম। মহাকাশযানের এক নির্জন কোনায় গোল জানালার পাশে শুয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। বাইরে অসংখ্য নক্ষত্র কালো মহাকাশের মাঝে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। মহাকাশযানটি নিউট্রন স্টারের কাছাকাছি চলে আসছে, আমরা বুঝতে পারছি না কিন্তু মহাকাশযানটির গতিবেগ দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। নিউট্রন স্টারটি এত ছোট যে এটিকে দেখা যাচ্ছে না। দূরে একটি নেবুলা তার সমস্ত বিচিত্র রূপ নিয়ে ফুটে আছে। আমি মিত্তিকার পাশে গিয়ে নরম গলায় ডাকলাম, "মিত্তিকা।"

সে ঘুরে আমার দিকে তাকাল, কিছু বলল না।

আমি হাসার চেষ্টা করে বললাম, "তুমি আমার ওপর খুব রেগে আছ তাই না?"

মিত্তিকা এবারেও কোনো কথা বলল না। আমি অপরাধীর মতো বললাম, "তোমার সাথে আমি একটু কথা বলতে চাইছিলাম মিত্তিকা।"

মিত্তিকা বড় বড় চোখে আমার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুতভাবে একটু হেসে বলল, "তোমার মতো একজন মহাপুরুষ আমার মতো তুচ্ছ একজন মানুষের সাথে কথা বলবে?"

আমি একটু হতচকিত হয়ে বললাম, "তুমি কী বলছ মিত্তিকা?"

"আমি ঠিকই বলছি। তুমি অন্য ধরনের মানুষ—তুমি দশজন সাধারণ মানুষের মতো নও— বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বড় বড় জিনিস নিয়ে তোমাকে ভাবতে হয়। মহাজাগতিক প্রাণীরা যেন মানুষকে ভুল না ভাবে সেজন্য আমার মতো তুচ্ছ একজন মানুষকে তুমি আবর্জনার মতো—জঞ্জালের মতো ফেলে দাও।"

"কী বলছ তুমি মিত্তিকা?"

মিত্তিকা গলার স্বরে শ্লেষ ফুটিয়ে এনে বলল, "আমি ভুল বলেছি? নিশ্চয়ই ভুল বলেছি। আমি তুচ্ছ সাধারণ অশিক্ষিত মূর্খ একজন মেয়ে, আমি কি এই মহাজগতের বড় বড় জিনিস বুঝতে পারি? পারি না—"

AMARBOI.COM

"মিত্তিকা—"

মিত্তিকা মুখ ফিরিয়ে বলল, "আমাকে একা থাকতে দাও ইবান। দোহাই তোমার—"

"কিন্তু মিত্তিকা তোমার সাথে আমার কথা বলতেই হবে।"

"না ইবান।" মিত্তিকা মাথা নেড়ে বলল, "আমার সাথে তোমার কথা বলার কিছু নেই ইবান। আমাকে একা থাকতে দাও। দোহাই তোমার।"

মিত্তিকা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তার চোখ মুছে নিল—আমার সামনে সে কাঁদতেও রাজি নয়।

আমি ভেসে ভেসে নিয়ন্ত্রণ কক্ষে ফিরে এলাম, হঠাৎ করে আমার নিজেকে একজন সত্যিকারের অপরাধী বলে মনে হতে থাকে।

নিয়ন্ত্রণ কক্ষে ম্যাঙ্গেল ক্বাস চিন্তিত মুখে বসে ছিল, আমাকে দেখে সে সরু চোখে বলল, "ইবান, তোমার সাথে আমার কথা রয়েছে।"

আমি দেখতে পেলাম সে কোমরে একটা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ঝুলিয়ে রেখেছে। আমি কাছাকাছি গিয়ে বললাম, "কী কথা?"

"তুমি জান আমি উপগ্রহে আটকা পড়ে থাকা আমার দলের লোকজনকে উদ্ধার করে আনতে চেয়েছিলাম।"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "জানি।"

"কিন্তু দেখতেই পাচ্ছ আমি আমার লোকজনকে উদ্ধার করতে পারি নি।" ম্যাঙ্গেল ক্বাস একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "তার মানে বুঝতে পারছ?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "বুঝতে পারছি। তোমাকে আবার নতুন করে তোমার দল দাঁড়া করাতে হবে।"

ম্যাঙ্গেল ক্বাস একটু চমকে উঠে আমার দিকে তাকাল, সে আমার কাছে এই উত্তর আশা করে নি। কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে শীতল চোখে তাকিয়ে থেকে বলল, "হ্যাঁ। তুমি ঠিকই বলেছ, আমাকে আবার নতুন করে আমার দল তৈরি করতে হবে। দল তৈরি করার জন্য আমার কিছু মানুষ দরকার।"

আমি মুখে বিদ্রূপের একটা হাসি ফুটিয়ে বললাম, "তোমার কিছু মানুষ দরকার নেই, তোমার দরকার কিছু দানবের।"

ম্যাঙ্গেল ক্বাসের মুখ পাথরের মতো শক্ত হয়ে উঠল, সে কঠোর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি তোমার সাহস দেখে মাঝে মাঝে বেশ অবাক হয়ে যাই। বেশি সাহস কারা দেখায় জান।"

"জানি।"

"কারা?"

"দুই ধরনের মানুষ—যারা সাহসী এবং যারা নির্বোধ। আমি জানি আমি সাহসী নই—কাজেই আমি নিশ্চয়ই নির্বোধ।" কথা শেষ করে আমি দাঁত বের করে হাসার ভঙ্গি করলাম।

"না, তুমি নির্বোধ নও। আমি প্রায় মন স্থির করে ফেলেছি যে তোমাকে আমি আমার দলে নেব।"

আমি ভয়ানক চমকে উঠলাম, একজন পুরোদস্তুর দস্যু আমাকে তার দলে নেবে সে ধরনের কথা আমি শুনতে পাব কখনো কল্পনা করি নি। আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম—মানুষটি কি আমার সাথে ঠাট্টা করছে? আমি কয়েকবার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত বললাম, "তুমি কী বলছ?"

"তুমি শুনেছ আমি কী বলেছি। এখন তুমি ভাবছ ব্যাপারটা অসম্ভব। তোমার মতো একজন নীতিবান সৎ ভালোমানুষ কেমন করে দস্যুদলে যোগ দেবে? কিন্তু ব্যাপারটা আসলে অন্যরকম।"

"অন্যরকম?"

"হ্যাঁ। সেই বিংশ শতাব্দীতে মানুষ আবিষ্কার করেছিল মস্তিষ্কের সামনের দিকে একটা অংশ রয়েছে যেটি মানুষের নৈতিকতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। মস্তিষ্কের ফ্রন্টাল লোবে ট্রান্সক্র্যানিয়াল ম্যাগনেটিক স্টিমুলেটর[৩৬] দিয়ে সেই অংশটি নিখুঁতভাবে খুঁজে বের করা হয়েছে। আমি সেই অংশটির অবস্থান জানি—মস্তিষ্কের এই অংশটি নষ্ট করে দেওয়া হলে মানুষকে মুক্তি দেওয়া হয়।"

"মুক্তি?"

"হ্যাঁ। তোমাদের তথাকথিত নৈতিকতার বন্ধন থেকে মুক্তি। একবার যখন মুক্তি পাবে তখন তোমাদের আর ভালো কাজ করতে হবে না, মহত্ত্ব দেখাতে হবে না, নৈতিকতা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। একেবারে ঠাণ্ডা মাথায় তখন তুমি মানুষ খুন করতে পারবে।"

আমি কিছুক্ষণ বিস্ফারিত চোখে ম্যাঙ্গেল ক্বাসের দিকে তাকিয়ে রইলাম, মানুষটির কথাবার্তায় রহস্য বা বিদ্রূপের এতটুকু চিহ্ন নেই। সে যে কথাটি বিশ্বাস করে ঠিক সেই কথাটিই বলছে। ম্যাঙ্গেল ক্বাস হাত দিয়ে দেখিয়ে বলল, "আমি ছোট একটা যন্ত্র তৈরি

AMARBOI.COM

করিয়েছি, কপালের ওপর বসিয়ে দিতে হয়, মাথার তিনদিক দিয়ে স্ক্যান করে মস্তিষ্কের মাঝে নির্দিষ্ট অংশটি খুঁজে বের করে। তারপর কপালে ড্রিল করে মস্তিষ্কে ঢুকে যায়, সেখানে নির্দিষ্ট অংশটিতে উচ্চ চাপের বিদ্যুৎ দিয়ে নিউরনগুলোকে ঝলসে দেওয়া হয়। চব্বিশ ঘণ্টার মাঝে তুমি পুরোপুরি অন্য মানুষ হয়ে সেরে উঠবে।" ম্যাঙ্গেল ক্বাস কথা শেষ করে আমার দিকে তাকিয়ে মধুরভাবে হাসার চেষ্টা করল।

আমি হঠাৎ অনুভব করলাম ভয়ের একটা শীতল স্রোত আমার মেরুদণ্ড দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। ম্যাঙ্গেল ক্বাস আমার আতঙ্কটি বুঝতে পারল, মুখে একটা হাসি ফুটিয়ে মাথা নেড়ে বলল, "আসলে ব্যাপারটি তোমার কাছে যত ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে সেটা মোটেও তত ভয়ঙ্কর নয়। পুরো ব্যাপারটি দুই ঘণ্টার মাঝে শেষ হয়ে যায়, মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট অংশটা খুঁজে বের করতে এক ঘণ্টা, মাথায় ড্রিল করে ফুটো করতে এক ঘণ্টা। নিউরনগুলো চোখের পলকে ঝলসে দেওয়া যায়। সেরে উঠতে চব্বিশ ঘণ্টার মতো সময় লাগে। পুরো ব্যাপারে সেটাই সবচেয়ে সময়সাপেক্ষ। তোমার কাছে এখন মনে হচ্ছে অন্যায় কাজ করা খুব কঠিন, কিন্তু তুমি দেখবে কত সহজ।"

আমি কোনো কথা না বলে বিস্ফারিত চোখে ম্যাঙ্গেল ক্বাসের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ম্যাঙ্গেল ক্বাস জিভ বের করে ঠোঁট দুটো ভিজিয়ে নিয়ে প্রত্যেকটি শব্দ আলাদাভাবে উচ্চারণ করে বলল, "ভূমিকা শেষ হয়েছে, এবারে আসল কাজের কথায় আসা যাক।" সে একটা নিশ্বাস নিল, তারপর নিজের নখের দিকে তাকাল, তারপর ঘুরে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "ইবান, আমি বড় নিঃসঙ্গ।"

আমি ভিতরে শিউরে উঠলেও বাইরে শান্ত মুখে দাঁড়িয়ে রইলাম। ম্যাঙ্গেল ক্বাস মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "তোমার মহাকাশযান স্কাবিয়ানের মেয়েটিকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। নামটিও খুব সুন্দর, মিত্তিকা।"

ম্যাঙ্গেল ক্বাস একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "আমি ঠিক করেছি মিত্তিকাকে আমার সঙ্গী করে নেব। কী বল?"

"তোমার মতো একজন দানবের চরিত্রের সাথে মানানসই একটা সিদ্ধান্ত।"

"ম্যাঙ্গেল ক্বাস কোমরে বেঁধে রাখা অস্ত্রটি খুলে এবারে হাতে নিয়ে বলল, "তোমার নিজের মঙ্গলের জন্য বলছি ইবান, সীমা অতিক্রম কোরো না। ব্যাপারটি নিয়ে দুঃখিত হবারও সুযোগ পাবে না।"

"তুমি আমার মতামত জানতে চেয়েছিলে—"

"আসলে মতামত জানতে চাই নি, তোমাকে জানিয়ে রাখছিলাম। তোমার আসল সমস্যাটি কোথায় জান?"

"ঠিক কোন সমস্যার কথা বলছ জানালে হয়তো বলতে পারতাম।"

"না, পারতে না। কারণ তুমি জান না। ন্যায়-অন্যায় অপরাধ-মহত্ত্ব এসবের সংজ্ঞার পরিবর্তন হয়েছে। মস্তিষ্কের একটি ছোট অংশ আছে কি নেই সেটা হচ্ছে অপরাধী এবং নিরপরাধের মাঝে পার্থক্য। যার সেই ছোট অংশ নেই তাকে কি আর অপরাধী হিসেবে ঘৃণা করা যায়, নাকি শাস্তি দেওয়া যায়?"

আমি কোনো কথা বললাম না। ম্যাঙ্গেল ক্বাস কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "প্রাচীনকালে অপরাধী ছিল, নীতিবান মানুষও ছিল, এখন ওসব কিছু নেই। যেমন মনে কর মিত্তিকার কথা। মেয়েটিকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে—কিন্তু আমি কি তাকে জোর করে আমার সঙ্গী করব?" ম্যাঙ্গেল ক্বাস নিশ্বাস ফেলে বলল, "কখনোই না। আমি তার মস্তিষ্কে

AMARBOI.COM

ছোট একটা অস্ত্রোপচার করব, মিত্তিকা তখন তার চারপাশের জগৎকে নতুন চোখে দেখবে।"

ম্যাঙ্গেল ক্বাস হাত দিয়ে নিজের বুক স্পর্শ করে বলল, "মিত্তিকার তখন মনে হবে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সবচেয়ে সুদর্শন সবচেয়ে আকর্ষণীয় মানুষ হচ্ছে ম্যাঙ্গেল ক্বাস। পতঙ্গ যেভাবে আগুনের দিকে ছুটে যায়, গ্রহাণু যেভাবে ব্ল্যাকহোলের দিকে ছুটে যায়, ঠিক সেভাবে সে আমার কাছে ছুটে আসবে। বুঝেছ?"

আমি মাথা নেড়ে জানালাম যে আমি বুঝেছি।

ঠিক এ রকম সময়ে মহাকাশযানটি একটু কেঁপে উঠল, ম্যাঙ্গেল ক্বাসের ভুরু একটু কুঞ্চিত হয়ে উঠল, সে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

"আমরা নিউট্রন স্টারের মাধ্যাকর্ষণের কাছাকাছি চলে আসছি। ফোবিয়ানের গতিবেগ বেড়ে যাচ্ছে, এই ভয়ঙ্কর গতিবেগের জন্য এটা মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে। আমরা নিউট্রন স্টারের মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে ব্যবহার করে গ্যালাক্সির এই অংশ পাড়ি দেব।"

"স্লিংশট৩৭ প্রক্রিয়া?"

"হ্যাঁ।"

"অত্যন্ত অস্থিতিশীল সময়?"

"খানিকটা।"

"তোমার হিসাবে ভুল হলে নিউট্রন স্টারে গিয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে।"

আমি শান্ত গলায় বললাম, "হিসাবে ভুল হবে না। ফোবিয়ান পঞ্চম মাত্রার মহাকাশযান, এর নিউরাল নেটওয়ার্ক হিসাবে ভুল করে না।"

ম্যাঙ্গেল ক্বাস উঠে দাঁড়াতে গিয়ে খানিকদূর ভেসে গেল, ঘুরেফিরে এসে বলল, "ইবান, এই ভরশূন্য পরিবেশ আমার আর ভালো লাগছে না। তুমি মহাকাশযানটিকে অক্ষের ওপর ঘুরিয়ে মাধ্যাকর্ষণ ফিরিয়ে এনো।"

আমি বললাম, "আনব। নিশ্চয়ই আনব।"

ম্যাঙ্গেল ক্বাস চলে যাবার পর আমি নিয়ন্ত্রণ প্যানেলের সামনে বসে দীর্ঘ সময় নিয়ে ফোবিয়ানের যাত্রাপথ পর্যবেক্ষণ করলাম। ফোবিয়ানের জ্বালানি সীমিত কাজেই যাত্রাপথে প্রতিটি বড় গ্রহ, নিরাপদ নক্ষত্র বা নিউট্রন স্টারকে ব্যবহার করা হয়, কোনো বিপদ না ঘটিয়ে যতটুকু সম্ভব কাছাকাছি যাওয়া হয়, প্রবল মহাকর্ষণে ফোবিয়ানের গতিবেগ বাড়িয়ে নেওয়া হয়। গতিপথটি খুব যত্ন করে ছক করে নিতে হয় যেন নির্দিষ্ট দিকে নির্দিষ্ট বেগে যাওয়া যায়। ফোবিয়ানের নিউরাল নেটওয়ার্ক হিসাবে কোনো ভুল করবে না সে ব্যাপারে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত, তবুও পুরোটা নিজের চোখে দেখতে চাইলাম। ম্যাঙ্গেল ক্বাসের দলকে উদ্ধার করার জন্য খানিকটা ঘুরে আসতে হয়েছে। জ্বালানি নষ্ট না করে সেই ক্ষতিটুকু পূরণ করার জন্য এই নিউট্রন স্টারের বেশ কাছাকাছি যেতে হচ্ছে, যে ব্যাপারটি আমার ঠিক পছন্দ হচ্ছে না। এখান থেকে যে পরিমাণ বিকিরণ হচ্ছে সেটা ফোবিয়ান কতক্ষণ সহ্য করতে পারবে কে জানে। আমি নিয়ন্ত্রণ প্যানেলে নিউট্রন স্টারের অবস্থানটুকু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে একটা নিশ্বাস ফেললাম, এর আকর্ষণে মহাকাশযানটির গতিবেগ প্রতি মুহূর্তে বেড়ে যাচ্ছে। মহাকাশযানে এক ধরনের কম্পন অনুভব করা যাচ্ছে, যতই সময় যাচ্ছে সেটা ততই বেড়ে যাচ্ছে। এ রকম সময়ে যদি কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে যায় সেটা নিয়ন্ত্রণ করা খুব কঠিন হবে।

আমি নিয়ন্ত্রণ প্যানেল থেকে সরে এসে ব্যায়াম করার ঘরটিতে ঢুকে সেটা ঘুরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলাম। দেখতে দেখতে ঘূর্ণি বেড়ে গেল, আমি সাথে সাথে দেয়ালে এসে দাঁড়ালাম। কিছুক্ষণের মাঝেই আমার দেহের ওজন বেড়ে যেতে শুরু করে, আমি আবার আমার শরীরের সহ্য করার ক্ষমতা পরীক্ষা করে দেখতে শুরু করে দিই।

কিছুক্ষণের মাঝেই আমার শরীর সীসার মতো ভারী হয়ে আসে, আমার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, আমার চোখের সামনে লাল পরদা কাঁপতে থাকে, আমি কোনোমতে পা টেনে টেনে দৌড়াতে থাকি, আমি টের পাই আমার সমস্ত শরীর ঘামতে শুরু করেছে। যখন মনে হল আমি লুটিয়ে মাটিতে পড়ে যাব ঠিক তখন আমার কানের কাছে ফোবির কথা শুনতে পেলাম, "মহামান্য ইবান।"

আমি হাঁপাতে হাঁপাতে কোনোভাবে বললাম, "বল ফোবি।"

"আপনি আবার নিরাপত্তার সীমা অতিক্রম করছেন।"

"ইচ্ছে করেই করছি ফোবি।"

"আমি এখনো বুঝতে পারছি না কেন।"

"সময় হলেই বুঝবে। এখন আমার একটা কথা শোন।"

"বলুন মহামান্য ইবান।"

"আমার কথাটি পুরোপুরি গোপনীয়। আর কেউ কি শুনতে পাবে?"

"না মহামান্য ইবান, আর কেউ শুনতে পাবে না।"

"বেশ, তা হলে শোন, আমি তোমাকে সপ্তম মাত্রার একটি জরুরি নির্দেশ দিচ্ছি।"

ফোবি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "সপ্তম মাত্রার নির্দেশ? আপনি কি সত্যিই বলছেন?"

"আমি সত্যিই বলছি।"

"সপ্তম মাত্রার নির্দেশে মহাকাশযানকে ধ্বংস করার পর্যায়ে নেওয়া হয়।"

"হ্যাঁ। আমি জানি। অধিনায়ক হিসেবে আমার সেই ক্ষমতা আছে।"

"আপনি কেন সপ্তম মাত্রার জরুরি নির্দেশ দিচ্ছেন মহামান্য ইবান?"

"তুমি নিশ্চয়ই জান ম্যাঙ্গেল ক্বাস মিত্তিকার মস্তিষ্কে একটা অস্ত্রোপচার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।"

"জানি। অত্যন্ত দুঃখজনক একটি সিদ্ধান্ত।"

"সে যদি সত্যিই অস্ত্রোপচার শুরু করে তোমাকে এই আদেশ কার্যকর করতে হবে। যদি না করে তা হলে প্রয়োজন নেই।"

"আমি কীভাবে আদেশ কার্যকর করব?"

"ফোবিয়ানের গতিবেগ কমিয়ে আনতে শুরু করবে।"

"তার জন্য ইঞ্জিন চালু করার প্রয়োজন রয়েছে।"

"আমি তোমাকে ইঞ্জিন চালু করার অনুমতি দিচ্ছি।"

ফোবিয়ান দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বলল, "ফোবিয়ানের গতিবেগ কমিয়ে আনার অর্থ আমরা নিউট্রন স্টারে গিয়ে আঘাত করব।"

"হ্যাঁ, আমার ধারণা আত্মহত্যার জন্য সেটি চমৎকার একটি উপায়।"

"আপনি আত্মহত্যা করতে চাইছেন মহামান্য ইবান?"

"না, চাইছি না। তবে অনেক সময় কিছু একটা না চাইলেও সেটা করতে হয়।"

ফোবি আবার দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বলল, "আপনি সত্যিই এটা করতে চাইছেন?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ। ফোবি আমি চাইছি।"

"বেশ, তবে আমার কিছু সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রয়োজন। কী হারে গতিবেগ কমাব?"

"আমি বলছি, তুমি মন দিয়ে শোন।"

আমি আমার পাথরের মতো ভারী দেহকে টেনে নিতে নিতে ফোবিকে নির্দেশ দিতে শুরু করলাম।

৭

মাত্র কিছুক্ষণ হল আমি ফোবিয়ানের খানিকটা মাধ্যাকর্ষণ বল ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য পুরো মহাকাশযানটিকে তার অক্ষের ওপর ঘোরানো শুরু করেছি। এত বড় মহাকাশযানটিকে ঘোরাতে প্রচুর শক্তির প্রয়োজন, খুব ধীরে ধীরে সেটা ঘুরতে শুরু করেছে। প্রায় সাথে সাথেই আমরা সবাই মহাকাশযানের দেয়ালে দাঁড়াতে শুরু করেছি। যতক্ষণ ভেসেছিলাম বুঝতে পারি নি এখন বুঝতে পারছি যে ফোবিয়ান আসলে ভয়ানকভাবে কাঁপছে, নিউট্রন স্টারের প্রবল মহাকর্ষ বলটি এই মহাকাশযানের ওপর বেশ ভয়ঙ্কর চাপ সৃষ্টি করেছে। আমি নিয়ন্ত্রণ প্যানেলে ফোবিয়ানের যাত্রাপথটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলাম, তখন পায়ের শব্দ শুনে ঘুরে তাকিয়ে আমি ভয়ানকভাবে চমকে উঠলাম। ম্যাঙ্গেল ক্বাস সৈনিকদের মতো পা ফেলে হেঁটে আসছে, তার পিছনে দুজন অপরিচিত মানুষ, তারা মিত্তিকাকে ধরে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে আসছে।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, "কী হচ্ছে এখানে?"

ম্যাঙ্গেল ক্বাস শীতল গলায় বলল, "বিশেষ কিছু নয়। এই মহাকাশযানের নতুন দুজন সদস্যকে তোমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিই অধিনায়ক ইবান।"

মিত্তিকাকে ধরে রাখা দুজন মানুষ অদ্ভুত একটা ভঙ্গিতে হাসার চেষ্টা করল, তাদের চোখের দৃষ্টি দেখে তাদেরকে স্বাভাবিক মানুষ বলে মনে হল না। এদেরকে আমি আগে কখনো দেখি নি, নিশ্চয়ই শীতল কক্ষ থেকে তাদের জাগিয়ে আনা হয়েছে। আরেকটু কাছে এলে আমি দেখতে পেলাম দুজনের কপালের ঠিক একই জায়গায় একটা ক্ষত, ম্যাঙ্গেল ক্বাস নিশ্চয়ই তার অস্ত্রোপচার করে এই দুজন মানুষকে ঘাঘু অপরাধীতে পাল্টে নিয়েছে।

ম্যাঙ্গেল ক্বাস আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিল, "এরা হচ্ছে ক্রদ এবং মুশ। একসময়ে নিরাপত্তাবাহিনীর সদস্য ছিল, এখন আমার একান্ত অনুগত সদস্য। তাই না?"

ম্যাঙ্গেল ক্বাসের কথার উত্তরে দুজনেই অনুগত গৃহপালিত রোবটের মতো মাথা নাড়ল। ম্যাঙ্গেল ক্বাস মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "আমি তাদেরকে তাদের প্রথম দায়িত্ব দিয়েছি, দেখ তারা কী উৎসাহ নিয়ে দায়িত্ব পালন করছে।"

আমি একটা নিশ্বাস নিয়ে বললাম, "দায়িত্বটি কী?"

"মিত্তিকাকে চিকিৎসা কক্ষে নিয়ে অপারেশন থিয়েটারে শুইয়ে দেওয়া। আমার তৃতীয় অস্ত্রোপচারের জন্য প্রস্তুত করা।"

মিত্তিকা আতঙ্কে চিৎকার করে ঝটকা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না, ক্রদ এবং মুশ শক্ত করে তাকে ধরে রেখেছে। তাদের মুখে একটা উল্লাসের ছায়া পড়ল, মনে হতে লাগল পুরো ব্যাপারটিতে তাদের খুব আনন্দ হচ্ছে। আমি কঠোর গলায় বললাম, "মিত্তিকাকে ছেড়ে দাও।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রুদ এবং মুশ এমনভাবে আমার দিকে তাকাল যেন আমি একটা অত্যন্ত মজার কথা বলেছি, তারা একে অপরের দিকে তাকাল এবং উচ্চৈঃস্বরে হাসতে শুরু করল। আমি গলার স্বর উঁচু করে বললাম, "তোমরা বুঝতে পারছ না। তোমাদের মাথায় এই মানুষটি অস্ত্রোপচার করেছে? এখন তোমাদের ভিতরে কোনো ন্যায়-অন্যায় বোধ নেই। তোমাদের দিয়ে ম্যাঙ্গেল ক্বাস ভয়ঙ্কর অন্যায় করিয়ে নিচ্ছে।"

ক্রুদ হাত দিয়ে তার ক্ষতস্থান স্পর্শ করে মুখে জোর করে এক ধরনের হাসি ফুটিয়ে বলল, "অস্ত্রোপচার যদি করে থাকে সেটি আমাদের ভালোর জন্যই করেছে।"

মুশ মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ, ভালোর জন্যই করেছে।"

দুজনে মিলে মিত্তিকাকে টেনে নিতে নিতে বলল, "এখন আমরা এই মেয়েটার মাথায় অস্ত্রোপচার করব, তখন সেও আমাদের একজন হয়ে যাবে।"

মিত্তিকা আবার নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "ইবান আমাকে বাঁচাও।"

মিত্তিকার চোখের দিকে তাকিয়ে আমার বুক ভেঙে গেল, আমি সাহস দিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু ম্যাঙ্গেল ক্বাস আমাকে সে সুযোগ দিল না, মিত্তিকার দিকে তাকিয়ে বলল, "যে বেঁচে আছে তাকে নতুন করে বাঁচানো যায় না মেয়ে।"

মিত্তিকা কিছু একটা বলতে চাইছিল ক্রুদ এবং মুশ তাকে সে সুযোগ দিল না, একটি ঝটকা মেরে তাকে টেনে নিয়ে গেল। আমি শুনতে পেলাম সে হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো চিৎকার করে কাঁদছে, মহাকাশযানে তার কান্নার শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল। ম্যাঙ্গেল ক্বাস মাথা নেড়ে বলল, "বোকা মেয়ে, অবুঝ মেয়ে।"

আমি ম্যাঙ্গেল ক্বাসের দিকে হিংস্র চোখে তাকিয়ে রইলাম, ম্যাঙ্গেল ক্বাস আমাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে বলল, "আশা করছি তুমি কোনোরকম নির্বুদ্ধিতা করবে না। তুমি জান আমার শরীরের ভিতরেও বিস্ফোরক রয়েছে, আমি আমার আঙুল দিয়ে একটা এলাকা ধ্বংস করে দিতে পারি।"

"আমি জানি।"

"আমার শরীরের ওপর বায়োমারের আস্তরণ রয়েছে, কোনো বিস্ফোরক দিয়ে সেটা তুমি ছিন্ন করতে পারবে না।

"আমি জানি।"

"আমি হাইব্রিড মানুষ। আমার মস্তিষ্কে কপোট্রন রয়েছে, আমাকে কখনো থামিয়ে রাখা যায় না, আমার জৈবিক শরীরকে অচেতন করলেও কপোট্রন শরীরের দায়িত্ব নিয়ে নেয়।"

"আমি জানি।"

"বর্তমান প্রযুক্তি আমাকে থামাতে পারবে না। কাজেই আমার বিরুদ্ধে যাওয়ার চেষ্টা কোরো না।"

আমি কোনো কথা বললাম না। ম্যাঙ্গেল ক্বাস নিচু গলায় বলল, "তোমার আমাকে সাহায্যও করতে হবে না ইবান, কিন্তু আমার বিরোধিতা কোরো না।"

আমি এবারেও কোনো কথা বললাম না। ম্যাঙ্গেল ক্বাস মুখে বিচিত্র এক ধরনের হাসি ফুটিয়ে বলল, "তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ ইবান একসময় তুমি আমার একজন ঘনিষ্ঠ মানুষ হবে। তুমি, আমি আর মিত্তিকা খুব পাশাপাশি থাকব।"

আমি এবারেও কোনো কথা বললাম না, ম্যাঙ্গেল ক্বাস চোখে বিদ্রুপ ফুটিয়ে বলল, "কিছু একটা বল ইবান।"

"তুমি গোল্লায় যাও ম্যাঙ্গেল ক্বাস।"

ম্যাঙ্গেল ক্বাসের চোখ হঠাৎ হিংস্র শ্বাপদের মতো জ্বলে উঠল, আমার মুহূর্তের জন্য মনে হল সে আমাকে হত্যা করবে। কিন্তু সে নিজেকে সামলে নিল, তারপর মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "তবে তাই হোক ইবান।"

ম্যাঙ্গেল ক্বাস ঘুরে চিকিৎসা কক্ষের দিকে রওনা দিতেই হঠাৎ পুরো ফোবিয়ান থরথর করে কেঁপে উঠল। আমি দেয়াল ধরে নিজেকে সামলে নিলাম, সম্ভবত মিত্তিকাকে অপারেশন থিয়েটারে জোর করে শোয়ানো হয়েছে এবং ফোবি আমার সপ্তম মাত্রার নির্দেশমতো ফোবিয়ানের গতি কমিয়ে আনছে। আমি নিয়ন্ত্রণ প্যানেলের দিকে তাকালাম, সেখানে একটি লাল আলো জ্বলে উঠে আবার নিভে গেল। আমি মূল ইঞ্জিন দুটোর গুঞ্জন শুনতে পেলাম। ম্যাঙ্গেল ক্বাস আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল, "কী হচ্ছে এখন?"

"আমরা নিউট্রন স্টারের কাছাকাছি চলে আসছি। ফোবিয়ানের গতিবেগ নিয়ন্ত্রণের মাঝে রাখার জন্য যাত্রাপথকে একটু পরিবর্তন করতে হচ্ছে।"

ম্যাঙ্গেল ক্বাস আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, আমি বললাম, "তুমি স্বীকার কর আর না-ই কর—আমি এখনো এই মহাকাশযানের অধিনায়ক। তোমাকে আমার উপর নির্ভর করতে হবে ম্যাঙ্গেল ক্বাস।"

ম্যাঙ্গেল ক্বাস কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার ঘুরে চিকিৎসা কক্ষের দিকে এগিয়ে গেল।

আমি নিয়ন্ত্রণ প্যানেলের দিকে তাকিয়ে রইলাম। খুব ধীরে ধীরে ফোবিয়ানের গতিবেগ কমে আসছে, এভাবে আর কিছুক্ষণ চলতে থাকলে ফোবিয়ান নিউট্রন স্টারের প্রবল মহাকর্ষণ থেকে কোনোদিনই বের হয়ে আসতে পারবে না। আমি শান্ত চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম, মিত্তিকাকে বাঁচানোর জন্য আর কোনো উপায় ছিল কি না আমার জানা নেই। থাকলেও এখন আর কিছু করার নেই, মহাকাশযান ফোবিয়ান এবং এর যাত্রীদের নিয়ে আমি যে ভয়ঙ্কর খেলায় নেমেছি তার থেকে আর ফিরে আসার কোনো উপায় নেই। আমি নিয়ন্ত্রণ প্যানেলে বসে দেখতে থাকি ফোবিয়ান ধীরে ধীরে তার নিরাপদ দূরত্ব থেকে সরে আসছে, নিউট্রন স্টারের প্রবল আকর্ষণে ফোবিয়ান একটু পরে পরে কেঁপে উঠছে, প্রতিবার কেঁপে ওঠার সময় বিচিত্র এক ধরনের শব্দ শোনা যায়, অশুভ এক ধরনের শব্দ—আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার পরও এই শব্দ শুনে আমার বুক কেঁপে ওঠে।

আমি একটা নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালাম, শেষ পর্যন্ত কী হবে আমি জানি না, যদি এই ভয়ঙ্কর খেলা থেকে ফিরে আসতে না পারি তা হলে আর কারো সাথে দেখা হবে না। আমার মনে হয় মিত্তিকার কাছে একবার ক্ষমা চেয়ে আসা উচিত।

আমি ফোবিয়ানের দেয়াল ধরে হেঁটে হেঁটে চিকিৎসা কক্ষে হাজির হলাম, ঘরের দরজায় লাল আলো জ্বলছে, এখন ভিতরে কারো ঢোকার কথা নয়। আমি অধিনায়কের কোড প্রবেশ করিয়ে ভিতরে ঢুকতেই সবাই ঘুরে আমার দিকে তাকাল। মিত্তিকাকে অপারেশন থিয়েটারে শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে, তার কপালের ওপর একটি রিং। সেখান থেকে দুর্বোধ্য কিছু সঙ্কেত বের হয়ে আসছে। ক্রুদ বা মুশ দুজনের একজনের হাতে গ্যাস মাস্ক, মিত্তিকাকে ঘুম পাড়িয়ে দেবার জন্য গ্যাস নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে। ম্যাঙ্গেল ক্বাস আমাকে দেখে যেন খুশি হয়ে উঠল, মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "চমৎকার! আমি তোমাকেই চাইছিলাম।"

"কেন?"

"মিত্তিকার মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট কিছু জায়গা খুঁজে বের করা প্রয়োজন। সেই জায়গাগুলো খুঁজে বের করতে হলে সেখানে এক ধরনের আলোড়ন তৈরি করতে হবে যেন আমার সিনান্স মডিউল[৩৮] সেটা খুঁজে পায়।"

আমি শীতল গলায় বললাম, "আমি তোমাকে সেই জায়গাগুলো খুঁজে বের করতে সাহায্য করব তোমার সেরকম ধারণা কেমন করে হল?"

"তোমার সেগুলো খুঁজে বের করতে হবে না ইবান। তোমার জন্য মিত্তিকার ভিতরে খুব একটা স্নেহার্দ্র জায়গা আছে, তোমাকে দেখলেই তার মস্তিষ্কের এক জায়গায় আলোড়ন হবে—"

"এবং তুমি সেই জায়গাগুলো ধ্বংস করবে?"

ম্যাঙ্গেল ক্বাস একগাল হেসে বলল, "ঠিক অনুমান করেছ।"

ক্লদ কিংবা মুশ দুজনের একজন, আমি এখনো তাদের আলাদা করে ধরতে পারছি না— উত্তেজিত গলায় বলল, "ক্যাপ্টেন, সিনান্স মডিউলে সঙ্কেত আসছে।"

"চমৎকার!" ম্যাঙ্গেল ক্বাস আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি আরো একটু কাছে এসে দাঁড়াও।

আমি আরো একটু কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে মিত্তিকার শক্ত করে বেঁধে রাখা হাত স্পর্শ করে বললাম, "মিত্তিকা, আমি তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছি।"

মিত্তিকার সেই ভয়ঙ্কর ভীতিটুকু আর নেই। তার চোখেমুখে হঠাৎ করে পুরোপুরি হাল ছেড়ে দেওয়া মানুষের এক ধরনের প্রশান্তি চলে এসেছে। সে নরম গলায় বলল, "বল ইবান।"

"আমি খুব দুঃখিত মিত্তিকা—"

"তোমার দুঃখ পাবার কিছু নেই ইবান। আমি সারাক্ষণ বুঝতে চেষ্টা করছিলাম তুমি কেমন করে এই মানুষটিকে বাঁচিয়ে নিয়ে এলে। আমি বুঝতে পারি নি। এইখানে এই অপারেশন থিয়েটারে শুয়ে ম্যাঙ্গেল ক্বাসের চোখের দিকে তাকিয়ে আমি হঠাৎ করে বুঝতে পেরেছি।"

"মিত্তিকা—"

"আমি বুঝতে পেরেছি যে এই সৃষ্টিজগতে অন্যায়—ভয়ঙ্কর অন্যায় যেরকম থাকবে, তাকে থামানোর জন্য সেরকম সত্য আর ন্যায় থাকতে হবে। অন্যায়কে অন্যায় দিয়ে যুদ্ধ করা যায় না। ন্যায় দিয়ে অন্যায়ের সাথে যুদ্ধ করতে হয়।"

"মিত্তিকা শোন—"

"আমি তোমার ওপর অভিমান করেছিলাম ইবান। আমি ভেবেছিলাম তুমি আমাকে এই ভয়ঙ্কর মানুষের হাতে তুলে দিয়েছ। এই নিঃসঙ্গ অপারেশন থিয়েটারে শুয়ে শুয়ে আমি হঠাৎ করে বুঝতে পেরেছি যে আসলে কেউ আমাকে ম্যাঙ্গেল ক্বাসের হাতে তুলে দিতে পারবে না! কেউ পারবে না।"

মিত্তিকা খুব সুন্দর করে হাসল, হেসে বলল, "আমার ভিতরকার যত সুন্দর অনুভূতি, যত ভালবাসা সবকিছু এই মানুষটি ধ্বংস করে দেবে। তারপর যেটা বেঁচে থাকবে সেটা তো মিত্তিকা নয়। সেটা অন্য কেউ। সেই ভয়ঙ্কর অমানুষ চরিত্রটির শরীর হয়তো আমার কিন্তু সেটি আমি নই। জগতের সব ভালবাসা, সব সুন্দর, সব সত্য, সব ন্যায় সরিয়ে নিলে সেটা আমি থাকব না। আমার ভিতরকার ভালোটুকু আমি, খারাপটুকু আমি নই।"

ম্যাঙ্গেল ক্বাস উৎফুল্ল গলায় বলল, "চমৎকার মিত্তিকা, এর চাইতে ভালোভাবে এটা করা সম্ভব ছিল না। তোমার মস্তিষ্কের প্রত্যেকটা অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।"

AMARBOI.COM

ঘুম পাড়িয়ে দেওয়ার জন্য নিহিলা৩৯ গ্যাস মাস্কটি মিত্তিকার মুখের কাছে এগিয়ে নিয়ে ক্লদ বলল, "এখন ঘুম পাড়িয়ে দেব, ক্যাপ্টেন?"

"হ্যাঁ। ঘুম পাড়িয়ে দাও। আর এক ঘণ্টার মাঝে মিত্তিকা নতুন মানুষ হয়ে উঠবে।"

ক্লদ মিত্তিকার মুখের ওপর গ্যাস মাস্কটি নামিয়ে আনল। মিত্তিকা খুব সুন্দর করে হাসল, হেসে বলল, "ইবান, বিদায়। আমার চোখে ঘুম নেমে আসছে। এই ঘুম থেকে যে মানুষটি জেগে উঠবে সেটি আর মিত্তিকা থাকবে না। সেই ভয়ঙ্কর মানুষটিকে তুমি ক্ষমা করে দিও ইবান।"

আমি মিত্তিকার হাতে চাপ দিয়ে বললাম, "মিত্তিকা, তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমাও। তোমার ভিতরকার ভালবাসা কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।"

মিত্তিকা তার শক্ত করে বেঁধে রাখা হাত দিয়ে আমার হাতকে স্পর্শ করার চেষ্টা করল, পারল না, আমি অনুভব করলাম তার হাত দুর্বল হয়ে আসছে, আমি তার মুখের দিকে তাকালাম। সেখানে গভীর ঘুম নেমে আসছে। আমি একটা নিশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। ম্যাঙ্গেল ক্বাস তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল, শীতল গলায় জিজ্ঞেস করল, "আমি ভেবেছিলাম তুমি কাউকে মিথ্যা সান্ত্বনা দাও না।"

"না। আমি দিই না।"

"তা হলে তাকে কেন বলেছ কেউ তার ভিতরকার ভালবাসা কেড়ে নিতে পারবে না?"

"কারণ তার আগেই সে মারা যাবে।"

ম্যাঙ্গেল ক্বাস চমকে উঠে বলল, "কী বললে?"

"শুধু মিত্তিকা নয়। তুমি, আমি, তোমার এই প্রভুভক্ত অনুচর সবাই মারা যাবে।"

"কেন?"

"আমি ফোবিয়ানকে ধ্বংস করে ফেলেছি ম্যাঙ্গেল ক্বাস। তুমি টের পাচ্ছ না ফোবিয়ান তার গতিবেগ পাল্টে নিউট্রন স্টারের দিকে ছুটে যাচ্ছে?"

আমি এই প্রথমবার ম্যাঙ্গেল ক্বাসের মুখে আতঙ্কের চিহ্ন দেখলাম। সে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, বলল, "কী বললে? তুমি ফোবিয়ানকে ধ্বংস করে ফেলছ?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

আমি মিত্তিকাকে দেখিয়ে বললাম, "এই মেয়েটার মাঝে একটা আশ্চর্য সরলতা রয়েছে। তাকে একজন কুৎসিত অপরাধীতে পাল্টে দেবে সেটা আমার জন্য গ্রহণযোগ্য নয়।"

"এই একটা তুচ্ছ মেয়ের জন্য তুমি—"

"একজন মানুষ কখনো তুচ্ছ নয়। আমি তোমার মতো দানবকেও উদ্ধার করে এনেছিলাম। তার তুলনায় মিত্তিকা একজন দেবী, মিত্তিকা খুব ভালো একটি মেয়ে, আমি তার ভালোটুকু বাঁচিয়ে রাখার জন্য এক-দুইটি মহাকাশযান ধ্বংস করে ফেলতে পারি।"

ম্যাঙ্গেল ক্বাস হঠাৎ আমার কাছে এসে বুকের কাছাকাছি পোশাকটি শক্ত করে ধরল, চিৎকার করে বলল, "তুমি মিথ্যা কথা বলছ।"

আমি ম্যাঙ্গেল ক্বাসের হাতটি সরিয়ে বললাম, "আমি সাধারণত মিথ্যা কথা বলি না।"

ক্লদ এবং মুশ ম্যাঙ্গেল ক্বাসের কাছে ছুটে এসে বলল, "এখন কী হবে?"

ম্যাঙ্গেল ক্বাস মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "এ মিথ্যা কথা বলছে। এত সহজে কেউ পঞ্চম মাত্রার একটা মহাকাশযান ধ্বংস করে দেয় না।"

"কোনটি সহজ কোনটি কঠিন সে ব্যাপারে তোমার এবং আমার মাঝে বিশাল পার্থক্য—"

আমার কথা শেষ হবার আগেই মহাকাশযান ফোবিয়ান হঠাৎ করে ভয়ঙ্করভাবে কেঁপে উঠল, মনে হল পুরো মহাকাশযানটি বুঝি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, অশুভ এক ধরনের কর্কশ শব্দ পুরো মহাকাশযানের ভিতরে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল।

ক্রুদ আতঙ্কিত হয়ে বলল, "ক্যাপ্টেন! আসলেই মহাকাশযানটি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে!"

ম্যাঙ্গেল ক্বাস চাপা গলায় বলল, "নিয়ন্ত্রণ কক্ষে চল, দেখি কী হচ্ছে।"

কথা শেষ করার আগেই ম্যাঙ্গেল ক্বাস এবং তার পিছু পিছু ক্রুদ এবং মুশ ছুটে বের হয়ে গেল। আমি একটা নিশ্বাস ফেলে মিত্তিকার কাছে এগিয়ে গেলাম, তার ঘুমন্ত মুখটি স্পর্শ করে নরম গলায় বললাম, "ঘুমাও মিত্তিকা। আমি দেখি তোমাকে বাঁচাতে পারি কি না।"

আমি মিত্তিকার মাথার কাছে রাখা নিহিলা গ্যাস সিলিন্ডারটি তুলে নিলাম। কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য ছোট অক্সিজেন সিলিন্ডার থাকে, একটু খুঁজে সেটাও বের করে নিলাম। পোশাকের ভিতরে সেগুলো লুকিয়ে নিয়ে এবারে আমিও ছুটে চললাম নিয়ন্ত্রণ কক্ষে। সেখানে এখন আসল নাটকটি অভিনীত হবে। আমি তার মূল অভিনেতা—আমাকে থাকতেই হবে।

নিয়ন্ত্রণ কক্ষে আমাকে দেখে ম্যাঙ্গেল ক্বাস দাঁতের ফাঁক দিয়ে কুৎসিত একটা গালি উচ্চারণ করে বলল, "নির্বোধ আহাম্মক কোথাকার!"

আমি অত্যন্ত সহজ একটা ভঙ্গি করে বললাম, "এখন আমার কথা বিশ্বাস হল? দেখেছ, মহাকাশযানটা ধ্বংস হতে যাচ্ছে!"

ম্যাঙ্গেল ক্বাস চিৎকার করে বলল, "না। ধ্বংস হচ্ছে না। আমি সেটাকে ফিরিয়ে আনব।"

"তুমি পারবে না।"

"দেখি পারি কি না।"

ম্যাঙ্গেল ক্বাস অভিজ্ঞ মহাকাশদস্যু—মহাকাশের নিয়ন্ত্রণ কীভাবে নিতে হয় সেটি খুব ভালো করে জানে। সে দ্রুত কন্ট্রোল প্যানেলে চোখ বুলিয়ে নেয়, তারপর প্যানেল স্পর্শ করে মূল ইঞ্জিন দুটো পরিপূর্ণভাবে চার্জ করে নেয়। এখন ইঞ্জিন দুটো চালু করতেই প্রচণ্ড শক্তিশালী দুটো ইঞ্জিন মহাকাশযানটিকে সঠিক যাত্রাপথে নেওয়ার চেষ্টা করবে। সেই ভয়ঙ্কর শক্তি মহাকাশযানটিকে প্রচণ্ড ত্বরণের মুখোমুখি এনে ফেলবে, মহাকাশযানের ভিতরে সেটি এক অচিন্তনীয় মাধ্যাকর্ষণের জন্ম দেবে। ম্যাঙ্গেল ক্বাস, ক্রুদ আর মুশ সেই অচিন্তনীয় মহাকর্ষণে অচেতন হয়ে পড়বে, কিন্তু আমাকে চেতনা হারালে চলবে না, যেভাবেই হোক আমাকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। আমি জানি না পারব কি না।

ম্যাঙ্গেল ক্বাস নিয়ন্ত্রণ প্যানেল স্পর্শ করার জন্য তার হাত বাড়িয়ে দিল, আমি নিজেকে রক্ষা করার জন্য নিচে লাফিয়ে পড়লাম, দুই হাত শক্ত করে দুই পাশে দুটি ধাতব রিং আঁকড়ে ধরে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লাম। ম্যাঙ্গেল ক্বাস সুইচ স্পর্শ করল এবং সাথে সাথে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে পুরো মহাকাশযানটি কেঁপে উঠল। আমার প্রথমে মনে হল মহাকাশযানটি বুঝি টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে যাচ্ছে, কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারলাম যে, না, মহাকাশযানটি এখনো টুকরো টুকরো হয়ে যায় নি—প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে মহাকাশযানের সবকিছু

AMARBOI.COM

লণ্ডভণ্ড হয়ে উড়ে গেছে মাত্র। আমি চিৎ হয়ে শুয়েছিলাম বলে ম্যাঙ্গেল ক্বাস, ক্লদ বা মুশকে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু কাতর চিৎকার শুনে বুঝতে পারছি তাদের কেউ–না–কেউ ছিটকে পড়ে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে।

মহাকাশযানটি থরথর করে কাঁপতে শুরু করছে। পদার্থ–প্রতিপদার্থের শক্তিশালী ইঞ্জিন ভয়ঙ্কর গর্জন করে শব্দ করেছে, আয়োনিত গ্যাস অচিন্তনীয় গতিবেগে ছুটে বের হয়ে মহাকাশযানটিকে নিউট্রন স্টারের মহাকর্ষ থেকে বের করে আনার চেষ্টা করছে। আমি বুঝতে পারছি মাধ্যাকর্ষণের টানে আমার ওজন বেড়ে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে সমস্ত শক্তি দিয়ে অদৃশ্য কোনো দানব আমাকে মহাকাশযানের মেঝেতে চেপে ধরছে। আমি নিশ্বাস নিতে পারছি না, আমার চোখের ওপর একটা লাল পরদা কাঁপতে শুরু করছে, মনে হচ্ছে আমি বুঝি এক্ষুনি অচেতন হয়ে পড়ব।

কিন্তু আমি জোর করে নিজের চেতনাকে শাণিত করে রাখলাম, আমার কিছুতেই জ্ঞান হারানো চলবে না, আমাকে যেভাবেই হোক নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রেখে জেগে থাকতে হবে। আমি দাঁতে দাঁত চেপে জেগে রইলাম।

আমি অনুভব করতে পারছি মহাকাশযানের প্রচণ্ড ত্বরণে আমার চেহারা বিকৃত হয়ে যাচ্ছে, অদৃশ্য শক্তি মুখের চামড়া দুইপাশে টেনে ধরেছে, হাত নাড়ানোর চেষ্টা করে নাড়াতে পারছি না, মনে হচ্ছে কেউ যেন পেরেক দিয়ে আমার সমস্ত শরীরকে মেঝের সাথে গেঁথে ফেলেছে, শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেউ যেন পিষে ফেলছে। নিজের শরীরের প্রচণ্ড চাপে আমার নিজের অস্তিত্ব যেন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ভয়ঙ্কর কষ্টে আমার মুখ শুকিয়ে যায়, প্রচণ্ড তৃষ্ণায় বুক হা হা করতে থাকে। মনে হয় কেউ যেন মহাকাশযান থেকে সমস্ত বাতাস শুষে নিয়েছে, অনেক চেষ্টা করেও আমি একফোঁটা বাতাস বুকের ভিতরে আনতে পারি না। মাথার ভিতরে কিছু একটা দপদপ করতে থাকে, মনে হয় বুঝি এক্ষুনি একটা ধমনি ছিঁড়ে যাবে, নাক মুখ চোখ দিয়ে গলগল করে রক্ত বের হয়ে আসবে।

আমি আর পারছি না, অনেক চেষ্টা করেও আর নিজের চেতনাকে ধরে রাখতে পারছি না। হঠাৎ করে মনে হতে থাকে চোখের সামনে একটা কালো পরদা নেমে আসছে, চারপাশে সবকিছু অন্ধকার হয়ে আসছে। আমি যখন হাল ছেড়ে দিয়ে অচেতনতার অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছিলাম, ঠিক তখন কে যেন আমাকে ডাকল, "ইবান।"

কে? কে কথা বলে? আমি চোখ খোলার চেষ্টা করলাম কিন্তু প্যরলাম না। আমি আবার গলার স্বর শুনতে পেলাম, "ইবান। তুমি কিছুতেই জ্ঞান হারাতে পারবে না। তোমাকে যেভাবে হোক চেতনাকে ধরে রাখতে হবে। যেভাবেই হোক।"

কে কথা বলছে? মানুষের গলার স্বরটি আমি আগে কোথাও শুনেছি কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছি না। গলার স্বরটি আবার কথা বলল, "ইবান। তুমি চোখ খুলে তাকাও।"

আমি পারছিলাম না, কিছুতেই চোখ খুলতে পারছিলাম না, কিন্তু গলার স্বরটি আবার জোর করল, "চোখ খুলে তাকাও, ইবান।"

আমি অনেক কষ্টে চোখ খুলে তাকালাম, আমার মুখের কাছে ঝুঁকে রিতুন ক্লিস দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে চোখ খুলে তাকাতে দেখে বললেন, "আমি হলোগ্রাফিক প্রতিচ্ছবি না হয়ে সত্যিকার মানুষ হলে তোমাকে বুকে করে তুলে নিতাম ইবান। কিন্তু আমি সেটা পারব না। তোমাকে জেগে উঠতে হবে ইবান। যেভাবেই হোক জেগে উঠতে হবে। যদি মিত্তিকাকে বাঁচাতে চাও, এই মহাকাশযানটিকে বাঁচাতে চাও, তোমাকে জেগে উঠতেই হবে।"

আমি দাঁতে দাঁত চেপে ফিসফিস করে বললাম, "আমি পারছি না, কিছুতেই পারছি না।"

"তোমাকে পারতেই হবে। যেভাবেই হোক তোমাকে পারতেই হবে। ওঠ। ম্যাঙ্গেল ক্বাস আর তার দুই জন অনুচর অচেতন হয়ে আছে, ওঠ তুমি।"

"আমি কী করব?"

'নিহিলা গ্যাসের সিলিন্ডারটি এনেছ না?"

"হ্যাঁ, এনেছিলাম।"

"এই সিলিন্ডারটি এনে তাদের কাছাকাছি খুলে দিতে হবে—এদেরকে দীর্ঘ সময় অচেতন রাখতে হবে। ওঠ তুমি।"

আমি ওঠার চেষ্টা করে পারলাম না, মনে হল একটি পাহাড় চেপে ধরে রেখেছে। মনে হল সমস্ত শরীর কেউ শিকল দিয়ে মেঝের সাথে বেঁধে রেখেছে। কয়েকবার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়ে বললাম, "পারছি না আমি মহামান্য রিতুন ক্লিস।"

"না পারলে হবে না ইবান। তোমাকে পারতেই হবে। এই যে দেখ তোমার পাশে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য অক্সিজেন সিলিন্ডারটি আছে, তুমি এনেছিলে চিকিৎসা কক্ষ থেকে। সেটা নিজের কাছে টেনে নাও, টিউবটা তোমার নাকে লাগাও, তুমি শরীরে জোর পাবে ইবান।"

আমি অমানুষিক পরিশ্রম করে পাশে পড়ে থাকা সিলিন্ডারটি নিজের কাছে টেনে আনলাম, জরুরি অবস্থায় শ্বাস নেবার জন্য ছোট অক্সিজেন সিলিন্ডারটির সাথে লাগানো টিউবটি নিজের নাকে লাগানোর সাথে সাথে মনে হল বুকের ভিতরে বাতাস এসে আমাকে বাঁচিয়ে তুলছে। বুকভরে দুবার নিশ্বাস নিতেই মাথার ভিতর দপদপ করতে থাকা ভাবটা একটু কমে এল, আমি আবার চোখ খুলে তাকালাম।

রিতুন ক্লিস মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, "চমৎকার ইবান! চমৎকার। এবারে নিহিলা গ্যাসের সিলিন্ডারটি নিয়ে ম্যাঙ্গেল ক্বাসের কাছে যাও। সে এখনো অচেতন হয়ে আছে, তার নাকের কাছে নিহিলা গাসটি ছেড়ে দিতে হবে, সে যেন আর জ্ঞান ফিরে না পায়।"

"কিন্তু সে অচেতন হয়ে থাকলেও তার মাথার ভিতরে কপোট্রন রয়েছে।"

"থাকুক। সেটা পরে দেখা যাবে। তুমি এগিয়ে যাও। নিহিলা গ্যাসের সিলিন্ডারটা নিয়ে এগিয়ে যাও। দেরি কোরো না—"

আমি সমস্ত শক্তি ব্যয় করে কোনোভাবে উপুড় হয়ে নিলাম। তারপর নিহিলা গ্যাসের সিলিন্ডারটি হাতে নিয়ে সরীসৃপের মতো গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে যেতে থাকি। মেঝের সাথে ঘর্ষণে আমার মুখের চামড়া উঠে গিয়ে সমস্ত মুখ রক্তাক্ত হয়ে যায়, আমার পোশাক ছিড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, কিন্তু আমি তার মাঝেই নিজেকে টেনে টেনে নিতে থাকি। নিয়ন্ত্রণ কক্ষের এক অংশ থেকে অন্য অংশে যেতে আমার মনে হল এক যুগ লেগে গেল। প্রথমে ক্লদ এবং তারপর মুশের অচেতন দেহ পার হয়ে আমি ম্যাঙ্গেল ক্বাসের কাছে এগিয়ে গেলাম। ক্লদ আর মুশ দুজনেই খারাপভাবে আঘাত পেয়েছে, মহাকাশযানের ভয়ঙ্কর ত্বরণের সাথে অপরিচিত অনভিজ্ঞ দুজন মানুষ প্রথম ধাক্কাতেই ছিটকে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারিয়েছে। মাথার কোথাও আঘাত লেগেছে সেখান থেকে চুইয়ে চুইয়ে রক্ত বের হচ্ছে। আমি তাদের মুখের ওপর নিহিলা গ্যাসের মাস্কটি কয়েক সেকেন্ডের জন্য লাগিয়ে এসেছি, খুব সহজে এখন তাদের জ্ঞান ফিরে আসবে না।

আমি ম্যাঙ্গেল ক্বাসের কাছে পৌছে খুব কষ্ট করে মাথা তুলে তার দিকে তাকালাম, সে চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে, নিশ্বাসের সাথে সাথে খুব ধীরে ধীরে তার বুক ওঠানামা করছে। আমি খুব সাবধানে ধীরে ধীরে নিহিলা গ্যাসের মাস্কটি হাতে নিয়ে ম্যাঙ্গেল ক্বাসের মুখে

লাগানোর জন্য এগিয়ে গেলাম, হঠাৎ করে ম্যাঙ্গেল ক্বাসের চোখ খুলে গেল এবং তার ডান হাতটি খপ করে আমার হাত ধরে ফেলল। আমি হাতটি ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করে পারলাম না, সেটি শক্ত লোহার মতো আমার হাতকে ধরে রেখেছে। ম্যাঙ্গেল ক্বাস এবারে খুব ধীরে ধীরে আমার দিকে তাকাল, তার চোখে একটি অতিপ্রাকৃত দৃষ্টি, সে বিচিত্র একটি যান্ত্রিক গলায় বলল, "তুমি কে? তুমি কী করছ?"

ম্যাঙ্গেল ক্বাসের মাথায় বসানো কপোট্রনটি কথা বলছে। আমি অবাক হয়ে লক্ষ করলাম সেটি আমাকে চেনে না—সম্ভবত ম্যাঙ্গেল ক্বাস যখন পুরোপুরি অচেতন হয়ে যায় শুধুমাত্র তখনই সেটি তার শরীরের দায়িত্ব নেয়। সম্ভবত এটি আমার জন্য একটি সুযোগ। আমি গলার স্বর অত্যন্ত স্বাভাবিক রেখে বললাম, "আমি ইবান। আমি মহাকাশযান ফোবিয়ানের অধিনায়ক।"

"তুমি নিহিলা গ্যাস মাস্ক নিয়ে কী করছ?"

"আমি ফোবিয়ানের সকল যাত্রীকে অচেতন করে রাখছি।"

"কেন?"

"ফোবিয়ানকে রক্ষা করার জন্য তার গতিবেগকে অত্যন্ত দ্রুত বাড়াতে হবে, তার জন্য প্রয়োজনীয় ত্বরণ মানুষের শরীর সহ্য করতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত গতিবেগ নিয়ন্ত্রিত না হচ্ছে ফোবিয়ানের সকল যাত্রীকে অচেতন করে রাখতে হবে।"

"কেন?"

"এই প্রচণ্ড ত্বরণের মাঝে মানুষ যেন নিজে থেকে কিছু করার চেষ্টা করে নিজের শরীরের ক্ষতি না করে ফেলে সেজন্য।"

"কিন্তু তুমি তো অচেতন নও।"

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, "না, আমি এখনো অচেতন নই।"

"কেন নও?"

"আমিও নিজেকে অচেতন করে ফেলব।"

"তা হলে কেন নিজেকে অচেতন করছ না?"

ম্যাঙ্গেল ক্বাসের মস্তিষ্কে বসানো কপোট্রনটিকে এ রকম সম্পূর্ণ একটি অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে এ রকম গুরুতর আলোচনা শুরু করতে দেখে আমি খুব অবাক হয়ে গেলাম। আমার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল কিন্তু তবুও জোর করে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছি। ম্যাঙ্গেল ক্বাসের গলা থেকে আবার বিচিত্র একটা শব্দ বের হল, "আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, তুমি কেন নিজেকে অচেতন করছ না?"

"তুমি কেন এটা জানতে চাইছ?"

"আমি ম্যাঙ্গেল ক্বাসের মস্তিষ্কের কপোট্রন। যখন প্রভু ম্যাঙ্গেল ক্বাস অচেতন থাকেন তখন আমি তার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিই। আমাকে জানতে হবে তুমি কী করছ।"

"কেন?"

"যদি আমার মনে হয় তুমি প্রভুর বিরুদ্ধে কিছু করছ তা হলে আমি তোমাকে হত্যা করব।"

আমি আতঙ্কে শিউরে উঠে দেখলাম ম্যাঙ্গেল ক্বাসের একটি হাত খুব ধীরে ধীরে আমার মস্তিষ্কের দিকে তাক করে স্থির হল। আমি জানি তার হাতের আঙুলে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরক লুকানো রয়েছে, মুহূর্তে সেটি ছুটে এসে আমার মস্তিষ্ককে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারে। আমি বিস্ফারিত চোখে দেখলাম তার আঙুলের ভিতর চামড়ার নিচে দিয়ে কিছু একটা নড়ে গেল, সম্ভবত বিস্ফোরকটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে স্থির হয়েছে।

ম্যাঙ্গেল ক্বাসের গলা দিয়ে আবার যান্ত্রিক বিচিত্র একটি শব্দ বের হল, কাটা–কাটা গলায় বলল, "আমার প্রশ্নের উত্তর দাও ইবান। তুমি কেন নিজেকে অচেতন করছ না?"

আমি হতচকিত হয়ে ম্যাঙ্গেল ক্বাসের উদ্যত হাতের দিকে তাকিয়ে রইলাম, ইতস্তত করে বললাম, "যারা নিজেদেরকে অচেতন করতে পারছে না আমি শুধু তাদের অচেতন করছি।"

আমি ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলার জন্য আরো কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলাম, মনে হল হঠাৎ করে ম্যাঙ্গেল ক্বাসের ভিতরে কিছু একটা ঘটে গেছে, সে অত্যন্ত বিচিত্র ভঙ্গিতে স্থির হয়ে রইল। সে কিছু বলল না বা কিছু করল না। তার উদ্যত হাতটি এতটুকু নড়ল না এবং যে হাত দিয়ে আমাকে শক্ত করে ধরে রেখেছিল, সেই হাতটিও হঠাৎ করে শিথিল হয়ে গেল। কী হয়েছে আমি কিছু বুঝতে পারলাম না কিন্তু আমি বোঝার চেষ্টাও করলাম না। নিহিলা গ্যাসের মাস্কটি ম্যাঙ্গেল ক্বাসের মুখে চেপে ধরলাম, আমি দেখতে পেলাম ম্যাঙ্গেল ক্বাসের বুক ওঠানামা করছে, এই গ্যাসটি তার ফুসফুসে রক্তের সাথে মিশে যাচ্ছে। মস্তিষ্কের কপোট্রনের ওপর আমার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই কিন্তু মানুষ ম্যাঙ্গেল ক্বাস সহজে ঘুম থেকে জেগে উঠবে না।

আমি প্রবল ক্লান্তিতে মেঝেতে মাথা রেখে চোখ বন্ধ করলাম। ঠিক তখন কে যেন আমার খুব কাছে হেসে উঠল। আমি কষ্ট করে চোখ খুলে তাকালাম, আমার খুব কাছে রিতুন ক্লিস দাঁড়িয়ে আছেন। হাসতে হাসতে তিনি আমার পাশে বসে পড়লেন, বললেন, "চমৎকার! ইবান—চমৎকার।"

"কী হয়েছে?"

"তুমি দেখছ না কী হয়েছে?"

"না দেখছি না।" আমি বড় একটা নিশ্বাস নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে?"

"ম্যাঙ্গেল ক্বাসকে তুমি নিহিলা গ্যাস দিয়ে দীর্ঘ সময়ের জন্য অচেতন করে দিয়েছ। তার কপোট্রনকেও অচল করে দিয়েছ।"

"আমি কপোট্রনকে অচল করে দিয়েছি? কখন? কীভাবে?"

"তোমার সাথে কথোপকথনের সময় তুমি তাকে কী বলেছ মনে আছে?"

"না। আমার মনে নেই। অচেতন করা নিয়ে কিছু একটা বলছিল তখন আমিও জানি ভয় পেয়ে কিছু একটা উত্তর দিয়েছি।"

রিতুন ক্লিস আবার হেসে উঠে বললেন, "তোমার মনে নেই কিন্তু আমার খুব ভালো করে মনে আছে—কারণ তোমাদের এই কথোপকথন হচ্ছে ঐতিহাসিক একটি ব্যাপার। এ রকম কথোপকথন আগে কখনো হয়েছে বলে আমার জানা নেই, ভবিষ্যতেও কখনো হবে কি না জানি না। কিন্তু যুক্তিতর্ক বা গণিতের একেবারে প্রাথমিক আলোচনাতেও এই কথোপকথনের যুক্তিগুলো থাকে।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি।" রিতুন ক্লিস আমার আরো কাছে ঝুঁকে পড়ে বললেন, "ম্যাঙ্গেল ক্বাসের কপোট্রন তোমাকে জিজ্ঞেস করেছে তুমি কেন নিজেকে অচেতন করছ না?"

আমি কষ্ট করে মাথা নাড়লাম, "হ্যাঁ মনে পড়েছে।"

"তুমি বলেছ, যারা নিজেদেরকে অচেতন করতে পারছে না তুমি শুধু তাদের অচেতন করছ। তা হলে কি তুমি নিজেকে অচেতন করবে? এই প্রশ্নের শুধুমাত্র দুটি উত্তর হতে পারে, এক : নিজেকে অচেতন করবে কিংবা দুই : নিজেকে অচেতন করবে না। ধরা যাক প্রথমটি সত্যি, অর্থাৎ তুমি নিজেকে অচেতন করবে, কিন্তু তুমি বলেছ যারা নিজেকে অচেতন করছে

AMARBOI.COM

না তুমি শুধু তাদের অচেতন করছ, কাজেই এটা হতে পারে না। তা হলে নিশ্চয়ই দ্বিতীয় উত্তরটি সত্যি, অর্থাৎ তুমি নিজেকে অচেতন করছ না। কিন্তু তুমি বলেছ যারা নিজেদেরকে অচেতন করছে না তুমি শুধু তাদের অচেতন করছ; কাজেই এটাও সত্যি হতে পারে না। এটি একটি অত্যন্ত পুরোনো গাণিতিক বিভ্রান্তি, তুমি খুব চমৎকারভাবে এখানে ব্যবহার করেছ। এই কপোট্রনের ক্ষমতা খুব সীমিত, এই বিভ্রান্তি থেকে সেটি কিছুতেই বের হতে পারছে না।"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "আমি এটা বুঝে ব্যবহার করি নি, হঠাৎ করে ঘটে গেছে।"

"আমি ভাগ্যে বিশ্বাস করি না, এটা নিশ্চয়ই হঠাৎ করে ঘটে নি। কিন্তু সেটা নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে, এখন আরো একটা খুব জরুরি কাজ বাকি রয়েছে।"

"কী কাজ?"

"ম্যাঙ্গেল ক্বাসের কপোট্রন কতক্ষণ এভাবে থাকবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই; তুমি এটাকে পুরোপুরি বিকল করে দাও।"

"কীভাবে বিকল করব?"

"এই দেখ ওর মাথার পিছনে দুটি ইলেকট্রড আছে, এদিক দিয়ে যদি এক মিলিয়ন ভোল্টের একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ দেওয়া যায় কপোট্রনটা পাকাপাকিভাবে অচল হয়ে যাবে।"

"এক মিলিয়ন ভোল্ট?"

"হ্যাঁ, ঝুঁকি নিয়ে কাজ নেই। কন্ট্রোল প্যানেলেই তুমি পাবে। কমিউনিকেশান্স মডিউলের বাইপাসে এ রকম ভোল্টেজ থাকে। তুমি দুটো তার বের করে নাও, নিউরাল নেটওয়ার্ক তোমাকে ভোল্টেজ প্রস্তুত করে দেবে।"

আমি নিজেকে টেনে নিতে গিয়ে আবার মেঝেতে শুয়ে পড়ে কাতর গলায় বললাম, "আমি পারছি না মহামান্য রিতুন।"

রিতুন ক্লিস ফিসফিস করে বললেন, "তোমাকে পারতেই হবে ইবান। তুমি যদি না পার তা হলে যে কোনো মুহূর্তে ম্যাঙ্গেল ক্বাসের কপোট্রন এই বিভ্রান্তি থেকে বের হয়ে আসবে, তখন তুমি তার সাথে পারবে না। তোমার জীবন শুধু নয়, মিত্তিকার জীবনও শেষ হয়ে যাবে। তুমি চেষ্টা কর ইবান।"

আমি অক্সিজেন সিলিন্ডার থেকে বুকভরে কয়েকবার নিশ্বাস নিয়ে আবার গুড়ি মেরে সরীসৃপের মতো এগুতে থাকি। কন্ট্রোল প্যানেলের নিচে শুয়ে কমিউনিকেশান্স মডিউলের দুটি তার টেনে খুলে এনে ম্যাঙ্গেল ক্বাসের কাছে এগিয়ে গেলাম। তার মাথার পিছনে দুটি ইলেকট্রড থাকার কথা, চুলের পিছনে লুকিয়ে আছে। আমি খুঁজে বের করে তার দুটো লাগিয়ে একটু সরে এসে নিচু গলায় ফোবিকে ডাকলাম, "ফোবি।"

"বলুন মহামান্য ইবান।'

"তুমি এই তার দুটোতে এক মিলিয়ন ভোল্টের একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ দাও।"

"দিচ্ছি, আপনি আরো একটু সরে যান।"

"আমি পারছি না ফোবি, তুমি দিয়ে দাও।"

"ম্যাঙ্গেল ক্বাস হঠাৎ একটু নড়ে উঠল, আমি চিৎকার করে উঠলাম, "ফোবি, এক্ষুনি দাও।"

সাথে সাথে ভয়ঙ্কর বিদ্যুৎঝলকে ম্যাঙ্গেল ক্বাসের পুরো শরীর কেঁপে উঠল, তার হাত দুটো হঠাৎ করে প্রায় ছিটকে সোজা হয়ে উঠল এবং আঙুলের ডগা দিয়ে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরক

AMARBOI.COM

বের হয়ে আসে, আমি প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেলাম, ফোবিয়ান থরথর করে কেঁপে উঠল, কালো ধোঁয়ায় পুরো নিয়ন্ত্রণ কক্ষটি অন্ধকার হয়ে আসে।

ম্যাঙ্গেল ক্বাসের শরীরটা বিচিত্রভাবে নড়তে শুরু করে, একটা চোখ হঠাৎ করে খুলে ছিটকে বের হয়ে আসে, চোখের কালো গর্তের ভিতর দিয়ে সবুজ রঙের ধোঁয়া এবং কিছু ফাইবার বের হতে শুরু করে। মুখটি হাঁ করে খুলে জিভের নিচে থেকে কিছু জটিল যন্ত্রপাতি বের হয়ে আসে। যন্ত্রগুলো অনিয়ন্ত্রিতভাবে নড়তে থাকে, এক ধরনের কালো তেলতেলে জিনিস মুখ বেয়ে বের হতে থাকে। কান থেকে সাদা আঠালো এক ধরনের জিনিস গড়িয়ে বের হতে শুরু করে।

আমি আতঙ্কে চিৎকার করে পিছনে সরে আসার চেষ্টা করলাম। রিতুন ক্লিস আমার পাশে বসে শান্ত গলায় বললেন, "ভয় নেই ইবান, কোনো ভয় নেই।"

"কী হয়েছে? ম্যাঙ্গেল ক্বাসের কী হয়েছে?"

"ও হাইব্রিড মানুষ। ওর যন্ত্রের অংশটি নষ্ট হয়ে গেছে ইবান। মানুষের অংশটি আছে, ঘুমাচ্ছে।"

"ঘুমাচ্ছে?"

"হ্যাঁ, সহজে ঘুম ভাঙবে না।"

"আমি কি একটু ঘুমাতে পারি রিতুন ক্লিস?"

রিতুন ক্লিস কী বললেন আমি শুনতে পেলাম না কারণ তার আগেই আমি অচেতন হয়ে গেলাম। মানুষের শরীর অত্যন্ত বিচিত্র, যে সময়টুকু জেগে না থাকলেই নয় তখন জেগে ছিল; এখন যেহেতু প্রয়োজন মিটেছে আমার শরীর আর একমুহূর্ত জেগে থাকতে রাজি নয়।

AMARBOI.COM

৮

আমি মিত্তিকার হাত এবং পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে তার মাথার কাছে রাখা বায়ো জ্যাকেটটি চালু করে দিলাম। প্রায় সাথে সাথেই বায়ো জ্যাকেটের ছোট পাম্পটি গুঞ্জন করে ওঠে। আমি মনিটরে দেখতে পেলাম তার রক্তের মাঝে দ্রবীভূত হয়ে থাকা নিহিলা গ্যাসটুকু পরিশোধন করতে শুরু করে দিয়েছে। আমি মিত্তিকার মাথার কাছে চুপচাপ দাঁড়িয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম, মেয়েটি সত্যিই অপূর্ব সুন্দরী, চেহারার মাঝে এক ধরনের সারল্য রয়েছে যেটি সচরাচর দেখা যায় না। আমার এখনো বিশ্বাস হয় না যে মিত্তিকাকে আরেকটু হলে ম্যাঙ্গেল ক্বাস একজন ঘাঘু অপরাধীতে পাল্টে দিতে চাইছিল।

আমি মিত্তিকার দিকে তাকিয়ে রইলাম, খুব ধীরে ধীরে তার দেহে প্রাণের চিহ্ন ফিরে আসছে, মিত্তিকার মুখে গোলাপি আভা ফিরে এল, সে হাত-পা নাড়ল এবং একসময় ছটফট করে মাথা নাড়তে শুরু করল। আমি তার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে ডাকলাম, "মিত্তিকা, চোখ খুলে তাকাও মিত্তিকা।"

মিত্তিকা মাথা নেড়ে অস্পষ্ট স্বরে কাতর গলায় কিছু একটা বলল, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। মিত্তিকার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে আমি আবার ডাকলাম, "মিত্তিকা। মিত্তিকা—"

মিত্তিকা হঠাৎ চোখ খুলে তাকাল, তার দৃষ্টি অপ্রকৃতিস্থ মানুষের মতো বিভ্রান্ত। আমাকে দেখে সে চিনতে পারল বলে মনে হল না। মিত্তিকা অসহায়ের মতো চারদিকে একবার তাকিয়ে হঠাৎ করে আমার দুই হাত জাপটে ধরে বলল, "আমি কোথায়? আমার কী হয়েছে?"

"তোমার কিছু হয় নি মিত্তিকা।" আমি মিত্তিকার মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম, "তোমার যেখানে থাকার কথা ছিল তুমি সেখানেই আছ।"

মিত্তিকার হঠাৎ কিছু একটা মনে পড়ে গেল, আর্তচিৎকার করে ভয়ার্ত গলায় বলল, "ম্যাঙ্গেল ক্বাস?"

আমি হেসে বললাম, "তোমার কোনো ভয় নেই মিত্তিকা, ম্যাঙ্গেল ক্বাসকে নিয়ে আর কোনো ভয় নেই।"

মিত্তিকা আতঙ্কিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "কোথায় আছে ম্যাঙ্গেল ক্বাস?"

"এস আমার সাথে, দেখবে।"

"না।" মিত্তিকা আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "দেখব না, আমি দেখব না।"

"দেখতে না চাইলে দেখো না, কিন্তু আমার মনে হয় এখন যদি তাকে দেখ তোমার খুব খারাপ লাগবে না।"

"কেন?"

"কারণ সে আর হাইব্রিড মানুষ নেই। তার ভিতরের যেটুকু অংশ যন্ত্র ছিল সেটা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। যেটা একসময় তার শক্তি ছিল এখন সেটা তার দুর্বলতা।"

মিত্তিকা একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, মনে হল সে আমার কথা ঠিক বুঝতে পারছে না। কয়েকবার চেষ্টা করে বলল, "তুমি কী বলছ, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। কে তাকে ধ্বংস করল? কীভাবে করল? কখন করল?"

"সে অনেক বড় ইতিহাস।" আমি একটু হেসে বললাম, "তুমি আমার সাথে চল নিজের চোখেই দেখতে পাবে।"

মিত্তিকা অপারেশন থিয়েটার থেকে নেমে এল। আমি তার হাত ধরে তাকে নিয়ে করিডোর ধরে হাঁটতে থাকলাম।

ক্রুদ এবং মুশ আলাদা আলাদা দুটি চেয়ারে বসে ছিল, তাদের হাত পিছনে শক্ত করে বাঁধা। আমাকে দেখে ক্রুদ বলল, "মহামান্য অধিনায়ক, আমার হাত দুটো খুলে দেবেন?"

"কেন?"

"অনেকক্ষণ থেকে আমার নাকের উপরের অংশ চুলকাচ্ছে।"

আমি রক্তে মাখামাখি হয়ে থাকা এই মানুষ দুজনের দিকে তাকিয়ে এক ধরনের সমবেদনা অনুভব করলাম, একসময়ে নিশ্চয়ই তারা চমৎকার মানুষ ছিল, ম্যাঙ্গেল ক্বাস তাদেরকে আধা-মানুষ আধা-জন্তুতে পরিণত করে দিয়েছে। আমি জানি না তাদের মস্তিষ্কের ক্ষতিগ্রস্ত জায়গা আবার ঠিক করে দিয়ে আবার তাদের স্বাভাবিক মানুষে তৈরি করে দেওয়া যাবে কি না।

ক্রুদ আবার অনুনয় করে বলল, "মহামান্য অধিনায়ক ইবান, আপনি কি আমার হাত দুটি খুলে দেবেন?"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "না ক্রুদ। সেটি সম্ভব নয়। আমি ঠিক জানি না তোমরা ব্যাপারটির গুরুত্বটুকু ধরতে পেরেছ কি না। ম্যাঙ্গেল ক্বাস তোমাদের মস্তিষ্কে এক ধরনের অস্ত্রোপচার করে তোমাদের স্বাভাবিক চিন্তা করার ক্ষমতা অনেকটুকু নষ্ট করে দিয়েছে। আমার পক্ষে এখন কোনো ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব নয়।"

ক্রুদ কাতর মুখে বলল, "আপনি বিশ্বাস করুন মহামান্য ইবান আমি আপনার কোনো ক্ষতি করব না।"

মুশও গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল, বলল, "আমিও ক্ষতি করব না।"

আমিও মাথা নাড়লাম, "আমি দুঃখিত ক্লদ এবং মুশ, তোমাদের আরো একটু কষ্ট করতে হবে। আমি কিছুক্ষণের মাঝে তোমাদের কিছু একটা ব্যবস্থা করব।"

ক্লদ এবং মুশ নেহায়েত অপ্রসন্ন মুখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি মিত্তিকাকে নিয়ে আরো একটু এগিয়ে গেলাম, নিয়ন্ত্রণ কক্ষের একেবারে কোনার দিকে আমি ম্যাঙ্গেল ক্বাসকে বেঁধে রেখেছি। তাপ পরিবহনের টিউবগুলো যেখানে ঘরের মেঝেতে নেমে এসেছে সেখানে ম্যাঙ্গেল ক্বাসের দুটি হাত ছড়িয়ে আলাদা করে বেঁধে রাখা হয়েছে। সে মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে আছে, আমি সেখানেও কোনো ঝুঁকি নিই নি, দুটি পা শক্ত করে বেঁধে রেখেছি। ম্যাঙ্গেল ক্বাসকে দেখে মিত্তিকা আতঙ্কে চিৎকার করে আমাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরল। আমি ফিসফিস করে বললাম, "মিত্তিকা, ভয় পাবার কিছু নেই। যখন তাকে ভয় পাবার কথা ছিল তখন যেহেতু তাকে ভয় পাও নি, এখন ভয় পেয়ো না।"

মিত্তিকা ভাঙা গলায় বলল, "কিন্তু, দেখ কী বীভৎস! কী ভয়ানক!"

আমি তাকে দেখলাম, সত্যিই বীভৎস, সত্যিই ভয়ানক। একটি চোখ খুলে ঝুলছে, চোখের গর্ত থেকে কিছু ফাইবার বের হয়ে আছে, মুখের ভিতর থেকে কিছু যন্ত্রপাতি বের হয়ে আসছে, কিছু গালের চামড়া ফুটো করে ফেলেছে। হাত এবং পায়ের নানা অংশ থেকে ধাতব অংশ শরীরের চামড়া ফুটো করে বের হয়ে এসেছে, সেসব জায়গা থেকে রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে। ম্যাঙ্গেল ক্বাস যখন হাইব্রিড মানুষ ছিল তখন তার যন্ত্র এবং মানব-অংশের মাঝে চমৎকার একটি সমন্বয় ছিল, এখন নেই। এখন দেখে ভিতরে একটি আতঙ্ক হতে থাকে।

ম্যাঙ্গেল ক্বাস তার ভালো চোখটি দিয়ে আমাদের দিকে তাকাল, একটি যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে বলল, "ইবান, আমি তোমাকে বলেছি আমাকে কীভাবে হত্যা করতে হবে।" সে কথাগুলো বলল খুব কষ্ট করে, তার উচ্চারণ হল অস্পষ্ট এবং জড়িত।

আমি বললাম, "আমি সেটা জানতে চাই না।"

ম্যাঙ্গেল ক্বাস অনুনয় করে বলল, "একটা চতুর্থ মাত্রার অস্ত্র নিয়ে আমার চোখের ফুটো দিয়ে উপরের দিকে লক্ষ্য করে গুলি করলে মস্তিষ্কটি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে—"

ম্যাঙ্গেল ক্বাসের কথা শুনে মিত্তিকা শিউরে উঠল, আমি তাকে শক্ত করে ধরে রেখে বললাম, "ম্যাঙ্গেল ক্বাস, আমি তোমাকে হত্যা করব না। তোমাকে হত্যা করাই যদি আমার উদ্দেশ্য হত আমি তা হলে তোমাকে ঐ উপগ্রহটিতে তোমার মৃত বন্ধুদের সাথে রেখে আসতে পারতাম।"

"তুমি তা হলে আমাকে কী করতে চাও?"

"তোমাকে কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিতে চাই।"

"আমি ভেবেছিলাম তুমি ভালো মানুষ। তুমি কাউকে কষ্ট দিতে চাও না।"

"আমি আসলেই কাউকে কষ্ট দিতে চাই না।"

"তা হলে কেন তুমি আমাকে হত্যা করছ না?"

"কারণ আমি দীর্ঘদিন চিকিৎসাবিজ্ঞানের খোঁজ রাখি নি—হয়তো চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হয়েছে, হয়তো তারা তোমার মস্তিষ্ক সারিয়ে তুলতে পারবে, তুমি হয়তো আবার একজন সাধারণ মানুষ হয়ে যাবে।"

ম্যাঙ্গেল ক্বাস তার বিচিত্র যান্ত্রিক মুখ দিয়ে অবিশ্বাসের মতো একটা ভঙ্গি করে বলল, "তুমি সত্যিই সেটা বিশ্বাস কর?"

"হ্যাঁ করি।"

ম্যাঙ্গেল ক্বাস কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর মাথা নেড়ে বলল, "কিন্তু তা হলে সেই মানুষটি তো ম্যাঙ্গেল ক্বাস থাকবে না, সেটি হবে অন্য একজন মানুষ। আমি কি অন্য মানুষ হতে চাই?"

আমি একটু অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম, তার এই প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই।

ম্যাঙ্গেল ক্বাস এবং তার দুই অনুচর ক্রুদ এবং মুশকে তাদের ক্যাপসুলে ঢুকিয়ে, দেহগুলোকে শীতল করে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য সংরক্ষণ করতে আমার এবং মিত্তিকার দীর্ঘ সময় লেগে গেল। সত্যি কথা বলতে কী মিত্তিকা না থাকলে আমার একার পক্ষে এ কাজগুলো করা দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। ক্রুদ এবং মুশ খুব সহজেই তাদের ভাগ্যকে মেনে নিয়েছিল কিন্তু ম্যাঙ্গেল ক্বাসের জন্য সেটি ছিল অসম্ভব একটি ব্যাপার। ক্যাপসুলের কালো ঢাকনাটি যখন ধীরে ধীরে নেমে আসছিল তখনো সে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে কাতর গলায় তাকে হত্যা করার জন্য অনুরোধ করে যাচ্ছিল। কোনো একটি বিচিত্র কারণে ম্যাঙ্গেল ক্বাস বুঝতে পারছিল না যে আসলে তার মৃত্যু ঘটে গেছে। একজন মানুষ যখন এভাবে মৃত্যু কামনা করে তখন তার বেঁচে থাকা না-থাকায় আর কিছু আসে-যায় না।

ম্যাঙ্গেল ক্বাস আর তার দুজন অনুচরকে নিরাপদে সংরক্ষণ করার পর আমি প্রথমবার ফোবিয়ানের দিকে নজর দিলাম, নিউট্রন স্টারের প্রবল আকর্ষণ থেকে বের হয়ে আসার জন্য যে প্রচণ্ড শক্তিক্ষয় হয়েছে তার চিহ্ন সর্বত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। নিয়ন্ত্রণের মূল অংশটি ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় জরুরি অংশটি কোনোভাবে কাজ করছে। তাপ সঞ্চালনের অনেকগুলো টিউব দুমড়ে মুচড়ে ফেটে গেছে। বিদ্যুৎ সঞ্চালনের একটি বড় অংশ অচল হয়ে আছে। ফোবিয়ানের দেয়ালের কোথাও কোথাও সূক্ষ্ম ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে, ভিতর থেকে বাতাস বের হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকায় ফোবিয়ানের অনেকগুলো অংশের জরুরি চাপনিরোধক দরজা পাকাপাকিভাবে বন্ধ হয়ে আছে। যোগাযোগ মডিউলের কিছু অংশও অকেজো হয়ে আছে, গন্তব্যস্থানে নিয়মিত যে সিগন্যাল পাঠানো হচ্ছিল সেটি বন্ধ হয়ে গেছে, সেটি আবার চালু করে না দিলে মহাজাগতিক নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র ধারণা করতে পারে ফোবিয়ান নিউট্রন স্টারের আকর্ষণে পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। সব মিলিয়ে এখন প্রচুর কাজ। কিছু কিছু এই মুহূর্তে শুরু করতে হবে।

কিন্তু সব কাজ শুরু করার আগে আমার মিত্তিকাকে তার শীতল ক্যাপসুলে ঘুম পাড়িয়ে দিতে হবে। এই মহাকাশযানটিতে শুধুমাত্র তার অধিনায়কের থাকার কথা—এটি সেভাবেই প্রস্তুত করা হয়েছে। কোনো একটি বিচিত্র কারণে আমার মিত্তিকাকে শীতল ক্যাপসুলে ঘুম পাড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করছিল না—ইচ্ছে করছিল তাকে আমার পাশাপাশি রেখে দিই, কিন্তু সেটি সম্ভব নয়। সে মহাকাশযানের একজন যাত্রী, তাকে নিরাপদে তার গন্তব্যে পৌঁছে দিতে হবে। একজন যাত্রীকে সারাক্ষণ তার শীতল ক্যাপসুলে ঘুমিয়ে থাকার কথা, আর এখন এই মহাকাশযানের মোটামুটি বিপজ্জনক পরিবেশে তাকে বাইরে রাখা বেআইনি এবং বিপজ্জনক; একজন মহাকাশযানের অধিনায়ক হিসেবে আমি কোনো অবস্থাতেই সেটি করতে পারি না। মিত্তিকা নিজেও সেটা জানে কাজেই ম্যাঙ্গেল ক্বাস এবং তার দুজন অনুচরকে ঘুম পড়িয়ে দেওয়ার পর সে আমাকে বলল, "এবার আমার পালা।"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "হ্যাঁ।"

"মহাকাশযানের যে অবস্থা আমার মনে হচ্ছে তোমাকে সাহায্য করতে পারলে হত—কিন্তু তুমি তো জান আমি মহাকাশযানের কিছুই জানি না।"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "আমি জানি। তোমার জানার কথা নয়। আমাকে দীর্ঘদিনে এসব শিখতে হয়েছে।"

মিত্তিকা চোখে একটু দুশ্চিন্তা ফুটিয়ে বলল, "তুমি কি একা এইসব কাজ শেষ করতে পারবে?"

আমার ইচ্ছে হল বলি, না, পারব না। তুমি আমার পাশে থাক—কিন্তু আমি সেটা মুখ ফুটে বলতে পারলাম না। বললাম, "পারব মিত্তিকা। আমাকে সাহায্য করার জন্য সাহায্যকারী রোবটগুলো চালু করে দেব। নিউরাল নেটওয়ার্কে সব তথ্য রাখা আছে—কোনো সমস্যা হবে না।"

মিত্তিকা কিছু বলল না, একটা নিশ্বাস ফেলল। আমি বললাম, "এই মহাকাশযানের যাত্রী হওয়ার কারণে তোমার অনেক দুর্ভোগ হল মিত্তিকা। ফোবিয়ানের অধিনায়ক হিসেবে আমি আন্তরিকভাবে তোমার কাছে দুঃখ প্রকাশ করছি। তুমি যদি চাও আমি আনুষ্ঠানিকভাবে তোমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে পারি।"

মিত্তিকা শব্দ করে হেসে বলল, "এর প্রয়োজন নেই ইবান, অধিনায়ক হিসেবে তুমি আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে পার—কিন্তু আমি কী করব? আমার তো কোনো আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা নেই, আমার প্রাণ বাঁচানোর জন্য আমি কীভাবে ধন্যবাদ জানাব?"

"ধন্যবাদ জানানোর কিছু নেই মিত্তিকা। আসলে আমরা খুব সৌভাগ্যবান তাই এত বড় বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে গেছি।" আমি নিয়ন্ত্রণ প্যানেলের ওপর রাখা কোয়ার্টজের গোলকের ভিতরে সৌভাগ্য-বৃক্ষটিকে দেখিয়ে বললাম, "এই সৌভাগ্য-বৃক্ষে এতক্ষণ ফুল ফুটে যাওয়া উচিত ছিল।"

"ঠিকই বলেছ। আমরা যে সৌভাগ্যবান সেটা জানার জন্য আমাদের যেটুকু সময় বেঁচে থাকার দরকার ছিল তুমি না থাকলে সেটা সম্ভব হত না।"

আমি কোনো কিছু না বলে একটু হাসলাম। মিত্তিকা একটু এগিয়ে এসে আমার হাত স্পর্শ করে বলল, আমি তোমার কাছে আরো একটি ব্যাপারে কৃতজ্ঞ ইবান।"

"কী ব্যাপার?"

"আমি তোমার কাছে প্রথম দেখতে পেয়েছি যে অন্য মানুষের জন্য ভালবাসা থাকতে হয়। নিজের ক্ষতি করে হলেও অন্যের ভালো দেখতে হয়!"

আমি শব্দ করে হেসে বললাম, "আমার মা আমার এই সর্বনাশটি করে গেছেন! বিশ্বজগতের সব মানুষ যখন বুদ্ধি, প্রতিভা, সৌন্দর্য, শক্তি, সৃজনশীলতা নিয়ে জন্ম হচ্ছে তখন আমার মা আমাকে জন্ম দিয়েছেন ভালবাসা দিয়ে!"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ, জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করে শুধুমাত্র এই একটি জিনিসই আমাকে দেওয়া হয়েছে। আমার জন্ম হয়েছে একজন দুর্বল মানুষ হয়ে, আমি বড় হয়েছি দুর্বল মানুষ হিসেবে!"

মিত্তিকা সুন্দর করে হেসে বলল, "ভালবাসা দুর্বলতা নয় ইবান। তোমার মা চমৎকার একজন মানুষ—নিজের সন্তানকে এর চাইতে ভালো কী দেওয়া যায়?"

আমি মাথা নাড়লাম, "যখন বড় হওয়ার জন্য আমি কষ্ট করেছি তখন এই গুণটি আমার খুব প্রয়োজনীয় মনে হয় নি।"

"তোমার মা এখন কোথায় আছেন?"

AMARBOI.COM

"তুমি যেখানে যাচ্ছ সেখানে রিশি নক্ষত্রের কলোনির কাছাকাছি কোথাও আছেন। আমি আসলে সেজন্যই যাচ্ছি, মায়ের সাথে দেখা করব! এই সৌভাগ্য–বৃক্ষটা আমি মায়ের জন্য নিয়ে যাচ্ছি।"

"ইস্! কী মজা।"

"হ্যাঁ, আমি খুব অপেক্ষা করে আছি। ফোবিয়ানের যোগাযোগ মডিউলটা হঠাৎ করে নষ্ট হয়ে গেল—এটা ঠিক করে আমি চারপাশে ট্রেসার পাঠানো শুরু করব। খুঁজে বের করতে হবে আমার মা কোথায় আছেন।"

মিত্তিকা সুন্দর করে হেসে একটা ছোট নিশ্বাস ফেলল। বলল, "তুমি খুব সৌভাগ্যবান ইবান, তোমার একজন প্রিয় মানুষ তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমার কেউ নেই।"

আমার হঠাৎ করে বলার ইচ্ছে করল, মিত্তিকা আমি আছি, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করে থাকব। কিন্তু আমি সেটা বলতে পারলাম না, মিত্তিকার দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বললাম, "তুমি নিশ্চয়ই একজন প্রিয়জন পাবে মিত্তিকা। নিশ্চয়ই পাবে।"

মিত্তিকা কোনো উত্তর না দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বিচিত্র একটা ভঙ্গিতে হাসল। তার সেই হাসি দেখে হঠাৎ কেন জানি আমার বুকের ভিতরটা দুমড়েমুচড়ে গেল।

মিত্তিকা তার নিও পলিমারের পোশাক পরে কালো ক্যাপসুলে শুয়ে আছে। আমি খুব ধীরে ধীরে ক্যাপসুলের ঢাকনাটি নিচে নামিয়ে আনলাম, মিত্তিকা শেষ মুহূর্তে ফিসফিস করে বলল, "ভালো থেকো ইবান।"

আমিও নরম গলায় বললাম, "তুমিও ভালো থেকো মিত্তিকা।"

মিত্তিকা জোর করে একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, "বিদায়।"

"বিদায় মিত্তিকা।"

আমি ক্যাপসুলের ঢাকনাটি নামিয়ে সুইচটা স্পর্শ করতেই স্বয়ংক্রিয় জীবনরক্ষাকারী প্লাজমা জ্যাকেটের হালকা গুঞ্জন শুনতে পেলাম। ক্যাপসুলের স্বচ্ছ ঢাকনা দিয়ে আমি মিত্তিকাকে দেখতে পেলাম—খুব ধীরে ধীরে তার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। ক্যাপসুলের মাঝে শীতল একটি প্রবাহ বইতে শুরু করেছে, কিছুক্ষণের মাঝেই সে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়বে। আমি একদৃষ্টে মিত্তিকার দিকে তাকিয়ে রইলাম, মনে হল এই সাদামাঠা সরল মেয়েটি আমার জীবনের বড় একটা অংশকে ওলটপালট করে দিয়ে গেল।

শীতল কক্ষ থেকে বের হয়ে আমি ফোবিকে ডাকলাম। ফোবি সাথে সাথে উত্তর দিল, বলল, "বলুন মহামান্য ইবান।"

"ফোবিয়ান তো প্রায় ভেঙেচুরে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। বলা যায় একটি বিপজ্জনক অবস্থা।"

"আপনি ঠিকই বলেছেন।"

"সবচেয়ে জরুরি কাজ কোনটি? কোন কাজটা দিয়ে শুরু করব?"

"সবচেয়ে জরুরি কাজ হচ্ছে যোগাযোগ মডিউলটি ঠিক করা। ত্বরণের প্রথম ধাক্কাটা লাগার সাথে সাথে প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। গত ছত্রিশ ঘণ্টা এখান থেকে কোনো সঙ্কেত যায় নি। মহাজাগতিক নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের লোকজন ভাবতে পারে আমরা ধ্বংস হয়ে গেছি!"

"বেশ।" আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, "তা হলে এটা দিয়েই শুরু করা যাক।"

"আপনি এটা দিয়ে শুরু করতে পারবেন না মহামান্য ইবান। মূল নিয়ন্ত্রণটি না সারিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনি কিছুতেই যোগাযোগ মডিউল সারাতে পারবেন না। আবার মূল নিয়ন্ত্রণ সারিয়ে তোলার আগে দেয়ালের সূক্ষ্ম ফাটলগুলো বন্ধ করতে হবে।"

আমি একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম, "বেশ, কিছু ইঞ্জিনিয়ার রোবট ছেড়ে দাও, কাজে লেগে যাই।"

আমি প্রায় এক ডজন ইঞ্জিনিয়ার রোবট নিয়ে কাজে লেগে গেলাম। মহাকাশযানের বাইরে থেকে মাইক্রো স্ক্যানার দিয়ে সূক্ষ্ম ফাটলগুলো খুঁজে বের করে ইঞ্জিনিয়ার রোবটদের নিয়ে সেগুলো ওয়েল্ড করে সারিয়ে তুলতে লাগলাম। প্রায় একটানা কাজ করে যখন দেখতে পেলাম শরীর আর চলছে না তখন আমি মহাকাশযানের ভিতরে ফিরে এলাম, এসে দেখি মহামান্য রিতুন ক্লিস আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি বললাম, "মহামান্য রিতুন, আপনি?"

"হ্যাঁ! তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি।"

"বিদায়?"

"হ্যাঁ। মনে হচ্ছে পুরো ব্যাপারটি তুমি চমৎকারভাবে গুছিয়ে নিয়েছ। আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে।"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "আপনার প্রয়োজন কখনোই ফুরাবে না মহামান্য রিতুন। আপনি সাহায্য না করলে আমি কখনোই এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতাম না।"

রিতুন ক্লিস হেসে বললেন, "সেটি সত্যি নয়। যেটি করার সেটি তুমি নিজেই করেছ।"

"কিন্তু কী করতে হবে আমি জানতাম না।"

"তুমি জানতে ইবান। তুমি এখনো জান। নিজের ওপরে বিশ্বাস রেখো।"

"রাখব।"

রিতুন ক্লিস কাছাকাছি এসে বললেন, "আমি সত্যিকারের মানুষ হলে তোমাকে স্পর্শ করতাম। সত্যিকারের মানুষ নই বলে স্পর্শ করতে পারছি না।"

আমি বললাম, "আমার কাছে আপনি তবুও সত্যিকারের মানুষ।"

"শুনে খুশি হলাম।" রিতুন ক্লিস আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "যাবার আগে একটা শেষ কথা বলে যাই?"

"বলুন।"

"আমি সত্যিকারের মানুষ নই। যারা সত্যিকারের মানুষ তাদের নিয়ে কখনো নিজের সাথে প্রতারণা কোরো না।"

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, "আপনি কী বলছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না মহামান্য রিতুন।"

"বুঝতে না পারলে কথাটি তোমার জন্য নয় ইবান। কিন্তু কখনো যদি বুঝতে পার কথাটি মনে রেখো।" রিতুন ক্লিস আমার দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বললেন, "আমাকে বিদায় দাও ইবান।"

"বিদায়। বিদায় মহামান্য রিতুন।"

"বিদায়—আমার একটু ভয় ভয় করছে ইবান। ভয় এবং দুঃখ। তার সাথে একটু আনন্দ—তোমার মতো একজন চমৎকার মানুষের সাথে পরিচয় হল সেই আনন্দ।"

"আমারও খুব সৌভাগ্য মহামান্য রিতুন যে আপনার সাথে আমার পরিচয় হল। আমার মা এখানে থাকলে খুব খুশি হতেন।"

'রিতুন ক্লিস কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর নিচু এবং বিষণ্ণ গলায় বললেন, "যদি

AMARBOI.COM

তার সাথে দেখা হয় তাকে আমার ভালবাসা জানিও। তাকে বলবে তিনি ঠিক কাজ করেছিলেন, সন্তানের বুকের মাঝে সবার আগে ভালবাসা দিয়েছিলেন।"

"বলব।"

রিতুন ক্লিস একটি হাত উপরে তুলে হঠাৎ করে মিলিয়ে গেলেন, আমার মনে হল আমি মৃদু একটা আর্তচিৎকার শুনলাম, তবে সেটি আমার মনের ভুলও হতে পারে। ঘরের ফাঁকা জায়গাটিতে তাকিয়ে আমি বুকের ভিতরে এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করতে থাকি। আমার মা সত্যি কথাই বলেছিলেন, রিতুন ক্লিস সত্যিই চমৎকার একজন মানুষ। ফোবিয়ানে আমার ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার সময় রিতুন ক্লিস না থাকলে কী সর্বনাশই-না হত! পুরো গল্পটা যখন আমার মাকে শোনাব আমার হাসিখুশি ছেলেমানুষি মা নিশ্চয়ই কী আগ্রহ নিয়েই-না শুনবেন! ব্যাপারটি চিন্তা করেই এক ধরনের আনন্দে আমার চোখ ভিজে ওঠে।

যোগাযোগ মডিউলটি ঠিক হওয়ার সাথে সাথে আমি মহাজাগতিক মূল কেন্দ্রে যোগাযোগ করার জন্য তথ্য পাঠাতে শুরু করলাম। এ পর্যন্ত যা ঘটেছে তার পুরো বর্ণনা দিয়ে আমি আমার মায়ের খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করলাম। তার আন্তঃগ্যালাক্টিক পরিচয়সংখ্যা দিয়ে তিনি কোথায় আছেন সেটি খুঁজে বের করার জন্য একটি অনুরোধ পাঠালাম। আনুষ্ঠানিকভাবে এটি অনুরোধ হলেও পঞ্চম মাত্রার মহাকাশযানের অধিনায়ক হিসেবে এটি একটি নির্দেশ হিসেবেই বিবেচনা করার কথা। মহাজাগতিক মূল কেন্দ্র থেকে খবর ফিরে আসতে অনেক সময় লাগবে, আমি তার মাঝে ফোবিয়ানের অন্যান্য সমস্যাগুলো সারতে শুরু করে দিলাম।

বিদ্যুৎ সঞ্চালনের অংশটুকু সেরে তুলতে দীর্ঘ সময় লেগে গেল। কাজটি সহজ হলেও বেশ সময়সাপেক্ষ, অভিজ্ঞ রোবটগুলো পুরো সময়টুকু এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছোটাছুটি করছিল। মহাকাশযানের ভিতরে সারাক্ষণই এক ধরনের ছোটাছুটি এবং বিদ্যুতের ঝালকানি এবং তার সাথে হালকা ওজোনের গন্ধ। বিদ্যুৎ সঞ্চালনের কাজটুকু শেষ হওয়ার পর আমি তাপ পরিবহনের অংশটুকুতে হাত দিলাম, তাপ সুপরিবাহী বিশেষ সংকর ধাতুর উজ্জ্বল টিউবগুলো অনেক জায়গাতেই দুমড়েমুচড়ে গিয়েছে, ভিতরে তাপ পরিবাহী তরলগুলো নানা জায়গাতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। সেগুলো পরিষ্কার করে টিউবগুলো পাল্টে দেওয়ার কাজ শুরু করতে হল। ফোবিয়ানের মূল পাম্পের বিভিন্ন অংশ থেকে টিউবগুলোর ভিতর দিয়ে তরলগুলো মহাকাশযানের নানা অংশে পাঠিয়ে পুরো পদ্ধতিটি বারবার পরীক্ষা করে দেখতে হল।

ফোবিয়ানকে পুরোপুরি দাঁড় করানোর বিশাল কাজ করতে করতে আমার সময়ের জ্ঞান ছিল না, ফোবির অনুরোধে মাঝে মাঝে খেয়েছি মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিয়েছি। গন্তব্যস্থানে পৌঁছানোর আগে আমি মহাকাশযানটিকে তার আগের অবস্থায় নিয়ে যেতে চাই।

এ রকম সময়ে ফোবি আমাকে জানাল মূল মহাজাগতিক কেন্দ্রের সাথে আমাদের যোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছে। আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললাম, "চমৎকার! তাদের প্রতিক্রিয়া কী রকম?"

ফোবি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আপনি নিজেই দেখুন মহামান্য ইবান।"

আমি হাতের যন্ত্রপাতি নামিয়ে রেখে মনিটরের দিকে তাকালাম, মহাজাগতিক কেন্দ্রের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী হাত-পা নেড়ে ফোবিয়ানে যা ঘটেছে সেটা নিয়ে উত্তেজিত ভঙ্গিতে হড়বড় করে কথা বলছে। ম্যাঙ্গেল ক্বাসের মতো বড় একজন অপরাধীকে সার্বিকভাবে পরীক্ষা না করে ফোবিয়ানে তুলে দেওয়া নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করছে।

উপগ্রহটিতে সেই বিচিত্র প্রাণীদের নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করছে এবং তাদের নিয়ে গবেষণা করার বিস্তারিত পরিকল্পনার বর্ণনা দিতে শুরু করেছে। ফোবিয়ানকে নিউট্রন স্টারের প্রবল মহাকর্ষ বল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসার জন্য আমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে—আমি এক ধরনের কৌতুকমিশ্রিত কৌতূহল নিয়ে তার কথা শুনতে লাগলাম। উচ্চপদস্থ কর্মচারীর দীর্ঘ বক্তব্য একসময় শেষ হল এবং আমাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিতে গিয়ে হঠাৎ করে থেমে বলল, "অধিনায়ক ইবান, তুমি একজন মহিলার খোঁজ নেওয়ার জন্য যে ট্রেসার পাঠিয়েছিলে সেটি ফিরে এসেছে। আমি সে সংক্রান্ত তথ্য তোমাকে পাঠালাম।"

আমি চমকে উঠে সোজা হয়ে বসলাম, আমার মা সম্পর্কে তথ্য এসেছে—যার অর্থ তাকে খুঁজে পাওয়া গেছে। আমার বুক আনন্দে ছলাৎ করে ওঠে। মনিটরে কিছু অর্থহীন সংখ্যা এবং বিচিত্র প্রতিচ্ছবি খেলা করতে লাগল এবং হঠাৎ করে মনিটরে একজন মধ্যবয়স্ক মানুষকে দেখতে পেলাম। মানুষটির বিষণ্ন এক ধরনের চেহারা। সে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "অধিনায়ক ইবান, আমি ঠিক কীভাবে খবরটি দেব বুঝতে পারছি না।"

আমি চমকে উঠলাম, মানুষটি কী বলতে চাইছে?

"তোমার মা খবর পেয়েছিলেন তুমি ফোবিয়ানে করে আসছ। তুমি কবে পৌঁছাবে সেটি জানার জন্য তিনি মহাজাগতিক কেন্দ্রের সাথে প্রায় প্রতিদিন যোগাযোগ রেখেছিলেন এবং সেটিই হয়েছে কাল।"

মধ্যবয়স্ক মানুষটি একটি নিশ্বাস ফেলে বলল, "যখন ফোবিয়ান নিউট্রন স্টারের মহাকর্ষ বলে আটকা পড়ে সেখানে বিধ্বস্ত হওয়ার উপক্রম হল এবং হঠাৎ করে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তখন আমরা সবাই ভেবেছিলাম ফোবিয়ান ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।"

মানুষটি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "অধিনায়ক ইবান, তোমার মা যখন আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন আমরা তখন তাকে জানিয়েছিলাম যে নিউট্রন স্টারের মহাকর্ষ বলে আটকা পড়ে ফোবিয়ান ধ্বংস হয়ে গিয়েছে—আমাদের সাথে আর কোনো যোগাযোগ নেই।

"আমি খুব দুঃখিত অধিনায়ক ইবান, এই খবরটিতে তোমার মায়ের বুক ভেঙে গেল। তোমাকে নিশ্চয়ই খুব ভালবাসতেন, তিনি কিছুতেই সেই ভয়ঙ্কর আশাভঙ্গের দুঃখ থেকে উঠে আসতে পারলেন না। একদিন রাতে যখন জোড়া উপগ্রহ থেকে উথালপাথাল জ্যোৎস্নার আলো, কালো সমুদ্রে জোয়ারের পানি লোকালয়ে ছুটে এসেছে, তোমার মা তখন হেঁটে হেঁটে সেই সমুদ্রের ফুঁসে ওঠা পানির মাঝে হেঁটে গেলেন। সমুদ্রের পানি তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। আমি খুব দুঃখিত অধিনায়ক ইবান পরদিন তার দেহ যখন বালুবেলায় ফিরে এসেছে সেটি ছিল প্রাণহীন।"

মধ্যবয়স্ক মানুষটি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বিষণ্ন চোখে তাকাল, একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "তোমার মা মৃত্যুর আগে একটা ছোট ভিডিও ক্লিপ রেখে গিয়েছেন। আমরা তোমার কাছে সেটা পাঠালাম।"

মধ্যবয়স্ক মানুষটি বিষণ্ন চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনিটর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমার হঠাৎ করে মনে হল বুকের ভিতরটি ফাঁকা হয়ে গেছে। আমি মাথা ঘুরিয়ে তাকালাম, ফোবিয়ানের বিশাল কক্ষ, জটিল যন্ত্রপাতি, উজ্জ্বল আলো, গোল জানালা দিয়ে বাইরের কালো মহাকাশ এবং উজ্জ্বল নেবুলা এবং মনিটরের ওপর সাজিয়ে রাখা আমার মায়ের জন্য সৌভাগ্য-বৃক্ষ সবকিছু কেমন জানি অর্থহীন মনে হতে থাকে। আমার চোখের সামনে সবকিছু কেমন জানি অস্পষ্ট হয়ে আসতে থাকে, নিশ্চয়ই চোখ ভিজে আসছে। আমি

হাতের উল্টো পৃষ্ঠা দিয়ে চোখ মুছে মনিটরে তাকালাম, সেখানে আমার মায়ের ভিডিও ক্লিপটি দেখা যাচ্ছে। আমি হাত বাড়িয়ে সেটি স্পর্শ করতেই হঠাৎ করে ঘরের মাঝখানে আমার মা জীবন্ত হয়ে উঠলেন, তার কালো চুল বাতাসে উড়ছে, আকাশের মতো দুটি নীল চোখে গভীর বেদনা। আমার মা ঘুরে অনিশ্চিতের মতো তাকিয়ে ফিসফিস করে বললেন, "আমি আর পারছি না, খুব আশা করেছিলাম যে ছেলেটাকে দেখব, বুকে জড়িয়ে ধরে মাথায় হাত বুলাব। হল না। এক নিঃসঙ্গ একটি মহাকাশযানে আমার সোনার টুকরো ছেলেটি নিউট্রন স্টারের প্রবল আকর্ষণে চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেল। প্রাচীনকালে মানুষ বিশ্বাস করত মৃত্যুর পর একজন মানুষ আকাশের নক্ষত্র হয়ে বেঁচে থাকে। আমারও সেটা খুব বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে যে আমার সোনামণি ইবান আকাশের একটি নক্ষত্র হয়ে বেঁচে আছে।"

আমার মা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "আমার সোনামণি ইবানের কাছে আমার খুব যেতে ইচ্ছে করছে। আমিও সেই নক্ষত্রের পাশাপাশি অন্য একটি নক্ষত্র হয়ে থাকব। উথালপাথাল জোছনায় একটু পরে যখন কালো সমুদ্রের পানি ফুঁসে উঠবে আমি তখন তার মাঝে হেঁটে হেঁটে যাব। আমার আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করছে না।"

আমার মা একটা নিশ্বাস ফেলে চুপ করে গেলেন, সমুদ্রের বাতাসে তার চুল উড়তে লাগল, তার উজ্জ্বল চোখ দুটো গভীর বেদনায় নীল হয়ে রইল। আমার মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার চোখ পানিতে ভরে উঠল, আমার মা অস্পষ্ট হয়ে এলেন। ঠিক তখন শুনতে পেলাম কেউ-একজন আমাকে ডাকল, "ইবান।"

আমি ঘুরে তাকালাম। ফোবিয়ানের দরজা ধরে মিত্তিকা দাঁড়িয়ে আছে। সে শান্ত পায়ে হেঁটে এসে আমাকে আঁকড়ে ধরে বলল, "বুড়োমতো একজন মানুষ আমাকে জাগিয়ে তুলে বলেছেন তুমি ইবানের কাছে যাও। আজ তার জন্য খুব দুঃখের দিন। কী হয়েছে ইবান? আজ কেন তোমার জন্য দুঃখের দিন?"

"আমার মা মারা গেছেন মিত্তিকা।"

"মারা গেছেন? তোমার মা?"

"হ্যাঁ।"

"কেমন করে মারা গেলেন?"

"আমার মা ভেবেছিলেন ফোবিয়ান নিউট্রন স্টারে ধ্বংস হয়ে গেছে, আমিও ধ্বংস হয়ে গেছি। সেটা ভেবে আমার মা এত কষ্ট পেলেন যে—"

"যে?"

"আর বেঁচে থাকতে চাইলেন না। আমার মা সমুদ্রের পানিতে হেঁটে হেঁটে চিরদিনের জন্য অদৃশ্য হয়ে গেলেন।"

মিত্তিকা এক ধরনের বেদনার্ত মুখ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে নিচু গলায় বলল, "আমি খুব দুঃখিত ইবান। আমি খুব দুঃখিত।"

আমি মিত্তিকার দিকে তাকিয়ে রইলাম, তার নীল দুটি চোখে এক আশ্চর্য গভীর বেদনা—ঠিক আমার মায়ের মতন। আমি সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ বুকের ভিতরে এক বিচিত্র আলোড়ন অনুভব করলাম, এক বিচিত্র নিঃসঙ্গতা হঠাৎ করে আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। আমার রিতুন ক্লিসের কথা মনে পড়ল, তিনি বলেছিলেন আমি যেন নিজেকে প্রতারণা না করি। আমি করলাম না, মিত্তিকার হাত ধরে ফিসফিস করে বললাম, "মিত্তিকা—"

"কী হয়েছে, ইবান?"

AMARBOI.COM

"আমি—আমি বড় একা।"

মিত্তিকা গভীর মমতায় আমার হাত ধরল। আমি কাতর গলায় বললাম, "তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না, মিত্তিকা।"

মিত্তিকা গভীর ভালবাসায় আমার মুখমণ্ডল স্পর্শ করে বলল, "যাব না। আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না ইবান।"

হঠাৎ করে ঘরের মাঝামাঝি একটা ছায়া পড়ল, আমি চোখ তুলে তাকিয়ে দেখলাম, সেখানে রিতুন ক্লিস দাঁড়িয়ে আছেন। আমি ইতস্তত করে বললাম, "আমি ভেবেছিলাম আপনি চলে গিয়েছেন রিতুন ক্লিস।"

"হ্যাঁ—আমি চলে যেতে চেয়েছিলাম কিন্তু তোমাকে একা ফেলে যেতে পারছিলাম না ইবান।"

"ধন্যবাদ রিতুন ক্লিস। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।"

"তোমাকে দেখে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল, আমি তাই মিত্তিকাকে জাগিয়ে দিলাম। মনে হল মিত্তিকা হয়তো তোমার পাশে থাকতে পারবে। মানুষের অবলম্বন লাগে—মানুষ যত শক্তই হোক তার একজন অবলম্বন দরকার, তার পাশে একজনকে থাকতে হয়।"

"আমার জন্য আপনার ভালবাসা আমি কখনো ফিরিয়ে দিতে পারব না।"

"তুমি ফিরিয়ে দিয়েছ ইবান। আমি তাই এখন যেতে পারব। তোমাকে ছেড়ে আমি যেতে পারব। রিতুন ক্লিস তার বিষণ্ন মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে তুলে বললেন, "বিদায় ইবান। বিদায় মিত্তিকা!"

আমি আর মিত্তিকা হাত নাড়লাম, বললাম, "বিদায়।"

রিতুন ক্লিসের ছায়ামূর্তি খুব ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল। চিরদিনের মতোই।

AMARBOI.COM

৯

মহাকাশ নিকষ কালো অন্ধকার, তার মাঝে অসংখ্য নক্ষত্র জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। কোথাও নেবুলার রক্তিম ঘূর্ণন, কোথাও ধোঁয়াটে গ্যালাক্সি। কোথাও কোয়াজারের উজ্জ্বল নীলাভ আলো, কোথাও অদৃশ্য ব্ল্যাকহোলের আকর্ষণে আটকে পড়া নক্ষত্রে তীব্র আলোকচ্ছটা। সেই আদি নেই অন্ত নেই অন্ধকার হিমশীতল মহাকাশ দিয়ে নিঃশব্দে ছুটে চলছে ফোবিয়ান। নিঃসঙ্গ এই মহাকাশযানে দুজন যাত্রী। আমি এবং মিত্তিকা।

ফোবিয়ানের দুই নিঃসঙ্গ যাত্রী।

নির্ঘণ্ট

১. নিও পলিমার : পোশাক হিসেবে ব্যবহার করার জন্য নতুন ধরনের পলিমার (কাল্পনিক)।

২. বায়োডোম : জীবনরক্ষাকারী বিশাল গোলক (কাল্পনিক)।

৩. ভিডি টিউব : যোগাযোগের জন্য বিশেষ ভিডিও সংযোগ (কাল্পনিক)।

৪. হলোগ্রাফিক : আলোর ব্যতিচার ব্যবহার করে ত্রিমাত্রিক ছবি দেখানোর বিশেষ পদ্ধতি।

৫. জিন : মানুষের ক্রমোজমে যে অংশটুকু জৈবিক বৈশিষ্ট্য বহন করে।

৬. জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং : জিনের পরিবর্তন করে জৈবিক বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের প্রক্রিয়া।

৭. গ্রিশিন গ্রহ : উল্কাপাতে বায়োডোম ধ্বংস হয়ে বসবাসকারী মানুষের মৃত্যু হয়েছিল যে গ্রহে (কাল্পনিক)।

৮. ব্ল্যাকহোল : প্রবল মহাকর্ষ বলে সৃষ্ট Singularity, যেখান থেকে আলো পর্যন্ত বের হতে পারে না।

৯. কারগো বে মহাকাশযানের যেখানে পরিবহন করার জিনিসপত্র সংরক্ষণ করা হয় (কাল্পনিক)।

১০. নিউরন : মস্তিষ্কের কোষ।

১১. সিনান্স : নিউরনদের মাঝে যোগাযোগ হওয়ার সংযোগস্থান।

১২. নিউরাল নেটওয়ার্ক : মানুষের মস্তিষ্কের অনুকরণে সৃষ্ট নেটওয়ার্ক।

১৩. মস্তিষ্ক ম্যাপিং : একজন মানুষের মস্তিষ্ককে সংরক্ষণ করার প্রক্রিয়া (কাল্পনিক)।

১৪. জিনম ল্যাবরেটরি : মানুষকে জন্ম দেওয়ার কৃত্রিম পদ্ধতি যে ল্যাবরেটরিতে ব্যবহার করা হয় (কাল্পনিক)।

১৫. প্ল্যাসেন্টা : মাতৃগর্ভে সন্তান যে অংশ দিয়ে মায়ের দেহ থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে।

১৬. মেটা ফাইল : যে ফাইলে বিপুল পরিমাণ তথ্য সংরক্ষণ করা যায় (কাল্পনিক)।

১৭. স্কাউটশিপ : মূল মহাকাশযান থেকে আশপাশে যাওয়ার জন্য ছোট মহাকাশযান (কাল্পনিক)।

১৮. প্রতিপদার্থ : পদার্থের সংস্পর্শে এসে যেটি শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

১৯. প্লাজমা : পদার্থের চতুর্থ অবস্থা আয়োনিত গ্যাস।

২০. এক্সরে লেজার : কয়েক এংস্ট্রম তরঙ্গদৈর্ঘ্য দিয়ে তৈরি লেজার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২১. নিহিলিন	:	যে ড্রাগ খেয়ে দীর্ঘ সময় না ঘুমিয়ে থাকা যায় (কাল্পনিক)।
২২. তরল হিলিয়াম তাপমাত্রা	:	শূন্যের নিচে প্রায় দু শ সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস।
২৩. নিউট্রন স্টার	:	যে নক্ষত্রে পরমাণু ভেঙে নিউক্লিয়াস সম্মিলিত হয়ে যায়।
২৪. হাইব্রিড	:	যে মানুষের ভিতরে তার জৈবিক সত্তার পাশাপাশি একটি যান্ত্রিক সত্তা বিরাজ করে (কাল্পনিক)।
২৫. বায়োমার	:	মানুষের শরীরের ওপর ব্যবহার করার জন্য একটি বিশেষ পলিমার (কাল্পনিক)।
২৬. হোয়াইট ডোয়ার্ফ	:	নক্ষত্রের বিবর্তনে একটি বিশেষ পর্যায়।
২৭. আয়ন	:	পরমাণুতে প্রয়োজন থেকে বেশি কিংবা কম ইলেকট্রনের উপস্থিতি।
২৮. গ্যালাক্টিক অবস্থান নির্ধারণ মডিউল	:	যে যন্ত্র দিয়ে গ্যালাক্সিতে যে কোনো জায়গার অবস্থান নিখুঁতভাবে জানা যায় (কাল্পনিক)।
২৯. গ্লুকোনাইট	:	অচিন্তনীয় বিস্ফোরণের ক্ষমতাসম্পন্ন দুষ্প্রাপ্য খনিজ (কাল্পনিক)।
৩০. এটমিক ব্লাস্টার	:	শক্তিশালী পরমাণু দিয়ে তৈরি বিশেষ ধরনের অস্ত্র (কাল্পনিক)।
৩১. জেটপ্যাক	:	শরীরের সাথে লাগানো ক্ষুদ্রকায় জেট ইঞ্জিন যেটি একজন মানুষকে উড়িয়ে নিতে পারে (কাল্পনিক)।
৩২. কোয়ারেন্টাইন কক্ষ	:	যে কক্ষে কোনো কিছুকে জীবাণুমুক্ত করা হয়।
৩৩. আলট্রাভায়োলেট রশ্মি	:	যে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য থেকে ছোট।
৩৪. জিনেটিক প্রোফাইল	:	একজন মানুষের জিনের বিন্যাস।
৩৫. কপোট্রন	:	কৃত্রিম মস্তিষ্ক (কাল্পনিক)।
৩৬. ট্রান্সক্র্যানিয়াল ম্যাগনেটিক স্টিমুলেটর	:	উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এবং উচ্চ কম্পনের চৌম্বকীয় ক্ষেত্র দিয়ে মস্তিষ্কের বাইরে থেকে মস্তিষ্কের ভিতরে সংবেদন সৃষ্টি করার বিশেষ যন্ত্র।
৩৭. স্লিংশট	:	মহাকর্ষ বল ব্যবহার করে মহাকাশযানের গতিপথে শক্তি প্রয়োগের পদ্ধতি।
৩৮. সিনাপ্স মডিউল	:	মস্তিষ্কের ভিতরে কোথায় আলোড়ন সৃষ্টি হয় সেটি খুঁজে বের করার বিশেষ যন্ত্র (কাল্পনিক)।
৩৯. নিহিলা	:	মানুষকে দীর্ঘ সময় অচেতন রাখার বিশেষ ধরনের গ্যাস (কাল্পনিক)।

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০০১

AMARBOI.COM